উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন কার্যালয় কলিকাতা-৩

৬৮-তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা মাঘ, ১৩৭৩

দিব্য বাণী

চতুর্যুগান্তে বেদানাং জায়তে কিল বিপ্লবঃ।
প্রবর্তয়ন্তি তানেত্য ভুবি সপ্তর্ষয়ো দিবঃ॥ —বিষ্ণুপুরাণ ৩।২।৪৪

চারিটি যুগের অন্তে সদাই বেদ-বিপ্লব আসে
(লোপ পেতে বসে ধর্মাচরণ, যথাযথ বেদ-জ্ঞান)—
সপ্তর্ষিরা নামিয়া তখন এই ধরণীর বুকে
করেন আবার সনাতন সেই বেদের প্রবর্তন।

নরঋষির অবতরণ*

স্বামী সারদানন্দ

ঐ স্তিমিতচিৎসিন্ধু ভেদি উঠিছে কি জ্যোতি ঘন॥
মায়া- খণ্ডিত অখণ্ড বারি, বুঝে লীলা কেবা হেন॥
কোটী সূর্য গলাইয়া ছাঁচে ঢালা কান্তি যেন॥

দেখ উজ্জ্বল বালক বেশে, অখণ্ড ঘর প্রবেশে,
প্রেমঘন বাহুপাশে কাহারে (নরেশে) করে ধারণ॥
বলে, চাহ বীর আঁখি মেলি, রাখ ধ্যান চল চলি,
ধরণী ডুবাল বুঝি অবিদ্যা কাম কাঞ্চন॥
সুধীর ধীর পরশে, যোগী চাহে সহরষে,
কণ্টকিত তনু মন, নীরবে ভাসে নয়ন॥
তারা জ্বলি ছায়াপথে পশে ধরা আচম্বিতে,
পুণ্যভূমে উদে আজি পুনঃ নর নারায়ণ॥

*'স্বামী বিবেকানন্দ'-শীর্ষক গান—উদ্বোধন, সপ্তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা; চৈত্র ১৩১১

পরলোকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী

গভীর দুঃখের বিষয়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী গত ১১ই জানুআরি রাত্রি ১-৩২ মিনিটের সময় (তাসখণ্ড সময়) আকস্মিকভাবে দেহত্যাগ করিয়াছেন; ইহার মাত্র সাত মিনিট পূর্বে তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

আয়ুব খাঁর সহিত আলোচনা করিয়া পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে মৈত্রীস্থাপনের পথসন্ধানে তিনি কোসিগিনের আমন্ত্রণে রাশিয়ার তাসখণ্ডে গিয়াছিলেন। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিবার কয়েকঘণ্টা পরেই তাঁহার দেহাবসান হয়। ১১ তারিখ বেলা ২॥টার সময় তাঁহার দেহ তাসখণ্ড হইতে দিল্লীতে লইয়া আসা হয়। শেষকৃত্য আরম্ভ হয় পরদিন বেলা ১২-৩২ মিনিটে।

বিশুদ্ধ ভারতীয় ছাঁচে গঠিত জীবন, ভারতের কল্যাণে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ শাস্ত্রীজী তাঁহার বজ্রের চেয়েও কঠোর অথচ কুসুমের চেয়েও কোমল বিমল চরিত্রের জন্য, তাঁহার সরল ব্যবহারের জন্য ভারতবাসী সকলেরই অন্তরে অকপট শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

অতি অল্প সময়, মাত্র উনিশ মাস তিনি প্রধানমন্ত্রীরূপে জাতির কর্ণধার ছিলেন। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে দেশের ভিতর ও বাহির হইতে বহু বিপর্যয়ের ঝড় প্রবলবেগে উঠিয়া আভ্যন্তরীণ একবদ্ধতাকে ও স্বাধীনতাকে বিপন্ন করিতে চাহিয়াছে; কিন্তু তাঁহার দৃঢ়প্রত্যয়-বিশিষ্ট নিপুণ ধীরস্থির পরিচালনায় সেই সব সঙ্কট-মুহূর্তে জাতি সুসংহত হইয়াছে, দেশ বিপন্মুক্ত হইয়াছে, আবার শান্তির পথের সন্ধানও পাইয়াছে।

স্বাধীনতালাভের পর চলার পথনির্ধারণে যে দ্বিধার ভাব শান্তিকামী ভারতে ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছিল, শাস্ত্রীজী সে দ্বিধা নিশ্চিহ্ন করিয়া নির্ভুল পথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। ক্ষমা ও সহিষ্ণুতাই বিশ্বকল্যাণের পথ এবং জাতির মহত্ত্বের নিদর্শন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার সহিত আত্মরক্ষা বা অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য শক্তিমান হওয়া এবং প্রয়োজন হইলে শক্তির প্রয়োগ করাও একান্ত আবশ্যক। শাস্ত্রীজী কার্যতঃ উভয়ভাবের সমন্বয় সাধন করিয়া জাতিকে অগ্রগমনের পথে নিঃসংশয় করিয়াছেন, জাতির ঈষদাচ্ছন্ন আত্মবিশ্বাসকে পূর্ণভাবে নিরাবরণ করিয়াছেন। আবার ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশেরই—বিশ্বেরও—কল্যাণকামনায় আন্তরিকভাবে শান্তির পথ-সন্ধান-প্রচেষ্টায় যথেষ্ট সংযম এবং ঔদার্যের পরিচয় দিয়াছেন। যে আদর্শ ধরিয়া ভারতবর্ষ অগ্রসর হইতেছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া তিনি নূতন আদর্শের দিকে যান নাই, তাহারই পরিপূরণ করিয়াছেন। ভারতের ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা দুর্বলতা বলিয়া বহির্জগতে বিবেচিত হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল, তিনি সেই আশঙ্কাকে লুপ্ত করিয়া ভারতের এই আদর্শকেই শক্তিদৃপ্ত দৃঢ়তর ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছেন, ইহাকে অধিকতর মহিমোজ্জ্বলই করিয়াছেন।

* * *

বারাণসী জেলার মোগলসরাই-এ এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর লালবাহাদুর শাস্ত্রী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা সারদাপ্রসাদ শিক্ষকতা করিতেন। দেড় বৎসর বয়সে লালবাহাদুর

পিতৃহীন হন। মাতামহের তত্ত্বাবধানে বারাণসীর হরিশ্চন্দ্র বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে মহাত্মাজীর আবেদনে সাড়া দিয়া তিনি ১৭ বৎসর বয়সে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। ফলে তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হয়। মুক্তিলাভের পর কাশী বিদ্যাপীঠে আবার তিনি পড়াশুনা আরম্ভ করেন। এখান হইতে 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করিবার পর এলাহাবাদে আসেন; এখানেই তাঁহার দেশ-সেবা পুনরায় সুরু হয় এবং একটানা চলিতে থাকে।

এলাহাবাদ পৌরসংসদের সদস্যরূপে, এলাহাবাদ জেলা কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতিরূপে এবং প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতিরূপে তিনি দীর্ঘকাল দেশ-সেবায় ব্রতী ছিলেন। পরে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে আইনসভায় যুক্তপ্রদেশ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দেও তিনি পুনরায় এই পদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এই কালের মধ্যে কংগ্রেসের বিভিন্ন আন্দোলনে যোগদানের জন্য তাঁহাকে বহুবার কারাবরণ করিতে হইয়াছে। সর্বমোট নয় বৎসর তিনি কারাবাস করিয়াছেন। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে তিনি নূতন সংসদের রাজ্যসভায় সদস্যরূপে নির্বাচিত হন। ভারতের রাষ্ট্র ও পরিবহনমন্ত্রীও হন এই বৎসর। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে হন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দেকেন্দ্রীয় রেল ও পরিবহন মন্ত্রী হইয়া ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এই পদ ত্যাগ করেন। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর তিনি পরিবহন ও যোগাযোগ মন্ত্রী হন। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্য ও শিল্প-মন্ত্রণালয়ের ভার গ্রহণ করেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভার গ্রহণ করেন ১৯৬১ কামরাজ-পরিকল্পনায় সংগঠনের জন্য ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে দপ্তরহীন মন্ত্রীরূপে আবার তাঁহাকে আনা হয়। জওহরলালজীর মৃত্যুর পর এই বৎসরই জুন মাসে তিনি ভারতের প্রধান মন্ত্রীর পদে বৃত হন।

প্রধান মন্ত্রী হইবার পরই তাঁহাকে বহুবিধ আভ্যন্তরীণ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে পাকিস্তানের সহিত সামরিক সংঘর্ষ সুরু হয়। কচ্ছের ব্যাপার পুরাপুরি মিটিতে না মিটিতেই কাশ্মীর লইয়া আগুন জলিয়া ওঠে। ধীর স্থির অথচ দৃঢ় হইয়া যেভাবে তিনি এই সমস্যার মধ্য দিয়া ভারতকে গৌরবের পথে আগাইয়া লইয়া গিয়াছেন, এবং পরে উভয় দেশের মধ্যে মৈত্রীর সেতুবন্ধনের সূচনা করিয়াছেন, ভারতের ইতিহাসের পাতায় তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

* * *

শাস্ত্রীজী নিজের ব্যক্তিগত জীবনে সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি সর্বাবস্থায় অবিচল নিষ্ঠা দেখাইয়া এদিকে জন-সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। বিদেশের সংস্কৃতি, বিদেশের আচরণ, বিদেশের মতামতের প্রতি মোহ ভারতের নিজস্বতায় ও ভারতের কল্যাণে নিবদ্ধ তাঁহার একাগ্র দৃষ্টিকে বিন্দুমাত্র চঞ্চল করিতে পারে নাই। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা ছিল—"তাঁর বাণী এক অর্থে সর্বব্যাপক। সেই কম্বু-কণ্ঠের উদাত্ত আহ্বানেই সারা দেশ জেগে উঠেছিল।...আমার আজও মনে আছে, ছাত্র জীবনে তাঁর বাণী ও রচনা আমার অন্তরে কি গভীর রেখাপাত করেছিল। তাঁর বাণী আমার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিই সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। আমি চাই, দেশের প্রত্যেক যুবক-যুবতী স্বামীজীর বাণী থেকে প্রেরণা লাভ করুক।"[১] তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

---

[১] "স্বামীজীর জীবনদর্শন" (শাস্ত্রীজী কর্তৃক লিখিত একটি প্রবন্ধের অনুবাদ)—উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৭১

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের নববর্ষ

শ্রীভগবানের কৃপায় 'উদ্বোধন' ৬৮তম বর্ষে পদার্পণ করিল। যাঁহাদের সহৃদয় সহযোগিতা ইহার অগ্রগমন অব্যাহত রাখিয়াছে, 'উদ্বোধনে'র সহিত সংশ্লিষ্ট তাঁহাদের সকলেরই শুভেচ্ছা আমাদের চিরকাম্য।

অতীতের স্মৃতিগুলির মধ্যে যেগুলি ভবিষ্য জীবনের পক্ষেও শুভকর, সেগুলিকে মনে সজাগ রাখিতে হয় চেষ্টা করিয়া। নতুবা, 'অভ্যাসের-সীমা-টানা চৈতন্যের সঙ্কীর্ণ সঙ্কোচে ঔদাস্যের ধুলা ওড়ে…মন জড়তায় ঠেকে'—গতানুগতিকতায় সেই মহত্তর চেতনাগুলি ক্রমশঃ মনের গভীরে তলাইয়া যায়।

বিগত বৎসর, বহু দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও, একটি অতি কল্যাণকর জিনিস আমাদের দিয়াছে—জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে ভারতবাসী-রূপে সকলকে লইয়া একটি শুভ চেতনায়, আত্মবিশ্বাসে, আত্মমর্যাদায় এবং জাতির কল্যাণের জন্য আত্মত্যাগে প্রেরণা। শ্রীভগবানের কৃপায় এই কল্যাণকর ভাবগুলিকে আমরা যেন জাতীয় জীবনে সদাজাগ্রত রাখিবার মত ব্যবস্থা করিতে পারি।

আমাদের প্রয়োজন

অতীত ইতিহাসের ঘটনা-বিশ্লেষণ ভবিষ্যতের উপর কিছুটা আলোক বিকিরণ করে। অনেকের অন্তরালোক আবার স্পষ্ট করিয়া তোলে ভবিষ্যৎকে; পরবর্তীকালে তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বাণী-গুলির বাস্তবরূপায়ণতাই ইহার অভ্রান্ততার নিদর্শক।

৬৭ বৎসর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ ('উদ্বোধনের' প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় 'প্রস্তাবনা') আমাদের বর্তমান প্রয়োজন সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহার কিছুটা আমরা আয়ত্ত করিলেও এখনো অনেক বাকী—"যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুদাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই সর্বদা-পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখপ্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।"

কিন্তু ইহার একটি বিপজ্জনক দিকও আছে—"যদ্যপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্য বীর্য-তরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়; ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়; ভয় হয়, পাছে অসাধ্য, অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ' হইয়া যাই।"

ভারতের বর্তমান জাগরণের কালটুকুর সীমায় দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে, এই বিপদের আভাস ইতিপূর্বেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পাশ্চাত্যভাবানুকরণ করিতে যাইয়া আমাদের অনেকেই 'ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা' হইয়া যাইতেছে, অত্যধিক ভোগ-লিপ্সা তাহাদের ন্যায়অন্যায়-বোধকে এবং স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার মোহ মনুষ্যত্বকেই বিলুপ্ত করিতেছে; অনেকেরই জীবনকে 'ইতোনষ্ট-

স্ততোভ্রষ্টঃ' করিয়া আপাতমধুরতার অন্তে দুর্বিষহ যন্ত্রণা ও অশান্তির সাগরে নিমজ্জিত করিতেছে।

ইহারই প্রতিকারকল্পে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা স্বামীজী আমাদের ঘরের রত্নরাজিকে—প্রাচীন ভারতের অমূল্য ভাব ও চিন্তাগুলিকে, বহু শতাব্দীর কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত জীবনাদর্শকে সর্বদা চোখের সামনে রাখিয়া অপরের ভাবগুলির দিকে তাকাইতে বলিয়াছেন। ভারতের উচ্চভাবগুলি চরমসত্যের মহিমাস্নাত, কোন যুগের কোন ভাবের, কোন যুক্তি-বিচারের সম্মুখীন হইতে সেগুলির ভয় নাই। জাতির কূপমণ্ডূকতারূপ অচলায়তনের দু-একটি কক্ষের বাতায়ন কোন কোন মনীষী দ্বারা স্বামীজীর পূর্বেই উন্মুক্ত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু অগণিত কক্ষসমন্বিত এই সুবিশাল অট্টালিকার সব বাতায়ন, সব দ্বার পূর্ণ উন্মুক্ত করিয়াছেন স্বামীজীই, এবং উন্মুক্তই রাখিতে বলিয়াছেন (অবশ্য তাহার পূর্বে আমাদের ঘরে যে নিজস্ব ভাবগুলি রহিয়াছে সেগুলিকে তিনি দেশবাসীর চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন)—"যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা দেখিতে ও জানিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক পাশ্চাত্য কিরণ।"

উনবিংশ শতাব্দী হইতে ক্রমবর্ধমান হইয়া আজিও "কত বিভিন্ন প্রকারের ভাব, কত শক্তিপ্রবাহ—দেশদেশান্তর হইতে কত সাধু-হৃদয়, কত ওজস্বী মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত হইয়া নররঙ্গক্ষেত্র কর্মভূমি—ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে।...বিদ্যুদ্বেগে নানাবিধ ভাব—রীতিনীতি দেশমধ্যে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। অমৃত আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গরলও আসিতেছে।"

কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের 'ঘরের সম্পত্তি' 'আসাধারণের' সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার কোন ব্যাপক ব্যবস্থা হয় নাই; নমনীয়চিত্ত বালক-বালিকাগণ প্রথম হইতেই উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে বিদেশাগত সর্ববিধ ভাবধারার সহিত সুপরিচিত হইবার সুযোগ পাইতেছে, কিন্তু ঘরের রত্নরাজি প্রায় কিছুই তাহারা দেখিতে পাইতেছে না। বালকগণকে, যুবকগণকে দেশপ্রেমিক করিতে হইবে, স্বার্থত্যাগী করিতে হইবে, উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে দূরে রাখিতে হইবে, জাতির অতীত জীবনের গৌরব স্মরণ করাইয়া তাহাদিগকে জাতির প্রতি সশ্রদ্ধ করিতে হইবে, ইহা দেশের বহু মনীষী আজ উপলব্ধি করিতেছেন। ইহার জন্য কার্যকরী পন্থাবিষ্কার করিবার চেষ্টাও চলিতেছে। কিন্তু যাহা দ্বারা ইহা সহজে ঘটানো সম্ভব, তাহার দিকে এখনো কাহারো পূর্ণ দৃষ্টি পড়িতেছে না। যে দৃষ্টিশক্তি অমৃত ও গরলের মধ্যে পার্থক্য দেখাইতে পারে, যাহা প্রলোভনের অপরূপ আবরণটি সরাইয়া 'অগ্রেহ-মৃতোপমম্, পরিণামে বিষমিব' জীবনাদর্শের আত্মঘাতী স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিতে পারে, তাহা সহজেই লাভ করানো যায় আমাদের উচ্চচিন্তাগুলি সর্বসাধারণের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া রাখিলে।

শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ইহা সহজে করা যায়; অবিলম্বে ইহা করা একান্ত প্রয়োজন। শিশুপাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সর্বত্রই প্রতিটি ধাপের উপযোগী বা উপযোগী করা অন্ততঃ রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও বেদান্ত অবশ্যপাঠ্য হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সেই সঙ্গে অন্যান্য জাতির ও ধর্মের উচ্চভাবগুলিও থাকিবে। আর সেই সঙ্গে প্রয়োজন, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এগুলির যথার্থ মর্ম সহজে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের

চিন্তাধারারও সর্বত্র বিস্তার। বিদেশী সাহিত্যের পরিচয় আমরা অনেকেই রাখি, রাখিতে পারিলে গর্ব অনুভব করি; কিন্তু আমাদের রামায়ণ-মহাভারত-গীতা-বেদান্ত-উপনিষদে কি আছে, উচ্চশিক্ষিত হইয়াও তাহার সঠিক সংবাদ হয়ত সকলে রাখি না; মানবজাতির আধুনিক সমস্যাগুলির উপর স্বামী বিবেকানন্দ কি আলোক-সম্পাত করিয়াছেন, তাহাও হয়ত জানি না। আমাদের ঘরেই কত উচ্চ, কত ব্যাপক, কত গভীর চিন্তারাজি আছে, পাশ্চাত্যের চিন্তাগুলির দিকে তাকাইবার সময় সেগুলিও দেখা প্রয়োজন। গল্পের মাধ্যমে, ঐতিহাসিক উচ্চ জীবনের মাধ্যমে—পুরাণের মাধ্যমে—এই চিন্তাগুলিকে সর্বজনবোধ্য করা হইয়াছিল বলিয়াই বিপরীত চিন্তার সহিত পরিচয় সত্বেও ভারতের উচ্চজীবনাদর্শ বিলুপ্ত হয় নাই। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের উপলব্ধ বা অধিগম্য অতি উচ্চ চিন্তাগুলিকে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসারিত না করিলে যে সমাজ বা সভ্যতা দীর্ঘজীবী হয় না, উন্নতির পথে তাহার অগ্রগমন রুদ্ধ হয়, তাহা আমাদের প্রাচীনকালের সভ্যতার নিয়ামকগণ জানিতেন। মহাভারতে তাই স্পষ্ট নির্দেশ আছে, 'বেদকে ইতিহাস ও পুরাণের দ্বারা বর্ধিত করিবে (গল্পাদির মাধ্যমে সহজবোধ্য করিবে); নতুবা অল্পবুদ্ধি লোক উহাকে প্রহার করিবে (বুঝিতে না পারিয়া নিন্দা ও ত্যাগ করিবে)।' প্রাণবন্ত ভারতে সর্ববিধ চিন্তার দ্বার অবারিত ছিল। কোন শক্তিশালী বা বিরোধী চিন্তার "চ্যালেঞ্জ"-এর সম্মুখীন হইতে সে ভয় পাইত না। আধুনিক যুগের জড়বাদভিত্তিক চিন্তার সমপর্যায়ের চার্বাকদর্শনের চিন্তার সহিতও জনগণ পরিচিত ছিল। উহাকে স্বীকার করা হইয়াছিল, বিশ্লেষণ করিয়া দেখা হইয়াছিল, এবং অন্যান্য রত্নরাজির তুলনায় উহা মূল্যহীন বিবেচিত হইয়া অগ্রাহ্যও হইয়াছিল। চার্বাক দর্শন ভারতীয় জাতির চিরন্তন অবলম্বনভূমি হইতে তাহাকে সরাইতে চাহিয়াছিল, এক শ্রেণীর বর্তমান জড়বাদী জীবনদর্শন যাহা বলিতে চায়, সেই সব কথাই বলিয়াছিল: ঈশ্বর বা ধর্মে বিশ্বাস করিবার কোন প্রয়োজনই নাই; যাঁহারা বেদাদি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই ঋষিরা 'ধূর্ত, ভণ্ড, প্রতারক।' পরলোক বলিয়া কিছুই নাই, মানুষের দেহাতীত কোন সত্তাই নাই—"ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?" কাজেই এই জীবন যতদিন আছে, যতটুকু পার, যে উপায়ে পার সুখ ভোগ করিয়া লও—"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" বলা বাহুল্য এই ঋণ শোধ দিবার জন্য নৈতিক কোন দায়িত্বের প্রশ্নই ওঠে না, কারণ নৈতিকজীবনের প্রতি আসক্তিও 'কুসংস্কার' মাত্র; 'সংস্কারমুক্ত' হইয়া সদসদ্ যে কোন উপায়েই হউক সুখলাভই হইল জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—শাস্ত্রের কথা ও প্রথা অগ্রাহ্য করিয়া "··· যথেচ্ছং বিহরেৎ সদা।" এককথায় একটি পশু বুদ্ধিমান হইলে যাহা করা সম্ভব, তাহা সবই কর। এই সব চিন্তাগুলি, যাহা মানুষকে পশুত্বের স্তরে নামাইয়া লইতে চায়, কোনদিনই এখানে সমগ্র জাতির জীবনকে প্রভাবান্বিত করিবার মত শক্তিসঞ্চয় করিতে পারে নাই, কোনদিন পারিবেও না। জীবনের হাটে ইহার বিনিময়ে শান্তি এবং আনন্দ পাওয়া কখন সম্ভব নয়। যদি হইত, তাহা হইলে ভোগ্যবস্তুর অনায়াসলভ্যতা বা প্রাচুর্য যেখানে, সেই পাশ্চাত্যে অসংখ্য নরনারীর অন্তর অশান্তিতে পুড়িয়া ছারখার হইত না; স্বামীজীর ভাষায়: মুখে তার অট্টহাসি, কিন্তু অন্তর তার কান্নায় ভরা। খাওয়া-পরা প্রভৃতি প্রয়োজনগুলি মানুষের পক্ষে অবশ্যস্বীকার্য সন্দেহ

নাই, বাহুল্যেরও স্থান আছে, কিন্তু কেবল ঐগুলির প্রাচুর্যই সভ্য, সংস্কৃতিবান মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নয়, সে উচ্চতর আনন্দ চায়।

বর্তমান সময়ে আমাদের বাধামুক্ত অঙ্গনে বহির্দেশ হইতে যে সব ভাবরাশি আসিতেছে, তন্মধ্যে জীবনপ্রদ ভাবগুলির সঙ্গে, অতি অল্পসংখ্যক হইলেও, অনেকেই যে এই গরলও পান করিতেছেন, তাহার একমাত্র কারণ আমাদের নিজস্ব ভাবগুলিকে তাঁহাদের চোখের সামনে ধরা হয় নাই, সেগুলির মূল্য সম্বন্ধে অবহিত হইবার সুযোগ তাঁহারা পান নাই। তাহারই ফলে জীবননিয়ন্ত্রণের উপরও তাহার প্রভাব পড়িয়াছে, প্রায় সর্বস্তরে প্রবলবেগে দুর্নীতি বাড়িয়াই চলিয়াছে। সব চেয়ে আশঙ্কার কথা, লজ্জার কথা, সাহিত্য প্রভৃতির মাধ্যমে এই গরল আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে অসঙ্কোচে বিতরিত হইতে সুরু করিয়াছে।

বহু জাতির জীবনস্পর্শী অতীতের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া মনীষীরা মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারেন। সমাজ, ধর্ম ও সভ্যতার অতীত ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া সেগুলির উন্নতি-অবনতির ক্ষণ ও কারণ নির্ণয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন টয়েন্‌বী, সোরোকিন প্রভৃতি পাশ্চাত্যের বহু মনীষী; অতীতের গমন পথ দেখিয়া উহাদের পরিণাম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীও করা হইতেছে। এভাবে একটি দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়া বলা হইয়াছে যে, ভবিষ্যতে একমাত্র পাশ্চাত্য সভ্যতাই জগতে টিকিয়া থাকিবে, বাকী সবগুলিই—ভারতীয় সভ্যতাও—হয় বিনষ্ট হইবে, না হয় পাশ্চাত্যেরই অনুরূপ হইয়া যাইবে।

অতীতের ঘটনা বিশ্লেষণ করিয়া যাঁহারা ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তাঁহারা ছাড়া আরো এক ধরনের ভবিষ্যৎদ্রষ্টা আছেন। তাঁহাদের যুক্তি-অনুমানের সহায়তায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় না; তাঁহারা ভবিষ্যৎ দেখিতে পান।

স্বামীজী স্বয়ং এই স্তরের ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন। মানবজাতির ইতিহাসও তিনি বিশ্লেষণী দৃষ্টি লইয়া তন্নতন্ন করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীগুলি এই উভয়বিধ দৃষ্টিসঞ্জাত; সেই দৃষ্টিতে দেখিয়াই তিনি ভারত সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন, তাহার উন্নতির জন্য নির্ভুল পথের নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন।

তিনি স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন, ভারতের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল, ভারতীয় সভ্যতার বিনাশ তো নাই-ই—অদূর ভবিষ্যতে উহা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ভাস্বর হইয়া উঠিবে। এই ভাস্বরতা আসিবে আমাদের ঘরের মণিরত্নগুলি বাহির করিয়া সেগুলিকে পাশ্চাত্যের শিল্প-বিজ্ঞানাদির ও অন্যান্য শুভকর ভাবরাজির উপর খচিত করিয়া; রত্নগুলির কথা ভুলিয়া গিয়া বা সেগুলিকে নিভৃত কক্ষে বদ্ধ রাখিয়া নহে—উহা বিনাশের পথ। কিন্তু তাহা আর হইবার নহে—ভারতীয় সভ্যতার সুমহান প্রকাশ ঘটিবেই।

আমরা ইচ্ছা করিলেও ইহার অন্যথা করিতে পারিব না, জগতের কোন শক্তি, কোন চিন্তাই তাহা পারিবে না। পারিবে না সত্য, কিন্তু সোজা পথে না চলিলে বহু দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে। বাঁকাপথে বহু ঘুরিয়া অনেক সহিয়া, ঠেকিয়া শিখিয়া, শেষে আমাদের ডঙ্কামারা রাজপথে উঠিতেই হইবে।

প্রাচীন ভারতের মৃত্যুঞ্জয় ভাবগুলি যত শীঘ্র সর্বধারণের মধ্যে পরিবেশনের ব্যবস্থা আমরা করিতে পারিব, দুর্নীতি, দুর্বলতা প্রভৃতি সঞ্জাত দুর্ভোগের অবসান তত নিকটবর্তী হইবে, সর্বাধিক কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত হইবে তত বেশী।

সৃষ্টিতত্ত্ব*

স্বামী সারদানন্দ

প্রাণ ও আকাশ : মহাভারতাদিতে এই সৃষ্টিতত্ত্ব পাঠ করিয়া সাধারণতঃ আমরা অনেক ভুল বুঝিয়া থাকি। সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার প্রথমেই আছে যে, প্রথমতঃ প্রাণ ও আকাশ প্রকাশিত হইল; এখন প্রাণ মানে আমরা নানারূপ বুঝিয়া থাকি। কেহ নিঃশ্বাস অর্থ বুঝিয়া লন, কেহ জীবাত্মা বুঝেন, ইত্যাদি; কিন্তু এরূপ অর্থে ইহা ব্যবহৃত হয় নাই। সেইরূপ আকাশ অর্থে আমরা অবকাশ বুঝি; এই আকাশের তিন রূপ অর্থ আছে। ১ম মহাকাশ—বাহ্য জগতের সকল বস্তু এই মহাকাশে বর্তমান। সম্মুখের এই আলো, টেবিল প্রভৃতি, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, মনুষ্য, বৃক্ষাদি সমস্তই এই অবকাশে রহিয়াছে। ২য়— চিত্তাকাশ; আমরা যে সমস্ত চিন্তা করি, বিচার করি বা যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই, সেই সমস্তই পৃথক পৃথক ভাবে আমাদের মনে বর্তমান রহিয়াছে। এইজন্য মনকে আকাশরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ৩য়— চিদাকাশ অর্থাৎ জ্ঞানময় আকাশ; আমাদের যে জ্ঞান, তাহা সামান্য জ্ঞান, কিন্তু চিদাকাশ পূর্ণজ্ঞানের আকাশ। আমাদের জ্ঞানে অজ্ঞান জড়িত; কিন্তু এই জ্ঞানে অজ্ঞান নাই—পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ; এই আকাশে বাহ্যিক মহাকাশ ও আন্তরিক চিত্তাকাশ উভয়ই রহিয়াছে। কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্ব-বর্ণনায় আকাশ আর এক অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহা পদার্থের সূক্ষ্ম অংশ, ইংরাজীতে যাহাকে matter বলে; ইহা জড়ের সূক্ষ্ম অংশ, এবং প্রাণ অর্থে সমস্ত শক্তির মূল শক্তি। জড় জগতের যত কিছু শক্তি, যেমন গতিশক্তি, শারীরিক শক্তি, অন্নপরিপাক-শক্তি, চিন্তাশক্তি, আধ্যাত্মিক শক্তি—সমস্তই সেই এক প্রাণেরই বিকার; সেইরূপ আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসশক্তিও সেই প্রাণের বিকার এবং নিঃশ্বাসশক্তি বর্তমান থাকাতেই মানুষ জীবিত থাকে বলিয়া ইহাকে প্রাণ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাণ বলিতে এক মূল শক্তিকে বুঝিতে হইবে, আর সকল শক্তিই ইহার বিকার। সেইরূপ আকাশ বলিলে বুঝিতে হইবে, মূল জড় বস্তু—আর সমস্ত জড় বস্তুই যাহার বিকারমাত্র।

শাস্ত্র ও বিজ্ঞান : আমরা শাস্ত্রের এই মত না বুঝিয়াই ইহা ভ্রান্ত মত বলিয়া অগ্রাহ্য করি, কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞান এই সৃষ্টিতত্ত্ব সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়া দেয়। সৃষ্টির প্রারম্ভে এই আকাশের উপর শক্তির অর্থাৎ প্রাণের কার্য হইতে আরম্ভ হয়, ইহার প্রথম ফল বায়ু বা কম্পন। আকাশের পরমণুসকলের কম্পন আরম্ভ হয়। বায়ু—বা ধাতু—কম্পন অর্থ। আকাশ হইতে এই বায়ুর বা কম্পনের উৎপত্তি হয়। কম্পন হইতে তেজঃ জন্মায়, বিজ্ঞানও আজকাল ইহা প্রমাণ করিতেছে। কোন বস্তুর গতিরোধ করিলে তাহা উত্তপ্ত হইয়া উঠে। বাতাস অত্যন্ত জোরে বহিলে উত্তাপ উৎপাদন করে। বিজ্ঞান বলেন, গ্রহ-নক্ষত্রাদি ও সমুদয় পৃথিবী প্রথমে অত্যন্ত উত্তপ্তাবস্থায় ছিল, ক্রমে শীতল হইয়া বাসোপযোগী হইয়াছে। এখনো সূর্যলোক অত্যন্ত উত্তপ্ত, তথায় পৃথিবীর যাবতীয় কঠিন বস্তু বাষ্পরূপে বর্তমান রহিয়াছে। এই তেজঃ শীতল হইয়া অপ্ বা জল হয় ও ক্রমে কঠিন হইয়া পৃথিবী বা কঠিন মৃত্তিকাদিরূপে পরিণত হয়। এই পঞ্চ-মহাভূত প্রথমে সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে, ক্রমে ইহাদের পরস্পরের মিশ্রণে এই স্থূল জগৎ নির্মিত হয়।

*'উদ্বোধন' ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যার 'সারদানন্দ স্বামীর বক্তৃতা' হইতে পুনর্মুদ্রিত।

কলিতজয়বিবেকানন্দস্তোত্রম্

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী*

বিগলিতশতসূর্যজ্যোতিষা লিপ্তকান্তিং
স্ফুরদগণিতবিদ্যুদ্দীপ্তবিস্ফারনেত্রং
শিশুশশধরভালং ভৈরবং ভস্মগাত্রং
কলিতজয়বিবেকানন্দপাদং নমামি ॥ ১

অরুণকিরণজালোদ্ভিন্নপাদারবিন্দং
নখরতরলজ্যোৎস্নাধিক্কৃতেন্দুপ্রকাশং
স্তিমিতমদনগর্বং শর্বমানন্দরূপং
কলিতজয়বিবেকানন্দপাদং নমামি ॥ ২

নয়নকমলবাসং লোললাস্যং রমায়া-
গু্ণবিভজিতবাণী কণ্ঠে যস্যাতিলগ্না।
নিখিলবিভবসিদ্ধির্যস্য সেবানুরক্তা
তমহমজবিবেকানন্দপাদং নমামি ॥ ৩

প্রহরণধৃতবেদং জ্ঞানবিজ্ঞাননেত্রং
মৃগপতিবলদৃপ্তং মূর্তবেদান্তসূর্যং
অভীরভীরিতি ঘোষৈর্নাদিতক্ষৌণীপৃষ্ঠং
কলিতজয়বিবেকানন্দপাদং নমামি ॥ ৪

কলিমলমপনেতুং স্বাগতং হ্যক্ষচক্রাৎ
জড়মতিজনসজ্ঘান্ দীপয়ন্তং রজোভিঃ
জনহিত-মতি-কেন্দ্রস্থাপকং দিগ্‌দেশান্তং
কলিতজয়বিবেকানন্দপাদং নমামি ॥ ৫

কলিযুগমলহারী শোভনঃ জ্ঞপ্তিখড়্গৈঃ
সকলতমমপাস্য শ্রৌতধর্মং রটন্তং
নিহিতনিখিলকামং মাত্রকৌপীনবিত্তং
কলিতজয়বিবেকানন্দপাদং নমামি ॥ ৬

জননমরণমুগ্ধধ্বান্তবিধ্বংসকার্যং
অমিতবলবিলাসং ব্যোমকেশং বিশালং
ভজনরসসমুদ্রং ভাববাত্যাতিলোলং
কলিতজয়বিবেকানন্দপাদং নমামি ॥ ৭

চরণকমলগন্ধভ্রামিতং ভৃঙ্গমিন্দুং
গময়তু গুরুদৃষ্টিস্তূর্ণমীশানলোকং
শময়তু রমণাচ্ছশ্রদ্ধেয়াশেষদোষান্
জয়তু ভুবি বিবেকানন্দনামাতিধন্যম্ ॥ ৮

* স্বামীজীর শিষ্য

বর্তমান যুগে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবের প্রয়োজনীয়তা

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী

পাশ্চাত্য দেশে এই জ্ঞানবিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠার দিনে অনেক বিখ্যাত মনীষী নৈতিক এবং ধর্মগত অবনতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া প্রচার করিয়াছেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত কর্মযোগী আলবার্ট সুইৎজারের Decay and the Restoration of Civilisation বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একদিকে জ্ঞানের উচ্চতম গগনস্পর্শী পিরামিড, আর পাশেই অতলস্পর্শ গিরিগহ্বর স্বতই চিন্তাশীল সুধীজনের মনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্য ও ভীতি উৎপাদন করে। যে কোন সময় একটা land-slideএ পাহাড় ধ্বসিয়া পরা অসম্ভব নহে। এই যদি নৈসর্গিক জ্ঞানালোকে ভাস্বর পাশ্চাত্যের অবস্থা হয় তবে আমাদের স্বাধীন ভারতের অবস্থা কি অন্য রূপ? এই প্রশ্ন অতি স্বাভাবিক। আদিমকালে, এমন কি নিকট অতীতেও ইংরেজের প্রভাব সত্ত্বেও ভারতবর্ষ হিমালয়- ও সমুদ্র-বেষ্টিত হইয়া নিজের বিশেষ কৃষ্টি ও সংস্কার লইয়া পরিখাবেষ্টিত দুর্গের ন্যায় আত্মরক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু আজ যে সব দ্বার খুলিয়া গিয়া ঘর বাহিরের সহিত একাকার হইয়া গিয়াছে। আজও কি আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? যত কিছু ভাববন্যা আজ ইউরোপ-আমেরিকাকে প্লাবিত করিতেছে তাহার ঢেউ এ মহাভারতের তীর অতিক্রম করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে শুধু সহরাভিমুখে নয়, গ্রামাঞ্চলেও। যে কোন রন্ধ্র দিয়া তাহা প্রবলবেগে প্রবেশ করিতেছে আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে। এক শ্রেণীর প্রাজ্ঞ ভবিষ্যদ্দর্শী লোক 'ত্রাহি মধুসূদন' রব তুলিয়াছেন ইতিমধ্যেই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, মধুসূদন কাহাকেও হাতে ধরিয়া ত্রাণ করেন না। করিলে পুরুষসিংহ বিবেকানন্দের উদাত্ত বাণীর কোনই প্রয়োজন হইত না, সপ্ত-ঋষির একজনকে নামিয়া আসিতে হইত না এই ধরাধামে। 'যমেবৈষ বৃণুতে' ঠিক; কিন্তু চুম্বকের ন্যায় তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে হয় শ্রদ্ধাভক্তি এবং কর্মের দ্বারা।

বর্তমান যুগের মানবজাতির প্রয়োজন মহামানবের। মহামানব ভারতের মাপকাঠিতে কি? এ মাপকাঠি কি নূতন করিয়া তৈয়ার করিতে হইবে? নিশ্চয়ই নয়। আমরা অসভ্য বর্বর জাতি নহি। দশহাজার কি অন্ততঃ ৫।৬ হাজার বছর পূর্বে এই মাপকাঠি এ দেশেই তৈয়ার হইয়াছিল আমাদের রমণীয় তপোবনে; যে প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ঋগ্‌বেদ হইতে সুরু করিয়া উপনিষদের প্রতি চিন্তা প্রতি কল্পনা পর্যন্ত অনুরঞ্জিত, তাহা হইল—মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য কি? প্রেয় না শ্রেয়? প্রেয় ইহলোক-সীমিত, আর শ্রেয় ইহলোক পরলোক উভয় লোক ব্যাপী। ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ। আমাদের ষড়্‌দর্শন তো ইহা লইয়াই। হাজার হাজার বছর পূর্বেই আমরা জীবনের লক্ষ্য নির্ভুলভাবে আবিষ্কার করিয়াছি। তবে আর নূতন করিয়া লক্ষ্য আবিষ্কার করিব কি? মাপকাঠি তৈয়ার করিব কি? পাশ্চাত্য এখনো খুঁজিতেছে; সেখানে যত যত ism নামে মানুষের সুখসাধনের মাপকাঠি তৈয়ার হইতেছে, সব চূর্ণীকৃত হইয়া ধূলায় আসন গ্রহণ

করিতেছে ক্রমে ক্রমে। এ ভয়ঙ্কর যুগের বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যদি নৈতিক ও উচ্চতম ধর্মমূলক উন্নতি সমান্তরাল রেখায় প্রসারিত না হয় তবে মানবজাতির ৫০ লক্ষ বৎসরের ইতিহাসের এই শেষ পৃষ্ঠা খোলা হইয়াছে বলা যায়। স্বামীজীর আমেরিকা ও ইউরোপ ভ্রমণ কেন? তাঁহার স্বল্পপরিসর জীবনে এই আত্মঘাতী প্রবল উদ্যম কেন? ভাবিলে অবাক হইতে হয়। যশোলিপ্সা তাঁহার ছিল না। সমাধিস্থ হইয়া তিনি হিমাচল বা ভারতের যে কোন নির্জন স্থানে শুকদেবের মত আত্মানন্দে মগ্ন হইয়া থাকিতে পারিতেন। গুরুবলও তো তাঁহার ছিল অসীম। আমেরিকা কেন? আমি নিজে কন্যাকুমারিকায় বিবেকানন্দ-শিলা সান্নিধ্যে দাঁড়াইয়া নিজকে এই প্রশ্নই করিয়াছিলাম। উত্তর পাইলাম, মনশ্চক্ষে দেখিলাম, স্বামী বিবেকানন্দ শিলাটির উপর বসিয়া আছেন ভারতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া, ভারতের তৎকালীন তমসার আবরণ উন্মোচনের জন্য "অপাবৃণু" মন্ত্রের ধ্যানে যেন মগ্ন তিনি। শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল, চিন্তা-মাত্রেই কি একটা অনুপ্রেরণা লাভ করিলাম—স্বামীজীর সেই মূর্তিটি হৃদয়পটে ভাসিয়া উঠিল, যেমন দেখিয়াছিলাম ঢাকায় তাঁহার অভ্যর্থনা-সভায় ও লাঙ্গলবন্ধে ব্রহ্মপুত্রস্নানের জন্য সমবেত অসংখ্য জনমণ্ডলীর মধ্যে। লক্ষ স্নানার্থী লোকের সমাবেশ মধ্যে মনে হইয়াছিল মধ্যাহ্ন-সূর্য যেন মূর্তি ধরিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন তীর্থের মহিমা বাড়াইবার জন্য। সেদিনের সেই অপূর্ব অভিজ্ঞতাই আমার মত অযোগ্য ব্যক্তিকে তাঁহার মাহাত্ম্যবর্ণনে নিযুক্ত করিয়াছে। স্বামীজী তাঁহার সুতীক্ষ্ণ ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি নিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্যের সঙ্গে আদানপ্রদান ভিন্ন বর্তমান ভারতের কোন উন্নতিই সম্ভব নয়। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে' ইহা সুপরিস্ফুট। আজ প্রায় ৭০ বৎসর পরেও আমরা কয়জন সেকথার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতেছি? যাহা সত্য তাহা কখনও লোপ পায় না, সাময়িকভাবে ঢাকা থাকিতে পারে। এত বড় ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা এ ভারতেও পূর্বে কয়জন জন্মিয়াছিলেন জানি না। স্বামীজী বলিয়াছেন, India was great in the past, India will be greater in the future. ভারত অতীতে মহান ছিল, ভবিষ্যতে মহত্তর হইবে। আরও মহৎ বৃহৎ হইবে কাহাকে অবলম্বন করিয়া?—শ্রীরামকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া, যিনি একাধারে 'রাম' এবং 'কৃষ্ণ', আর বিবেকানন্দকে অবলম্বন করিয়া—যাঁহার ত্যাগের মহিমা অভ্রংলিহ। একজন বড় পাশ্চাত্য দার্শনিক লিখিতেছেন, what is true is valid whether I as an individual know it or not, even beauty is blessed in itself whether I notice it or not.

সর্বজ্ঞ শ্রীরামকৃষ্ণের আলোকে স্বামীজীকে বোঝা এক কথা, আর স্বামীজীকে তাঁহার স্বমহিমায় বোঝা আর এক কথা। পাশ্চাত্য মনীষী রোমাঁ রোঁলা উভয় ভাবেই স্বামীজীকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

একটা কথা আমাদের স্মরণ করিতে বাধা নাই যে, শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর জন্ম পরিগ্রহের পশ্চাতে রহিয়াছে ভারতের একটা প্রকাণ্ড ঐতিহ্য। এখানে ঐতিহ্য অর্থে আমি একটা পটভূমিকা বুঝি। স্বামী গম্ভীরানন্দ ১৩৭১ সালের চৈত্র সংখ্যা উদ্বোধনে শ্রীশ্রীঠাকুর এবং স্বামীজীর আবির্ভাবের সুন্দর একটি পটভূমিকা লিখিয়াছেন। আমি একজন ইতিহাসের

ছাত্র হিসাবে তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ একমত। আর একটি কথা শুধু বলিতে চাই। একবার একটা আবহাওয়া কোন স্থানে সৃষ্ট হইয়া গেলে যে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহার ফলেই আরও সৃষ্টিক্রিয়া চলিতে থাকে যদি না আবার মানসিক ও শারীরিক প্রতিকূল অবস্থার উদ্ভব হয়। ভারতেও মাঝে মাঝে এই প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে ও তাহাতে সাময়িক প্রতিবন্ধক ঘটিয়াছে সত্য কিন্তু অধ্যাত্ম-চিন্তার ও জ্ঞানগঙ্গার মূল ধারা এই আর্যভূমিতে বহিয়াই চলিয়াছে। তাই যুগে যুগে এদেশে ভগবানের অবতরণ সম্ভব হইয়াছে।

অতীতে ধ্যানমগ্ন ভারতের ধ্যান ভঙ্গ করিল কে? ইতিহাস বলিবে গ্রীক জাতিরা আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পূর্বেই ভারতের জ্ঞানভাণ্ডারের সন্ধান পাইয়াছিল। তাহার ফলে কি জ্যোতিষে কি গণিতে ও অন্যান্য শাস্ত্রে ভারতের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ইউরোপকেও জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিল। ইহাই বর্তমান গবেষকগণের মত। (Vide Basham—The Wonder that was India).

অষ্টাদশ শতক জার্মান দেশের এক অতি উজ্জ্বল দার্শনিক যুগ। Hegel, Herder, Voltaire প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিকগণ বলেন, India is the craddle of human kind. ভারতই মানবজাতির শিশুদোলা। আরও বলেন মানবীয় কৃষ্টির সূত্রপাত ঐ গঙ্গার ধারে: Inception of human culture near The Ganges ...... where the first flicker of human wisdom was nourished অর্থাৎ সংক্ষেপে গঙ্গাতীরেই মানবের প্রথম জ্ঞানের বিকাশ। ভারতের এই প্রতিমূর্তি লইয়া জার্মানি ও ফ্রান্সে বহু বিখ্যাত উপন্যাসাদি রচিত হইয়াছে। গ্রীসের mythology বা পুরাণতত্ত্ব হইতে ভারতীয় mythology বা পুরাণতত্ত্ব মর্যাদা পাইয়াছে সেখানে বেশী। তারপর যখন আধুনিক যুগে ম্যাক্সমূলার, ডুয়েশন প্রভৃতি দার্শনিকের মত আলোচনা করি তখন আরও বিস্মিত হইয়া পড়ি। ম্যাক্সমূলার তাঁহার মূল্যবান জীবনের ৪০ বৎসর মগ্ন ছিলেন আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রসমূদ্রে, যাহার ফলে ঋগ্বেদাদি ভারতীয় অমূল্য গ্রন্থরাজি নবোদিত সূর্যের ন্যায় পৃথিবী আলোকিত করিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ আসিয়াছিলেন আমাদের বেদান্ত-বিজ্ঞানকে আধুনিক মনের বোধগম্য ব্যাখ্যায় জগৎময় ছড়াইয়া দিতে।

ম্যাক্সমূলার সংখ্যবেদান্ত ইত্যাদি দর্শন আলোচনান্তে একটা আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, "I admit, as a popular philosophy the Vedanta would have its dangers, that it would fail to call out and strengthen the manly qualities required for the practical side of life and that it might raise the human mind to a height from which the most essential virtues of social and political life might dwindle away into mere phantoms."

এ আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক নহে। কিন্তু তাহা হইলে যে স্বামীজীর ভারতভূমে আবির্ভাব ব্যর্থ হইয়া যায়। স্বামীজী ভারতে বস্তুবাদ (Materialism) এবং অধ্যাত্মবাদ উভয়ের সমন্বয়ে নূতন করিয়া গড়িতে চাহিয়াছেন ভারতের আদর্শকে। কোনও মানুষ বা জাতির জীবনে ইহা হইতে উচ্চতর আদর্শ থাকিতে পারে কি? রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, স্বর্গকে নিজ স্বার্থকতার জন্যই ধরাতে নামিয়া আসিতে হইবে। শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রীতেও সেই কথা। তাই স্বামীজী কোমর বাঁধিয়া লাগিলেন—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর

পাতন। বেদান্তের ভূমি ভারতবর্ষকে কর্মের তূর্যনিনাদে পূর্ণ করিয়া, প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। সে কি নির্ঘোষ! সে পাঞ্চজন্য-রবে সমস্ত ভারতভূমিতে যেন কুরুক্ষেত্রের পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছিল। সে 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' মন্ত্র কাহার না প্রাণ স্পর্শ করিয়াছিল সেকালে! তাহার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হউক যুগে যুগে ভারতের প্রতি গুহাগহ্বরে, প্রতি কক্ষে, প্রতি প্রাসাদে। জাগ্রত রাখুক ভারতকে, জাগাইয়া তুলুক সমগ্র বিশ্বকে। সে বাণী ধ্বনিত হইয়াই চলিতেছে—আমরা কর্ণকুহর আবৃত করিয়া রাখিয়াছি তাই শুনিতেছি না। এই আবরণ-টুকু যদি সরাইতে না পারি, তবে নিজেকে ভারতবাসী বলিয়া পরিচয় দিব কোন মুখে? স্বামী বিবেকানন্দের চরিত্রের বহু দিক আছে। সে চরিত্রের এক একটি দিক লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। মানুষের উন্নতির যেমন কোন সীমারেখা টানা যায় না, তেমনি সে দেবমানব-চরিত্র আলোচনারও কোন শেষ থাকিতে পারে না। কারণ আমাদের সম্মুখে প্রতিনিয়ত কত নূতন নূতন জটিল সমস্যার উদ্ভব হইতেছে যাহার সুষ্ঠু সমাধান জাতির কল্যাণের জন্য প্রয়োজন। কিন্তু কে তাহা করিবে? যাঁহারা আত্মাভিমানে মগ্ন হইয়া স্বার্থসাধনে, নিজ যশোগানে তন্ময়, তাঁহারা? সর্বত্যাগী বীর সন্ন্যাসী, যাঁহার চিত্ত পূর্ণ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত, সেই বুদ্ধপ্রতিম লোক ভিন্ন আর কাহারো পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখা আর সমগ্র ভাবে দেখার মধ্যে তফাৎ অনেক। সকলেই বিবেকানন্দকে সমগ্রভাবে দেখুক। তিনি কোথাও আত্মগোপন করিয়া নাই; সমগ্র রচনাবলী, সমগ্র পত্রাবলীর মধ্যে নিজেকে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে কোথাও দীনতা নাই, কোথাও সসঙ্কোচ বা সভয় ভাব বা যশের লিপ্সা অণুমাত্র নাই। আছে প্রেম, আর নিঃসংশয়, বলিষ্ঠ, অভ্রান্ত পথনির্দেশ; আছে প্রাণবন্ত প্রেরণা। একদিকে বর্তমান যুগের "স্বদেশমন্ত্র"—দরিদ্র, অজ্ঞ, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতিকে প্লাবিত করিয়া প্রেমের প্লাবন, অপর দিকে মৃত্যুরূপা প্রলয়রূপিণী কালীর আহ্বানে অভয়মন্ত্রের প্রচার—আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন সাহিত্যে কেহ দেখিয়াছে কি? তৎকালের ভারত-মহাশ্মশানে এই মন্ত্রেরই প্রয়োজন ছিল না কি? স্বাধীনতা লাভ করিলেও আজও আমরা এই এটম-বোমার যুগে চারিদিকে শত্রু-পরিবেষ্টিত হইয়া মৃত্যুরূপা কালীকে ভুলিতে পারিতেছি কি? আমাদের যে আজ সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন প্রেমের দীক্ষার ও অভয় বাণী শ্রবণের।

আজ আমরা Socialistic pattern of Society স্থাপনের চেষ্টা করিতেছি সত্য, কিন্তু দেশে নিরন্ন, ক্ষুধার্ত, অভাবগ্রস্ত লোক এখনো সংখ্যাতীত। স্বার্থপরতা, দুর্নীতিপরায়ণতা বাড়িয়াই চলিয়াছে। জাগতিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই দুর্দশাগ্রস্ত দরিদ্রনারায়ণের একমাত্র ভরসা স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও তাঁহার কর্মপ্রেরণা নয় কি? স্বামীজীর ইতিহাসজ্ঞান অতি আশ্চর্য। তিনি রোম গ্রীস হইতে সমস্ত মধ্যপ্রাচীর, সমগ্র জগতের ইতিহাসে সভ্যতার ভাঙন-গড়ন বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রতি অঞ্চলের ইতিহাস তাহার নখদর্পণে। সভ্যতার অগ্রগতির ধারা তাই তাঁহার লেখনীমুখে অপূর্ব ভাষায় প্রকাশিত। জাতির সংহতি-রক্ষায় এবং ভবিষ্যৎগঠনে তাই তাঁহার সত্যদৃষ্টি। পরবর্তী কালে Toynbee প্রমুখ ঐতিহাসিক ঐ দৃষ্টিতেই ইতিহাস রচনা

করিতেছেন। স্বামীজী আমাদের অতীত ইতিহাসের ভুলভ্রান্তি ও সাফল্য পর্যালোচনায় দক্ষহস্ত। কাজেই এদিক হইতেও তাঁহার ইঙ্গিত আমাদের শিরোধার্য হওয়া উচিত। আজ দেশে নেতার অভাব নাই। সকলেই নেতা। ফলে অভ্রান্ত, নির্দিষ্ট পথের অভাব। আমাদের কিছু সঞ্চয় চাই। দেশের জন্য, বাঁচিবার জন্য স্বামীজী অপরের দ্বারে কেবল হাত পাতিতে বলেন নাই, তাঁহার নীতি ছিল 'দিব আর নিব'। স্বামীজী কি জ্ঞানযোগী না কর্মযোগী? এ প্রশ্নের উত্তর, তিনি জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে প্রেমের সূত্র ঢুকাইয়া হইয়াছেন বর্তমান যুগের মহাযোগী। বিবেকানন্দের সমস্ত প্রেরণার মূলে ছিল ধর্ম, যে ধর্ম আজ জগতের প্রায় সর্বত্র জীবন হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে। এ ধর্ম শাশ্বত সনাতন ধর্ম—যাহা অর্থ কাম এবং মোক্ষের ভিত্তিস্বরূপ। আমাদের এই ধর্মকে জীবন্ত করিয়া অপরকে দিতে হইবে। সেই প্রেমে অনুস্যূত বেদান্ত-ধর্মের প্রচার দ্বারা তিনি জগৎটাকে একবারে ওলট-পালট করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। সেই সুপ্রাচীন যুগের বৌদ্ধসঙ্ঘ একদিন জাপান হইতে চীন, তাতার, সিংহল প্রভৃতি ছাইয়া 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়াছিল। স্বামীজী তাই উদার সন্ন্যাসিসঙ্ঘ গড়িয়া গেলেন ভারতের ও জগতের জাগতিক, আধ্যাত্মিক, সর্ববিধ মুক্তির জন্য—কোন নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি না করিয়া। তিনি জগৎকে আর ভাগা-ভাগি করেন নাই, সারা বিশ্বের জন্যই কথা বলিয়াছেন। আজ এই সঙ্ঘের দেশবিদেশ-ব্যাপী কর্মশক্তি পর্যালোচনা করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। কোথা হইতে এই আর কোথা হইতে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসি-বৃন্দের এই কর্মপ্রেরণা? জ্ঞানযোগী ম্যাক্স-মূলার আজ বাঁচিয়া থাকিলে দেখিয়া আনন্দিত হইতেন যে, বেদান্ত শুধু নিষ্ক্রিয় নীরস জ্ঞানচর্চা নয়, যোগীর হাতে তাহা অগ্নিগর্ভ প্রেমসাধনা। "মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্", শঙ্কর বলিলেন, কিছু গ্রহণ না করিয়া, "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ", ত্যাগীর জীবনযাপন কর। আমাদের এই যুগের শঙ্কর, একাধারে বুদ্ধ ও শঙ্কর স্বামীজী বলিলেন, ত্যাগী হইয়াও নিষ্কাম কর্ম কর, ধনীদের নিকট হইতে ধন সংগ্রহ করিয়া দেশের দরিদ্রদের দাও, তাহাদের সর্ববিধ উন্নতি সাধন কর; তাহাদের নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা কর। তিনি নিজে তাহাই করিয়া গিয়াছেন। গৃহস্থের পক্ষে পরিবারের, সমাজের, দেশের সেবার জন্য ধন উপার্জন করা কর্তব্য—স্বামীজী বলিয়াছেন—অর্জন না করিলে ত্যাগ করিবে কি? স্বামীজী যেন যিশুর ভাষায় হিন্দু সমাজকে বলিলেন, I come not to destroy but to fulfil—আমি সমাজ ধ্বংসের জন্য নয়, গড়ার জন্য আসিয়াছি। আমরা স্বামীজীর পথ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি, না পিছাইয়া পড়িতেছি—ভাবিবার বিষয়। হিন্দু বলিয়া সগর্বে দাঁড়াইতে আজও আমাদের সাহস নাই। বিশ্বপ্রেমিক হিন্দু, উদার নির্ভীক হিন্দু, কাহারো ভয়ে নিজস্বতাকে কিছুতেই ম্লান করিবে না—এই প্রতিজ্ঞা প্রত্যেক হিন্দুকে গ্রহণ করিতে হইবে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয়, যদি সর্বাঙ্গীণ মুক্তিসাধন করিতে হয়।

জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সমগ্র জগতের এ যুগের পথপ্রদর্শক স্বামীজী বলিয়াছেন, হিন্দু খৃষ্টান মুসলমান য়াহুদী সবই তাঁহার আপন জন। আর বলিয়াছেন: জীবনে মাত্র একটি জিনিস আছে, যাহা যে কোন মূল্য দিয়া লাভ করার যোগ্য। তাহার নাম প্রেম, ভালবাসা—

আকাশের মত যাহার বিস্তার, সমুদ্রের মত যাহার গভীরতা।" চরম বেদান্তজ্ঞানের সহিত এই মানবপ্রেম যুক্ত হইলে জগতের আর কিছু পাইবার বাকী থাকে কি? এ আদর্শ জগতে আর কেহ প্রচার ও স্থাপন করিয়াছেন কি আজ পর্যন্ত?

আজকাল একটা ধুয়া বা বুলি উঠিয়াছে—মানবতা। কিন্তু মানবতা বা human fellow-feeling তো কিছুমাত্র অগ্রসর হইতেছে না। দ্বন্দ্ব-কোলাহল বাড়িয়াই চলিয়াছে জগতে। কারণ এ মানবতা abstract একটা ভাব মাত্র—ইহা ভিত্তিহীন। সেই জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের উপর মানবতাকে স্থাপিত না করিলে সব ব্যর্থ হইবে। তাই স্বামীজী বিশ্বগগনে আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের পতাকা উড্ডীন করিয়া কত বৈদেশিককে শিষ্য ও ভক্ত করিয়া গেলেন। আমাদের দাসত্বের যুগে ইহা কেহ কল্পনা করিতে পারিত কি? এক ব্রহ্মের সন্তান যদি সবাই হয়, যদি মূলে থাকে নিঃস্বার্থতা, তবে মানবতাও আপনিই আসিবে। ছায়া তো কায়ারই অনুসরণ করে।

স্বামীজী অনেক ভাবিয়া গিয়াছেন আমাদের জন্য। আবার অনেক ভাববার কথা রাখিয়াও গিয়াছেন আমাদের জন্য। সেগুলির সমাধান আমাদিগকে করিতে হইবে তাঁহারই প্রদর্শিত পথ অনুসরণে। জাতীয় বা ব্যক্তিগত জীবনের এমন কোন বিভাগ নাই যাহার উপর তাঁহার দৃষ্টিপাত হয় নাই। রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁহার সাক্ষাৎ মন্তব্য কিছু নাই কিন্তু তিনি মূল ধরিয়া কথা বলিয়াছেন সর্ববিধ মুক্তির পথ নির্দেশ করিয়া।

বর্তমানে জগতের বড় সমস্যাই হইল নীতিজ্ঞানসম্পন্ন করিয়া, মানুষকে সৌহার্দ্যসূত্রে আবদ্ধ করিয়া কি করিয়া বাঁচাইয়া রাখা যায় বিজ্ঞানের রাজ্য বিস্তারলাভ করিয়াই চলিয়াছে ও চলিবে এক সীমাহীন উন্নতির পথে। কিন্তু এই বিজ্ঞানকে আত্মঘাতী না হইতে হইলে বেদান্ত-বিজ্ঞানের সঙ্গে চাই তাহার মিলন। একার্যে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি প্রণিধানযোগ্য: "বেদান্তই আমাদের প্রাণ, বেদান্তই আমাদের জীবন। ইহারই উপদেশাবলীর সহিত বহিঃপ্রকৃতির বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে যে ফল লাভ হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। বর্তমান জড়বাদ নিজ সিদ্ধান্তসমূহ পরিত্যাগ না করিয়া কেবল বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করিলেই আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে।"

তিনি অনেক কিছুরই পূর্বাভাষ দিয়াছেন, যাহা ঘটিতেছে ও ঘটিবে, এবং সকল পরিবর্তনকেই জ্ঞান ও সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করিবার দৃষ্টান্তও দেখাইয়া গিয়াছেন। সর্বজ্ঞ শ্রীশ্রীঠাকুর সকল ভবিষ্যৎ যেন দিব্যচক্ষে দর্শন করিয়া যোগ্য আধার বুঝিয়া তাঁহার সর্বশক্তি নিঃশেষ করিয়া দিয়াছিলেন স্বামীজীর উপর। কাজেই আমাদের পথ সুগম—শুধু নয়ন উন্মীলিত রাখিয়া চলিতে হইবে। অন্তে নিজের মুক্তি হইবে কি না, তাহাও ভাবিবার প্রয়োজন নাই—স্বামীজীর কথামত কেবল কাজ করিয়া যাওয়া বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়।

শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সকল উন্নতির মূলে। স্বামীজী মানুষের প্রতি, নিজের প্রতি শ্রদ্ধার চূড়ান্তই দেখাইয়া গিয়াছেন, এবং আমাদিগকে সশ্রদ্ধ হইতে, সকলের সহিত সশ্রদ্ধ ব্যবহার করিতে শিখাইয়া গিয়াছেন। কী উচ্চ স্তর হইতে, কী এক আত মানবের আসনে বসিয়া কথা বলিতেন স্বামীজী!

স্বামীজী যে একটা ঈশ্বর-উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। সেজন্যই তাঁহার আরদ্ধ

সমাজ- ও দেশগঠন-উপযোগী কাজগুলি তাড়াতাড়ি গুছাইয়া ফেলিবার জন্য শেষের দিকে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। মহাপ্রয়াণের তিন বৎসর পূর্বেই তিনি ৺নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সহিত আলাপে নিজ জীবনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে পরিষ্কার ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন তাঁহার কাজের তুলনায় এবং আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় সংক্ষিপ্ত হইলেও তাহার প্রভাব অনন্তকাল স্থায়ী হইবে এদেশে এবং বিদেশে; তাঁহার চিন্তা এবং প্রেরণার স্পন্দন অনন্তকাল ধরিয়া স্পন্দিত হইয়া চলিবে।

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

—বর্তমান যুগে ইহা অপেক্ষা সারগর্ভ বাণী আর কেহ উচ্চারণ করিয়াছে কি? তুমি রাজনীতিবিদ্ হও, ধার্মিক হও, লোকসেবক হও, মাথা পাতিয়া লও এই অমর বাণী। একমাত্র ইহা দ্বারাই জগতে ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইবে। ইহাই যুগবাণী।

প্রার্থনা

স্বামী জীবানন্দ

ধ্যানমগ্ন ঋষি অখণ্ডের ঘর থেকে
এলে নেমে মর্ত্যধামে বিশ্বহিত লাগি
রামকৃষ্ণ-মহাভাব-প্রচারক হয়ে,
তব পায়ে নতশির কৃপাকণা মাগি।
বাণী তব স্তব্ধ নয় আজও ধ্বনিত
আকাশে বাতাসে তার রয়েছে মূর্ছনা
সারা বিশ্বে কণ্ঠে কণ্ঠে হতেছে রণিত
কান পেতে শোনা যায় অপূর্ব ব্যঞ্জনা!

প্রাণের ভারত তব এখনো মলিন
ক্ষুধার্ত আতুর কণ্ঠ হয়নি নীরব
হাহাকার আর্তনাদ দিকে দিকে ওঠে
দুর্বলতা এখনো যে হয়নি বিলীন!
দাও শক্তি, ভক্তি দাও সেবিতে হে বীর
আজ যেন আদর্শের সার্থকতা ঘটে।

কায়া ও ছায়া

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

জননী সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো পূজার প্রসঙ্গে ভক্তদের বলিতেন, কায়া ও ছায়া এক, অর্থাৎ জীবন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ ও ছবি-শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে কোন ভেদ নাই যদি ভক্ত যথাযথ শ্রদ্ধা-ভক্তি হৃদয়ে জাগ্রত করিয়া দেখিতে পারেন। হিন্দুধর্মের সমালোচকগণ ইহা বুঝিতে পারেন না, কোন কালেই পারিবেন কিনা সন্দেহ। তাঁহাদের এক অপরিবর্তনীয় বুলি—প্রতিমা-পৌত্তলিকতা। হিন্দুধর্মের সনাতন ঐতিহ্যে উপাস্যদেবতা মৃন্ময়ী নন, চিন্ময়ী। দেবতা বাস্তবিক বাহিরে নন, চৈতন্য যেখানে সর্বদা জ্বল জ্বল করিতেছে সেই মানুষের হৃদয়ে। অতএব হিন্দু উপাসকের নিকট প্রতিমার প্রকৃত উপাদান কাঠ খড় মাটি পাথর নয়, চৈতন্য! মন্ত্র পড়ি যাঁহার উদ্দেশ্যে, স্তব গাই যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি হৃদয়াসীন চৈতন্যময় সত্তা, নির্জীব, জড়বস্তু নন।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কায়া ও ছায়ার পারস্পরিক সম্বন্ধ ও মূল্য বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়। কখনও কায়া অপেক্ষা ছায়াই বেশী প্রয়োজনীয়—যেমন নিদাঘ রৌদ্রে তপ্ত পথচারীর নিকট গাছের ছায়া। গাছটি সুন্দর কি অসুন্দর, মূল্যবান কি সাধারণ তখন আমরা সে বিচার করি না, আমরা তাকাই তাহার ছায়ার দিকে যাহা আমাদের শরীরকে শীতল করিবে। সরোবরের জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব আকাশের চন্দ্রের ন্যায় নয়নাকর্ষী না হইলেও উহা দেখিয়া আমরা আনন্দ পাই। তাজমহল দেখিয়া যাঁহারা মুগ্ধ হন তাঁহারা যমুনার জলে উহার ছায়ার স্মৃতিটিও সযত্নে হৃদয়ে সঞ্চিত রাখেন এবং তাজমহলের গল্প করিবার সময় ছায়া-তাজমহলেরও বর্ণনা করিতে ভুলেন না। মানুষ মরিয়া যায় কিন্তু সে পরবর্তীদের নিকট বাঁচিয়া থাকে তাহার ছায়া—আলোকচিত্রের মধ্যে। কোনও পতিব্রতা নারীকে যখন কেহ বলে, তিনি যেন তাঁহার স্বামীর ছায়া—তখন এই ছায়াত্ব ঐ নারীর গৌরবই ঘোষণা করে। সঙ্গীতেও আমরা ছায়ার সমাদর করি। মূল রাগিণীর ন্যায় উহার ছায়া-রাগিণীসমূহও শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়রঞ্জন করে। নট—ছায়ানট, খাম্বাজ—কৌমুদী খাম্বাজ, ভৈরবী—আনন্দ ভৈরবী ইত্যাদি। ছায়া কায়া নয় কিন্তু কায়ার অনেক আলোক, শক্তি, আনন্দ উহাতে বহু সময়ে সংক্রামিত হয়।

কখনও কখনও ছায়াকে বর্জন করিতে হয়। গভীর রাত্রিতে ঘরের মধ্যে মন্দান্ধকারে যদি অকস্মাৎ একটি সচল ছায়া চোখে পড়ে আমরা ভয়ে আঁতকাইয়া উঠি। যাহার ভালবাসার আন্তরিকতা সম্বন্ধে আমাদের আদৌ আস্থা নাই সে যদি মিষ্ট কথা কহিয়া মিতালি করিতে আসে তাহা হইলে আমরা সতর্ক হই, কেননা ছায়া-বন্ধু বড় ভয়ঙ্কর। ছায়া-অবতার—কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশী সাধন করেন। যীশুখ্রীষ্ট সেইজন্য সাবধান করিয়াছিলেন, Beware of false prophets, ভুয়ো অবতার হইতে হুঁশিয়ার।

কখনও কখনও ছায়াকে গ্রহণ করিতে হয় উহার যথার্থ মূল্য জানিয়া—যেমন গিলটি করা গহনা। যদি জানি উহা আসল সোনার নয়—ছায়া-সোনার—তাহা হইলে উহা কিনিতে

পারি, ব্যবহার করিতে পারি, কিন্তু ঠকিবার আশঙ্কা নাই। সোনার মূল্য দিয়া উহা কিনি না। আমরা যখন অভিনয় দেখি তখন নাট্যের বিভিন্ন অঙ্কে অভিনেতাদের সঙ্গে হাসি কাঁদি, লম্ফ-ঝম্ফ করি, আনন্দ পাই, কিন্তু প্রাণে প্রাণে জানি এই সকল ঘটনা সত্য নয়, ছায়া।

আধ্যাত্মিক জীবনেও কায়া ও ছায়ার প্রসঙ্গ ও চিন্তা অনবরত আমাদিগকে করিতে হয়। ত্রিবিধ তাপে তপ্ত হইয়া আমরা যখন শ্রীভগবানকে প্রাণের আর্তি নিবেদন করি তখন তাঁহার করুণা একটি শীতল ছায়ারূপে আমাদের নিকট নামিয়া আসে। তাঁহার চিন্তা, তাঁহার নাম-গান, তাঁহাতে নির্ভরতা দ্বারা আমাদের মনঃপ্রাণ শীতল হয়। ভগবানের কায়া কি প্রকার তাহা আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য—পণ্ডিতরা উহা লইয়া জল্পনা-কল্পনা করুন—আমাদের পক্ষে তাঁহার ছায়াই পর্যাপ্ত। বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা দ্বারা হৃদয়ে তাঁহার অতীন্দ্রিয় প্রেমের যে অনুভূতি আমরা পাই উহাই তাঁহার ছায়া। উহাই আমাদের সন্তাপ হরণ করে, আমাদিগকে শক্তি দেয়, শান্তি দেয়।

কঠোপনিষদ্ বলিতেছেন, আমাদের দেহের মধ্যে দুইটি সত্তা বাস করিতেছেন—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। কায়া ও ছায়ার ন্যায় উভয়ে পরস্পর নিবিড় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ (কঠোপনিষৎ ১৷৩৷১), উভয়ের প্রকৃতিতে প্রচুর সাদৃশ্য বর্তমান—যেমন চৈতন্যময়তা, আনন্দময়তা, স্বাধীন ইচ্ছা, কর্মশক্তি ইত্যাদি। কিন্তু জীবাত্মার ক্ষেত্রে এই ধর্মগুলি সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে পরমাত্মায় উহাদের পরিমাণ অনন্ত। পরমাত্মা অসীম চৈতন্যস্বরূপ; তাঁহার আনন্দের, স্বাধীনতার, সৃজনশক্তির কোনও গণ্ডী নাই। উপনিষদ্ বলেন, মানুষের জীবভাব তাহার চিরকালের পরিচয় নয়। এমন দিন আসিতে পারে যখন ছায়া কায়ার মধ্যে অন্তর্হিত হয়, মানুষ জানে, 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—আমি ব্রহ্মস্বরূপ। লৌকিক জীবনে একজন বন্ধুর পক্ষে তাহার প্রিয় সুহৃদের ছায়া হইয়া থাকা অথবা পতিব্রতা নারীর স্বামীর ছায়া হইয়া চলা গৌরবের বিষয়। কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে মানুষ যদি পরমাত্মার ছায়া হইয়া জীবত্ব-স্বীকার করিয়া সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে উহা তাহার মূর্খতার পরিচায়ক। মানুষের প্রধান কর্তব্য আত্মজ্ঞান লাভ করা, ছায়াত্ব ঘুচাইয়া কায়াত্ব উপলব্ধি করা।

ভগবদ্‌ভক্তের দৃষ্টি আলাদা, বুলিও আলাদা। ভক্ত ভাবেন, তিনি যে ভগবানের ছায়া, বৃহৎ অগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ এইটি যদি সর্বদা মনে রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলেই তো জীবন-সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। দুর্বুদ্ধিবশতঃ এই সত্য আমরা খেয়াল করি না বলিয়াই তো অহঙ্কার-মত্ত হইয়া 'আমি' 'আমি' করি। সেইজন্যই তো দুঃখ পাই, কত যন্ত্রণা ভোগ করি। যদি সর্বক্ষণ বলিতে পারি 'নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু', যদি গীতার শিক্ষা মনে রাখিতে পারি –

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

(ঈশ্বর সকল জীবের হৃদয়ে বাস করিতেছেন, তাঁহার দৈবী মায়ায় সকলকে কলের পুতুলের ন্যায় চালাইতেছেন,) তাহা হইলে সকল দুঃখের অবসান হয়। অতএব ভক্ত বলেন, হে প্রভু, সর্বদা আমাকে তোমার ছায়া করিয়া রাখো। আমি যে তোমার—ইহা যেন আমি ভুলিয়া না যাই। তোমার ভুবনমোহিনী অবিদ্যা মায়ায় পড়িয়া আমি যেন তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ বিস্মৃত না হই। হে প্রভু, আমি পার্থিব সুখ চাই না, স্বর্গসুখও চাই না, জন্মে-জন্মে তোমার কিঙ্কর হইয়া তোমার সেবাধিকার চাই।

আমরা যতক্ষণ স্বপ্ন দেখি ততক্ষণ প্রত্যেকটি বস্তু বা ঘটনা সত্য বলিয়া মনে হয়। স্বপ্ন ভাঙ্গিলে বুঝিতে পারি উহারা মনের সৃষ্টি, মিথ্যা। জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্নের দৃষ্ট বস্তু বা ঘটনাগুলি যদি ভাবিতে চেষ্টা করি তখন সেগুলি আর বাস্তব বলিয়া মনে হয় না, মনে হয় উহারা কায়াহীন ছায়ামাত্র। লৌকিক জীবনের এই অভিজ্ঞতা আধ্যাত্মিক জীবনেও অনুভূত হয়। সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ আত্মবস্তুর দিকে যত আমরা আগাইয়া যাই নাম-রূপময় জগৎসংসার ততই আমাদের নিকট স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতে বাধ্য। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার একটি গানে এই অনুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন :—

নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাচর।

জগৎ-সংসারকে অনিত্য বলিয়া দৃঢ় ধারণা না হইলে আধ্যাত্মিক অনুভূতি সুদূরপরাহত। কি জ্ঞানপথ, কি ভক্তিপথ উভয় পথেই ইহা সত্য। উপনিষদ্ বলিতেছেন, ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে। বিবেকী ব্যক্তি অনিত্যবস্তুসমূহকে সত্য বলিয়া আঁকড়াইতে যান না। (কঠ ২।১।২) গীতায় শ্রীভগবান ভক্ত অর্জুনকে বলিতেছেন, অনিত্যম-সুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্। এই অনিত্য দুঃখময় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি যথার্থ শ্রেয়ঃ চাও তো আমার ভজনা কর। জ্ঞান-সাধকের মন্ত্র—'ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা।' ভক্তি-সাধকের মন্ত্র—'ভগবানই সত্য, জগৎ সর্বদা পরিবর্তনশীল।' উভয় পথের সাধকই কায়া ও ছায়ার মূল্য জানেন, গিলটি করা গহনাকে সোনা বলিয়া ভ্রম করেন না।

জ্ঞান ও ভক্তির উভয়েরই আবার একটা উচ্চতর দৃষ্টি আছে। উপনিষদ্ বলিতেছেন, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—এই যাহা কিছু সবই ব্রহ্ম। আত্মৈবেদং সর্বম্—আত্মাই এই সব কিছু হইয়াছেন। জগৎ-সংসারকে মায়া বলিয়া দৃঢ় প্রযত্নে প্রত্যাখ্যান করিয়া করিয়া আত্মবস্তুর সাক্ষাৎকার ঘটে। আত্মাকে উপলব্ধি করিবার পর সাধক দেখেন নামরূপও আত্মা ছাড়া অন্য কিছু নয়। আত্মারই সত্তা জ্ঞান ও আনন্দ জগৎ-সংসারে প্রকাশ পাইতেছে। তখন সাধকের নিকট কায়া ও ছায়ার পার্থক্য ঘুচিয়া যায়। ছায়া বলিয়া তিনি কিছু দেখেন না, সবই কায়া—ছায়াহীন কায়া। সাধক কবি সুরদাস তাঁহার একটি প্রসিদ্ধ গানের শেষে লিখিয়াছেন—

ইক মায়া ইক ব্রহ্ম কহাবত সুরদাস ঝগেরো
অজ্ঞানসে ভেদ হোবে জ্ঞানী কাহে ভেদ করো।

সুরদাস বলিতেছেন—মায়া এক বস্তু আর ব্রহ্ম আর এক বস্তু এই লইয়া ঝগড়া দেখিতে পাই। এই ভেদ অজ্ঞান হইতেই হয়। হে জ্ঞানী, তুমি যদি যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকো তো ব্রহ্ম ও মায়ার মধ্যে প্রভেদ দেখিতেছ কেন?

সুরদাস উপনিষদের সিদ্ধান্তই ধ্বনিত করিয়াছেন, ভক্তির পরাকাষ্ঠাতেও এই দৃষ্টি আসিয়া থাকে। ভগবানকে দর্শন করিলে সংসারকে অনিত্য বলিবার আর প্রয়োজন থাকে না। সংসারকে তখন ভগবানের লীলা বলিয়া মনে হয়। সব রূপের মধ্যে তখন তাঁহার স্মিতহাস্য ফুটিয়া উঠে, সকল শব্দের ভিতর বাঁশীর সুর শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ সুফী সাধক জাফরের এই গানটি শুনিতে ভাল বাসিতেন—'জো কুছ হ্যায় সো তুঁহী হ্যায়।' যাহা কিছু আছে সবই তুমি।

আধ্যাত্মিক জীবনে কায়া অর্থাৎ সত্যস্বরূপ শ্রীভগবান তাঁহার ছায়া দ্বারা আমাদের ত্রিতাপ দূর করেন। তাঁহার মূর্তি—ছায়ার ভিতর তাঁহাকে ভাবনা করিবার চেষ্টা দ্বারা আমরা তাঁহার সান্নিধ্য ও স্পর্শ লাভ করি। আমরা

যতক্ষণ জীব ততক্ষণ আমরা ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব —ছায়া। যতদিন না আমরা সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করিতেছি ততদিন সংসার মায়া—ছায়া। এই ছায়া সম্বন্ধে আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে। সত্যের অনুভূতি হইলে মায়া হইতে আর ভয় নাই—ছায়া তখন কায়ার সহিত এক হইয়া গিয়াছে।

দানবের পরাজয়

শ্রীশান্তশীল দাশ

দানবেরা মাঝে মাঝে মাথা তোলে উন্মত্ত উল্লাসে ;
ভাবে, বুঝি দেবতারা সবাই নিদ্রিত, সে-সুযোগে
নিমেষে প্রয়োগ করে সর্বশক্তি, আপন বিক্রমে
অধিকার করে নেবে স্বর্গরাজ্য ; হবে অধিপতি
একচ্ছত্র ; কেউ আর প্রতিদ্বন্দ্বী রবে না কোথাও,
একা সব ভুঞ্জিবে সে, অসপত্ন রাজ্যসুখভোগ।

মাথা তোলে ঠিকই সে, হুহুঙ্কার ছাড়ে গর্বভরে ;
যতটুকু শক্তি আছে, সেই নিয়ে নিজেকে অজেয়
মনে করে, আর সেই শক্তির প্রচণ্ড দম্ভভরে
এদিকে ওদিকে করে হানাহানি ; ন্যায়নীতি সব
চির-বিসর্জন দিয়ে, জানে না-যে, তারা যে দানব,
দানব শক্তির বশ, অধর্মের আশ্রিত-যে তারা।

স্বপ্ন তার ভেঙে যায়, দম্ভ তার লুটায় মাটিতে ;
প্রচণ্ড আঘাত আসে, যে-আঘাতে উদ্ধত মস্তক
নত হয় ভূমিতলে, প্রাণভয়ে আশ্রয় সন্ধান
করে সে সবার কাছে ; অসত্য অধর্মাচারী সেই
দানবের 'পরে হানে বিদ্রূপ ঘৃণার তীক্ষ্ণ বাণে
সবাই ; সঙ্কোচে আর দেখায় না মুখ সে আলোকে।

বারে বারে দানবের পরাভব এমনি করেই
হয়, তবু কোনদিন শিক্ষা তার হয়নি, হবে না।
সে জাগবে বার বার, ঘটাবে অনর্থ চারিধারে,
তারপর জর্জরিত হয়ে শেষে লুটাবে ধুলায়।
নিশ্চিহ্ন কি কোনদিন হবে নাকো এই দানবেরা ?
শুধু পরাজয় নয়, চাই তার সম্পূর্ণ বিনাশ।

"তাল ভঙ্গ ন পায়"*

স্বামী তেজসানন্দ

বৈদিক যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত আর্য ঋষিকণ্ঠে যে শাশ্বত বাণী ধ্বনিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাই ভারত-কৃষ্টির মূল ভিত্তি-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। অদৃশ্য শিশিরসম্পাতে যেমন পুষ্পকলিকাসমূহ অলক্ষিতে প্রস্ফুটিত হয়, তেমনি যুগে যুগে অধ্যাত্ম-মনীষিবর্গের অবিশ্রান্ত নীরব কঠোর সাধনার ফলে ভারতের আধ্যাত্মিক তথা সাংস্কৃতিক জীবন বিচিত্র শোভায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতের বেদ ও বেদান্ত, রামায়ণ ও মহাভারত, পুরাণ ও তন্ত্রাদির মর্মবাণী সেই সাংস্কৃতিক আদর্শকে শত বিপ্লব ও বিপর্যয়ের মধ্যেও এক অপার্থিব জ্ঞানালোকে চিরভাস্বর রাখিয়া সকলকে প্রকৃত পথের সন্ধান দিয়া আসিতেছে।

এই সাংস্কৃতিক জীবনের পরিপুষ্টি-সাধনকল্পে বিবিধ ভাষাভাষী ভারতবর্ষের শিক্ষাপ্রদ রম্য কথা-সাহিত্য, প্রচলিত গল্প ও গাথা সহজ ও সরল ভাষায় ও ছন্দে জনমানসে যে অমর রেখাপাত করিয়া দেশবাসীকে তাহাদের সমুন্নত আদর্শের প্রতি সর্বদা সচেতন রাখিয়াছে, তাহার যথার্থ মূল্যায়ন করা সহজসাধ্য নহে। মনীষিবর্গের এই অতুল অবদানের ফলেই ভারতের কৃষ্টিধারা আজও সতেজ ও সজীব রহিয়াছে এবং উহা দিকে দিকে প্রসারিত হইয়া বিশ্ববাসীকে শান্তির অমৃতরসের সন্ধান দিতেছে। তাই যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দও দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, "এই সেই ভারত যেখান হইতে ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ বন্যাকারে প্রবাহিত হইয়া সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে; আর এখান হইতে আবার তদ্রূপ তরঙ্গ উত্থিত হইয়া নিস্তেজ জাতিসমূহের ভিতর জীবন ও তেজ সঞ্চার করিবে।"

প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত একটি সারগর্ভ কাহিনীর অবতারণা করা হইতেছে যাহার মাধ্যমে আমরা গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসজীবনের প্রকৃত আদর্শেরও কতকটা পরিচয় পাইতে সমর্থ হইব।

বহুবৎসর পূর্বে কোন এক সময়ে ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলের একটি অখ্যাত পল্লীতে সঙ্গীত- ও নটন-নিপুণ নট-নটীদ্বয় বাস করিত। নাচিয়া গাহিয়া জীবিকার্জন করাই তাহাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল। ইহা অনস্বীকার্য যে, যখন দেশে কোনপ্রকার অর্থাভাব থাকে না ও শস্যসামগ্রীরও অনটন ঘটে না, তখনই সঙ্গীত- ও নর্তনপ্রিয় জনগণ এইরূপ নির্দোষ আমোদ-প্রমোদে অর্থব্যয় করিতে অগ্রসর হয় এবং নাচগানই যাহাদের উপজীবিকা তাহাদিগকেও অর্থোপার্জনের জন্য কোন অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় না। দৈব-বিড়ম্বনায় একবার প্রখর সূর্যতাপে ও দীর্ঘকাল-ব্যাপী অনাবৃষ্টিতে সেই দেশের অধিকাংশ শস্যই বিনষ্ট হয় এবং দুর্ভিক্ষের করাল কবল হইতে নিষ্কৃতিলাভের আশায় অনেকে আত্ম-রক্ষার্থে দিগ্‌দিগন্তরে পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে কাহারও পক্ষে যে নাচ-গানের জন্য অর্থব্যয় করা সম্ভব নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। আমাদের এই

* একটি প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে লিখিত।
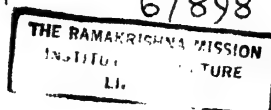
আখ্যায়িকার নায়ক-নায়িকার নাচ-গানের আসরও অনতিবিলম্বে একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। নিরুপায় হইয়া তাহারাও পার্শ্ববর্তী অপর এক সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজার রাজ্যে প্রস্থান করিল।

সে-দেশের খাদ্যের বা অর্থের বিশেষ কোন অভাব ছিল না। রাজা অশীতিপর বৃদ্ধ ও অতিশয় কৃপণ। তিনি তাঁহার চেয়েও বয়োজ্যেষ্ঠ এক মন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যসংক্রান্ত সকল বিষয়ে পরামর্শ করিয়া কঠোরহস্তে রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। ভারতীয় হিন্দুশাস্ত্রের বিধানানুসারে এই পলিতকেশ বৃদ্ধ নৃপতি ও মন্ত্রীর বহুপূর্বেই বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করা সমীচীন ছিল। কিন্তু সেই নির্দিষ্টকাল অতীত হইলেও কার্পণ্যদোষ-দুষ্ট ক্ষমতাপ্রিয় স্বার্থপর নৃপতি এবং তদ্ভাবে ভাবিত মন্ত্রী তাঁহাদের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অকুতোভয়ে প্রজাশাসন করিতেন। প্রজাবর্গের মধ্যে অসন্তোষের গুঞ্জরণ শ্রুত হইলেও রাজদণ্ডের ভয়ে প্রকাশ্যভাবে কেহ কোন বিরুদ্ধ মনোভাব ব্যক্ত করিতে সাহসী হইত না। যাহা হউক, দেশান্তর হইতে আগত সেই প্রসিদ্ধ নট-নটীদ্বয় ব্যয়কুণ্ঠ নৃপতির রাজধানীতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে হাটে-মাঠে,—নানা স্থানে তাহাদের অভিনয়-চাতুর্য প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। ইহার ফলে অচিরেই তাহাদের নৃত্য-গীতনৈপুণ্যের সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং কিছু কিছু অর্থাগমও হইতে লাগিল। নট-নটীদ্বয় রাজদরবারে তাহাদের নৃত্য-গীত-পারদর্শিতা প্রদর্শনের জন্য নিরতিশয় আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল। তাহাদের দৃঢ় ধারণা রাজদরবারে নৃত্য-কলা প্রদর্শন করিতে পারিলে একদিনেই তাহারা প্রভূত পরিমাণে অর্থোপার্জন করিতে সক্ষম হইবে। তাহাদের এই সঙ্গীত- ও নর্তন-বিদ্যার সংবাদও নৃপতির কর্ণে পৌছিতে বিলম্ব হইল না। সভাসদ্‌বর্গের অনুরোধে রাজা আদেশ করিলেন যে, যদি বিনা অর্থব্যয়ে তাহারা রাজসভায় নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করিতে সম্মত হয়, তবে তাঁহার দিক হইতে কোন আপত্তির কারণ থাকিবে না। নট-নটীদ্বয় রাজাদেশ শিরোধার্য করিয়া আকুল আগ্রহে সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

রাজা তাঁহার মন্ত্রী ও সভাসদ্‌বর্গের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপতলে এক বিরাট সভার আয়োজন করিলেন। সভাগৃহ অচিরে আলোকমালায় সুসজ্জিত হইল। নির্দিষ্ট দিনে সভাস্থল পরিষদবৃন্দ, রাজ্যের গণ্যমান্য অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও অন্যান্য প্রজাবর্গ দ্বারা পূর্ণ হইয়া গেল। প্রবলপ্রতাপ নৃপতি ও যুবরাজ এবং মন্ত্রী ও মন্ত্রীকন্যাও স্ব স্ব সম্মানিত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। বিপুল জনসমাগমে সভামণ্ডপে তিলধারণেরও স্থান রহিল না। চারুদর্শন নট-নটীদ্বয় যথোচিত মনোহর বেশ ধারণপূর্বক রঙ্গমঞ্চে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সমবেত জনমণ্ডলী বিপুল হর্ষধ্বনি সহকারে তাহাদিগকে স্বাগত জানাইল।

নৃত্য-গীতাভিনয় আরম্ভ হইবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সকলে নির্বাক্ বিস্ময়ে দেখিতে পাইল—জটাজূটধারী, বিভূতিভূষিতাঙ্গ, কৌপীনমাত্রসম্বল, আজানুলম্বিত বাহু, দীর্ঘকায় এক তেজোদীপ্ত সন্ন্যাসী একখানি ছিন্নকন্থা স্কন্ধে বহন করিয়া সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার তপঃক্লিষ্ট শীর্ণ দেহ ও মুখমণ্ডল এক অপূর্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। তাঁহার ধীর মন্থরগতি, ধ্যানগম্ভীর ভাব ও উত্তান নয়নের স্থির দৃষ্টির মাধ্যমে এক দিব্যানুভূতি প্রকট হইতেছিল। এই নৃত্য-গীতের আসরে এবম্বিধ একজন সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীর আগমনে সকলেই উচ্চকিত

হইয়া উঠিল। তাঁহার আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্যও কেহ অনুধাবন করিতে সমর্থ হইল না। সভাস্থ সকলের ন্যায় তিনিও একটি আসন গ্রহণ করিয়া নিশ্চল অবস্থায় উপবিষ্ট রহিলেন।

নির্দিষ্ট সময়ে নটী (নর্তকী) সাবলীল মনোহর ভঙ্গীতে তাহার নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিল এবং তাহার সহযোগী বাদ্যবিশারদ নট বামদেব সঙ্গীত ও নৃত্যের তালে তাল রাখিয়া নিপুণহস্তে বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে লাগিল। নর্তকীর তাল-লয়-সমন্বিত-সঙ্গীতের মূর্ছনা, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, লীলায়িত নর্তন-ভঙ্গী দর্শন-শ্রবণে দর্শকবৃন্দ মুহুর্মুহুঃ হর্ষধ্বনি করিতে লাগিল। সময় যে কিভাবে অলক্ষিতে অতিবাহিত হইতেছে, তাহা বিস্মৃত হইয়া নিবিষ্টচিত্তে সকলে এই অভিনয় দর্শন করিতে লাগিল। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া তৃতীয় যামে পৌছিয়াছে। অথচ এখনও কেহই নর্তকীকে শুধু প্রশংসাধ্বনি ব্যতীত কোন বস্তু উপহার বা পুরস্কার প্রদান করিতেছে না। তদ্দর্শনে শ্রান্ত নর্তকী ব্যথিত অন্তরে তাহার সহযোগী বাদ্যবাদক বামদেবকে উদ্দেশ করিয়া গানের সুরে বলিয়া উঠিল—

“রাত দো ঘড়ী বজ গঈ, থক গঈ পঞ্জর মেরী
নটী কহে, সুনো বামদেব ইনাম ন মিলা
কোঈ”।—

—রাত্রি দুই ঘটিকা অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। নাচ-গান করিতে করিতে আমার বক্ষের পাঁজর ক্লান্ত ও ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছে। অথচ তুমি স্বচ্ছন্দে কেবল তালই বাজাইয়া চলিয়াছ। এ পর্যন্ত কাহার নিকট হইতে কোন কিছু ইনামও (বকশিস) মিলিল না। নর্তকীর এই হতাশা ও দুঃখব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণ করিয়া নট গানের সঙ্গে তাল রাখিয়া বলিয়া উঠিল—

“বহুত গঈ থোড়ী রহী থোড়ী অভী হ্যায়।
নট কহে, সুনো নটী, তাল ভঙ্গ ন পায়॥”

—রাত্রির অধিকাংশ সময়ই তো চলিয়া গিয়াছে। রাত্রি শেষ হইতে আর অল্পক্ষণমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। তাহাও দেখিতে দেখিতে শেষ হইয়া যাইবে। হে নর্তকী, তুমি যে ভাবে, যে তালে নৃত্য-গীত পরিবেশন করিতেছ, তুমি সেই ভাবেই উহা করিয়া যাও। দেখিও, যেন তাল ভঙ্গ না হয়।

নটের উক্তিটি শ্রবণমাত্র সভাস্থলে উপবিষ্ট সেই সন্ন্যাসীপ্রবর তাঁহার একমাত্র সম্বল ছিন্নকম্বাটি হর্ষপুলকিত চিত্তে নট-নটীদ্বয়কে প্রদান করিলেন। উভয়ে সন্ন্যাসীর এই দান সাদরে গ্রহণ করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে মস্তক দ্বারা উহা স্পর্শ করিল। দেখিতে দেখিতে নৃপতির পার্শ্বে উপবিষ্ট রাজকুমার তাঁহার মহার্ঘ অঙ্গুরীয়টি এবং বৃদ্ধ মন্ত্রীর পার্শ্বে সমাসীনা তাঁহার পরমাসুন্দরী দুহিতা স্ব-কণ্ঠ হইতে মূল্যবান স্বর্ণহারটি উন্মোচন করিয়া অভিনয়-মঞ্চে নট-নটীদ্বয়ের উদ্দেশ্যে পুরস্কারস্বরূপ নিক্ষেপ করিল। তদ্দর্শনে কৃপণ নৃপতি ও তৎস্বভাবসম্পন্ন মন্ত্রী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হইয়া উঠিলেন। রাত্রি শেষ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই এবং অভিনয়কারীদ্বয়ও বিরামহীন নৃত্য-গীতাদি পরিবেশনের ফলে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া নৃপতি কালবিলম্ব না করিয়া সভা-ভঙ্গের আদেশ প্রদান করিলেন। একে একে সকলে সভাগৃহ হইতে প্রস্থান করিলে, রাজা সর্বপ্রথম সেই সন্ন্যাসীপ্রবরকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তিনি কি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া এই রাজসভায় আগমন করিয়াছেন এবং নট-নটীর সঙ্গীতের মধ্যে তিনি এমন কি তাৎপর্য খুঁজিয়া পাইয়াছেন যাহাতে এতটা প্রসন্ন হইয়া তিনি তাঁহার একমাত্র

গাত্রাচ্ছাদন ছিন্নকন্থাটি অভিনয়কারীদ্বয়কে প্রদান করিলেন। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী নৃপতি কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—মহারাজ, আপনার প্রশ্নদুইটির যথাযথ উত্তর প্রদান করিতেছি। আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন—

"ভিক্ষাশনং তদপি নীরসমেকবারং
শয্যা চ ভূঃ পরিজনো নিজদেহমাত্রম্।
বস্ত্রং সুজীর্ণশতখণ্ডময়ী চ কন্থা
হা হা তথাপি বিষয়ান্ ন জহাতি চেতঃ॥"

—আমি সনাতনপন্থী একজন পরিব্রাজক সন্ন্যাসী। গুরুগৃহে দ্বাদশ বর্ষ ব্রহ্মচর্যপালন, গুরুসেবা ও যথারীতি শাস্ত্রাধ্যয়নাদি করিবার পর প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক স্বাদু বা নীরস যথাপ্রাপ্ত মাধুকরী ভিক্ষায় জীবন ধারণ করিয়া দীর্ঘকাল কঠোর সাধনায় নিযুক্ত ছিলাম। বৃক্ষতলে ভূমিশয্যায় শয়ন; সঙ্গী একমাত্র নিজের দেহখানি। আর দেহাচ্ছাদন ঐ সুজীর্ণ শতখণ্ডময়ী কন্থা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এতকাল কৃচ্ছ্রসাধন করা সত্ত্বেও এই চিত্তকে বিষয়বাসনামুক্ত করিতে সমর্থ হই নাই। আজ জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া পৌছিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম জীবন-সন্ধ্যায় আপনার নিকট হইতে অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হইলে একটি কুটীর বাঁধিয়া ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগপূর্বক জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটা দিন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে কাটাইয়া দিব। মহারাজ! সুদীর্ঘকাল যে সন্ন্যাসী কাহারও কৃপাপ্রার্থী হয় নাই, স্বদেহের সুখ-দুঃখের প্রতিও যে কোন দিন বিন্দুমাত্র দৃক্পাত করে নাই, যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট যে সন্ন্যাসী দেশে দেশে, পাহাড়ে পর্বতে, নির্জন অরণ্যে পরিভ্রমণ করিয়া পরিব্রাজক জীবন যাপন করিয়াছে, সেই ত্যাগব্রতধারী সন্ন্যাসী আজ ক্ষণভঙ্গুর এই শরীর রক্ষার্থে অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া রাজদরবারে সমাগত! ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? মহারাজ! এখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম এক বিরাট সভা,—লোকে লোকারণ্য। বহু গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সমাবেশে সভাগৃহ জমজম করিতেছে। সভান্তে আপনার নিকট আমার মনোগত ভাব প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই এই সভাস্থলে আসন গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং নট-নটীর গানও শুনিতেছিলাম। নটের বাক্যের শেষ পঙ্ক্তিটি শ্রবণমাত্র আমার চিত্তে যে সাময়িক ভ্রান্তি ও মানসিক দুর্বলতা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা সহসা কাটিয়া গেল। নট নটীকে লক্ষ্য করিয়া গানের ছন্দে সত্য কথাই বলিয়াছে,—রাত্রির অধিকাংশই তো অতীত হইয়াছে। সামান্য যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে তাহাও শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই। সুতরাং তুমি যে তালে নাচ-গান করিতেছ, তাল ভঙ্গ না করিয়া সেইভাবেই উহা করিয়া যাও। কি অপূর্ব শিক্ষাপ্রদ এই বাণী! আমি এতকাল যে তালে ত্যাগের পথ, ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভরতার পথ বাহিয়া চলিয়াছি, আজ ক্ষণিক দুর্বলতাবশতঃ সন্ন্যাসজীবনের একমাত্র সম্বল জগতের ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আপনার দ্বারদেশে কৃপাপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছিলাম। ধিক, শত ধিক এই বিষয়লুব্ধ মনকে। বস্তুতঃ একবার পদস্খলন হইলে চিত্তকে আবার উচ্চগ্রামে উন্নীত করা সহজে সম্ভব হয় না, অলক্ষিতে মন দিনের পর দিন নিম্নগামী হইতে থাকে। সন্ন্যাসীশিরোমণি আচার্য শঙ্করও তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে মুক্তিপথযাত্রীমাত্রকেই উদ্দেশ করিয়া সাবধানবাণী শুনাইয়াছেন—

"লক্ষ্যচ্যুতং চেদ্ যদি চিত্তমীষদ্বহির্মুখং
সন্নিপতেৎ ততস্ততঃ।
প্রমাদতঃ প্রচ্যুতকেলিকন্দুকঃ সোপানপঙ্ক্তৌ
পতিতো যথা তথা"॥৩২৫॥

—খেলার গোলক অসাবধানতাবশতঃ যদি সোপানশ্রেণীর সর্বোচ্চ সোপানেও পতিত হয়, তাহা হইলে উহা ক্রমশঃ নিম্ন হইতে নিম্নতর সোপানে নামিতে থাকে। এইভাবে চিত্তও যদি ব্রহ্মচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্রও বহির্মুখ হয়—বিষয়চিন্তায় নিমগ্ন হয়—তাহা হইলে উহা ক্রমান্বয়ে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে প্রধাবিত হইয়া উহাতেই আসক্ত হয়।

জীবনের এই মৌন সন্ধিক্ষণে ইহারা আমার চক্ষের আবরণ উন্মোচন করিয়া দিয়াছে। ইহারাও আজ আমার শিক্ষাগুরু। আমি ইহাদের নিকট হইতে যে মূল্যবান শিক্ষা লাভ করিয়াছি ও সাবধানবাণী শ্রবণ করিয়াছি তাহাই আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রকৃত পাথেয় হইয়া থাকিবে। "রথ্যায়াং বহুবস্ত্রানি ভিক্ষা সর্বত্র লভ্যতে। ভূমিঃ শয্যাস্তি বিস্তীর্ণা যতয়ঃ কেন দুঃখিতাঃ।"—রাস্তা-ঘাটে সর্বত্র ছিন্ন বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। মাধুকরী ভিক্ষাও এই বিরাট সংসারে সহজলভ্য। এই বিশাল শ্যামলা ধরণী তাহার স্নেহাঞ্চল বিছাইয়া আমার সুখশয্যা রচনা করিয়া রাখিয়াছে। জীবন-নির্বাহের এই বিপুল সমারোহ থাকিতে প্রকৃত সন্ন্যাসীর তো দুঃখিত হইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। তাই আমি এই নট-নটীর অভিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া আমার ছিন্ন কন্থাটি তাহাদিগকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করিয়াছি। "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"—ক্রান্তদর্শী ঋষিগণ সত্যই বলিয়াছেন,—তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের ন্যায় এই ত্যাগের পথ দুর্গম ও বিপজ্জনক; কিঞ্চিন্মাত্র অসতর্ক ও অসাবধান হইলে পদস্খলন অবশ্যম্ভাবী। জয় হউক মহারাজ, শ্রীভগবান আপনার অশেষ কল্যাণ করুন।—এই আশীর্বাণী উচ্চারণ করিয়া সেই প্রবীণ সন্ন্যাসী প্রশান্তচিত্তে রাজসভা পশ্চাতে রাখিয়া চিরতরে অদৃশ্য হইলেন। সন্ন্যাসী-কেশরী স্বামী বিবেকানন্দও পরবর্তীকালে এই সমুন্নত আদর্শেরই প্রতিধ্বনি করিয়া তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "The Song of the Sannyasin" (সন্ন্যাসীর গীতি) কাব্যে লিখিয়াছেন—

> "সুখতরে গৃহ ক'রো না নির্মাণ,
> কোন্ গৃহ তোমা ধরে হে মহান ?
> গৃহছাদ তব অনন্ত আকাশ,
> শয়ন তোমার সুবিস্তৃত ঘাস ;
> দৈববশে প্রাপ্ত যাহা তুমি হও,
> সেই খাদ্যে তুমি পরিতৃপ্ত রও ;
> হউক কুৎসিত কিংবা সুরন্ধিত,
> ভুঞ্জহ সকলি হয়ে অবিকৃত।
> শুদ্ধ আত্মা যেই জানে আপনারে,
> কোন্ খাদ্য পেয় অপবিত্র করে ?
> হও তুমি চল-স্রোতস্বতী মত,
> স্বাধীন উন্মুক্ত নিত্য-প্রবাহিত।
> উঠাও আনন্দে, উঠাও সে তান,
> গাও গাও গাও সদা এই গান—
> ওঁ তৎ সৎ ওঁ॥" ১১॥

অতঃপর নৃপতি রাজকুমার ও মন্ত্রীকন্যাকে তাহাদের মূল্যবান রত্নালঙ্কার নট-নটীদ্বয়কে পুরস্কার দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজকুমার বলিতে লাগিলেন—পিতঃ, হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত রহিয়াছে,—"ব্রহ্মচর্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। যদি বা ইতরথা ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেদ্ গৃহাদ্ বা বনাদ্ বা।" "…যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।"—অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্মের বিধানানুসারে মন্দাধিকারী সাধারণ জনগণ ব্রহ্মচর্যাশ্রম সমাপ্ত হইলে গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করিবে এবং প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইলে বানপ্রস্থী হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে। কিন্তু তীব্র বৈরাগ্যবান উচ্চাধিকারী

ব্যক্তির পক্ষে শাস্ত্রবিধান অন্যপ্রকার। যখনই তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, তখনই সে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য বা বানপ্রস্থ—যে কোন অবস্থা হইতে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে পারিবে। মহারাজ! আপনার বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণের সময় অনেক পূর্বেই অতীত হইয়া গিয়াছে। আমিও যৌবন অতিক্রম করিয়া প্রায় প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইয়াছি। অথচ আপনি কার্পণ্যবশতঃ ও ক্ষমতালিপ্সায় আত্মহারা হইয়া এখন পর্যন্ত আমার উপর রাজ্যশাসনের ভার অর্পণ না করিয়া রাজকার্যেই নিযুক্ত রহিয়াছেন! শুধু ইহাই নহে, আপনার নিকট মন্ত্রী-দুহিতার সঙ্গে আমার পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার অভিপ্রায় নানাভাবে ব্যক্ত করা সত্ত্বেও আপনার নিকট হইতে এ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে সম্মতিসূচক কোন ইঙ্গিত প্রাপ্ত হই নাই। ইহা যে কিরূপ মর্ম-পীড়াদায়ক তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। মন্ত্রীমহাশয়ও আপনার মত একজন কৃপণ নৃপতির পুত্রের হস্তে তাঁহার কন্যাকে সমর্পণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় আমি এবং মন্ত্রী-কন্যা উভয়ে আপনাদের দুজনকেই আজ গভীর নিশিতে গোপনে হত্যা করিয়া রাজ্যের শাসন-দণ্ড ধারণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম। কিন্তু বিধির বিধান দুর্লঙ্ঘনীয়। নট-নটীর গানের শেষ পঙ্‌ক্তিটি "তাল ভঙ্গ ন পায়"—আজ গভীর অর্থপূর্ণ হইয়া আমাদের কর্ণে ঝঙ্কার তুলিয়াছে। বলা বাহুল্য, আপনারা উভয়েই কালের স্বাভাবিক গতিতেই অল্পদিনের মধ্যেই এই সংসার-রঙ্গমঞ্চ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবেন। এই মহাসত্য স্মরণ করাইয়া দিয়া ইহারা আমাদের উভয়কেই এক মহাপাতক হইতে রক্ষা করিয়াছে। আপনাদিগকে হত্যা করিয়া রাজা-রানী হইবার দুরভিসন্ধি হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ইহারা আমাদের যে উপকার সাধন করিয়াছে, তাহার তুলনায় এই পার্থিব স্বর্ণাঙ্গুরীয় ও রত্নহার তুচ্ছাতিতুচ্ছ। গভীর কৃতজ্ঞতাবশতই পুরস্কারস্বরূপ উহা তাহাদিগকে অর্পণ করিয়াছি।

বৃদ্ধ নৃপতি ও বৃদ্ধ মন্ত্রী নিবিষ্টমনে রাজ-কুমারের মুখনিঃসৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া কার্পণ্য, হঠকারিতা, স্বার্থপরতা, ভোগলিপ্সা ও ক্ষমতা-প্রিয়তার যে কি বিষময় পরিণাম হইতে পারে তাহা আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিলেন। ইহাও এতদিনে বুঝিতে পারিলেন যে, ভোগের দ্বারা ভোগের নিবৃত্তি হয় না। শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে —"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥" —বিষয়-ভোগের দ্বারা ভোগের আকাঙ্ক্ষা কখনও পরিতৃপ্তি লাভ করে না। অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় উহা দিন দিনই বর্ধিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ভোগের মধ্যে শান্তির সন্ধান কোনদিনেই মিলিবে না—"ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ"—একমাত্র ত্যাগেই অমৃতত্বের অধিকারী হওয়া সম্ভব। ভর্তৃহরিও তাঁহার বৈরাগ্যশতক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং
বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ং
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং
রূপে জরায়া ভয়ম্।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং
কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ং
সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং
বৈরাগ্যমেবাভয়ম্॥ ৩১॥

—ভোগে রোগভয়, সৎকুলের গৌরবে কুল-ভঙ্গের ভয়, সম্পত্তিতে রাজ্যলোলুপ নৃপতি হইতে ভয়, মানে অপমানের ভয়, বলে শত্রুর ভয়, রূপে বৃদ্ধত্বের ভয়, শাস্ত্রে পরাজয়ের ভয়, সদ্‌গুণে খলব্যক্তিগণের নিকট হইতে ভয়, শরীরধারণে

মৃত্যুভয় বিদ্যমান। সংসারে বস্তুমাত্রেই ভয়ের কারণ নিহিত রহিয়াছে। একমাত্র বিষয়ভোগ-বৈরাগ্য দ্বারাই নির্ভয় হওয়া সম্ভব।

বৃদ্ধ নৃপতি ও বৃদ্ধ মন্ত্রী আর কালবিলম্ব না করিয়া রাজকুমারের সঙ্গে মন্ত্রীকন্যার উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদন করিয়া তাহাদের উভয়কে রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং জীবনের অবশিষ্টাংশ ভগবচ্চিন্তায় অতিবাহিত করিবার মানসে বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্বক বনে গমন করিলেন।

বলা বাহুল্য, এই আখ্যায়িকাটি বিভিন্ন লেখকের লেখনীমুখে বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত হইলেও ইহার মাধ্যমে ভারতের সনাতন আদর্শের যে সমুজ্জ্বল আলেখ্য সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার মৌলিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোথাও কোন মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হয় না। এই সর্পিল বন্ধুর ও পিচ্ছিল সংসারপথে গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীকে কি তালে, কি ছন্দে পদক্ষেপ করিতে হইবে তাহা এই বহুপ্রচলিত "তাল ভঙ্গ ন পায়" কাহিনীতে অতি সুন্দরভাবে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহা অনস্বীকার্য যে, আবহমানকাল হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত বেদ-বেদান্ত, পুরাণ-ইতিহাস প্রভৃতির মাধ্যমে ভারতের যে সাংস্কৃতিক ধারা নির্বাধ গতিতে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, এবম্বিধ প্রচলিত বিভিন্ন কথিকা উহারই পরিপুষ্টি সাধনপূর্বক মনুষ্যসমাজে সার্থক ও শিক্ষাপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে। পরমকারুণিক শ্রীভগবান আমাদের সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করুন এবং প্রকৃত আলোকের সন্ধান দিয়া আমাদের জীবন ধন্য করুন,—ইহাই তাঁহার রাতুল চরণে ঐকান্তিক প্রার্থনা।

"অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়। আবিরাবীর্ম এধি॥"
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

—হে প্রভো, অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত কর, অজ্ঞান অন্ধকার হইতে জ্ঞানের জ্যোতিতে লইয়া চল, মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতত্ব প্রদান কর। ওহে স্বপ্রকাশ, তুমি আমাদের হৃদয়ে জ্যোতিরূপে আবির্ভূত হও। শান্তিময় হউক আমাদের জীবন।

"ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ"

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

কোন্ দূর জন্মলগ্নে, হে চির-সুন্দর,
জ্বেলে দিলে তুমি মোর মর্মের ভিতর
সৌন্দর্য-পিপাসা! বহ্নিশিখা অমরার
নগরীর পাষাণের মরু-সাহারার
বক্ষে তাই চিত্ত মম কেঁদেছে কেবলই!
তাই পল্লী-জননীর অঙ্কে এনু চলি
যেখানে আকাশ নীল, প্রান্তর শ্যামল,
যেখানে শিশির-ভেজা ঘাসে ঝলমল
করে কোটী কোহিনূর অরুণ-কিরণে!
যেখানে ফসলে সোনা, মধু সমীরণে!
পাখীদের কাকলিতে অরণ্য মুখর!
কানে আসে সারাবেলা তরুর মর্মর!
হে সুন্দর, দৈন্য দিলে ঐশ্বর্যে ভরিয়া!
বিত্তে কভু তৃপ্ত নয় মানবের হিয়া!

শ্রীসোমনাথ

স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সোমনাথ একটি বিরাট বিস্ময়। পশ্চিম সমুদ্রকূলে অবস্থিত প্রভাসপত্তনের এই শিবস্থান যে কত প্রাচীন, তা নির্ণয় করা একরকম অসাধ্য। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, "কত বেদ, কত মন্ত্র, মহাযজ্ঞ কত পবিত্রিলা এই দেশ"—এই 'পুরাতন পুরবের' মতই এই প্রভাসক্ষেত্র সুপ্রাচীন, আর এই মহাতীর্থ সোমনাথও তত প্রাচীন।

পুরাণাদি প্রাচীন সাহিত্য পাঠে জানা যায়, দক্ষ-শাপে ক্ষয়রোগগ্রস্ত ভগবান চন্দ্র এখানেই শিবের উদ্দেশ্যে তপস্যা ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে শাপমুক্ত হয়ে নিজ প্রভা ফিরে পেয়েছিলেন; এই জন্যই ক্ষেত্রের নাম 'প্রভাস'। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলার অবসান এইখানেই; যদুকুলও আত্মকলহে লিপ্ত হয়ে এখানেই শেষ হয়ে যায়। অদ্যাপি সেইসব পুরাতন স্থান ও স্মৃতি বিদ্যমান।

সরস্বতী, হিরণ্য ও কপিলা—এই তিনটি পুণ্যনদী এখানেই সাগরে মিশেছেন; এইজন্যও এই ক্ষেত্র মহাপবিত্র। মহাভারতে এই প্রভাস তীর্থের অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে।

ভারতের এই পশ্চিম উপকূল, প্রাচীন Venice-এর মত এক সময় ভারত ও ভারতেতর দেশের মধ্যে জলপথে বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল; বর্তমান বোম্বে বা কলকাতা বন্দর অপেক্ষা এর ঐশ্বর্য কোনও অংশেই কম ছিল না।

ভারতবাসীর মর্মকথা: 'সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল'; তাই চিরকালই এদেশের নরনারী শ্রীভগবানের তৃপ্তির জন্য ধনসম্পদ ত বটেই, এমনকি প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়।

ভারতবর্ষের আরাধ্য দেবতা 'উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর'। তাই ভারতবর্ষময় অসংখ্য শিবমন্দির, আর নিয়ত কোটি কণ্ঠে "হর, হর, বম্, বম্।" বৈদিক যুগেরও আগে থেকে এই শিবের পূজো ও আরাধনা যে চলে আসছে, মহেন্‌জোদারোর প্রত্নতাত্ত্বিক অবিষ্কারই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

প্রভাসক্ষেত্রে মহাদেব সোমনাথের উপাসনা যে কবে থেকে সুরু হয়েছিল, বলা প্রায় অসম্ভব। এখানকার মন্দিরের ঐশ্বর্যের ও সম্পদের কথা লোকের মুখে মুখে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তখনকার দিনে রেডিও বা সংবাদপত্র প্রভৃতি প্রচারবিভাগ ছিল না। সুতরাং এ প্রচারে যে কত যুগ লেগেছিল তা কে জানে?

'রাক্ষসীর প্রাণপাখী' 'মরিয়া না মরে'। ধনলুব্ধ বিদেশীদের বর্বরতায় অনেকবার এই মন্দির ধ্বংস হলেও অচিরকালের মধ্যেই আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। 'শ্মশানেষ্বাক্রীড়া' শিব শ্মশান ভালবাসেন বলেই, তাঁর অচিন্ত্য ও অব্যক্ত লীলার যজ্ঞে এই ধ্বংস, আবার 'ললাটস্থচন্দ্রাদ্গলিত-সুধয়া' নূতন সৃষ্টি! জয় মহাদেব শম্ভো! 'ভাঙ্গাগড়া খেলা যে তার কিসের তবে ডর!'

এই প্রভাসে কবে যে প্রথম শ্রীসোমনাথের মন্দির নির্মিত হয় তা বলা শক্ত। তবে নানান সাহিত্যিক প্রমাণ দৃষ্টে মনে হয়, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। নাসিক ও কার্লে শিলালেখে সিথিয়ান্ নাহাপন কর্তৃক প্রভাসে শিবের আরাধনার উল্লেখ আছে।

অবশ্য এ বিষয়ে গুপ্তযুগের কোন শিলালেখ পাওয়া যায়নি।

খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে (৪৭০ খৃঃ) সৌরাষ্ট্র গুপ্ত সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয় ও বল্লভীতে হয় তার রাজধানী। বল্লভী রাজারা প্রায় সকলেই শিবের বিশেষ ভক্ত ছিলেন, সুতরাং তাঁদের রাজ্যকালে এ-স্থানের প্রভূত উন্নতি হওয়াই স্বাভাবিক। সর্বদাই যে বিদেশীর আক্রমণেই মন্দির ধ্বংস হয়েছে, একথাও জোর করে বলা না। সমুদ্রের নোনা আবহাওয়া ও প্রাচীনত্ব এর জন্য দায়ী; একথাও অবশ্য অনুমান করা অসঙ্গত নয়। খুব সম্ভব এই কারণেই প্রথম ও দ্বিতীয় মন্দির জীর্ণ হওয়ার ফলে খৃষ্টীয় ৭ম বা ৮ম শতকে তৃতীয় মন্দির নির্মিত হয়। তখন থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সোমনাথ মহাদেব খুবই প্রকট। কিংবদন্তী যদি বিশ্বাস করতে হয়, প্রত্যহ গঙ্গোত্রীর জলে মহাদেবের অভিষেক হত এবং ভক্তিমান মানুষেরাই সে জল কাঁধে করে বয়ে আনতেন।

ইতিমধ্যে আরবদেশে হজরত মহম্মদের আবির্ভাব (৫৭০) খৃঃ। তাঁর একেশ্বরবাদী ধর্ম দুর্ধর্ষ আরবগণকে এক করে নববলে বলীয়ান করে তোলে। মহম্মদের দেহান্তের (৬৩২ খৃঃ) একশ বছরের মধ্যেই মক্কা থেকে ইউরোপের স্পেন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ আরব শক্তির পদানত হয়।

ভারতবর্ষের ধনসম্পত্তিও তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে (৭১১ খৃঃ) আরবীয়দের প্রথম ভারত অভিযান হলেও এদেশে রাজ্যস্থাপন করতে কয়েক শতাব্দী লেগেছিল (১১৯২ খৃঃ)।

গজনীর সুলতান মামুদ ১০২৬ খৃষ্টাব্দে সোমনাথ আক্রমণ করেন। মুসলমান লেখকদের মতে হিন্দুরা খুব সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও পরাজিত হন এবং বহুকালের দেবমন্দির ধ্বংস ও লুণ্ঠিত হয়। হিন্দুরা এই অবমাননার প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করেন এবং মামুদকে অতিকষ্টে প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়। এমন কি লুণ্ঠিত ধনসম্পত্তিও বিশেষ কিছু গজনী অবধি পৌছায়নি।

এইভাবে মন্দির ধ্বংস হলেও অনহিলওয়ারার চালুক্য রাজারা এই মন্দির আবার নির্মাণ করেন। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবার ঐতিহাসিক জয়নুল আকবর লিখেছেন: 'হিন্দুস্থানের সমুদ্রতীরে একটি বিরাট শহর আছে। তাহার নাম সোমনাথ। মুসলমানের মক্কার মতই এই স্থান হিন্দুদের পরম পুণ্যক্ষেত্র।'

দ্বাদশ শতাব্দীতে (১১১৪ খৃঃ) ভব বৃহস্পতি নামে একজন প্রসিদ্ধ শৈব সাধুর বিশেষ আগ্রহে সম্রাট কুমার পাল এই মন্দির সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে ঢেলে তৈরী করান। এটি দেখতে যেন কৈলাস-শিখরের মতন! তাই এর নূতন নাম হয় 'মেরু প্রাসাদ'! বলতে গেলে শুধু মন্দির নয়, সম্পূর্ণ শহরটি সম্রাটের চেষ্টায় নূতন রূপ পরিগ্রহ করে।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে (১২৯৬) আলাউদ্দিন খিলজি দিল্লীর সম্রাট হবার পরেই গুজরাটের দিকে অভিযান করেন। তাঁর আক্রমণ প্রতিরোধ করার সহস্র চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং মন্দির ধ্বংস ত হয়ই, তার ভগ্নাংশগুলিরও অনেক দিল্লী চলে যায়। এর কিছু পরেই জুনাগড়ের রাজা মহীপাল চুড়সম মন্দির মেরামত করেন এবং তাঁর ছেলে নগর আবার শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজ্য কাল ১৩২৫-৫১ খৃঃ।

১৪৬৯ খৃঃ মাহ্‌মুদ বেগ মন্দির থেকে শিবলিঙ্গ সরিয়ে এটিকে একটি মসজিদে পরিণত করলেও এ প্রচেষ্টা বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ১৫০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি মন্দির আবার নূতন করে মাথা তোলে।

সম্রাট আকবরের সময়ে জুনাগড় দুর্গ মোগল অধিকারে আসে (১৫৭৭ খৃঃ)। কিন্তু এ সময়ে সোমনাথ মন্দিরে কোন উপদ্রব হয়নি। অবশ্য এই সময় থেকে সুরাট বন্দরের ক্রমোন্নতি; ফলে প্রভাসের গরিমা ক্রমশঃ কমতে থাকে। ঔরঙ্গজেবের আমলে (১৬৬৯ খৃঃ) গুজরাটের মোগল সুবেদারকে এই মন্দির ধ্বংস করার হুকুম দেওয়া হলেও এটি কাজে পরিণত হয়নি। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট স্বয়ং অভিযান চালান এবং সোমনাথ একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ইন্দোরের রানী প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যা বাঈ, পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে শিবপ্রতিষ্ঠার অসুবিধা দেখে, এখান থেকে খানিক দূরে একটি নূতন মন্দির গড়িয়ে সেখানে লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা ও নিয়মিত সেবা-পূজোর ব্যবস্থা করেন। বাইরের ধাক্কা প্রভৃতি থেকে বাঁচাবার জন্য মন্দিরের তলায় একটি গুহায় লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা হয়। অদ্যাপি সেখানে নিয়মিত সেবাপূজো চলে আসছে। এই মন্দিরের অভ্যন্তরের জমাট আধ্যাত্মিক ভাব যাত্রী মাত্রেরই মনে গভীর রেখাপাত করে। 67898

১৮০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি বরোদার গাইকোয়াড়ের তত্ত্বাবধানে সমগ্র সৌরাষ্ট্রদেশ চলে আসে। কিন্তু ততক্ষণে 'ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিবিড় নিশীথে' দিল্লী-রাজশালা স্তব্ধ ও মোগল-মহিমার শ্মশানশয্যা হয়ে গেছে এবং 'বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে' রূপায়িত হয়ে ভারতের সর্বত্রই অধিকার বিস্তার করতে থাকে। মারাঠা ও রাজপুত রাজারাও আস্তে আস্তে বৃটিশের বশ্যতা স্বীকার করে কালে পূর্ব গৌরবের কঙ্কালে পরিণত হল।

মহাকালের খেলা চলতে থাকে। তারই অপ্রতিহত প্রভাবে জল-স্থল-অন্তরীক্ষে দোর্দণ্ড প্রতাপী বৃটিশরাজকে ভারতবর্ষ ছেড়ে যেতে হয়। (আগষ্ট ১৫, ১৯৪৭)

ভারতের লৌহ-মানব সর্দার প্যাটেল কথা বলেন কম; কিন্তু কাজ করেন তার শতগুণ। তাঁরই অদম্য উৎসাহে, সেই পুরাতন ভগ্নস্তূপের মধ্যে আবার সোমনাথের মন্দির সম্পূর্ণ নূতন করে নির্মিত হয়। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে নওয়ানগরের জামসাহেব এর ভিত্তি স্থাপন করেন। সম্বৎসরের মধ্যে আরব্ধ কাজ সমাধা হয় এবং ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ১১ই মে স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ নূতন মন্দিরে জ্যোতির্লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন।

সোমনাথ বা প্রভাসপত্তনের কথা অতি সংক্ষেপেই বলা হল। এই সামান্য প্রবন্ধের মধ্যে এর বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। ভারতের উপাস্য দেবতা 'উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর'। কার সাধ্য ভারত-ভারতীর এই প্রাণের দেবতাকে তার অন্তর থেকে তাড়াবে? তিনি যে 'সদা বসন্তং হৃদয়ারবিন্দে'। ধর্মপ্রাণ ভারত-বাসীর ইষ্টনিষ্ঠার এটি প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। যতকাল ভারতবর্ষ থাকবে, ততকাল এখানে শিবের ডমরু, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী ও মা কালীর পাঁঠা চলবেই। এই আপ্তবাণী ত বাজে কথা নয়!

মৃত্যুঞ্জয় মহাকাল শিবের রাতুল চরণে অনন্ত কোটি প্রণাম। তাঁর ললাটস্থ চন্দ্রের প্রভায় সকলের হৃদয়-মন্দির আলোকিত হোক। সকলের শুভ হোক, সকলে মানুষ হোক, এই প্রার্থনা:

'তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশোঽসি মহেশ্বর।
যাদৃশোঽসি মহাদেব তাদৃশায় নমো নমঃ॥
সৌরাষ্ট্রদেশে বিশদেঽতি রম্যে
জ্যোতির্ময়ং চন্দ্রকলাবতংসম্।
ভক্তিপ্রদানায় কৃপাবতীর্ণং
তং সোমনাথং শরণং প্রপদ্যে॥

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

(বলরামবাবুকে লিখিত)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

বৃন্দাবনধাম

(১৪ই ফাল্গুন, ১২৯৬)

নমস্কারনিবেদনঞ্চ বিশেষ

আপনার পোষ্টকার্ড ও পত্র যথাসময়ে পাইয়া বিস্তারিত সকল অবগত হইলাম। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী বোধ হয় এতদিন কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন। যদ্যপি আসিয়া থাকেন, আমার সংখ্যাতীত প্রণাম তাঁহার চরণে জানাইবেন। সুরেশবাবুর উদরের পীড়া শুনিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলাম ; শ্রীশ্রী৺জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন সত্বর তিনি আরোগ্য হইয়া যান। হৃষীকেশে উপস্থিত সকলে ভাল আছে জানিতে পারিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। নরেন কি এখন কিছুদিন গাজিপুরে থাকিবেক ? পাহাড়ীবাবাকে তাহার উত্তম বোধ হইয়াছে ; তিনি উত্তম লোক, আমাদের পূর্বে শুনা ছিল। নরেনের সহিত কিরূপ কথাবার্তা হয়, যদ্যপি কিছু শুনিয়া থাকেন, অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন। সুবোধ (খোকা) রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড প্রভৃতি দর্শন করিয়া সত্বর পদব্রজে হরিদ্বার যাইবে, এইরূপ বলিতেছে। আমি হাঁটিয়া বোধ হয় এত পথ যাইতে পারিব না, সুতরাং এবার যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল। শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে মহোৎসব এবার দক্ষিণেশ্বরে কি প্রকার হইল, অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন। এখানে এবার এ পর্যন্ত বৃষ্টি নাই, শীত খুব কম পড়িয়াছে। এখানে ২৪ প্রহরির ধুম মধ্যে মধ্যে খুব দেখা যাইতেছে। কীর্তনাদি খুব হইয়া থাকে। নিত্যানন্দ-বংশের একটী, তাঁহার নাম নিমাইচরণ গোস্বামী, এখানে আসিয়া আছেন। তাঁহার কীর্তনাদি প্রায় এখানে হইয়া থাকে, লোকটি অত্যন্ত প্রেমিক ও উত্তম কীর্তন করিতে পারেন। তাঁহার সহিত আলাপে আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজী এখানে প্রায় ২।৩ মাস আসিয়া আছেন। তিনি গোপীনাথের বাগের মধ্যে থাকেন। এস্থান তাঁহার বড় উত্তম বোধ হইতেছে। এখানকার ভাবে এবার তিনি খুব মিশিয়াছেন, তিলক-মালা ধারণ করিয়াছেন ও বৈষ্ণবদিগের সঙ্গে সর্বদা কীর্তনাদি করিয়া থাকেন। আমাদের সঙ্গে মধ্যে ২ প্রায় দেখা হয় ; তাঁহার এখন কিছুকাল বৃন্দাবনধামে বাস করিবার ইচ্ছা—এইরূপ বলেন। শ্রীযুত কৃষ্ণচৈতন্য দাস বাবাজীর সঙ্গে প্রায় দেখা হয় ; তাঁহার সহিত আলাপে অত্যন্ত সুখ বোধ হয়। তিনি শারীরিক ভাল আছেন।

হরমোহনের যদ্যপি ছোট edition গীতা ছাপান হইয়া থাকে, অনুগ্রহ করিয়া ২।১ খানি পাঠাইয়া দিবেন ও বরাহনগর মঠ হইতে একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা (জপের জন্য) লইয়া সুবিধামতন পাঠাইয়া দিবেন। আপনাদের আত্মীয় ৺নবীনবাবুর কন্যা ও তাঁহার পুত্র এখানে সত্বর আসিবেন। তাঁহারা সংবাদ দিয়াছেন। যদি সুবিধা বিবেচনা করেন তাহা হইলে সেই সঙ্গে পাঠাইয়া দিবেন।

বাবুরামের শরীর যদ্যপি অসুস্থ থাকে তাহা হইলে পশ্চিমে যাইবার জন্য কেন এত ব্যস্ত হইতেছে? তাহাকে এখন পশ্চিমে আসিতে নিষেধ করিবেন। তবে যদ্যপি আপনার সহিত আসে তাহা হইলে ভাল, নচেৎ অসুস্থাবস্থায় একাকী কষ্ট পাইবে, কারণ তাহার শরীর বড় মজবুত নহে।

এখানকার শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের সেবা উত্তমরূপে চলিতেছে। কামদার ব্রজ-মোহন ঠাকুর বড় উত্তম লোক। বাস্তবিক এরূপ লোক এখানে থাকার উপযুক্ত। কাহাকেও উচ্চ কথা বলেন না, সকলে তাঁহার উপর খুব সন্তুষ্ট। আমি যতদূর দেখিতেছি, খুব উত্তম বলিয়া বোধ হইতেছে; সর্বদা ঠাকুরসেবা ইত্যাদি কার্যে নজর রাখিয়া থাকেন।

আপনার পত্রের ভাবে বোধ হইল যে আপনার এখন এখানে আসার কিছু ঠিক নাই। যাহা আপনার পক্ষে সুবিধা বিবেচনা করেন তাহা করিবেন। শ্রীশ্রী৺জগদীশ্বরের ইচ্ছায় শরার আরোগ্য হইয়া গেলেই উত্তম।

আপনি কেমন থাকেন মধ্যে ২ পত্র দিবেন। বরাহনগরে সকলকে আমাদের প্রণাম জানাইবেন। শ্রীযুত গিরিশবাবু, অতুলবাবু, সুরেশবাবু, মাষ্টার মহাশয় ও চুনীবাবুকে আমার প্রণাম জানাইবেন এবং আপনি আমার প্রণাম জানিবেন। ফকির কি এবার পরীক্ষা দিয়াছে? উপস্থিত একপ্রকার সকল মঙ্গল। ইতি নিবেদন—তারিখ ১৪ই ফাল্গুন।

নিঃ শ্রীরাখাল

দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়ায় স্বামীজী

ব্রহ্মচারিণী উষা

[অনুবাদক—শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়]

(পূর্বানুবৃত্তি)

[স্বামীজীর দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়ায় অবস্থানকালে যারা তাঁর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, যাদের তিনি তাঁর কাজের সহায়করূপে বেছে নিয়েছিলেন এবং যাদের জীবন তিনি রূপান্তরিত করে দিয়েছিলেন, এরূপ তিনজনকে নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব। তন্মধ্যে শান্তি একজন। ··· তারপর ছিল সিস্টার ···]

আর একজন ছিল জো। সে অবশ্য লসএঞ্জেলেসে আসার বহু পূর্ব থেকেই স্বামীজীকে জানত। কিন্তু তার নাম এখানে উল্লেখ করার কারণ দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়ার সঙ্গে তার সংস্রব ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসে স্বামীজী ওকল্যাণ্ডে চলে যাবার পরেও শেষ হয় নাই। পরবর্তী সময়ে সে প্রায়ই হলিউড বেদান্ত-সমিতিতে আসত। এই সব সময়ে তার আলাপের প্রিয় বিষয়বস্তু ছিল স্বামীজী। সে প্রায়ই বলত যে, সে নিজেকে স্বামীজীর শিষ্য ব'লে ভাবে না। সে বলত, 'আমি তাঁর বন্ধু' আর বলত, 'তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পর আমি আর পূর্বের মানুষ ছিলাম না।' রামকৃষ্ণ মঠের প্রগতি এবং মিশনের কাজের সঙ্গে জো সম্পূর্ণ অভিন্নভাবে মিশে গিয়েছিল। স্বামীজীর দেহত্যাগের পর জো বহুবার ভারতে গিয়েছিল। অন্যদিকে, তার সাহায্যে স্বামীজীর বহু লেখা প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিল এবং পাশ্চাত্যের শিষ্যদের জন্য বেলুড় মঠে একটি অতিথিশালা প্রস্তুত হয়েছিল। শেষবার যখন জো বেদান্ত-সমিতির হলিউড কেন্দ্রে ফিরে আসে তখন সে ৯০ বৎসরের বৃদ্ধা। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের হেমন্তকালে, সিস্টারের মৃত্যুর তিন মাস পরে, বেদান্ত-সমিতির হলিউড কেন্দ্রে সে দেহত্যাগ করে।

স্বামীজীর দেহত্যাগের কিছুকাল পরে বেলুড় মঠের অতিথিশালা থেকে জো একটি তারিখশূন্য অসম্পূর্ণ পত্র লেখে; তার টাইপ-করা প্রতিলিপি আছে; এতে সে স্বহস্তে লিখে ইচ্ছা প্রকাশ করে গেছে যে এটি যেন রক্ষিত হয়। এই পত্রে জো তার জীবনের উপর স্বামীজীর প্রভাব বর্ণনা করেছে:

"স্বামীজীর যে গুণটি আমাকে আকৃষ্ট করেছিল, তা হচ্ছে তাঁর সীমাহীনতা; আমি কখনও তার তল বা উর্ধ্ব বা পার্শ্বদেশ স্পর্শ করতে সক্ষম হই নাই। আমার মনে হয় নিবেদিতারও আকর্ষণের কারণ এইটাই—তাঁর বিস্ময়কর বিস্তৃতি। আহা, এরূপ প্রকৃতি মানুষকে কী মুক্তস্বভাবই না করে তোলে! (এরূপ প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে) নিজের ওপর যে প্রতিক্রিয়া হয়, আসলে সেইটাই হল সব; তাই নয় কি? যা পাওয়ার, এ থেকেই তা পাওয়া যায়।

তুমি জিজ্ঞাসা করেছ, চরম সত্যকে আমি স্থিরবিশ্বাসে নিশ্চিত ভাবে আঁকড়ে ধরতে পেরেছি কি না। হাঁ, পাকা করেই ধরেছি। মনে হয় উহা আমার সত্তার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে মিশে গেছে। স্বামীজীর মধ্যে যে সত্য প্রত্যক্ষ করেছি, তাই আমাকে মুক্তি দিয়েছে। লোকের দোষকে কত তুচ্ছ জিনিস বলে মনে হয়—ক্রীড়া-

ক্ষেত্র রূপে সামনে যখন সত্যের পারাবার বিস্তৃত রয়েছে, ওসব তুচ্ছ কথা আর মনে করা কেন? স্বামীজী আমাকে মুক্তি দিতে এসেছিলেন; নিবেদিতাকে তিনি যেমন ত্যাগ দিয়েছিলেন, মিসেস এস.-কে যেমন একত্ব দিয়েছিলেন, তেমনি আমাকে দিয়েছিলেন স্বাধীনতা; এ সবই ছিল তাঁর জীবনোদ্দেশ্যের অংশবিশেষ। ভারতের আধ্যাত্মিক উপহার হিসাবে তাঁর মহত্ত্ব কিন্তু ত্যাগের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত; তাই ভারতীয় এবং ভারতের জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ (নিবেদিতা) কর্মীরা বলত, "দিবারাত্র আমার কর্ণকুহরে কেবলমাত্র একটি কথাকেই অনুরণিত হতে শুনতে পাচ্ছি—'ত্যাগের কথা স্মরণ রেখো'।"…আমার ত্যাগ নেই, কিন্তু স্বাধীনতা আছে। ভারতকে উন্নত হতে দেখা ও উন্নতির পথে তাকে সহায়তা করার স্বাধীনতা আমার আছে—সেইটাই আমার কাজ, এবং সে কাজটি আমি কত ভালবাসি! জ্বলন্ত পাবকতুল্য আদর্শবাদীদের নিয়ে গঠিত এই সঙ্ঘটি গাছপালা পুড়িয়ে 'জীবন'-নামক অরণ্য থেকে বেরিয়ে আসার নতুন নতুন পথ প্রস্তুত করছে—এসব দেখতে (কত ভালবাসি আমি!)…।

স্বামীজী হচ্ছেন আমাদের একটি সুদৃঢ় শৈলসদৃশ আশ্রয় এটা আমি অনুভব করি। আমার জীবনে এই প্রয়োজনই তিনি সিদ্ধ করেছেন—পূজা নয়, গৌরব নয়, কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার সময় পায়ের নীচে অবলম্বন-ভূমির অটলতা! যাক, শেষ পর্যন্ত আমি স্বাধীন হয়েছি। মুক্তির বোধ মনে কী বিস্ময়ই না জাগায়!—আমার বৈশিষ্ট্যগুলির প্রয়োজন এখন আর পাশ্চাত্যে নেই, আছে ভারতে।… অতিথিশালায় উপরের দুখানি নতুন ঘর নিয়ে এই বিশাল নদীতীরের নিস্তব্ধতায় স্থানের প্রাচুর্য ও বিপুল বিলাসিতার মধ্যে বাস করছি। কোথাও এত বিলাসিতার কথা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল! জায়গা প্রচুর রয়েছে—কোন আসবাব নেই যার যত্ন নিতে হবে, একরাশ কম্বল, ছবি, ডিস—এসব নেই, আছে শুধু এক সেট চায়ের সরঞ্জাম। জিনিসপত্রের সে ঠোকা-ঠুকি চলে গেছে। কাজ করবার মত, যত্ন নেবার মত কিছুই আর নেই—সবই হাওয়ায় মিলে গেছে! তবু আমি একা নই! (ওটা আমি সহ্যই করতে পারি না)। দেহত্যাগ না করেও স্বর্গের সন্ধান পাওয়া যায়।

আমি দেখছি—আর এসব কেনই বা? এটাই আশ্চর্য!

'সামান্য বুদ্ধি দিয়ে আমাদের বোকা বানিয়ে রাখা হচ্ছে, কিন্তু এবারে আর আমাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন দেখতে পাবে না। বুদ্ধির সীমানার ওপারের দু-একটি জিনিস আমি খুঁজে পেয়েছি—তা হচ্ছে প্রেম'—একথা স্বামীজী মিসেস লেগেটকে লিখেছিলেন; তাঁদের উভয়েরই মঙ্গল হোক।"

১৯০০ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুআরি মাসে যেদিন স্বামীজী মীডদের গৃহ ত্যাগ করে উত্তর ক্যালিফর্ণিয়ায় যান, সেদিন তিনি সিস্টারের অগ্নিকুণ্ডের কাছে তাকের উপর তাঁর পাইপটি রেখে বলেছিলেন, 'এই গৃহ এই অবস্থায় থাকবে না।' ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়া বেদান্ত-সমিতির একজন সভ্যের বদান্যতায় সম্পত্তিটি উক্ত সমিতির অধিকারভুক্ত হয়েছে। পরবর্তী বৎসরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের স্বামী মাধবানন্দ (১৯৬২ খৃষ্টাব্দে সংঘাধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত হন) এবং স্বামী নির্বাণানন্দ—রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের এই দুইজন ট্রাষ্টীর উপস্থিতিতে গৃহটিকে একটি মন্দিররূপে উৎসর্গ করা হয়।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে বাড়ীটির বহির্ভাগ যে কিছু কিছু পরিবর্তিত হয়েছে, তা শতাব্দীর পরিবর্তনকালে যে ছবি তোলা হয়েছে, তা থেকেই বোঝা যায়। মেজে ও ভিতরের ছাদ মোটামুটি একই রকম আছে। ভিতরটা স্বামীজীর সমকালীন শেষদিকের ভিক্টোরিয়ান পদ্ধতিতে পুনরায় সাজানো হয়েছে। অগ্নিকুণ্ডটি—যেখানে তিনি তাঁর 'পাইপটি' রেখেছিলেন—একটি দেয়ালের পশ্চাতে আবিষ্কৃত হয়েছে; তা আবার আগের মতই করা হয়েছে; মীডেরা বাস করার সময়ই ঐ দেয়াল তোলা হয়েছিল। সিস্টার পাইপটিকে বহু বৎসর নিজের কাছে রেখেছিল; পরে স্বামী প্রভবানন্দের নিকট গচ্ছিত করে দেয়। এখন হলিউডে অন্যান্য স্মৃতিচিহ্নের সঙ্গে ওটিও রক্ষিত আছে। যে টেবিলটিতে স্বামীজী ভগ্নীদের সঙ্গে বসতেন, সেটি পুনরায় ভোজনাগারে রাখা হয়েছে। স্বামীজী যেখানে শয়ন করতেন, উপর তলের সেই কক্ষটিকে ঠাকুরঘর করা হয়েছে। যে বাগানটিতে তিনি বসে থাকতে ভালবাসতেন, সেটিও আবার সযত্নে রক্ষিত হচ্ছে।

১৯৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর প্রাক্কালে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, স্বামীজীর দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়ায় আগমনের প্রভাব স্থায়ী হয়েছে। তাঁর বক্তৃতা ও পত্রাবলীতে শক্তি বিধৃত রয়েছে; সেগুলি পড়লে মনে হয়, এই সামনে বসে এখনই যেন তিনি কথাগুলি বলছেন! সিস্টার ও জো-র ন্যায় ভক্ত, যারা স্বামীজীকে ভালবাসত, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর কাজে যন্ত্রস্বরূপ হয়ে সেবারত ছিল; এবং আমাদের সমসাময়িকেরাও এই সব ভক্তদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে তাঁর সঙ্গে একটি সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। শেষ কথা, মীড-ভগ্নীদের গৃহে স্বামীজীর উপস্থিতির প্রভাব এখনো বজায় আছে; সেখানে গেলে সূক্ষ্ম কিন্তু নিশ্চিতভাবে তাঁর উপস্থিতি অনুভব করতেই হবে।

দক্ষিণ পাসাডেনা ৩০৯ নং মণ্টেরে রোডের পুরাতন ধরনের বাড়িটি একদল লোকের কাছে একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে; আর এই দলটি ক্রমে ভারী হচ্ছে। যাঁর স্পর্শে এই গৃহ ধন্য হয়েছে, যিনি তেজোদীপ্ত ও প্রাণবন্ত ভঙ্গীতে ধর্মনিহিত সত্যকে প্রচার করে তাদের হৃদয় জয় করেছেন, সেই অদ্বিতীয় দেবমানব স্বামীজীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য তারা এখানে সমবেত হয়। এই পাশ্চাত্য ভক্তমণ্ডলীর কাছে স্বামী বিবেকানন্দ হলেন তাদের সঙ্গে রামকৃষ্ণ-বেদান্তের সংযোগ-সেতু।

"একটি মন হইতে অপর মনে আধ্যাত্মিক তেজ সংক্রামিত করা যায়। যিনি দেন, তিনি গুরু; যে গ্রহণ করে, সে শিষ্য। এইভাবেই পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক শক্তি বিকীর্ণ হয়।"

"যে যত আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত, সে তত সাধু। ভগবানের শুদ্ধসত্তার অনুভবের নামই উপাসনা।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

'স্বামিশিষ্য-সংবাদ'-প্রণেতা শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

'নচিকেতা'

সাধুসঙ্গ ও তৎপ্রসূত প্রেম সাধারণ জীবকেও অসাধারণ করে তোলে। আচার্য শঙ্কর বলেছেন, ক্ষণকালের জন্য হলেও সাধুসঙ্গলাভে ভবসাগর পার হওয়া যায়।

আচার্য শঙ্কর-কথিত ক্ষণকাল সাধুসঙ্গলাভে সাধারণ এক গৃহীর আচ্ছন্ন প্রতিভা এবং মোহ-মুগ্ধ মন তদীয় শ্রীগুরুর অমোঘ আশীর্বাদ ও অপূর্ব প্রেমস্পর্শে পরিণামে কিরূপ প্রতিভাত ও পরিবর্তিত হয়েছিল, বর্তমান প্রবন্ধে তারই কথঞ্চিৎ আলোচনা করা হচ্ছে।

'স্বামিশিষ্য-সংবাদ'-প্রণেতা ৺শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের গুরু যতিশ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দের কৃপা ও সঙ্গলাভ মাত্র পাঁচ কি ছয় বৎসরের অধিক হয় নাই (১৮৯৭-১৯০২), যদিও তৎপূর্বে তিনি কিছুদিন সাধু নাগমহাশয়ের সঙ্গলাভে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিলেন। এই অত্যল্পকাল মধ্যেই শ্রীগুরুর প্রেমস্পর্শে তাঁর অধীতবেদবিদ্যা, শাস্ত্রীয় বিচারের প্রতিভা এবং তত্ত্বানুসন্ধিৎসা কিরূপ ভাবে প্রকটিত হল, স্বামিশিষ্য-সংবাদের বিষয়বস্তু তার সম্যক নিদর্শন। কথাপ্রসঙ্গে ধর্ম, সমাজ ও জাতীয় সমস্যা এবং তার সমাধান সম্বন্ধে স্বামীজী হৃদয়-গ্রাহী ভাষায় যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তা যথাযথ লিপিবদ্ধ হয়েছে—উক্ত 'স্বামিশিষ্য-সংবাদে'। শরৎবাবু সাধারণ গৃহস্থঘরে জন্মিলেও সাধু নাগমহাশয়, স্বামীজী ও তাঁর শিবতুল্য গুরুভ্রাতাদের সংস্পর্শে এসে তিনি অশেষ গুণের অধিকারী হয়েছিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ ও ভক্তগণের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও অমায়িক ব্যবহার সর্বজনবিদিত ও আদর্শস্থানীয় ছিল। সৌভাগ্যবশতঃ সাধুদের সস্নেহ সঙ্গলাভের সুযোগে শরৎবাবু প্রকৃতই নবজীবন লাভ করেছিলেন।

বাংলা ১২৭৪ সালের মাঘমাসে (ইংরেজী ১৮৬৮, জানুআরি) কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে ফরিদপুর জেলায় মাদারীপুর মহকুমার কুড়াশী গ্রামে শরৎবাবু এক নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ-গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা—৺রামকমল দেবশর্মা (চক্রবর্তী) ছিলেন—যাজক ব্রাহ্মণ এবং তাঁর তিন কনিষ্ঠ সহোদর* দেশান্তরে কর্মরত থাকায় তিনি তাঁদের যৌথ পরিবার রক্ষাকল্পে দেশের বাড়ীতেই অবস্থান করতেন। তখনকার যৌথপরিবার বর্তমান যুগে স্বপ্নাতীত! সংসারের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না থাকলেও ভাইদের মধ্যে পারস্পরিক স্নেহবন্ধন ও বিশ্বাস অতুলনীয় ছিল এবং সেজন্যই অল্প আয় সত্ত্বেও ঐ সংসারে বারোমাস পূজা-পার্বণাদি যথারীতি পালিত হত। সদ্‌গুণ ও সত্যনিষ্ঠার দরুন রামকমল তাঁর কনিষ্ঠদের নিকট পিতৃতুল্য শ্রদ্ধা পেতেন।

নিজবাটীর ৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্বকোণে ছয়গাঁ নামক গ্রামে ৺তারাকান্ত ভট্টাচার্য (পাঠক) মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্গীয়া বিধুমুখী দেবীর সহিত রামকমলের বিবাহ হয়। বিধুমুখী অতীব সরল, সত্যনিষ্ঠ ও ধর্মপ্রাণা ছিলেন এবং সে কালের তুলনায় তাঁকে বিদুষী বলা চলে। অবসর সময়ে তিনি কখনও অলসতার প্রশ্রয় না

---

*(১) নীলকমল চক্রবর্তী—জমিদারী সেরেস্তার নায়েব।
(২) কালীকমল চক্রবর্তী—স্কুলশিক্ষক
(৩) শশীকমল চক্রবর্তী—ধামরাই স্কুলের শিক্ষক।

দিয়ে পঠন-পাঠনে সবিশেষ আনন্দ পেতেন। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী ও ভাগবতাদি তাঁহার নিত্যপাঠ্য ছিল। তাঁর সৎশিক্ষা এবং সদ্‌গুণেই বোধহয়, তাঁর দুইপুত্র—শরৎ ও রমেশ পরিণত বয়সে সমধিক যশস্বী হয়েছিলেন। স্বামী-বিয়োগের পর বিধুমুখী সুদীর্ঘ ১৪ বৎসর কাল ৺কাশীবাসী ছিলেন এবং ঐ পুণ্যস্থানেই দেহত্যাগ করেন।

পিতা রামকমলের সংসারে শরৎবাবু প্রথম পুত্রসন্তান বলে শিশুকাল থেকেই তিনি বিশেষ আদুরে ছিলেন। খুল্লতাতদের আদরযত্নে তাঁর গায়ে কাঁটার আঁচড়টি লাগবারও জো ছিল না। ছোটকাকা ৺শশীকমলের শিক্ষকতার স্থান ছিল ধামরাই, ঢাকাজেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমায়। শরৎবাবুর বিদ্যারম্ভ সেখানেই হয়। তিনি যে ছেলেবেলা থেকেই মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন, তথনকার এণ্ট্রান্স (প্রবেশিকা) পরীক্ষায় মাসিক ১০৲ টাকা বৃত্তি-প্রাপ্তিই তার সম্যক পরিচয়। কবিত্ব-শক্তির পরিচয়ও তাঁর বাল্যকাল হতেই পাওয়া যায়। প্রবেশিকা-পরীক্ষার সমসাময়িক কালে তিনি "কাব্য-কুসুমাঞ্জলি" নামে একখানা কবিতার বই রচনা ও প্রকাশ করেন। সেই পুস্তক সুপাঠ্য মনে করে দেশস্থ পণ্ডিতসমাজ তাঁহাকে 'শরৎ-কবি' বলেই সম্বোধন করতেন। পরিণত বয়সে তাঁর কবিত্বশক্তি বাংলা বা সংস্কৃতে কতদূর অগ্রসর হয়েছিল, তার কিঞ্চিৎ আভাস যথাসময়ে দেওয়া হবে।

প্রবেশিকা পরীক্ষান্তে শরৎবাবু ঢাকা জগন্নাথ কলেজে তথনকার ফার্স্ট আর্টস্ পড়লেন এবং বি-এ পড়ার জন্য কলিকাতায় মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজে) ভর্তি হলেন। বিগত ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে শরৎবাবু উক্ত কলেজ হতে সংস্কৃতে অনার্সসহ বি-এ পাশ করলেন। সংস্কৃতে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তির পরিচয় শেষ জীবনে পাওয়া যাবে।

তখনকার দিনে অল্প বয়সেই বিবাহের প্রথা ছিল। প্রবেশিকা-পরীক্ষায় জলপানি পাওয়ার দরুন এবং খুল্লতাতদের আগ্রহাতিশয্যে ঢাকা জেলার ষোলঘরনিবাসী ৺মদনমোহন বারুড়ীর জ্যেষ্ঠাকন্যা মোক্ষদায়িনী দেবীর সহিত শরৎবাবুর বিবাহ হল। মদনবাবু তখন ফরিদপুর জেলার সুন্দীপ মুন্‌সিপির খ্যাতনামা উকিল ছিলেন এবং বিশেষ অবস্থাপন্নও ছিলেন।

ঢাকা জগন্নাথ কলেজে পাঠকালীন শরৎবাবু নারায়ণগঞ্জের নিকট দেওভোগনিবাসী পূজ্যপাদ সাধু নাগমহাশয়ের (৺দুর্গাচরণ নাগ) সান্নিধ্য লাভ করেন; তাঁর সংস্পর্শে এসে তাঁর ভাবপ্রবণ মন সবিশেষ উদ্বেলিত হল। সাধু নাগমহাশয়ের জীবন কতখানি উন্নত ছিল, তাহা পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিই জাজ্বল্য প্রমাণ। বলেছেন, "পৃথিবীর বহুস্থান ভ্রমণ করলাম, নাগমহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখলাম না।" এই নাগমহাশয়ের দেবচরিত্রই শরৎবাবুর ধর্মজীবনের প্রথম পথপ্রদর্শক। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে প্রাথমিক সংবাদাদি তিনি সাধু নাগমহাশয়ের নিকটই অবগত হন

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন যে, মেজেণ্টারের ঘরে ঢুকলে গায়ে রঙ ধরে। উদাসীন নাগমহাশয়ের সান্নিধ্যলাভে পাছে শরৎবাবুও সংসারে উদাসীন হয়ে পড়েন, এই আশঙ্কা তাঁর অভিভাবক ও আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে প্রবলতর হল। শরৎবাবুর রচিত 'সাধু নাগমহাশয়ের জীবনী'তে একস্থানে তিনি লিখেছেন: আমার শ্বশুর শ্রীযুক্ত মদনমোহন বারুড়ী মহাশয় লোক-পরম্পরায় শুনতে পান যে, নাগমহাশয়ের সংস্রবে এসে তাঁর জামাতা শরৎবাবু লেখাপড়ায় ও

সাধারণ সংসারধর্মে আস্থাহীন হয়ে পড়ছেন। প্রকৃত অবস্থা কি জানবার জন্য মদনবাবু একদিন দেওভোগে এসে উপস্থিত হলেন। নাগমহাশয়কে দেখে তাঁর সকল উদ্বেগ দূর হল। সাধুজীর আদরযত্নে ও সরল অমায়িক ব্যবহারে পরমপ্রীত হয়ে মদনবাবু বলেছিলেন, "জামাতা যখন এমন মহাপুরুষের কাছে যাতায়াত করেন তখন তাঁর ভয় বা চিন্তার কারণ কিছুই নাই।" পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, সাধু নাগমহাশয়ের কৃপাচ্ছত্রতলে এসেই শরৎবাবুর ধর্মজীবনের সূচনা হল। উদাসীন সাধুর নিয়ত সঙ্গলাভে সাংসারিক বিষয়ে তিনিও খানিকটা উদাসীনই হয়ে পড়লেন এবং সেজন্য কর্মজীবনে তেমন সিদ্ধমনোরথ হতে পারেননি।

অভিভাবকদের ইচ্ছানুযায়ী বি-এ পাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট পদের জন্য পরীক্ষা দিতে হয়। অন্যান্য বিষয়ে উত্তীর্ণ হলেও ঘোড়দৌড় পরীক্ষায় তিনি আহত হন। তিনি আর এই পরীক্ষা দেবার চেষ্টা করেননি। কিছুকাল রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের 'প্রাইভেট্ টিউটারে'র কাজ করার পর তিনি ডাকবিভাগে চাকুরি গ্রহণ করেন এবং ঐ বিভাগে সুদীর্ঘকাল কাজ করে কটকের (উড়িষ্যা) পোস্টমাষ্টার থাকাকালে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। চাকুরিজীবনে তাঁর তেমন কোনও উন্নতি কোন দিনই হয়নি। তার প্রধান কারণ—তাঁর স্বাধীন সত্তা। তিনি উপরিওয়ালার খোসামোদ তোষামোদাদি আদৌ করেননি, বরং অন্যায় অবিচার দেখলে বাক্‌-সংযম করতেও জানতেন না। শরৎবাবুর প্রধান গুণ ছিল—প্রসন্নচিত্ততা! তিনি তাঁর সামান্য আয়েও সদানন্দেই জীবন কাটিয়েছেন।

অফিসে কাজ করবার সময় থেকেই দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি সুললিত সংস্কৃত স্তব রচনা করে ছাপিয়ে শরৎবাবু বিতরণ করতেন। বোধ হয় আফিসে কাজ করার সময় থেকেই এটি শুরু হয়। শোনা যায়, এর কয়েকটি কপি জগৎপূজ্য স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তৃতীয় স্তবের কতকাংশ স্বামীজীর বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়, যেখানে তিনি লিখেছেন—

বিরম বিরম বন্ধো! যোগকর্মান্তবন্ধাৎ
ভজ ভজ হৃদিপদ্মে রামকৃষ্ণস্য মূর্তিম্।
সুবিহিতমসিধাতৈঃ ছিন্ধি সংসারপাশান্
স ইহ তব বিমুক্তেঃ কারণং নান্যদস্তি॥

অনুসর শ্রুতিশীর্ষজ্ঞানবৈরাগ্যমার্গম্
সুখময়পরতত্ত্বে তিষ্ঠ ভো সঙ্গশূন্যে।
নিরবধি জপ বন্ধো! রামকৃষ্ণেতি মন্ত্রম্
অভীরভীরিতি নাদৈঃ পূর্যতাং দিঙ্‌মুখানি॥

প্রতি বৎসর ঈদৃশ স্তোত্র রচনাকারীর সংস্কৃত পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে স্বামীজী তাঁকে দেখবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে, প্রথমবার বিলেত থেকে আসার পর ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বাগবাজার রাজবল্লভপাড়ার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর তখনো আলাপ হয়নি। শরৎবাবুর জীবনে স্বামীজীর দর্শনলাভ এই প্রথম। স্বামী তুরীয়ানন্দ (হরি মহারাজ) তাঁকে স্বামীজীর নিকট নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন। স্বামীজী মঠে এসে তাঁর রচিত শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্র পাঠ করে ইতিপূর্বেই তাঁর বিষয় শুনেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তগরিষ্ঠ নাগমহাশয়ের কাছে যে তাঁর যাতায়াত আছে, স্বামীজী তা জেনেছিলেন। স্বামীজী শরৎবাবুকে সংস্কৃতে সম্ভাষণ করে নাগমহাশয়ের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন এবং তাঁর অমানুষিক ত্যাগ,

উদ্দাম ভগবদনুরাগ ও দীনতার বিষয় উল্লেখ করতে করতে বললেন, "বয়ং তত্ত্বান্বেষাৎ হতাঃ মধুকর ত্বং খলু কৃতী"। কথাগুলি নাগমহাশয়কে লিখে জানাতে তাঁকে আদেশ করলেন।

স্বামীজীর সংস্পর্শে আসার পর থেকে শরৎবাবু সরকারী কাজেও মনঃসংযাগ যথারীতি করতে পারেননি, সুতরাং তাঁর পদমর্যাদা ও আর্থিক উন্নতি—উভয় পথই রুদ্ধ ছিল। অধিকন্তু 'স্বামিশিষ্য-সংবাদ' প্রকাশিত হবার পর থেকে সরকারের কোপদৃষ্টিও তিনি এড়াতে পারেন নি। কিছুকাল সরকারের গুপ্ত গোয়েন্দারাও তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করতেন। এ অবস্থায় কর্মোন্নতি কারুর হয় কি? 'স্বামিশিষ্য-সংবাদ' মাসিকপত্র উদ্বোধনে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বহু যুবক ধর্ম, সমাজ ও জাতি বিষয়ক বহু সমস্যার সমাধানমানসে ঐ সব বিষয়ে স্বামীজীর মতামত জানবার জন্য শরৎবাবুর নিকট উপস্থিত হতেন। তখন বাংলাদেশ জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং যুবকদের মধ্যে একদল বিদেশী সরকারের মূলোৎপাটনে বদ্ধপরিকর। জনৈক ডাকবিভাগের কর্মচারীর নিকট উক্ত যুবকদলের সাময়িক আনাগোনাও সরকার মোটেই পছন্দ করলেন না। পরিণামে শরৎবাবুর কর্মজীবন যেন তেন প্রকারেণ চলতে লাগল। সাধারণ চাকুরিজীবী হলেও শরৎবাবুকে সেজন্য কেহই কোন দিন দুঃখ প্রকাশ করতে দেখেননি। ভগবৎকৃপায় তিনি আত্মতুষ্টই ছিলেন। কর্মজীবনে যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন, সকলেই একমুখে বলতেন, শরৎবাবুর অমায়িক ব্যবহার ও আতিথেয়তা খুবই হৃদয়গ্রাহী এবং চিরদিন মনে রাখার মত। কর্মব্যপদেশে তিনি যেখানে গিয়েছেন, তাঁর বহু বন্ধুবান্ধব, বিশেষতঃ ঠাকুরের ও স্বামীজীর ভক্তবৃন্দ প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে ভগবৎপ্রসঙ্গ শুনতেন। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে শ্রদ্ধাস্পদ কুমুদবন্ধু সেন শরৎবাবুর বাসায় বহুবার উপস্থিত থাকতেন। প্রথম জীবনে শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল এবং সুরেন্দ্রনাথ সেন শরৎবাবুর বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন

সরকারী কর্মে থাকাকালীন শরৎবাবুই বরিশালে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করেন এবং যখন তিনি গয়া, ঝরিয়া, পূর্ণিয়া, ডুমকা, ডেরেণ্ডা, রাঁচী, পুরুলিয়া ও কটকে ছিলেন, তখন প্রত্যহ সন্ধ্যার প্রাক্কালে তথায় ঠাকুর ও স্বামীজীর প্রসঙ্গাদি করতেন। ডেরেণ্ডাতে (রাঁচী) একটি শিববাড়ী ছিল। প্রতি রবিবার শরৎবাবু তথায় ঠাকুর ও স্বামীজী সম্বন্ধে প্রাণস্পর্শী ভাষণ দিতেন। তিনি যখন গয়ায় ছিলেন, তখন ৺শ্রীশ্রীবিষ্ণুপদ দর্শনমানসে অথবা অন্য কোন কারণে মঠের সাধুসন্ত অনেকেই তাঁর বাসাবাড়ীতে গিয়েছেন; এমন কি, করুণাময়ী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে নিয়ে স্বামী সারদানন্দ একবার সেখানে পদার্পণ করেছিলেন। ভাগ্যবান শরৎবাবুর বাসাবাড়ী পুণ্যভূমিতে পরিণত হয়েছিল।

কটকে থাকাকালীন স্থানীয় উকিল ৺জানকী নাথ বসু এবং তাঁর দুই পুত্র—ব্যারিস্টার শরৎচন্দ্র বসু ও সুভাষচন্দ্র বসু (জগদ্বরেণ্য নেতাজী) একাধিকবার শরৎবাবুর ডাকঘরের বাসাবাড়ীতে এসে দেখা করেন—ঠাকুর ও স্বামীজীর প্রসঙ্গাদি শোনবার জন্যই।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদের ১ম খণ্ডের ৬ষ্ঠ বল্লীতে উল্লিখিত আছে—১৩০৩ সালের ১৯শে বৈশাখ স্বামীজী শরৎবাবুকে আলমবাজার মঠে দীক্ষাদান করেন। স্বামীজী বলেছিলেন: যিনি এই সংসার-মায়ার পারে নিয়ে যান, যিনি কৃপা করে সমস্ত মানসিক আধিব্যাধি বিনষ্ট করেন, তিনিই যথার্থ

গুরু। শাস্ত্রে বলে—যাঁরা অধীতবেদ-বেদান্ত, যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ, যাঁরা অপরকে অভয়ের পারে নিতে সমর্থ, তাঁরাই যথার্থ গুরু। তাঁদের পেলেই দীক্ষিত হবে,—"নাত্র কার্য বিচারণা।"

১৩২০ সালে ফাল্গুন মাসে শরৎবাবু রচিত ঠাকুর ও স্বামীজী বিষয়ক স্তোত্রসম্ভার ও সঙ্গীতাদি এবং বহু শাক্ত ও বৈষ্ণব সঙ্গীত 'বাঙালের বাক্য ধর' কবিতা সহ "শ্রীরামকৃষ্ণাষ্ঠ-স্তবমালা" নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। ঝরিয়ায় থাকা-কালীন শরচ্চন্দ্র-রচিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পাঁচালী" জনৈক ভক্ত ৺মাখনলাল হোড় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পাঁচালী রাঁচীর ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে প্রায় নিত্যপাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হত। শরৎবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র উক্ত পাঁচালী কাশী সেবাশ্রমে সর্বপ্রথম বহু ভক্তসম্মেলনে সুরলয়সহ পাঠ করে ধন্য হন। ঐ উৎসবে পাঁচ শতাধিক ভক্তের সমাগম হয়েছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলার মূল ঘটনাগুলি অতীব সুন্দর ভাব ও ভাষায় পাঁচালী আকারে বর্ণিত আছে। ইহাতে অতি অল্প কথায় সুষ্ঠু ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনকথা বর্ণিত।

চাকুরির প্রথম অবস্থা হইতেই শরৎবাবুর অর্থকষ্ট ছিল। তবে কনিষ্ঠ সহোদর ধনার্জন করিয়াও অকৃতদার ছিলেন বলিয়া তাঁর শেষ জীবনে আর্থিক কষ্ট আর কোনদিনই ছিল না। ধনাঢ্য সহোদরের সহযোগিতায় তিনি দান করার সুযোগ পেয়েছিলেন। দেশের জনহিতকর কার্যে যথাসাধ্য সাহায্যদান এবং জাঁকজমকের সহিত শারদীয়া পূজাপার্বণের সময় দরিদ্রনারায়ণের সেবা ও তাহাদিগকে বস্ত্রবিতরণাদি বহু জনহিতকর কাজে শরৎবাবু যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন। স্বামীজীর অপার করুণা ও অমোঘ আশীর্বাদে শরৎবাবুর পাঁচটি ছেলে সকলেই উচ্চশিক্ষিত এবং স্বাবলম্বী। তাঁহার দুটি কন্যাও সৎপাত্রস্থা।

সরকারী চাকুরি হতে অবসরগ্রহণের পর কলিকাতায় থাকাকালীন শরচ্চন্দ্র-লিখিত পুরাতন কাগজের মধ্যে তাঁরই রচিত অসম্পূর্ণ একখানা "শ্রীশ্রীঠাকুরের নামামৃত" পাওয়া যায়, এবং অসম্পূর্ণ অংশ তাঁর দ্বারা লিখিয়ে তাঁর বড় নাতির নামে ১৩৪৬ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সঙ্কলিত "রামনাম সঙ্কীর্তনে"র মত ঠাকুর সম্বন্ধে "নামামৃত" লেখার জন্য পূজনীয় সারদানন্দ মহারাজ শরৎবাবুকে অনুরোধ জানাবার ফলেই "নামামৃত" সঙ্কলিত হয়। শরৎবাবুর একজন উচ্চশিক্ষিত নাতি বইখানা সঙ্কলন করেন। "নামামৃত"খানি বর্তমানে ৺কাশী সেবাশ্রম হতেই মুদ্রিত ও বিতরিত হয়।

বেলুড় মঠে থাকাকালীন এক সময় স্বামীজী শিষ্যের সংস্কৃতানুরাগ এবং অধীত বেদান্ত-বিদ্যায় পারদর্শিতার জন্যই যেন তাঁকে বেদান্তের একটি ভাষ্য লিখতে আদেশ করেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ ও অন্যান্য পণ্ডিত সাধুসন্তগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদেরই আগ্রহাতিশয্যে এবং শ্রীগুরুর আদেশে শরৎবাবু "বিবেকভাষ্য" নামে বেদান্তের একটি টীকা লিখতে প্রবৃত্ত হন। তাঁর লিখিত পাণ্ডুলিপি ক্রমে বৃহদাকার ধারণ করে এবং সপ্তমখণ্ডে প্রায় সহস্রাধিক 'ফুলস্কেপ' পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়। পাণ্ডুলিপিখানি স্বামী শুদ্ধানন্দ কর্তৃক আদ্যোপান্ত সংশোধিত এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ কর্তৃক অনুমোদিত।

শরৎবাবুর দেহান্তের পর পাণ্ডুলিপিটি তাঁর জন্মভূমির গৃহেই পড়েছিল বলে কতকাংশ কীট-দষ্ট হয়। সেই অবস্থায় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র পাণ্ডু-লিপিটি উদ্ধার করেছেন। দুঃখের বিষয়, পাণ্ডুলিপিটি এখনো মুদ্রিত করা সম্ভবপর হয়নি।

শরৎবাবু-রচিত "শ্রীরামকৃষ্ণাদ্যস্তবমালা" উচ্চ-শিক্ষিত ভক্তমণ্ডলীর নিকট খুবই আদরের ধন। তাঁর রচিত শ্রীগুরুসঙ্গীত—"মূর্তমহেশ্বরমুজ্জ্বল-ভাস্করমিষ্টমমরনরবন্দ্যম্", শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত—"তুমি ব্রহ্ম রামকৃষ্ণ, তুমি কৃষ্ণ তুমি রাম", "জয়তু জয়তু রামকৃষ্ণ, জয় ভবভয়হারী হে" এবং "জয় জয় রামকৃষ্ণনাম—গাও রে", শ্যামাসঙ্গীত—"কে ও রণরঙ্গিণী, প্রেমতরঙ্গিণী, নাচিছে উলঙ্গিনী আসব-আবেশে হায়" এবং কৃষ্ণসঙ্গীত—"গোপী-মনোরঞ্জন, অঞ্জনগঞ্জন, আঁখিযুগখঞ্জন, মঞ্জীর বাজে পায়"—মঠের প্রকাশিত একাধিক গ্রন্থে স্থান পেয়েছে—প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত বলেই। শ্রীশ্রীঠাকুরের অবতারবাদ বিষয়ে শরৎবাবুর "বাঙ্গালের বাক্য ধর" কবিতাটি খুবই সুপাঠ্য, তিনি বলেছেন—

অসভ্য সুসভ্য দেশ যদি শুনি তাঁর গাথা
হয়ে থাকে তরঙ্গিত—কোটি প্রাণে শান্তিদাতা ;
মহামেধা দার্শনিক
মহাজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক
অবাক্ হয়েছে যদি শুনি উক্তি সারবান,
কেন তবে মিথ্যা হবে—"রামকৃষ্ণ ভগবান ?"

"শ্রীরামকৃষ্ণাদ্যস্তবমালায়" শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রত্যেক সাধুসন্ত এবং গৃহীভক্ত বিষয়ক স্তোত্রটি অতীব মনোরম। উহাতে সকলেরই গুণগ্রাম বিশদ ও নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে। স্তবমালার পদলালিত্য ও অনুপ্রাস সদাশয় পাঠকের মনে ভক্তকবি জয়দেবের সুললিত সংস্কৃতকাব্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেবে—ইহা নিঃসন্দেহ। শরৎবাবু শুধু সঙ্গীতরচয়িতাই ছিলেন না, সঙ্গীতেও তিনি সুকণ্ঠ ছিলেন।

তাঁর কলিকাতাবাসকালে জাপানীদের দ্বারা কলিকাতায় বোমানিক্ষেপের আশঙ্কা দেখা দিল। ফলে, কলিকাতা প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ল। সেই হিড়িকে শরৎবাবুও বহরমপুরে তাঁর চতুর্থ পুত্রের বাসায় যেতে বাধ্য হন এবং ৬ মাস পর ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে কনিষ্ঠ পুত্র কর্তৃক ফরিদপুর জেলার নিজগৃহে নীত হন। তখন তাঁর বয়স ৭৪ বৎসর। বাড়ী পৌঁছবার অন্যূন তিন মাসের মধ্যেই, ৬ই ভাদ্র, ১৩৪৮ সাল, শনিবার (২৩-৮-৪২), শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে তাঁর দেহাবসান হয়।

এর ১১ দিন পূর্ব হতে তাঁর হাঁপানির টান অত্যন্ত বেড়ে যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী ও ব্রহ্মানন্দজীর নাম করতে করতে, তাঁদের দিব্য উপস্থিতি অনুভব করে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দের তেজস্বী শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর রচনাদি, বিশেষ করে স্বামীজীর সহিত তাঁর কথোপকথন "স্বামিশিষ্য-সংবাদ" গ্রন্থখানি অগণিত জনগণকে উচ্চভাবানুপ্রেরিত করে তাঁদের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে তাঁকে চিরঅধিষ্ঠিত করে রেখেছে।

'নরেন্দ্র শিক্ষা দিবে'

স্বামী ধীরেশানন্দ

স্বীয় দিব্যলীলা-নাটকের শেষ অঙ্কে কাশীপুর উদ্যান-বাটীতে দুরারোগ্য রোগজীর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কথা বলিতেও অক্ষম তখন একদিন ইঙ্গিতে লিখিয়া সমবেত ভক্তগণকে জানাইয়াছিলেন— **'নরেন্দ্র শিক্ষা দিবে'**।

প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথের বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—'নরেন্দ্র অখণ্ডের ঘরের'। স্বীয় শিষ্যগণের মধ্যে একমাত্র নরেন্দ্রকেই চিহ্নিত করিয়া তিনি একথাও বলিয়াছিলেন—'এত লোক এখানে আসিল, নরেন্দ্রের মত একজনও কিন্তু আর আসিল না।' তাই দেখিতে পাই নিজের ভাবসম্পদের উত্তরাধিকারীরূপে তাঁহাকে গড়িয়া তুলিবার জন্য ঠাকুরের কি বিপুল আগ্রহ ও প্রচেষ্টা। তিনি পূর্বেই জানিতেন, নরেন্দ্রকে দিয়া জগতের অনেক কাজ হইবে। তাই আচার্যরূপে নরেন্দ্রনাথকে নিখুঁতভাবে গড়িয়া তুলিতেও তাঁহাকে কম বেগ পাইতে হয় নাই। নরেন্দ্র পাছে একঘেয়ে হইয়া যান, ঈশ্বরের অনন্ত ভাবরাশির দুটি একটি ভাবমাত্র লইয়াই পাছে নরেন্দ্র স্বীয় অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও বিদ্বত্তা-প্রভাবে কোন সাম্প্রদায়িক ভাবে ভাবিত হইয়া একটা সঙ্কীর্ণ দল সৃষ্টি করিয়া বসেন, সেজন্য ঠাকুরের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না।

নরেন্দ্র শক্তি মানেন না। ভগবানের নামে প্রেমাশ্রুবিসর্জনাদি পুরুষপ্রবর নরেন্দ্রের নিকট পুরুষত্বের অবমাননা বলিয়া প্রতিভাত হইত। নরেন্দ্র তখন ব্রাহ্মসমাজের ভাবে অনুপ্রাণিত। তিনি নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের উপাসক। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ কালীমন্দিরে যান, 'মা'-'মা' করেন। মার দিব্যদর্শনের কথা ভক্তগণসমক্ষে বলেন। নরেন্দ্র কিন্তু এসব বিশ্বাস করেন না। বলেন:—ও সব মাথার খেয়াল; খেয়ালবশতঃ অনেকে ঐরূপ দর্শনাদি করে।

তাঁহার নরেন্দ্র কি শেষটায় একঘেয়ে হইয়া যাইবে? কেবল নিরাকার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপেই লীন হইয়া থাকিবে? তবে তাহার দ্বারা লোকশিক্ষা হইবে কি করিয়া? জগতের সকলেই তো আর নিরাকার ব্রহ্মোপলব্ধির অধিকারী নয়? শ্রীরামকৃষ্ণ তাই মাঝে মাঝে একটু চিন্তিত হন, কিন্তু বেশী নয়; কারণ অতীন্দ্রিয় যোগশক্তি-প্রভাবে তিনি পূর্ব হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছায় নরেন্দ্র বিশেষ শক্তিসম্পন্ন হইয়া লোক-কল্যাণার্থ জগতে অবতীর্ণ। সুতরাং কালে নরেন্দ্র লোকশিক্ষক হইবেই। তাই তিনি সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সাধারণ ফুল শীঘ্রই ফোটে এবং শীঘ্রই ঝড়িয়া পড়িয়া যায়। কিন্তু পদ্মফুল দেরীতে ফোটে এবং থাকেও অনেকদিন। নরেন্দ্র যে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত 'সহস্রদল পদ্ম'। তাই সে ফুলটি ফুটিতে একটু সময় লাগিবে বৈ কি!

দুঃখে পড়িলেই মানুষের প্রকৃত জীবন গড়িয়া উঠে। শত দুঃখের পেষণে নিষ্পিষ্ট মানব স্বীয় পুরুষকারসহায়ে যখন জীবনযুদ্ধে জয়ী হয় তখনই তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির সম্যক্ বিকাশ ঘটিয়া থাকে। অশেষ দুঃখ-দারিদ্র্যই জীবনের প্রকৃত শিক্ষক। উহাতেই ধৈর্য, সহনশীলতা, আদর্শৈকনিষ্ঠতা ও হৃদয়ের সদ্গুণরাজির পরিপূর্ণ প্রকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। সর্বপ্রকার সুখের মধ্যে বাস করিয়া সকলেই

উচ্চতত্ত্ব আলোচনা করিতে সমর্থ। কিন্তু দুঃখ যখন মানুষকে দিশাহারা করিয়া ফেলে, চারিদিকে কেবল হতাশার করুণ সুরই যখন কর্ণগোচর হয় তখন কয়জন জীবনের উচ্চতম লক্ষ্যটিকে স্থির রাখিয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে পারেন?—নরেন্দ্রের জীবনেও বোধ হয় দুঃখের পীড়ন এই জন্যই প্রয়োজন ছিল। ইহা ঈশ্বরেচ্ছাতেই ঘটিয়াছিল। ইহার অন্য প্রয়োজনও ছিল। ভবিষ্যতে যিনি আচার্য হইবেন, মানবজীবনের সর্ববিধ অবস্থার সহিত তাঁহার পরিচয় থাকা আবশ্যক।

নরেন্দ্রনাথ আজন্ম সুখে লালিতপালিত। হঠাৎ পিতৃবিয়োগে নরেন্দ্রনাথের পরিবারবর্গ অশেষ দারিদ্র্যের সম্মুখীন হইলেন। মা, ভাই, বোনদের অন্নসংস্থানের কোন উপায় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র নরেন্দ্রনাথ শত চেষ্টা করিয়াও প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জনের নিমিত্ত একটি কর্ম সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না। সুসময়ের বন্ধুরাও এই সংকটকালে সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ। অনেকে শত্রুতাচরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইল না। জ্ঞাতিরা পৈতৃক ভিটাটুকুও কাড়িয়া নিতে বদ্ধপরিকর। সংসার যে কত নীচ, ঘৃণিত, মানুষ যে কত স্বার্থপর, এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া নরেন্দ্রনাথ তাহার পরিচয় পাইলেন। এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়িয়া, অনাহারে দিন কাটাইয়াও কিন্তু তিনি স্বীয় আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। জীবনের লক্ষ্য ভগবান লাভ—ইহা তিনি কখনও বিস্মৃত হন নাই। অপরের শত সমালোচনা, কটাক্ষ এবং প্রলোভনও তাঁহাকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। অনেক কষ্টে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্যামবাজার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কর্মটি জুটিল। কিন্তু তাহাও বেশীদিন রহিল না।

অবশেষে নরেন্দ্র একদিন ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলেন, তাঁহার মা-ভাইদের অন্নসংস্থান যাহাতে হয় সেজন্য মা-কালীকে বলিতে হইবে। ঠাকুর বলিলেন—'তুই মাকে মানিস না, তাই তো তোর এত কষ্ট।' ঠাকুরের কথায় অনুরুদ্ধ হইয়া নরেন্দ্র মা-কালীর মন্দিরে গিয়াও মার নিকট অর্থাদি প্রার্থনা করিতে পারেন নাই, জ্ঞান ভক্তি ইত্যাদি প্রার্থনা করিয়াই ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

যেদিন নরেন্দ্র সাকারে বিশ্বাসী হইলেন, মাকে মানিলেন, সেদিন ঠাকুরের কি আনন্দ! পুনঃপুনঃ সমবেত ভক্তদের বলিতে লাগিলেন—"নরেন্দ্র মাকে মেনেছে, বেশ হয়েছে, না? কাল সারা রাত 'আমার মা ত্বং হি তারা'—এই গানটি গেয়েছে। এখন ঘুমুচ্ছে।" ঠাকুরের এত আনন্দের কারণ নরেন্দ্র এখন সাকারেও বিশ্বাসী হইয়াছেন। ঠাকুর যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। স্বীয় সর্বভাবের পরিবাহক নরেন্দ্রনাথকে সর্বপ্রকারে যোগ্য করিতে হইবে। সাকার নিরাকার উভয় ভাবেই বিশ্বাস রূপ উহারই সার্থক সূচনা দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণের এত আনন্দ।

শ্রীম বলিতেন, "নরেন্দ্র কত করলেন। বক্তৃতা, প্রচার, মঠস্থাপন, কত কি। কিছুতেই আবদ্ধ হন নাই। কেন? পরমাত্মাকে জেনে করেছেন তাই। তাঁর হাতের যন্ত্র। আত্মদ্রষ্টাকেও তিনি ইচ্ছামত কাজে লাগাতে পারেন। নরেন্দ্র যদি সমাধিস্থ হয়েই থাকতেন তবে মায়ের কাজ করত কে? ভারত ও জগতের কল্যাণের জন্যই ঠাকুর তাকে কাজে লাগালেন।···

মঠ করা কেন? গুরুভাইরা কেউ কেউ এ প্রশ্ন করায় নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'এই মঠকে কেন্দ্র করে ভারত ও জগতের Regeneration হবে।' আমেরিকায় তিনি

যা করেছেন তা ঠাকুরেরই কাজ। ভারতের ধর্ম, দর্শন ও সভ্যতাকে তিনি বীরদর্পে জগতে প্রচার করলেন।

ঠাকুর থাকতেও নরেন্দ্রের দুঃখ গেল না। দুঃখ শরীরের ধর্ম। উহা থাকবেই। তবে বিষয়ীদের মত কাবু করতে পারে না। অত দুঃখ পেয়ে তবেই না তিনি মহাপুরুষ হলেন? তাই পরে নরেন্দ্র বলেছিলেন: যারা দুঃখকষ্ট পায় নাই, তারা কি আবার মানুষ? ধনী, বিদ্বান, বুড়ো হলেও তারা Babies, Little babies. কত কষ্ট তিনি পেয়েছেন। আলমোড়ায় তপস্যায় বসেছেন। খবর গেল ভগ্নী আত্মহত্যা করেছে। তাকে খুব ভালবাসতেন। হৃষীকেশে প্রাণ যায় যায় হয়েছিল। কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না।"

নরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, দুঃখের আগুনে না পুড়িলে মানুষ মহৎ হয় না। তিনি নিজেও দুঃখের আগুনে পুড়িয়াছিলেন। দুঃখের আগুনে, তপস্যার আগুনে পুড়িয়া খাঁটি সোনা হইয়াছিলেন। বিদেশেও তিনি যখন একাকী, সাহায্য করিবার কেহ নাই—তাঁহার বিরুদ্ধে শত ষড়যন্ত্র এবং নানা কুৎসিত অপবাদ রটনা করিতেও মিশনারীরা কুণ্ঠিত হয় নাই। বন্ধুরা সে সবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন: আমি কি এ সব ভয় করি? আমি জানি সংসারটা গোষ্পদজলতুল্য অতি তুচ্ছ, মিথ্যা; এ সব শিশুরা আমার কি করিবে? সত্যই জয়ী হইবে।

এই দুর্জয় সাহস, অপরিসীম মনোবল তিনি কোথা হইতে পাইলেন? ইহা তাঁহার আত্মানুভূতির শক্তি। সাধনসহায়ে ও গুরুকৃপায় তিনি অপরোক্ষ আত্মজ্ঞানলাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন এবং সদা সর্বব্যাপী চেতন সমুদ্রেই যেন তিনি ডুবিয়া থাকিতেন। জগৎটা একটা মিথ্যা ছায়ার মত তাঁহার কাছে ভাসিত; তাই কোন আঘাতেই মুষড়াইয়া পড়িতেন না। উহাতে যেন তাঁহার অন্তরের শক্তি আরও অধিকতর বেগে প্রকাশ পাইত। তাই নির্ভীক অন্তরে তিনি বলিয়াছেন—

'ভাঙো মায়া, মুক্ত হও বন্ধন হইতে,
ভীত নাহি হও—বুঝ রহস্য পরম।
নিজ প্রতিবিম্ব মোরে নারে সন্ত্রাসিতে,
জেনো স্থির—আমি সেই, 'সোঽহং সোঽহম্।'

মুক্তির পথে সহস্র প্রতিবন্ধক আসিয়া সাধককে পথভ্রষ্ট করিয়া ফেলিতে চায়। দুর্বল মানব যাহাতে ভীত না হয় সেজন্য তিনি বলিতেছেন—

'রোষদীপ্ত মূর্তি ধরি' আসুক জগৎ
চূর্ণিতে তোমায়—তবু জানিও নিশ্চয়,
হে আত্মা, তুমি হে দেব—তুমি সে মহৎ
মুক্তিই গন্তব্য তব—অন্য গতি নয়।'

—এ যেন তাঁহার নিজেরই প্রথম জীবনের প্রতিকূল আবর্তমধ্যেও লক্ষ্যৈকনিবদ্ধদৃষ্টির একটি পূর্ণ প্রতিকৃতি! তৎকালে স্বার্থপর সংসারের যে নগ্ন চিত্র তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন, পরবর্তীকালে তাহা তাঁহার জ্বালাময়ী ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে:

'দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলে অনিবার,
পিতা পুত্রে নাহি দেয় স্থান;
'স্বার্থ' 'স্বার্থ' সদা এই রব,
হেথা কোথা শান্তির আকার?
সাক্ষাৎ নরক স্বর্গময়—
কেবা পারে ছাড়িতে সংসার?
ব্রত ত্যাগ তপস্যা কঠোর,
সব মর্ম দেখেছি এবার;
জেনেছি সুখের নাহি লেশ, শরীরধারণ বিড়ম্বন;
যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।

হৃদিবান্ নিঃস্বার্থ প্রেমিক !
এ জগতে নাহি তব স্থান ;···
হও জড়প্রায়, অতি নীচ, মুখে মধু অন্তরে গরল—
সত্যহীন, স্বার্থপরায়ণ,
তবে পাবে এ সংসারে স্থান।'

সংসারবিষয়ে কি নিদারুণ তিক্ত অভিজ্ঞতা ! মনে রাখিতে হইবে এই অভিজ্ঞতা তাঁহার তখনই হইয়াছিল যখন তিনি ২০।২১ বছরের যুবকমাত্র। তারপর আসিয়াছিল তাঁহার তীব্র সাধনার জীবন। অনশনে অর্ধাশনে অলৌকিক তীব্র বৈরাগ্যবান্ নরেন্দ্রনাথ তখন সাধনার খরস্রোতে জীবনতরী ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। সে সাধনার বর্ণনাও তিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন—

'বিদ্যাহেতু করি প্রাণপণ,
অর্ধেক করেছি আয়ুক্ষয়—
প্রেমহেতু উন্মাদের মত, প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায়;
ধর্মতরে করি কত মত, গঙ্গাতীর শ্মশান আলয়,
নদীতীর পর্বতগহ্বর, ভিক্ষাশনে কত কাল যায়।
অসহায়—ছিন্নবাস ধ'রে দ্বারে দ্বারে উদরপূরণ—
ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে, কি ধন করিনু উপার্জন ?'

এই অলোকসামান্য তপস্যাপ্রভাবে নরেন্দ্রনাথ কি তত্ত্ব উপলব্ধি করিলেন ? তাঁহার নিজ মুখেই তাহা আমরা শুনিতে পাইয়াছি,—

'শোন বলি মরমের কথা,
জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর,
এক তরী করে পারাপার—
মন্ত্রতন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ—বুদ্ধির বিভ্রম,
'প্রেম' 'প্রেম'—এই মাত্র ধন।
জীব ব্রহ্ম, মানব ঈশ্বর,
ভুত-প্রেত-আদি দেবগণ,
পশু-পক্ষী, কীট-অণুকীট,
এই প্রেম হৃদয়ে সবার।'

সর্বভূতে এক প্রেমময়ের সাক্ষাৎকারে নরেন্দ্রনাথ কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ঈশ্বর-লাভের জন্য বাল্যাবধি তাঁহার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আকুল ব্যাকুলতার পর্যবসান এইরূপেই ঘটিয়াছিল। যে ব্যাকুলতা একদিন তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল উহাই তাঁহাকে এখন লক্ষ্যে পৌছাইয়া দিল। সর্বভূতে এক প্রেমময়ের দর্শন—এক ব্রহ্মদর্শন—ইহাই সর্বসাধনার শেষ কথা ইহাই শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্র একবাক্যে ঘোষণা করিয়া থাকেন।

শ্রোত্রিয়ত্ব অর্থাৎ বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞান, বিদ্বত্তা অলোকসামান্য মেধাবী নরেন্দ্রনাথের পূর্ব হইতেই ছিল। এখন তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠতা লাভ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হইল। লোকশিক্ষা দিবার আধারটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর হইল। নরেন্দ্রনাথ এখন আচার্যপদবীতে আরূঢ় হইলেন। সাধক নরেন্দ্রনাথ এখন আচার্য বিবেকানন্দ হইলেন। মৃত্যু, রোগ, শোক, দারিদ্র্য, ধর্মাধর্ম—সবেতেই এক পরমাত্মার প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া আচার্য বিবেকানন্দ এখন কৃতকৃত্য, স্বস্থ। আর কোন কর্তব্যই তাঁহার এখন অবশেষ নাই। তাই তখন তিনি ঈশ্বরেচ্ছা দ্বারা চালিত হইয়া জীবশিক্ষাদানে ব্রতী হইলেন। ঈশ্বরপূজন—এই বুদ্ধিপূর্বক সর্ব-স্বার্থচিন্তারহিত হইয়া সর্বভূতে সেই প্রেমময়ের সেবা, ইহাই পরমার্থপ্রাপ্তির অত্যুৎকৃষ্ট সাধন বলিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন।

বেদান্তোক্ত অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি লাভ করিয়াও স্বামীজী জগৎকে মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা করিয়া তাহার প্রতি উদাসীন থাকেন নাই। নরনারায়ণের সেবায় নিজেকে তিনি নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। সকলকে শিখাইয়াছেনও তাহাই :—

'ব্রহ্ম হতে কীটপরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়।'

ঈশ্বরে ফলার্পণ-বুদ্ধিতে নিষ্কাম কর্ম ও উপাসনা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে তখনই সাধকের হৃদয়ে আত্মজিজ্ঞাসা জাগে ও পরমার্থতত্ত্ব সাধকের হৃদয়ে স্ফুরিত হয়—ইহাই বেদান্তশাস্ত্রের সুস্পষ্ট ঘোষণা। পূর্বপূর্ব যুগে চিত্তশুদ্ধির জন্য আচার্যগণ শাস্ত্রবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম, অগ্নিহোত্রাদির কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে বর্ণাশ্রম-ধর্ম বিলুপ্তপ্রায়। এখন সে সব করিবার সুযোগ ও অবসর কাহারও নাই। তাই আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ যুগোপযোগী সাধনের বিধান করিলেন:

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

জীব-শিব, শিববুদ্ধিতে জীবসেবা দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি কর—ইহার যুগাচার্যের অভিনব বাণী। এই মহান্ আদর্শটি নিজেও জীবন দ্বারা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। নিষ্কাম সেবা দ্বারা ধন্য হইবার সুযোগ প্রদান করত: ঈশ্বরই সাধকের নিকট জীবরূপে উপস্থিত—এই জ্ঞানে সেবা করিতে পারিলে সেই কর্ম ও উপাসনায় আর কোন পার্থক্য থাকে না। কর্ম তখন উপাসনায় পর্যবসিত। শ্রদ্ধার সহিত এই সাধনের দ্বারা হৃদ্গত সর্বপাপ, ভোগবাসনা ও চিত্তবিক্ষেপাদি দূর হইয়া গেলে সাধকের সাত্ত্বিক হৃদয় তখন শান্ত, অন্তর্মুখ ও আত্মনিষ্ঠ হইয়া পড়ে এবং অচিরেই ও অল্পায়াসেই বেদান্তবিদ্যার অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারে সাধক তখন কৃতার্থ হইয়া থাকেন। শ্রীগুরুমুখে শ্রুত এই সাধন-রহস্যটি সকলের কল্যাণের জন্য তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। পূর্বাচার্যগণের তুলনায় ইহা স্বামীজীর যুগোপযোগী একটি বিশেষ অবদান।

শ্রীম বলিতেন,—"সেবা শুধু খাওয়ান-পরান নয়। জীবকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জেনে ভালবেসে সেবা। যেমন মানুষ নিজের জনকে ভালবাসে, নিজেকে ভালবাসে। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মত অপরেরও করা। নিজের স্বার্থ, ভোগবুদ্ধি থাকবে না—তবে হল নিষ্কাম কর্ম। দেখ স্বামীজী কেমন ছিলেন। জগতে এত মান পেয়ে ফিরে এসে এক কৌপীন প'রে আছেন। সব দিয়ে দিলেন গুরুভাইদের। ভক্তদের লিখলেন—'আপনারা আমার খাওয়া-পরার জোগাড় করে দিন আমি ভিক্ষা করে খাচ্ছি।' পূর্বের ন্যায় সেয়ারের গাড়ীতে পাঁচ পয়সা দিয়ে বরানগর যাতায়াত করলেন। খালি পা, হট্‌হট্ করে চলছেন।··· স্বামীজী কালিকম্লি-বাবার কথা বলতেন। বলতেন—'ঠিক ঠিক নিষ্কাম কর্মী ঐ একটি সাধুকে দেখেছি। চাঁদা করে লাখ লাখ টাকা তুললেন, তা দিয়ে উত্তরাখণ্ডের সব রাস্তাঘাট, ধর্মশালা, সদাব্রত করালেন। হৃষীকেশে সাধুদের জন্য অন্নসত্র। তিনি নিজে জল তুলতেন, আটা ঠাসতেন. রুটি সেঁকতেন। অপর লোকও সাহায্য করত। সাধুদের সেই রুটি দিচ্ছেন। নিজেও সাধুদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে সেই রুটি ভিক্ষা নিচ্ছেন। এদিকে উলঙ্গ। এক কালো কম্বল গায়ে। কাজ যখন ঠিক চলতে লাগলো তখন কোথায় উধাও হয়ে গেলেন। আজও তাঁর খোঁজ কেউ জানে না। এর নাম নিষ্কাম কর্ম। কোন আসক্তি নাই।'"

সমালোচনা

ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ॥ শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ প্রণীত॥ মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত॥ পৃষ্ঠা ১৮০+।৵০; দাম পাঁচটাকা।

শ্রীযুক্ত প্রণবরঞ্জন ঘোষ ইতিপূর্বে বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য রচনা করে, তিনি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ঐতিহ্যের নৈষ্ঠিক ব্রতচারী, তার সুযোগ্য প্রমাণ দিয়েছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত 'ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থটি তাঁর দুর্লভ মনন ও শিল্পরূপের আর একটি সপ্রশংস প্রমাণ উপস্থাপিত করল। এ বিষয়ে যাঁরা চিন্তার দীপবর্তিকা জেলে গুহাহিত সত্যের মুখোমুখি হতে চান, তাঁরা অধ্যাপক ঘোষকে অন্তর থেকে সাধুবাদ দেবেন। মনের সঙ্গে হৃদয়ের, তত্ত্বের সঙ্গে রসের, আলোচনার বিশ্লেষণ এবং সুবলয়িত সংশ্লেষণের যে পরিচয় বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে বিকশিত হয়েছে, আধুনিক কালের চিন্তাশীল মহলে তার সমাদর সর্বজনীন হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। ইদানীং বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর সন্তানদের কর্মকৃতি নিয়ে নতুন করে আলোচনা হচ্ছে। কেউ ভাবের ফুলচন্দনে, কেউবা মনের প্রদীপ জেলে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের তত্ত্ব-সাধনার স্বরূপ নির্ধারণের অভিপ্রয়াসী হয়েছেন। শ্রীযুক্ত ঘোষ এই বইখানিতে সেই আলোচনার একটি মনোজ্ঞ শিল্প-আলেখ্য রচনা করেছেন।

গ্রন্থটির দুটি অংশ—(১) স্মরণ, (২) মনন। 'স্মরণে' কয়েকটি উপচ্ছেদে (শ্রীরামকৃষ্ণ, কামারপুকুর, বিশালাক্ষী, পঞ্চবটী, দক্ষিণেশ্বর থেকে বেলুড়) তিনি স্মৃতিচারণা করেছেন আপন মনে, আর স্বগতোক্তি করেছেন আপন ভাষায়। শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিপূত স্থানগুলিতে তিনি উপস্থিত হয়েছেন, গৈরিক ধূলি সর্বাঙ্গে স্পর্শ করেছেন, 'অবতারবরিষ্ঠে'র পুণ্য-আবির্ভাবকে সমগ্র সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। যে-কোন হৃদয়বান পাঠক এই অংশ পড়তে পড়তে লেখকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠবেন। আবেগ এখানে দ্বাররক্ষী, লেখক এখানে 'রূপদক্ষ'। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি-রঞ্জিত পথঘাট লেখকের কাছে আবেগ ও কল্পনার রসে রূপময় হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে লেখক নানা ধরনের তত্ত্বকথারও অবতারণা করেছেন, কিন্তু "আপন মনের মাধুরীই" তাঁর লেখনীকে শিল্পীর তুলিকায় পরিণত করেছে। এই অংশে তাঁর প্রতিভা প্রকৃত আর্টিস্টের প্রতিভা।

গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশ 'মননে'র কয়েকটি উপচ্ছেদে (শ্রীরামকৃষ্ণ—যুগজীবন সাহিত্য, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ, অপূর্ব গৃহী, অপূর্ব সন্ন্যাসী) তিনি প্রধানতঃ চিন্তনের জগতে পদচারণা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যথার্থ তাৎপর্য, তাঁর সঙ্গে বিবেকানন্দের সম্পর্ক, গার্হস্থ্যধর্ম ও সন্ন্যাসজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি একদিকে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ঐতিহ্যের বিচার করেছেন, আর একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জীবনসাধনার গভীরে অবতরণ করেছেন। বস্তুতঃ গ্রন্থের এই দ্বিতীয় অংশটি বাংলার সংস্কৃতি-সাধনার একটি স্মারকপঞ্জী হয়ে থাকবে। ইতিহাসের ছায়াপটে দেশ ও কালের যে রূপ ফুটে ওঠে, তাকে বিশেষ ব্যক্তি ও যুগের মধ্যে প্রতিফলিত করে দেখাই যথার্থ ঐতিহ্যের

বিচার। সে দিকে লেখক অতিশয় পারঙ্গম, তাতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। বিবেকানন্দের ভাবধারার সঙ্গে ঘোষ আবাল্য যুক্ত হয়ে আছেন। ফলে এ বিষয়ে আলোচনা-বিচার-বিশ্লেষণ তাঁর ন্যায্য অধিকার। সেই অধিকার তিনি এই গ্রন্থের মধ্যে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সন্ন্যাসধর্মের আলোচনায় তিনি যে দৃষ্টিকোণের পরিচয় দিয়েছেন তার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আমরা ভক্তি করি। লেখকের রচনায় সেই ভক্তির সঙ্গে যুক্তি সংযোজিত হওয়ার ফলে গ্রন্থটি মণিকাঞ্চনের শিল্পরূপ ধারণ করেছে। এ গ্রন্থের বহুল প্রচার জাতির ঐতিহ্যস্বার্থেই অবশ্য প্রয়োজনীয়। মণ্ডল বুক হাউস শোভন আকারে গ্রন্থটি প্রকাশ করে একটি পবিত্র কর্তব্য করেছেন।

—শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক-ভজন—স্বামী অপূর্বানন্দ সংকলিত। শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, বারাণসী ১ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৩৬; মূল্য ৪০ পয়সা।

পুস্তিকাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আরাত্রিক ভজন ও স্তোত্র, শ্রীশ্রীমায়ের স্তব ও প্রণামমন্ত্র এবং 'শ্রীরামকৃষ্ণাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্' বঙ্গানুবাদ ও স্বরলিপি সহ সন্নিবিষ্ট। পুস্তিকাটি ভক্তগণের নিত্যসঙ্গী হইবার উপযুক্ত।

কথাপ্রসঙ্গে জ্ঞান মহারাজ—প্রকাশক: শ্রীপ্রসাদচন্দ্র ঘোষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, ১৩/১, শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির পথ, উত্তর ব্যাঁটরা, হাওড়া। পৃষ্ঠা ১৩৬; মূল্য ২৲।

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্য জ্ঞান মহারাজের জীবন অনন্যসাধারণ। তিনি শ্রীগুরুর নির্দেশ অনুযায়ী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শকে রূপায়িত করিতে জীবন উৎসর্গ করেন। এই গ্রন্থখানির মাধ্যমে তাঁহার জীবনের একটি রূপরেখা পাওয়া যাইবে। 'কথাপ্রসঙ্গে' নামক পরিচ্ছেদে সহজ সরল ভাবে বর্ণিত উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা সন্নিবেশিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ জ্ঞান মহারাজ 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রচার'—এই পর্যায়ে অনেকগুলি ভাবপূর্ণ পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। গ্রন্থের শেষাংশে সেই সকল পুস্তিকা হইতে 'সারকথা' শিরোনামে কতকগুলি অমূল্য কথা সংযোজিত হইয়াছে, যথা:—

(১) "কোন প্রশ্নে তোমাদের নাহি অধিকার,
কাজ কর, করে মর,—এই কর সার।"

(২) "দেহের শান্তি ঘুমে, মনের শান্তি নামে।"

Seminar on Swami Vivekananda's Teaching (Swami Vivekananda Centenary Memorial Seminar no. 1, May 1 to May 7, 1964): Sri Ramakrishna Misson Vidyalaya, Coimbatore, South India. Pp. 133.

স্বামীজীর শতবার্ষিক অনুষ্ঠানের সার্থকথা তাঁহার সঞ্জীবনী বাণীর অনুধ্যানে ও জীবনে তাহার রূপায়ণে—এই চিন্তায় প্রণোদিত হইয়া স্মরণিকাটির প্রকাশ অভিনন্দনযোগ্য। ১লা মে হইতে ৭ই মে, ১৯৬৪ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত অধিবেশনে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যে সমস্ত সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, তাহা আলোচ্য গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। Swami Vivekananda's Philosophy of Life; Swami Vivekananda on Religion; Universal Religion; Swami Vivekanada's Teaching in Education; Swami Vivekananda on Role of Women; Swami Vivekananda on Role of Youth; India and Her Regeneration. প্রভৃতি প্রবন্ধ বিশেষ তথ্যপূর্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা

১৯৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী

গত ২রা জানুআরি, ১৯৬৬, বেলুড় মঠে শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কার্যবিবরণী পাঠ ও সভার অন্যান্য অনুষ্ঠানের পর স্বামী নির্বাণানন্দজীর নির্দেশে স্বামী বন্দনানন্দ আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার ও কার্যধারা সম্বন্ধে সুন্দর বিবৃতি দেন। অতঃপর শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ সভাপতির ভাষণে বলেন: রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মপ্রসারের অলক্ষ্যে রহিয়াছে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অমোঘ আশীর্বাদ। আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে যে সেবাকার্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই উপাসনা। আদর্শ জীবন গঠনই সবচেয়ে বড় কাজ! পবিত্রতা ও ত্যাগ আমাদের মূল মন্ত্র। জীবনে আদর্শ রূপায়িত হইলে তবেই অপরের মধ্যে ভাবসঞ্চারের শক্তি আসে।

সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতির সারানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন রেজিষ্ট্রী হওয়ার পর ৫৬ বৎসর অতীত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে মিশনের বহু উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়; বিশেষ করিয়া শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে মিশনের কার্যাবলী জনসাধারণ ও সরকারের স্বীকৃতি সহযোগিতা ও সহানুভূতি লাভ করিয়াছে।

কর্মপ্রচার

১৯৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে মিশনের কার্যধারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের অঙ্গহিসাবে কনখল সেবাশ্রম, চেরাপুঞ্জি আশ্রম ও রেঙ্গুন সেবাশ্রমে স্বামীজীর মূর্তিপ্রতিষ্ঠা, বেলঘরিয়া বিদ্যার্থী আশ্রমে বিবেকানন্দ-শতাব্দী জয়ন্তী ভবন (সভাগৃহ ও গ্রন্থাগার) উদ্বোধন, পেরিয়ানায়কেনপালয়ম আশ্রমে ছাত্রাবাসের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা ও মহাবিদ্যালয়ের উদ্বোধন, রেঙ্গুন সেবাশ্রমে সেন্টিনারি মেমোরিয়েল বিল্ডিং সংযোজন এবং পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠে জুনিয়র সেকশনের জন্য বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা-কার্য সম্পন্ন হয়।

সদস্য-সংখ্যা

আলোচ্য বর্ষে মিশনের ৭ জন সাধু-সদস্য ও ১০ জন গৃহস্থ-সদস্য দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৯৬৫, মার্চ-এর শেষে মোট সদস্য-সংখ্যা ছিল ৬৭০ (সাধু ৩৬০, ভক্ত ৩১)।

কেন্দ্র সংখ্যা

মূল কেন্দ্র (বেলুড়) সহ ১৯৬৫, মার্চ মাসে পূর্ব বৎসরের ন্যায় মিশনের কেন্দ্র ছিল ৭২টি। তন্মধ্যে পূর্বপাকিস্তানে ৮; ব্রহ্মদেশে ২; ফ্রান্স, ফিজি, সিঙ্গাপুর, সিংহল ও মরিশাসে একটি করিয়া; বাকী ৫৭টি ভারতে। ভারতের কেন্দ্রগুলি রাজ্য-হিসাবে: পশ্চিমবঙ্গে ২৩, মাদ্রাজে ৮, উত্তরপ্রদেশে ৬, বিহারে ৬, আসামে ৪, অন্ধ্রে ২, উড়িষ্যায় ২; দিল্লী, রাজস্থান, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, মহীশূর ও কেরলে একটি করিয়া।

প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি উল্লেখযোগ্য:

সকলেই অবহিত যে, ভারত ও পাকিস্তানে সংঘর্ষের ফলে বর্তমানে আমাদের দেশকে এক অতি সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়া চলিতে হইতেছে। ইহাতে মিশনকেও বহু সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। সব চেয়ে

বড় সমস্যা পাকিস্তানে অবস্থিত কেন্দ্রগুলিকে লইয়া ; এই কেন্দ্রগুলির সহিত সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। পাকিস্তানের কেন্দ্রগুলির চারজন কর্মীকে (ভারতীয় নাগরিক) অন্তরীণ রাখা হইয়াছিল ; সম্প্রতি তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। পাকিস্তানে অবস্থিত মিশনের অপর চারজন কর্মীকে (পাকিস্তানের নাগরিক) অবশ্য অন্তরীণ করা হয় নাই। পাকিস্তানে মিশনের কেন্দ্রগুলি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে, তাহাও ঠিক জানা নাই।

মিশনের আর একটি বিপত্তি উল্লেখযোগ্য ; ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে রেঙ্গুন সেবাশ্রম রাষ্ট্রীয়করণের ফলে মিশনের কর্মীদিগকে চলিয়া আসিতে হইয়াছে।

কার্যবিভাগ

মিশনের কার্যধারার প্রধানতঃ পাঁচটি বিভাগ : (১) রিলিফ, (২) চিকিৎসা, (৩) শিক্ষা, (৪) সাহায্য, (৫) সংস্কৃতি ও ধর্ম।

(১) রিলিফ : ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত দুঃস্থ জনগণের মধ্যে সেবাকার্য গত বর্ষের কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে জানুআরি মাসে পূর্ব-পাকিস্তানে দাঙ্গার ফলে সহস্র সহস্র নরনারী ও শিশু অবর্ণনীয় অবস্থায় ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতভূমিতে আসিতে থাকে। এই সময় তাহাদের জন্য খাদ্য, পরিচ্ছদ, ঔষধাদির বিশেষ প্রয়োজন হয়। মিশন কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে গেদে, পেট্রাপোল, বানপুর ও হিঙ্গলগঞ্জে চারটি এবং আসামে হরিমুরা ও গোয়ালপাড়া জেলায় দুইটি রিলিফ-কেন্দ্র খোলা হইয়াছিল। মে মাসে রায়পুরের সন্নিকট কুরুদ ক্যাম্পে সেবা-কার্য সম্প্রসারিত করা হয়।

গেদে কেন্দ্রে মিশন কর্তৃক ২,১৮৪ খানি ধুতি, ১,২১৪ খানি শাড়ি, ২,২৯৯টি ছোটদের পোশাক, ৬ খানি কম্বল, ৯৭টি চাদর, ৯টি গামছা বিতরিত হয় ; এগুলি সবই নূতন। ইহা ছাড়া ২,০৮০ খানি পুরাতন বস্ত্রও বিতরিত হয়। প্রায় ৫৭ কুইণ্টাল চিঁড়া, ২০ কুইণ্টাল গুড়, ৯৫৩টি এনামেলের থালা এবং প্রচুর পরিমাণে বিস্কুট ও অন্যান্য খাদ্য-দ্রব্য বিতরণ করা হয়। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর এই কেন্দ্রটি বন্ধ করা হয়।

পেট্রাপোল রিলিফ-কেন্দ্রে ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ হইতে ৩ শে জুলাই পর্যন্ত মোট ১,২৫,৩৭৩ জন লোকের মত রান্না-করা খাদ্য বিতরিত হয়। পরে রাজ্য সরকার কর্তৃক রান্না-করা খাদ্য-বিতরণ আরম্ভ হইলে মিশন শুষ্ক খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্র বিতরণ করে। বিতরিত দ্রব্যের সংখ্যা ও পরিমাণ : নূতন ১,৫৫৫ খানি ধুতি, ১,৫৬৮ খানি শাড়ি, ৩,৩৯০টি শিশুদের পোশাক, ১৮৪টি চাদর, ১১ খানি গামছা ; পুরাতন ২,২৪৬ খানি কাপড়-জামা ; ২২ কুইণ্টাল চিঁড়া, প্রায় ১১ কুইণ্টাল গুড়, ৫৪৩টি এনা-মেলের থালা ও ৪৪১টি গ্লাস। সেবাকেন্দ্রটি ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর বন্ধ করা হয়।

বানপুর গভর্নমেণ্ট ক্যাম্প পরিচালনার ভার মিশনের হস্তে আসে ১লা জুন। গভর্নমেণ্ট ও মিশনের যুক্ত ব্যয়ে এখানে ৩৬,২৪৯ জন লোকের মত রান্না-করা খাদ্য দেওয়া হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত মিশন কর্তৃক নূতন ১২০ খানি ধুতি, ১১১ খানি শাড়ি, ৯২টি ছেলেমেয়েদের পোশাক, ৫১ খানি চাদর ও ১৬৬ খানি পুরাতন বস্ত্রাদি এবং তৎসহ প্রায় ২৯ কুইণ্টাল চিঁড়া, ১৩ কুইণ্টাল গুড়, ১৯৮টি এনামেলের বাসন ও অন্যান্য দ্রব্য বিতরণ করা হয়। এই সেবাকেন্দ্রটি ১লা নভেম্বর বন্ধ করা হইয়াছে।

হিঙ্গলগঞ্জ রিলিফ-কেন্দ্রে রান্না করিয়া ৭,৪৩০ জন লোককে খাওয়ানো হইয়াছে।

আসামে হরিমুরা কেন্দ্রে মিশন কর্তৃক নূতন ২,৪৭৭ খানি ধুতি, ১,২১৪ খানি শাড়ি, ২,২৯৯টি পোশাক, ৬টি কম্বল, ৯৯টি চাদর, ৯টি গামছা ও পুরাতন ২,০৮০টি জামাকাপড় এবং প্রচুর পরিমাণ বার্লি, বিস্কুট, বেবি-ফুড, গুঁড়া দুধ এবং ১,২৮৫টি ডেকচি, ৪৬৬টি হাণ্ডা, ৯৭৫টি থালা, ১৭১টি টিনের পাত্র, ৮৭৩টি হ্যারিকেন লণ্ঠন, ৫৬ কেজি কাপড়কাচা সাবান, এবং ১২,৭৫০ টাকা মূল্যের ঔষধ বিতরণ করা হয়। এই সেবাকেন্দ্র কর্তৃক ৯টি বিদ্যালয় পরিচালিত হইয়াছিল, (মোট ছাত্রসংখ্যা ১,৯৬১)। ইহা ছাড়া ৪টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র (একটি পুরুষদের জন্য এবং ৩টি মহিলাদের জন্য) খুলিয়া ৪৪ জন বয়স্ক পুরুষ ও ১১৪ জন বয়স্ক মহিলাকে শিক্ষা দেওয়া হইত; ১০টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই সেবাকেন্দ্র কর্তৃক বামিনগাঁও অঞ্চলের ৬,০০০ জন দুঃস্থকেও সাহায্য দেওয়া হয়। আসামে রিলিফ-কেন্দ্র ১৮ই জুন বন্ধ করা হয়।

১৭ই মে মধ্যপ্রদেশে ৩নং কুরুদ ক্যাম্পে মিশন কর্তৃক সেবাকেন্দ্র খোলা হয়। এই ক্যাম্পে ১০,০০০ উদ্বাস্তু সমবেত হইয়াছিল। ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সেবাকার্য চালানো হয়। এই সময়ের মধ্যে নূতন ৪,৩৫০ খানি ধুতি, ১০,৭৭৬ খানি শাড়ি, ১৫,৩৬৯ পোশাক-পরিচ্ছদ, ১০,৪২০ খানি কম্বল, ৪১৮টি চাদর, ১৩,০০০ পুরাতন জামাকাপড়, ৫৫৪ কেজি বার্লি, ৬৭ কেজি বিস্কুট, ৯ কুইণ্টাল মুড়ি, ৬০০ কেজি চিনি, ৮০,৮৫০টি মাল্টি-ভিটামিন ট্যাবলেট, ৫৫০টি এ্যালুমিনিয়ামের বাসন, ৯৪৪টি এনামেলের থালা, ১,০০২টি হ্যারিকেন, এবং প্রচুর পরিমাণে অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও বিতরণ করা হইয়াছিল। বিতরিত অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে মাল্টি-পারপাস ফুড, হর্লিকস, সুতার গুলি, সূচ, বই, খাতা, শ্লেট, পেন্সিল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ক্যাম্প হাসপাতাল ও ডিস্পেনসারির মাধ্যমে ৭৫০ রকমের ঔষধও বিতরণ করা হয়। ২০০ খানি পুস্তক সম্বলিত একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারও খোলা হইয়াছিল।

উপরি-উক্ত এই সমস্ত সেবাকার্যে প্রায় ২,৩৮,৮০০ টাকা ব্যয় হয়। বেলুড় প্রধান কেন্দ্রের সহিত রহড়া, নরেন্দ্রপুর ও আসানসোল শাখাকেন্দ্রের সক্রিয় সহযোগিতায় এই সেবাকার্য সুসম্পন্ন হয়।

প্রধান কেন্দ্র বেলুড়ের অর্থসাহায্যে কাটিহার আশ্রম কর্তৃক পূর্ণিয়া শহরের সন্নিকট বেলা গ্রামে জমি ক্রয় করিয়া ৭৫টি ছিন্নমূল পরিবারের বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই কলোনিতে ৫টি নলকূপ বসানো হইয়াছে।

১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের জানুআরির প্রথম সপ্তাহ হইতে রামেশ্বরে এবং মণ্ডপম্ ও রামনাথপুরমের মধ্যবর্তী অঞ্চলস্থ উচিপল্লীতে মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্র কর্তৃক সাইক্লোন-রিলিফ আরম্ভ করা হয়। সেবাকার্যটি আলোচ্য বর্ষে শেষ হয় নাই বলিয়া বিস্তৃত বিবরণ এবার দেওয়া হইল না; ২৪-৩-৬৫ পর্যন্ত ঝটিকাবিধ্বস্ত দুঃস্থগণের এই সেবাকার্যে প্রায় ৯৫,০০০ টাকা খরচ হইয়াছে।

(২) চিকিৎসা : ভারত, পাকিস্তান এবং ব্রহ্মদেশে মিশনের অনেক কেন্দ্রেই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে রোগীদের সেবাশুশ্রূষা করা হয়। বারাণসী, বৃন্দাবন, কনখল ও রেঙ্গুন সেবাশ্রম, কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠান ও রাঁচির যক্ষ্মা-হাসপাতাল—এইসব হাসপাতাল ছাড়াও বোম্বাই, কানপুর, সালেম ও নিউদিল্লীর

সেবাকেন্দ্রগুলিতে আপৎকালীন- ও পর্যবেক্ষণ-ব্যবস্থা হিসাবে কয়েকটি শয্যা সংরক্ষিত আছে। নিউদিল্লীস্থিত চিকিৎসালয়টি টি. বি. রোগীদের জন্য। কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠানে ও রেঙ্গুন হাসপাতালে গভর্নমেণ্টের অনুমোদিত পরিষেবিকা-শিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। সেবা-প্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য 'বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন' খোলা হইয়াছে; ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কলেজ অব মেডিসিন'-এর অঙ্গীভূত।

আলোচ্য বর্ষে মিশনের তত্ত্বাবধানে হাসপাতালগুলিতে মোট শয্যা-সংখ্যা (bed) ছিল ১,০৭৬; এগুলিতে ১৯,৪২৪ জন রোগী চিকিৎসার জন্য ছিল। ৫০টি বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয়ে পুরাতন রোগীসহ মোট ২৪,২৩,৫২৯ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

(৩. **শিক্ষা :** মিশন-পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মধারা নিম্নলিখিত রূপ :

প্রতিষ্ঠান	স্থান বা সংখ্যা	ছাত্র	ছাত্রী
কলে	মাদ্রাজ		
„	রহড়া (২৪ পরগণা)	২,৩৪৭	
„ (আবাসিক)	বেলুড়, নরেন্দ্রপুর		
„ প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় আর্টস কলেজ	পেরিয়ানায়-কেনপালয়ম	১৭০	
বি. টি. কলেজ	বেলুড়, পেরিয়ানায়-কেনপালয়ম	২৩৩	
বেসিক ট্রেনিং কলেজ (পোস্ট গ্রাজুয়েট)	রহড়া		
বেসিক ট্রেনিং কলেজ (জুনিয়র)	রহড়া, সরিষা, সারগাছি	৩৯৩	২৪৪
বেসিক ট্রেনিং স্কুল	পেরিয়ানায়-কেনপালয়ম, মাদ্রাজ		
শারীর শিক্ষা কলেজ	পেরিয়ানায়-কেনপালয়ম	১০০	
গ্রামীণ „ „	„	১০৩	
কৃষি-শিক্ষা বিদ্যালয়	„	৬১	
সমাজ-শিক্ষা সংগঠক-শিক্ষণ কেন্দ্র	বেলুড়, পেরিয়ানায়কেনপালয়ম	২৬১	

প্রতিষ্ঠান	স্থান বা সংখ্যা	ছাত্র	ছাত্রী
ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল	বেলুড়, বেলঘরিয়া, মাদ্রাজ, পেরিয়ানায়-কেনপালয়ম	১,৬০৯	
জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল	৮		
ছাত্রাবাস (কয়েকটি অনাথাশ্রম-সহ)	৭৪		
চতুষ্পাঠী	৩		
বহুমুখী বিদ্যালয়	১২		
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৮		
উচ্চ বা মাধ্যমিক „	১৪	৪১,৬৭৫	১৬,১৫৯
সিনিয়র বেসিক ও মধ্য ইংরাজী „		(মোট ৫৭,৮৩৪)	
জুনিয়র বেসিক ও প্রাথমিক „	৪৯		
নিম্নশ্রেণীর ও অন্যান্য „	৫৭		
পরিষেবিকা-শিক্ষণ কেন্দ্র	২		

এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ভারত, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, ফিজি ও মরিশাসে পরিব্যাপ্ত। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র (Institute of Culture) কর্তৃক পরিচালিত দিবা-ছাত্রাবাসে (Day Hostel) ৪০০ জন ছাত্র অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করিতেছে। এখানে মানবতা ও সংস্কৃতি-শিক্ষা এবং বিভিন্ন ভারতীয় ও বৈদেশিক ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে; উভয় বিভাগে আলোচ্য বর্ষে ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ৭২ ও ৬৯২।

(৪) **সাহায্য :** প্রধান কেন্দ্রের কাজ প্রধানতঃ শাখাকেন্দ্রগুলির পরিচালনা হইলেও এখান হইতে দরিদ্র ছাত্রগণকে ও দুঃস্থ পরিবারবর্গকে কিছু সাহায্যদানও করা হয়। আলোচ্য বর্ষে প্রধান কেন্দ্র হইতে নিয়মিত ভাবে ১০৮টি দুঃস্থ পরিবারকে ও ২১৮ জন ছাত্রকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে; সাহায্যপ্রাপ্তগণের মধ্যে সিন্ধুর উদ্বাস্তুগণ স্থায়ি-ভাবে, এবং দুইটি বিদ্যালয়, ১৭০টি পরিবার এবং ৪৯ জন ছাত্র সাময়িকভাবে সাহায্য পাইয়াছে। সাহায্যের মোট পরিমাণ ২৬,৪৭৩

টাকা। ইহা ছাড়া কয়েকটি শাখাকেন্দ্র হইতেও দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত পরিবারকে যে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে, তাহার পরিমাণ ৫,৩৩০ টাকা।

(৫) কৃষ্টি ও সংস্কৃতিঃ মিশনের অধিকাংশ কেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে প্রতিফলিত ভারতের সমন্বয়-মূলক প্রাচীন সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক ভাব বিস্তারের উপর বিশেষভাবে জোর দেন এবং বিভিন্ন কাজকর্মের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের 'সর্বজনীন শিক্ষাকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করেন। এতদুদ্দেশ্যে বহু গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগার পরিচালিত হয়। জনসভা, আলোচনা-সভা পুস্তক-প্রকাশন ও উৎসবাদির মাধ্যমেও আধ্যাত্মিক ভাববিস্তার করা হইয়া থাকে।

উপজাতীয় অঞ্চলে কর্মপ্রসার

আসামে খাসি ও জয়ন্তিয়া পর্বতাঞ্চলে উপজাতিদের মধ্যে মিশনের কর্ম প্রসারিত হইতেছে। নেফা (NEFA) অঞ্চলেও কর্ম-ধারা সম্প্রসারিত করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

শ্রীশ্রীসারদানন্দ-জন্মোৎসব

'উদ্বোধন'-ভবনে গত ১৩ই পৌষ (২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৬৫) পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের শততম জন্ম-তিথি উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

পূজ্যপাদ মহারাজের ঘরে ও পার্শ্ববর্তী কক্ষে তাঁহার প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্য দ্বারা সুন্দর-ভাবে সাজানো হইয়াছিল। ছাদের উপরে ও নীচের তলায় যে ঘরে বসিয়া স্বামী সারদানন্দজী কাজ করিতেন, সেখানেও তাঁহার প্রতিকৃতি সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হয়। উৎসবের অঙ্গহিসাবে মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, স্বামী সারদানন্দজীর জীবনী ও বাণী পাঠ ও আলোচনা, ভজন, ভোগরাগ প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। বহু ভক্ত পূজ্যপাদ মহারাজের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত উদ্বোধন-ভবন আনন্দমুখর ছিল। রাত্রে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতানুষ্ঠান বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল।

স্বামীজীর জন্মতিথি উৎসব

বেলুড় মঠে গত ২৯শে পৌষ (১৩. ১. ৬৫) স্বামী বিবেকানন্দের ১০৪তম জন্মোৎসব পূজা, বেদগীতি, কালীকীর্তন, কঠো-পনিষদ পাঠ প্রভৃতি সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হইয়াছে। অপরাহ্ণে মঠপ্রাঙ্গণে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতি স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও স্বামী বন্দনানন্দ স্বামীজীর জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ বলেন: স্বামীজী যেন যুক্তিপ্রবণ বিশ্লেষণপরায়ণ তৎকালীন বিশ্ব-মনের মূর্ত জিজ্ঞাসা রূপে শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার নির্দেশমত চলিয়া প্রত্যক্ষ উপলব্ধিলাভে ঈশ্বরের অস্তিত্বে নিঃসংশয় হইয়া পরে নিজের কথায় আধুনিক জগতের মনের সব সংশয় মিটাইয়া গিয়াছেন। স্বামী বন্দনানন্দ (আমেরিকার হলিউড কেন্দ্র হইতে কিছুদিনের জন্য ভারতে প্রত্যাগত) বলেন যে, স্বামীজীর যে কথাগুলিকে তিনি আমেরিকাবাসীর মনে গভীর রেখাপাত করিতে দেখিয়াছেন তাহা হইল: ধর্ম মানে অনুভূতি; ঈশ্বরই আমাদের স্বরূপ—এই স্বরূপ উপলব্ধির নামই ধর্ম; কোন শাস্ত্র বা ধার্মিক ব্যক্তির কথা 'মানিয়া লইবার' প্রয়োজন নাই—নিজের চেষ্টায় ধর্মনিহিত সত্যগুলি উপলব্ধি করিয়া উহার সত্যতা যাচাই করিয়া লও; ধর্ম 'সায়েন্টিফিক'—বিজ্ঞানীদের

সত্যান্বেষণের ধারা অনুসারে পরীক্ষা করিয়া আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলির সত্যতা যাচাইয়া লওয়া যায়। স্বামী গম্ভীরানন্দ সভাপতির ভাষণে বলেন : দেশের তৎকালীন পরিবেশের তাগিদে প্রথমাবস্থায় আমরা স্বামীজীকে প্রধানতঃ 'বিজয়ী বীর সন্ন্যাসী' ও 'স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী' বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। স্বামীজীও এদেশে আসিয়া স্বদেশপ্রেম এবং আমাদের তেজবীর্যের পুনরুজ্জীবনের কথাই বেশী করিয়া বলিয়াছিলেন। উহার প্রয়োজনও ছিল। এখন অন্য প্রয়োজন আসিয়াছে—স্বামীজীর বিশ্বজনীন চিন্তাগুলির দিকেই এখন আমাদের বেশী মনোযোগী হইতে হইবে।

কল্পতরু-উৎসব

কাশীপুর উদ্যানবাটী : যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুআরি ভক্তবৃন্দকে দিব্যভাবাবেশে স্পর্শ করিয়া 'তোমাদের চৈতন্য হউক' বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, সেখানে সেই ঘটনার পুণ্যস্মৃতিতে গত ১লা জানুআরি 'কল্পতরু-দিবস' উপলক্ষে দিবসত্রয়ব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভোগ-রাগ, কালীকীর্তন, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন অবলম্বনে কথকতা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। সহস্র সহস্র ভক্ত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। অপরাহ্ণে স্বামী জীবানন্দ কর্তৃক গীতা-ব্যাখ্যার পর স্বামী বোধাত্মানন্দ-জীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতি মহারাজ, স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ ও স্বামী অজজানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জীবন অবলম্বনে সময়োপযোগী ভাষণ দেন। সভান্তে শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর রামায়ণ-কীর্তন (অঙ্গুরী-সংবাদ) শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করেন।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : মধ্যাহ্নে বিশিষ্ট গায়ক-সাম্প্রদায় কর্তৃক মাথুর-লীলা-কীর্তন, রাত্রে কাসুন্দিয়া মায়ের মন্দির কর্তৃক যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী অবলম্বনে পালাকীর্তন এবং অপরাহ্ণে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ কর্তৃক উপনিষদ্-ব্যাখ্যার পর জনসভায় স্বামী চিদাত্মানন্দ (সভাপতি), স্বামী মহানন্দ ও স্বামী স্বপর্ণানন্দের মনোজ্ঞ ভাষণ।

উৎসবের শেষ দিন সন্ধ্যায় স্বামী তীর্থানন্দ ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। রাত্রে বিশিষ্ট তরজা-গায়ক-সম্প্রদায় কর্তৃক 'শ্রীকৃষ্ণ-নারদ-সংবাদ' তরজা-গান বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল।

কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে 'কল্পতরু-দিবস' উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদির মাধ্যমে যথারীতি আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বহু ভক্তের সমাগমে ও ভজনকীর্তনে যোগোদ্যান আনন্দমুখর হইয়াছিল। প্রতি বৎসরই এই উৎসবটিতে ভক্তগণ বিমল আনন্দ উপভোগ করেন।

উৎসব ও সভা

মেদিনীপুর : শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৪ই ডিসেম্বর কৃষ্ণা সপ্তমীতে জননী সারদাদেবীর ১১৩তম জন্মতিথি পূজা-হোমাদিসহ উদ্‌যাপিত হয়। শহর ও মফস্বলের বহু ভক্ত নরনারী সমবেত হন এবং প্রসাদ ধারণ করেন। সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর শ্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচনা করেন স্বামী বিশোকাত্মানন্দ মহারাজ।

১৮ই ডিসেম্বর একাদশীতে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের জন্মতিথি প্রতিপালিত হয়। অপরাহ্ণেমন্দিরে শ্রীশ্রীরামনাম-সংকীর্তন হয় এবং সন্ধ্যায় 'আনন্দভবন হলে' স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা করেন।

১৯শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন

বেলঘরিয়া ঃ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী আশ্রমের 'বিবেকানন্দ শতাব্দী জয়ন্তী ভবনে' স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী পুরবী মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গত ১৩ই নভেম্বর দেশরক্ষার্থে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ জওয়ানদের জন্য শিল্পপীঠের ছাত্রগণের রক্তদান উপলক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় সকল ছাত্রই রক্তদানে ইচ্ছুক থাকিলেও বর্তমানে সংরক্ষণের উপযোগীরূপে মাত্র ৫০ জন ছাত্রের রক্ত লওয়া হইয়াছে।

বিদ্যার্থী আশ্রমের ছাত্রগণ দেশের সঙ্কট-মুহূর্তের প্রয়োজনে সপ্তাহে একরাত্রি করিয়া উপবাস করিতেছে এবং অবসরসময়ে নিজেদের শ্রমে খাদ্য উৎপাদনে ব্রতী হইয়াছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁহার ভাষণে ছাত্রগণের উৎসাহের প্রশংসা করিয়া আদর্শদেশসেবকরূপে জীবন-গঠনের জন্য তাহাদের অনুপ্রাণিত করেন।

ব্রহ্মচারী বিশ্বচৈতন্যের দেহত্যাগ

দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ২০শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৪টা ২৩ মিনিটের সময় বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারী বিশ্বচৈতন্য (প্রহ্লাদ মহারাজ) ৬৬ বৎসর বয়সে হৃদ্‌রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসর যাবৎ উচ্চ রক্তচাপে ও হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিলেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমে যোগদান করেন এবং শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট হইতে ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা লাভ করেন। তিনি সুগায়ক ছিলেন এবং লখ্‌নৌ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পণ্ডিত এস. এন. রতনঝঙ্কারের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। বেলুড় মঠে বহু বৎসর যাবৎ বাস করিয়া ভজনাদির মাধ্যমে তিনি তাঁহার সঙ্গীতবিদ্যাকে শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর সেবায় বিশেষভাবে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগে মঠের একজন উচ্চস্তরের সঙ্গীতাভিজ্ঞের অভাব ঘটিল। তাঁহার আত্মা ভগবৎপাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিবিধ সংবাদ

শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর ঃ গত ১৪ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার (দক্ষিণেশ্বর) শ্রীসারদামঠে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর ত্রয়োদশাধিক শততম জন্মোৎসব একটি শুচিস্নিগ্ধ এবং ভাব-গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে সুসম্পন্ন হয়। ব্রাহ্ম মুহূর্তে মঙ্গলারতি এবং দেবীসূক্ত পাঠের পর বেলা ৭টা হইতে ১২॥টা পর্যন্ত শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ষোড়শোপচার পূজা, হোম এবং শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ হয়।

বাহিরে সুসজ্জিত মণ্ডপে পত্রপুষ্প-সুশোভিত শ্রীশ্রীমায়ের বৃহৎ প্রতিকৃতির সম্মুখে নিবেদিতা বিদ্যালয়, উইমেন্স ওয়েলফেয়ার সেণ্টার এবং বিদ্যাভবনের ছাত্রীগণের সুললিত কণ্ঠের মাতৃবন্দনায় মঠ-প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়। অতঃপর ১১-১২টা পর্যন্ত উক্ত মণ্ডপে প্রব্রাজিকা স্বরূপপ্রাণা সহজ এবং সুন্দরভাবে শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবনালোচনা করিয়া সমাগত ভক্ত মহিলাদের তৃপ্তি দান করেন। অপরাহ্ণে প্রব্রাজিকা বিশ্বপ্রাণা "শ্রীশ্রীমায়ের কথা" হইতে নির্বাচিত অংশ পাঠ করেন। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত অগণিত ভক্ত মহিলার শুভাগমনে মঠে এক সানন্দ এবং পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

এবার দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন প্রকার অন্নপ্রসাদ বিতরণ সম্ভব হয় নাই।

বারাসত ঃ রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে গত ১৮ই হইতে ২০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন দিন পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজীর ১১০তম জন্মোৎসব পূজার্চনা, শাস্ত্রপাঠ, ধর্মালোচনা, ভজন, কথকতা, শোভাযাত্রা প্রভৃতির মাধ্যমে

সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শিবানন্দ মহারাজের জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী পুণ্যানন্দ, স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ, শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, অধ্যক্ষ শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী ও অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয় মজুমদার। উৎসবক্ষেত্রে সহস্র সহস্র নরনারীর সমাগম হইয়াছিল।

চন্দ্রপুরা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র

দামোদর ভ্যালি করপোরেশনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং ভারতের তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্যতম বৃহৎ কেন্দ্র বিহারের অন্তর্গত চন্দ্রপুরা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি গত ১৪ই নভেম্বর এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে।

চন্দ্রপুরা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে বর্তমানে যে দুইটি টার্বো জেনারেটর যন্ত্র বসানো হইয়াছে তাহা হইতে ২ লক্ষ ৮০ হাজার কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা চলিবে। তৃতীয় টার্বো জেনারেটরটি বসাইবার আয়োজন করা হইতেছে। এই কাজ সম্পূর্ণ হইলে এখান হইতে ৪ লক্ষ ২০ হাজার কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হইবে।

চন্দ্রপুরা বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হইয়াছিল ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে এবং ইহার প্রথম ইউনিটটিতে কাজ আরম্ভ হয় ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। বিদ্যুৎ-উৎপাদনকারী কেন্দ্র সমূহের মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও আধুনিক। কেন্দ্রটির বিশেষত্ব হইল ইহার 'ইলেক্ট্রস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটরস্' যন্ত্র, যাহা 'মেকানিক্যাল ডাস্ট কালেক্টারের' সঙ্গে একযোগে সমস্ত স্থানটির বায়ু বিশুদ্ধ রাখিয়াছে।

পরলোকে ভক্ত কালীপ্রসন্ন দাস

পূজনীয় স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য কালীপ্রসন্ন দাস গত ৩১শে অক্টোবর কলিকাতা শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে প্রায় ৬৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিন দিন পূর্বে তাঁহার শরীরে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছিল।

করিমগঞ্জ সেবাসমিতি প্রতিষ্ঠায় যাঁহাদের অবদান অবিস্মরণীয়, তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। উক্ত কাজে তিনি পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজজীর অনুপ্রেরণা ও উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন।

শেষজীবনে কর্মব্যপদেশে তিনি বহু বৎসর লক্ষ্ণৌতে অতিবাহিত করিয়াছেন।

তাঁহার আত্মা চির শান্তি লাভ করুক। ওঁ শান্তিঃ! ওঁ শান্তিঃ!! ওঁ শান্তিঃ!!!

পরলোকে বীরেশ্বর দত্ত

ভারতের বিখ্যাত কাগজ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মেসার্স ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্স লিমিটেড কোম্পানীর অন্যতম ডিরেকটর ও মেসার্স ভোলানাথ পেপার হাউস প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বীরেশ্বর দত্ত গত ২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭২ (৭. ১২. ৬৫) মঙ্গলবার পরলোক গমন করিয়াছেন।

কর্মসূত্রে উদ্বোধনের সঙ্গে বহু দিন হইতে তাঁহার যোগাযোগ ছিল। সদ্‌ব্যবসায়ী হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাঁহার আত্মা চির শান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১০ই ফাল্গুন (২২. ২. ৬৬) মঙ্গলবার শুভ শুক্লা দ্বিতীয়ায় বেলুড় মঠে ও অন্যত্র ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩১তম পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে পূজা পাঠ ও উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে, এবং ১৫ই ফাল্গুন (২৭শে ফেব্রুআরি) রবিবার এতদুপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব হইবে। বর্তমান খাদ্যপরিস্থিতির জন্য ভক্তগণকে অন্নপ্রসাদ দেওয়া সম্ভব হইবে না।

ভ্রম-সংশোধন

পৌষ ১৩৭২ সংখ্যায় ৬৫৯ পৃষ্ঠা, ২য় কলম, ৯ম লাইনে "খুড়তুতো" স্থলে "পিসতুতো" পড়িবেন।

শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজ

জন্ম : ১৬ই জানুআরি, ১৮৮৯ মহাসমাধি : ২৭শে জানুআরি, ১৯৬৬

অদ্বৈত আশ্রমের সৌজন্যে

শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজীর মহাসমাধি

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজ গত ১৩ই মাঘ বৃহস্পতিবার (২৭. ১. ৬৬) রাত্রি ১-১৫ মিনিটের সময় মহাসমাধি লাভ করিয়াছেন।

ইহার কয়েকদিন পূর্ব হইতে চিকিৎসার জন্য তিনি কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠানে ছিলেন। তাঁহার পূতদেহ বেলুড় মঠে লইয়া যাইবার জন্য সেবাপ্রতিষ্ঠান হইতে প্রত্যূষে যাত্রা করা হয়; যাইবার পথে সকাল ৬৷৷টার সময় শ্রীশ্রীমায়ের বাটী পৌছিলে মাল্যাদিপ্রদান ও আরাত্রিক করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধানিবেদন করা হয়। সেখান হইতে সকাল ৭টায় (১৪ই মাঘ, ২৭শে জানুআরি) বেলুড় মঠ পৌছাইয়া তাঁহার পূতদেহ অতিথিভবনে রাখা হইয়াছিল; সেখান হইতে পুষ্পমাল্যাদিশোভিত পালঙ্কে করিয়া বেলুড় মঠের পুরাতন মন্দির সংলগ্ন প্রাঙ্গণে লইয়া যাওয়া হয় সাড়ে এগারটার সময়। সকালে মঠে পৌছিবার পর হইতে শেষ পর্যন্ত সর্বক্ষণ মঠের সাধু-ব্রহ্মচারিগণ তাঁহার নিকট বসিয়া বেদপাঠ ও ভজনাদি করিতেছিলেন। মঠপ্রাঙ্গণে আসিবার পর সমবেত কয়েক সহস্র ভক্ত তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। পরে দুপুর ১২৷৷টার সময় তাঁহার পূতদেহ গঙ্গাতীরে মঠের পুরাতন ঘাটে লইয়া যাইয়া সন্ন্যাসিগণ আরাত্রিকাদি ক্রিয়া সমাপন করিবার পর উহা শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীস্বামীজী ও শ্রীশ্রীমহারাজের মন্দির হইয়া শেষকৃত্যের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে বাহিত হয় এবং ১-১৫ মিনিটের সময় চিতাগ্নিতে আহুত হয়।

* * * *

স্বামী যতীশ্বরানন্দের পূর্বনাম সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুআরি, বুধবার, পূর্ববঙ্গের পাবনা জেলায় নন্দনপুর গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং কোনও সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। সুরেশচন্দ্রের মাতা বিধুমুখী দেবীও ধর্মপ্রাণা মহিলা ছিলেন।

জলপাইগুড়ি এবং বগুড়াতে সুরেশচন্দ্রের শিক্ষাজীবনের প্রথমভাগ কাটিয়াছে; পরে রংপুর জেলার কোন বিদ্যালয় হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রাজসাহী ও কোচবিহারে কিছুদিন পড়াশুনা করিয়া কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজে আসিয়া তিনি ভর্তি হইয়াছিলেন। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি.এ. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। জানা যায়,

সংস্কৃতে সর্বাধিক নম্বর পাওয়ায় সুরেশচন্দ্র বি.এ. পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর আরও এক বৎসর তিনি এম.এ. পরীক্ষার জন্য নিয়মিতভাবে পড়াশুনা করিলেও বৈরাগ্যের প্রেরণায় তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত সংসারের বাহিরেই চলিয়া আসিতে হইয়াছিল। বেলুড় মঠের সহিত যোগাযোগ এবং সেখানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানমণ্ডলীর দিব্য সংস্পর্শের ফলে সুরেশচন্দ্রের মনে সংসার-অনাসক্তির বীজ অঙ্কুরিত ও উত্তরোত্তর বর্ধিত হইবার সুযোগ লাভ করে। মাতাপিতা স্বাভাবিক প্রেরণাবশে তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ রাখিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সুরেশচন্দ্র একদিন তাঁহার গর্ভধারিণীকে স্পষ্টই জানাইয়া দিলেন যে, তিনি ভগবানলাভের সঙ্কল্প লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণমঠে যোগদান করাই মনস্থ করিয়াছেন এবং সেখানে যদি তিনি আদৌ সিদ্ধমনোরথ না হন, তবে অবশ্যই গৃহে ফিরিয়া মাতাপিতার অভিপ্রায় মত সংসার করিবেন।

সামান্য কিছু পাথেয় সম্বল করিয়া, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে সুরেশচন্দ্র মাত্র ২২ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া বেলুড় মঠে আসিয়া যোগদান করেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গগণের অন্যতম শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন এবং ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে পূজ্যপাদ মহারাজ যখন মাদ্রাজে ছিলেন, তখন তাঁহারই কাছে তিনি সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হন।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দুই বৎসরকাল তিনি 'প্রবুদ্ধ-ভারত' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ; পরে এক বৎসরের জন্য তিনি বোম্বাই শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত হন। ১৯২৬ হইতে '৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণমঠের পরিচালনভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। ইতিমধ্যে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে যতীশ্বরানন্দজী বেলুড় মঠের অন্যতম ট্রাষ্টি এবং রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন-সভার অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি জার্মাণীতে বেদান্ত-প্রচারকরূপে প্রেরিত হন। ১৯৩৫ হইতে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগ পর্যন্ত তিনি সুইজারল্যাণ্ডের সেণ্টমরিজ্, জেনেভা প্রভৃতি অঞ্চলেও ধর্মপ্রচার করিয়া বেড়ান ; পরে হল্যাণ্ড, প্যারিস এবং লণ্ডনেও কিছুকাল তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবপ্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনাকালে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জার্মাণী ত্যাগ করিয়া আমেরিকায় গমন করেন। সেখানে তাঁহারই অক্লান্ত উদ্যমে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ফিলাডেলফিয়াতে একটি বেদান্ত-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি উক্ত কেন্দ্রের দায়িত্বভার সাফল্যের সহিত বহন করেন। অবশেষে য়ুরোপ হইয়া ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাঙ্গালোর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তাঁহার উন্নত আধ্যাত্মিক জীবন লক্ষ্য করিয়া কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে উপযুক্ত ক্ষেত্রে দীক্ষাদি প্রদানের অধিকার প্রদান করেন। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে তাঁহার গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি যেমন সুবক্তা, তেমনি চিন্তাশীল লেখকও ছিলেন। "এডভেঞ্চারস ইন রিলিজিয়াস লাইফ," "য়ুনিভার্সাল প্রেয়ার্স" এবং "ডিভাইন লাইফ" তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দেশ-বিদেশের বহু নরনারী, তাঁহার

জীবন হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন; তাঁহারা সকলেই তাঁহার সুমিষ্ট আচরণ, সহানুভূতিশীল হৃদয়, উদার ধর্মভাব এবং গভীর অন্তর্জীবন দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন।

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি হইতে তাঁহার শরীরে নানা ব্যাধির উপসর্গ দেখা দিতে থাকে। চিকিৎসকগণের পরামর্শানুযায়ী স্থান পরিবর্তন ও চিকিৎসাদির জন্য গত ডিসেম্বর মাসে তাঁহাকে ব্যাঙ্গালোর হইতে বেলুড় মঠে আনয়ন করা হয়। দুঃখের বিষয়, তাঁহার শরীর অতি দ্রুত অবনতির পথেই চলিতে থাকে এবং বহুমূত্র ও আরও কয়েকটি জটিল উপসর্গ আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় অনন্যোপায় হইয়া ২৪শে জানুআরি, '৬৬, তাঁহাকে কলিকাতাস্থ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার্থে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসকমণ্ডলীর সর্ববিধ চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তাঁহার জীবনদীপ নির্বাপিত হইল।

দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্ব হইতেই তিনি যেন তাঁহার অন্তিমকাল প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছিলেন! প্রায়ই তাঁহাকে বলিতে শোনা গিয়াছে, "মহারাজ আমার সব শক্তি কেড়ে নিয়েছেন। আর এ শরীর রেখে কী লাভ? এ শরীর এখন চলে যাওয়াই ভাল।" জগদ্ধিতায় উৎসর্গীকৃত একটি জীবন এইভাবেই নিত্যসত্তায় লীন হইয়া চিরশান্তি লাভ করিল।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

* * *

মহাপ্রয়াণের পর ত্রয়োদশ দিবসে, ২৫শে মাঘ (৭. ২. ৬৬) সোমবার দিন বেলুড় মঠে বিশেষ পূজা, হোম, কীর্তন ও ভোগরাগাদি হইয়াছিল। বহু সাধু-ব্রহ্মচারী, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও কয়েক সহস্র ভক্ত এই দিন বেলুড় মঠে সমবেত হইয়াছিলেন। বিকাল ৩॥ টায় স্বামী ওঙ্কারানন্দজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী ভূতেশানন্দজী, স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী ও সভাপতি মহারাজ চিত্তস্পর্শী ভাষায় স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের ব্যক্তিত্বের মাধুর্য, নিয়মানুবর্তিতা, তপস্যা ও উন্নত আধ্যাত্মিক জীবনের কথা আলোচনা করেন। স্বামী ভূতেশানন্দজী বলেন, সাধনভজনকে কেন্দ্র করিয়া তিনি অন্য কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত করিতেন, সস্নেহ ব্যবহারে আপনার করিয়া লইতে পারিতেন সকলকেই। স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী যতীশ্বরানন্দজীর জীবনের বহু ঘটনার উল্লেখ করিয়া পরে বলেন যে গুরুর মাধ্যমে আমরা রামকৃষ্ণভাবসমুদ্রেরই স্পর্শ পাই—আমাদের দৃষ্টি কোন গণ্ডীতে সীমায়িত না করিয়া যেন সদাপ্রসারিত রাখিতে পারি সেই অসীম বিস্তারের দিকে। তিনি বলেন, গুরুর উপদেশমত জীবনযাপন করাই হইল গুরুর প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধানিবেদন। স্বামী ওঙ্কারানন্দজী বলেন, স্বামী যতীশ্বরানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের জীবনে যে আদর্শ দেখিয়াছিলেন, সেই আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন নিজ জীবনে। শুধু আজ শ্রদ্ধার্পণের দিনে নয়, সারাজীবন সেই আদর্শের অনুধ্যান ও জীবনরূপায়ণের চেষ্টা করিলেই তাঁহার প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইবে।

দিব্য বাণী

নরদেব দেব জয় জয় নরদেব
শক্তিসমুদ্রসমুত্থতরঙ্গং
দর্শিতপ্রেমবিজৃম্ভিতরঙ্গং
সংশয়রাক্ষসনাশমহাস্ত্রং
যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যং
নরদেব দেব জয় জয় নরদেব ॥১
অদ্বয়তত্ত্বসমাহিতচিত্তং
প্রোজ্জ্বলভক্তিপটাবৃতবৃত্তং
কর্মকলেবরমদ্ভুতচেষ্টং
যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যং
নরদেব দেব জয় জয় নরদেব ॥২

—স্বামী বিবেকানন্দ

নরদেব ! প্রভু, তোমারই হউক জয় !
শক্তি-সাগর-সম্ভূত তুমি ঊর্মি,
প্রেম-হিল্লোলে প্রেমময়, লীলাময়,
সংশয়-রাক্ষস-নাশে তুমি
উদ্যত মহা অস্ত্র,
ভবরোগহারী ! শরণ লইনু
শ্রীগুরু, তোমারই পায় !
নরদেব ! প্রভু, তোমারই হউক জয় !
সমাহিত তব চিত্ত, হে দেব,
অদ্বয়-মহাতত্ত্বে
আবৃত সদা ভকতি-বসনে
প্রোজ্জ্বল, মধুময় !
লোককল্যাণ-নিরত সদাই
অদ্ভুত তব কর্ম,
ভবরোগহারী ! শরণ লইনু
শ্রীগুরু, তোমারই পায় !
নরদেব ! প্রভু, তোমারই হউক জয় !

কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন স্থূলশরীরে দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, আনন্দের হাট-বাজার বসিয়া থাকিত সেই ঘরটিতে। যিনি আনন্দস্বরূপ, তাঁহার সহিত তিনি সর্বদা এক হইয়া থাকিতেন, আবার একই সঙ্গে তাঁহার বিশ্বরূপ—লীলামূর্তিও দর্শন করিতেন। 'ভাবমুখে অবস্থান', 'অবতার' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা ব্যতীত যুক্তির দিক দিয়া ইহা ধারণা করা অসম্ভব; যেমন অসম্ভব ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যাহা বলিয়াছেন: তিনি সাকারও, নিরাকারও, এবং আরও কত কি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজের এই অবস্থাকে 'বিজ্ঞানী'র অবস্থা বলিয়া, শ্রীভগবানকে সাকার, নিরাকার সব ভাবে প্রত্যক্ষ করার পরের অবস্থা বলিয়া বর্ণনাকালে ইহারই ইঙ্গিত দিয়াছেন—"বিজ্ঞানীর অবস্থায় রেখেছে······ব্রহ্মজ্ঞানের পরও আছে। জ্ঞানের পর বিজ্ঞান।······একমতে দর্শন হয় না—কে কাকে দর্শন করে। আপনিই আপনাকে দেখে।" একমতে অর্থাৎ অদ্বৈত মতে—এমতে চরম সত্যকে 'দর্শন' করা যায় না। নিজেই নিজেকে দেখা যায় না; দেখিতে হইলে, এই মতে, যুক্তির দিক দিয়া, যাহা দেখিতেছি তাহা হইতে নিজেকে আলাদা করিতে হয়। যুক্তির দিক দিয়া, নিজেকে একটু নামাইয়া আনিয়া দেখিতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কিন্তু স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছেন যে ইহা নিজেই নিজেকে দেখা, এবং এই অবস্থা ব্রহ্মজ্ঞানেরও পরের অবস্থা, আগের নহে।

সাকার হইতে নিরাকারে, ইহা আমরা বুঝি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অদ্বৈত-সাধনার পূর্বে মা-কালীর চিন্ময়ী মূর্তি জ্ঞানখড়্গ দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিয়া তাহারও পারে চলিয়া গেলেন, ইহাও যুক্তির দিক হইতে ধারণা করা যায়। কিন্তু তাহারও পরের কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা যুক্তির অতীত।

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, জীবন্মুক্ত পুরুষ প্রভৃতি সম্বন্ধে আমরা কিছুটা ধারণা করিতে পারি, কিন্তু অবতার পুরুষের অবস্থা সম্বন্ধে তাই ধারণা করা অসম্ভব; উপলব্ধি ছাড়া আধ্যাত্মিক রাজ্যের সব তত্ত্বের ধারণাই অস্পষ্ট থাকে: শাস্ত্র পড়ে তাঁকে এক রকম বোঝা যায়; সাধন করে আর এক রকম। আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেন, তখন আর এক রকম।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বিবেকবৈরাগ্যহীন শাস্ত্রচর্চার বিশেষ মূল্য দিতেন না। বারে বারে তিনি বলিয়াছেন, যে ভাবেই হোক তাঁর দিকে আগাইয়া যাওয়াই হইল আসল কাজ। তারপর বোঝাবুঝি পরে আপনি হইয়া যাইবে—যদুমল্লিকের সঙ্গে একবার দেখা হইলে তাহার কোথায় কি আছে, সবই জানা যাইবে। "কি জান, এটা (সাকার ও নিরাকার দর্শনে কিরূপ অনুভূতি হয়) ঠিক বুঝতে সাধন চাই। ঘরের ভিতর রত্ন যদি দেখতে চাও, আর নিতে চাও, তাহলে পরিশ্রম করে চাবি এনে দরজার তালা খুলতে হয়। তারপর রত্ন বার করে আনতে হয়। তা না হলে তালা দেওয়া ঘর—দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে ভাবছি, 'ঐ আমি দরজা খুললুম, সিন্দুকের তালা ভাঙ্গলুম,—ঐ রত্ন বার করলুম।' শুধু দাঁড়িয়ে ভাবলে হয় না। সাধন করা চাই।"

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে*

স্বামী সারদানন্দ

আমাদিগের স্মরণ আছে, বেলা দুই প্রহরের কিছু পূর্বে সেদিন[১] আমরা সিমলার গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীটস্থ নরেন্দ্রনাথের ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলাম এবং রাত্রি প্রায় এগারটা পর্যন্ত তাঁহার সহিত অতিবাহিত করিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণানন্দ স্বামিজীও সেদিন আমাদিগের সঙ্গে ছিলেন। প্রথম দর্শন-দিন হইতে আমরা নরেন্দ্রের প্রতি যে দিব্য আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, বিধাতার নিয়োগে উহা সেদিন সহস্রগুণে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। ইতঃপূর্বে আমরা ঠাকুরকে একজন ঈশ্বরজানিত ব্যক্তি বা সিদ্ধপুরুষ মাত্র বলিয়া ধারণা করিয়াছিলাম। কিন্তু ঠাকুরের সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথের অদ্যকার প্রাণস্পর্শী কথাসমূহ আমাদের অন্তরে নূতন আলোক আনয়ন করিয়াছিল। আমরা বুঝিয়াছিলাম, মহামহিম শ্রীচৈতন্য ও ঈশা প্রভৃতি জগদ্‌গুরু মহাপুরুষগণের জীবনেতিহাসে লিপিবদ্ধ যে সকল অলৌকিক ঘটনার কথা পাঠ করিয়া আমরা এতকাল অবিশ্বাস করিয়া আসিতেছি, তদ্রূপ ঘটনাসকল ঠাকুরের জীবনে নিত্যই ঘটিতেছে—ইচ্ছা বা স্পর্শমাত্রেই তিনি শরণাগত ব্যক্তির সংস্কারবন্ধন মোচনপূর্বক তাহাকে ভক্তি দিতেছেন, সমাধিস্থ করিয়া দিব্যানন্দের অধিকারী করিতেছেন অথবা তাহার জীবনগতি আধ্যাত্মিক পথে এরূপভাবে প্রবর্তিত করিতেছেন যে, অচিরে ঈশ্বরদর্শন উপস্থিত হইয়া চিরকালের মত সে কৃতার্থ হইতেছে। আমাদের মনে আছে, ঠাকুরের কৃপা লাভ করিয়া নিজ জীবনে যে দিব্যানুভবসমূহ উপস্থিত হইয়াছে, সে-সকলের কথা বলিতে বলিতে নরেন্দ্রনাথ সেদিন আমাদিগকে সন্ধ্যাকালে হেদুয়া পুষ্করিণীর ধারে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছিলেন এবং কিছুকালের জন্য আপনাতে আপনি মগ্ন থাকিয়া অন্তরের অদ্ভুত আনন্দাবেশ পরিশেষে কিন্নরকণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছিলেন—

"প্রেমধন বিলায় গোরা রায়। চাঁদ নিতাই ডাকে আয় আয়। (তোরা কে নিবি রে আয়।)
প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়!
প্রেমে শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়! (গৌর-প্রেমের হিল্লোলেতে)
নদে ভেসে যায়।"

গীত সাঙ্গ হইলে নরেন্দ্রনাথ যেন আপনাকে আপনি সম্বোধনপূর্বক ধীরে ধীরে বলিয়াছিলেন, "সত্যসত্যই বিলাইতেছেন! প্রেম বল, ভক্তি বল, জ্ঞান বল, মুক্তি বল, গোরা রায় যাহাকে যাহা ইচ্ছা তাহাকে তাহাই বিলাইতেছেন। কি অদ্ভুত শক্তি! (কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিবার পরে বলিতেছেন) রাত্রে ঘরে খিল দিয়া বিছানায় শুইয়া আছি, সহসা আকর্ষণ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে হাজির করাইলেন—শরীরের ভিতরে যেটা আছে সেইটাকে; পরে কত কথা কত উপদেশের পর পুনরায় ফিরিতে দিলেন। সব করিতে পারেন—দক্ষিণেশ্বরের গোরা রায় সব করিতে পারেন!"

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া তামসী রাত্রিতে পরিণত হইয়াছে। পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পাইতেছি না, প্রয়োজনও হইতেছে না। কারণ নরেন্দ্রের জলন্ত ভাবরাশি মরমে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তরে এমন এক দিব্য মাদকতা আনিয়া দিয়াছে—যাহাতে শরীর টলিতেছে এবং এতকালের বাস্তব জগৎ যেন দূরে স্বপ্নরাজ্যে অপসৃত হইয়াছে, আর অহেতুকী কৃপার প্রেরণায় অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের সান্তবৎ হইয়া উদয় হওয়া এবং জীবের সংস্কার-বন্ধন বিনষ্ট করিয়া ধর্মচক্র-প্রবর্তন করারূপ সত্য—যাহা জগতের অধিকাংশের মতে অবাস্তব কল্পনা-সম্ভূত—তাহা তখন জীবন্ত সত্য হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে!

* 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' হইতে

১ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের শীতকাল

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

(স্বামী অদ্বৈতানন্দজীকে লিখিত)

শ্রীশ্রীগুরুদেব

শরণং

শ্রীবৃন্দাবন ধাম

৭ই ভাদ্র, সন ১৩০০ সাল

(২২. ৮. ১৮৯৩)

গোপাল দাদা,

আমরা অনেকদিন পরে তোমার আশীর্বাদপত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। আমরা যখন বোম্বে ছিলাম তখন নরেন্দ্রনাথের সহিত মিলিয়া নিরতিশয় প্রীত হইয়াছিলাম। পরে তিনি স্বয়ং আমাদিগকে আবু পাহাড়ে বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া যান, আমরা সেখানে প্রায় তিনমাস থাকিয়া নীচে নামিয়া গঙ্গাধরের সহিত মিলিত হই ও একসঙ্গে জয়পুরে আসি। তথায় পনের দিন ছিলাম। প্রায় একমাস হইল এ ধামে আসিয়াছি, শীঘ্রই ব্রজের গ্রামে যাইবার বাসনা আছে। গঙ্গাধর খেতড়িতে গিয়াছে। তাহার নিকট হইতে পত্রও পাইয়াছি, সে ভাল আছে। আলমোড়া হইতে তারক দাদাও পত্র লিখিয়াছেন, তিনিও ভাল আছেন। আমাদের ৺কাশী যাইবার খুব ইচ্ছা আছে, এখন বিশ্বনাথের দয়া হইলেই হয়। কলিকাতা বরাহনগরের চিঠি আসিয়াছে, গুরুদেবের কৃপায় সংবাদ মঙ্গল। আমাদের প্রণাম জানিবে। আমরা এক্ষণে পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল আছি।

বাগবাজারের হরিমোহনকে তুমি চেন বোধ হয়, আমাদের মঠে কখন কখন আসিত। বেশ ফুটফুটে, পাতলা, ছোট, বছর ১৯।২০ আন্দাজ বয়স, এখন ২৫ ২৬ হইবে ; সে বাটী হইতে রাগ করিয়া আজ দেড় মাস হইল পালাইয়াছে। তাহার কাকা আমাদের পত্র লিখিয়াছে। যদি সন্ধান পাও আমাদের অথবা নিমাইচরণ ঘোষ ৫৩নং বাবুপাড়া লেন বাগবাজার কলিকাতা ঠিকানায় অনুগ্রহ করিয়া খবর দিলে বিশেষ পরোপকার করা হইবে। হরিমোহনের ঠাকুরমা ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধা, তাহার শোকে মৃতকল্পা হইয়া রহিয়াছে। আমরা হরিদ্বারেও কোন পরিচিতের নিকট এই জন্য এক পত্র লিখিতেছি। গঙ্গাধরকেও লিখিয়াছি ও পুনরায় লিখিব। তুমি কেমন আছ ? নিবেদন ইতি।

দাস

শ্রীরাখাল ও হরি

শ্রীরামকৃষ্ণ

(গান)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

তোমাকে প্রণাম চির-অভিরাম শ্রীরামকৃষ্ণ যুগাবতার !
শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে মা বিনা যে কিছু জানে নি আর ।
দুহাতে কেবল বিলালে অমল জগন্মাতার মহাপ্রসাদ,
ভুলিয়া মায়ায় ভুলিয়া ধরায় ছিলাম আমরা যাহার স্বাদ ।

গাহিলে মধুরে ঃ "যে শিশুর সুরে কেঁদে ডাকে ঃ 'মাগো কোথা তুমি,'
'আয় আয়' ব'লে টেনে নেয় কোলে মা তারে—কপোলে স্নেহে চুমি' ।
সে-প্রেমময়ীর প্রেমই বুকে বুকে ঝরে যুগে যুগে মধুরিমায়,
সে-আলোময়ীর নয়নমণির আলো জ্বলে রবি শশি তারায়

"মা তারেই পায় দেন ঠাঁই—চায় গহন হিয়ায় যে তাঁহারে,
চরণে তাঁর যে শরণ না চায়—ঘুরে মরে হায় সে আঁধারে ।
মানবজীবন সফলসাধন হয় শুধু সুধাপরশে তাঁর ।
সে-সুধায় যার মিটে ক্ষুধা—তার থাকে কি অভাব ভুবনে আর ?

"জ্ঞানের গরব, বিভূতি-বিভব কত ছলে জনে জনে ভুলায় !—
সোনার-হরিণ মৃগয়ায় করে উধাও রঙিন সুখ-আশায় !
জানিতে সে চায় —বনবীথিকায় আছে কত শাখা, পাতা ও ফুল !
শুধু যায় ভুলে—ফলই প্রাণদাতা, বিদ্যাভিমান মিথ্যামূল ।"

চাও নি কিছুই আপনার তরে, করো নি চিন্তা—কী হবে কাল !
ঝরালে মোহন অমৃত-বচন পতিতপাবন রূপে দয়াল !
তাই যোগী মুনি কবি জ্ঞানী গুণী গায় নাম তব আঁখিজলে ঃ
বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ লুটালো তোমার পদতলে ।

(কোরাস)

ধনজনমান-কামনার মোহে দেখে আমাদের অন্ধ ম্লান
ঝলকিয়া নিশা উজলিয়া দিশা উছলিয়া উষা এলে মহান্ !

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনাদর্শ

স্বামী আদিনাথানন্দ

ব্যক্তি- ও সমাজ-জীবনে অবিরত অন্তরে-বাহিরে দেবাসুর-দ্বন্দ্ব আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কখনও দেবশক্তির প্রাধান্য, কখনও বা আসুরিক শক্তির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। যখনই আসুরিক শক্তি প্রাধান্য লাভ করে, ঐশীশক্তিসম্পন্ন কোনও মহাপুরুষ বা ঈশ্বরের অবতার মানবকল্যাণে দেহধারণ করিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হন ও পথভ্রষ্ট, হতবুদ্ধি মানবকে অমৃতের সন্ধান দেন। ইতিহাস ইহাই সাক্ষ্য দেয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে একদিকে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ যখন প্রাণচঞ্চল পাশ্চাত্য জড়সভ্যতার মোহে নিজস্ব কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছিল এবং অপরদিকে অতৃপ্তভোগতৃষ্ণা ও নিত্য নূতন ভোগবাসনার আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবনে বিভ্রান্ত ও অবসাদগ্রস্ত পাশ্চাত্যবাসী অগ্নি-উদ্গীরণে উন্মুখপ্রায় আগ্নেয়গিরির শিখরে আরূঢ় থাকিয়া আত্মধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিতেছিল, তখন মানবের কল্যাণার্থে মানবপ্রেম ও ধর্ম-সমন্বয়ের অভয়বাণী প্রচার করিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁহার আবির্ভাবে ভারত ও পাশ্চাত্যে ধর্ম-জগতে এক নব জাগরণ সূচিত হয়। পাশ্চাত্য মনীষী রোমা রোলাঁ এই আবির্ভাবকে 'নবযুগের পথপ্রদর্শক' এবং নব জীবনের 'দিশারী' রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন (the pilot and guide for the needs of the new age)।

প্রায় সার্ধ এক শতাব্দী পূর্বে কলিকাতা নগরীর উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে যাঁহার আবির্ভাব উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুধর্মের নব-জাগরণের মূল উৎস, যাঁহার উপদেশে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের অন্তঃকলহ-সমাধানের উপায় সুগম হইয়াছে, যাঁহার পরধর্মসহিষ্ণুতা ও সর্বধর্ম-সমন্বয়ের বাণী নিজ আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারিগণ কর্তৃক পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বাহিত হইয়া অগণিত নরনারীর প্রাণে শান্তি সিঞ্চন করিয়াছে, আজ হিংসা, দ্বেষ, ভয়, সন্দেহ ও নব নব বিভীষিকাময় ধ্বংসাত্মক অস্ত্রসম্ভার-সজ্জায় সন্ত্রস্ত মানবজাতির হৃদয়ে সাহস, বিশ্বাস ও প্রেম উদ্বুদ্ধ করিয়া শান্তিস্থাপনে তাঁহার জীবন ও শিক্ষাই একমাত্র অবলম্বন।

আজ তিনি স্থূল দেহে ধরাধামে প্রকট না থাকিলেও তাঁহার অভিনব জীবনাদর্শ, অভূতপূর্ব শিক্ষা ও অমূল্য উপদেশই মানবজাতির একমাত্র পথপ্রদর্শকরূপে প্রেরণা দিতে সক্ষম। এই দিব্য জীবন ও বাণীর স্মরণ, মনন, প্রণিধান ও অনু-সরণই মানবকল্যাণের একমাত্র পন্থা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, নবাবী আমলের মোহর, যত মূল্যবানই হউক, অন্য যুগে অচল। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-নির্দেশিত পথেই বর্তমান মানব মুক্তিপথের সন্ধান পাইবে। যদিও শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের প্রাক্কালে প্রাচীন শাস্ত্রাদি ও অবতার পুরুষদের বাণী যুগপ্রয়োজন-সাধনে অচলপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণ সেগুলির কোনটিকেই বর্জন করিতে না বলিয়া স্বীয় ব্যবহারিক জীবনের ও উপদেশের মাধ্যমে এই কথাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, সকল ধর্মেরই অন্তর্নিহিত সারমর্ম সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং সকল ধর্মই মানুষকে অভীপ্সিত

পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিতে পারে। স্থানকালপাত্র-ভেদে এবং অভিরুচি অনুযায়ী বিভিন্ন মানুষের অগ্রগতির ধারা বিভিন্ন হইতে বাধ্য। কাজেই প্রাচীন ধর্ম সবগুলিই থাকা চাই; শুধু সেগুলিকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া যুগোপযোগীভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পূর্ণ নবীন দৃষ্টিভঙ্গি মানবজাতির মৈত্রী, ঐক্য ও শান্তির পথ সুগম করিতে বিশেষরূপে সহায়তা করিয়াছে।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় হইতে ভারতের সর্বত্র এক নবীন আধ্যাত্মিক প্লাবন আসিয়াছে এবং তাহার তরঙ্গ পাশ্চাত্যেও গিয়া পৌঁছিয়াছে। নবজীবনের স্পন্দন এবং অতীত আধ্যাত্মিক গৌরবের জাগ্রত চেতনা ভারতকে ভরপুর করিয়াছে। আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও অন্যান্য স্থানে বহুসংখ্যক কেন্দ্রের মাধ্যমে তাঁহার সার্বজনীন, অনুপম, উদার বাণী জড়সর্বস্ব জগতে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে নিজস্ব কৃষ্টি ও আনুষ্ঠানিক আদর্শের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া ভাববিনিময়ের পথ বহুলাংশে সুগম করিতেছে। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে বস্টনে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথি উপলক্ষে এক ভাষণে খ্যাতনামা ঐতিহাসিক সরোকিন বলিয়াছিলেন, 'পাশ্চাত্যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা ও বেদান্ত প্রচারের সফলতা বর্তমান মানবেতিহাসে দুইটি মৌলিক প্রক্রিয়া সংঘটনের লক্ষণ।' স্বামীজী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে জগতে এক নবীন সভ্যতার প্রারম্ভ সূচিত হইয়াছে; প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কৃষ্টির যাহা কিছু উৎকৃষ্ট তাহা সম্মিলিত হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের মাহাত্ম্য ও বর্তমান মানবজাতির জীবনে তাঁহার আধিপত্যের হেতু অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিই মনে ভাসিয়া উঠে।

বিগত চারি সহস্র বৎসর ব্যাপী ভারতীয় কৃষ্টি যে আধ্যাত্মিক সম্পদে সমৃদ্ধ, তাঁহার জীবনে তাহাই পুনঃপ্রকাশ লাভ করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে মানুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়-বহির্ভূত সব কিছুতে, আধ্যাত্মিক সত্যেও আস্থা হারাইতে থাকে এবং ঐশ্বর্য, ক্ষমতা ও জাগতিক সুখভোগকে জীবনের চরম লক্ষ্য জ্ঞানে তৎপ্রতি অত্যধিক আসক্ত হয়; সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়া প্রমাণ করেন যে, ঈশ্বর ও আত্মা সত্য এবং আন্তরিকতার সহিত সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে চেষ্টা করিলে এই জীবনেই এ সত্য উপলব্ধি করা সকলেরই পক্ষে সম্ভব। যোগ, সমাধি, জীবন্মুক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহার নিকট শুধু কথার কথা ছিল না; কঠোর সাধনা দ্বারা তিনি উপলব্ধির বিভিন্ন স্তরে, সর্বোচ্চ স্তরেও আরোহণ করিয়াছিলেন এবং নিজের এই উপলব্ধি দ্বারা শাস্ত্রোক্ত সত্যগুলিকে এই ঘোর নাস্তিকতা, অবিশ্বাস ও জড়বিজ্ঞানের যুগে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

ভারতে ও পাশ্চাত্যে চিন্তাধারার বর্তমান প্রবণতার একটি হইল, ধর্মনিরপেক্ষ মানবিকতা; অর্থাৎ ঈশ্বরসম্পর্ক-বর্জিত সৎপথে জীবনযাপন। মানবধর্মীদের মতে সমাজের হিতসাধন এবং সঙ্গতি- ও সহযোগিতা-বিধান করাই যথেষ্ট; ঈশ্বর, আত্মা ও পরকাল ইত্যাদি বিষয়ে বৃথা চিন্তা অবান্তর; কারণ এই সকল বিষয় দুর্জ্ঞেয়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ জীবন দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, এই আদর্শ ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। তাঁহার জীবনের শিক্ষায় প্রথমে ঈশ্বরের ও তৎপরে জগৎসংসারের স্থান। যীশুখ্রীষ্টের ন্যায় তিনিও বলিয়াছিলেন, 'প্রথমে স্বর্গরাজ্যের সন্ধান কর, বাকী সব পরে আপনিই আসিবে।' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন: বিদ্যাসাগর জানে না যে, মানুষের অভ্যন্তরে

একটি রত্ন আছে; মানুষের অন্তরে ঈশ্বর রহিয়াছেন—তিনিই এই রত্ন; জীবনে সর্বাগ্রে তাঁহাকেই জানিতে হইবে। চিন্তায় ও আচরণে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করিয়া কি ভাবে জীবনের আমূল পরিবর্তন-সাধন সম্ভব, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহা বলিয়া ও নিজজীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। সংসার-ত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী না হইয়াও সাংসারিক কর্তব্যের মধ্যে থাকিয়াই ভগবানলাভ করা যায়; ইহার উপায়, ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রাখিয়া কাজ করা, অন্তরে বৈরাগ্য ও প্রশান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করা এবং যে ঐশী শক্তি আমাদের জীবন, কর্মক্ষমতা ও সত্তা নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, তাহার উপর নির্ভরতা অভ্যাস করা। পৃথিবীর ইতিহাসে তিনিই প্রথম বিশ্বমানবিকতা প্রচার করেন। তাঁহার মানবিকতা বর্তমান চিন্তা-জগতে এক নূতন ধারার সূচনা করিয়াছে, কারণ তাহা ঈশ্বরদর্শন-রূপ প্রত্যক্ষ-উপলব্ধি-সঞ্জাত। একমাত্র সামাজিক কর্তব্য বা মানব-প্রীতি সাধন করিলেই আমাদের অন্তরের ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় না, আমাদের আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধান হয় না। তিনি ঈশ্বরারাধনা ও নারায়ণজ্ঞানে জীবসেবা উভয়কেই সমান প্রাধান্য দিয়াছেন; আমাদের নীতি হওয়া উচিত নিজের মুক্তি এবং জগতের কল্যাণ সাধন—এই তাঁহার শিক্ষা। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।"

পূর্ণতালাভের জন্য জীবনে আত্মোপলব্ধি ও জীবসেবার মিলিত রূপায়ণের প্রয়োজন। সুতরাং 'মানুষের অন্তরে দেবতা বাস করেন এবং মানুষই দেবতায় পরিণত হয়'—তাঁহার এই শিক্ষা উচ্চতর আদর্শস্থানীয় ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি-প্রস্তুতির সহায়ক, যেখানে মানুষে-মানুষে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে ও ধর্মে-ধর্মে ভেদের কোন স্থান নাই। যে সকল বাধা মানুষে-মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে তাহা সবই, সর্ববিধ বর্জন ও ভেদই ইহা দ্বারা দূরীকৃত হইবে। তিনি এমন এক আধ্যাত্মিক গণতন্ত্রের ইঙ্গিত দিয়াছেন, যেখানে সর্ববিধ উগ্রতা, তিক্ততা ও মতভেদ পরিহার করিয়া সকল ধর্মই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম। এই মতানুযায়ী মানুষ অসত্য হইতে সত্যে পৌছায় না, শুধু সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে পৌছায়। নিম্নতম জড়োপাসনা হইতে উচ্চতম অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত প্রত্যেকটিই নিজস্ব প্রকৃতি ও ধারণাশক্তি অনুযায়ী ভগবৎরাজ্যে প্রবেশলাভের সহায়ক বিভিন্ন ধাপ—ইহা বুঝিতে পারিলে ধর্মসম্বন্ধীয় সব দ্বন্দ্ব, সব ধর্মান্ধতা দূরীভূত হইবে। বর্তমান কালে ইহার বিশেষ প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কোনও নূতন ধর্ম প্রবর্তন করেন নাই। সুদূর অতীত হইতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অদ্যাবধি ভারতের বিভিন্ন অংশে ঋষিকণ্ঠনিঃসৃত যে জাতীয় সুরলহরী ধ্বনিত হইতেছে, তাহাই জোরালো করিয়া আমাদের শ্রবণগম্য করিয়াছেন। ডাঃ রাধাকৃষ্ণন বেশ সুন্দর ভাবে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন, 'অনন্তের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনদর্শন' (Life in the perspective of the Eternal)

শ্রীরামকৃষ্ণের একক জীবনে মানবজাতির আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছিল; একেশ্বরবাদ, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, শাক্ত মত, বৈষ্ণব মত অথবা অন্য কোনও প্রকার আরাধনা বা অনুষ্ঠানগুলির কোনও একটি বিশেষ অংশ নয়। স্বীয় জীবনে কঠোর সাধনা দ্বারা তিনি মানবজাতির সমগ্র আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং পৃথিবীর সকল শাস্ত্রের সত্যতা আপন অনুভূতি দ্বারা প্রমাণিত করেন। এই কারণেই স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা

করিবার সময় জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে উচ্চভাব প্রচারই ইহার উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করেন।

ধর্মজগতে তাঁহার আর একটি অবদান, পারমার্থিক বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের স্বাধীনতার স্বীকৃতি। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে যে পথ সর্বাপেক্ষা উপযোগী, তাহা বাছিয়া লইয়া আন্তরিক ভাবে তাহাতে লাগিয়া থাকাই তাহার কর্তব্য। বিভিন্ন মতবাদ, অনুষ্ঠান ও সাধনপদ্ধতি লইয়া বিবাদে কোনও সার্থকতা নাই, কারণ উপযুক্ত উপদেষ্টার অধীনে আন্তরিকতার সহিত সাধন করিলে প্রত্যেকটিই ঈশ্বরোপলব্ধির পথে পরিচালিত করিতে সক্ষম।

সুতরাং তাঁহার শিক্ষা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে বিভিন্ন প্রকার মানুষকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও আলোকের উচ্চ শিখরে উন্নীত করিবার পন্থারূপে সকল ধর্মেরই সহাবস্থানের (co-existence) অধিকার রহিয়াছে। পৃথিবীতে এই হিতকারী শিক্ষা সর্বথা গৃহীত না হওয়ায় মানবজাতিকে বহু দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। যতশীঘ্র ইহা সম্যক গৃহীত হইবে তত শীঘ্রই বিভিন্ন ধর্মে মৈত্রী ও ঐক্য স্থাপিত হইবে এবং ধর্মান্ধতা- ও একদেশিকতা-জনিত অনৈক্য দূরীভূত হইবে।

প্রকৃতধর্মাচরণে জাগতিক বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের অসীম শক্তি নিহিত, তাঁহার জীবনই এ বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ।

ভারতে শুধু সমাজসংস্কার বা আর্থিক পরিকল্পনা দ্বারা সামাজিক ত্রুটি বা কুসংস্কার দূর করা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক বক্তৃতা অথবা সময়ে সময়ে সাধুতা, দেশপ্রীতি ও সমাজসেবার উপদেশ দ্বারা জাতি তাহার স্বাভাবিক দুর্বলতা পরিহার করিয়া সজীবতা ও বল সঞ্চয় করিতে পারে না। ধর্মানুরাগ, আত্মত্যাগ-প্রবণতা ও জনসেবার ভাব দ্বারাই সমাজসংস্কার ও নর-নারীকে আদর্শ নাগরিকে পরিণত করা সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুপম জীবন ও সুউচ্চ প্রেরণাদায়ক উপদেশ ব্যষ্টির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া এক সুসভ্য ও নীতিজ্ঞানসম্পন্ন পুনরুজ্জীবিত সমাজ এবং আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলিষ্ঠ জাতি গঠনে সহায়তা করিবে। সেই নবগঠিত জাতি ও সমাজ জগৎকে চমৎকৃত করিবে সন্দেহ নাই।

পৃথিবীকে যদি ব্যাপক হিংসাদ্বেষ এবং শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতিলব্ধ অস্ত্রাদিজনিত ধ্বংসলীলা হইতে রক্ষা করিতে হয় এবং মানবজাতিকে যুদ্ধভীতি হইতে মুক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে মানুষে-মানুষে একটি নূতন ধরনের সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে প্রয়াস পাইতে হইবে। মানুষকে শুধু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীব বলিয়া মনে না করিয়া, তাহার সত্তায় নিহিত গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়া তাহাকে তাহার প্রাপ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পারিলেই মানবজাতির ভবিষ্যৎ মঙ্গলের সূচনা হইবে।

মানবজাতির প্রয়োজন বিচার ও প্রেমের নির্দেশানুযায়ী জীবনযাপন করিতে শিক্ষা করা। বিশ্বমানবের একত্বের সর্বোচ্চ আদর্শ উপলব্ধি করিবার পন্থারূপেই জীবনকে গ্রহণ করিতে শিক্ষা করা আবশ্যক, যাহাতে মানব-জাতি স্বার্থ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিকট আত্মসমর্পণ না করে। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত আধ্যাত্মিক জীবনাদর্শ অনুসরণ করিলেই মানবজীবনের এক নূতন তাৎপর্য প্রতিভাত হইবে এবং আমাদের দৃষ্টিপথে প্রেমময়, সেবাপরায়ণ ও ঈশ্বর-কেন্দ্রিক জীবনালেখ্য উদ্ঘাটিত হইবে।

শক্তির উৎস

ডক্টর বিশ্বরঞ্জন নাগ

বিজ্ঞানে বিশেষ অর্থে 'কাজ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কোন জিনিসকে বলের বিপরীতে স্থানান্তরিত করা হ'লে বলা হয় কাজ করা হয়েছে। কাজের পরিমাণ হ'ল, যতটা দূরে স্থানান্তরিত করা হ'ল সেই দূরত্ব ও বলের পরিমাণের গুণফল। যখন কোন ভারী জিনিসকে উঁচুতে তোলা হয় তখন মাধ্যাকর্ষণের বলের বিরুদ্ধে ভারটি স্থানান্তরিত হয় বলেই কাজ করা হয়। যখন পৃথিবীপৃষ্ঠের উপরে রেখে কোন জিনিসকে সরান হয় তখন ঘর্ষণের বলের বিরুদ্ধে এই কাজ করা হয়। যখন কোন ঘড়িতে দম দেওয়া হয় তখন স্প্রীংএর পরমাণুগুলির পরস্পরের আকর্ষণের বিরুদ্ধে কাজ করা হয়।

শক্তি হ'ল কোন জিনিসের কাজ করার ক্ষমতা। সভ্যতার প্রথম যুগে মানুষের দৈহিক ক্ষমতাই ছিল শক্তির একমাত্র উৎস। কালক্রমে পশুদের বশে আনার পরে ঘোড়া, গরু ও উট-, জাতীয় পশুর দৈহিক ক্ষমতা হ'ল শক্তির অন্য উৎস। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে শক্তির বিভিন্ন উৎস মানুষের আয়ত্তে এসেছে—যেমন কয়লা বা তেলের রাসায়নিক শক্তি, বায়ুর গতির শক্তি, উচ্চস্থানে সঞ্চিত জলের শক্তি। বাষ্পীয় যন্ত্র (Steam engine), বায়ু-নির্ভর যন্ত্র (Wind mill) ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র (Electric generator) ব্যবহার করে ঐ শক্তির উৎসগুলি থেকে শক্তিকে মানুষ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করছে। এই বিভিন্ন ধরনের শক্তির উৎস নিয়ে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে আলাদা জিনিস থেকে শক্তি আহরণ করা হ'লেও শক্তির মূল উৎস হ'ল দুটি। একটি হ'ল রাসায়নিক শক্তি এবং দ্বিতীয়টি হ'ল সূর্যের শক্তি। কয়লা বা তেল পুড়িয়ে যখন বাষ্পীয় বা তৈলচালিত (Diesel) যন্ত্র চালান হয় তখন কয়লা বা তেলের রাসায়নিক শক্তিই ব্যবহার করা হয়। আবার যখন বায়ুর গতিবেগের সাহায্যে বায়ু-নির্ভর যন্ত্র চালানো হয় বা জলধারার সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় তখন সূর্যের শক্তি ব্যবহার করা হয়। সূর্যের শক্তিই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে তাপ সৃষ্টি ক'রে বায়ুতে গতি সঞ্চারিত করে এবং সমুদ্রের জলকণাকে বাষ্প করে—যে বাষ্প তুষাররূপে উচ্চস্থানে সঞ্চিত হয় এবং জলধারা হ'য়ে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে। তাই রাসায়নিক শক্তি ও সূর্যের শক্তির মূল কথা কি তা জানা গেলে শক্তির মূল উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়।

অণু ও পরমাণুর গঠন থেকে রাসায়নিক শক্তি কিভাবে সৃষ্ট হয়, তা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে থাকে একটি কেন্দ্রীন এবং এই কেন্দ্রীনের চারপাশে ঘুরে বেড়ায় কতকগুলি ইলেকট্রন। কেন্দ্রীন ধনাত্মক (Positive) তড়িৎযুক্ত এবং ইলেকট্রন ঋণাত্মক (Negative) তড়িৎযুক্ত। তড়িতের গুণ হ'ল—বিপরীতধর্মী তড়িৎযুক্ত বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। স্বাভাবিক ভাবে তাই মনে হয়, পরমাণুর মধ্যে কেন্দ্রীনের সঙ্গে ইলেকট্রনগুলির মিলিত হ'য়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু দেখা যায় কেন্দ্রীনের সঙ্গে মিলিত না হ'য়েও ইলেকট্রনগুলি বিশেষ

বিশেষ দূরত্বে কেন্দ্রীনের চারপাশে ঘুরতে থাকে। কেন এই বিশেষ দূরত্বের কক্ষগুলিতে ইলেকট্রনগুলি স্থায়িভাবে থাকতে পারে তার সহজ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়—একে প্রকৃতির একটি নিয়ম রূপেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রীনের চারপাশে ঘুরতে থাকা অবস্থায় ইলেকট্রনগুলিতে শক্তি সঞ্চিত থাকে। প্রথমতঃ, ইলেকট্রনগুলির গতিজনিত শক্তি—যে ধরনের শক্তি থাকে একটি ছুড়ে দেওয়া গোলকে বা বলে। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীনের বলক্ষেত্রে অবস্থানজনিত শক্তি—যে ধরনের শক্তি থাকে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে উঁচুতে রাখা কোন ভারে। সৃষ্টির গোড়াতেই যখন বিশ্বের যাবতীয় মৌলিক পদার্থের পরমাণু তৈরী হয় তখনই পরমাণুর ইলেকট্রনগুলিতে এই শক্তি সঞ্চিত হয়েছে। যৌগিক পদার্থের অণুর ইলেকট্রনগুলিতেও এমনি শক্তি থাকে। যেমন, একটি কার্বন-ডাই-অক্সাইডের অণু; এই অণুতে আছে দুটি অক্সিজেনের পরমাণু ও একটি কার্বনের পরমাণু। সাধারণভাবে তাই ভাবা যেতে পারে, একটি কার্বন-ডাই-অক্সাইডের অণুর ইলেকট্রনগুলিতে সঞ্চিত শক্তির মোট পরিমাণ হবে দুটি অক্সিজেনের পরমাণুর ইলেকট্রন ও একটি কার্বনের পরমাণুর ইলেকট্রনে সঞ্চিত শক্তির যোগফল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয় না। কেননা যখন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের অণু গঠিত হয় তখন কার্বন ও অক্সিজেনের পরমাণুর ইলেকট্রনগুলি শুধুমাত্র একটি কেন্দ্রীনের বলক্ষেত্রে থাকে না—থাকে তিনটি কেন্দ্রীনের মিলিত বলক্ষেত্রে।

যখন কয়লা বা তেল পোড়ান হয় তখন যে রাসায়নিক পরিবর্তন হয় তাতে পরমাণুগুলি স্থান পরিবর্তন করে নূতন অণুর সৃষ্টি করে। যেমন ধরা যাক কার্বনের বা শুদ্ধ কয়লার দহন। এই দহনের সময়ে কার্বনকে অক্সিজেনের সংস্পর্শে রেখে উচ্চ তাপমাত্রায় আনা হয়। উচ্চ তাপমাত্রায় কার্বন ও অক্সিজেনের পরমাণুগুলি সহজেই পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের অণু তৈরী করে এবং এই তৈরী হওয়ার ঘটনাটিই হ'ল কার্বনের দহন। দহনের পূর্বে একটি কার্বন ও দুটি অক্সিজেনের পরমাণুর ইলেকট্রনে যে শক্তি থাকে, দেখা যায় দহনে তৈরী কার্বন-ডাই-অক্সাইডের অণুর ইলেকট্রনে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ তা থেকে কম। এই উদ্বৃত্ত শক্তিই দহনের সময়ে তাপরূপে প্রকাশিত হয় এবং 'কাজ'-এ লাগে। এরকম যে সব রাসায়নিক পরিবর্তনে তাপ উৎপন্ন হয়—তার সবগুলিতেই পরমাণুর ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রীনের নিকটে থাকার জন্য ইলেকট্রনের মধ্যে যে শক্তি সঞ্চিত থাকে সেই শক্তিই ব্যবহৃত হয়। তাই বলা যেতে পারে, রাসায়নিক শক্তির উৎস হ'ল কেন্দ্রীন ও ইলেকট্রনের পরস্পরের বন্ধনজনিত শক্তি। যখন পরমাণুগুলি প্রথমে তৈরী হয়েছিল তখন অন্য কোন উৎস থেকে এই শক্তি এসেছিল। আবার সূর্য থেকে প্রতিনিয়ত শক্তি আহরণ করে উদ্ভিদজগৎ নিত্য নূতন অণু তৈরী করছে এবং এই শক্তি দাহ্যপদার্থে সঞ্চয় করছে। রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টিকালে পরমাণুর ইলেকট্রনে সঞ্চিত শক্তি বা সূর্য থেকে আহরণ করা শক্তিই মানুষ ব্যবহার করে

ভাবা যেতে পারে যে, সূর্যের শক্তিও কোন রাসায়নিক পরিবর্তন থেকে আসছে। রাসায়নিক পরিবর্তন থেকে শক্তি উৎপন্ন হওয়ার সময় একটি নির্দিষ্ট ভরের জিনিস ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের শক্তি পাওয়া যেতে পারে; শক্তির এই পরিমাণ বিভিন্ন রাসায়নিক পরিবর্তনে বিভিন্ন। কিন্তু সূর্যের ভর নিয়ে

হিসেব করলে দেখা যায় যে, মানুষের জানা কোন রাসায়নিক পরিবর্তন থেকে সূর্যের পুরো শক্তি উৎপন্ন হ'তে পারে না। তাই বহুদিন পর্যন্ত সূর্যের শক্তির উৎস মানুষের নিকট ছিল অজ্ঞাত। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে পদার্থ-বিদ্যায় নূতন কয়েকটি ঘটনা আবিষ্কৃত হয়, যা নিয়ে বিশেষ পরীক্ষা করে এই সমস্যার সমাধান হয়েছে।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আইনস্টাইন সিদ্ধান্ত করেন যে, কোন বস্তুর গতিজনিত শক্তি বৃদ্ধি পেলে বস্তুটির ভরের পরিবর্তন হয়, এবং ভরও হচ্ছে শক্তিরই অন্য রূপ। কাজেই গতিহীন অবস্থাতেও সব বস্তুতে প্রচুর শক্তি সঞ্চিত আছে। এই শক্তি পরমাণুর কেন্দ্রীন ও ইলেকট্রনের বন্ধন-জনিত শক্তির চেয়ে বহুগুণ বেশী। ভরের প্রধান অংশ কেন্দ্রীনে থাকে; তাই ভাবা যেতে পারে যে ভরজনিত শক্তি পরমাণুর কেন্দ্রীনকে আশ্রয় করেই আছে। যদি কোন প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীনের ভরের পরিবর্তন করা যায় তাহলে তার ফলে প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হবে। কিন্তু যত রকমের পরিবর্তনের কথা জানা ছিল, দেখা গেছে সে সবক্ষেত্রেই কেন্দ্রীন অপরিবর্তিত থাকে।

বিভিন্ন পরমাণুর কেন্দ্রীনের গঠন নিয়ে অনুসন্ধান করলে কিভাবে কেন্দ্রীনের ভরের পরিবর্তন হ'তে পারে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরমাণুর কেন্দ্রীন তৈরী হয় নিউট্রন- ও প্রোটন-কণার সমন্বয়ে। যেমন ধরা যাক হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীন। এই কেন্দ্রীনে আছে দুটি নিউট্রন ও দুটি প্রোটন। আশা করা যায়, হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীনের ভর হবে দুটি নিউট্রন ও দুটি প্রোটনের ভরের যোগফল। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীনের ভর এই যোগফলের চেয়ে কিছুটা কম। এই ভরের তারতম্যের নাম দেওয়া হয়েছে 'ভরের বিচ্যুতি' (Mass defect)। ভরের বিচ্যুতি থাকায় প্রমাণিত হয় যে, যখন দুটি নিউট্রন ও দুটি প্রোটন পরস্পরের নিকটে এসে হিলিয়াম কেন্দ্রীন তৈরী করে, তখন এদের ভরের কিছুটা অংশ এই কার্যে ব্যয়িত হয়। কাজেই হিলিয়ামের কেন্দ্রীন থেকে যদি নিউট্রন ও প্রোটনগুলিকে আলাদা করতে হয়, তাহ'লে ঐ ব্যয়িত ভরের সমপরিমাণ ভর পুরোপুরি শক্তিতে রূপায়িত হ'লে যতখানি শক্তি হয়, বাইরে থেকে ততখানি শক্তি সেখানে দিতে হবে। এজন্য, ভরের বিচ্যুতি আছে বলে, বিভিন্ন পরমাণুর কেন্দ্রীনগুলি স্থায়িত্ব লাভ করেছে এবং সহজে তাদের মধ্যে পরিবর্তন আনা যায় না। ভরের বিচ্যুতির সমপরিমাণ শক্তিকে বলা যেতে পারে কেন্দ্রীনের বন্ধনশক্তি। তাই যে কেন্দ্রীনের ভরের বিচ্যুতি যত বেশী, তার বন্ধনশক্তি এবং ফলে স্থায়িত্বও ততই বেশী হবে। সবচেয়ে কম প্রটোনযুক্ত কেন্দ্রীনের ভরের বিচ্যুতি সর্বাপেক্ষা কম। কেন্দ্রীনে প্রোটনের সংখ্যা বাড়লে ভরের বিচ্যুতি বাড়তে থাকে; আবার আশিটির বেশী প্রোটনের সংখ্যা হ'লে ভরের বিচ্যুতি কমতে থাকে। এ-থেকে বোঝা যায়, যদি কম প্রোটনযুক্ত কেন্দ্রীনকে বেশী প্রোটনযুক্ত কেন্দ্রীনে পরিবর্তিত করা যায় বা আশিটির বেশী প্রোটনযুক্ত কেন্দ্রীনকে কম প্রোটনযুক্ত কেন্দ্রীনে পরিবর্তিত করা যায়, তাহ'লে শক্তি উৎপন্ন হবে; কেন না পরিবর্তনের পরের কেন্দ্রীনের ভর পরিবর্তনের পূর্বের কেন্দ্রীনের ভরের চেয়ে কম হবে। যে ভর এভাবে হারিয়ে গেল, সেই ভর শক্তি হ'য়ে দেখা দেবে। কিন্তু কিভাবে এই পরিবর্তন করা যেতে পারে তার কোন উপায় বহুদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের জানা ছিল না। কতকগুলি নূতন

ঘটনা থেকে বলা যেতে পারে, আকস্মিকভাবে এই পরিবর্তনের রহস্য ধরা পড়েছে।

রঞ্জনরশ্মি আবিষ্কারের পরে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক বেকারেল দেখতে পান, কতকগুলি পদার্থ থেকে রঞ্জনরশ্মির মতই ছবি তুলবার কাগজে ছাপ ফেলার ক্ষমতাসম্পন্ন রশ্মি আপনা হ'তেই বের হয়। এই রশ্মির নাম দেওয়া হয় তেজস্ক্রিয় রশ্মি (Radioactive ray) এবং পদার্থগুলিকে বলা হয় তেজস্ক্রিয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে পরীক্ষার ফলে জানা যায় যে, তেজস্ক্রিয় রশ্মির মধ্যে থাকে কিছু গতিশীল ইলেকট্রন বা বীটা রশ্মি, কিছু আলো এবং রঞ্জনরশ্মির চেয়েও শক্তিশালী রশ্মি বা গামা রশ্মি এবং কিছু গতিশীল কণা বা আলফা কণা। দেখা যায়, আলফা কণা হ'ল হিলিয়ামের কেন্দ্রীন। তেজস্ক্রিয় রশ্মিতে আলফা কণার উপস্থিতি থেকে প্রমাণিত হয় যে, তেজস্ক্রিয়ায় পরমাণুর কেন্দ্রীন পরিবর্তিত হয়। রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারাও দেখা গেছে যে, তেজস্ক্রিয় পরিবর্তনে পদার্থের রাসায়নিক গুণও পরিবর্তিত হয় বা পরমাণুগুলি নূতন পরমাণুতে পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনে যে ভর বিলুপ্ত হয় সেই ভরের শক্তিই বীটা ও আলফা রশ্মির গতিজনিত শক্তি ও গামা রশ্মির শক্তি সরবরাহ করে। কিন্তু সাধারণভাবে কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থের খুব অল্প অংশেরই পরিবর্তন হয় বলে তেজস্ক্রিয়ার মাধ্যমে এক সঙ্গে খুব বেশী শক্তি পাওয়া যায় না। কয়েকটি বিশেষ পদার্থেই তেজস্ক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে পরমাণুর পরিবর্তন হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ইউরেনিয়াম ২৩৫। সাধারণ ইউরেনিয়ামের সঙ্গে এর রাসায়নিকগুণের কোন পার্থক্য নেই কিন্তু কেন্দ্রীনের গঠনে সামান্য বিভেদ আছে। এই ইউরেনিয়ামের একটি বিশেষ পরিমাণের বেশী একই সঙ্গে রাখা হ'লে তেজস্ক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুতগতিতে হ'তে থাকে। তাই ভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করার একটি বিশেষ মাধ্যম হ'ল ইউরেনিয়াম ২৩৫। পারমাণবিক চুল্লীতে যে শক্তি উৎপন্ন হয় বা পারমাণবিক বোমায় যে শক্তি প্রকাশিত হয় তা হ'ল ইউরেনিয়াম ২৩৫ বা সমধর্মী অন্যান্য কেন্দ্রীনের শক্তি।

তেজস্ক্রিয়ায় খুব অল্পপরিমাণ পদার্থ থেকে প্রচুর পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু সূর্যে ইউরেনিয়াম বা সমধর্মী পদার্থের পরিমাণ সম্পর্কে যতটা হিসেব পাওয়া যায়, সে হিসেব থেকে তেজস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সূর্যের শক্তির উৎপত্তির ব্যাখ্যা হয় না। আগেই দেখান হয়েছে যে, যেমন উচ্চসংখ্যার প্রোটনযুক্ত পরমাণুর কেন্দ্রীনের পরিবর্তনে শক্তি উৎপন্ন হয়, তেমনি খুব কম সংখ্যার প্রোটনযুক্ত পরমাণুর কেন্দ্রীন উচ্চসংখ্যার প্রোটনযুক্ত পরমাণুর কেন্দ্রীনে পরিবর্তিত হ'লে ভরের পরিবর্তন হ'য়ে শক্তি উৎপন্ন হ'তে পারে। কিন্তু এই পরিবর্তন সহজে ঘটানো সম্ভব নয়। যেমন কার্বনের দহনের জন্য কয়লাকে উচ্চতাপমাত্রায় আনতে হয়, তেমনি হাইড্রোজেনকেও খুব উচ্চ তাপমাত্রায় আনলেই হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীন থেকে হিলিয়ামের কেন্দ্রীন সৃষ্টি হ'তে পারে। এই তাপমাত্রা সাধারণভাবে তৈরী করা অসম্ভব। নানারকম পরীক্ষা এখনও চলছে কিন্তু পরীক্ষাগারে বিশ্বাসযোগ্যভাবে এই পরিবর্তন এখনও করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এভাবে প্রচুর শক্তি যে উৎপন্ন হ'তে পারে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে হাইড্রোজেন বোমায়। পারমাণবিক বোমার শক্তি ব্যবহার করে উচ্চ তাপমাত্রার সৃষ্টি করে হাইড্রোজেন বোমায় হাইড্রোজেনকে হিলিয়ামে পরিবর্তিত করা হয় এবং তার ফলে প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হয়। মোটামুটিভাবে দেখা গেছে, সূর্যের

শক্তিও আসে এই ধরনের পরিবর্তনের মাধ্যমে।

এই আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, শক্তির উৎস হ'ল দুটি। একটি হ'ল ইলেকট্রন ও কেন্দ্রীনের বন্ধনজনিত শক্তি—যে শক্তি রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়টি হ'ল কেন্দ্রীনের আভ্যন্তরীণ প্রোটন ও নিউট্রনের বন্ধনশক্তি—যে শক্তি আসে সূর্য থেকে বা উৎপন্ন হয় পারমাণবিক চুল্লীতে। প্রকারান্তরে রাসায়নিক ও পারমাণবিক শক্তি —এই উভয় ক্ষেত্রেই ইলেকট্রন বা নিউট্রন ও প্রোটনের পরস্পরের নিকটে অবস্থানজনিত শক্তিই ব্যবহৃত হয়।

যদি কোন প্রক্রিয়ায় সত্যসত্যই কেন্দ্রীনের প্রোটন ও নিউট্রন বা ইলেকট্রনকে বিলুপ্ত করা যায় তাহ'লে আইনস্টাইনের সূত্রানুসারে এদের ভরের বিলোপ হ'য়ে প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হবে। বিভিন্ন কণা নিয়ে পরীক্ষার ফলে সাম্প্রতিক কালে এভাবে শক্তির নূতন উৎস আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। দেখা গেছে, বিশ্বে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন ছাড়া আরো অনেক কণা থাকতে পারে। ঠিক ইলেকট্রনের ন্যায় একটি কণা আছে যার ভর এবং সব গুণই ইলেকট্রনের ন্যায়, কিন্তু তড়িৎ বিপরীতধর্মী। এই কণাটির নাম হ'ল পজিট্রন। যদি কোন প্রক্রিয়ায় একটি পজিট্রন ও ইলেকট্রনে সংঘাত হয় তাহ'লে এরা পুরোপুরি বিনষ্ট হয় এবং এদের ভরের সমপরিমাণ শক্তি দেখা দেয়। কিন্তু এভাবে শক্তি উৎপন্ন করার কার্যকরী কোন উপায় এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। হয়ত ভবিষ্যতে এমনি কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভরকে সোজাসুজি শক্তিতে পরিণত করা সম্ভব হবে। মানুষের সভ্যতায় সেদিন একটি বিশেষ দুশ্চিন্তার অবসান হবে, কেন না সেদিন মানুষের হাতে আসবে শক্তির কাঁচামালের এমন এক খনি, যা চিরদিন থাকবে পূর্ণ। শক্তির বর্তমান উৎসগুলি ফুরিয়ে গেলে কি হবে—এ ভাবনা সেদিন মানুষকে আর ব্যস্ত করতে পারবে না।

পাঙ্গী পাহাড়

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

পাঙ্গী পাহাড় পুণ্য হল রক্তরাঙা অরুণরাগে,
কুঞ্জ ছেয়ে কেয়ূর-কাকন গড়ল কুসুম পদ্মবাগে।
অবাধ চড়াই-উৎরায়েতে অমর্ত্যলোক পড়ল ধরা,
হৃদ্য হ্রদের ধোঁয়ার খেয়া পাল উড়ালো গন্ধভরা।
বিশ্বরূপের সেবাশিবির স্বপ্নভরা বনস্পতি
দেওদারেরই সবুজ পাতায় আঁকলো কী এ অমরজ্যোতি!
বিশাখা ও ইরাবতীর তটরেখায় ছন্দ জাগে,
মন্দিরেতে বাসুকী নাগ যেন মকরন্দ মাগে!
গহন চীড়ের বনের নীড়ে নন্দনলোক হল ধরা,
ঝোরার তানে পাখির গানে শৈলনিবাস ক্লান্তিহরা।
প্রজাপতির পাথায় জ্বলে সবজি ক্ষেতের সবুজ পরশ,
প্রাণ জাগানো ওকের পাতায় রাত্রিশেষের দিব্য হরষ!
পাঙ্গী পাহাড় সঙ্গী পেল হীরকখচা বরফচূড়ায়,
আহা একি রক্ত-রবি হিমালয়ের অমা উড়ায়!

মৌলনা রূমীর অধ্যাত্মকাব্য[১]

ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল

ভূমিকা[২]

সেই গূঢ় রহস্যের উপলব্ধি ও তাহাতে নিশ্চয়স্থিতি লাভার্থে এই কাব্যগ্রন্থ (সত্য) ধর্মের পরম উৎসস্বরূপ। ইহা ভগবানের পরম বিজ্ঞান, সুদর্শন পন্থা ও তাঁহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ-স্বরূপ। বেদীমূলের বর্তিকার ন্যায় এই প্রদীপ[৩] ঊষার প্রভা হইতেও দেদীপ্যমান।[৪] ইহা তরু-গুল্ম ও প্রস্রবণ সমন্বিত হৃদয়-স্বর্গোদ্যান—যাহার একটি প্রস্রবণ এই (ধর্ম-) পথের পথিকদের উপযোগী 'সল্‌সবীল্'[৫] নামে অভিহিত। ভগবৎ জ্ঞানী ও প্রেমিকদের নিকট এই গ্রন্থ একটি শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল ও প্রকৃষ্ট বিশ্রামস্থান। ধার্মিক ব্যক্তিগণের নিকট ইহা পরম উপাদেয় ও আহার্য ও স্বাধীন ব্যক্তিদিগের নিকট ইহা অতি মনোরম ও আনন্দদায়ক। আর ধৈর্যশীল ব্যক্তিদের জন্য মিশরের নীল নদের (জলের) ন্যায় ইহা একটি পানীয় দ্রব্য, কিন্তু অবিশ্বাসী ও ফর্'উনের[৬] অনুসরণকারীদের পক্ষে বিষাদময়, যেমন সর্বশক্তিমান ভগবান বলিয়াছেন, "তিনি অনেককে প্রবঞ্চিত করিয়াছেন, আবার অনেকে ইহাদ্বারা প্ররোচিত হইয়াছেন।"[৭] ইহা (ভগ্ন-) হৃদয়ের নিদান, ব্যথিতের সান্ত্বনা ও কোরানের ব্যাখ্যাতা। ইহা মহৎ দান-সামগ্রীর প্রান্তর ও (দুর্বল-) চরিত্রের উৎকর্ষসাধক। ইহা সেই (শুদ্ধাত্মাদের) শুদ্ধ হস্তের পূত লেখনী দ্বারা (রক্ষিত) যাঁহারা সর্বদা "পবিত্রাত্মা ব্যতীত কেহই ইহা স্পর্শ করিতে পারে না"[৮] —এই নিষেধ-বাক্য বলিয়া

---

১ প্রসিদ্ধ ফারসী কবি মৌলানা জলালুদ্দীন রূমী একজন শ্রেষ্ঠ সুফী দার্শনিক। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি ইরানের অন্তর্গত বল্‌খ্‌ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। সুদীর্ঘ-কাল তদানীন্তন রোমের কোনিয়া শহরে অতি-বাহিত করিয়া অবশেষে তথায়ই প্রাণত্যাগ করেন। আর একজন প্রসিদ্ধ ফারসী সুফী কবি তাঁহার এই **মস্‌নবীয়ে-মনবী** (বা অধ্যাত্ম-কাব্য)-কে পরবর্তীকালে 'ফারসী কাব্যে কোরান' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের নিকট ইহা একটি পবিত্র গ্রন্থ।...

২ মূল রচনা আরবী গদ্যে লিখিত।

৩ মন্দির বা মসজিদে ক্ষুদ্র প্রদীপটি যেমন ভগবৎ-আলোর প্রতীকস্বরূপ, তেমনি কবিবরের কাব্যগ্রন্থটি যেন সেই উজ্জ্বল প্রভারই বিকিরণ-মাত্র।

৪ তুঃ কোরান ২৪ ; ৩৫।

৫ 'সল্‌সবীল্' অর্থে কবি বুঝিয়াছেন "পথ (বা তাঁহাকে জানিবার উপায়) জিজ্ঞাসা কর" (তুঃ মস্‌নবী, ৬ খণ্ড, ৩৫০২)।

৬ ফর্'উন্ বা Pharaoh প্রাচীন মিশর-দেশের একজন রাজা। তাঁহার দুষ্কৃতিপূর্ণ অত্যাচারের জন্য তিনি অবশেষে ভগবৎ-অনু-গৃহীত মুসার হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হন।

৭ তুঃ কোরান ২ ; ২৬। এই পবিত্র গ্রন্থের তত্ত্বপূর্ণ কাহিনীসমূহের উদ্দেশ্যে এই উক্তি করা হইয়াছে। কবিবর নিজেও এই কাব্যের ষষ্ঠ খণ্ডে ৬৫৫ এবং তাহার পরবর্তী পঙ্‌ক্তি-সমূহে বলিয়াছেন, অনেকেই তাঁহার অধ্যাত্ম-কাব্যের তত্ত্বপূর্ণ কাহিনীগুলির গূঢ় অর্থ অনুধাবন করিতে না পারিয়া হয়ত প্রবঞ্চিত হইবেন।

৮ তুঃ কোরান ৫৬ ; ৭৮।

অসিয়াছেন। "সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে মিথ্যাচার কখনও ইহার নিকটবর্তী হইতে পারে না।"[৯] কারণ, ভগবানই ইহা রক্ষা করিয়া পরিদর্শন করিতেছেন। বস্তুতঃ "তিনিই পরম রক্ষক ও দয়াশীলদের মধ্যে পরম দয়ালু।"[১০] পরম শক্তিশালী ভগবানের নির্দেশিত এই গ্রন্থের আরো অনেক সুমহান আখ্যা রহিয়াছে। তবে আমরা এই অল্প (আখ্যা-) দ্বারাই ইহাকে সীমাবদ্ধ করিতেছি। কারণ, অল্পই বহুর পরিমাপক; ক্ষুদ্র জলকণাই জলস্রোতের গুণ-নির্দেশক; এবং একটি তণ্ডুলকণাই বিশাল শস্য-ভাণ্ডারের প্রতীকরূপে প্রতীয়মান হয়।

পরম দয়ালু ভগবানের কৃপাপ্রার্থী বল্‌খ্‌বাসী হুসেনের পৌত্র ও মুহম্মদের পুত্র এই হীন সেবক (জলালুদ্দীন) মুহম্মদ তাঁহাকে নিবেদন উদ্দেশ্যে বলে, "আমার প্রভুর ইচ্ছায় আমি এই কাব্যকে ছন্দিত শ্লোকে পরিবর্ধন করিতে সচেষ্ট হইয়াছি —যাহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে আশ্চর্য কাহিনী, দুষ্প্রাপ্য প্রবচন, সুমহান আলোচনা, অমূল্য ইঙ্গিত, তপস্বীদের গোচারণ ও ভক্তদের উদ্যান —যাহার প্রত্যেকটি প্রকাশে সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অর্থে পরিপূর্ণ। আর আমার পরম আশ্রয় ও নির্ভর সেই প্রভু—যিনি আমার দেহে আত্মারূপে অবস্থিত ও আমার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের পরম সম্পদ—সেই শেখ যিনি জ্ঞানীদের আদর্শ, সত্যনিষ্ঠ ও বিশ্বাসীদের চালক, বিনশ্বর প্রাণীদের সহায়ক ও তাহাদের চিত্তবৃত্তি ও বিবেকের নির্ভর—যাঁহার উপর ভগবান তাঁহার সৃষ্টজীবের ভার অর্পণ করিয়াছেন—সেই নির্বাচিত মানব, যিনি অবতারের কর্তব্য পালনকারী ও সেই গূঢ় রহস্যের জন্যই নির্বাচিত, দেবলোকের ধনাগারের দ্বারোদ্ঘাটনকারী, মর্ত্যলোকের ধনসম্পদের বিশ্বস্ত অধ্যক্ষ, গুণসমূহ বা বিভবাদির উৎস, **সত্য ও ধর্মের ক্ষুরধার অসি (হুসামুল্‌-হক্‌ ও অল্‌-দীন্‌)**—অল্‌-হসনের পৌত্র ও মুহম্মদের পুত্র হসন—যিনি ইবনে-অখী তুর্ক্‌[১১] নামে সমধিক পরিচিত,—সেই আধুনিক আবু ইয়জীদ,[১২] সমকালীন জুনয়দ,[১৩] —সেই পবিত্র সদ্বংশ জাত উর্মিয়হ অধিবাসী পবিত্র আত্মা—তাঁহাদের সকলের উপর ভগবৎ-করুণা বর্ষিত হউক—সেই সাধক-প্রবরের বংশধর,—যাঁহার "সায়াহ্নে আমি ছিলাম কুর্দ-অধিবাসী, আর প্রাতঃকালে আরব-অধিবাসী"—উক্তির জন্য সেই মহামানব[১৪] চিরসম্মানিত। তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ চিরশান্তি লাভ করুন। কত মহান সেই পুরগামী ও তাঁহার অনুগামী!

তাঁহার এমন একটি বংশ যাহাকে সূর্য তাহার কিরণ-ছটায় আচ্ছাদিত করিয়াছে—এবং সেই বংশগৌরবে তারকারশ্মি নির্বাণ-প্রায়। তাঁহাদের অঙ্গণ ভাগ্যের "কিব্‌লহ"[১৫]-স্বরূপ,—

৯ তুঃ কোরান ৪১ ; ৪২।

১০ তুঃ কোরান ১২ ; ৬৪।

১১ অর্থাৎ 'অখী-তুর্ক' নামক তুরস্ক দেশের একটি সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। কবিবরের প্রিয় শিষ্য এই হুসামুদ্দীন তাঁহার গুরুর দেহাবসানের অব্যবহিত পরে রূমী-প্রবর্তিত 'মৌলবী' সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠাতা হন।

১২ বিস্তাম-অধিবাসী ইয়জীদ বা বায়জীদ একজন প্রসিদ্ধ ফারসী সুফী সাধক। ৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

১৩ বাগদাদের অধিবাসী সুফী সাধক জুনয়দ ৯০৯ খৃষ্টাব্দে ইহলীলা সংবরণ করেন।

১৪ কুর্দ-অধিবাসী আবুল-ওফার সহিত এই সাধক-প্রবরকে সংযুক্ত করা হইয়াছে। আবার কাহারো মতে তিনি শিরাজ আবু আব্দুল্লাহ বাবুনী বা আবু হফ্‌স্‌ অল্‌-হদ্দাদ।

১৫ 'কিব্‌লহ' অর্থ লক্ষ্যস্থল বা বেদীমূল।

যেখানে আধ্যাত্মিক রাজবংশীয়গণ সম্মানিত হইয়াছেন; ইহা আশার "কাবা"-স্বরূপ, যেখানে কৃপার অভিলাষিবৃন্দ চারিদিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এইরূপ আকর্ষণ অবলীলা-ক্রমে চলিতে থাকুক, যতদিন তারকারাজি উদ্ভাসিত হয় এবং সূর্য প্রাচ্যাকাশে দীপ্তিমান থাকে—এবং অবশেষে সৎ, পবিত্র, আত্মজ্ঞান ও দিব্যভাবাপন্ন সুমহান ব্যক্তিদের সমৃদ্ধির কারণ-রূপে বিবর্তন লাভ করুক—তাঁহারা যেমন অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন, তেমনি মৌন হইয়াও সর্বজ্ঞ, অদৃশ্য হইয়াও সর্বত্র বিদ্যমান; এবং সূত্রাবরণের অন্তরালে সম্রাট ও দেশকালের নায়করূপে বর্তমান—তাঁহারা যেমন সর্বগুণসম্পন্ন, তেমনি ভগবৎ-নিদর্শনের আলোক-বর্তিকা স্বরূপ। "হে সর্বজীবের প্রভু, তুমি চিরস্থায়ী হও!"—ইহাই একমাত্র প্রার্থনা যাহা কখনই অগ্রাহ্য হইবে না এবং যাহা সর্বকালে সর্বলোকে সমর্থন করিবে। —এই উভয়লোকের প্রভু ভগবানকে প্রণাম জানই; এবং সেই প্রভু তাঁহার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ-পুরুষ মুহম্মদ[১৬] ও তাঁহার পবিত্র ও শুদ্ধাত্মা অনুগামীদের (সর্বদাই) আশীর্বাদ করিতেছেন।"

প্রস্তাবনা[১৭]

শুনরে, কী যে ব্যথা বাঁশী বলে,
বিরহের ব্যথাই যে সে বলে।[১৮]
ঘর হ'তে মোরে ছিনে এনেছে যবে,
মোর সুরে কাঁদে স্ত্রী-পুরুষ সবে।
দগ্ধ হিয়া চাইরে বিচ্ছেদ তরে,
প্রেম-ব্যথা যে তবে কইতে পাইরে।
রয়েছে যে তার বঁধু থেকে সরে,
সে-ই যে খুঁজে বঁধু মিলন তরে।
যে সভায়ই গাইরে আমার বেদন,
দুঃখি-সুখী সবাই যে আমার পরাণ।
নিজ-ভাবে সে, বঁধু যে মানয়ে;
মর্মব্যথা যে কভু না পুছয়ে।
কৈ তফাৎ গোপন-কথা ও ক্রন্দনে?
চোখ ও কান যে অন্ধ সে সুদর্শনে![১৯]
দেহ ও প্রাণে নেই কভু রে আবরণ;
অন্তর্দৃষ্টির নেই তবু কিছু মনন।
বেণু-সুরে যে আগুন, নয় হাওয়া!
নেই যেথা সে আগুন,
হোক হাওয়া।[২০]
প্রেম-বহ্নি আছে এ বেণু-অন্তরে,
প্রেম-নৃত্য আছে এ সুরা-অন্তরে।১০॥

১৬ অর্থাৎ পয়গম্বর হজরৎ মুহম্মদ। মুহম্মদের শব্দগত অর্থ—যে প্রশংসার যোগ্য।

১৭ এখানেই কাব্যারম্ভ বা সূচনা। এই কাব্যাংশটিকে কোন ব্যাখ্যাকার "নঈ-নামহ" (বা বাঁশীর জীবন-কাহিনী) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বলা যাইতে পারে যে মানুষেরই আত্মস্বরূপটি যেন বাঁশীরূপে নিজের দুঃখব্যথা বর্ণনা করিতেছে।

১৮ মূল ছন্দানুযায়ী কাব্যানুবাদ করিতে সচেষ্ট হইয়াছি। তথায় আছে: ফা'ইলাতুন্ ফা'ইলাতুন্ ফা'ইলুন্ অর্থাৎ দীর্ঘ, হ্রস্ব, দীর্ঘ, দীর্ঘ উচ্চারণের পুনরুক্তি ও শেষ পর্বে একটি দীর্ঘ-উচ্চারণের সংক্ষেপ। (অর্থাৎ – ✓ – – / – ✓ – – / – ✓ –) আর ফারসী মসনবী-কবিতার ন্যায় এখানেও প্রত্যেক শ্লোকের উভয় চরণের অন্ত্যমিল রহিয়াছে।

১৯ কবির অন্তরের কথা কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু সেই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ইন্দ্রিয়-জ্ঞান দ্বারা বুঝিতে পারা যায় না।

২০ আগুন অর্থে ভগবৎ-প্রেম। যাহার প্রাণে সেই প্রেম-বহ্নি নাই, সে কেবল বাসনা-অগ্নিতে জ্বলিয়া মরিবে। 'হাওয়া' ফারসীতে দ্ব্যর্থক—বায়ু ও বাসনা।

বিরহীদের বাঁশরী হয় আত্ম-জন ;
পর্দা তার পর্দা মোদের করে ছেদন ।[২১]
বাঁশরীর সে ঔষধি আর সে গরল,—
সে তৃষা আর নিগ্রহ যে
দেখি বিরল ।[২২]
বাঁশরীতে রক্ত-রাহার বিবরণ ;
প্রেম-গাথা মজ্নুনের সে বিবরণ ।[২৩]

রক্ত-রাহার বিবরণ—অর্থাৎ প্রেম-পথে একদিকে যেমন প্রেমের আকুলতা ও বিরহে দুঃখ-কষ্টে ভরা জীবন, তেমনি আবার বন্ধুর মিলনের আনন্দোল্লাসে রক্তে-রঙ্গীন পথ ।

গোপনাচারী বন্ধু বেহুশ যে হয় ;
গুপ্ত-বিষয় কানাকানিতেই রয় ।[২৪]
দুঃখে যার দিনগুলো রয় ভরা ;
বহ্নি সাথে দিনগুলো ভাগ করা ।
যায় যদিরে দিন, বলি, চল্—নাই ভয় ;
তুমিই কেবল থাক, হে গুণময় ![২৫]
মীন নহে যে, সে জলে প্রাণান্ত হয় ;
রুজি যার হারা, রুজে দেরীই হয় ।[২৬]
পক্ক যে তার হাল বুঝিবে কি বা খাম্ ;
তাই আর আলোচনা নয়, অস্-সলাম্ ।[২৭]
খোলরে বাঁধ, মুক্ত হও, আমার তনয় !
স্বর্ণরৌপ্য-শৃঙ্খল আর তোদের ত নয় ।
ঢাল কুঁজায় জল যদি বা সাগরের,—
জল ধরিবে তা কত আর ?—
এক দিনের[২৮] । ২০ ॥
লুব্ধ-কুঁজো হয় কভু কীরে পূরণ ?
তৃপ্ত হইলে শুক্তি মুক্তায় তা পূরণ ।
বস্ত্র যার প্রেমে হয়েছে ছিন্ ও ভিন্ ;
লোভ-ও-আর সব পাপ হতে সে
বিচ্ছিন্ ।[২৯]

২১ প্রেমের প্রতীক বাঁশরীর সুরের (বা পর্দার) আকর্ষণে আমাদের পর্দা বা মালিন্যের অন্ধকার দূর হইয়া যায় ।

২২ সদসৎ-এর সুসমঞ্জস সম্মিলনেই প্রেমের বা সুন্দরের প্রকাশ । তাই প্রেমের একদিকে যেমন উচ্ছলতা, তেমনি অন্যদিকে রহিয়াছে সংযমের দৃঢ় বন্ধন ।

২৩ মজ্নূঁ সুফী সাহিত্যের একজন আদর্শ প্রেমিক । লয়লা-মজ্নুনের প্রেম-কাব্য ফারসী-সাহিত্যে চির-প্রসিদ্ধ ।

২৪ ভগবৎ-তত্ত্ব অতি রহস্যপূর্ণ এবং ইহার শিক্ষা একদিকে যেমন গুরু-পরম্পরায় দেওয়া হয়, তেমনি আবার তাহা কেবল আত্মজ্ঞানলাভেচ্ছু ব্যক্তিকেই অতি সতর্কভাবে দান করিতে হইবে । এবং এই জ্ঞান কেবল বেহুশ (বা অজ্ঞান) অর্থাৎ পার্থিব ইন্দ্রিয়াদি জ্ঞানের উর্ধ্বে উঠিতে পারিলেই লাভ করিতে পারে ।

২৫ প্রেম-তত্ত্বের শেষ **ফনা কী অল্লাহ** বা ভগবৎ-সত্তায় নিজকে নিমজ্জিত করা । তখন কেবল তিনি ছাড়া আর কিছুই থাকিবে না ।

২৬ মীন বা মৎস্যকে ভগবৎ-প্রেমিকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে । সেই ভগবৎ-প্রেম সময় না হইলে লাভ হয় না ; আবার, যথাসময়ে ইহা সকলেই লাভ করিয়া ধন্য হইবে ।

২৭ খাঁটি প্রেমিককে পক্ক বলা হইয়াছে । তাঁর হাল বা (ভগবৎ-) অবস্থা খাম্ অর্থাৎ কাঁচা বা (ভগবৎ-প্রেমে) অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কি বুঝিবে ? তাই খাম-খেয়ালী ব্যক্তিদের নিকট এই সকল গূঢ় তত্ত্ব আলোচনা না করিয়া **অস্-সলাম্** বা বিদায় নেওয়াই ভাল ।

২৮ আমাদের লোভ ও তৃষ্ণা যেন কুঁজোর জল, আর ভগবৎ-প্রেম সাগরের জল । বস্তুতঃ তাঁর প্রেমের পরিমাপ করা যায় না । তাই আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীব সেই তত্ত্বের কতটুকুই বা বুঝিতে পারিবে !

২৯ বস্ত্র যেন শরীর বা পার্থিব কামনা-বাসনা । এই বসনের রূপক বাসনাদির উর্ধ্বে উঠিতে পারিলেই মানুষ ভগবৎ-প্রেম লাভ করে ।

হে মোদের প্রেমের পশারি, তুষ্ট হও ;
হে কবিরাজ, নাশ তাপ ও কষ্ট সব।[৩০]
সব অহঙ্কার ও যশের হে ঔষধি !
হে তুমি মোদের প্লেতো ও গেলেন-নিধি ![৩১]
প্রেম-টানে দেহ ভূ-র যায় স্বর্-এ ;
নাচয়ে পাহাড় চতুর সে রঙে রে।[৩২]
তূর-ও প্রাণ পায় প্রেম-টানে (হে) প্রেমিকা !
মস্ত তূর্ **ও খর্‌র্ মূসা স্বা'ইকা**।[৩৩]

* * *

যার কবি-মানস সনে না হয় মিলন ;
স্বর যদি বা রয় শতেক—তা নয় কথন।
যায় রে ফাগুন, তবে যে ঝরল ফুল !
পিকরব শুনাইবে কী আর কোকিল ?

মাশুক-ই যে সব,—ও আশেক কায়ারে ;
জীয়তা মাশুক,—আর আশেক
মৃতরে।[৩৪] ৩০ ॥
তার যবে না রয় এ-প্রেমে বাসনা ;
মন্দভাগ্য বিহগ, নেই পাখনা।[৩৫]
আগ ও পাছের কেমনে খেয়াল করি ?
আমার বন্ধুর অসীম রূপকে স্মরি ![৩৬]
প্রেম ত চায়, তারি কথা হোক রে প্রকাশ ;
দীপ্ত না হইলে মুকুর,—কোথা বিকাশ ?
জান, হয় না কেন দর্পণ ভাস্বর ?
মুখশ্রী মালিন্যে যে রইল ভর।[৩৭]
শুনরে বন্ধু এ কাহিনী সবে ;
গূঢ় সে সত্য বলিরে তবে। ৩৫ ॥

৩০ প্রেম চিরঞ্জীব ; তাই ইহাতে তুষ্ট থাকিতে সকলকে আহ্বান করা হইয়াছে। ইহার মাধ্যমেই আমরা সকল পার্থিব দুঃখ-তাপ হইতে মুক্ত হইতে পারি—তাই প্রেমই যেন কবিরাজ।

৩১ গ্রীক প্লেতোন্ হইতে আরবীতে ইফ্লাতুন্ এবং গ্রীক গেলেনোস্ হইতে জালীনূস্। মহান প্লেতো (Plato) এবং গেলেন (Galen) যথাক্রমে খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ ও ২য় শতাব্দীতে আধ্যাত্মিক প্রেমতত্ত্ব (Platonic love)-বিশ্লেষক ও চিকিৎসক হিসাবে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

৩২ এখানে কোরানের "শবে-মি'রাজ"-এর উল্লেখ করা হইয়াছে মনে হয়। সেই পবিত্র রাত্রে পয়গম্বর মুহম্মদ ভগবৎ-প্রেমের আকর্ষণে তাঁহার প্রসিদ্ধ বুরাক্ (-অশ্বে) চড়িয়া স্বর্গ (বা স্বঃ) রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন।

পাহাড় অর্থে "তূর্" পাহাড়—যেখানে পয়গম্বর মুসা ভগবৎ-দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। আবার, জড়-দেহকে পাহাড়ের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

৩৩ বা "মস্ত তুর-দেহ ও মূসা-প্রাণ ফিকা"। কোরানে (৭ ; ১৩৯) রহিয়াছে "খর্‌র্ মূসা স্বা'ইকান্" অর্থাৎ (পয়গম্বর) মুসা মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

৩৪ মাশুক (বা ম'শূক্) অর্থ যাঁহাকে ভালবাসা যায়—সেই একক প্রিয়তম। 'আশিক্' অর্থ প্রেমিক বা যে ভালবাসে। সেই প্রিয়তম বা একক পুরুষই যেন কেবল চিরঞ্জীব ; আর অন্য সব বস্তু, বিষয় বা প্রাণী (এমন কি মানুষ পর্যন্ত) যেন তাঁহার প্রকাশ-রূপ মাত্র। এই সকল তাঁহারই মৃত কায়া-রূপ ছায়া (বা মায়া) মাত্র।

৩৫ সাধারণ জীবকে মন্দভাগ্য পাখির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সে যেন পিঞ্জরাবদ্ধ পাখি, ডানা থাকিয়াও নাই।

৩৬ সেই অসীম ও অনন্তের পরম-স্বরূপ সীমাবদ্ধ জীবের পক্ষে বর্ণনা করা কখনই সম্ভব নহে। তাঁহাকে জানিতে হইলে নিজেও সেই-ভাবে ভাবিত হইতে হইবে।

৩৭ জীবাত্মাকে ময়লাযুক্ত আয়না বা দর্পণের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সেই মুকুর যেন ভগবৎ-স্বরূপেরই দর্পণ। ইহা পবিত্র হইলেই তাঁহার স্বরূপটি জীবের মানস-পটে প্রতিফলিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা*

স্বামী নির্বেদানন্দ

অজানা সাগর-বুকে পাড়ি

শ্রীরামকৃষ্ণ এভাবে সব সময় মায়ের সেবা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, মায়ের মোহিনী হাস্য-মদিরা আকণ্ঠ পান করত তাঁর মন। মায়ের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করার জন্য তাঁর প্রাণে তীব্র ব্যাকুলতার আগুন জ্বলে উঠল; মায়ের দর্শনলাভ ছাড়া আর অন্য কোন কিছুতে তা নিভবার নয়। সাধারণ পুরোহিতের মত শাস্ত্রীয় পূজাপদ্ধতির বিধিবদ্ধ পথে শ্লথপদে চলে পরিতৃপ্ত হতে পারছিলেন না তিনি; সাধারণ পূজারীর মত মার কাছে ধন, মান ও পার্থিব সফলতা কামনা করার ভেতরেও কোন রসবোধ আনতে পারছিলেন না। তাঁর মন এসব তুচ্ছ কামনার নাগালের বহু ঊর্ধ্বে সব সময় উঠে থাকতো। ভগবানকে সামনাসামনি দেখার জন্য তাঁর প্রাণের আকুলতা বেড়েই চলল। মায়ার যে পর্দাটির আড়াল থাকায় জীবন্ত দেবীকে দেখতে পাওয়া যায় না, সে পর্দাটিকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলার জন্য দুর্বার আগ্রহ তখন কেশরীর মত অস্থির পদসঞ্চারে তোলপাড় করে দিচ্ছে তাঁর হৃদয়; পাষাণ-প্রতিমায় একটুখানি প্রাণের স্পন্দন দেখার জন্য তিনি তখন অধীর হয়ে উঠেছেন। মন তাঁর কিছুতেই মানতে চাইত না যে ধর্ম শুধু কল্পনা-বিলাস, জগন্মাতার অস্তিত্ব শুধু রূপকথার কাহিনী—মানুষের মনগড়া স্বপ্নমাত্র। বালকের মত তিনি সরলভাবে বিশ্বাস করতেন যে রামপ্রসাদ এবং অন্যান্য ভক্তেরা মায়ের দিব্যদর্শনলাভে সত্যই ধন্য হয়েছিলেন। কাজেই সে মহানন্দময় দর্শন লাভে তিনিই বা বঞ্চিত হবেন কেন? এ চিন্তা তাঁর হৃদয়ে শাণিত তীরের মত এসে বিদ্ধ হত। তিনি স্পষ্ট অনুভব করতেন যে পরমানন্দময়ী মা কাছেই আছেন, অথচ তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। বারে বারে আশার আলো জ্বেলে মা আবার নিরাশার অন্ধকারে সব ঢেকে ফেলছেন।

সংসারের সব কিছুই তখন তাঁর বিস্বাদ লাগছিল। মনে হত, অমৃতত্ব ও আনন্দের চিরন্তন উৎসমুখই যদি খুলতে না পারা গেল, তাহলে দিনের পর দিন এই দুর্বিষহ জীবনটাকে টেনে চলার কোন অর্থই হয় না। মায়ের করুণায় পূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে বালকের মত অসহায়ভাবে অবিরাম প্রার্থনায় তিনি মার কাছে অনুনয় জানাতেন অপার মহিমা নিয়ে দেখা দেবার জন্য। মায়ের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে থাকতেন, আর মাঝে মাঝে বাঁধনহারা আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন ভজন ও স্তোত্রাদির মাধ্যমে হৃদয়বিদারী প্রার্থনায়। প্রতিদিন সন্ধ্যাসমাগমে বেদনাশ্রুপ্লাবিত নয়নে হতাশ হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়তেন; গড়াগড়ি দিয়ে করুণ-কণ্ঠে বিলাপ করতেন: আর একটা দিন চলে গেল, মা, তোর দেখা পেলাম না! তীব্র আবেগের ঝড়ে তাঁর মন তখন সংসার থেকে উড়ে এসে বেদনা-সাগরের বুকে ভেসে চলেছিল, নির্মম তরঙ্গাঘাতে আন্দোলিত হয়ে। মায়ের দেখা না পাওয়ার বেদনায় তিনি এত কাতর হতেন যে বাহ্য জগতের অস্তিত্বই ভুলে যেতেন; ভগবদ্দর্শনের পথের বাধাগুলিকে প্রাণপণ প্রয়াসে সরিয়ে

* লেখকের মূল গ্রন্থ "Sri Ramaktishna and Spiritual Renaissance" হইতে অনূদিত।

দিতে চাইতেন। কালীবাড়ীর একপ্রান্তে জঙ্গলাকীর্ণ একটি পতিত কবরখানা ছিল, দিনের বেলাও ভয়ে কেউ সেদিকে যেতে চাইত না। সেখানে গিয়ে একটি আমলকী গাছের নীচে বসে সারারাত তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে কাটাতেন। যাবার আগে উলঙ্গ হয়ে, এমনকি উপবীত পর্যন্ত খুলে রেখে যেতেন। মাতৃধ্যানে নিমগ্ন হবার আগে এভাবে লজ্জা- জাতি- ও ভয়-জনিত সর্ববিধ দুর্বলতাকে তিনি পদদলিত করে যেতেন। তাঁর এই অদ্ভুত আচরণে কালীবাড়ীর লোকেরা কে কি ভাবছে, ভ্রূক্ষেপও করতেন না সেদিকে।

হিন্দুদের চিত্তনিয়ন্ত্রণ-বিজ্ঞান যোগমার্গের সঙ্গে কোন পরিচয় তাঁর ছিল না; শুধু হৃদয়ের প্রচণ্ড ব্যাকুলতা সম্বল করে তিনি পথে নেমেছিলেন। নিজ অকপট হৃদয় যে পথ দেখাচ্ছিল, সেই বিপদসঙ্কুল পথ ধরেই নির্ভয়ে তিনি এগিয়ে চলেছিলেন। নিজের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার দাবদাহ তাঁকে দৈহিক সহ্যশক্তির প্রায় শেষ সীমায় এনে ফেলেছিল। ভাবাবেশে তাঁর বুক ও মুখ লাল হয়ে উঠত, অজস্র অশ্রু ঝরে পড়ত গণ্ডবেয়ে; থেকে থেকে দেহে কম্পন জাগত, করুণ দৃষ্টি ফুটে উঠত চোখের কোণে—মর্মন্তুদ ক্রন্দনে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন। যাঁরা দেখতেন তাঁদের বুক ফেটে যেত। বিরহের এই তীব্র জ্বালা আর সইতে না পেরে একদিন তিনি দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে উন্মত্তের মত নিজ জীবনের অবসান ঘটাতে ছুটে চললেন। ঠিক সেই মুহূর্তে মা তাঁকে কৃপা করলেন। মায়ার পর্দা সরে গিয়ে চোখের সামনে দিব্য-দর্শনের পথ অবারিত হল, সমাধির পরমানন্দ সাগরে তিনি মগ্ন হলেন।

এই দর্শন সম্বন্ধে তিনি নিজমুখে বলেছেন, "মার দেখা পেলাম না বলে তখন হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা; জলশূন্য করবার জন্য লোকে যেমন সজোরে গামছা নেঙরায়, মনে হল হৃদয়টাকে ধরে কে যেন সে রকম করছে! মার দেখা বোধ হয় কোন কালেই পাব না ভেবে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলাম। অস্থির হয়ে ভাবলাম, তবে আর এ জীবনে আবশ্যক নেই। মার ঘরে যে অসি ছিল দৃষ্টি সহসা তার ওপর পড়ল। এই দণ্ডেই জীবনের অবসান করব ভেবে উন্মত্তের মত ছুটে সেটা ধরতে যাচ্ছি, এমন সময়……ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হয়ে গেল—কোথাও যেন আর কিছুই নাই!—আর দেখছি কি, এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃসমুদ্র—যেদিকে যতদূর দেখি চারিদিক হতে তার উজ্জ্বল ঊর্মিমালা তর্জন গর্জন করে গ্রাস করবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হচ্ছে! দেখতে দেখতে সেগুলি আমার ওপর আছড়ে পড়ল এবং আমাকে এককালে কোথায় তলিয়ে দিলে! হাঁপিয়ে, হাবুডুবু খেয়ে, সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়ে গেলাম। তারপর বাইরে যে কি হয়েছে, কোন দিক দিয়ে সেদিন ও তার পরদিন যে গেছে, তার কিছুই জানতে পারিনি! অন্তরে কিন্তু একটা অননুভূতপূর্ব জমাট-বাঁধা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত ছিল এবং মার সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করেছিলাম।"

দুদিন পরে দিব্যানন্দময় সমাধি থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যুত্থিত হলেন। সমাধিভঙ্গ-কালে প্রেম-মধুর-কণ্ঠে আবেগ-কম্পিত অধরে "মা" বলে ডেকে উঠেছিলেন তিনি। এভাবে তরুণ পূজারীর চিত্ততরণী আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার ঝড়ে তরঙ্গের তালে তালে নাচতে নাচতে অজানা সাগরের বুকের ওপর দিয়ে ছুটে, ঝড়ের গতি যখন সেদিকে নিয়ে গেছে তখন সেদিকে চলেও অবশেষে নিরাপদ তটভূমে এসে ভিড়ল, দিব্যানন্দরূপ আনন্দধামের তীরে পৌছে দি

তাঁকে। দুদিন বিশ্রামের অবকাশও পেলেন তিনি সেখানে। কিন্তু স্বল্পকালের আনন্দ-উপভোগ শেষ হতেই আবার সে ব্যাকুলতার ঝড় এল প্রবলতর বেগ নিয়ে, তটভূমি থেকে টেনে এনে আবার তাঁকে ভাসিয়ে দিল যাতনার তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ পারাবারে

পুনরায় দেখা দিয়ে ধন্য করার জন্য মায়ের কাছে করুণ প্রার্থনায় দিনগুলি তাঁর আবার ভরে উঠল। প্রথম দর্শনের পর দর্শনেচ্ছা তীব্রতর হওয়ায় দিব্যানন্দের রাজ্যে পুনরায় পৌছুবার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ভয়াবহ হয়ে উঠল। পাগলের মত হয়ে উঠলেন তিনি। মায়ের বিরহযন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে কখনো কখনো তিনি মাটিতে ঘসে মুখ রক্তাক্ত করে তুলতেন। তাঁর করুণ ক্রন্দন শুনে চারিদিকে কৌতূহলী জনতার ভিড় জমে যেত। কিন্তু সে অবস্থায় মন থেকে বিশ্বজগৎ মুছে যেত বলে তাঁর বোধ হত, লোকগুলি যেন স্বপ্নে দেখা বা ছবিতে আঁকা মানুষের মত অবাস্তব। তাদের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মায়ের কাছে প্রার্থনা করে চলতেন তিনি।

প্রথমদর্শনের অব্যবহিত ফলস্বরূপ তাঁর অন্তরের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার ও বিরহযন্ত্রণার অস্থিরতা আরও বেড়ে উঠলেও সে দর্শন তাঁকে অজ্ঞাতপদসঞ্চারে ধীরে ধীরে নিয়ে চলেছিল অধ্যাত্মচেতনার এক নতুন দেশে। বিরহযন্ত্রণা যখন অসহ্য হয়ে উঠত, তখন তাঁর বাহ্যজ্ঞান লোপ পেত, তখন উচ্চ ভাবভূমিতে উঠে জগন্মাতার অনিন্দ্যসুন্দর রূপ প্রত্যক্ষ করতেন তিনি। এভাবে বারে বারে ভাবসমাধিস্থ হয়ে তিনি চিন্ময়ী মাকে সাক্ষাৎ দেখতেন। দেখতেন মা হাসছেন, কথা কইছেন, অশেষ প্রকারে তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। কখনো বা পুঞ্জ পুঞ্জ খদ্যোতের মত জ্যোতিঃ দেখতেন, কখনো বা দেখতেন কুয়াশার মত জ্যোতিতে চারিদিক ছেয়ে রয়েছে। আবার কখনো বা গলিত রূপার মত উজ্জ্বল জ্যোতিঃতরঙ্গ দিক্-দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করে ফেলত। চোখ বুজেও দেখতেন, আবার চোখ মেলেও এই সব দেখতে পেতেন।

তাঁর শুদ্ধ মন সাধারণ মনের সীমা ছাড়িয়ে আরো বহু, বহুদূরে চলে গেল; আকুল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এতদিন সে যা খুঁজে বেড়াচ্ছিল, নিঃসংশয়ে তার নাগাল পেল সেখানে।

এখন ধ্যান করতে বসলেই মা তাঁকে দেখা দিতেন। শুধু দেখা দেওয়া নয়, তাঁর সঙ্গে গল্প করতেন, দৈনন্দিন জীবনের বহু বিষয়ে উপদেশও দিতেন। এই সময় ধ্যানকালে তাঁর বহু বিচিত্র অনুভূতি হত। অনুভব করতেন, শরীরের গ্রন্থিগুলি কে যেন তালা বন্ধ করে দিচ্ছে, যাতে ধ্যানকালে ঈষন্মাত্র অঙ্গচালনাও সম্ভব না হয়; বন্ধ করার শব্দ তিনি স্পষ্ট শুনতে পেতেন। তারপর নিশ্চল ধ্যানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত। যতক্ষণ না আবার বিপরীত দিক থেকে ঐরূপ শব্দ শুনতে পেতেন এবং অনুভব করতেন যে গ্রন্থিগুলি সব খুলে দেওয়া হল, ততক্ষণ পর্যন্ত আসন ছেড়ে ওঠা বা নিশ্চল শরীরে সামান্য স্পন্দন জাগান-ও তাঁর সাধ্যায়ত্ত থাকত না।

অচিরে দৃষ্টিপথের সব বাধাই নিঃশেষে অপসৃত হল; মায়ের দর্শনলাভের জন্য ধ্যান করা বা ভাবস্থ হওয়ার কোন প্রয়োজনই আর রইল না। মন্দিরে আর প্রতিমা দেখতেন না তিনি; পাষাণ-কায়া চিরতরে বিদায় নিল তাঁর কাছে, চিন্ময় দেহ নিয়ে মা এসে দাঁড়ালেন সেখানে। খালি চোখেই সব সময় তিনি দেখতে পেতেন, মন্দিরে প্রসন্ন-হাস্যময়ী করুণামৃতবর্ষিণী জীবন্ত জগজ্জননী দাঁড়িয়ে আছেন। নাকের কাছে হাত রেখে দেখেছেন, মা সত্যই নিশ্বাস ফেলছেন। রাত্রে দীপালোকে তন্নতন্ন করে

খুঁজেও মন্দিরতলে মায়ের জ্যোতির্ময়ী মূর্তির কোন ছায়াপাত দেখতে পান নি। নিত্যসেবার কাজকর্ম শেষ করে রাত্রে ঘরে শুতে গিয়ে মায়ের পায়ের মলের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছেন—মনে হয়েছে, মা যেন বালিকার মত দ্রুতপদে দোতালায় উঠছেন। কম্পিতবক্ষে তখনই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে বাইরের উঠানে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট দেখেছেন, মা দোতালার আল্‌সের ওপর উঠে আলুলায়িতকেশে দাঁড়িয়ে আছেন, গঙ্গাদর্শন করছেন।

এই সব দর্শনের ফলে মায়ের একেবারে কোলের ওপর উঠে বসেছিলেন তিনি, শিশুর মত আগ্রহ নিয়ে তাঁকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। মায়ের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা তাঁকে সব কিছু ভব্যতার সীমার বাইরে নিয়ে এসেছিল। বৈধী পূজাবিধি তাঁকে আর বেঁধে রাখতে পারল না। হৃদয়ে দিব্যপ্রেম উথলে উঠল; প্রথা, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, এমনকি সাধারণ ঔচিত্য-বোধেরও কোন স্থান আর রইল না সেখানে। বাহ্যজগতের বস্তুর চেয়ে আরো স্পষ্টভাবে, আরো নিবিড়ভাবে তিনি স্নেহময়ী জননীরূপে চিন্ময়ী মাকালীকে সাক্ষাৎ দেখতে পেতেন। কাজেই আদুরে ছেলের সহজাত ভালবাসা নিয়ে তিনি তো মাকে আদর করতে ছুটবেনই! কখনো দেখতেন, মন্ত্রপাঠ করে অন্নাদি নিবেদন করার আগেই মা খাওয়া আরম্ভ করে দিয়েছেন। কখনো হাতে কিছু অন্ন তুলে নিয়ে নিজেই সিংহাসনের কাছে গিয়ে মায়ের মুখে তুলে ধরতেন, আব্দারের সুরে খেতে বলতেন তাঁকে। কখনো বা আগে নিজে কিছুটা খেয়ে বাকীটা মায়ের মুখের কাছে তুলে অতি সহজ ভাবে বলতেন, "আচ্ছা মা, আমি খেয়েছি, এবার তুই খা।" ভাবাবেশে বুক মুখ সব প্রায়ই লাল হয়ে উঠত; সে অবস্থায় কম্পিত পদে মায়ের কাছে এগিয়ে এসে আদর করে মায়ের চিবুক ধরে গান ধরতেন, গল্প করতেন, পরিহাস করতেন, কখনো বা নাচতেই সুরু করতেন। কখনো বা রাত্রে ভোগের পর মাকে শয়ান দিয়ে বলতেন, "আমাকে শুতে বলছিস? আচ্ছা মা, শুচ্ছি"; বলেই, মায়ের শয্যায় শুয়ে থাকতেন কিছুক্ষণ। প্রতিদিন প্রভাতে মায়ের মালা গাঁথার জন্য যখন পুষ্পচয়ন করে বেড়াতেন, দেখে মনে হত যেন কারো সঙ্গে গল্প করতে করতে চলেছেন তিনি—কখনো হাসছেন, কখনো বা আনন্দে অধীর হয়ে উঠছেন। রাত্রে কোন-দিন ঘুমাতেন না, ভাবস্থ হয়ে মায়ের সঙ্গে কথা বলে, না হয় গান গেয়ে, আর না হয় আমলকী গাছের তলায় বসে ধ্যান করে সারারাত কাটিয়ে দিতেন। মায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা মাঝে মাঝে আরও গভীর হয়ে উঠত, মায়ের সঙ্গে একাত্মবোধ এসে যেত। সে সময় তাঁর আচরণ হয়ে উঠত আরো গুরুতর, আরো ভয়াবহ; দেখে মনে হত, তিনি মন্দির অপবিত্র করে ফেলছেন। এ অবস্থায় ফুল-বিল্ব-দলে অঞ্জলি ভরে আগে নিজের বিভিন্ন অঙ্গে, এমন কি পায়ে পর্যন্ত ঠেকিয়ে পরে তা তুলে দিতেন মায়ের চরণে।

ঈশ্বর-প্রেমে যাঁরা উন্মাদ, তাঁরা শাস্ত্রবিধির পারে চলে যান; তাঁদের আচরণ বিধিবদ্ধ করা দুঃসাধ্য। সে প্রেমোন্মত্ত মনের গভীরতার পরিমাপ করবে কে? দিব্যপ্রেমের যে রহস্যময় প্রবল প্রবাহ তাঁদের জীবন থেকে সব বিধি-নিষেধ ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তাঁদের কথায় ও আচরণে অনন্যসাধারণত্ব ফুটিয়ে তোলে, সে প্রেম সম্বন্ধে যথার্থ ধারণাই বা হবে কার? আর-এক জগতের লোক হয়ে যান তাঁরা। আমাদের সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলা তাঁদের বেঁধে রাখতে পারে না; নিয়মের প্রয়োজন মিটিয়ে তাঁরা

নিয়মের গণ্ডি পার হয়ে চলে যান। এ-জাতীয় জীবন-প্রবাহ কখনো মানুষের ইচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত হয়ে, মানুষের গড়া বাঁধ দিয়ে ঘেরা জলপ্রণালীর প্রবাহের মত বয়ে চলতে পারে না। এ জীবন ভগবদ্-প্রেমামৃতে পূর্ণ হয়ে অসীম সাগরের মত অন্তহীন মহিমায় সগৌরবে তরঙ্গায়িত হয়ে চলে।

তবে সাধারণ মানুষ ভুল বুঝবেই। শুদ্ধ হৃদয়ের ভাব তারা ধরতেই পারে না। সে জন্য জীবনের ধরাবাঁধা নিয়মের ব্যতিক্রম কোথাও দেখলেই, তার কারণ তাদের কাছে অজ্ঞাত থাকলেও, তারা সেটাকে পাগলামি বলে স্থির-সিদ্ধান্ত করে বসে। এদিকে নিজেদের ধর্মজ্ঞ বলে তারা অভিমানও রাখে খুব; ভাবে, পূজারী যদি পূজাবিধি লঙ্ঘন করল, যদি ন্যায়-অন্যায়-বোধরহিতই হল, তাহলে প্রতিমা ও মন্দির অপবিত্র হতে আর বাকী রইল কি! মানসিক বিকার ছাড়া আর অন্য কোন কারণেও যে মানুষের আচরণ এরূপ হতে পারে, সেকথা কল্পনাতেও আসে না তাদের। এই সব ধর্মধ্বজীর দল, অধ্যাত্মবিদ্যার এই সব পণ্ডিত-মূর্খের দল যদি তাদের ইচ্ছামত কাজ করতে পারত, তাহলে জগতের সমস্ত সত্যদ্রষ্টাদের, আচার্যদের ও সাধু-সন্ন্যাসীদের নিজেদের বিবেচনা-মত উচিত শিক্ষা-ই দিয়ে দিত। একবার ঘটেছিলও তাই; ঈশ্বর-প্রেমোন্মত্ত এরূপ এক ব্যক্তির আচরণের বিচারাধিকার যখন তারা জোর করে নিজের হাতে টেনে নিয়েছিল, তখন তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করতেও দ্বিধা বোধ করে নাই।

অবশ্য সমাজের সাধারণ পর্যায়ে একদল লোক সব সময় থাকেন, ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত ব্যক্তির অসাধারণ আচরণের মধ্যে যাঁরা গগনচুম্বী আধ্যাত্মিকতার আভাস পান। এইসব দেবমানবদের প্রবল আকর্ষণে তাঁরা আকৃষ্ট হন এবং এঁদের সেবা করার ও আশ্রয় দেবার অধিকার পেলে নিজেদের ধন্য জ্ঞান করেন। দেবদূতের মত এসে বহিরাচারপ্রিয় ছিদ্রান্বেষীদের ক্রোধোন্মত্ততার হাত থেকে তাঁরা সযত্নে রক্ষা করে চলেন এই সব দেবমানবদের।

দক্ষিণেশ্বরের এই তরুণ পূজারীটির দেব-সেবায় তথাকথিত স্বেচ্ছাচার ঘটছে দেখে কালী-বাড়ীর বিকৃতরুচি কর্মচারীরাও ক্রোধোন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের রোষবহ্নি থেকে শ্রীরাম-কৃষ্ণকে বাঁচাবার জন্য পূর্বোক্ত দেবদূতের মতই এসে হাজির হয়েছিলেন মন্দিরের স্বত্বাধিকারিণী রানী রাসমণি ও তাঁর জামাতা মথুরবাবু। এ-দুজন ভক্তের অন্তরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত অসীম শ্রদ্ধা যদি না জেগে উঠত, তাহলে কি যে ঘটত, তা বলা কঠিন। কালীবাড়ীর কর্ম-চারীরা হয়ত দলবেঁধে আক্রমণই করে বসত তাঁকে। অন্তরের সহজাত জ্ঞান হতেই রানী রাসমণি ও মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমোন্মাদনা ধরতে পেরেছিলেন, বুঝতে পেয়েছিলেন যে জগজ্জননীর প্রতি যথার্থ ও অনন্যসাধারণ ভক্তি-প্রেমের ফলেই তাঁর পূজা এমন অদ্ভুত রূপ নিয়েছে। বোধ হয় আরো একটু বেশী বুঝেছিলেন তাঁরা; বোধ হয় বুঝেছিলেন, মা কালীই শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরে থেকে তাঁকে দিয়ে এসব করাচ্ছেন, তাঁর আচরণ বাহ্যদৃষ্টিতে দুর্বোধ্য বলে মনে হলেও দৈবী ইচ্ছাই বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে সেখানে। দু-একটা ঘটনা থেকেই তা বোঝা যায়। রানী রাসমণি একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন, কালীমন্দিরে বসে শ্রীরামকৃষ্ণের ভজন শুনছেন। ভজন শুনতে শুনতে মায়ের ধ্যান করার সময় হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন তিনি; মায়ের চিন্তা ছেড়ে একটা মামলার চিন্তায় তাঁর মন চলে গেল, মন্দিরে বসে সেই চিন্তাতেই তিনি ডুবে গেলেন।

মনোযোগের অভাব দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ রানীর কোমল অঙ্গে করাঘাত করে তিরস্কার করলেন—"এখানেও ঐ চিন্তা!" রানী চমকে উঠলেন, নিজের দোষ দেখতে পেয়ে শিক্ষকের কাছে তিরস্কৃতা বালিকার মত লজ্জিতা হলেন। ক্রোধোন্মত্তা হলেন না, বা মন্দিরের স্বত্বাধিকারিণীর প্রতি তাঁর একজন সামান্য কর্মচারীর এই আচরণকে অন্যায় বলেও ভাবলেন না। ভাবলেন, তাঁর শিক্ষার জন্য মা নিজেই এ শাস্তি দিয়েছেন। তাঁর মানসিক অবস্থার উপযুক্ত এবং সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জেনে এ শাসন তিনি গ্রহণ করলেন দীনভাবে। পুজারীকে শাস্তি দেওয়া তো দূরের কথা, মন্দিরের কর্মচারীরা যাতে এ নিয়ে আলোচনা করে শ্রীরামকৃষ্ণের মনে সামান্য আঘাতও না দিতে পারে, তাঁর কাছে এ প্রসঙ্গ তুলতে পর্যন্ত না পারে, তাড়াতাড়ি তার ব্যবস্থা করলেন।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝলেন, মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের নিত্যকর্ম সমাধা করা শরীরের দিক দিয়ে তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়। মন তাঁর ভাবস্থ হয়েই থাকত, ইন্দ্রিয়জগতের বহু ঊর্ধ্বে উঠে সর্বদা আনন্দসুধা পান করত। সেজন্য জাগতিক নিয়মের দাবীর শৃঙ্খলে সে আর আবদ্ধ হয়ে থাকতে চাইল না। তাছাড়া তাঁর স্নায়ুমণ্ডলীও বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল; পুরোহিতের কাজের বোঝা আর সে বইতে পারছিল না, বিশ্রাম চাইছিল। মথুরবাবুকে সেকথা জানালেন তিনি। মথুরবাবুও সানন্দে তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণের পরিবর্তে কিছুদিন কাজ করার জন্য তাঁর ভাগিনেয় হৃদয়কে অনুমতি দিলেন। এভাবে ধরাবাঁধা দায়িত্বের বোঝা নামিয়ে রেখে কিছুদিনের মত তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার অবসর পেলেন, এবং নির্বাধে ছুটে চললেন মনের আধ্যাত্মিক প্রেরণার বশে।

এরই কাছাকাছি কোন সময়ে অধ্যাত্মসাধনার উপযোগী করে তোলার জন্য হৃদয়ের সহায়তায় তিনি আমলকী গাছের চারিদিকে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়ে সেখানে আরো চারটি পবিত্র বৃক্ষ রোপণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরবর্তী জীবনের অধিকাংশ সাধনা এই একত্রসন্নিবিষ্ট ছায়াবহুল গাছগুলির নীচে একটি বেদীর উপর সাধিত হয়। স্থানটি এখন পঞ্চবটী নামে পরিচিত। দক্ষিণেশ্বর-মন্দির-দর্শনার্থী তীর্থযাত্রীরা এই স্থানটিকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন। (ক্রমশঃ)

প্রার্থনা

শ্রীঅমরজিৎ মুখোপাধ্যায়

যুগে যুগে যত নরদেহে লীলা আছে,
আমারে হে প্রভু, রাখিও তোমার কাছে
ধূলি-ধূসরিত তপ্ত মেদিনী পথে
আসিবে আতুর দূর-দূরান্ত হতে;
তব চাহনির করুণাকিরণ-স্নানে
ফুটিবে পুষ্প কত যে শুষ্ক প্রাণে,
স্নেহ-সুশীতল গৃহ-প্রাঙ্গণ মাঝে
কত না হৃদয় জুড়াবে সকাল সাঁঝে!

ব্যাকুল হইয়া আমি রব পথ-পাশে
করুণাধারায় প্লাবন দেখার আশে;
পথধূলি লয়ে রাখিব মাথায়
রহিব সবার পিছু—
লীলা দেখিবার অধিকার ছাড়া
চাহিব না আর কিছু!

চিকাগো বক্তৃতার গুরুত্ব

অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন

চিকাগো ধর্মমহাসভায় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ যে অবিস্মরণীয় বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসের একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। একটি মাত্র বক্তৃতায় জগতের চিন্তাধারায় এইরূপ বিস্ময়কর আলোড়ন সৃষ্টির দ্বিতীয় আর কোন দৃষ্টান্ত নাই। বাগ্মিতার ক্ষেত্রে তুলনাহীন এই বক্তৃতার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসাধারণ। আধুনিক জগতের চিন্তাশীলতার ক্ষেত্রে ইহা নবদিগন্তের উন্মোচন করিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ যে ধর্মমহাসভায় নিয়মানুগত প্রতিনিধি না হইয়াও যোগদান করিয়াছিলেন, সেই ধর্মসম্মেলনে পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম হিন্দুধর্ম আমন্ত্রিত হয় নাই। স্বামীজী স্বেচ্ছায় স্বয়ং হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্বের ভার যদি গ্রহণ না করিতেন, তবে সেই ধর্ম-মহাসভায় হিন্দুধর্মের বাণী কেহ শুনিতে পাইত না এবং হিন্দুধর্মের কথা না জানিলে ভারতবর্ষের জীবন-সাধনার মর্মবাণীর কথাও পৃথিবীর সেই সুধী-সম্মেলনের অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত। কারণ বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্ম প্রভৃতি যে সকল ধর্ম প্রতিনিধি-প্রেরণের সুযোগ লাভ করিয়াছিল তাহারা ভারতের সাধনা ও সংস্কৃতির আংশিক পরিচয় মাত্র বহন করে।

ধর্মমহাসভায় স্বামীজী যে কয়টি ভাষণ দিয়াছিলেন তাহার মাধ্যমে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাকে আশ্রয় করিয়া ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বরূপ জগৎসভায় অবিচলিত প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। চিকাগো বক্তৃতাই হিন্দুধর্ম এবং প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের পূর্ণ মহিমার পুনরাবিষ্কার। পাশ্চাত্য সভ্যতার জগদ্ব্যাপী বিস্তৃতির প্রথম পর্বে ভারতবর্ষ এবং হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আধুনিক সভ্য সমাজে প্রবল অবজ্ঞারূঢ়ভাবই প্রকাশ পাইয়াছিল। হিন্দুধর্ম প্রসঙ্গে তাই স্বামীজী বলিয়াছিলেন যে, ইহা বিদেশীর "ঘৃণাস্পদ" ও স্বদেশীর "ভ্রান্তিস্থান"। সেই ঘৃণা ও ভ্রান্তির সুস্পষ্ট চিত্র ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজী শিক্ষার প্রধান ধারক ও বাহক ডিরোজিওর শিষ্যসম্প্রদায়ের হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে ঘৃণা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের Accademy নামক আলোচনা-সভার বর্ণনাপ্রসঙ্গে ডিরোজিওর সমসাময়িক হরমোহন চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন, "The Hindu religion was denounced as vile and corrupt and unworthy of the regard of rational beings." (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—পৃঃ ১১০) ইঁহাদের সমকালীন রামমোহন ভারতবর্ষের ধর্ম-জীবনের ইতিহাসকে আদ্যোপান্ত অসভ্যতার নামান্তর বলিয়া অবশ্য প্রচার করেন নাই। পাশ্চাত্য Monotheism বা একেশ্বরবাদ তত্ত্বের সাক্ষাৎ যে উপনিষদের ব্রহ্মবাদে মিলিবে, ইহাই ছিল তাঁহার প্রতিপাদ্য। কিন্তু উপনিষদের যুগ ব্যতীত অন্যান্য যুগে হিন্দুধর্মের বিবর্তন সম্বন্ধে তাঁহার কি পরিমাণ অশ্রদ্ধা ছিল, তাহা তাঁহার একাধিক উক্তিতে সুপরিস্ফুট। হিন্দু-ধর্মের সাকারোপাসনার প্রতি অবিমিশ্র ঘৃণায় ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যতীত হিন্দুধর্মের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রামমোহন বলিয়াছিলেন…(Hindus) prefer custom and fashion to the authorities of their scriptures and therefore continue

under the form of religious devotion, to practise a system which destroys, to the utmost degree, the national texture of society and prescribes crimes of the most heinous nature, which even the most savage nations would blush to commit unless complled by the most urgent necessity. (Preface to Ishopanishad) উপনিষদের যুগের পরবর্তী কালে হিন্দু-ধর্মের বিভিন্ন বিকাশ রামমোহনের দৃষ্টিতে একান্ত গর্হিত ছিল। তাই Translation of An Abridgement of Vedanta গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলিয়াছিলেন—"...inconvenient or rather injurious rites introduced by the peculiar practice of Hindoo idolatry destroys the texture of society."

যে ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদ ব্যতীত প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে রামমোহন প্রশংসার যোগ্য আর কিছুই খুঁজিয়া পান নাই, সেই ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধেও রামমোহনের সর্বাঙ্গীন আস্থা ছিল না। এই জন্যই বেদান্ত-গ্রন্থের রচয়িতা রামমোহন Lord Amherst-এর নিকট লিখিত পত্রে বলিয়াছিলেন, "Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe that all visible things have no real existence." ..হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে স্বদেশীয়গণের যখন এইরূপ বিরূপ মনোভাব, তখন তাহার প্রতি বিদেশীয়দিগের কি ধারণা ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। শ্রীরামপুরের খৃষ্টীয় প্রচারক-গণের এবং Alexander Duff প্রমুখ খৃষ্টান নেতাগণের হিন্দুধর্মের প্রতি আক্রমণের মধ্যে বিদেশীর ঘৃণা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

দেশে ও বিদেশে হিন্দুধর্মের প্রতি এই দীর্ঘকালস্থায়ী ঘৃণা ও বিদ্বেষের প্রাবল্যের সম্মুখে আধুনিক সভ্যতার পীঠস্থান আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ অকুণ্ঠিত চিত্তে হিন্দুধর্মের মহত্ত্ব ঘোষণা করিলেন। সে ঘোষণা কেবলমাত্র আবেগসর্বস্ব ছিল না। তাহার পশ্চাতে হিন্দুধর্ম ও ভারত-ইতিহাসের নির্ভুল বিশ্লেষণ এবং হিন্দুধর্মের দার্শনিক তাৎপর্যের মর্মোদ্ঘাটন অলৌকিক প্রতিভার আলোকে সমুজ্জ্বল হইয়া দেখা দিয়াছিল।

হিন্দুধর্মের ঐতিহাসিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করিয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন—"I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance......I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to Southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shatterd to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation."

এই ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অন্তরালে হিন্দুধর্মের যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ক্রিয়াশীল তাহা নির্দেশ করিয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "To him (a Hindu) all the religions, from the lowest fattishism to the highest absolutism mean so many attempts of the human soul to grasp and realise the Infinity each determined by the conditions of its birth and association, and each of these marks a stage of progrees; and every soul is a young eagle soaring higher and higher, gathering more and more strength, till it reaches the glorious Sun."

হিন্দুধর্ম যে কোন পরলোক-সম্পর্কিত মতবাদে

বিশ্বাসের নামান্তর নয়, হিন্দুধর্ম যে কতগুলি নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি অন্ধ আনুগত্য নয়, একথা পরিস্ফুট করিয়া স্বামীজী বলিলেন, "The Hindu religion does not consist in struggles and attempts to believe a certain doctrine or dogma, but in realising—not in believing, but in being and becoming."

হিন্দুধর্ম মানুষকে কেবল দেহধারী জীবমাত্র বলিয়া গণ্য করে না। তাই মানুষের দেহগত জীবনের ত্রুটি, বিচ্যুতি ও ক্ষুদ্রতাকে সে সার সত্য বলিয়া গ্রহণও করে না। আত্মার পরিপূর্ণতার মধ্যেই হিন্দুধর্ম মানুষের জীবনের রহস্যের চরম নিষ্পত্তি খুঁজিয়া পাইয়াছে। তাই হিন্দুধর্ম মানুষের অপূর্ণতা হইতে মুক্তিলাভের যে পথ নির্দেশ করিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া স্বামীজী বলিলেন—"Therefore to gain this infinite universal individuality this miserable little prison-individuality must go. Then alone can death cease when I am one with life, then alone can misery cease when I am one with happiness itself, then alone can all errors cease when I am one with knowledge itself."

এই বিশ্বজগতের স্বরূপ বিশ্লেষণে হিন্দুধর্ম যে গভীর প্রজ্ঞাদীপ্ত অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছে বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীও যে তাহার অনুকূল, সে বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া স্বামীজী বলিলেন—"Manifestation and not creation is the word of science today and the Hindu is only glad that what he has been cherishing in his bosom for ages is going to be taught in more forcible language and with further light from the latest conclusions of science."

বিদেশী প্রচারক ও রামমোহন প্রমুখ স্বদেশী সমালোচক পৌত্তলিকতার অভিযোগে হিন্দুধর্মের যে নিন্দা রটনা করিয়াছিলেন, স্বামীজী তাহারও সার্থক প্রতিবাদ করিয়া সে অভিযোগ খণ্ডন করিয়াছিলেন। পৌত্তলিক ভাবধারা হিন্দুর নৈতিক অধঃপতনের কারণ বলিয়া রামমোহন বারংবার হিন্দুধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে কটূক্তি বর্ষণ করিয়াছিলেন। নিম্নাধিকারীর পক্ষে ঈশ্বর-উপাসনায় মূর্তিপূজার স্থান আছে, একথা কোন কোন সময়ে উল্লেখ করিলেও রামমোহনের মূর্তিপূজা সম্বন্ধে চূড়ান্ত বিচার ছিল যে, ইহা পুণ্যের পরিবর্তে কেবল পাপের উদ্ভবস্থল। তিনি ঈশোপনিষদের ভূমিকায় তাই বলিয়াছিলেন—"Fatal system of Idolatry induces the violation of every humane and social feeling—and moral debasement of a race···" স্বামীজীর অভিজ্ঞতা মূর্তিপূজা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সাক্ষ্যদান করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য, রামপ্রসাদ অথবা তুলসীদাস ও মীরাবাঈ প্রভৃতির সাধনা রামমোহনকে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধান্বিত করিতে পারে নাই। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে বসিয়া স্বামীজী যাহা জানিয়াছিলেন, অকুণ্ঠিত চিত্তে তিনি তাহাই উচ্চারণ করিয়াছিলেন—"The tree is known by its fruits. When I have seen amongst them that are called idolaters, men, the like of whom in morality and spirituality and love I have never seen anywhere, I stop and ask myself, can sin beget holiness?" সাকারোপাসনার মধ্য দিয়া অন্যান্য ধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের মূল দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যটি নির্দেশ করিয়া স্বামীজী বলিলেন—"Unity in variety is the plan of nature and the Hindu has recognised it. Every other religion lays down certain fixed dogmas, and tries to force society to adopt them. It places before society only one coat which must fit Jack and John and Henry, all alike. If it does not fit

John or Henry, he must go without a coat to cover his body. The Hindus have discovered that the absolute can only be realised, or thought of, stated through the relative; and the images, crosses and crescents are simply so many symbols—so many pegs to hang the spiritual ideas on."

সকল ধর্মের ন্যায় হিন্দুধর্মের মধ্যেও যে কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে স্বামীজী দ্বিধাবোধ করেন নাই। কিন্তু ধর্ম-জীবনে সেই ত্রুটিবিচ্যুতির ক্ষেত্রেও হিন্দুধর্মের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী তাহার বিশিষ্টতাকেই প্রকটিত করিয়াছে। পরকে উৎপীড়নের দ্বারা হিন্দু আপনাকে কলঙ্কিত করে নাই। তাই স্বামীজীর কণ্ঠে এই প্রদীপ্ত বাণী ধ্বনিত—

"The Hindus have their faults, they sometimes have their exceptions; but mark this, they are always for punishing their own bodies, and never for cutting the throats of their neighbours. If the Hindu fanatic burns himself on the pyre, he never lights the fire of Inquisition."

মানুষের প্রকৃতিগত বিভিন্নতাকে অবলম্বন করিয়াই তাহার যথার্থ অধ্যাত্ম-জীবনের বিকাশ ঘটিতে পারে, ইহাই হিন্দুধর্মের আবিষ্কৃত সত্য। সেইজন্য অধ্যাত্ম-জীবনের কোন একটি পথকে হিন্দুধর্ম কোন ক্রমেই একমাত্র পথ বলিয়া গণ্য করিতে পারে না। সেই কথা ব্যক্ত করিয়া স্বামীজী বলিলেন—

"To the Hindu, then, the whole world of religions is only a travelling, a coming up of different men and women, through various conditions and circumstances, to the same goal. Every religion is only evolivng a God out of the material man, and the same God is the inspirer of them all."

এই জন্যই হিন্দুধর্ম সকল ধর্মসাধনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সকল ধর্মের প্রতি তাহার মনোভাব মৈত্রীভাবপূর্ণ। মানবজাতির অধ্যাত্ম-জীবনের বৈচিত্র্যকে পূর্ণ বিকশিত করিবার জন্য সকল ধর্মের অনুশীলন যে প্রয়োজন, হিন্দুধর্মের এই দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিস্ফুট করিয়া স্বামীজী ধর্মমহা-সভায় তাঁহার সমাপ্তিসূচক ভাষণে এই কারণে এই মহৎ ও উদার বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

"The seed is put in the ground, and earth and air and water are placed around it. Does the seed become the earth, or the air, or the water? No. It becomes a plant, it develops after the law of its own growth, assimilates the air, the earth and the water, converts them into plant-substance and grows into a plant. Similar in the case with religion. The Christian is not to become a Hindu or a Buddhist, nor a Hindu or a Buddhist to become a Chirstian. But each must assimilate the spirit of the others and yet preserve his individuality and grow according to his own law of growth."

সকল ধর্মের সমস্ত বিবাদের ইহাই যথার্থ মীমাংসা। হিন্দুধর্মের ইহাই মূল কথা। চিকাগো বক্তৃতায় স্বামীজীর পুণ্যবাণী মানব-সমাজকে সর্বযুগের ধর্মবিরোধের সার্থক সমাধানের মন্ত্র দান করিয়া সর্বকালের ও সর্ব দেশের মানুষের মধ্যে সৌভ্রাত্রের অক্ষয় সেতু রচনা করিয়াছে।

শ্রীশ্রীমহারাজের স্মৃতি

স্বামী যতীশ্বরানন্দ

১৯০৬ সালে কলিকাতায় এফ. এ. পড়িবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর ভাবের সহিত পরিচিত হই। ঠাকুরের কথামৃত ও স্বামীজীর রাজযোগ একই সময়ে আমার হস্তগত হয়। এই বই ও আরও সব বই পড়িয়া এক নূতন ভাবরাজ্যে প্রবেশ করি। এই সময় শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট দীক্ষা লইবার ও ধর্মজীবন যাপন করিবার সঙ্কল্প করি। কিন্তু সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে সময় লাগে।

১৯০৭ সালে এফ. এ. পরীক্ষা দিয়া রাজসাহীতে বি. এ. পড়িতে যাই। সেখানে দুই বৎসর থাকিয়া আবার কলিকাতায় আসি ১৯০৯ সালের গ্রীষ্মের পর। শ্রীশ্রীমহারাজ এই সময় মান্দ্রাজ হইতে ফিরিয়া উড়িষ্যাতে ছিলেন। ১৯১০ সালে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবে সর্বপ্রথম তাঁহাকে দর্শন করি। উৎসবের পর তিনি ৺পুরী চলিয়া যান। এই সময় আমি সীতাপতির সহিত বেলুড়মঠে গিয়া সাধুদের সহিত পরিচিত হই। শনি-রবিবার বেলুড় মঠেই কাটাইতে আরম্ভ করি। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ প্রভৃতি মহারাজগণ আমাকে তাঁহাদের আপনার করিয়া লন। ১৯১০ সালের শেষে স্বামীজীর উৎসবের পূর্বে শ্রীশ্রীমহারাজ যখন কলিকাতা আসেন তখন পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে শ্রীশ্রীমহারাজের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। শ্রীশ্রীমহারাজের সঙ্গে আমার এক অপূর্ব যোগ আছে বোধ করিতাম। তাঁহার প্রতি ভক্তি-ভালবাসায় বিহ্বল হইয়া যাইতাম। অন্য মহারাজদের বেলায় এরূপ হইত না।

কলিকাতায় ও বেলুড়ে মহারাজের নিকট খুবই যাইতাম। তাঁহার দর্শন ও এক-আধটু সেবা করিবার সুযোগও পাইতাম। একদিন বিনোদ-বাবুদের বাড়ীতে কি উৎসব ; অনেক সাধুভক্ত আসিয়াছেন। আমি মহারাজকে বড় হাতপাখা লইয়া বাতাস করিতেছি, মহারাজ হঠাৎ আমাকে বলিলেন—"দেখ্, শরীর মন সংসারকে দিলে সংসার সব নষ্ট করিয়া দেয়। ভগবানকে দিলে তিনি সব—স্বাস্থ্য, চেহারা, মন—ভাল অবস্থায় রাখিয়া দেন।" আমার সাধু হইবার ইচ্ছা খুবই ছিল। মহারাজ আদর্শটা আরও উজ্জ্বল করিয়া ধরিলেন।

একদিন আমি ও আমার একটি বন্ধু মহারাজের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বেলুড় মঠে যাই। সেখানে গিয়া শুনি তিনি বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে বলরাম-মন্দিরে গিয়াছেন। তখন আমরা বলরাম-মন্দিরে যাই। মহারাজ আমার বন্ধুকে বলেন—"দেখি তোর হাত।" তাহার হাত দেখিয়া বলিলেন—"তোর কামের দিক হইতে কিছু অন্তরায় আছে। তবে শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা হইলে তাহা কাটিয়া যাইবে।" বাবুরাম মহারাজ আমাকে স্নেহ করিতেন। তিনি মহারাজকে আমার হাতও দেখিতে বলেন। মহারাজ আমার হাত কিন্তু দেখিলেন না। ইহাতে আমার মন খারাপ হইয়া গেল। আমি মনে করিলাম আমার বন্ধুর সাধু হইবার সম্ভাবনা আছে, আমার হয়ত তাহাও নাই।

এই ঘটনার কয়েকদিন পর বেলুড় মঠে ঢুকিতেছি, মাঠের মাঝখানে মহারাজের সেবক আমাকে দেখিয়া বলিল—"মহারাজ বলিতে-

ছিলেন, তুমি সাধু হইবে।" আমার তখন প্রাণে বল আসিল। সময়ে আমার সাধু হওয়া হইল; কিন্তু বন্ধুটিকে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইল। সে এখন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কিন্তু খুব ঠাকুরের ভক্ত; শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য।

একদিন মহারাজ সদলবলে তুখানি নৌকা করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যান। আমিও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম। অপূর্বভাবে তিনি ভাবিত। বলিলেন—দক্ষিণেশ্বরে কুকুর হইয়া থাকাও পরম সৌভাগ্য।

শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট যখন গিয়া বসিতাম তখন স্পষ্ট বোধ করিতাম—তাঁহার চারিদিকে যেন একটি charmed circle আছে। আমরা তাহার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। একদিন মহারাজ আমার নিকট এক নূতন ভাবে প্রকাশিত হন। তিনি বেলুড় মঠে পায়চারি করিতেছিলেন। আমি দেখিলাম এক অমানব দিব্য পুরুষ।

১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে মহারাজ কৃপা করিয়া আমাকে দীক্ষা দেন। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি ৺পুরী চলিয়া যান। আমি মহারাজকে লিখি—আমি সাধু হইতে চাই। মহারাজ অমূল্য মহারাজকে দিয়া লেখান—মনে যদি জোর থাকে, চলিয়া আসুক না।

১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে আমি ৺পুরীতে মহারাজের নিকট চলিয়া যাই ও সঙ্ঘে যোগদান করি। মহারাজ এই সময় আমাকে দিয়া অটলবাবুর বাড়ীতে ৺জগদ্ধাত্রী পূজা করান। পূজনীয় হরি মহারাজ প্রধান তন্ত্রধারক; নীরদ মহারাজ সহকারী তন্ত্রধারক। কুমারী-পূজাও করাইয়াছিলেন। ইহাতে সাধু হইবার অব্যবহিত পরেই আমার জীবনে এক গভীর আধ্যাত্মিক ভাবের প্রেরণা আনিয়া দেন।

ইহার পর শ্রীশ্রীমহারাজ শর্বানন্দ মহারাজের সঙ্গে আমাকে মান্দ্রাজে পাঠান। মান্দ্রাজে যাইবার পূর্বে মহারাজকে আমি উপদেশ দিবার জন্য অনুরোধ করি। তিনি গম্ভীর ভাবে খুব কৃপার সহিত বলেন—"Struggle! Struggle! Struggle!"—ইহাই জীবনের মূলমন্ত্র হইয়া আছে। শ্রীশ্রীমহারাজের কথা এখনও কানে বাজে।

পুরীতে থাকিবার সময়কার দু-একটি কথা মনে হয়। একদিন অটলবাবু শর্বানন্দ স্বামীকে বলেন—"তোমরা কি রকম সাধু? তোমাদের কোন সিদ্ধাই নাই!" তাহা শুনিয়া মহারাজ বলেন—"সিদ্ধাই পাওয়া সহজ। মনের পবিত্রতা লাভ করা শক্ত। মনকে পবিত্র করাই আসল।"

একদিন মহারাজের শরীর খারাপ। কোমরে ব্যথা হইয়াছিল। সেদিন ৺পুরী-মন্দিরে বিশেষ উৎসব। আমরা প্রায় সকলেই—মহারাজের সেবকই মহারাজের সব দেখিবে মনে করিয়া—মন্দিরে উৎসব দেখিয়াই অনেক সময় কাটাইয়া দিই। সন্ধ্যার পর আমরা ফিরিলে মহারাজ আমাদের স্বার্থপরতার জন্য খুব বকেন। অবশেষে বলেন—"আমি তোদের নিকট হইতে কিছুই চাই না। এক তোদের মঙ্গল চাই। আর তোদের মঙ্গলের জন্যই সব বলি।"

বকুনি খাইয়া রাত্রে আমি মহারাজের সেবা করিবার ভার লই। একদিন রাত্রে মহারাজ গরম বোধ করেন। আমাকে জানালার পাখি খুলিতে বলেন। আমি একে সেবাকার্যে নূতন, তারপর আমার বুদ্ধিরও অভাব। জানালা কিছুক্ষণ পর বন্ধ করিবার দরকার, তাহা মনে হয় নাই। পরদিন মহারাজের শরীর একটু ভার হয়। তাহা শুনিয়া আমি বিশেষ লজ্জিত ও দুঃখিত হই। মহারাজ আমাকে নিজে কোন রকম বকুনি ত দেনই নাই তাছাড়া আরও অন্য সকলকে বলিয়াছিলেন—"ছেলেমানুষ, জানে

না।" ইহাতে অন্য কেহই আমাকে কিছু বলে নাই। আমার এক শিক্ষা হইয়া গেল

১৯১১ সালের শেষে মান্দ্রাজ যাই। সেখানে পাঁচ বৎসর ছিলাম। ১৯১৬ সালে মান্দ্রাজেই আবার মহারাজকে দর্শন করি।

মান্দ্রাজ মঠের ম্যানেজারের কাজ করিতে আমাকে খুব খাটিতে হইত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ম্যানেজারের চেয়ারে আমাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"তোকে কি এখানে কেরানীগিরি করিবার জন্য পাঠাইয়াছি?" আমাকে খুব বকেন। শর্বানন্দ মহারাজকেও খুব বকেন। বলেন—"ছেলেটাকে পড়াশুনা প্রভৃতি করিবার সুযোগ না দিয়া তাহাকে দিয়া কেরানীগিরি করাইতেছে।"

বিশ্ব মহারাজ তখন মহারাজের সেবক। তিনি আমাকে মহারাজের জন্য ভাল তিল-তেল প্রভৃতি আনিতে বলেন। আমি সন্ধান জানিতাম ও সর্বোৎকৃষ্ট যাহা পাইতাম তাহা আনিতাম। একদিন ইহা উপলক্ষ্য করিয়া বলেন—"তোকে কি আমি কোথায় ভাল তিল-তেল পাওয়া যায় না যায় তাহার সন্ধান জানিবার জন্য এখানে পাঠাইয়াছি?" সব বকুনি শ্রীশ্রীমহারাজের কৃপার ও ভালবাসার নিদর্শন জানিয়া, প্রাণে প্রাণে তিনি আমার আপনার ও আমি তাঁহার আপনার জন, ইহা মনে করিয়া আনন্দিতই হইতাম।

এই সময় মহারাজ আমাকে বিশেষ পড়াশুনা ও সাধন-ভজন করিতে ও নিত্য বিষ্ণু-সহস্র-নাম পাঠ করিতে বলেন। তাঁহার কৃপায় মন খুব ভাল অবস্থায় থাকিত ও হৃদয়ে মহারাজের সহিত যোগ ও এক অপূর্ব আনন্দ বোধ করিতাম।

মহারাজ কৃপা করিয়া তাঁহার দলের সঙ্গে আমাকে ৺কন্যাকুমারী লইয়া যান। ইহার পূর্বে আমি বিধিপূর্বক সমগ্র ৺চণ্ডীপাঠ কখনও করি নাই। দেবীর মারামারি-কাটাকাটি ভাল লাগিত না। স্তোত্রগুলি মাত্র পড়িতাম। ইহা শুনিয়া খুব বকেন, আর প্রতি পক্ষে একদিন বিধিপূর্বক ৺চণ্ডীপাঠ করিতে বলেন। তিন বৎসর বিষ্ণু-সহস্র-নাম ও ৺চণ্ডীপাঠ করিতে বলিয়াছিলেন। আমি তিন বৎসরের বেশী পাঠ করিয়াছিলাম।

ব্রহ্মচারী অবস্থায় অহঙ্কারাদি হইবে মনে করিয়া আমি প্রবন্ধাদি লিখিতাম না ও বক্তৃতাদিও দিতাম না। বাহিরের লোকের সঙ্গে ধর্ম-প্রসঙ্গাদিও বিশেষ করিতাম না। ত্রিবাঙ্কুরের হরিপাদ আশ্রমে একদিন আমাকে জোর করিয়া বলেন—"আমাদের নিকট হইতে যে সব শুনিতেছিস ও শিখিতেছিস তাহাই বলবি।"

মান্দ্রাজে একদিন বলেন—"পড়াশুনা করিবার এমন অভ্যাস করবি যাহাতে কোনদিন পড়াশুনা না করিলে খারাপ বোধ হয়। মন উচ্চাবস্থায় না থাকিলে অন্ততঃ পড়াশুনা লইয়া থাকিবে। তাহার নীচে যাইবে না।"

আরেক দিন বলেন—"প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া article লেখ্‌ ত!" আমি বলি—"কি লিখিব? কোন ভাব আসে না।" তখন বলেন—"বেশ ভাল করিয়া চিন্তা করিতে শেখ্‌। তখন দেখবি এত ভাব আসিবে যে তাহার চোট সামলানো দায়।" এরপর গুরু-কৃপায় আমার কোন ভাবের অভাব হয় নাই।

ব্যাঙ্গালোরে মহারাজের নিকট থাকিবার সময় একদিন সকালে কয়েকটি physical exercise দেখান ও নিত্য করিতে বলেন। আমি কিছু indoor exercise বরাবরই করিতাম। মহারাজের প্রদর্শিত exercise-গুলি তাহার সঙ্গে যোগ করিয়া লই।

মহারাজ একাধিকবার আমাকে বলিয়াছিলেন - Physical, intellectual, moral and spiritual সব রকম progress এক সঙ্গে চালানো দরকার।

মাদ্রাজে আসিবার পর মহারাজ নিজেই আমাকে অনেকবার suggestion দেন—আমাকে সন্ন্যাস দিবেন। সন্ন্যাসের পূর্বে অন্যান্য সাধুরা আমাকে তাঁহার নিকট গিয়া সন্ন্যাসের জন্য প্রার্থনা করিতে বলেন। আমি মূর্খের মত গিয়া তাঁহাকে বলি—"মহারাজ, আপনি যদি আমাকে উপযুক্ত মনে করেন তবে আমাকে কৃপা করিয়া সন্ন্যাস দিন।" তাহাতে মহারাজ স্নেহের সঙ্গে বলেন—"সন্ন্যাসের উপযুক্ত একথা কেহই বলিতে পারে না। তবে আমি তোকে সন্ন্যাস দিব।"

সন্ন্যাসের দিন শ্রীশ্রীমহারাজ এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক ভাবে vibrate করিতেছেন অনুভব করিলাম। হোম প্রভৃতি হইবার পর যখন তাঁহাকে প্রণাম করিলাম তখন তিনি মাথায় হাত দিয়া আমার ভিতর এক বিরাট সত্তার বোধ আনিয়া দেন। তিনি, আমি, জগৎ যেন এক অনন্ত সত্তায় মিশিয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীগুরুর যে কি স্বরূপ তাহার আভাস দিলেন। তখন "অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥"—ইহার সত্যতা খুবই অনুভব করিলাম।

ঐদিন সন্ধ্যার পর আমরা অনেকেই মহারাজের নিকট গিয়া বসিয়াছি। শর্বানন্দ মহারাজও সেখানে ছিলেন। মহারাজের মন খুব উচ্চ সুরে বাঁধা। আমি মনে করিয়াছিলাম খুব সাধন-ভজনের কথা বলিবেন, তাহা না বলিয়া বিশেষতঃ আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তোরা সাধন কি করবি! ঠাকুর-স্বামীজীর ভাব দ্বারে দ্বারে প্রচার কর। তাঁহাদের কাজ কর। দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভগবানের নাম শোনা। ইহাই মহা সাধন।" শর্বানন্দ মহারাজের নাম ধরিয়া বলিলেন—"শর্বানন্দ, শ্রীরামানুজাচার্যের ভাব আজকাল আমার বড় ভাল লাগে—সকলকে ভগবানের বাণী শুনানো।"

ঐদিন শ্রীশ্রীমহারাজ আমার ভিতর এক নূতন প্রেরণা আনিয়া দেন। আমার মনটাকে এক নূতন ধারায় চালাইয়া দিলেন। সেই ভাব এখনও চলিতেছে। মাদ্রাজে এই নূতন প্রেরণার ফলে পড়াশুনা-ধ্যান-পাঠাদিতে বেশী জোর দেই। ক্লাস, বক্তৃতাদিও করিতে আরম্ভ করি। বিশেষভাবে প্রবন্ধাদি লেখা পরে হয়।

মাদ্রাজের নূতন মঠ-বাড়ী নির্মাণও শ্রীশ্রীমহারাজের এক ঐশী শক্তির বিকাশ। পুরাতন মাদ্রাজ মঠ-বাড়ী ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় মঠ ভাড়াটিয়া বাড়ীতে স্থানান্তরিত করিতে হয়। পূজনীয় শর্বানন্দ মহারাজ ও আমরা নূতন মঠ-বাড়ী কি করিয়া প্রস্তুত হইতে পারে তাহা ভাবিয়াই পাই নাই। জমি পূর্বেই ক্রয় করা ছিল। শ্রীশ্রীমহারাজ আসিয়া বলিলেন—তিনি মঠ-বাড়ীর ভিত্তি স্থাপন করিবেন। শর্বানন্দ স্বামীকে টাকা সংগ্রহ ও এমন কি কিছু ধারও করিতে বলিলেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে অর্থাদি আসিয়া গেল, অন্যান্য যোগাযোগও হইল। আট মাসের মধ্যে সামনের 'হল' ছাড়া আর সব বাড়ী তৈয়ার হইয়া গেল। শ্রীশ্রীমহারাজ ব্যাঙ্গালোর হইতে ফিরিয়া আসিবার পর ও আমাদের সন্ন্যাসের কিছুদিন পর নূতন মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

ঐ দিন— মঠ-প্রতিষ্ঠার দিন —আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে আরতি করিতেছি। শ্রীশ্রীমহারাজ আমার পিছনে একটু দূরে দাঁড়াইয়া। আরতি

করিতে করিতে বোধ করিলাম—যেন এক বিরাট সত্তায় সব পূর্ণ। সব ছবিতে ও শ্রীশ্রীমহারাজের ভিতর ও সকলের ভিতরেই সেই বিরাটের আরতি করিলাম। এখনও আরতি করিতে গেলে এই ভাব আসিয়া যায়। ইহা শ্রীশ্রীমহারাজের বিশেষ কৃপা। ঐ দিন সন্ধ্যার পর আমরা ভাড়াটিয়া বাড়ীর ছাদে মহারাজের নিকট গিয়া বসিয়াছি। মহারাজ তখন বলিলেন—"আমি ঠাকুরকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলাম—এরা ছেলেমানুষ, কি করিয়া বাড়ী করিবে? আপনি কৃপা করিয়া সব ব্যবস্থা করিয়া দিন। —তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় বাড়ী হইয়া গেল।"

মান্দ্রাজে নানা কাজে ব্যাপৃত থাকিতাম। পড়াশুনা-ধ্যানাদির বিশেষ সময় পাইতাম না। আমার জীবনে একটা পরিবর্তন হওয়া উচিত, তাহা মহারাজ মান্দ্রাজে আসিয়াই বুঝেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল—আমি মান্দ্রাজ ছাড়িয়া ব্যাঙ্গালোরে যাই। আমার সেখানে যাইবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মহারাজ জানিতেন আমার পক্ষে কি ভাল। একদিন বলিলেন—"বোকা, নিজের interest বুঝিস না! মান্দ্রাজে আর তোর থাকিয়া কাজ নাই। তুই ব্যাঙ্গালোরে যা।"

পূর্বে তুলসী মহারাজ শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট আমাকে চাহিয়াছিলেন। মহারাজও একরূপ রাজী ছিলেন শুনিয়াছি। যাহা হউক, মহারাজের ইচ্ছায় আমি ১৯১৭-এর গ্রীষ্মে ব্যাঙ্গালোর যাই। সেখানে এক বৎসরের উপর ছিলাম।

মহারাজ ১৯১৭ সালের গ্রীষ্মের প্রারম্ভে পুরী চলিয়া যান। আমিও ইহার কিছুদিন পর ব্যাঙ্গালোরে যাই। সেখানে খুব সাধন-ভজন-পড়াশুনা করিতাম। ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে রবিবারের ক্লাসও আমি লইতাম। ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মের শেষভাগে আমার Enteric Fever হয়। শরীরে খুব জ্বালা বোধ করিতাম। হাসপাতালের ward-এ আছি। এই সময় খুব Influenza হইতেছিল। একদিন সকালে একটি বৃদ্ধকে আমার bed-এর পাশের bed-এ আনিয়া রাখিল। বৃদ্ধের Double Pneumonia হইয়াছিল। খুব সাজ্ঘাতিক অবস্থা। সন্ধ্যা নাগাদ বৃদ্ধের সব শেষ হইয়া গেল।

আমি বিশেষ যন্ত্রণা বোধ করিতেছি। তখন আমার মন খুব পরিষ্কার। কোনরূপ মৃত্যুভয় নাই। আমার মনে হইতেছিল যন্ত্রণা আরও বেশী হইলে তাহা সহ্য করা মুশকিল। তাহা অপেক্ষা আমার মৃত্যুই ভাল। যেই এই কথা আমার মনে উঠিয়াছে তখন শ্রীশ্রীমহারাজকে দেখিলাম।

তিনি বলিলেন—"মরবি কি রে! তোকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ করিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। আমার মন এক অভিনব ভাবে পূর্ণ হইয়া গেল। চোখ দিয়া খুব জল পড়িতে লাগিল। মৃত্যু-ভয় ত ছিলই না। খুব একটা শান্তি ও শরণাগতির ভাব আসিয়া গেল। অসুখও ভালর দিকে turn লইল।

ব্যাঙ্গালোরে এক বৎসরের উপর থাকিয়া ও এক বৎসর মান্দ্রাজ প্রদেশের একাধিক স্থানে সাধন-ভজনাদি করিয়া ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরের শেষে শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট ভুবনেশ্বরে যাই। সেখানে তাঁহার পূত সঙ্গে কয়েকদিন থাকিবার সুযোগ পাই। ভুবনেশ্বর মঠ নির্মাণ তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই সময় একদিন সন্ধ্যাকালে পুরীর অটল মৈত্র মহাশয় তাঁহার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সহিত আসিয়া উপস্থিত। বৃদ্ধ খুব বিষণ্ণ

শোকে যেন মগ্ন। শ্রীশ্রীমহারাজ বরদানন্দ স্বামীকে গান গাহিতে বলিলেন। বরদানন্দ স্বামী —"অভয়ার অভয়পদ কর মন সার"—এই গানটি গাহিলেন। গান শুনিয়া—তাহার অপেক্ষা বেশী শ্রীশ্রীমহারাজের দর্শনে ও কথাবার্তায়—বৃদ্ধের মুখ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমরা সকলেই এই পরিবর্তন দেখিয়া খুব আনন্দিত হইলাম।

ভুবনেশ্বরে কয়েকদিন থাকিবার পর মহারাজ আমাকে অসুস্থ গোকুলানন্দ স্বামীর সঙ্গে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। আমি কলিকাতা হইতে গিয়া কয়েক মাস বেলুড় মঠে বাস করি। এই সময়, ১৯২০ সালের স্বামীজীর উৎসবের পূর্বে মহারাজ বেলুড়ে আসেন। সকলে আমরা তাঁহার ঘরে গিয়া বসিতাম। ধ্যান ও স্তোত্রাদি পাঠ হইত।

শ্রীশ্রীমহারাজকে আমার শেষ দর্শন ৺কাশীতে—১৯২১ সালের প্রারম্ভে, স্বামীজীর উৎসবের পূর্বে। আমি তখন পূজনীয় হরি মহারাজের নিকট ছিলাম। মহারাজ ৺কাশীতে অদ্বৈতাশ্রমে ও সেবাশ্রমে এক নূতন আধ্যাত্মিক ভাবের স্রোত আনিয়া দেন। এই সময় তিনি আমাকেও খুব আধ্যাত্মিক প্রেরণা দেন। একদিন আমাকে তিনি সাধন-ভজনের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। আমি বলিলাম—"আমার ভিতরটা যেন খুলিতেছে না। তাই মনে শান্তি পাইতেছি না। আমরা এমন খারাপ সংস্কার লইয়া জন্মিয়াছি যে সেগুলি আধ্যাত্মিকতার অন্তরায় হইয়া আছে।" মহারাজ বলিলেন—"এ রকম ভাবিস না। মহানিশায় জপ কর। পুরশ্চরণ কর। ভিতরটা আপনিই খুলিয়া যাইবে।"

আর একদিন মনে অশান্তি বোধ করিয়া তাঁহার নিকট গিয়াছি। তিনি আমাকে আসিতে দেখিয়া আমার নিকট উঠিয়া আসিলেন। অল্প সময়ে অনেক উপদেশ দিলেন। বলিলেন—"আমি যা চাই তা করতে চাস না বলিয়াই তোর মনে অশান্তি হয়।" মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া হৃদয় শান্তিপূর্ণ করিয়া দিলেন।

শ্রীশ্রীমহারাজের ইচ্ছা, আমি মায়াবতী গিয়া 'প্রবুদ্ধ ভারতের' ভার লই। আমাকে তিনি নিজে কিছুই বলেন নাই। পূজনীয় সুধীর মহারাজ, নির্মল মহারাজ একাধিক বার আমাকে মায়াবতী যাইবার সম্বন্ধে বলেন। আমি বিশেষভাবে নারাজ।

একদিন পূজনীয় হরি মহারাজের নিকট আছি ও তাঁহার সেবার কাজে ব্যাপৃত আছি। সকালে হঠাৎ বোধ করিলাম—আমার ভিতরে কি যেন একটা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে ও প্রাণের ভিতর হইতে কান্না পাইতেছে। চোখ দিয়া খুব জলও পড়িতে লাগিল। চোখের জল মুছি, আবার পড়িতে থাকে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতর একটা খুব শরণাগতির ভাব আসিয়া যাইতেছে দেখিলাম। বুঝিলাম শ্রীশ্রীমহারাজের ইহা একটি লীলা। তিনি কৃপা করিয়া আমার মনের গোঁ ও আরও সব অন্তরায় ভাঙ্গিয়া দূর করিয়া দিতেছেন। সন্ধ্যা নাগাদ আমার মনটা পরিষ্কার হইয়া গেল।

ইহার পর একদিন সকালে শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করিতে গিয়াছি। তখন তিনি আমাকে বলিলেন—"দেখ্, ওদের সকলের ইচ্ছা তুই মায়াবতী যাস ও প্রবুদ্ধ ভারতের ভার নিস।" ইতিপূর্বেই তিনি আমার গোঁ ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। আমি কোন রকম দ্বিধা না করিয়া বলিলাম—"মহারাজ আপনি যদি আদেশ করেন নিশ্চয়ই যাইব।" মহারাজ এই

উত্তর শুনিয়া খুব প্রসন্ন হইলেন ও আশীর্বাদ করিলেন। এরপর আমার মায়াবতী যাওয়া স্থির হইল। একদিন সকালে মহারাজকে প্রণাম করিয়া সুধীর মহারাজ, নির্মল মহারাজ প্রভৃতি অন্যান্য সাধুদের সঙ্গে তাঁহার নিকট বসি। মহারাজ আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন—"সাধন-ভজন কিরূপ চলিতেছে?" আমি উত্তরে বলি অনেক কাজ করিতে হয়। বিশেষ সময় পাই না।" মহারাজ বলিলেন—"কাজের জন্য সময় পাওয়া যায় না, এইরূপ মনে করা ভুল। মনের চঞ্চলতার জন্য ঐরূপ মনে হয়।" এরপর মহারাজের কথার বন্যা খুলিয়া গেল। তিনি খুব ভাবের সহিত বলিলেন—"work and worship একসঙ্গে করিয়া মনকে তৈয়ার করিতে হয়।" এইসব কথা 'Spiritual Teachings'-এর 'Work and Worship' Chapter-এ আছে। ইহা আমাকেই বিশেষ করিয়া বলা।

এই দিন নির্মল মহারাজের সঙ্গে ও সব সাধু ভ্রাতাদের সঙ্গে আমার এক বিশেষ প্রীতির ভাব স্থাপন করিয়া দেন। বলেন—"নির্মলও যেমন আমার আপনার তুইও তেমনি আমার আপনার, এমনি সকলেই।" যখন ভাবি সকলেই তো মহারাজের আপনার, তখন সকলকে আমারও আপনার বলিয়া বোধ হয়। শ্রীশ্রীমহারাজ তাঁহার নিজের শিষ্য ও শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য সকলকেই আপনার মনে করিতেন ও বলিতেন, সকলেই ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ করিতে আসিয়াছে। একদিন বিশেষতঃ আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—"কর্ম ঠাকুর-স্বামীজীর—এই ভাব নিয়ে করলে কোনও বন্ধন তো হইবেই না, অধিকন্তু তার through দিয়ে spiritual, moral, intellectual এবং physical সব রকম উন্নতি হবে। তাঁহাদের পায়ে আত্মসমর্পণ কর। শরীর মন সব তাঁদের পায়ে দিয়ে দে। তাঁদের গোলাম হয়ে যা।"

শ্রীশ্রীমহারাজের এই ও আরও সব উপদেশ জীবনের সম্বল হইয়া আছে।

শ্রীশ্রীমহারাজের সঙ্গে আমার একদিন খুব প্রাণ ভরিয়া কথাবার্তা বলিবার ইচ্ছা ছিল। তাঁহার উপর আমার অভিমান হইয়াছিল। মাদ্রাজে ১৯১৬ সালে গিয়াই আমাকে বলিয়াছিলেন, তিনি ফিরিবার সময় আমাকে বাংলাদেশে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন। আমাকে তাঁহার সঙ্গে না লইয়া গিয়া বাঙ্গালোরে পাঠান। তারপর ১৯১৯ সালের শেষে ভুবনেশ্বরে তাঁহার নিকট আসিলে আমাকে সেখানে বেশীদিন না রাখিয়া বাংলাদেশে পাঠাইয়া দেন। এইসব কারণে আমার অভিমান হওয়ায় মনে অশান্তি বোধ করিতেছিলাম।

আমি কথাবার্তা বলিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলাম। একদিন এই সুযোগ পাই। শ্রীশ্রীমহারাজের ১৯২১ সালের জন্মতিথিতে ৺কালীপূজা হয়। প্রতিমা ভাসানোর জন্য সন্ধ্যার পূর্বে সকলেই গঙ্গাতীরে গেলে আমি তাঁহার নিকট যাইব স্থির করি। পূর্বে তাঁহাকে কিছুই বলি নাই

আমি ঐদিন সন্ধ্যার পর তাঁহার ঘরে গিয়া উপস্থিত। বিশুদ্ধানন্দ স্বামী তাঁহার নিকট বসিয়া। পেতাপুরীও আছেন। আমাকে দেখিয়াই মহারাজ ছেলেমানুষের ভাবে পেতাপুরীকে বলিয়া উঠিলেন—"দেখ্‌লি আমি কেমন যোগী?"

শুনিলাম একটু পূর্বেই তিনি পেতাপুরীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"দেখত, সুরেশ আসিয়াছে কি না।" তিনি পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন আমি আসিব।

এইদিন অনেক কথাবার্তা হয়। ভুবনেশ্বরে আমাকে মাত্র কয়েকদিন রাখিয়া বেলুড়ে পাঠাইয়া দেন। মহারাজ বলেন—আমার বাংলা দেশে যাইবার ইচ্ছা ছিল ও একটু ঘোরাঘুরি করিবারও ইচ্ছা ছিল, তাহা তিনি জানিতেন। আরও জানিতেন—এভাব অল্প দিনেই কাটিয়া যাইবে। এই ভাব শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে কাটিয়া যায়—সেইজন্য আমাকে বাংলা-দেশে অত তাড়াতাড়ি করিয়া পাঠাইয়া দেন। মহারাজ কত গভীর ভাব হইতে সব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা ভাবিয়া আমি বিশেষ লজ্জিত হই। তিনি মনের সব খেদ দূর করিয়া আমার মনটাকে পরিষ্কার করিয়া দেন। ইহার ফলে শ্রীশ্রীমহারাজ তাঁহাদের সঙ্গে আমার এক নূতন মনের যোগ আনিয়া দেন।

ইহার কয়েকদিন পর তিনি বেলুড়ে চলিয়া যান। ৺কাশীতে আমার তাঁহাকে শেষ দর্শন করা। শ্রীশ্রীমহারাজ তাঁহার অমানব মূর্তি আমার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীশ্রীমহারাজ আমাকে মান্দ্রাজে ও ৺কাশীতে যে আধ্যাত্মিকতার আভাস এবং ধর্ম ও কর্ম জীবনের গতির ধারা দেখাইয়া দেন তাহার জের আজও চলিতেছে। তিনি কৃপা করিয়া সূক্ষ্মভাবে আরও নূতন আলোক ও নূতন প্রেরণা আনিয়া দিতেছেন। যতই দিন যাইতেছে ততই শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার মর্ম বুঝিতেছি। সচ্চিদানন্দই গুরুরূপে আসেন।

"ভগবান আছেন, ধর্ম আছে—এসব কথার কথা বা morality রক্ষার জন্য নয়। সত্যই তিনি আছেন, তিনি প্রত্যক্ষের বিষয়, উপলব্ধির বিষয়। তাঁর চেয়ে সত্য আর কিছু নেই।"

"গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে মানুষ যদি খেটে চলে যায়, তবে তার সব দ্বন্দ্ব ঘুচে যায়। তবে কি আর এদিক সেদিক দৌড়ুতে হয়? ভগবানই তার সব অভাব মিটিয়ে দেন, তাকে হাত ধরে ঠিক রাস্তায় নিয়ে যান।"

—স্বামী ব্রহ্মানন্দ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বর্তমান পরিস্থিতি

অধ্যাপক শ্রীসুজয়গোপাল রায় পোদ্দার

আজ থেকে দীর্ঘ ১৩০ বছর আগে ভগবান স্বয়ং এসেছিলেন আমাদের মাঝে আমাদের মত মানুষের সাজে তাঁর এক মহতী ইচ্ছা বাস্তব-রূপায়িত করতে; সে ইচ্ছা যে কি, তা ভগবান নিজেই বলে গেছেন শ্রীকৃষ্ণ-অবতারে ভক্ত অর্জুন সমীপে—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

লীলাময়ের লীলাকালে সে লীলা বুঝবার মত পবিত্র আধার হয়তো তখন খুব বেশী ছিল না—লীলাসংবরণের পরই যেন মানুষ হঠাৎ বিশেষ ভাবে সচেতন হয়ে উঠলো শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা আজ মানুষের ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে নানা ভাবে, নানা রূপে, নানা লয়ে, নানা ছন্দে। ঠাকুরের ১৩১তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে আমার এই অনাড়ম্বর প্রয়াসও এই পূজারই একটি রূপ।

মানুষ যখনই কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা করে তখন সে মনের স্বাভাবিক ধর্মানুযায়ী মানুষের নিয়ম অনুসরণ করে থাকে; ইংরেজীতে যাকে বলে law of association—সেই নিয়মানুসারেই মানুষ চিন্তাস্রোতে ভেসে চলে। এই অনুষঙ্গের নিয়ম-প্রভাবেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে যে সংশ্লিষ্ট ধারণাগুলো আমাদের মনে আসে, তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো 'ধর্ম'। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে ধর্মের স্বরূপ কি, বর্তমান জীবন-পটভূমিকায় এই ধর্মের কোন মূল্য আছে কিনা—কালোপযোগী ভেবে বর্তমান নিবন্ধে সে-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো।

প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে কোন যুক্তিপূর্ণ আলোচনা স্বামী বিবেকানন্দের আলোচনা-সাপেক্ষ। আমার একথার সমর্থনে স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমায়ের মুখ-নিঃসৃত বাণীই তুলে ধরছি। স্বামীজী বলছেন —"যে সকল ভাব আমি প্রচার করিতেছি, সকলই তাঁহার চিন্তারাশির প্রতিধ্বনিমাত্র।" শ্রীমাও একই কথা অন্যভাবে বলছেন—"নরেন হলো ঠাকুরের হাতের যন্ত্র। তিনি তাঁর ছেলেদের ও ভক্তদের দিয়ে তাঁর কাজ করাবেন বলে নরেনকে দিয়ে এসব লেখাচ্ছেন, বলাচ্ছেন।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম লীলা-সহচর শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজও রামকৃষ্ণ মিশনের জনৈক সন্ন্যাসীর এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, 'দেখ ঠাকুর হচ্ছেন বেদ, আর স্বামীজী তার ভাষ্য।' বেদাধ্যয়নের সময় যেমন তার ভাষ্য, টীকা ইত্যাদির প্রয়োজন হয়, ঠিক তেমনি ঠাকুরকে বুঝতে হলে বা জানতে হলে স্বামী বিবেকানন্দকে জানা প্রয়োজন।

সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনবেদ অনুধ্যানে ব্রতী হয়ে বর্তমান নিবন্ধের যে তিনটি পর্যায়ের উল্লেখ করেছি, তার প্রত্যেকটি সম্বন্ধে আলোচনা স্বামীজী-প্রদর্শিত পথেই করবো। এ যেন অনেকটা গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজোর মতো। বস্তুতঃ এ সব বিষয়ে আমাদের নতুন কিই বা বলার থাকতে পারে? স্বামীজী স্বয়ং ঠাকুর সম্বন্ধেই বলেছেন—"শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কোন নূতন তত্ত্ব প্রচার করিতে আসেন নাই—প্রকাশ করিতে আসিয়াছিলেন বটে, অর্থাৎ, "He was the embodiment

of all past religious thoughts of India. His life alone made me understand what the shastras really meant, the whole plan and scope of the old shastras." তিনি আরও বলেছেন —"He had lived in one life the cycle of the national religious existence in India."

প্রথম পর্যায়ের আলোচনা হলো শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে প্রতিফলিত 'ধর্ম'কে কেন্দ্র করে। ধর্ম কি? এ প্রশ্নের উত্তর নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয়ে গেছে। ধর্মের ইতিহাস হচ্ছে তার সাক্ষী। বিভিন্ন কালের মানুষ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের এমন বিচিত্র বর্ণনা দিয়েছেন যার ফলে অনেক নৈষ্ঠিক ধর্মজিজ্ঞাসুকে প্রায়শই নানারকম বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। ধর্মের এই ইতিহাস-সম্পর্কীয় আলোচনায় নিযুক্ত না হয়ে আমাদের সাধারণ বুদ্ধি থেকে ধর্মের কোন যথার্থ ব্যাখ্যা করতে পারা যায় কিনা সে চেষ্টাই করবো এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করবো যে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে প্রতিবিম্বিত ধর্মের সঙ্গে আমাদের সাধারণ বুদ্ধিপ্রসূত ধর্মবোধের কোন মিল আছে কিনা।

যখন আমরা বলি আগুনের ধর্ম হচ্ছে তার দাহিকাশক্তি (এ বলা বিজ্ঞানসম্মত) তখন আসলে যা বুঝি সেটা হচ্ছে দাহিকাশক্তির জন্যই আগুন, আগুন অন্য কিছু নয়; যার মধ্যে দাহিকাশক্তি নেই, তাকে কোন ভাবেই আগুন নামে অভিহিত করা চলে না। ঠিক এই যুক্তিই জগতের অন্যান্য বস্তুনিচয়ের বেলায়ও সমভাবে প্রযোজ্য। এক কথায় কোন কিছুর ধর্ম হচ্ছে তার মূল বৈশিষ্ট্য যার সামান্যতম অভাবের জন্য সেই 'কোন কিছু' নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলে ধর্মভ্রষ্ট হয়। এই ব্যাখ্যা যদি আমরা মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি (যে ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীসভা করতে বাধ্য), তাহলে মানুষের ধর্ম বলতে বুঝবো তার মূল বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ 'মনুষ্যত্ব' যার জন্যে মানুষ মানুষ। যার মধ্যে 'মনুষ্যত্ব' এই বিশিষ্টতার অভাব আছে, তাকে মানুষ বলা চলে না। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক একটা কলসের কথা; 'কলস'কে আমরা মানুষ বলি না, কারণ এর মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই বলে আমরা জানি। মনুষ্যেতর প্রাণী যেমন একটি পাখী—একেও আমরা মানুষ বলি না একই কারণে, অথচ আমাদের মত প্রত্যেককেই আমরা মানুষ বলে থাকি। কিন্তু কেন? সহজ উত্তর হচ্ছে আমরা সবাই যুক্তিসম্মত ভাবে দাবী করি যে আমাদের মধ্যে 'মনুষ্যত্ব' নামক বিশিষ্টতাটি বর্তমান। যদি কোন ব্যক্তির জীবন বিশ্লেষণ করে একথা প্রমাণিত হয় যে তার মধ্যে 'মনুষ্যত্ব' নামক গুণের অভাব আছে, তাহলে হাজার মৌলিক দাবী সত্ত্বেও সেই ব্যক্তিকে 'মানুষ' বলা চলবে না- এ ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিকে মনুষ্যেতর প্রাণীর বা জড়ের সমগোত্রীয় অর্থাৎ 'অ-মানুষ' এই অলংকারেই ভূষিত করতে হবে, অন্ততঃ যুক্তির দিক থেকে তো তাই বলতে হয়। কিন্তু সবাই যে আমরা সবাইকে 'মানুষ' বলি। মনের এই স্বাভাবিক উক্তি কি তবে মিথ্যা? নিশ্চয়ই না। আমরা সত্যলাভের পথে যতই এগিয়ে চলি, 'মনুষ্যত্ব' সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ততই পালটে যায়। তাই বিভিন্ন স্তরের লোকের মাপকাঠিতে 'মানুষ'-এর সংজ্ঞাও পালটে যায়। সেজন্য উন্নত দৃষ্টিভঙ্গীর কাছে মানুষের দেহ থাকলেই মানুষ হয় না, মনটিও 'মানুষ'-এর মত চাই। গভীর শ্রদ্ধা ও অধ্যবসায় নিয়ে খুঁজলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের সকলের

মধ্যেই সর্বোচ্চ দৃষ্টিভঙ্গী যাকে 'মনুষ্যত্ব' বলে স্বীকার করে, তা লুক্কায়িত আছে। জগতের সমস্ত ধর্মশাস্ত্রে যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে তাহলে এদিক থেকে আমরা বলতে বাধ্য যে আমরা সকলেই মানুষ, কারণ পৃথিবীর সমস্ত ধর্মই মানুষের মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি ও তার জয়গান করে গেছে। এই মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার প্রচেষ্টারই অন্য নাম 'ধর্মজীবন'; ভারতের প্রাচীন মুনিঋষিরা এর যথার্থ তাৎপর্য নিরূপণ করে বলেছেন—মানুষের মনুষ্যত্ব-রূপ ধর্ম হচ্ছে পরম ও চরম সত্য যার অন্য নাম আত্মা বা ব্রহ্ম। এই সত্য হচ্ছে এমন এক নিয়ম যার দ্বারা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাখ্যা করা চলে—যার বাইরে দ্বিতীয় কিছু নেই। এখন তাহলে একটা প্রশ্ন হতে পারে যে সমগ্র জগতের পেছনে যদি একটিমাত্র সত্য থাকে তাহলে মানুষ ব্যতিরেকে অন্যসব যেমন মনুষ্যেতর প্রাণী এবং জড়দ্রব্যও কি সেই সত্যের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়? আর তাই যদি হয় তাহলে মানুষকে যেজন্য মানুষ বলছি, ইতর প্রাণী ও জড় দ্রব্যকেও ঠিক সেই কারণেই মানুষ বলতে বাধ্য নই কি? অর্থাৎ জগতের সবকিছুই এক—এরকম সিদ্ধান্তই তো শেষ পর্যন্ত আমাদের গ্রহণ করতে হচ্ছে? উত্তর—হাঁা। ভারতীয় ঋষিরা এরকম সদর্থক জবাব অনেক আগেই দিয়ে গেছেন,—তাঁরা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সত্তার দিক থেকে সবই এক; আমরা যখন সত্যসত্যই এই জ্ঞানের অধিকারী হবো তখন নিশ্চিতই মানুষের সঙ্গে জগতের অন্য কোন অংশের এতটুকু পার্থক্য থাকবে না। ভেদজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটবে তখন। ব্রহ্মবিদের কাছে একজন মানুষ যা, একখণ্ড তৃণও মূলতঃ তাই। তবে আমরা যখন বিভেদের প্রাচীর তুলে জাগতিক বস্তুনিচয়কে ভিন্ন ভিন্ন করে দেখি তখন সেটা হচ্ছে অব্রহ্মবিদ্ বা অজ্ঞানীর কাজ। আমরা অজ্ঞান বা অবিদ্যা বা মায়ার মোহজালে পড়ে অভিভূত হয়ে আছি বলেই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারছি না—আমরা যেন সর্বদাই রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজত-ভ্রম করেই চলেছি। কোন এক মঙ্গল-মুহূর্তে যদি কোন প্রভাতী সুরে আমাদের নিদ্রা টুটে, তাহলে সত্য তখন আপন আলোয় আপনি প্রকাশ পাবে।

খুবই আশা ও আনন্দের কথা যে সত্যান্বেষী মানবমন তার স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চ'লে আজ বিংশশতাব্দীর শুরুতে অদ্বৈতবিদ্যার পথেই পা বাড়িয়েছে। বর্তমান বিজ্ঞানের মতে জগতের মূল উপাদান সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যতটুকু জানা সম্ভব হয়েছে, সে অনুসারে বলা হয় 'শক্তিই জগতের মূল সত্তা; এই শক্তিই ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রমুখ পদার্থকণার রূপ নিয়েছে। জগৎ তার বিচিত্র রূপসম্ভার নিয়ে যে ভাবে ধরা দিয়েছে আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের কাছে, সেটা তার আসল রূপ নয়—চেয়ার, টেবিল, কাগজ, কলম প্রভৃতি জাগতিক বস্তু আসলে কতকগুলি বিদ্যুৎতরঙ্গের উদ্দাম নৃত্য-রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়।' সত্যসাধক বিজ্ঞানীর এই উক্তি কি অদ্বৈত বেদান্তের মায়াবাদের ক্ষীণ প্রতি-ধ্বনি নয়? এমন একদিন নিশ্চয়ই আসবে যেদিন এই বিজ্ঞানীরাও বলবেন যে অচেতন বিদ্যুৎতরঙ্গও মূল সত্য নয়—সত্য হচ্ছে পরমচেতনা; অন্ততঃ আমরা আশা করছি যে সত্যপথযাত্রী বিজ্ঞানীর এই অভিযান সার্থক হবে পরমপিতার পবিত্র আলিঙ্গনে।

আমাদের সঙ্গে প্রাণী বা জড়ের পার্থক্য

গুণের দিক থেকে নয়, মাত্রা বা পরিমাণের দিক থেকে। অর্থাৎ সত্যের প্রকাশ মানুষের মাঝে যে পরিমাণে ঘটেছে মনুষ্যেতর প্রাণী বা জড়ের মধ্যে, সেই পরিমাণের প্রকাশ ঘটেনি। ইতরপ্রাণী এবং জড়ের মধ্যেও আবার এই প্রকাশের মাত্রাগত তারতম্য আছে। মানুষ যেমন সত্যোপলব্ধির ফলে জগতের সর্বত্র একের প্রকাশ দেখতে পায়, ইতরপ্রাণীর বা জড়ের বেলায়ও ঠিক একই অভিজ্ঞতা হবে, অবশ্য যদি তর্কের খাতিরে আমরা ধরে নিই যে, এদের পক্ষেও সত্যোপলব্ধি সম্ভব। যদি তাই হয় তাহলে মানুষ ইতরপ্রাণী ও জড়ের মধ্যে কোনরকম পার্থক্য থাকতে পারে না। ধর্মজীবন যাপন করার অর্থই হচ্ছে, যেমন আগে বলেছি, এই সত্যোপলব্ধির চেষ্টা করা। সাধারণভাবে মানুষের ক্ষেত্রেই সত্যোপলব্ধির প্রশ্ন ওঠে, কারণ ইতরপ্রাণী ও জড়দ্রব্য আত্মসচেতন (সংকীর্ণ অর্থে) নয় বলে, মানুষ এখন পর্যন্ত মনে করে। তাই ধর্মজীবনের কথা আমরা মানুষের প্রসঙ্গেই আলোচনা করে থাকি।

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই স্বামীজী ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রকাশই হলো ধর্ম'—Religion is the manifestation of the divinity already in man, সাধারণত: ধর্ম বলতে আমাদের সংস্কার ভরা মন একমাত্র পূজা-অর্চনা, সন্ধ্যা-আহ্নিক, জপ-ধ্যান, যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতিকেই মনে করে। এগুলো ধর্মের বহিরঙ্গ, এগুলি ধর্মলাভের সহায়ক। পৃথিবীতে সব মানুষ সমান প্রবণতা নিয়ে জন্মায়নি; সব মানুষ তাই সমান স্তরেও বর্তমান নয়। সুতরাং প্রবণতা, রুচি বা দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য ধর্মজীবন যাপনের ক্ষেত্রেও সমতা বা ঐক্য পরিলক্ষিত হয় না। আমাদের বুদ্ধি বলে আমরা যে plane of existence-এ আছি, সেখানে থেকে নিরাকার ধারণা করে সেভাবে ধর্মসাধনা প্রায় অসম্ভব; তাই খুবই যুক্তিসম্মত ভাবে ঐ পরম সত্যকে (আত্মা বা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর) সাকার ভেবে অর্থাৎ নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী দেবদেবীর মূর্তি তার ওপর আরোপ করে নানারকম পূজা-পদ্ধতির মাধ্যমে, আমাদের ধর্মসাধনে ব্রতী হতে হয়। সাধনার ফলে যদি আমরা নিজেদের সেই দুর্লভ higher plane of exitence-এ নিয়ে যেতে পারি তাহলে সে স্তরে পূর্বস্তর—সাকার ধর্ম-সাধনার স্তর লুপ্ত হবে। সুতরাং সত্যের সাকার ও নিরাকার—দুরকম সাধনই সাধনা—উভয়ের সমন্বয় নিরাকারে। শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়েও স্বামীজী বলেছেন, মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার প্রকাশই হলো শিক্ষা—Education is the manifestation of the perfection already in man. একটু ভেবে দেখলে স্পষ্ট বুঝা যাবে যে এই পূর্ণতা এবং পূর্বোল্লিখিত 'দেবত্বের' মধ্যে, আসলে কোন পার্থক্য নেই; যতটুকু পার্থক্য আছে সেটা শুধু শব্দের বাহ্যিক প্রকাশের মধ্যে—শব্দস্থিত শক্তি উভয়ক্ষেত্রেই এক। স্বামীজীর মতে তাই আসল ধর্ম ও আসল শিক্ষা একান্ত অভিন্ন। যিনি যথার্থ ধার্মিক তিনিই যথার্থ শিক্ষিত, আর যিনি যথার্থ শিক্ষিত তিনিই যথার্থ ধার্মিক; সঙ্গে সঙ্গে যথার্থ ধার্মিক ও যথার্থ শিক্ষিত আবার যথার্থ দার্শনিকও—কারণ ভারতীয় দর্শনের কাজ বুদ্ধি দ্বারা সামগ্রিকভাবে জগৎ ও জীবনের একটা চরম ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করাই নয়, সত্যের উপলব্ধি করা। ভারতীয় চিন্তাধারায় ধর্ম, শিক্ষা ও দর্শন সম-অর্থব্যঞ্জক।

এখন দেখা যাক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জীবনে এই ধর্মের প্রতিফলন কিরূপ হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা করলে জানা যায় যে তাঁর জন্মের পেছনে এক অলৌকিক নিয়ম কাজ করেছে,—ইতিহাস পর্যবেক্ষণে বস্তুতঃ ইহা পরিলক্ষিত হয় যে ভগবান যখন যুগপ্রয়োজনে অবতাররূপে আবির্ভূত হন তখন সেই আবির্ভাব দিব্য ঘটনায় বেষ্টিত থাকে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মানুরাগ শৈশব থেকেই দীপ্ত। বালক গদাধরের দেবদেবীর স্তোত্র, পুরাণকাহিনী, রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ, কীর্তন ভজন প্রভৃতির প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ, ভাবতন্ময়তা, মুহুর্মুহুঃ সমাধি, শিবধ্যান, ভাবাবেশে নৃত্য, সাধুসঙ্গ—এসব ঘটনা তাঁর ধর্মজীবনেরই ইঙ্গিত দেয়। দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দিরে পূজারী নিযুক্ত হওয়ার সময় থেকেই তাঁর সত্যকারের সাধনা শুরু হয়। দক্ষিণেশ্বর হলো শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপীঠ। বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষা যে আসল শিক্ষা নয়, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একথা যেদিন প্রকাশ করলেন অগ্রজ রামকুমারের কাছে, সেই দিনই যেন তিনি ইঙ্গিত করলেন তাঁর উত্তরজীবনের প্রতি। তিনি বলেছিলেন—"চালকলা-বাঁধা বিদ্যা আমি শিখিতে চাই না, আমি এমন বিদ্যা শিখিতে চাই যাহাতে জ্ঞানের উদয় হইয়া মানুষ বাস্তবিক কৃতার্থ হয়।" এই অকপট উক্তি কি ধর্মশব্দের মূল তাৎপর্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে না? তারপর দক্ষিণেশ্বরে চললো ঠাকুরের কঠিন তপস্যা। হিন্দুধর্মের যত রকম শাখা-প্রশাখা আছে যেমন শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি, অহিন্দু ধর্ম যেমন খৃষ্টান, ইসলাম প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মপথে এবং সাকার ও নিরাকার এই উভয় মার্গে বিচরণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ উপলব্ধি করলেন যে সত্য এক ও অভিন্ন। হিন্দুদের ভগবান, মুসলমানদের আল্লা এবং খৃষ্টানদের গড—সবই এক, শুধু নামের পার্থক্য। 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' সত্য হচ্ছে সচ্চিদানন্দস্বরূপ; ভগবানের বিভিন্ন নাম ও জগতের বৈচিত্র্য সবই হচ্ছে নামরূপের খেলা—সচ্চিদানন্দসাগরে ফেন-বুদ্‌বুদ-তরঙ্গের লীলা। ফেন, বুদ্‌বুদ ও তরঙ্গ যেমন বাহ্যিক প্রকাশের দিক থেকে ভিন্ন হলেও আসলে সমুদ্রই, ঠিক তেমনি জগতের সব কিছুই এই সত্যের আশ্রয়ী। মানুষ তার বিভিন্ন রুচি অনুযায়ী সত্যান্বেষণের জন্য বিভিন্ন যাত্রাপথ বেছে নেয়—মূল গন্তব্যস্থল কিন্তু একই। একথা বলতে গিয়ে ঠাকুর একটা সুন্দর উপমা ব্যবহার করেছেন—"ছাতের ওপর উঠতে হ'লে মই, বাঁশ, সিঁড়ি ইত্যাদি নানা উপায়ে যেমন ওঠা যায়, তেমনি এক ঈশ্বরের কাছে যাবার অনেক উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্মই এক একটি উপায়।" যে ঠাকুর 'মা' 'মা' বলে পাগল, তিনিই আবার অদ্বৈতসাধনাকালে ধ্যানে আবির্ভূতা কালী মায়ের মূর্তিকে জ্ঞান-তরবারি দিয়ে বিনা দ্বিধায় কেটেও ফেলেছেন। এমনি ভাবে বিভিন্ন ধর্মসাধনার ফল ঠাকুর একটি ছোট্ট অথচ তাৎপর্যপূর্ণ কথায় প্রকাশ করেন—'যত মত তত পথ।' লক্ষ্য এক—মতের পার্থক্যের জন্য পথেরও বিভিন্নতা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবহুল জীবনে ধর্মের যথার্থ রূপ খুব স্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

তথাকথিত যুক্তিবাদী মন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-অনুধ্যানের ফলে ধর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে ঠিক একটা স্থির বিশ্বাসে যেন উপনীত হতে পারে না; কারণ ঐ মনের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-পথ রহস্যে ঢাকা। যুক্তিমুখী মন রহস্যবাদ বা অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষবাদে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না,

সে চায় একটা বুদ্ধিভিত্তিক ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা দিলেন যুক্তিবাদী স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজী প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বিভিন্ন বক্তৃতামালার মাধ্যমে ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ও শিক্ষার যেমন প্রচার করেছেন তা ঠাকুরের এবং প্রাচীন মুনি-ঋষির উপলব্ধ সত্যই; শুধু কতগুলো assertion বা ঘোষণার মধ্য দিয়ে নয়, exposition বা ব্যাখ্যার মাধ্যমে তিনি ইহা করেছেন। এই যুগপ্রয়োজন-সাধনকালে স্বামীজী পূর্বসূরী ঋষিদের মত আবার পরিষ্কার ভাবে দেখিয়ে গেছেন যে সত্য তথাকথিত বুদ্ধি বা reason-এর নাগালের বাইরে। 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ'। তর্ক দ্বারা সত্য সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না; দর্শন বা প্রত্যক্ষানুভূতিই সত্যোপলব্ধির একমাত্র উপায়। ব্রহ্ম সম্বন্ধে নিজ অদ্বৈতসাধনার গুরু তোতাপুরীর কথা ঠাকুর বলছেন—"যেমন অনন্ত সাগর—ঊর্ধ্বে নীচে, ডাইনে বামে, জলে জল। কারণ সলিল। জল স্থির। কার্য হলে তরঙ্গ। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়—কার্য।" বিচার যেখানে গিয়ে থেমে যায় সেই ব্রহ্ম। যেমন: কর্পূর জ্বালালে পুড়ে যায়, একটু ছাইও থাকে না। ব্রহ্ম বাক্য-মনের অতীত। স্বামী বিবেকানন্দও সেই কথাই বলেছেন। নির্বিকল্প সমাধি বা ব্রহ্মানুভূতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্—বোঝে প্রাণ বোঝে যার।' বুদ্ধি দ্বারা তো আমরা বুঝি যে সত্য এক এবং অদ্বিতীয়; কিন্তু আমাদের কাছে এ বোধ তো অপ্রতিষ্ঠিত, যতক্ষণ এ বোধের কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমাদের জীবনে মেলে না। সত্যকারের উপলব্ধি যখন হবে তখনই এই অদ্বৈতজ্ঞান পাকাপাকি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো বলা চলে; এই অদ্বৈতজ্ঞানের আলোকে তখন জীবন নতুন খাতে বইতে শুরু করবে। তখন 'ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়'—এই জ্ঞানে জ্ঞানী নিজের সঙ্গে ধূলিকণারও কোন ভেদ খুঁজে পাবে না। [ক্রমশঃ]

"তাঁকে চিন্তা করে, অখণ্ডে মন লয় হলেও আনন্দ;
—আবার মন লয় না হলেও লীলাতে মন রেখেও
আনন্দ।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

সমালোচনা

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনা: শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১ শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা ১৪২; মূল্য চার টাকা।

স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বতোমুখী চিন্তাধারায় ইতিহাস-চেতনা একটি প্রধান সুর। আবাল্য তিনি ইতিহাসের অনুরাগী ছাত্র। দেশে এবং দেশান্তরে ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর ইতিহাসকে নানাভাবে তিনি উপলব্ধি করেছেন। শুধু গ্রন্থপাঠের মধ্য দিয়ে নয়, স্বামীজী তাঁর সুদীর্ঘ পরিব্রাজক-জীবনে সমগ্র ভারতবর্ষে দীনতম কৃষকের কুটির থেকে অভিজাত-শ্রেষ্ঠ রাজন্যমণ্ডলীর প্রাসাদ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা ভারতেতিহাসের মর্মবাণী গ্রহণের যে প্রত্যক্ষ প্রয়াস করেছিলেন, তার তুলনা আধুনিক অধ্যাপক বা গবেষকদের মধ্যে একান্ত দুর্লভ। তাঁর বিশ্বপরিক্রমা মানবেতিহাসের সামগ্রিক পটভূমিতে ভারতেতিহাসের যথাযথ মূল্যায়নের যে সুযোগ এনে দিয়েছিল, তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ "বর্তমান ভারত" গ্রন্থটি ইতিহাস-দর্শনের গ্রন্থ। স্বামীজীর গুরুভাই এবং বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেবক স্বামী সারদানন্দজী 'বর্তমান ভারতে'র ভূমিকায় লিখেছিলেন—"ভারতসমাগত যাবতীয় জাতির মানসিক ভাবরাশি-সমুদ্ভুত দ্বন্দ্ব দশসহস্রবর্ষ-ব্যাপী কাল ধরিয়া উহাদিগকে পরিচালিত এবং ধীরে ধীরে শ্রেণীবদ্ধ, উন্নত, অবনত ও পরিবর্তিত করিয়া দেশে সুখদুঃখের পরিমাণ কিরূপে হ্রাস, কখন বা বৃদ্ধি করিয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ, বিভিন্ন আচার-ব্যবহার, কার্যপ্রণালীর মধ্যেও এই আপাত-অসম্বদ্ধ ভারতীয় জাতিসমূহ কোন সূত্রেই বা আবদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া সমভাবে পরিচয় দিতেছে এবং কোন দিকেই বা ইহাদের ভবিষ্যৎ গতি, সেই গুরুতর দার্শনিক বিষয়ই 'বর্তমান ভারতে'র আলোচ্য বিষয়।"

ইতিহাসের অনন্ত কালপ্রবাহের তীরে দাঁড়িয়ে স্বামীজী একদিন উপলব্ধি করেছিলেন—"সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক রূপান্তর—ইহাই ভারতীয় জীবন-সাধনার মূলমন্ত্র, ভারতের চিরন্তন সঙ্গীতের মূল সুর, ভারতীয় সত্তার মেরুদণ্ডস্বরূপ, ভারতীয়তার ভিত্তি, ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান প্রেরণা ও বাণী। তাতার, তুর্কী, মোগল, ইংরেজ কাহারও শাসনকালেই ভারতের জীবনসাধনা এই আদর্শ হইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই।" (স্বামীজীর পরিকল্পিত ও আংশিক-লিখিত 'India's message to the world' নামক অসমাপ্ত গ্রন্থ থেকে)।

ভারতবর্ষের সুদূর অতীত থেকে সমসাময়িক বর্তমানের উত্থান ও পতনের ইতিহাস পর্যালোচনা করেই স্বামীজী বলেছিলেন: "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।" যথার্থ ঐতিহাসিক যেমন আপাতবিচ্ছিন্ন ঘটনারাশির অন্তরালে একটি মূলসূত্র আবিষ্কার করেন, স্বামীজীও তেমনি ভারতবর্ষের ইতিহাসকে জাতির নিজস্ব প্রতিভা অধ্যাত্ম-উপলব্ধির চিরন্তন ভিত্তিতে অধিষ্ঠিত দেখতে পেয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় ভারতের বরেণ্য মনীষী ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সেকথা মনে করিয়ে দিয়েছেন—"হিন্দুদের জাদুকাঠি হল ধর্ম, তাই

পুনঃ পুনঃ বহিরাগত শত্রুর আঘাতে বিপর্যস্ত হলেও হিন্দুজাতি—বিনম্র হিন্দুজাতি—প্রাচীন সভ্যতাগুলির মত পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে লুপ্ত হয়ে যায় নি। আর এই কারণেই ভারতের ইতিহাস—গঠন- ও পঠন-প্রণালীর দিক থেকে—অন্যান্য দেশের ইতিহাস থেকে স্বতন্ত্র। এই জন্যই ভারতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রাজধানী হস্তিনাপুর, পাটলিপুত্র, কান্যকুব্জ প্রভৃতি ভারতের ইতিহাসে যত প্রাধান্য লাভ করেছে তার চেয়েও বড় স্থান দিতে হবে কাশী, মিথিলা, কাঞ্চী, নালন্দা, তক্ষশীলা প্রভৃতি সভ্যতার কেন্দ্রে।"

স্বামীজীর ইতিহাস-চেতনায় ভারতীয় সভ্যতার এই মূল সুরটির অনুসন্ধানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখেই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-বিভাগের অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন "বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনা" গ্রন্থটি পরিকল্পনা করেছেন। সম্ভবতঃ বাংলাসাহিত্যে এইটিই তাঁর প্রথম গ্রন্থপ্রয়াস। সেদিক থেকে সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ গ্রন্থের স্বচ্ছ ও সহজ ভাবভঙ্গী। রবীন্দ্রগদ্যরীতির লাবণ্য এবং বিবেকানন্দের ঋজু বলিষ্ঠ মননভঙ্গীর একত্র সমাহারে আদ্যন্ত সুখপাঠ্য এই ইতিহাস-চেতনার গ্রন্থটি নিঃসংশয়ে বাংলাসাহিত্যে পরম মূল্যবান সংযোজন।

তিনটি পর্বে অধ্যাপক সেন গ্রন্থটিকে ভাগ করেছেন—প্রথম পর্ব: ভারত-ইতিহাসের মূলতত্ত্ব; দ্বিতীয় পর্ব [এ পর্বে চারটি অধ্যায়] ভারতের ইতিহাস ও ধর্ম; দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারত—মধ্যযুগ; অষ্টাদশ শতাব্দী; মারাঠা; শিখ। তৃতীয় পর্ব: উনবিংশ শতাব্দী—ভারতের জাগরণ। এই সঙ্গে পরিশিষ্টে দুটি মননদীপ্ত প্রবন্ধ সংযোজিত—"মহালগ্ন" এবং "বিবেকানন্দ ও ভারতের মুক্তি"।

বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে ইতিহাস-সচেতন সাহিত্যিকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রই অগ্রগণ্য, যদিচ বঙ্কিমের ইতিহাস-চেতনা অনেক পরিমাণে বঙ্গ-কেন্দ্রিক। সে তুলনায় রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষকে আরো প্রশস্ততর দৃষ্টিতে দেখেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস সম্বন্ধে মূল্যবান প্রবন্ধাবলী প্রকাশের আগেই স্বামীজী উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যুগ-সন্ধিক্ষণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার রাখী-বন্ধনের প্রচেষ্টায় ভারতীয় সভ্যতার নিজস্ব মহিমা সম্বন্ধে আমাদের যেমন সচেতন করেছেন, তেমনি পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে নবযুগের বৈজ্ঞানিক মনোভাবও আমাদের হৃদয়ে সঞ্চার করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ভারতচিন্তা যে অনেক পরিমাণে বিবেকানন্দের ভারতচেতনার দ্বারা প্রভাবিত, একথা বলাই বাহুল্য।

অধ্যাপক সেন বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনা-আলোচনাপ্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথের ভারত-ইতিহাস-বিশ্লেষণকেও অনেক পরিমাণে তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বিশেষভাবে দ্বিতীয় পর্বের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচিন্তার উপাদান সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত। ভারত-ইতিহাসের মর্মানুসন্ধানে এই দুই মনীষীর চিন্তাধারার তুলনামূলক আলোচনা অবশ্য এ গ্রন্থে অপেক্ষিত নয়, তবে ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের আলোচনার যোগ্য বিষয়।

'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র আধুনিক যুগের ভারতবর্ষ। আপাতদৃষ্টিতে এর অর্থ দাঁড়ায় ধর্ম-উদাসীন রাষ্ট্র। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে এ উদাসীনতা একান্ত অসম্ভব। পুরানো যুগের চার্বাকপন্থা, বিগতপ্রায় সাম্যবাদ অথবা আধুনিক গণতান্ত্রিক মানবতাবাদ এরা সকলেই ধর্মের

বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেও বেদান্তের ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা স্বামীজী সনাতন-ধর্মের চিরন্তন প্রগতিশীলতা প্রতিপন্ন করে ভারতবর্ষকে একইসঙ্গে প্রাচীনতম ও আধুনিকতম জাতির মাতৃভূমিরূপে প্রতিপন্ন করেছেন। তাই স্বাধীনতার পরে আপাত-দৃষ্টিতে পাশ্চাত্য প্রভাব এদেশে হঠাৎ বাড়াবাড়ি শুরু করলেও ভারতাত্মার নিজস্ব সমাধান—ত্যাগ ও সেবার মন্ত্রই আমাদের মূল আদর্শ। ধর্ম অর্থে জীবনজিজ্ঞাসা। সে জিজ্ঞাসার উত্তরও এই ধর্মেই নিহিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্মসমন্বয়ের সাধনা আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতার সবচেয়ে বড়ো উত্তর। বস্তুতঃ ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নয়, ধর্মসমন্বয়ের রাষ্ট্র।

সেইজন্যই স্বামীজী বৈদান্তিক মেধা ও ইসলামের সৌভ্রাত্র্যের সমন্বয়ে এক নূতন ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন। রাজনৈতিক হঠকারিতার ফলে সে ভারতবর্ষের অখণ্ডরূপ আজ আমাদের দৃষ্টিগোচর নয়, কিন্তু নিঃসংশয়ে বলা চলে 'নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়'—শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনাই ভারত-ইতিহাসের সে মহা-মিলনের পথ-নির্দেশক।

বিবেকানন্দ-পদাঙ্ক অনুসরণে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সেন বৈদিক যুগ, বৌদ্ধ যুগ, মুসলমান যুগ ও ইংরেজ যুগ পরিক্রমা করে স্বামীজীর ধ্যাননেত্রে উদ্ভাসিত ভারতাত্মাকে উপলব্ধির সার্থক প্রয়াস করেছেন। ভারতের ইতিহাস বৈদিক বা হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ভারতবাসীমাত্রেই এক অর্থে 'হিন্দু'। হিন্দুত্ব কেবল ধর্মনির্ভর নয়, সংস্কৃতির সামগ্রিক পরিচয়। তাই হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ কেবল হিন্দু ভারতের কথাই ভাবেন নি, ইতিহাসের অমোঘস্রোতে সর্বজাতি ও ধর্মের মিলনতীর্থ এই ভারতবর্ষই তাঁর আরাধ্যা জননী। ইতিহাসের এই সমগ্রতাকে বিস্মৃত হয়ে কেউ ভারতবর্ষকে ভালোবাসতে পারে না। তাই উনিশ শতকে ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারপ্রচেষ্টা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত-সমাজে আবদ্ধ রয়ে গেছে, ভারতের গণসত্তা এই বহিরঙ্গ সংস্কারকে অস্বীকার করেই এগিয়ে চলেছে। সংস্কারের যে প্রয়োজন নেই তা নয়, আসলে প্রয়োজন সর্বব্যাপী শিক্ষার দ্বারা অন্তরের আমূল পরিবর্তন। জাতীয় সত্তার মধ্যবিন্দু থেকে নবীন প্রেরণার আবির্ভাবের সেই মহা-প্রয়োজনেই উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ঘটল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মিলিত অভ্যুদয়ে। "উনবিংশ শতাব্দী ভারতের নব-জাগরণ" এবং "মহালগ্ন" প্রবন্ধদুটিতে বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক মূল্য ও সমসাময়িক যুগসমস্যা সম্বন্ধে বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গীর নিপুণ বিশ্লেষণের দ্বারা লেখক আধুনিক কালের প্রান্ত অবধি পাঠকের চিন্তাধারাকে অগ্রসর করে এনেছেন।

প্রথম পর্বে ও দ্বিতীয় পর্বের প্রথম প্রবন্ধে তিনি স্বামীজীর দৃষ্টিতে ভারত-ইতিহাসের মূলসূত্র-সন্ধানী। দ্বিতীয় পর্বে নিপুণ তথ্যসমাবেশে ভারত-ইতিহাসের মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতের হিন্দুসংস্কৃতির কেন্দ্রপরিবর্তন, হিন্দুমুসলমান সংস্কৃতিসমন্বয়প্রয়াস, মুসলমান শাসনের অবসানে মারাঠা-ও শিখ-অভ্যুদয়ের বিফলতা—এ সব কিছুর অন্তরালে ইতিহাসের ঋজুকুটিল গতিপথে ভারতের অধ্যাত্মচেতনার বিচিত্র বিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। তৃতীয় পর্বের উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সঙ্গে আমরা বিংশ শতাব্দীর মানুষেরা প্রত্যক্ষ জড়িত। আলোচনার ক্ষেত্র আর একটু বিস্তৃত হয়ে স্বদেশী-আন্দোলনে স্বামীজীর প্রভাব সম্বন্ধে বিশদ ভাবনার অবকাশ এ গ্রন্থে হয়তো ছিল। সামগ্রিকভাবে এ গ্রন্থ বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনা প্রসঙ্গে আলোচনার সার্থক সূচনা।

প্রকাশকের যে পরিচ্ছন্ন রুচি ও মহৎ আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা এই গ্রন্থমুদ্রণে অভিব্যক্ত, তা আন্তরিক সাধুবাদের যোগ্য। প্রসঙ্গতঃ প্রশ্ন করা চলে, এ গ্রন্থের একটি ইংরেজী সংস্করণ কি আশু প্রকাশিতব্য নয়?

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

সারদা মায়ের কথা—স্বামী সোমানন্দ। প্রকাশক—গ্রন্থকার, মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রিশড়া (হুগলী)। পৃষ্ঠা ১০০, মূল্য ১·৭৫।

শ্রীশ্রীমায়ের লোকোত্তর জীবনের ঘটনাবলী বিভিন্ন শিরোনামে আলোচ্য পুস্তকে প্রকাশিত। গল্প বলার ভঙ্গীতে লিখিত ভাষায় অনেক স্থলে কল্পনাকে আশ্রয় করা হইয়াছে, তবে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের পবিত্র ভাবধারা বজায় রাখিবার প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয়। বইটি ছোটদের খুব ভাল লাগিবে।

আলোকের উৎস সন্ধানে—সঞ্জয়। প্রকাশক: শ্রীসঞ্জয়কুমার দাস। মুদ্রাকর: শ্রীসত্যরঞ্জন রায়গুপ্ত, শ্রীপ্রিন্টিং ওয়ার্কস্, জলপাইগুড়ি। পৃষ্ঠা ৩২; মূল্য এক টাকা।

২৫টি কবিতা লইয়া এই কাব্যগ্রন্থ। কবিতাগুলি ভাবসমৃদ্ধ। প্রকাশভঙ্গী স্বচ্ছ। একটি নিদর্শন:—

কত পথ, কত গৃহ সংসার, প্রান্তর নির্জন, আর
মুখরিত নগর নগরী
ঘুরিয়া ফিরিয়া পরিশ্রান্ত;
অবশেষে খেয়াতীরে সায়াহ্নবেলায়
মনে হয়, পান্থ শুধু বৃত্তপথে যাওয়া ও আসায়
যাপিয়াছে সারা দিনমান;
প্রজ্ঞামার্গে জ্ঞানতীর্থ সকল ঘুরি,
শ্রান্ত রিক্ত জ্ঞানবৃদ্ধ স্খলিত চরণে
ফিরে আসে শিশু-নির্জ্ঞানে॥

কাব্য-রসিকদের নিকট গ্রন্থটি আদরণীয় হইবে বলিয়া মনে হয়।

(১) **রামধনু**, (২) **পূজার ফুল**, (৩) **সোনার কুঞ্জ**, (৪) **মর্মবীণা**, (৫) **পারের খেয়া**, (৬) **মাতৃশঙ্খ ও কৃষ্ণ-মুরলী**—শ্রীশিশিরকুমার দত্ত প্রণীত, প্রাপ্তিস্থান: রায় ব্রাদার্স বুক সেলার্স এণ্ড পাবলিসার্স, ১৭২এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা: ৮২, ২৮, ২৪, ২০, ৭৬, ৫২। মূল্য: ২, ·৭৫, ·৫, ·৭৫, ১·৭৫, ১৲।

কবিতা ও সঙ্গীত প্রাণের জিনিস; অন্তরের ভাব স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিঃসৃত হইয়া লেখনীমুখে ছন্দোবদ্ধরূপে ইহার প্রকাশ। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থগুলিতে কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে কবিতাগুলি রচিত। ভক্তিমূলক গানগুলিতে ভাবের আন্তরিকতা আছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা: মুক্ত ভারত, আমার ভারত, বীরদীক্ষা, ন্যায়বজ্র।

স্মারক গ্রন্থ—সর্বাঙ্গী বিকাশ সঙ্ঘ, 'একান্তাশ্রম', কল্লু, হিমালয়; শাখাকেন্দ্র: দত্তাশ্রম, ১৫ কমলেশ, কাঁকরিয়া, আমেদাবাদ ১৭। পৃষ্ঠা ৩৩০।

সর্বাঙ্গী বিকাশ সঙ্ঘের ধর্মভাব বিস্তারপ্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এই সঙ্ঘের উদ্যোগে যে ধর্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, আলোচ্য স্মারক গ্রন্থখানিতে তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সম্মেলনে ইংরেজী, হিন্দী ও গুজরাতী ভাষায় ভাষণ প্রদত্ত হইয়াছিল। হিন্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবনকথা গ্রন্থটিকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছে। বঙ্গদেশের বাহিরে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ ভাবধারা ও যুগাদর্শ জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে এই গ্রন্থ সহায়তা করিবে সন্দেহ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দশম অধ্যক্ষ (প্রেসিডেণ্ট) নির্বাচিত হইয়াছেন।

স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ ও স্বামী ওঙ্কারানন্দজী মহারাজ সহাধ্যক্ষ (ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট) এবং স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ মঠ ও মিশনের জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচিত হইয়াছেন।

১৬ই ফেব্রুআরি, বুধবার সকালে বেলুড় মঠে ট্রাষ্টিগণের এক সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

কার্যবিবরণী

মাদ্রাজ (ময়লাপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৪—মার্চ, ১৯৬৫) প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে এলোপ্যাথিক বিভাগে ১,৪৪,২৩৫ ও হোমিওপ্যাথিক বিভাগে ২,১৩১ মোট ১,৪৬,৩৬৬ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। চক্ষুবিভাগে ১৪,৪৯৮, কর্ণ-নাসিকা ও গল-রোগের চিকিৎসা-বিভাগে ৯,৮৪০, দন্ত-বিভাগে ৭,১৩৩ জনের চিকিৎসা করা হয় এবং এক্স-রে বিভাগে ৫৭১ জন রোগীর এক্স-রে করা হয়। ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা ৮৯৮। ১৯,৫৮২ জন রোগীকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় এবং সাধারণ ভাবে অস্ত্রচিকিৎসা করা হয় ৯৮৫টি।

আলোচ্য বর্ষে শহরের বিভিন্ন স্থানে ২,৬২৫টি রুগ্ণ শিশুকে ঔষধমিশ্রিত দুগ্ধ দ্বারা চিকিৎসা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পুষ্টির অভাবগ্রস্ত ২,৬২৫টি শিশুকে নিয়মিত দুগ্ধ দেওয়া হয়।

পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের কার্য-বিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৪—মার্চ, ১৯৬৫) পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আলোচ্য বর্ষের কার্যধারা নিম্নরূপ: নানাস্থানে ও আশ্রমে মোট ২৪০টি ক্লাস অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্লাসে বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা অবলম্বনে আলোচনা করা হয়। উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২১৮টি ছাত্র শিক্ষা লাভ করে।

আশ্রমের ছাত্রাবাসে ২৪ জন বিদ্যার্থী ছিল, তন্মধ্যে ১২ জন বিনা খরচে ও ৩ জন আংশিক খরচে থাকিবার সুযোগ লাভ করে। গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ৭,৩৩৮; আলোচ্য বর্ষে ১৮৩ খানি পুস্তক সংযোজিত হয়। পাঠাগারে ৮টি দৈনিক ও ৫৪টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগার হইতে পঠনার্থে প্রদত্ত পুস্তক-সংখ্যা ৮,৫৩৯ এবং পাঠাগারে পাঠক-সংখ্যা ১৪,৭১৩। হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে যথাক্রমে ৫৫,১৫৩ (নূতন ৫,৯৪৬) জন ও ৪০,০০০ (নূতন ৫,৮২৪) জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে।

বিশাখাপত্তনম্ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত কার্যধারা:

আশ্রমে নিয়মিত পূজা পাঠ ও আধ্যাত্মিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং সাময়িক উৎসবগুলি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। গ্রন্থাগারে ২,৩৪৩ খানি সুনির্বাচিত পুস্তক আছে; পাঠাগারে ২০টি মাসিক ও ৬টি দৈনিক পত্রিকা লওয়া হয়। শিশুদের জন্য একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার করা হইয়াছে, তাহাতে ছবির বই-ই বেশী রাখা হইয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৫৯টি শিশু শিক্ষা লাভ করে এবং ১৫ জন শিক্ষক শিক্ষাদান-কার্যে নিযুক্ত আছেন। স্বামীজীর জন্মশত-বার্ষিকী উপলক্ষে 'বিবেকানন্দ হল' নির্মিত হইয়াছে।

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৪ – মার্চ, ১৯৬৫) প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে অন্তর্বিভাগে চক্ষুরোগীসহ ২,১০৭ জন রোগী ভর্তি হয় এবং ১,৬৪৭ জন আরোগ্য লাভ করে। চক্ষু-অস্ত্রোপচারসহ মোট ৮২৪টি অস্ত্রোপচার করা হয়। হাসপাতালের ১০৩টি শয্যার মধ্যে গড়ে প্রত্যহ ৫৯টি শয্যা রোগীদের দ্বারা অধিকৃত ছিল

আলোচ্য বর্ষে বহির্বিভাগে ২,১৭,৩০২ জন রোগী (পুরাতন ১,৭৩,১৭৬) চিকিৎসিত হয় এবং চক্ষুরোগীসহ মোট ৯৯৮ জনের অস্ত্রোপচার করা হয়। গড়ে দৈনিক চিকিৎসিতের সংখ্যা ৫৯৫

আলোচ্য বর্ষে হোমিওপ্যাথিক বিভাগে চিকিৎসিত নূতন ও পুরাতন রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ৮.০৯০ ও ১৫,৭১৭। এক্স রে বিভাগে ৬২০টি এক্স রে করা হয় এবং ল্যাবরেটরিতে ৫,৮৮৪টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। ফিজিওথেরাপি বিভাগে ২১৮ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

হরিজনদের জন্য দুইটি কূপ খনন করানো হইয়াছে এবং ১০৫ জন দরিদ্র ছাত্রকে ৩৪২ খানি পাঠ্যপুস্তক কিনিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কনখল সেবাশ্রম হরিদ্বারের নিকটে সুন্দর স্বাস্থ্যকর পরিবেশে অবস্থিত। ইহা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীন সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত এই আশ্রমের ৬৪তম বর্ষের (এপ্রিল, '৬৪—মার্চ, '৬৫) কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ৪৭টি শয্যাযুক্ত অন্তর্বিভাগীয় হাসপাতালে ১,৩৭০ জন রোগী ভর্তি হয় এবং ১,২২৭ জন আরোগ্যলাভ করে।

বহির্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৯১,২১৮ (নূতন ২৩,৫৯২); অস্ত্রচিকিৎসা ১,৪৪৯, দন্তচিকিৎসা ১৬২, চক্ষুকর্ণাদি চিকিৎসা ২,০১৬, ইলেক্ট্রোথেরাপি চিকিৎসা ৪৬০। ল্যাবরেটরিতে ৫,২৭৫টি নমুনা পরীক্ষিত হয়।

গ্রন্থাগারে ৫,২৮৩টি পুস্তক আছে; পাঠাগারে ৩৮টি সাময়িক ও ৬টি দৈনিক পত্রিকা লওয়া হয়।

উৎসব-সংবাদ

পুরী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৩ই জানুআরি বৃহস্পতিবার কঠোপনিষদ্‌পাঠ ও স্বামীজীর জীবনী আলোচনা, পূজানুষ্ঠান ও ভক্তসেবা প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের ১০৪তম জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়।

১৫ই তারিখ শনিবার বিকাল ৫টায় ত জনসভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন ওড়িষ্যার শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় মহান্তি। আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ঋদ্ধানন্দ ওড়িয়া ভাষায় বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন। ওড়িয়াতে বক্তৃতা করেন ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সুপর্ণানন্দ। ইংরেজীতে ভাষণ দেন অধ্যাপক শ্রীসত্যবাদী মিশ্র। সভাপতির মনোজ্ঞ ভাষণের পর ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। শ্রীকিশোরীমোহন দ্বিবেদী উপস্থিত

সকলকে সুললিত সংস্কৃতভাষায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শিলচর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গত ১৩ই জানুআরি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় আশ্রমের ছাত্র ও শিক্ষকগণ কর্তৃক এক বিশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। বিদ্যার্থি-ভবনের শিক্ষক প্রোফেসার শ্রীরামেশ্বর ব্রহ্মচারীর পরিচালনায় ছাত্রগণ সঙ্গীত, প্রবন্ধপাঠ, কবিতা-আবৃত্তি, লীলাগীতি ও বক্তৃতার মাধ্যমে স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে। পরে অনুষ্ঠানের সভাপতি স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ তাঁহার ভাষণে বলেন, নিজেরা 'মানুষ' হওয়ার চেষ্টা করিলেই সব চাইতে ভাল জনসেবা হইবে।

১৬ই জানুআরি স্বামীজীর জন্মতিথি স্মরণে স্কুল-সমূহের ইন্‌স্পেক্টর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান হয়। অধ্যাপক শ্রীদেবব্রত দত্ত, প্রিন্সিপাল শ্রীপ্রেমেন্দ্র-মোহন গোস্বামী, অধ্যাপক শ্রীকালীপ্রসাদ সিংহ এবং ডাক্তার শ্রীবীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং সভাপতি শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দাস স্বামীজীর আধ্যাত্মিকতা, বেদান্তপ্রচার, স্বদেশপ্রেম ও 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' বিষয়ে অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন।

আমেরিকায় বেদান্ত

উত্তর ক্যালিফর্নিয়া

স্যানফ্র্যান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটি: অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ; সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। নূতন মন্দিরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়, পুরাতন মন্দিরে নারদীয় ভক্তিসূত্র অবলম্বনে ক্লাস অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

অক্টোবর, '৬৫ : মাতৃভাবে ঈশ্বরোপাসনা; নূতন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-উৎসব; 'তোমরা ঈশ্বরের জীবন্ত মন্দির'; মনঃসংযম ও ধ্যান; অনন্তের যাত্রী; ইন্দ্রিয় ও মনের উন্নয়ন; অন্তরের ভগবৎশক্তি; আধ্যাত্মিক বিকাশ-সাধন; যুক্তি ও ধর্মানুভূতি; ঈশ্বরাস্তিত্ব উপলব্ধির সাধনা।

নভেম্বর, '৬৫ : ধ্যানপরায়ণ জীবনের স্তর; 'প্রভু আমার, সর্বস্ব আমার'; আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের আনন্দ; পোপের প্রচার—'অ-খৃষ্টান ধর্মসমূহের সহিত গীর্জার সম্বন্ধ'; ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়? ছায়া ও কায়া; গুরু ও শিষ্য।

স্যাক্রামেন্টো কেন্দ্র: অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ, সহকারী স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।

অক্টোবর, '৬৫ : শাশ্বত ও অশাশ্বত; ধ্যানের স্তর; আধ্যাত্মিক দর্শন; নিজ আত্মার প্রতি সত্যনিষ্ঠ হও; যোগের দ্বারা জীবনের উদ্ভাসন

নভেম্বর, '৬৫ : বেদান্তের আহ্বান; একাকী কিন্তু নিঃসঙ্গ নয় আধ্যাত্মিক জীবনে ভাবালুতা; যে আলোক অন্তর উদ্ভাসিত করে; মানুষ—অনন্ত পথের যাত্রী; বর্তমান ভারতের মহীয়সী সাধিকা; জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনা; ঈশ্বরপুত্র যীশুখৃষ্ট।

এতদ্ব্যতীত কঠোপনিষদের ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

জম্মু ও কাশ্মীর সীমান্তে সেবাকার্য

জম্মু ও কাশ্মীর সীমান্তে রামকৃষ্ণ মিশন যে সেবাকার্য চালাইতেছে তাহাতে এ পর্যন্ত ৯০১ খানি কম্বল, ১,০৫০টি বালতি, ১,৭৪০টি বয়স্কদের পোশাক (সার্ট, প্যাণ্ট, সোয়েটার, ফতুয়া, গেঞ্জি, জামি ইত্যাদি) এবং ২,৪৭০টি ছোটদের পোশাক বিতরণ করা হইয়াছে। এই রিলিফ-কার্যে মোট ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ৪২,০০০৲ টাকা।

প্রচারকার্য

গত ২৩.১.৬৫ হইতে ২০.৬.৬৫ পর্যন্ত স্বামী

সম্বুদ্ধানন্দ মহারাজ নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি দিয়াছেন :

বিষয়		স্থান
পাশ্চাত্যে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী		রামকৃষ্ণ আশ্রম, বোম্বাই
শ্রীরামকৃষ্ণ	...	শিবপুর, হাওড়া
স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের যুবসম্প্রদায়	...	বিজয়ওয়াদা
ভারতীয় নারীর আদর্শ	...	"
সনাতন ধর্ম	...	"
তরুণ ভারতের প্রতি স্বামীজীর বাণী		"
সনাতন ধর্মে শ্রীরামকৃষ্ণের দান	...	সিঁথি, কলিকাতা
বর্তমানে দেশে যে শিক্ষা প্রয়োজন		রবীন্দ্রসরোবর, "
কর্মযোগ	...	পার্কসার্কাস, "
স্বামী বিবেকানন্দ (বার্ষিক উৎসব)		বোম্বাই আশ্রম
শ্রীরামকৃষ্ণ (")		"
শ্রীরামকৃষ্ণ ও সনাতন ধর্ম	...	বারাকপুর
শ্রীরামকৃষ্ণ ও হিন্দুধর্ম	...	হোটর
শ্রীরামকৃষ্ণ ও বর্তমান যুগ	...	ইছাপুর
কঠোপনিষৎ	...	"
ধর্ম	...	বালিগঞ্জ
জগতে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী	...	কাটিহার আশ্রম
শ্রীরামকৃষ্ণ	...	রায়গঞ্জ
স্বামী বিবেকানন্দ	...	"
যে ধর্মের আমরা উত্তরাধিকারী	...	হরিরামপুর
ভারতের নব জাগরণ	...	মিনার্ভা থিয়েটার
যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ	...	বাঘাযতীন কলোনী
নিষ্কাম ধর্ম	...	আঁটপুর
শ্রীরামকৃষ্ণের সার্বভৌম ধর্ম	...	গড়বেতা
"	...	সিন্ধু
স্বামী বিবেকানন্দ	...	"
শ্রীবুদ্ধ ও তাঁহার বাণী	...	মেদিনীপুর
শ্রীবুদ্ধ ও স্বামী বিবেকানন্দ	...	"
স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ	..	"
বিশ্বশান্তি	...	বোম্বাই
বর্তমানে যা প্রয়োজন	...	"

পরলোকে ই. সি. ব্রাউন

দুঃখের বিষয়, রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য মিঃ ব্রাউন গত ৩১. ১২. ৬৫ তারিখ কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। জীবনের শেষভাগ তিনি বেলুড় মঠের অতিথি-ভবনে কাটাইতেছিলেন। হিন্দুমতে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হইয়াছে।

মিঃ ব্রাউন আমেরিকান ছিলেন। সানফ্র্যানসিসকোতে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম দর্শন লাভ করেন; সে-সময় কর্মব্যপদেশে তিনি কোন সংবাদপত্র ও বিজ্ঞাপন সংস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই দিন ক্লাসের পর তিনি স্বামীজীর সহিত করমর্দনও করিয়াছিলেন।

পরে সানফ্র্যানসিসকো হিন্দুমন্দিরে বাস করিয়া (আশ্রম হইতেই অফিসে যাইতেন) তিনি স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সাহচর্য ও তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। ত্রিগুণাতীতানন্দজী তাঁহার নাম দিয়াছিলেন "সজ্জন"। শেষ জীবনে মিঃ ব্রাউন এই নামেই নিজেকে পরিচিত করিতে ভালবাসিতেন, বিশেষতঃ মঠের সাধু ব্রহ্মচারীদের নিকট।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের দেহত্যাগের কিছু কাল পর মিঃ ব্রাউন বিবাহ করিয়া দুইটি কন্যা ও একটি পুত্র লাভ করেন। স্ত্রীবিয়োগের পর তিনি পুনরায় সানফ্র্যানসিসকো আশ্রমে বাস করিতে শুরু করেন। পরে চাকরিও ছাড়িয়া দিয়া আশ্রমের কাজে পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। দীর্ঘকাল তিনি সানফ্র্যানসিসকো কেন্দ্রের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। সানফ্র্যানসিসকো আশ্রমে থাকাকালে ভারত হইতে সেখানে প্রেরিত স্বামী প্রকাশানন্দ, স্বামী মাধবানন্দ, স্বামী দয়ানন্দ ও স্বামী অশোকানন্দের সঙ্গলাভ করিবার সুযোগ তিনি পান। ইঁহাদের সকলের প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা ছিল; "My teachers" বলিয়া ইঁহাদের উল্লেখ করিতেন।

গত মহাযুদ্ধে তাঁহার পুত্র মারা যাওয়ায় তিনি ভারতে আসেন। দু-তিন বার যাতায়াতের পর ভারতেই থাকিয়া যান। বাঙ্গালোরে তিন-চার বছর ছিলেন। হোটেলে থাকিয়া আশ্রমে যাতায়াত করিতেন। শেষ সময় বেলুড় মঠে ছিলেন। সেখান হইতেই চিকিৎসার

জন্য তাঁহাকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে পাঠান হইয়াছিল।

শেষ ১৫।২০ বৎসর তিনি মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদের মতই জীবন কাটাইয়াছেন। বাহ্য সন্ন্যাস গ্রহণের খুব ইচ্ছাও ছিল তাঁহার। বাহিরের কোন মঠ হইতে সন্ন্যাস পাওয়া যাইতে পারে, একথা তাঁহাকে জানাইলে বলিয়াছিলেন, "প্রয়োজন নাই, স্বামী বিবেকানন্দ স্থাপিত বেলুড়মঠরূপ main current হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে আমি চাইনা।"

মিঃ ব্রাউন নিরামিষাশী ছিলেন। বাগান করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার স্বভাব ছিল গোছালো। কৌতুকপ্রিয় ছিলেন খুব—অনেক মজার গল্প বলিতেন। শেষ পর্যন্ত স্বাবলম্বী ছিলেন, সহজে কাহারো নিকট কোনওরূপ সাহায্য লইতে চাহিতেন না।

তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিবিধ সংবাদ

ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেস

গত ৩রা জানুআরি হইতে ৯ই জানুআরি (১৯৬৬) পর্যন্ত চণ্ডীগড়ে ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেসের ৫৩তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অধিবেশনের মূল সভাপতি অধ্যাপক বি. এন. প্রসাদ উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে বলেন: উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য ভারতীয় ছাত্রদের বিদেশযাত্রার যে অত্যধিক আগ্রহ, তাহার প্রতিরোধকল্পে উন্নততর গবেষণাদির জন্য এদেশেই অতি উচ্চ পর্যায়ের কয়েকটি শিক্ষায়তন খোলা অতি আবশ্যক। প্রয়োজনানুযায়ী শিক্ষাদানের জন্য সেখানে বিদেশ হইতে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের আনিলেই হইবে। যে সব উচ্চতর শিক্ষার যথেষ্ট ব্যবস্থা এদেশেই রহিয়াছে, তাহার জন্য কোনও ছাত্রকে বিদেশে যাইতে দেওয়াই উচিত নয়।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের আলোচনার জন্য ১৩টি প্রসিদ্ধ শাখায় অধিবেশন হইয়াছিল। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ বিভিন্ন বিভাগে সভাপতিত্ব করেন:

অধ্যাপক দুর্গানন্দ সিংহ—মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা, অধ্যাপক এস. এম. মুখোপাধ্যায়—রসায়ন, অধ্যাপক জি. পি. শর্মা—প্রাণিবিদ্যা, অধ্যাপক ডব্লিউ. এম. ওয়াডিয়া—পদার্থবিদ্যা, অধ্যাপক আর. এস. মিশ্র—গণিত, ডক্টর এস. পি. রায়-চৌধুরী—কৃষিবিদ্যা, অধ্যাপক অনন্তকুমার সেনগুপ্ত—ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুবিদ্যা, ডক্টর পি. সি. সেনগুপ্ত—চিকিৎসা, মিঃ জি. এস. রায়—নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব, ডক্টর বি. কে. আনন্দ—শারীরবৃত্ত, অধ্যাপক এন. এম. ভাট—পরিসংখ্যান, অধ্যাপক টি. এস. মহাবলে—উদ্ভিদ্-বিদ্যা, মিঃ এস. পি. নাউটিয়াল—ভূবিদ্যা ও ভূগোল।

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ট্রেন সারভিস

জাপানের সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান কিওডোর সংবাদে প্রকাশ, জাপানের ন্যাশনাল রেলওয়ে করপোরেশন টোকিও এবং ওসাকার মধ্যে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ট্রেন সারভিস চালু করিয়াছে। দুইখানি সুপার এক্সপ্রেস এই দুইটি শহরের মধ্যে ৫১৫ কিলোমিটার (৩২২ মাইল) পথ তিন ঘণ্টা দশ মিনিটে অতিক্রম করে। ট্রেনদুইটির গতিবেগ ঘণ্টায় গড়ে ১৬২'৮ কিলোমিটার ছিল, কিন্তু মাঝে মাঝে উহারা ঘণ্টায় ২১০ কিলোমিটার বেগেও চলিয়া-

ছিল। ফ্রান্সের সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ট্রেন ঘণ্টায় ৮২·৫ মাইল বেগে চলে।

উৎসব-সংবাদ

ঢাকুরিয়া : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২ই জানুআরি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজাদি, শাস্ত্রপাঠ, ভজন প্রভৃতি কার্যসূচী অনুসরণ এবং সমাগত ভক্তবৃন্দকে ফল-মিষ্টি প্রসাদ হাতে হাতে বিতরণ করা হয়। বৈকালে ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের জীবন আলোচনা করেন।

খেপুত (মেদিনীপুর) : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৪ই ডিসেম্বর পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, ভোগরাগ, প্রসাদবিতরণ, মাতৃসঙ্গীত, মায়ের জীবনকথা আলোচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

কার্যবিবরণী

বিবেকানন্দ-সোসাইটি (২১, বৃন্দাবন বসু লেন, কলিকাতা ৬) : যুগাচার্য স্বামীজীর ভাবধারা রূপায়িত করিবার জন্য জনসাধারণের পক্ষ হইতে যে-সকল সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বিবেকানন্দ সোসাইটির নাম প্রাচীনতার দিক হইতে উল্লেখযোগ্য। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই সমিতির ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে সাপ্তাহিক ও সাময়িক ধর্মসভায় কঠোপনিষৎ, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, শিবমহিম্নঃস্তোত্র, গীতা, চণ্ডী, ধর্মপদ, 'কথামৃত', স্বামীজীর 'কলম্বো হইতে আলমোড়া', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি অবলম্বনে কথকতা এবং মহাপুরুষগণের পুণ্য জীবন ও বাণী অবলম্বনে বক্তৃতা হইয়াছিল।

সোসাইটি-পরিচালিত দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে ১১,৭৭৩ জন রোগী চিকিৎসিত হয়। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সহযোগিতায় সোসাইটিতে একটি দুগ্ধবিতরণ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

গ্রন্থাগারে ৫,৩৪০ খানি পুস্তক আছে, আলোচ্য বর্ষে ২,৫১২টি পুস্তক পাঠকগণকে পড়িতে দেওয়া হয়। পাঠাগারে অনেকগুলি পত্রিকা নিয়মিত আসে। সোসাইটির বর্তমান সভ্যসংখ্যা ৩৫৮।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মতিথি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

কলিকাতায় ১৫১ নং বিবেকানন্দ রোডে নিজস্ব জমিতে সোসাইটির বহু-ঈপ্সিত 'বিবেকানন্দ-স্মৃতিমন্দির'-এর (Swami Vivekananda Memorial Hall) নির্মাণকার্য চলিতেছে।

পরলোকে ডাঃ ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত

বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া গত ২১শে ডিসেম্বর তাঁহার চক্রধরপুরস্থ বাসভবনে ৭০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গে ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পরোপকারী, দয়ালু ও ভক্তিমান ধীরেন্দ্রবাবু পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ধর্মীয় ও জনহিতকর যাবতীয় কার্যে তাঁহার পরম অনুরাগ ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার আত্মার সদ্গতি করুন—ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ

(শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ)

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ

(শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নব-নির্বাচিত অধ্যক্ষ)

[আনন্দের কথা, শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছেন ; এ কথা আমরা পূর্বেই জানাইয়াছি। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মহাসমাধি লাভের পর শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ দশম অধ্যক্ষরূপে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর পূজ্যপাদ মাধবানন্দজী মহারাজের তিরোধানের পর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাষ্টিগণ আশা করিয়াছিলেন যে তৎকালীন সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজ (তখন অসুস্থ) সুস্থ হইবার পর অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করিবেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুআরি তিনি মহাসমাধিতে লীন হওয়ায় তাহা আর কার্যতঃ হইয়া উঠে নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের বর্তমান ট্রাষ্টিগণের মধ্যে সর্বপ্রাচীন শ্রীমৎ স্বামী শান্তানন্দজী মহারাজ স্বামী বিবেকানন্দ-কৃত ট্রাষ্ট্-ডীড্ অনুসারে অন্তর্বর্তিকালে অধ্যক্ষের কাজ করিতেছিলেন।]

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এ. পাস করিয়া, ২৪ বৎসর বয়সে, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দেন। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষা এবং তদানীন্তন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর নিকট হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য সন্ন্যাসী সন্তানগণের বহুজনের সংস্পর্শে আসিবার দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারীও তিনি হইয়াছেন।

দীর্ঘকাল নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সেবা করিয়াছেন। প্রথমে কিছুকাল মাদ্রাজ মঠে, পরে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে কয়েক বৎসর ধরিয়া

দক্ষতার সহিত কার্য করিবার পর তিনি অদ্বৈত আশ্রমের কলিকাতা শাখার কর্মাধ্যক্ষ হন। পরে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। ১৯২৯ খৃঃ তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাষ্টি ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালক-মণ্ডলীর সদস্য, এবং ১৯৩৮ খৃঃ সমগ্র সঙ্ঘের সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন। বারাণসী সেবাশ্রমের কার্যধারা পুনর্বিন্যাসের জন্য তিনি একবার মিশন-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৺কাশীধামে প্রেরিত হন এবং স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দের সহযোগিতায় তাহা সুসম্পাদিত করেন। ১৯৪৩-৪৫ খৃষ্টাব্দের বাংলার দুর্ভিক্ষে ত্রাণকার্যের দায়িত্ব সঙ্ঘের পক্ষ হইতে তাঁহার উপরই ন্যস্ত হইয়াছিল। তিনি সে সেবাব্রত সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত করেন। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের মার্চ পর্যন্ত—শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ শারীরিক কারণে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদকের গুরুত্বপূর্ণ পদ হইতে সাময়িক অবসর গ্রহণ করিলে তিনি উক্ত পদাভিষিক্ত হইয়া কার্য করিতে থাকেন। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে স্বামী মাধবানন্দজী অধ্যক্ষ হইবার পর স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী পুনরায় সাধারণ সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন; সঙ্ঘাধ্যক্ষ হইবার পূর্ব পর্যন্ত ঐ পদেই তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শাঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ী ব্রহ্মসূত্রের এবং শ্রীধর স্বামীর টীকাসহ সমগ্র গীতার ইংরেজী অনুবাদ—তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রের সূক্ষ্ম মর্ম গ্রহণের সুযোগ্য ক্ষমতার পরিচয় দেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণচরণে প্রার্থনা করি, তাঁহার প্রতিনিধিরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষের পদে দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত রাখিয়া স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীকে তিনি দীর্ঘকাল লোককল্যাণব্রতে ব্রতী রাখুন।

"কুলকুণ্ডলিনী না জাগলে চৈতন্য হয় না।"

"মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী। চৈতন্য হলে তিনি সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়ে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর এই সব চক্র ভেদ করে, শেষে শিরোমধ্যে গিয়ে পড়েন। এরি নাম মহাবায়ুর গতি—তবেই শেষে সমাধি হয়।"

"শুধু পুঁথি পড়লে চৈতন্য হয় না—তাঁকে ডাকতে হয়। ব্যাকুল হলে তবে কুলকুণ্ডলিনী জাগেন। শুনে, বই পড়ে, জ্ঞানের কথা!—তাতে কি হবে!"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

দিব্য বাণী

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণম্
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্॥ ১

—শিক্ষাষ্টকম্—শ্রীচৈতন্য

ধুয়ে মুছে সর্বক্লেদ প্রভাব যাহার করে
হৃদয়দর্পণটিরে শুদ্ধ অমলিন,
ভব-মহাদাবাগ্নির করে নির্বাপণ,
পরম কল্যাণাকর মুক্তি-শ্বেতশতদলে
ঢালে যাহা সুবিমল চন্দ্রের কিরণ,
সর্বত্র বিজয় তার, সদা জয়যুক্ত সেই
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম সংকীর্তন!

পরাবিদ্যা-বধূটির জীবনস্বরূপ যাহা,
কর্ণপুটে পশিলে যে মধু-বরিষণ
আনন্দের পারাবার উদ্বেলিত হয়ে ওঠে,
আনে প্রতিপদে পূর্ণামৃত-আস্বাদন,
সিনান করায় চির-শান্তিনীরে সর্বজীবে,
চিরজয়ী সেই কৃষ্ণনাম-সংকীর্তন!

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥ ৪
নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥ ৬

ধন জন সর্বজ্ঞত্ব সুন্দরী বনিতা আদি, জগদীশ, কিছুই না চাই—
জন্মে জন্মে, ভগবান, তব পদে সদা মোর অহৈতুকী ভক্তি যেন রয়!
সেদিন আসিবে কবে, তব মধুমাখা নাম নেবা মাত্র দুনয়নে যবে
বহিবে প্রেমাশ্রুধারা, দেহ মোর কণ্টকিত, কণ্ঠ মোর বাষ্পরুদ্ধ হবে!

কথাপ্রসঙ্গে

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য

শ্রীভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ প্রধানতঃ দুটি—একটি জ্ঞানের, অপরটি ভক্তির। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তগণকে সাধারণতঃ এই দুই থাকে ভাগ করিতেন—শিবঅংশ-সম্ভূত ও বিষ্ণুঅংশ-সম্ভূত। একটি মদনান্তকারী শিবের ভাব—রূপ-রস, বাসনা-কামনা সব কিছুকে প্রথম হইতেই অস্বীকার করিয়া, জ্ঞানাগ্নিতে 'ভস্মাবশেষ' করিয়া সর্বভাবাতীত চরম সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার ভাব। অপরটি সর্ববিধ পার্থিব রূপ-রসাদির মিথ্যায় গড়া আবরণের ভিতর সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানেরই প্রাণারাম প্রকাশ দেখিয়া অপরূপ ঈশ্বরীয় রূপ-মাধুর্যের দ্বারা সর্ববিধ নীচ বাসনা-কামনাকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হওয়ার ভাব

শ্রীভগবান যখন নরদেহে আবির্ভূত হন, সে আবির্ভাবে জ্ঞান ও ভক্তির প্রকাশ সমভাবে থাকিলেও যুগপ্রয়োজনে তিনি উহার একটিকেই বাহিরে বিশেষভাবে প্রকাশিত করেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বর্তমান যুগপ্রয়োজনে সর্ববিধ ভাবেরই বহিঃপ্রকাশ দেখাইয়াছিলেন। যখন যে ভাবের লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত, দেখা যাইত তিনি তখন সেইভাবেই ভাবিত হইয়াছেন। ভক্তিপথই অধিকাংশ লোকের পথ; সেজন্য সাধারণভাবে তাঁহার মধ্যে ভক্তিভাবের প্রকাশাধিক্যই দেখা যাইত। এক সময় তিনি জনৈক ভক্তকে বলিয়াছেন, "তোমায় তো বলেছি যে বিষ্ণুঅংশে ভক্তির বীজ যায় না। আমি এক জ্ঞানীর পাল্লায় পড়েছিলুম, এগার মাস বেদান্ত শুনালে। কিন্তু ভক্তির বীজ আর যায় না। ঘুরে ফিরে সেই 'মা—মা'।"

প্রেমঘনমূর্তি ভগবান শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন: জ্ঞান ছিল তাঁর অন্তরের জিনিস, নিজের উপভোগের জন্য; আর ভক্তির প্রকাশ দেখাইতেন সর্বসাধারণের ভিতর ভক্তির আদর্শ স্থাপনের জন্য। বলিয়াছেন, চৈতন্যদেবের তিনটি দশা ছিল; অন্তর্দশায় তিনি অদ্বৈততত্ত্বে লীন হইয়া স্থির হইয়া যাইতেন; অর্ধবাহ্যদশায় ভগবৎপ্রেমে উদ্দাম নৃত্য করিতেন, আর বাহ্য-দশায় তাঁহার নাম গুণগান করিতেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে 'বজ্রাদপি কঠোরাণি' সংযমের সহিত 'মৃদূনি কুসুমাদপি' প্রেমের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। শোনা যায়, মদন-লাঞ্ছিত রূপমাধুরী মণ্ডিত, চাচর-চিকুর শোভিত অতীব প্রিয়দর্শন এই যুবককে সন্ন্যাসদানের পূর্বে কেশবভারতী তাঁহার জিহ্বার উপর কিছু শর্করা রাখিয়া কিছুক্ষণ পরে ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দেখিয়া তাঁহার সংযমের বাঁধ কত উচ্চ, কত দৃঢ় তাহা পরীক্ষা করিয়াছিলেন; চিনির সব দানাগুলি উড়িয়া পড়িয়া গিয়াছিল—একটি দানাও ভিজিয়া যায় নাই। সন্ন্যাসীদের সর্ববিধ খুঁটিনাটি নিয়ম যেরূপ কঠোরতার সহিত তিনি পালন করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা মেলা ভার। সংযম ও ত্যাগের এই সুদৃঢ় প্রাচীর-বেষ্টিত ছিল তাহার ভাবাপ্লুত হৃদয়, সেখানেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল অনবদ্য প্রেম-শতদল।

কালক্রমে আমরা তাঁহার এই ত্যাগের দিকটি ভুলিতে বসিয়াছি। সংযম ব্যতীত কোনও ভগবদ্ভাব হৃদয়ে স্থায়ী হয় না, ভাবের গভীরতা আসা তো দূরের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব বলিতেন: (ক্যামেরার উদাহরণ দিয়া) কাঁচে যদি কালি (ব্রোমাইড প্রভৃতি) মাখান

থাকে, তবে তাহার উপর ছবি পড়িলে উহা স্থায়ী হয় ; কালি মাথান না থাকিলে ছবি পড়ে বটে, কিন্তু বস্তুটি সরাইয়া লইবামাত্র সে ছবিও লুপ্ত হয়। মনরূপ কাঁচের পক্ষে সংযমই ভাবকে স্থায়িভাবে ধরিয়া রাখিবার কালি। সংযমহীন জীবনে ভজনাদির আধিক্যবশতঃ সাময়িকভাবে হৃদয় উচ্চভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেও পরক্ষণে উহা বুদ্বুদের ন্যায় ফাটিয়া গিয়া শূন্যলীন হয়। ইহার আরো একটি গুরুতর বিপদ আছে। সংযমহীন জীবনে দীর্ঘকালব্যাপী ভজনাদির মাধ্যমে মন উচ্চে উঠিবার পর যখন নামিতে থাকে, তখন কত নীচে যে নামিয়া যাইবে, তাহার স্থিরতা থাকে না। সেজন্য জীবনে অনেক ক্ষেত্রে ইহাতে লাভ অপেক্ষা লোকসানই অধিক হয়। অভ্যাসসহায়ে স্থায়িভাবে যতটুকু সংযত ও ঈশ্বরীয় চিন্তায় নিবিষ্টমনা হওয়া যায়, তাহার মূল্য সাময়িক উচ্চ ভাবপ্রবণতার অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। স্বামী সারদানন্দজী ভাবের বহিঃপ্রকাশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে সংযমের বাঁধ যাহার যত উচ্চ, তাহার ভাবধারণের ক্ষমতাও তত বেশী। সংযমের বাঁধ যেখানে নিম্ন সেখানে সামান্য ভাবাবেগেই উহা উপছাইয়া পড়িয়া শরীরে অশ্রু প্রভৃতি বিকার আনয়ন করে। ভাবের বহিঃপ্রকাশই কখনো ভাবের গভীরতার নির্দেশক হইতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সহজ উপমায় ইহা প্রকাশ করিয়াছেন: ছোট ডোবায় হাতী নামিলে জল তোলপাড় হইয়া যায়, কিন্তু দীঘিতে নামিলে কিছুই হয় না।

ক্বচিৎ কাহারো জীবনে ঈশ্বরীয় ভাবের প্রকাশ এত বিপুল পরিমাণে ঘটে যে, সংযমের সুউচ্চ প্রাচীরও উহাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারে না, ভাবের বিপুল প্লাবন প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া দেহকেও প্লাবিত করে—দেহে অশ্রু-পুলকাদি বিকার দেখা দেয়। ইহার চরমাবস্থা মহাভাব। শ্রীমতী রাধারাণীর এই মহাভাব হইত, বৈষ্ণবশাস্ত্রে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। ভগবান চৈতন্যদেবের দেহেও এই মহাভাবপ্রসূত অষ্টসাত্ত্বিক বিকার প্রকাশের কথা উল্লিখিত আছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনেও এই মহাভাব ও তজ্জনিত দৈহিক বিকার বহুবার প্রকাশ পাইয়াছে।

নদীয়ার চাঁদ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে কত শত ভক্তের হৃদয়সাগর উদ্বেলিত হইয়াছে; শ্রীভগবানের সাকার বিগ্রহের অমিয় পাদস্পর্শে, চিদাকাশে 'পূর্ণ প্রেম-চন্দ্রোদয়ে', অমৃতত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, ভক্তির পথই সর্বসাধারণের পথ। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিয়াছেন: গৃহের—দেহমনবুদ্ধির—বাহিরে আসিয়া জ্ঞানসূর্যের প্রখর কিরণে দাঁড়াইতে হয়ত সকলে পারে না; কিন্তু ভক্তি-চন্দ্রের—তাঁহার সাকার রূপের—স্নিগ্ধকিরণে তো হৃদয় সুশীতল করা যায়! শ্রীচৈতন্য এই সর্বজনলভ্য সুশীতল অমিয়ধারার নিত্য নির্ঝর-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের ভাবানুসরণকালে আমরা যেন তাঁহার ভাবভক্তির ভিত্তিভূমির কথা ভুলিয়া না যাই ; যেন সর্বদা স্মরণ রাখিতে পারি যে, শ্রীভগবানকে সাকার বা নিরাকার যে কোন ভাবেই হউক না কেন প্রত্যক্ষ করা সম্ভব একমাত্র সংযমাগ্নিদগ্ধ বিগতমালিন্য শুদ্ধ মনবুদ্ধি সহায়েই। ভোগকালিমালিপ্ত মনের নিকট হইতে তিনি বহুদূরে। প্রেমময়ের নিত্যনিবাস নিত্য-ধামে জীবনতরণীকে বাহিয়া লইয়া যাইতে সঙ্কল্পবান হইয়া একমাত্র দাঁড়টানার দিকেই যেন নিবদ্ধদৃষ্টি না হই আমরা, নোঙরটি তুলিবার প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার কথাও যেন ভাবি।

ছাত্রজীবনে সংযম ও জাতির ভবিষ্যৎ

ছাত্রজীবন জীবনগঠনের সময়, সমাজ ও দেশের ভবিষ্যৎ সেবকরূপে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য যথাসাধ্য জ্ঞান ও শক্তিসঞ্চয়ের সময়; অপরিহার্য ক্ষেত্র ছাড়া সমাজ বা রাষ্ট্রের গতিনিয়ন্ত্রণে অত্যধিক মাত্রায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া ইহার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হইতে দেওয়া কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। সর্ববিষয়ে সংযমজনিত সঞ্চিত শক্তিতে যে ছাত্রজীবন যত বেশী সমৃদ্ধ হইবে, পরবর্তী-কালে কার্যক্ষেত্রে সমাজ ও দেশের সেবায় সে জীবন কাজে লাগিবে তত বেশী, তত অধিক-পরিমাণে ও অধিকতর সীমায় বিস্তৃত ও ফলপ্রসূ হইবে সে জীবনের সেবাব্রত। ছাত্রজীবনে ভাবপ্রবণতা অত্যধিক মাত্রায় থাকে, তাহার উচ্ছ্বাসও বহিঃপ্রকাশে সদাউন্মুখ। কিন্তু অধিকতর শক্তিসম্পন্ন উন্নততর জীবন গঠন করিতে হইলে ইহাকে যথাসাধ্য সংযত করিতেই হইবে; তাহার জন্য প্রয়োজনীয় মনের বলও অপর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে যৌবনের প্রারম্ভে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, পতনোন্মুখ জলধারার বেগ রোধ করিতে পারিলে সেখানে বিপুল শক্তি সঞ্চিত হয়। জল হইতে বাষ্প উঠিয়া এলোমেলো ভাবে ছড়াইয়া পড়িলে সে শক্তি বৃথা ক্ষয় হয়। কিন্তু যখন ঐ শক্তির অসংযত অপচয় রোধ করিয়া উহাকে সুদৃঢ় কক্ষে সঞ্চিত ও যথাযথ প্রণালীতে প্রয়োজন মত চালিত করা হয় (যেমন ষ্টীম ইঞ্জিনে), তখন ঐ সঞ্চিত শক্তি দ্বারা প্রচণ্ড কার্য সাধিত হইতে পারে। তাছাড়া যখন সাময়িক উচ্ছ্বাসবশে মানসিক শক্তি নিয়োজিত হয়, তখন ঝঞ্ঝার মত আসিয়া ক্ষণপরে উহা চলিয়া যায়—পিছনে রাখিয়া যায় অবসাদ ও শূন্যতা। আর যখন—স্থিরবুদ্ধি-চালিত হইয়া সুসংহত শক্তি নিয়োজিত হয়—তাহা হইয়া উঠে দীর্ঘকালব্যাপী কর্মক্ষম ও অপ্রতিরোধ্য; সাময়িক উচ্ছ্বাসবশে অনেকেই দুরূহ কর্মসাধনে অগ্রসর হইতে পারে; কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রচণ্ড মানসিক দৃঢ়তা না থাকিলে অধিকাংশই শ্লথগতি হইয়া যায় অর্ধপথে। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য স্থিরসংকল্প হইয়া শেষ পর্যন্ত আগাইয়া যাইবার মানুষ সংখ্যায় খুব বেশী নয়। দেশের পক্ষে সর্বকালেই প্রয়োজন কিন্তু সেইরূপ মানুষেরই; লোককল্যাণকর কোন শুভ সঙ্কল্পে সাময়িকভাবেও প্রভাবিত হওয়া মহৎ কর্ম সন্দেহ নাই; কিন্তু উহার স্বল্পাংশকেও জীবনে স্থায়িভাবে ধরিয়া রাখা মহত্তর কর্ম ও অধিকতর কল্যাণপ্রসূ। সংকল্পের সেরূপ দৃঢ়তার জন্য অমিত শক্তির প্রয়োজন এবং তাহা লাভের একমাত্র উপায় শক্তির অপচয় রোধ, সংযমাভ্যাস। স্বামী বিবেকানন্দ দেশের ও জগতের জন্য কীভাবেই না জীবনের শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন, আর সে শক্তির বিপুলতাই বা কী! কিন্তু তাঁহার কর্মজীবন (ক্ষেত্র ভিন্ন হইলেও) ছাত্রাবস্থায় আরম্ভ হয় নাই, ছাত্রজীবন নিয়োজিত ছিল শক্তির বিকাশের সাধনাতেই; কর্মজীবন আরম্ভ করিবার পূর্বে বিপুল শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি মানবসেবা এত বিপুলভাবে করিতে পারিয়াছিলেন।

অবশ্য কদাচিৎ এক-আধ বার সাময়িক বিশেষ প্রয়োজন আসিতে পারে। ঘরে যখন আগুন লাগে, তখন আর সব কাজ ভুলিয়া আগুন নিভাইবার জন্যই সকলকে ছুটিতে হয়, ছুটিয়া আসেও সবাই। আমাদের জাতীয় জীবনে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সেইরূপ কোন বিশেষ ক্ষণে ছাত্রগণকেও সব কিছু ভুলিয়া এইরূপ অতিপ্রয়োজনীয় কাজে সহায়তা করিতে ডাকা হইয়াছিল—সেকার্যে তাহাদের অবদানও

অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাহার পর হইতে যে সব কাজে ছাত্রদের আগাইয়া না আসিলে বা তাহাদের না ডাকিলেও চলে, সে সব কাজেও তাহারা নামিতেছে, তাহাদের আহ্বান করা হইতেছে ; তাহাদের শিক্ষা ব্যাহত করিয়া, তাহাদের মনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের নমনীয় বেগবান মানসিক প্রবণতার সুযোগ লইয়া হইতেছে। ছোট বড় নানা কারণে বারে বারে এরূপ ঘটার ফলে শিক্ষা অতিমাত্রায় বিঘ্নিত হয় ; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হওয়ায় ও উগ্র পরিবেশজনিত মানসিক অস্থিরতায় যে ক্ষতি হয়, তাহা পূরণ করা সহজ হয় না। যত দিন যাইতেছে, দেখিয়া অনেক সময় মনে হয়, ছাত্রদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তামাত্র করিবার কেহই যেন নাই ; তাহাদের তারুণ্যের দুর্দমনীয় উৎসাহ ও ত্যাগস্বীকার যন্ত্রমাত্ররূপেই ব্যবহৃত হয় ; ছাত্রজীবনে মন অতি নমনীয় ও আদর্শপ্রিয় থাকে, অতি সহজে সেখানে যে কোন ভাবের সাময়িক ছাপ দেওয়া যায়। জাতির ভবিষ্যতের পক্ষে ইহা সমূহ হানিকর—বর্তমানের ছাত্রদের ভবিষ্যৎই জাতির ভবিষ্যৎ, শিক্ষিত সম্প্রদায়ই জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ন্তা।

স্কুলের ছাত্রদের ও স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যেও কিছু অংশের হয়তো হৃদয়াবেগের ঊর্ধ্বে উঠিয়া পথ নির্ণয়ের জন্য যতখানি প্রয়োজন ততখানি স্থিরতা না আসিতে পারে। কিন্তু শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ, দেশনায়কগণই বা কেন শিক্ষাব্রতের সাবলীল ধারাকে এত বেশী করিয়া ব্যাহত হইতে দেন, তাহাও ভাবিয়া পাওয়া যায় না। ভবিষ্যৎ কল্যাণের চিন্তা কি আজ ব্যাপকভাবে এত অগভীর হইয়া উঠিয়াছে ?

দেশের কল্যাণের জন্য, অন্যায়রোধের জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িবার, স্বার্থত্যাগ করিবার, এমনকি জীবনও বিসর্জন দিবার সময় ও সুযোগের অভাব পরে হইবে না। প্রস্তুতি অধিক থাকিলে, সঞ্চয় অধিক হইলে ভবিষ্যতে দেশের কল্যাণ ও অন্যায়প্রতিরোধের জন্য ছাত্রদের কল্যাণসাধনব্রত বৃহত্তর পরিধিতে বিস্তৃত হইবে। মহত্তর কর্ম ও স্বার্থত্যাগের সুযোগ আজীবনই আসিবে। জীবনের যে কোন অবস্থায় আন্তরিক ইচ্ছার সহিত পরার্থে কৃত যে কোন কার্য, যে কোন ত্যাগই জীবনের সর্বোত্তম কর্ম নিশ্চয়ই ; কিন্তু কর্মক্ষেত্রে যে ত্যাগ, যে পরার্থপরতার অভাব উন্নতি-পথযাত্রার প্রতিপদে জাতি আজ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছে, ছাত্রসমাজে প্রচ্ছন্ন তাহার বিপুল ভবিষ্য সম্ভাবনা অদূর-দর্শিতা, অসম্যক্‌নিয়ন্ত্রণ, ও অনবধানতার জন্য (যাহারই হউক না কেন) বিকাশের প্রাক্কালেই অপব্যবহারে বিনষ্ট বা পূর্ণবিকাশের পথে প্রতিহত হইবে কেন ?

ভারতের সীমারেখা

শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর

ভারতের সীমারেখা কি এঁকেছ তুমি ভৌগোলিক?
আসমুদ্র-হিমাচল, আব্রহ্ম-কাশ্মীর? নহে ঠিক
এ সীমানা; এঁকেছ যে মানচিত্র অসতর্ক হয়ে—
হতে পারে ভূখণ্ডের—সনাতন ভারতের নহে!
এ চিত্রে কোথায় আছে পুণ্যভূমি মহাভারতের
মহারাণী গান্ধারীর পিত্রালয়? ওঙ্কারনাথের
বড়ভুধরের ছবি? সুমাত্রা ও জাভা বোর্ণিও-র
হিন্দুমন্দিরাদি কই, কালজয়ী সভ্যতা হিন্দুর
স্বাক্ষর রেখেছে যেথা? ভরতের ভারতের সীমা
সঙ্কীর্ণ ছিল না এত। দানবীর বলির মহিমা
পাতালে রচিয়াছিল সপ্ত মহাপণ্ডিতের সভা,
বিশাল সাম্রাজ্য আর। কিন্নরাদি যক্ষাদি কত বা
সুসভ্য জাতির নেতা কুবেরের অলকাপুরীর
সন্ধান কে করে আজ?

সেদিনও তো সীমা ভারতের
প্রসারিত হয়েছিল দূরান্তরে প্যাসিফিক পারে
রামকৃষ্ণসাম্রাজ্যের ভিত্তি গড়ে শুনালো ধরারে
ভারতআত্মার বাণী হিন্দুসাধু; দক্ষিণাফ্রিকার
লাঞ্ছিত জনের করে সগৌরবে তুলে দিল তার
ন্যায়ার্জিত অধিকার; বিশ্বকবি-প্রতিভা প্রেমের
কিরণে লইল জিনে চিরজয়োদ্ধত পশ্চিমের
অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার হার; বার বার ভারতের জয়
ধ্বনিত হয়েছে বিশ্বে, সারা বিশ্ব মেনেছে বিস্ময়!

ভোগমত্ত মানবের বিভীষিকাময় ধরণীর
সীমার ওপার হতে আহরিত অমৃতসিন্ধুর
প্রশান্ত প্রাণের বর্ণে ভারত এঁকেছে তার সীমা,
যুগে যুগে বিশ্ব জুড়ে ছড়ায়েছে সে স্নিগ্ধ নীলিমা।
জড়বাদ-দানবের অট্টহাস, ভীম আস্ফালন
জগৎ জুড়িয়া আজ তুলেছে যে মৃত্যুর গর্জন
ভেবেছ কি মাখাবে সে দেবতার
কপালে কালিমা—
ব্যঙ্গভরে মুছে দিয়ে চিরন্তন-জীবন-মহিমা?
হতে তা পারে না কভু—বীর্যবান দেবশিশুদল
জাগিতেছে পুনরায়, হিংস্রতারে করিয়া বিকল
আবার ছড়াবে তারা ভারতের প্রাণের মহিমা
দিকে দিকে প্রসারিয়া মৃত্যুঞ্জয় ভারতের সীমা।

পঞ্চকোশ বিচার

স্বামী স্বপ্রকাশানন্দ

মানুষের জানিবার ইচ্ছা ও কৌতূহলের অন্ত নাই। বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য মানুষ ব্যাকুল। বাহিরের সমস্ত পদার্থই তাহার অনুসন্ধিৎসার বিষয়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা নিকট যে বস্তুটি তাহার খোঁজ মানুষ করে না। সে বস্তুটি সে নিজে।

জন্মাবধি মানুষ 'আমি' 'আমি' করে কিন্তু সে 'আমি'টি যে কি তাহার সন্ধান জানে না। নিজকেই ঠিক ঠিক কয়জনে জানে? বেদান্ত আমাদের সেই স্বরূপটি জানাইয়া দেন। সেই স্বস্বরূপ-জ্ঞানলাভ দ্বারাই মানুষের পরমানন্দ-প্রাপ্তি ও দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই স্বরূপটি স্থূলশরীর, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি উপাধিসমূহ দ্বারা যেন আবৃত হইয়া রহিয়াছে। আমরা এই বাহ্য আবরণগুলিতেই সত্যত্ব ও আত্মত্ব বুদ্ধি করিয়া ভ্রান্ত হইয়া থাকি এবং সেইজন্য আসল বস্তুটির সন্ধান পাই না। ভগবান ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যও এই কথাই বলিয়াছেন—

'কোশৈরন্নময়াদ্যৈঃ পঞ্চভিরাত্মা ন
সংবৃতো ভাতি।
নিজশক্তিসমুৎপন্নৈঃ শৈবালপটলৈরিবাম্বু
বাপীস্থম্‌॥'

—জলাশয়স্থ শৈবালসমাচ্ছন্ন নির্মল জল যেরূপ স্পষ্ট প্রতীতি হয় না, সেইরূপ অবিদ্যোৎপন্ন অন্নময়াদি পঞ্চকোশের দ্বারা আবৃত বলিয়া জীবের স্বস্বরূপ আত্মা প্রকাশিত হন না।

'পঞ্চানামপি কোশানামপবাদে বিভাত্যয়ং শুদ্ধঃ।
নিত্যানন্দৈকরসঃ প্রত্যগ্রূপঃ পরঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ॥'

—বিচারের দ্বারা পঞ্চকোশ অনিত্যবুদ্ধি-পূর্বক পরিত্যক্ত হইলে শুদ্ধ নিত্য আনন্দৈকরস প্রত্যগাত্মা স্বতই প্রকাশিত হন।

বিচারই আত্মজ্ঞানলাভের মুখ্য সাধন। বর্তমান প্রবন্ধে পূর্বোক্ত পঞ্চকোশবিষয়ক বিচার মুমুক্ষু সাধককে কিরূপে ক্রমে তত্ত্বজ্ঞানলাভে সহায়তা করে, তাহাই আমরা আলোচনা করিব।

কোশ অর্থ আচ্ছাদক; যেমন অসির খাপ, গুটিপোকার গুটি ইত্যাদি। খাপ যেরূপ অসিকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে, সেইপ্রকার পঞ্চকোশও আত্মার স্বরূপকে ঢাকিয়া রাখে। এইজন্য ইহাদের 'কোশ' এই নাম দেওয়া হইয়াছে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়—ইহারাই পঞ্চকোশ এবং যথাক্রমে একটি অপরটির অভ্যন্তরে বিদ্যমান।

স্থূল শরীরকেই অন্নময় কোশ বলে। পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়-সহ পঞ্চপ্রাণ প্রাণময় কোশ নামে কথিত হয়। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-সহ মন মনোময় কোশ নামে অভিহিত। পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়-সহ বুদ্ধিই বিজ্ঞানময় কোশ নামে প্রসিদ্ধ এবং অজ্ঞান বা কারণ শরীরই আনন্দময় কোশ।

অন্নময় কোশই স্থূল শরীর। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় এই কোশত্রয় দ্বারা সূক্ষ্ম শরীর গঠিত এবং আনন্দময় কোশেই কারণ শরীর অবস্থিত। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই শরীরত্রয় মধ্যেই পঞ্চকোশ বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। অতএব শরীরত্রয় বিচার করিলেও পঞ্চকোশেরই বিচার করা হয়। জীবের যথার্থ স্বরূপ এই পঞ্চকোশের দ্বারা আবৃত। বিবেকী সাধক বিচারের দ্বারা পঞ্চকোশাতীত স্বস্বরূপে স্থিত হন। সেই বিচারের বিষয় এখন বলা হইতেছে :—

১। অন্নময় কোশ :—শুক্র-শোণিত হইতে উৎপন্ন এই স্থূল শরীর অন্নের দ্বারা জীবিত থাকে এবং অন্নের অভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাকে অন্নময় কোশ বলা হয়। ত্বক্‌, চর্ম, মাংস, রুধির, অস্থি, মেদ, মল প্রভৃতির সমষ্টি এই স্থূল দেহ অর্থাৎ অন্নময় কোশ কখনও নিত্য শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা হইতে পারে না। এই শরীর জন্মের পূর্বেও থাকে না এবং মৃত্যুর পরও থাকে না। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে ইহা মাত্র অল্পকালস্থায়ী। এই দৃশ্যমান শরীর অনিত্য-স্বভাববিশিষ্ট ও ঘটপটাদির ন্যায় জড়। অতএব বিকারী এবং হস্তপদাদি যুক্ত এই শরীর আত্মা নহে। শরীরের কোন অংশ ভগ্ন হইলেও চেতন শক্তির নাশ হয় না। ঘট নাশ হইলেও যেমন ঘটাকাশ নষ্ট হয় না, তদ্রূপ শরীরের কোন অংশ ছিন্ন হইলেও চেতন শক্তির বিলোপ হয় না। চেতন শক্তির নাশ না হওয়া বশতই আত্মা এসব কাহারও অধীন নন, তিনি এসব হইতে স্বতন্ত্র। স্থূলতা, কৃশতা ইত্যাদি দেহের ধর্ম, যাবতীয় ক্রিয়াদি দেহের ; আত্মা এই সকলের দ্রষ্টা এবং স্বতঃসিদ্ধ। মলমূত্রাদি পরিপূর্ণ এবং অস্থি-মাংসাদি সঙ্কুল এই কুৎসিত শরীরে মুর্খেরাই আমি সুন্দর, আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি বা আমার এই দেহ – এইরূপ বুদ্ধি করিয়া থাকে। বিচারশীল বিবেকী ব্যক্তি কিন্তু স্বস্বরূপ আত্মাকে নিন্দিত এই দেহ হইতে সর্বদা পৃথকরূপেই অবগত হইয়া থাকেন। অজ্ঞব্যক্তির 'আমি দেহ' এইরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের দেহাদি উপাধিযুক্ত জীব-চৈতন্যে 'আমি' এইরূপ বুদ্ধির উদয় হয়। আর বিবেক-বিচারবানের 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। জলে বা দর্পণে প্রতিবিম্বিত শরীরে, স্বপ্নদৃষ্ট শরীরে এবং মনে মনে কল্পিত শরীরে যেরূপ কাহারও কখনও 'আমি' বা 'আমার' এইরূপ বুদ্ধি হয় না, সেইরূপ এই প্রত্যক্ষ স্থূল শরীরের প্রতিও 'আমি' বা 'আমার' এইরূপ বুদ্ধি না হওয়াই উচিত। দেহাত্মবুদ্ধিই জন্মমরণাদি যাবতীয় দুঃখ-প্রাপ্তির মূল কারণ।

২। প্রাণময় কোশ ঃ—এই কোশটি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণবায়ুর সমষ্টি। অন্নময় কোশের অভ্যন্তরে এই প্রাণময় কোশটি অবস্থিত। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ কার্যে প্রাণময় কোশ নিযুক্ত থাকে। এইজন্য প্রাণময় কোশ ক্রিয়া-শক্তিযুক্ত কার্যরূপ হইয়া থাকে। অন্নময় কোশে বলাধান করতঃ ইন্দ্রিয়দিগকে স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত করানোই প্রাণময় কোশের স্বভাব ও কার্য। এই কোশটিও আত্মা নয় কারণ প্রাণবায়ুও ঘটের ন্যায় জড়, সর্বদা পরাধীন এবং নিজকে বা অপরকে এবং ভালমন্দ কোন কিছুকেই জানিতে সক্ষম নহে।

৩। মনোময় কোশঃ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়-সহ মনই মনোময় কোশ। এই কোশটি প্রাণময় কোশের অভ্যন্তরে বিরাজমান। মনোময় কোশ হইতেই 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি ভেদকল্পনার উদয় হয়। নামরূপাদি ভেদকল্পনা সমন্বিত বলবান এই মনোময় কোশ উক্ত প্রাণময় কোশকে পরিপূর্ণ করিয়া নিজে প্রকাশিত হয়। হোমের প্রজ্বলিত অগ্নি যেরূপ অভীষ্ট ফল প্রদান করে, সেইরূপ এই মনোময় কোশও সংসাররূপ ফল প্রদান করে এবং ইহাই সংসারবন্ধনের কারণ। এই মন নষ্ট হইলে সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। এই মন জাগ্রত থাকিলেই জগৎ প্রতীত হইয়া থাকে। মনরূপ অবিদ্যাই সংসারবন্ধনের হেতু। মনের অতিরিক্ত কোন অবিদ্যা নাই। স্বপ্নাবস্থায় কোন বাহ্য পদার্থ থাকে না কিন্তু সেখানে মনই স্ব শক্তি সহায়ে বিচিত্র ভোগ্য পদার্থসমূহ ও

ভোক্তা প্রভৃতি সৃজন করিয়া থাকে। স্বপ্নের ন্যায় জাগ্রৎকালে দৃষ্ট পদার্থসকলও মনেরই সৃষ্টি। ইহাতে কোন বিশেষতা নাই। জাগ্রৎ ও স্বাপ্ন পদার্থসমূহ সবই মনের বিলাস মাত্র। সুষুপ্তি-কালে মন যখন বিলীন হইয়া যায় তখন আন্তর বা বাহ্য জগতের কোন চিহ্নও থাকে না। ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। অতএব আপাত-রমণীয় অসার এই জগৎ মনেই উদয় হয় ও মনেই বিলীন হয়; ইহা মনেরই একটি কল্পনা মাত্র। বস্তুতঃ ইহার কোন সত্যতাই নাই। বায়ুদ্বারা আনীত মেঘ যেরূপ বায়ুদ্বারাই বিলীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মনদ্বারাই বন্ধন কল্পিত হয় এবং বন্ধননিবৃত্তি অর্থাৎ মোক্ষও মনই কল্পনা করিয়া থাকে। মনই দেহাদি সর্ববিষয়ে আসক্তি উৎপাদন করতঃ মনুষ্যকে ঐ আসক্তিরূপ রজ্জু সহায়ে পশুর ন্যায় বন্ধন করিয়া থাকে। আবার এই মনই উক্ত দেহাদি সর্বপদার্থে বৈরাগ্য উৎপাদন করতঃ ভাগ্যবান কোন মানব-হৃদয়ে মোক্ষলাভের ইচ্ছা ও আত্মজিজ্ঞাসার উদ্রেক করিয়া দেয়। মনই জীবের বন্ধন ও মোক্ষ বিধায়ক। রজঃ ও তমোগুণযুক্ত মলিন মনই বন্ধনের হেতু এবং রজঃ ও তমোগুণরহিত শুদ্ধ পবিত্র মনই মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে। যথার্থ বিবেক-বৈরাগ্যোদয়ে জিজ্ঞাসুর মন শুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে বিচার-সহায়ে তত্ত্বজ্ঞানলাভ-দ্বারা মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। বৈরাগ্যবান সাধক সযত্নে মনকে পরিশুদ্ধ করতঃ করতলস্থ ফলের ন্যায় নিঃসন্দিগ্ধরূপে মোক্ষলাভে ধন্য হইয়া থাকেন।

এই মনোময় কোশও আত্মা নহে, কারণ ইহা পরিণামী, আদি ও অন্তবান, দুঃখরূপ এবং দৃশ্য। দ্রষ্টা আত্মা কখনও দৃশ্যরূপ হইতে পারে না। অন্নময় কোশে 'আমি' 'আমার' এইরূপ বুদ্ধি উৎপাদন করা এবং ইন্দ্রিয়-সহায়ে বহির্গমনপূর্বক গৃহ-ধনাদিতে অভিমান করা মনোময় কোশের স্বভাব ও কার্য। মনোময় কোশটি ইচ্ছাশক্তিযুক্ত করণরূপ হয়। এই কোশটিও আত্মা হইতে পারে না।

৪। **বিজ্ঞানময় কোশ**:— বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বুদ্ধি। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়-সহ বুদ্ধি বিজ্ঞানময় কোশ নামে অভিহিত। মনোময় কোশের অভ্যন্তরে এই কোশটি বিদ্যমান। এই কোশটি জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন ও কর্তৃরূপ হয়। বুদ্ধি ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান চৈতন্যের প্রতিবিম্বযুক্ত ও প্রকৃতির বিকার এবং জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিমান এই বিজ্ঞানময় কোশটিই 'আমি আছি' 'আমি কর্তা' এইরূপ নিরন্তর অভিমান দেহান্দ্রিয়াদিতে করিয়া থাকে। এই 'আমি'-অভিমানযুক্ত বিজ্ঞানময় কোশই অনাদি জীব এবং অনাদি সংসারের সর্বব্যবহারের কর্তা। বাসনাতাড়িত এই কোশটিই পাপপুণ্য প্রভৃতি বিবিধ কর্ম করিয়া থাকে এবং তাহার সুখদুঃখাদি ফলভোগী হয়। কর্মফলানুযায়ী এই কোশটিই মনুষ্যাদি নানা শরীরে প্রবেশ করে; স্বর্গনরকাদি নানা লোকে গমনাগমন ইহারই হয়। বিজ্ঞানময় কোশই জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি —এই অবস্থাত্রয় অনুভব করিয়া থাকে। আত্মার অত্যন্ত সমীপতাবশতঃ প্রকাশময় হইয়া এই বিজ্ঞানময় দেহাদি সম্বন্ধ প্রযুক্ত 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি অভিমান সর্বদা করিয়া থাকে।—এই সমস্তই আত্মার উপাধি। বিজ্ঞান-ময় কোশেরও অভ্যন্তরে সমস্ত ইন্দ্রিয়-প্রাণাদিরও প্রকাশকরূপে যিনি বিদ্যমান, তিনিই চৈতন্যস্বরূপ কূটস্থ আত্মা। উপাধি সহযোগে ভ্রান্তিবশতই এই নির্বিকার আত্মা কর্তা ভোক্তা রূপে প্রতীত হন। ভ্রান্তিবশতই তিনি যেন মিথ্যা বিজ্ঞানময় কোশসহ একীভাব প্রাপ্ত হইয়া পরিচ্ছিন্ন হইয়া যান, এইরূপ মনে হয়।

উপাধিসহ সম্বন্ধবশতই তিনি উপাধিগুণের সহিত তত্তদ্রূপে প্রতিভাত হন। যেমন নির্বিকার অগ্নি লৌহরূপ উপাধির সহিত মিলিত হইয়া লৌহাকারে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ। মলিন জল যেরূপ পঙ্কনির্মুক্ত হইয়া নির্মালাকার ধারণ করে, অবিদ্যাদি উপাধি-দোষসমূহও তদ্রূপ বিচার সহায়ে অপসারিত হইলে আত্মা স্বকীয় শুদ্ধরূপে প্রতিভাত হন। কামনা-বাসনার আশ্রয় এই বিজ্ঞানময় কোশটি দেশকালাদি-দ্বারাও পরিচ্ছিন্ন।

সুষুপ্তিকালে বিজ্ঞানময়ের প্রতীতি হয় না। উহা তৎকালে অজ্ঞানে বিলীন হইয়া যায়, জাগ্রদবস্থায় কেবল উহা কর্তারূপে অবস্থান করে। অন্তঃকরণরূপে মন ও বুদ্ধি এক ও অভিন্ন হইলেও বিজ্ঞানময় কোশ অন্তরে কর্তা-রূপে পরিণত হয় এবং মনোময় কোশ করণরূপে বিকারপ্রাপ্ত হয়। ইহাই উভয় কোশের বৈলক্ষণ্য। মনোময়ের সহিত বিজ্ঞানময় কর্ম করিয়া থাকে। অন্তঃকরণ ও আত্মা অভিন্নরূপে প্রকাশিত হইলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট ভিন্নতা রহিয়াছে। সুষুপ্তিসময়ে অন্তঃকরণ অজ্ঞানে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু তখন অজ্ঞানের সাক্ষীরূপে আত্মা প্রকাশিত থাকেন। অতএব এই বিজ্ঞানময় কোশটিও আত্মা নহে।

৫। **আনন্দময় কোশ:**—জীবের কারণ-শরীরই আনন্দময় কোশ নামে খ্যাত। আনন্দ-স্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্বযুক্ত এবং অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন যে সূক্ষ্মা বৃত্তি, তাহাই আনন্দময় কোশ। প্রিয়, হর্ষ, প্রমোদ প্রভৃতি অন্তঃকরণের ভাব-সমূহকেও আনন্দময় কোশ বলা যাইতে পারে।

এই কোশটি প্রিয়, মোদ, প্রমোদ গুণযুক্ত হইয়া থাকে। কোন অভীষ্ট বস্তু দর্শনে যে আনন্দ তাহাকে 'প্রিয়' বলে। অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্তিজনিত আনন্দ 'মোদ' নামে কথিত হয়। অভীষ্ট বস্তুপ্রাপ্তির অনন্তর তদ্‌ভোগজনিত আনন্দকে 'প্রমোদ' বলে। আনন্দময় কোশেরই এই তিন প্রকার আনন্দবৃত্তি হইয়া থাকে। অভীষ্ট বস্তুপ্রাপ্তি হইলেই এই আনন্দময় কোশ প্রকাশিত হয় এবং এই কোশের দ্বারাই জীব আনন্দিত হয়। এই আনন্দময় কোশ বিজ্ঞানময় কোশেরও অভ্যন্তরে অবস্থিত। কারণশরীর-রূপী অবিদ্যার মলিন সত্ত্বগুণ প্রিয়-মোদাদি বিশেষ সুখের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দময় কোশরূপ ধারণ করে—সংক্ষেপে এইরূপও বলা যাইতে পারে।

এই কোশটিও বিকারী, ক্ষণস্থায়ী, অতএব আত্মা নহে। ইহারও প্রকাশকরূপে বিম্বভূত যে চৈতন্য বিদ্যমান, তিনিই প্রত্যগাত্মা (সর্বাভ্যন্তর আত্মা)। অন্নময় কোশ হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময় কোশ পর্যন্ত সমস্ত পদার্থই দৃশ্য, অনুভবের বিষয়, অতএব মিথ্যা—এই বুদ্ধিতে ত্যাগ করিলে অবশেষ কিছুই রহিল না, যেন সর্বশূন্য হইয়া গেল, এইরূপ মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা নহে। যে চৈতন্য দ্বারা পঞ্চ-কোশের ভাব ও অভাব অনুভূত হয়, তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যিনি সকলকে প্রকাশ করিতেছেন, যাঁহাকে অন্য কেহ প্রকাশ করিতে পারে না—তিনিই স্বপ্রকাশ, পঞ্চ-কোশাতীত, সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম।

এইরূপ বিচার-সহায়ে যে মুমুক্ষু সাধক পঞ্চকোশ হইতে আত্মাকে পৃথকরূপে নিরূপণ করিয়াও সেই আত্মাতেই দৃশ্যসমূহ বিলয়করতঃ আত্মভাবে অবস্থান করেন, তিনিই মুক্ত। লাল, নীল প্রভৃতি বর্ণের বস্তুর সহিত সম্বন্ধবশতঃ শুদ্ধ স্ফটিক যেমন লাল, নীল প্রভৃতি বর্ণযুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হয়, শুদ্ধ আত্মাও তদ্রূপ আবিদ্যক সম্বন্ধবশতঃ তত্তৎ কোশাকারে প্রতীয়মান হন। উক্তম বিচারই

পঞ্চকোশের সহিত ভ্রান্তিবশতঃ মিলিত আত্মাকে পৃথক করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। পঞ্চকোশের বিচারে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীরের বিচারও পরিসমাপ্ত হইয়া যায়।

পঞ্চকোশ হইতে আত্মাকে পৃথক করিয়া লইবার উপায়ের নাম বিচার। পূর্বোক্ত বিচার-সহায়ে বিবেকী সাধক হৃদয়ঙ্গম করেন যে, এই কোশপঞ্চকের বাস্তবিক নিজের কোন সত্তা নাই। ইহারা সাক্ষিচৈতন্যের সত্তায় সত্তাবান; সাক্ষিচৈতন্যের আভাসে আভাসিত হইয়া নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করে। অতএব আমি কখনও পঞ্চকোশযুক্ত বিকারী শরীর হইতে পারি না। আমি কোশসমূহের তথা জাগ্রদাদি অবস্থাসকলের অধিষ্ঠান-দ্রষ্টা-সাক্ষীরূপে সদা বিদ্যমান। শরীরের পরিণামে আমি কখন পরিণাম প্রাপ্ত হই না। তাদাত্ম্য বা ভ্রমবশতঃ আমাতে শরীর ও শরীরের ধর্মসমূহ আরোপিত হয় মাত্র। এইরূপে সুচিন্তা সুবিচারের দ্বারা সাধকান্তঃকরণবৃত্তি সাক্ষ্যাকারাকারিত হইয়া অবস্থান করে। অন্তঃকরণবৃত্তির স্বভাবই এইরূপ যে, যাহাই বৃত্তির বিষয় হইবে বৃত্তি তাহাই গ্রহণ করিবে। অর্থাৎ বৃত্তি তদাকারাকারিত হইয়া যাইবে।

যেমন নায়িকার চিন্তায় নায়কের মনোবৃত্তি নায়িকাকারে আকারিত হইয়া যায়। যেমন শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় গোপীগণের চিত্তবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণাকারে পরিণত হইয়া যাইত। যেমন কাঁচপোকার চিন্তায় তেলাপোকার চিত্ত কাঁচপোকার আকার ধারণ করে। যেমন সুখ-দুঃখের চিন্তায় মানবান্তঃকরণবৃত্তি সুখদুঃখাকার প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ পঞ্চকোশের চিন্তা-বিচারের দ্বারা সাধকান্তঃকরণবৃত্তি পঞ্চকোশের অধিষ্ঠান-সাক্ষী আকারে আকারিত হইয়া অবস্থান করে। অর্থাৎ নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞানোদয় হয়। ইহাকেই বৃত্তিজ্ঞান বলে। এই বৃত্তিজ্ঞানে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়, সমস্ত সংশয় বিনষ্ট হয়, সর্ব কর্মবন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সাধক সদ্য-মুক্তিলাভ করেন।

সাক্ষীর জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। এই জ্ঞানে সাধকের অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায় ও তিনি স্বস্বরূপে অবস্থান করেন। ভগবান শঙ্করাচার্যও বলিয়াছেন—

'সত্যানন্দস্বরূপং ধীসাক্ষিণং বোধবিগ্রহম্।
চিন্তয়াত্মতয়া নিত্যং ত্যক্ত্বা দেহাদিগাং ধিয়ম্॥'

দেহাশ্রিত বুদ্ধিকে পরিত্যাগ করিয়া যিনি সত্য ও আনন্দস্বরূপ, বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী এবং চৈতন্যময়, তাঁহাকেই সর্বদা আত্মা বলিয়া চিন্তা কর।

এখানে জীবসাক্ষী পরিচ্ছিন্ন হইলেও ব্যাপক ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। কেননা ঘটাকাশ পরিচ্ছিন্ন হইয়াও মহাকাশ হইতে ভিন্ন নয়; মহাকাশরূপই হয়। তদ্রূপ পরিচ্ছিন্ন জীব-সাক্ষীও ব্রহ্মস্বরূপই হন। অতএব সাক্ষীর জ্ঞানে ব্রহ্মস্বরূপেরই জ্ঞান হইয়া থাকে। তথাপি বিচার-দৃষ্টিতে অবলোকন করিলে পরিচ্ছিন্ন অন্তঃকরণো-পহিত সাক্ষীচৈতন্যের জ্ঞান যেন একটু পরিচ্ছিন্ন অব্যাপকের মত অবধারিত হয়। সুতরাং এই পরিচ্ছিন্ন সাক্ষীর জ্ঞান এবং অপরিচ্ছিন্ন ব্যাপক ব্রহ্মের জ্ঞান এক অভিন্ন হইতে পারে না। এইরূপ শঙ্কা হওয়ায় ভগবান শঙ্করাচার্য স্বয়ং পরিষ্কার করিয়া বলিলেন—

'তং চাপি পূর্ণাত্মনি নির্বিকল্পে বিলাপ্য
শান্তিং পরমাং ভজস্ব॥'

সেই সাক্ষীকেও কল্পনারহিত অপরিচ্ছিন্ন ব্যাপক পরমাত্মাতে (পরব্রহ্মে) লয় করিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হও।

শ্রুতি-অনুকূল বিচারের এমনি প্রভাব যে, তাহার সম্মুখে কিঞ্চিন্মাত্রও দ্বিধা সন্দেহ থাকিতে

পারে না। দৃঢ় বিচারের দ্বারাই অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন হইয়া স্বস্বরূপাববোধ হয়। অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—'দিবাকরের প্রকাশ ব্যতীত যেমন জাগতিক পদার্থের জ্ঞান হয় না, সেইরূপ বিচার বিনা অন্য কোন প্রকার সাধনের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না।'

উক্তপ্রকার পঞ্চকোশের সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা সাধকের অনুভূতি হয় যে, প্রতিটি কোশ অচেতন হইয়াও অহংরূপ চৈতন্যসত্তায় প্রতিভাসিত হইয়া স্ব স্ব কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। এই স্বানুভবপ্রভাবেই জ্ঞানী স্পষ্টরূপে ঘোষণা করেন—

'ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ময়ি সর্বং লয়ং যাতি তদ্ ব্রহ্ম চৈবাহমস্মি॥'

আমাতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, আমাতেই সকল অবস্থান করে, আমাতেই সমস্ত লয় হইয়া যায়—আমিই হইতেছি সেই ব্রহ্ম।

বিবেকী ব্যক্তি পঞ্চকোশাত্মক ত্রিবিধ শরীরাধিষ্ঠান নিজ স্বরূপানন্দানুভব করিয়া কৃতার্থ হন, মনুষ্যজন্ম সার্থক করেন। নিজ স্বরূপসুখানুভূতির জন্যই এই দুর্লভ মানবদেহধারণ; ইন্দ্রিয়জনিত ভোগসুখের জন্য নহে। যাঁহারা এই দুষ্প্রাপ্য মনুষ্যশরীর প্রাপ্ত হইয়া নিজ স্বরূপসুখানুভবের জন্য যত্ন চেষ্টা করেন না, তাঁহাদের জীবন অজাগল স্তনের ন্যায় নিরর্থক। তাঁহারা শুধু মাংসপিণ্ড বহনপূর্বক বৃথাই জীবনধারণ করিয়া থাকেন।

ফাল্গুনে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আবার বসন্ত এলো জীবন-প্রাঙ্গণে
বাতাবির গন্ধ ল'য়ে আতপ্ত পবনে!
কোকিলের কণ্ঠ শুনি সেই পুরাতন!
পুষ্পিত শিমুলে রাঙা সেই তো কানন!
অরণ্য মুখর হোলো কল-কাকলিতে!
'যাই যাই' ধ্বনি শুনি কুন্দের কলিতে!
কাঞ্চনের ঝরা-ফুলে আকীর্ণ ধরণী!
আমিও ঝরিয়া যাবো! তখনো এমনি
নয়ন করিবে তৃপ্ত 'বুগেন ভিলিয়া'!
উতলা দখিনা-বায়ু কাহারে খুঁজিয়া
এমনি ফিরিবে বন হ'তে বনান্তরে।
'চোখ গেল' পাখী কাঁদে আজি দ্বিপ্রহরে!
সেদিনও কাঁদিবে পাখী আজিকে যেমন!
আমি যাই! তুমি থাকো সুন্দর ভুবন!

স্পিতম জরথুষ্ট্র*

জে. কে. ওয়াডিয়া

প্রাগৈতিহাসিক আর্যজাতির কাহিনী ঘন-কুয়াসাচ্ছন্ন। যেটুকু প্রত্নতাত্ত্বিকগণের আয়াসে এবং প্রাচীন পুরাণাদি হইতে উদ্ধার করা সম্ভব, তাহাও অতি সামান্য এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রাহ্য নহে। বহু পণ্ডিতের বহু মত। তবুও অভেস্তায় যেটুকু লিপিবদ্ধ আছে তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, অর্-ইয়ন-ওয়েজ বা অবিভক্ত আর্যজাতির বাসভূমি ছিল শীত-প্রধান দেশ। সে দেশের বর্ণনা আছে—বৎসরের নয় মাস শুভ্র তুষারমণ্ডিত শীতকাল, মাত্র তিনমাস গ্রীষ্ম। আর্যগণ পশুচারণ করিতেন এবং এই সকল গৃহপালিত পশুই তাঁহাদের সম্পদরূপে গণ্য হইত। ফলে পশু-চারণের উপযুক্ত ভূমি অন্বেষণে তাঁহারা সতত স্থান পরিবর্তন করিতেন। প্রকৃতপক্ষে এই কালে তাঁহারা একপ্রকার যাযাবর জীবন যাপন করিতেন, জীবনধারণের জন্য প্রকৃতির খেয়ালের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইত। সুতরাং ক্রমে তাঁহারা প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে প্রকৃতির উপাসনায় প্রবৃত্ত হন।

কালে আর্যগোষ্ঠী সংখ্যাবৃদ্ধি ও অন্তর্কলহ ইত্যাদি কারণে বিভক্ত হইয়া যায়। একটি শাখা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া বর্তমান ইরাণ দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। ক্রমে আর্য সমাজে বহু পরিবর্তন ও সংস্কার সাধিত হয়। স্পিতম জরথুষ্ট্রের আবির্ভাবের পূর্বে এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হয়। ততদিনে আর্যগণ সমাজজীবনে অভ্যস্ত হইয়াছেন। জরথুষ্ট্রের কৌলিক নাম স্পিতম।

অভেস্তার পাঁচটি গাথার মধ্যে প্রথম গাথা অহুনবৎ-এর প্রারম্ভে উল্লেখ আছে যে একদা ইরাণ দেশ অনাচার ও ব্যভিচারে পূর্ণ হইয়া উঠিলে পাপভারে জর্জরিতা ধরিত্রী ঈশ্বরের নিকট স্বীয় মর্মবেদনা জ্ঞাপন করেন। দুর্নীতিমোচনে এবং ধরিত্রীর দুঃখলাঘবে একমাত্র সক্ষম জরথুষ্ট্রের আবির্ভাবের ইহাই হেতু।

এই দেবমানবের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে বহু বিরুদ্ধ মত বর্তমান। প্রধান গ্রীক লেখকগণের মতে জরথুষ্ট্রের আবির্ভাবকাল তাঁহাদের (লেখকদের) সমকালের কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে তিনি খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক। কতিপয় পারস্য দেশীয় পণ্ডিত উভয় মতই অগ্রাহ্য করেন। তাহাদের মতে জরথুষ্ট্রের আবির্ভাব কাল খৃঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দী।

অভেস্তা-বিশারদ পণ্ডিতগণ 'জরথুষ্ট্র' শব্দের অর্থ 'সোনালী আলো' বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার জন্মস্থান বা-এ। তাঁহার পিতার নাম পৌরুশস্প, মাতার নাম ডগদো। তাঁহার বাক্যকাল সম্বন্ধে পৌরাণিক ধর্মাচার্য বা মহাপুরুষের ন্যায় একই প্রকার কাহিনী বর্তমান। যেমন, জন্মমাত্র তাঁহাকে হত্যা করার বহু প্রয়াস বিফল হয়। জন্মাবধিই তাঁহার মধ্যে দৈবীপ্রভা প্রকটিত হয়; অতি শিশু বয়সেই তিনি সম-সাময়িক জ্ঞানবৃদ্ধদিগকে জ্ঞান ও বিদ্যায় পরাজিত করেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে অন্তরে ঈশ্বরলাভের স্পৃহা প্রবল হইতে থাকে এবং পরিশেষে তিনি পারস্যদেশের সর্বোচ্চ এলবুর্জ পর্বতে নির্জনবাস

* মূল ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত।

আরম্ভ করেন। কথিত আছে যে, পর্বতোপরি বা ক্যাস্পিয়ান সাগরোপকূলে অবিরাম দশ বৎসর তপস্যা করিয়া তিনি ঈপ্সিত জ্ঞান লাভ করেন।

জ্ঞানলাভের পর ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট জরথুষ্ট্র নানাস্থানে পর্যটন করিয়া ঈশ্বরের বাণী প্রচার করিতে থাকেন। প্রথম দশ বৎসর কাল তাঁহার প্রচারকার্য বিশেষ সাফল্য অর্জন করে নাই। এমন কি তাঁহার বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা নালিশ আনিয়া তাঁহাকে রাজদ্বারে অভিযুক্ত করা হইলে শাস্তিস্বরূপ তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।

দশ বৎসর নিষ্ফল অক্লান্ত প্রচারকার্যের পরে এই দুর্ঘটনাই কিন্তু বিধির আশ্চর্য বিধানে তাঁহার সাফল্যের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। তদানীন্তন রাজা বিষ্টাস্পের একটি অতি প্রিয় অশ্ব দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইল এবং জরথুষ্ট্রকে সেই অশ্বটিকে নিরাময় করিয়া নিজ শক্তির পরিচয় দিতে নির্দেশ দেওয়া হইল; এইরূপ শর্ত রহিল যে সফলকাম হইলে তাঁহাকে রাজদরবারে অবাধ প্রচারের অধিকার দেওয়া হইবে। দৈবশক্তিতে অশ্ব ব্যাধিমুক্ত হইল এবং তিনি পুনরায় প্রচারকার্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পিতৃব্যপুত্র মেডিওমা প্রথম তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরে দেশের রানী ও রাজা উভয়েই তাঁহার শিষ্য হন। ইহার পরে অতি অল্প সময়েই সমগ্র ইরাণ দেশ তাঁহার প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করে। সেই সময়ে ইরাণ দেশ বর্তমান ইরাণ অপেক্ষা অনেক বৃহদাকার ছিল।

তাঁহার মরজীবনের শেষ দিকে ইরাণের বিরুদ্ধে তুরাণ যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইরাণে জরথুষ্ট্র ধর্ম প্রচারিত হইতেছে। এই ধর্ম যাহাতে নিজদেশে প্রবেশ না করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে নব ধর্মকে সমূলে বিনাশ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া তুরাণরাজ এই যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধের সময় তুর-বারাতুর নামক একজন তুরাণী অগ্নিমন্দিরে প্রার্থনারত অবস্থায় জরথুষ্ট্রকে নিহত করে।

জরথুষ্ট্রের মতে কিছুই মন্দ নয়; যাহাকে মন্দ বলিয়া মনে করি তাহার ভিতরকার মন্দ অংশটুকু বাদ দিলেই তা ভাল হইয়া যায়। সুতরাং তিনি বহুপ্রচলিত প্রাচীন চিন্তাধারা ও প্রথাগুলির মন্দ দিকটা বর্জন করিয়া ও আধ্যাত্মিকতামণ্ডিত করিয়া সেগুলিকে সংরক্ষণ করিয়াছেন। ইরাণে প্রকৃতির উপাসনা প্রচলিত ছিল। বহু দেবতার পূজা ছিল। তিনি কিছুই বর্জন করেন নাই। শুধু প্রকৃতির মাধ্যমে বিশ্বপতি সৃষ্টিকর্তাকে এবং দেবতার মাধ্যমে তাঁহারই বিশেষ প্রকাশকে উপাসনা করিতে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার বাণী—স্বয়ম্ভূ ও সর্বজ্ঞ বিশ্বপতি আহুর মাজদাই একমাত্র উপাস্য। জনসাধারণের পূর্বপ্রচলিত সব প্রথা এইরূপে দোষমুক্ত করিয়া তিনি রক্ষা করিয়াছেন। কি প্রকারে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরকে সূর্য, চন্দ্র, তারকা, অগ্নি, জল ইত্যাদির মাধ্যমে পূজা করা সম্ভব, জনসাধারণকে তিনি তাহাই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। সাধুব্যক্তির আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে এবং মজদ নামক দেবদূতের মাধ্যমেও কিরূপে আহুর মাজদার উপাসনা করা সম্ভব তাহাও তিনি শিক্ষা দিয়াছেন। প্রাচীন আর্যগণের কাল হইতে ইরাণীদিগের যজ্ঞসূত্র ও শুভ্র অঙ্গাবরণ পরিধানের প্রথাও তিনি বর্জন করেন নাই। জরথুষ্ট্র-ধর্মাবলম্বী পার্শীরা পশমে তৈয়ারী ৭২টি সূত্র সম্বলিত 'কুষ্টি' নামক যজ্ঞোপবীত কোমরে পরিধান করেন; তাঁহাদের পবিত্র শুভ্র অঙ্গাবরণ 'সদ্রা' নয়টি স্থানে সেলাই দ্বারা প্রস্তুত।

শুভ্রতা মানবজীবনের পবিত্রতার স্মারক এবং নয়টি সেলাই মানব সত্তার আধ্যাত্মিক,

মানসিক ও দৈহিক নয়টি কলেবরের প্রতীক। স্কন্ধের সম্মুখ দিকে যে একটি পকেট থাকে, তাহা পার্শীকে সৎকার্যে পূর্ণ করিতে স্মরণ করাইয়া দেয়। কুস্তি কোমরে তিনবার জড়াইয়া পরিধান করা হয়, কারণ ইহা মানুষকে সৎ চিন্তা, কর্ম ও বাক্য দ্বারা অসৎ চিন্তা, বাক্য ও কর্মকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ করে। নওজোত বা নবজ্যোতি উৎসবে স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে পার্শী-শিশুকে কুস্তি ও সদ্রা দেওয়া হয়। ইহা জরথুষ্ট্র ধর্মে দীক্ষিত হইবার নিদর্শন।

আহুর মাজদার প্রত্যক্ষ উপাসনা, অর্থাৎ মূর্তি বা প্রতীকের মাধ্যমে উপাসনাও জরথুষ্ট্র সমর্থন করিতেন। স্বার্থসিদ্ধির জন্য দৈবশক্তি-অর্জনের প্রচেষ্টাকে তিনি নিন্দনীয় জ্ঞান করিতেন এবং আধ্যাত্মিকতা অর্জনই একমাত্র কাম্য—ইহা জানিয়া সর্বশক্তি সেই উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত করিতে উপদেশ দিতেন। সাংসারিক লাভালাভ-জ্ঞান বর্জন করিয়া একমাত্র ঈশ্বরলাভের পথে অগ্রসর হইতে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার মতে কেবলমাত্র মানবাত্মার শুদ্ধির জন্যই সর্বশক্তি অর্জন ও নিয়োগ করা কর্তব্য; এরূপ করিলে তবেই মানব ধাপে ধাপে দেবত্বে উন্নীত হইবে এবং পরিশেষে আহুর মাজদার সহিত মিলিত হইবে। তাঁহার প্রবর্তিত পথে চলিয়া বহু শতাব্দী পর্যন্ত অগণিত জীবন মহান আলোক প্রাপ্ত হইয়াছে। ঋষিতুল্য ইরাণী মহান মাজিগণ তন্মধ্যে গণ্য।

তাঁহার বাণী শ্রবণ করিবার জন্য নিকট ও দূরদূরান্ত হইতে বহু জনসমাগম হইত। তাঁহার প্রচারের ধারা ছিল নিম্নলিখিত রূপ :

তিনি বলিয়াছেন : আমি বলিতেছি বলিয়াই আমার কথা গ্রহণ করিও না; নিজের অন্তরে সত্যের অনুসন্ধান কর। অন্তর্নিহিত সত্যের সহিত যাহা মিলিবে, তাহাই গ্রহণ কর। ইহাতে ইহাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বাহ্যপ্রভাবে প্রভাবান্বিত বিশ্বাসের দ্বারা কিছু গ্রহণ করা অপেক্ষা তিনি অন্তরের ভাব-বিকাশের এবং স্বকীয় প্রবণতা ও স্বভাব অনুযায়ী বিচারসহকারে আধ্যাত্মিকতা গ্রহণের জন্য প্রয়াস পাইতে উৎসাহ দিতেন।

স্পেণ্টামেন্যু ও এংরেমেন্যু এই যুগ্মশক্তির কথা তিনি প্রায়ই বলিতেন। সৃষ্টিরূপ দিব্য-লীলায় এই উভয় শক্তি প্রধান অংশ গ্রহণ করে। প্রথম গাথায় এই যুগ্মশক্তির কথা বিশদভাবে বর্ণিত আছে। উল্লিখিত আছে যে যখনই এই দুই শক্তির মিলন হইল, জন্ম-মৃত্যুর প্রক্রিয়া আরম্ভ হইল তখনই। এই যুগ্মশক্তির অস্তিত্ব যতদিন থাকিবে, ততদিন জন্মমৃত্যু-প্রক্রিয়া বর্তমান থাকিবে অথবা যতদিন জন্মমৃত্যুর খেলা চলিবে ততদিন দুই শক্তির ক্রিয়াও অব্যাহত থাকিবে। যেমন শক্তিদ্বয় স্বতন্ত্র জীব সৃষ্টির জন্য দায়ী, তেমনিই জীব শক্তিদ্বয়ের নিরন্তর অস্তিত্বের জন্য দায়ী।

এই দুই শক্তির মধ্যে স্পেণ্টামেন্যুকে উত্তম আখ্যা দেওয়া হয়। এই শক্তি ব্যষ্টি সত্তাকে সৃষ্টিকর্তার সহিত ও অপর ব্যষ্টি সত্তার সহিত এবং সৃষ্ট সমষ্টি সত্তার সহিত মিলিত হইবার প্রবণতা দেয়। যে সকল সৎকর্ম ও সৎচিন্তা মানবাত্মাকে এই একত্বের দিকে পরিচালিত করে তাহা ইহারই প্রকাশ। এংরেমেন্যুকে সাধারণতঃ মন্দ শক্তি বুঝায়। ইহার প্রচেষ্টা সৃষ্ট জীবকে স্রষ্টা হইতে, ব্যষ্টি জীবাত্মাকে অপর ব্যষ্টি জীবাত্মা হইতে এবং সৃষ্টির সমষ্টি সত্তা হইতে পৃথক রাখা। এই শক্তিই এক পৃথক সত্তার অস্তিত্ব ও চেতনা উদ্বুদ্ধ করে যাহার প্রধান অভিব্যক্তি 'আমি' ও 'আমার' জ্ঞান—এ অহংবোধ। ইহা দ্বারা যে সব মন্দ কার্য সম্পাদিত হয়, তাহা শুধু যে ঈশ্বর, অন্যান্য ব্যষ্টি

সত্তা বা সৃষ্ট সমষ্টি সত্তা হইতে জীবাত্মাকে পৃথক করে তাহাই নহে, জীবাত্মার প্রকৃতিগত ব্যক্তিত্ব-বোধকেও সংরক্ষণ করে। এংরেমেন্যু প্ররোচিত কর্ম ও চিন্তা জীবাত্মা ও সত্যের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া অহংকারের সংরক্ষণ, পোষণ ও বর্ধনের সহায়তা করে। ইহা স্বতঃপ্রতীয়মান যে স্পেণ্টামেন্যু ও এংরেমেন্যু সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিরূপ দিব্যাভিনয় বা লীলার যন্ত্রস্বরূপ। ইহাদের সমবেত প্রচেষ্টা সৃষ্ট জীবকে সৃষ্টিকর্তা হইতে পৃথক করিয়াও তাঁহার সহিত সম্পর্কচ্যুত হইতে দেয় না, আবার জীবকে সৃষ্টিকর্তার মধ্যে লীন হইতেও দেয় না। এইরূপ বিরুদ্ধ শক্তিদ্বয়ের সামঞ্জস্যেই লীলা চলিতেছে।

সুদূর ও অদূর অতীতে বিদেশী পণ্ডিতেরা যুগ্মশক্তির ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্পেণ্টামেন্যুতে সৃষ্টিকর্তা আহুর মাজদার রূপ ও এংরেমেন্যুতে শয়তান অহ্রিমনের রূপ আরোপিত হইয়াছে। ইহারা যেন প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে বর্তমান। ইরাণের ইতিহাস প্রাচীনতম এবং সুদীর্ঘকালব্যাপী। এই দীর্ঘকালে ইরাণ বহু উত্থানপতনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। কখনও ইরাণীরা শক্তিশালী সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছে, কখনও বা পরাধীনতার গ্লানি ভোগ করিয়াছে। বিভিন্ন কালে তাহারা বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে আসিয়া স্বকীয় কৃষ্টি দ্বারা অন্য জাতিকে প্রভাবিত করিয়াছে, আবার কখনও বা বিজাতীয় ভাবধারা তাহাদের চিন্তারাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া তাহাদের চিন্তাধারা প্রভাবান্বিত ও বিকৃত করিয়াছে। যুগল শক্তিকে ঈশ্বর ও শয়তান—এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে কল্পনা পরবর্তী যুগে বহু পরে আসিয়াছে। এই চিন্তা বহু পরবর্তী চিন্তা, বিদেশী প্রভাব দ্বারা জরথুষ্ট্রীয় সংস্কৃতিতে প্রবিষ্ট বা আনীত। জরথুষ্ট্রধর্মেতিহাসের অতি অন্ধকার যুগে বহু শতাব্দী ধরিয়া এই বিদেশী চিন্তাটি প্রচলিত প্রথার আসন লাভ করে। উপরোক্ত রূপায়ণ, বিশেষতঃ এংরেমেন্যুতে অহ্রিমন যে আমদানী করা চিন্তা ও প্রথারূপে চলিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; শাস্ত্রে ইহার কোনও ভিত্তি বা অস্তিত্ব নাই। বস্তুতঃ গাথায় বা অভেস্তায় 'অহ্রিমন' বলিয়া কোন শব্দই নাই।

জরথুষ্ট্র নিজ অন্তরেই আলোক অন্বেষণ করিতে বলিয়াছেন। তিনি মাত্র দুইটি বাসনা রাখার অনুমোদন করিয়াছেন।—ঈশ্বরদর্শন এবং দিব্যবাণী প্রচারের জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ। তিনি দেশবাসীকে ঈশ্বরপ্রেম, অনুক্ষণ ঈশ্বরচিন্তা এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতে উপদেশ দিতেন। এই একমাত্র পথ যাহাতে জীবাত্মা ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভ করিতে এবং পরিণামে তাঁহাতে লীন হইতে পারে। তিনি সৃষ্টির সর্বত্রই ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে বলিতেন এবং সকল কর্মই আহুর মাজদাকে উৎসর্গ করিতে বলিতেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে আহুর মাজদাকে সম্যকরূপে ভালবাসিতে হইলে সকল মানুষ ও প্রাণীকে ভালবাসিতে হইবে; যে অপরকে সুখী করার জন্য কর্ম করে সে নিজেই সুখী হয়; সুখ তাহারই করায়ত্ত, যে শ্রেষ্ঠ সত্যলাভের জন্য সৎপথে জীবন যাপন করে; ইহাই জরথুষ্ট্রের বাণী। তিনি বিশেষ জোরের সহিত হুমাতা (সৎচিন্তা), হুকৃতা (সৎবাক্য) ও হুভার্স্তা (সৎকর্ম) অভ্যাস করিতে বলিতেন। দুস্মাতা (কুচিন্তা), দুযুক্তা (কুবাক্য) ও দুযুভার্স্তা (কুকর্ম) পরিত্যাগ করিতে বলিতেন। তিনি ভাল ও মন্দ উভয়ে পরিণামে যে ফল প্রসব করে তাহার কথা বলিয়াছেন এবং মানবকে নিজের পথ বাছিয়া লইবার স্বাধীনতা দিয়াছেন। তবে ইহাও বলিয়াছেন, যে যেরূপ পথ বাছিয়া

লইবে, তাহার পরিণাম ভোগও তদনুরূপ হইবে নিশ্চয়।

দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার যখন পারস্য (ইরাণ) জয় করেন তখন সেখানে গাঞ্জেসাপিগান ও দাজেনাপিস্ত নামক দুইটি প্রসিদ্ধ সুবৃহৎ গ্রন্থাগার বর্তমান ছিল। অন্যান্য গ্রন্থাদির সহিত এখানে একুশখানা নাস্ক গ্রন্থ ছিল; সেগুলি হইতেছে দুই লক্ষ ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে বিধৃত জরথুষ্ট্রের বাণী। মাত্র একটি নাস্ক ব্যতীত অপর সবগুলিই বিনষ্ট হইয়াছে। এই নাস্কে গাথা আছে। আলেকজাণ্ডার সুরাপানে উন্মত্ত অবস্থায় এক প্রণয়িনীর মনোরঞ্জনের জন্য গ্রন্থাগার দুইটি ভস্মীভূত করিতে আদেশ দেন। একটি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়। অন্যটি হইতে মহামূল্যবান কিছু পুস্তক গ্রীক পণ্ডিতগণ উদ্ধার করিতে সক্ষম হন এবং তাঁহাদের দেশে লইয়া যান। পারস্যবিজয়ের ফলে ইরাণীরা শুধু যে পরাধীন হয় তাহাই নহে, তাহাদের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ, বহুকাল ধরিয়া সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারও হারায়।

সুদীর্ঘকালব্যাপী গৌরবময় ইরাণের ইতিহাসের শেষ রাজবংশ হইল সাসানীয় বংশ। যখন সাসান প্রদেশের বাবক আর্দেশীর শেষ পার্থিয়ারাজকে পরাজিত করিয়া ২২৪ খৃষ্টাব্দে এই সাসানীয় রাজবংশের শাসন প্রবর্তিত করে, সেই সময় জরথুষ্ট্রীয় ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়। মহান অভেস্তা সাহিত্যের অবশিষ্টাংশ সংগ্রহ করিয়া একটি গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়। এই গ্রন্থ অদ্যাবধি খুর্দে অভেস্তা নামে পরিচিত। খুর্দে অর্থ মূল বিষয়ের ভগ্নাংশ। তৎকালীন পারস্য দেশের প্রচলিত পহল্লভি ভাষাতে ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা জেন্দ-অভেস্তা নামে খ্যাত।

জরথুষ্ট্র-বাণী অধিকাংশ বিনষ্ট হইলেও যতটুকু পাওয়া যায়, তাহা হইতেই প্রকৃত সত্যান্বেষীর দৃষ্টিতে জরথুষ্ট্র এক মহান ধর্মপ্রচারক বলিয়া প্রমাণিত হন। পৃথিবীর এক বিরাট অংশের ইচ্ছাকৃত কঠিন উপেক্ষা সত্ত্বেও একথা স্থিরনিশ্চয়ে বলা যায় যে পরবর্তীকালে পৃথিবীতে যে সকল মহান ধর্মাচার্যগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, জরথুষ্ট্র তাঁহাদেরই সমপর্যায়ভুক্ত। যাহারা তাঁহাকে যথার্থ আন্তরিকতার সহিত অন্বেষণ করিবে, তাহাদের উপর তাঁহার আশীর্বাদ অকৃপণহস্তে বর্ষিত হইবেই। এখনও তাঁহার বাণী ও শিক্ষা ভক্ত ও সত্যান্বেষীকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে আলোর সন্ধান দিতে সক্ষম।

[কালের কঠোর পরিহাসে ও ভাগ্যের বিড়ম্বনায় ইরান দেশে জরথুষ্ট্র ধর্ম প্রায় বিলুপ্ত। জরথুষ্ট্র-ধর্মাবলম্বিগণ বহুশতাব্দী পূর্বে বিধর্মীর অমানুষিক অত্যাচারে ধর্মরক্ষামানসে স্বদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। বর্তমানে সকল ধর্মাবলম্বীর আশ্রয়দাতা উদার ভারতে প্রবাসী মুষ্টিমেয় পার্শী-নামধেয় নরনারীই জরথুষ্ট্রের প্রধান অনুগামী। বর্তমানে ইহারাই জরথুষ্ট্র ধর্মের অলোকবর্তিকা প্রদীপ্ত রাখিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, যে ধর্মে সত্য আছে তাহা অত্যাচারে বিনষ্ট হয় না। জরথুষ্ট্র ধর্ম এই কথার সত্যতার প্রমাণ।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বর্তমান পরিস্থিতি

অধ্যাপক শ্রীসুজয়গোপাল রায় পোদ্দার

(পূর্বানুবৃত্তি)

নিবন্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচ্য হলো বর্তমান জীবন-পটভূমিকায় এই ধর্মের মূল্য নির্ধারণ করা। বর্তমান জগৎ ও জীবনের দিকে তাকালে আমাদের চোখে যে ছবি ভেসে ওঠে সেটা খুবই মর্মান্তিক। সর্বত্রই হাহাকার ও অশান্তি—সুখও যেন আজ সুখ বলে মনে হয় না—বিজ্ঞানের জয়যাত্রা যেন আশীর্বাদের বদলে অভিশাপই বর্ষণ করে চলেছে; মানুষ আজ একটা বড় রকমের অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করছে; একটুখানি ভুল বা খামখেয়ালীর ফলে সমগ্র মানবসমাজ পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। এ সবই সত্য। সঙ্গে সঙ্গে এটাও সত্য যে মানুষ এমন বাঁচা বাঁচতে চায় না; মানুষ চায় সুখ, শান্তি ও আনন্দ। তাই তো শুনি দেশে দেশে নন্দিত হচ্ছে শান্তি, মৈত্রী ও সাম্যের বাণী। এতো গেল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা। স্বদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার দিকে তাকালেও একই ছবি ভেসে ওঠে। ঘরে বাইরে সঙ্কটের সম্মুখীন। মানুষ কত আয়াস স্বীকার করছে একটুখানি সুখ, একটুখানি আনন্দ, একটু-খানি শান্তি লাভের জন্য; কিন্তু কই, মানুষের সব শ্রম যেন ব্যর্থ হতে চলেছে। যদিও বা কোন সময় আমরা একটা সুখের নীড় বেঁধে থাকি কিন্তু পর মুহূর্তেই সেই সুখনীড় দুঃখের ঝড়ে কোথায় যে উড়ে যায় তা আমরা টেরও পাই না। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক, বৌদ্ধিক এমনকি অনুভূতির জগতেও যেন আজ একটা বড়রকমের বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। সমগ্র দেশ আজ ভেজালে ছেয়ে গেছে। এ ভেজাল তো থাকবেই; কারণ সব ভেজালের মূলে যে ভেজাল সে সম্বন্ধে আমরা তাৎপর্যপূর্ণভাবে সচেতন নই; সেটা হচ্ছে মানুষে ভেজাল, যাকে অনেক সময় character crisis নামেও অভিহিত করা হয়। মানুষে ভেজাল যেদিন দূর হবে সেদিন অন্য সব ভেজাল আপনা আপনি সরে পড়বে। এ ভেজালের কি কোন ওষুধ নেই? আছে। এতক্ষণ যে ধর্মকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমরা আলোচনা করেছি সেই ধর্মই হচ্ছে মানুষে ভেজাল দূরীকরণের একমাত্র কার্যকরী মহৌষধ। আমরা যদি সংকল্প সহকারে যথার্থ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জগতের দিকে তাকাই তাহলে হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, নিন্দা, ভয়, হতাশা এসব কিছুই আমাদের জীবনকে বিষিয়ে তুলতে পারবে না। যথার্থ ধর্ম এবং হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী এবং আমরা জানি পরস্পরবিরোধীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান একেবারেই অসম্ভব। উদার ও বলিষ্ঠ ধর্মবোধ আত্মবিস্মৃত জাতিকে আবার আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করে তুলবে—মানুষ আবার জানতে সুরু করবে জগৎজুড়ে নিজের পরিচয়। কবির কথায় সেও হয়তো তখন গেয়ে উঠবে—

"তোমার মাঝে পেলাম খুঁজে
আমার পরিচয়,
আমার ভুবন তাইতো আজি
এমন মধুময়।"

আগেই আমরা দেখেছি যথার্থ ধর্ম শেখায়—ভেদ মিথ্যা, অভেদই সত্য। সবই যে আমি। সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় আমি তো আর আমাকে আঘাত করতে পারি না, ভালবাসতে পারি শুধু। যতদিন 'আমি-তুমি-সে' এই ভেদজ্ঞান সচল থাকবে ততদিন আমাকে ভালবাসতে গিয়ে তোমাকে আঘাত হানবোই, আমার কল্যাণ তোমার অকল্যাণ যোগাবেই। আমরা যখন অনেক সময় প্রিয়জনের জন্য বিভিন্ন রকমের ত্যাগ স্বীকার করি, এমনকি নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিই, তখন আমাদের মনে যে ধারণা বলবতী থাকে সেটা হচ্ছে—আমার প্রিয়জন আমা থেকে আলাদা কেউ নয়—আমিই সে, সে-ই আমি। আমাদের উপনিষদেও একথা সুন্দরভাবে ঘোষিত হয়েছে। 'ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।' 'ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।' পতি বলেই পত্নী পতিকে ভালবাসেন না, পতির মাঝে পত্নী নিজেকে দেখেন বলেই পতিকে ভালবাসেন। ঠিক তেমনি স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসেন স্ত্রী বলে নয়, স্ত্রীর কায়ায় নিজের ছায়া দেখতে পান বলেই স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসেন। একথাটাকে আমরা আমাদের সমস্ত প্রিয় বস্তুর বেলাতেই প্রয়োগ করতে পারি। সুতরাং যে মুহূর্তে 'আমি-তুমি-সে' এই তিন মিলে এক হয়ে যাবে, সেই মুহূর্ত থেকে জগতের সমস্ত কালো আলোয় রূপান্তরিত হবে। আর তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যকারের সাম্য। সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতিতে ধর্মের স্থান যে সর্বোচ্চে, জীবন-সমস্যার একমাত্র সমাধান যে ধর্ম, এ বিষয়ে বুদ্ধিমানদের মধ্যে আর দ্বিমত থাকতে পারে না।

নিবন্ধের তৃতীয় ও শেষ পর্যায়ে আলোচ্য হলো—এই ধর্মবোধকে প্রাত্যহিক ব্যবহারিক জীবনে কিভাবে রূপদান করা যায়। স্বামীজী যুগপ্রয়োজন উপলব্ধি করে ধর্মের একটি বিশেষ দিককেই মানবজীবনে রূপায়ণের জন্য নির্দিষ্ট করে গেছেন। স্বামীজী ধর্মজীবনে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের স্থান স্বীকার করেছেন সত্য কিন্তু বর্তমান জীবনপরিপ্রেক্ষিতে তিনি কর্মযোগের উপরই সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এখন Metaphysics-এর চেয়ে Ethics বেশী প্রয়োজনীয়, যদিও একথা সত্য যে এই শাস্ত্রদ্বয় একে অন্যকে প্রভাবিত না করে থাকতে পারে না। করুণাঘন ভগবান বুদ্ধদেবও নৈতিক জীবনের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাই বলে কোনরকম দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী যে বুদ্ধদেবের ছিল না তা বলা যায় না, তবে দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার কোন উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। ভগবান বুদ্ধ যা চেয়েছিলেন, সহজ কথায় সেটা হচ্ছে perfect reformation of moral life—নৈতিক জীবনের একটা পূর্ণ সংস্কার। স্বামী বিবেকানন্দও যুগপ্রয়োজন উপলব্ধি করে জীবনের এই দিকটাকেই বড় করে দেখেছেন। এর ভেতর দিয়েই সত্যের পথে এগিয়ে যায় মানুষ।

দেশবাসীর চরিত্র বিশ্লেষণ করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন যে আমাদের মধ্যে রজোগুণের অভাব ভয়ানক—সত্ত্ব তো নেই বললেই চলে; অনেক সময় সত্ত্বের ছদ্মবেশে তমোই মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। স্বামীজীর মতে ভারতীয়দের তাই কিছুদিন রজোমন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে, ভারতের নিজস্ব সম্পদ আধ্যাত্মিকতা ঠিক মত ফুটিয়ে তুলবার জন্য; আর পাশ্চাত্যের কর্মমুখরতায় মুগ্ধ হয়ে স্বামীজী ওদের সত্ত্বগুণের অধিকারী

হতে বলেছেন। সুতরাং নিজ অভীষ্টসাধনে পাশ্চাত্যকে অধ্যাত্মবিদ্যার পরাকাষ্ঠা ভারতীয় অদ্বৈতবিদ্যা গ্রহণ করতে হবে আর ভারতকে আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পাশ্চাত্যের কর্মোন্মাদনা ও জাগতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। এমনি করে উভয় ভাবের এক সুন্দর সামঞ্জস্যের মাধ্যমেই সমগ্র বিশ্ব মঙ্গলের পথে চালিত হতে পারে। তবে উভয়েরই এই প্রচেষ্টার ভিত্তি হবে কর্মযোগের আদর্শ। যোগস্থ বা সমত্ববুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে, আত্মাভিমান ত্যাগ করে, স্ব স্ব কর্ম নিষ্কামভাবে করাই হচ্ছে কর্মযোগের মূলকথা। এই কর্মযোগের মূলে কিন্তু আবার সেই জ্ঞানযোগ, যেখানে আত্মা সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়; তবে এটাও ঠিক যে জ্ঞানযোগের জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয় অভ্যাস বা কর্মের মাধ্যমে; কারণ সকলকেই প্রকৃতির নিয়ম বা স্বভাববশতঃ কর্ম করে যেতে হয়। 'নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ। কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥' কর্মযোগে অবিচল থাকার জন্য আবার সময় সময় ভক্তিযোগেরও প্রয়োজন হয়; এককথায় এই তিনটি যোগ পারস্পরিক ভিন্নতা তো সূচনা করেই না, উপরন্তু সখ্যতাই প্রকাশ করে; তবে সময়বিশেষে এই তিনের একটি প্রধান থাকে একথা অনস্বীকার্য। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এই কর্মপন্থাটিকে খুব সহজ কথায় বলেছেন—শিবজ্ঞানে জীবসেবা করা। ঠাকুরের এই উক্তি স্বামী বিবেকানন্দকে ভবিষ্যৎ ভারত তথা বিশ্বের মানুষের জন্য আদর্শ পথ রচনায় সাহায্য করেছিল। স্বামীজীও লোকসংগ্রহের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে উত্তরকালে নিজের জীবনকে জীবসেবার পূত যজ্ঞে আহুতি দিয়েছিলেন। শিবজ্ঞানে জীবসেবার অর্থ হলো 'বনের বেদান্তকে ঘরে টেনে আনা—অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবনে বেদান্তের বাস্তব প্রয়োগ। ঠাকুর দ্বৈতবাদীর ভক্তি ও অদ্বৈতবাদীর জ্ঞানের এক পরম সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। যোগী ও মুনিঋষিরা অরণ্যের নির্জনতায় যে অদ্বৈতজ্ঞানের সাধনা করে থাকেন, সমাজের বিভিন্ন স্তরে থেকেও প্রতিদিনের কার্যের ভিতর দিয়ে সকলেই সেই ব্রহ্মতত্ত্বের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। এই জ্ঞানে অটুট বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চললে জীবনের প্রতিটি কর্মই ঈশ্বরের উপাসনার স্থান দখল করবে। ঈশ্বর তো বহুরূপী হয়ে আমাদের মাঝেই খেলা করছেন। 'জীবে প্রেম'-এর অর্থই হলো ঈশ্বর-আরাধনা। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও ঠাকুরের অন্যান্য লীলাসহচরগণ নিজেদের জীবন দিয়ে এ সত্যের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এই শিবজ্ঞানে জীবসেবাই একমাত্র উপায়, যার সাহায্যে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে প্রতিফলিত ধর্মবোধের সুষ্ঠু ও সার্থক বাস্তবরূপায়ণ সম্ভব। এই উদ্দেশ্যেই স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করে যান—যার প্রধান ব্রত হলো ভগবান জ্ঞানে জীবের সেবাকে জ্ঞান-ভক্তিলাভের উপায়রূপে গ্রহণ করা।

উপসংহারে একটা কথা বলা খুবই সময়োপযোগী মনে করছি। অধুনা আমরা যেভাবে আমাদের চরিত্র রচনা করে চলেছি সেই চরিত্র বিশ্লেষণে যে ভয়াবহ চিত্র ফুটে ওঠে তার একটা দিক হলো—আমাদের 'মনমুখ এক' নয়। 'মনমুখ এক' না করা, 'ভাবের ঘরে চুরি' করা—এসব যেন আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। ঠাকুর, মা ও স্বামীজী সম্বন্ধে কত আলোচনাই তো হয়েছে ও হচ্ছে; কিন্তু কই ক'জন আমরা তাঁদের আদর্শ মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পেরেছি, জীবনে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি? খুবই আশা ও আনন্দের কথা, এই কিছুদিন আগে

জ্ঞানবৃদ্ধ দার্শনিক ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন কলিকাতার Asiatic Societyর একটি নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করে ভাষণ প্রসঙ্গে scientific advancement and spiritual decadence এর কথা বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করেছেন এবং knowledge ও wisdom-এর মধ্যে একটা balance বা ভারসাম্য বজায় রাখতে উপদেশ দিয়েছেন। ভারতের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীও একটি ধর্মসম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যাগুলিকে যদি আমরা একটা সুস্থ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করি তাহলে এগুলোর অনেক সুন্দর সমাধান পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যা বলছিলাম, শুধু চর্চাতেই শেষ করলে চলবে না, আচরণেও তার প্রতিফলন দেখাতে হবে; তবেই তো আলোচনা বা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আচার-অনুষ্ঠানের সার্থকতা আসবে। অনেক সময় হয়তো আমরা চেষ্টা করেও চর্চিত বিষয় জীবনে রূপ দিতে গিয়ে ব্যর্থ হই; তাতে ক্ষতি নেই। আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ তো অল্পদিনে সম্ভব নয়, তাই শত ব্যর্থতার মাঝেও আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। মনন ও নিদিধ্যাসনের মাধ্যমে। আলোচনার অব্যবহিত পরেই যদি আমরা সব ভুলে যাই, গতানুগতিকতার জালে জড়িয়ে পড়ি, তাহলে আলোচনা একরকম ব্যর্থই হবে বলা চলে। তবে নৈষ্ঠিক প্রযত্নের পর যদি ব্যর্থতা আসে, ক্ষতি নেই; তাহলে সর্বদা যেন স্মরণ রাখি, আজকের এই ব্যর্থতা আগামী দিনের সাফল্যেরই সূচক।

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দনা

শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত

পঞ্চবটীতে এসেছিলে তুমি
নররূপী ভগবান
ধ্যান-গম্ভীর ওগো ঋত্বিক
গাহি তব জয়গান।
সর্বধর্মসমন্বয়ের সুরে
বীণাখানি তব বলে সুমধুরে
জ্ঞানে ও কর্মে, ত্যাগে ও ধর্মে
হও সবে আগুয়ান
গাহি তব জয়গান।
তুমি এসেছিলে বেদ-বিগ্রহ রূপে
আপনারে তাই অশেষ করেছ
বিশ্বপ্রেমের ধূপে—
সমাধি-মগ্ন যুগ-অবতার
তুমিই ব্রহ্ম করুণা অপার
প্রণমি তোমারে নর-নারায়ণ
যুগে যুগে কর ত্রাণ
গাহি তব জয়গান।

রামায়ণী

শ্রীঅমূল্যকুমার মণ্ডল

রাতের অন্ধকারে ট্রেন ছুটে চলেছে দিল্লী অভিমুখে। অন্ধকার তার মায়াজাল বিস্তার করে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ঘুমিয়েই পড়েছিলাম, হঠাৎ যেন তন্দ্রাভাবটা কেটে গেল। ঘুম ঘুম ভাবটা ঠিক কাটেনি। কানে এল, —'শুদ্ধব্রহ্মপরাৎপর রাম, কালাত্মকপরমেশ্বর রাম।' কোনও বিশেষ নামের প্রতি আমার তেমন কোন বিশেষ আকর্ষণ নেই। তবুও কেন যেন এই 'রাম রাম' ধ্বনি আমার মনকে কেমন একটা বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন করে তুললো। চোখ মেলে চাইলাম। সূর্যদেব তাঁর সোনার রথে যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত অন্ধকার ধীরে ধীরে দূরীভূত হচ্ছে। বাইরের দিকে তাকিয়ে অন্যদেশ বলে হঠাৎ মনে হয় না। বাংলা দেশের পেলব মাটির ছোঁয়াচ এই অঙ্গদেশের মাটিতেও মায়াজাল বুনেছে। ভিন্ন দেশ তো বোধ হচ্ছে না, এ যেন একই মানুষের বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন রূপ ; একই মানুষ, কোথাও সে শিশু, কোথাও কিশোর, কোথাও পূর্ণ যৌবনের উচ্ছ্বাসে ভরপুর। এই সব চিন্তার মধ্যেই আবার কানে এল—রঘুপতি রাঘব রাজারাম, পতিতপাবন সীতারাম। কোনও দেহাতী ফকিরের সুমিষ্ট কণ্ঠনিঃসৃত এই সংগীত। মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। বাইরে তাকালাম। সামনে পাহাড়। ধোঁয়াটে আকাশ ট্রেনের ধোঁয়ায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। পাহাড়ের চূড়ার ওপর দিয়ে সূর্য তার সোনালী আলোর আভা ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই মূর্ত পরিবেশে রামনামের ধ্বনি মনকে বার বার উদ্বেল করে তুললো। কিন্তু আমি তো সে নাম বড় একটা করি না। সূর্যের নির্মল কিরণে চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো সেই ভারতবর্ষের মানচিত্র যেখানে গীত হচ্ছে শুধু—রাম রাম, সীতারাম, রাজারাম। এই মধুর ধ্বনিতে অতীতের সব কিছু যেন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। সুদূর অতীতের ঘটনাগুলি একে একে মানসপটে ভেসে উঠতে লাগলো।

রাজা দশরথ। তিনি রাজত্ব করেন, মৃগয়ায় যান, ভুলে অভিশাপ কুড়ান। যিনি চরম অভিশাপ দিচ্ছেন, তিনি তো ভিখারী। রাজা তো তাঁকে বধ করতে পারেন, তা তো করছেন না, তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ছেন। অনুতাপের বিষাদ-সলিলে রাজা ডুবে আছেন। অসহায় হয়ে তপস্বীর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ছেন। অনুতাপে কিছু ভিক্ষা মিললো। এইখানেই ভারতের ইতিহাসের সূচনা। পরম আনন্দের মধ্যে চরম দুঃখ এসেছে। কেউ কাউকে ছেড়ে পালিয়ে যায় নি। পরস্পরকে টেনে মুক্তির একটা রাস্তা খুঁজছে। ঝড় দেখে দরজা বন্ধ করে নি—বরং তাকে জানিয়েছে আমন্ত্রণ।

তাই বুঝি জন্ম নিলেন সেই অদ্ভুত শিশু ভুবনমোহন রূপগুণ নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে লোকে তাঁকে দেবশিশু বলে মেনে নিল। রাজার ছেলে। রাজার ছেলে তো আরও ছিল। দশরথ ছাড়া আরও রাজা ছিলেন। ইতিহাসের পাতা উল্টে চলেছে। রাজর্ষি জনক। রাজা ও ঋষি। সব আছে, অথচ কিছুই নেই। নিজের কোনও কামনা-বাসনা নেই। তাই বিধাতা সীতাদেবীকে পাঠালেন তার ঘর আলো করতে। রাজর্ষির

সার্থক সাধনা। সার্থক তার হলকর্ষণ। হয়ত এ বহুযুগের সাধনার ফল। প্রকৃতির যা কিছু সুন্দর, যা কিছু কল্যাণময় তাই যেন কন্যারূপ নিয়ে রাজার ঘরে এসেছে।

আবার পাতা উল্টালো। রাজা দশরথের আরও তিনটি পুত্রসন্তান। লক্ষ্মণ—অমিত তার বীর্য, অগ্রজের সামান্য ইচ্ছায় সে সব ত্যাগ করতে পারে। হয়ত হারায়, হয়ত নয়। হারানোর ব্যথা তারই বেশী লাগে—যে সামান্য কিছু পেয়ে ব্যাঙের আধুলির মত আটকে রাখে। সে তার বাঁধনে ঘুরপাক খায়, সামনে যেতে পারে না।

ইতিহাসের পাতা উল্টে যাচ্ছে। রাজা দশরথ—বৃদ্ধ দশরথ। বানপ্রস্থের পথযাত্রী বলা যায়। জীবনের সব আশা আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয়েছে। লোকজনের শ্রদ্ধা পেয়েছেন। আত্মীয়-গণের ভালবাসাও পেয়েছেন যথেষ্ট। জীবন প্রায় পরিপূর্ণ। কিন্তু সেখানেও সেই হারানো-পাওয়ার খেলা। আনন্দের ভরা জোয়ারে হিংসুটে হাঙরদের আনাগোনা। সত্যধর্ম তার দারুণ পরীক্ষার মানদণ্ড নিয়ে হাজির হয়েছে, মহারিক্ততা এনে দিয়েছে—মহাশূন্যতা নয়, জীবনের মহাপূর্ণতার পথের ইঙ্গিত। সেখানেও প্রেমের টানেই সব চলেছে, ত্যাগের মহামন্ত্র নিয়ে।

রঘুপতি বনে চললেন। সঙ্গে সহধর্মিণী সীতা আর অনুজ লক্ষ্মণ। রাজসুখকে ত্যাগ করে চললেন এক মহা অনিশ্চিতের পথে। প্রেম তো ফুটে ওঠে ত্যাগের মধ্যে। ভোগের মধ্যে সে এনে দেয় নানারূপ জটিলতা। মন স্থির হয়েছে, দুঃখ আজ নেই। ত্যাগ ও প্রেমের জোরে অরণ্যও হয়ে উঠেছে স্বর্গপুরী। কি আনন্দেই দিন কাটছে, কতো মুনি ও দুঃখীজন তাঁদের স্নেহ ও কৃপা পেয়েছে। আনন্দ যদি অনাবিল হত, পৃথিবীর ধারা তাহলে বন্ধ হতো। আনন্দের নিবিড় আস্বাদ হয়ত মানুষ ভুলে যেত। কেননা ছেদই জাগিয়ে দেয় বিগত আনন্দের মহিমময় রূপ। আর জাগিয়ে দেয় হারানোকে পাবার আকুল আকাঙ্ক্ষা। এই উদ্যোগই ফুটিয়ে তোলে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে তার পূর্ণ রূপে। যেমন সূর্যদেব তার প্রথম আলো দিয়ে বিকশিত করেন কমলকে—যে রাতের নিবিড় আঁধারে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল।

লঙ্কার রাজা রাবণ। অমিত তার তেজ—অমিত তার ধনসম্পদ। পাণ্ডিত্যেও তার যথেষ্ট খ্যাতি। কিন্তু এই খ্যাতির মধ্যেই লুকিয়ে আছে লোভ ও হিংসা—যে তার অগ্নিশিখায় সব কিছুকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। বিরাট অরণ্যকে ধ্বংস করবার জন্য আগ্নেয়গিরি লাগে না, সামান্য স্ফুলিঙ্গই যথেষ্ট। সেই বেড়ে বেড়ে বিশাল অরণ্যকে গ্রাস করতে পারে।

হিংসা, কাম, লোভ মানুষের অজ্ঞাতসারেই অভিযান চালায়। নইলে বোধ হয় মানুষ অনেক অনর্থ থেকে বাঁচতে পারতো। ছল করে রাবণ হরণ করলো সীতাকে।

সীতা আজ বন্দিনী। রাজর্ষির ঘরে শৈশবের সরলতায় তিনি সবাইকে করেছেন মুগ্ধ, কৈশোরে শ্বশুরালয় রেখেছিলেন আনন্দমুখর করে, অরণ্যেও হৃদয়ের মাধুরী দিয়ে রচনা করেছিলেন স্বর্গপুরী। আনন্দ, প্রেম, স্নেহ, কোমলতা, —এই তো ছিল সীতার জীবন। আজ বিধাতা তাঁর রুদ্র পরীক্ষা নিয়ে হাজির হয়েছেন। কুসুমের চেয়েও কোমল এক নারীকে আজ রুদ্রের চেয়েও কঠোর—সিংহিনীর চেয়েও তেজস্বিনী হতে হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "দশ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও প্রাণ দিতে পারে।" কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে—যেখানে আছে নিত্য নতুন পরীক্ষা, যেখানে

পরীক্ষা তার কঠোরতার রূপ নিত্যই বদলাচ্ছে, সেখানে যিনি প্রকৃত সংযমের সঙ্গে সাহস দেখাতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বীর, আদর্শ মহাপুরুষ। এই সংযত সাহসই সীতার পাথেয়। উচ্ছ্বাসের বন্যা এসে তাঁর সংযমের বাঁধকে কখনো চুরমার করে দেয় নি। সে ধীরে ধীরে সব কিছুকে জয় করে নিয়েছে। এই অনবদ্য সৃষ্টিই আজ আমার মনকে অভিভূত করে তুলেছে। তাই বুঝি ভারত-বাসী যুগ যুগ ধরে সীতাকে স্নেহের কন্যারূপে—বধূরূপে—সব শেষে মাতৃত্বের, পবিত্রতার মূর্ত প্রতীকরূপে স্বীকার করে নিয়েছে। নারীর যা কিছু সুন্দর, যা কিছু কল্যাণময়, সীতা তার মূর্ত প্রতীক। তার ওপর সীতা নারীত্বের সমস্ত মহিমা নিয়ে সর্বময়ী হয়ে, সকলের সমস্ত সুখ-দুঃখকে বরণ করে নিয়ে তাদেরই মধ্যে চিরন্তনা নারী হয়ে থাকতে চেয়েছেন। তাঁর জীবন তাই সমস্ত ভারতবাসীর কাছে গঙ্গার মত পূত-সলিলা, কল্যাণময়ী প্রবাহিণী।

হিংসা-লোভ শুধু মানুষের জীবনকে পুড়িয়েই ক্ষান্ত থাকে না, তার আঁচ লাগে অপর জনের উপরেও। রামলক্ষ্মণের সংসার ভাঙবার উপক্রম। তাঁদের ত্যাগ-প্রেম-সংযম কি এতই তুচ্ছ যে এই সামান্য আগুনের তাপে পুড়ে যাবে! তা গেল না। প্রেমে কি না হয়! বানর পাখী পশু সবাই আজ তাঁদের দুঃখে দুঃখী। নিজেদের যা কিছু সামান্য সামর্থ্য, তা নিয়ে এগিয়ে এসেছে রামলক্ষ্মণের সেবায়। সেখানে সকলেই জুটেছে, আর্যঅনার্যের ভেদ নেই, উত্তরদক্ষিণের ছেদ নেই, ধনসম্পদের প্রলোভনও নেই, আছে শুধু প্রেমের টান। সেখানে মানুষ পরস্পরের হাত ধরাধরি করে সমবেত হয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে, অধর্মের বিরুদ্ধে—সর্বস্ব পণ করে।

জয় হলো, রাবণ সবংশে নিহত হলো। মানুষ যখন তার সমস্ত শক্তি নিয়ে সংযমের সঙ্গে কোনও প্রচেষ্টা করেছে, তার জয় হয়েছে। এই ইতিহাস সমগ্র মানবজাতির। আসুরিক শক্তি হয়ত কিছুকালের জন্য চুরমার করে দিতে চেয়েছে সব কিছু। সারা পৃথিবী হয়ত আতঙ্কে শিউরে উঠেছে। কিন্তু মানুষের ঘরেই এসেছেন এমন কয়েকজন মানুষ, যাঁরা সাহস করে এই শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। অন্যায়, অত্যাচার পরিশেষে পরাজিত হয়েছে; নইলে পৃথিবীর চাকা যে থেমে যেত। যেমন নদী মজে যায় পাহাড়ে জলের প্রাচুর্য ও তার লাফালাফি তর্জন গর্জন না থাকলে।

১৪ বছর কেটে গেছে। রাম লক্ষ্মণ সীতা আজ অযোধ্যায় এসেছেন। ১৪ বছরের রাজ্যাধিকারও ভরতের মনে জাগাতে পারেনি লোভ। তিনি শুধু ছিলেন অগ্রজের প্রতিভূ। এই ত্যাগ ও নীতিবোধই দিয়েছে তাঁকে সুদীর্ঘ শান্তি ও লোকপ্রীতি।

রাম আজ রাজা। সংযমীর দুঃখ অনেক। স্বর্ণকার তো সোনাকে বার বার পোড়ায় খাঁটি করবার জন্য; বিধাতাপুরুষ আমাদের দুঃখ-তাপের কঠোর আগুনে পুড়িয়ে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে জাগাবার পথ করে দেন।

রাম রাজা হয়েছেন, শুধু নিজের সুখসুবিধের জন্য নয়। তিনি মানুষের মনোজগতের রাজা। তাঁর কর্তব্য শুধু প্রজাদের ব্যবহারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে কেন! মনো-রাজ্যে যার স্থান নেই, তার আসন যে ক্ষণস্থায়ী, তা কে-না জানে। ভেসে উঠলো মূর্তিমতী সাধ্বী সীতার চিত্র। মন প্রথমে সায় দিতে চাইলো না এই মনোরাজ্যের রাজাকে স্বাগত জানাতে। গভীরভাবে একটু চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লাম। দেখলাম রামের মধ্যে

মানবিকতার কি অপরূপ বিকাশ। সেখানে কোনও স্বার্থগন্ধ নেই, আছে অনাবিল প্রেম; তার কাম্য মানুষের কল্যাণ। তার জন্য চরম ত্যাগও তিনি হাসিমুখে বরণ করেছেন।

রামচন্দ্রের এই ত্যাগ বড় করুণ রূপ নিয়ে চোখের উপর ভেসে উঠলো। এ যে চরম ত্যাগ! রাম সীতা দুজনারই। এই শেষ পরীক্ষা তো আনলো তাঁদের দুজনার জীবনে পরিপূর্ণতা। তাঁরা আজ পিতামাতা, পিতামাতা যদি নবাগতকে না বরণ করে নেয়, তা দুঃখ আনে জীবনে আর বাধা সৃষ্টি করে নূতন মানুষের নূতন প্রাণের সন্ধানের। রামসীতা জীবনের ছেদ টেনে নবাগতকে বরণ করলেন।

এতক্ষণে মনের দ্বিধা কেটে গেল। রামসীতা, সীতারাম। তাঁদের শিশু কিশোর যুবা প্রৌঢ়, মাতাপিতা পুত্রকন্যা ভ্রাতা স্বামীস্ত্রী, রাজাপ্রজা, ধর্মবীর কর্মবীর ন্যায়বীর, সর্বজয়ী সর্বত্যাগী রূপ একে একে ভেসে উঠতে লাগলো। দেখতে পেলাম জীবনের সমস্ত বিকাশ তাঁদের মধ্যে রয়েছে পরিপূর্ণতা নিয়ে। তাঁরা শাশ্বত মানবমানবী। মানুষের ঘরে জন্ম নিয়ে মানুষের সমস্ত সুখদুঃখ ও কর্মের মধ্যে করেছেন আত্মার পূর্ণ বিকাশ। এইখানেই হয়েছে মানুষের জয়। ভারতবর্ষ বোধহয় মানুষের অন্তরস্থ চরম সত্যকে দৈনন্দিন জীবনে রূপ দেবার জন্য রামসীতাকে চিরকালের জন্য এত আপন করে নিয়েছে।

"রাম পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণঅবতার, একথা বারোজন ঋষি কেবল জানতো।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

"রাম ও সীতা ভারতবাসীর আদর্শ। ভারতের বালকবালিকাগণ, বিশেষতঃ বালিকামাত্রেই সীতার পূজা করিয়া থাকে। ভারতীয় নারীগণের সর্বাপেক্ষা উচ্চাকাঙ্ক্ষা—পরমশুদ্ধস্বভাবা, পতিপরায়ণা, সর্বংসহা সীতার মতো হওয়া।···সমগ্র ভারতবাসীর সমক্ষে সীতা যেন সহিষ্ণুতার উচ্চতম আদর্শরূপে আজও বর্তমান।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

বিজ্ঞানের ট্রাজিডি ও সুমতি*

শ্রীদিলীপকুমার রায়

Our age has made an idol of the brain;
The last adored a purer Presence; yet
In Asia like a dove immaculate
He lurks deep-brooding in the
hearts of men.

(Sri Aurobindo : *In the Moonlight*)

The simple faith (in science) which upheld the pioneers is decaying at the centre……In our day, those remote from the centres of culture have a reverence for science which its augurs no longer feel……Most men of science in the present are very willing to claim for science no more than its due and to concede much of the claims of other conservative forces such as religion.

(Bertrand Russell :
Is Science Superstitious)

Apart from religion human life is a flash of occasional enjoyments lighting up a mass of misery, a bagatelle of transient experience.

(A. N. Whitehead : Science & the Modern World)

মানসচিন্তারি করে উপাসনা যুগ আমাদের;
পূজিত বিগত যুগ এক শুভ্রতর মহীয়ানে;
তবু স্বর্গবিহঙ্গের ম'ত এশিয়ার গূঢ় প্রাণে
উচ্চে রাজে নিরঞ্জন নিত্যজ্যোতি সে-দেবদেবের।

(শ্রীঅরবিন্দ—"চন্দ্রালোকে" কবিতা)

বিজ্ঞানে যে-সরল শ্রদ্ধা তার পথিকৃৎ-দের উপজীব্য ছিল সে-বিশ্বাসের মূল আজ শুকিয়ে যায় বুঝি। আমাদের যুগে মানস-সংস্কৃতির রাজধানী থেকে যারা দূরে আসীন তারা বিজ্ঞানের নামে যে-ভাবে উজিয়ে ওঠে বিজ্ঞানের উদ্‌গাতারা আর সে-উচ্ছ্বাস বোধ করেন না। আজকের দিনে বেশির ভাগ বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের প্রাপ্য যতটুকু তার বেশি অর্থ চান না আর এমন কি, ধর্মবর্গীয় রক্ষণশীল সেকেলে প্রভাবের দাবিদাওয়াকে স্বীকার করতেও তাঁরা নারাজ নন এখন। (বার্টরাণ্ড রাসেল—
"বিজ্ঞান কি কুসংস্কারী" প্রবন্ধ)

ধর্ম বিনা এ-জীবনে লভি হায় আমরা কেবল
থেকে থেকে তুচ্ছ সুখভোগ—
যার চকিত চমকে
চোখে পড়ে আমাদের শুধু রাশি রাশি দুঃখশোক
অবসাদ তৃপ্তিহীন ক্ষণিক ইন্দ্রিয়-উত্তেজনা।

(হোয়াইটহেড—
সায়েন্স অ্যাণ্ড দি মডার্ণ ওয়র্লড)

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বীরবলেষু

আপনার চিঠি পেয়ে কী যে ভালো লাগল! আমাদের সাহিত্যরাগিণীতে আপনি এক সাবলীল ভাষার তান লাগিয়েছেন আপনার বিশিষ্ট ভঙ্গিমায়—যার ফলে আমাদের ভাব-প্রকাশের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে বৈকি—বিশেষ করে মৌখিক বাংলা ইডিয়মের প্রসাদে। কিন্তু সে যাক। আপনার চিঠি পড়তে পড়তে আমার মনে রকমারি ভাবোদয় হ'ল—ভাবলাম লিখিই না কেন আপনাকে—খোলা চিঠিতে।

---

* ৩৫ বৎসর আগে এ-নিবন্ধটি লেখা। অনেক কিছুই জুড়েছি, ছেঁটেছিও বিস্তর। একটি সম্পূর্ণ নূতন প্রবন্ধ বলা চলে। প্রবন্ধটি সময়োপযোগী মনে হয়। —লেখক

বিশেষ ক'রে গুরুদেব শ্রীঅরবিন্দের কাছে ভাবদীক্ষা লাভের পরে আমার আজকাল আরো বেশি ক'রে মনে হয় যে ওদেশ আজ বুঝবার কিনারায় এসেছে যে, এদেশকে (অর্থাৎ ভারতকে) যদি জয় করতে হয় তবে আমাদের অন্নজগৎকে জয় করলেই কাজ হাসিল হবে না, সবার আগে চাই আমাদের (পর পর) প্রাণ মন বিজ্ঞান ও আনন্দ-লোকের 'পরে চড়াও হওয়া। তাই ওরা আজ চাইলে ওদের ধর্মে অশ্রদ্ধা ও আত্মিক ইষ্টার্থে (values) সংশয় আমাদের মনে চারিয়ে দিতে।

মহাভারতে একটি চমৎকার কথিকা (parable) আছে। বৃত্রসংহারের পরে তাঁর শিষ্যসামন্তেরা লুকিয়ে সমুদ্রের নিচে সভা করল (কেন না সেখানে বজ্র পৌঁছতে পারবে না)। এরা কালকেয় দৈত্য—প্রচ্ছন্ন ব'লে আরো দুর্ধর্ষ, সর্বনেশে। তারা ঠিক করল যে, সমুদ্র থেকে রোজ নিশুত রাতে উঠে এসে এক এক ক'রে সাধুসন্ত মুনি ঋষি যোগী তপস্বীদের নির্মূল করলেই সবচেয়ে সহজে সৃষ্টি ডুবাবে। লক্ষ লক্ষ জীবকে মারতে সময় লাগবে, কিন্তু এই সব ধর্ম-ধারকদের মারলে সৃষ্টিলোপ হতেই হবে, কেন না "লোকা হি সর্বে তপসা ধ্রিয়ন্তে"—জগৎকে যোগী-ঋষিদের তপস্যাই রক্ষা করে। কাজেই রক্ষকের নাশ হ'লে রক্ষিতও বিনষ্ট হবে—এ হ'ল দুই আর দুইয়ে চার-এর অব্যর্থ গণিত। তাই তারা রেজলুশন পাশ করল:

যে সন্তি কেচিচ্চ বসুন্ধরায়াং
তপস্বিনো ধর্মবিদশ্চ তজ্জ্ঞাঃ।
তেষাং বধঃ ক্রিয়তাং ক্ষিপ্রমেব
তেষু প্রণষ্টেষু জগৎ প্রণষ্টম্॥

অর্থাৎ

ঋষি তপস্বী তত্ত্বদর্শীরাই
ধর্মে ধরাকে ধারণ করেন সবে।
তাঁদের বংশ নির্মূল হ'লে তাই
তপসের নাশে জগতেরো নাশ হবে।

বিজ্ঞানের পিছনে যে-সংশয়দৈত্য গাঢাকা হয়ে ছিল সে ছিল এই (ছদ্মবেশী) কালকেয়, তাই সে চাইল বিজ্ঞানের নামে ধর্মেও সংশয় আনতে। বলল যে, যেহেতু সংশয়ই হ'ল বিজ্ঞানসিদ্ধির বনেদ আর বিজ্ঞানের সিদ্ধিই বিশ্বসমৃদ্ধির মূল, সেহেতু ধর্মকেও নস্যাৎ ক'রে দাও সংশয়-তীরন্দাজিতে।

একথা বুদ্ধিবাদী বৈজ্ঞানিকেরা বললেন আরো এই জন্যে যে, বুদ্ধি যুক্তি ছেড়ে শ্রদ্ধা বিশ্বাসকে ভজলে যে-ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয় তাকে কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদেই টলানো যায় না। তাই তাঁরা অভিযান (campaign) সুরু করলেন শ্রদ্ধা বিশ্বাস পূজা ভক্তির বিরুদ্ধে। বললেন: "দেখ অন্ধ বিশ্বাসে তোমাদের সমাজে কত কুসংস্কারের আগাছা ও ভয়ের কাঁটাবন গজিয়ে উঠেছে।" বুদ্ধি দিল যুক্তিবর, আর বিজ্ঞান—ভুক্তি-অভয়। জঙ্গল ওরা অনেকটা সাফ করল বৈ কি। কেবল দুঃখ এই যে, সেই সঙ্গে বিরল আনন্দসহস্রদলও নিশ্চিহ্ন হ'ল। হোক না, মহামনীষী পল ভালেরি বললেন বড় গলা ক'রেই, "Les choses du monde ne m'intéressent que sous le rapport de l'intellect. Bacon dirait que cet intellect est un idol. J'y consens, mais je n'en ai trouvé de meilleure." অর্থাৎ বুদ্ধি ছাড়া জগতে আর আছে কী ছাই? কাজেই—বুদ্ধির চেয়ে মহত্তর কাউকে খুঁজে পাচ্ছি না যখন—আর কাকে গড় করতে যাব?

এর উত্তরে যদি আমরা বলি: "কেন? বিশ্বাস শ্রদ্ধা স্বজ্ঞা (intuition) এসব দেবতাও তো আজো বেঁচেবর্তে আছেন—" তাহ'লে ভালেরি-প্রমুখ বুদ্ধিপূজারীরা বলবেন: "ওরা

দেবতা কিসে? বুদ্ধি যুক্তির পদবী—মহাপ্রভু, শ্রদ্ধা বিশ্বাস তো তাঁবেদার—ওরা চায় ছায়ার কাছে হাত পাততে, বিজ্ঞান বিশুদ্ধ আলোর উপাসক, কেন না তার ভর পরীক্ষা নিরীক্ষা ওজন মাপজোপ—এককথায় যাকে ধরা ছোঁওয়া যায়, গুণে বলা যায়, ডুব দিয়ে তল পাওয়া যায়। শ্রদ্ধা বিশ্বাসের মূল হ'ল ভয়ের দণ্ডবৎ, যা জানি না বুঝি না তার কাছে হাতজোড় করা—এ চলবে না আর। মানুষকে হ'তেই হবে তার নিজের নিয়তির নিয়ন্তা—architect of his destiny, হ'তে হবে বীর, বস্তুবিশ্বকে খাটিয়ে হ'তে হবে ধনী সমৃদ্ধ শৌর্যশালী..." ইত্যাদি।

বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারের ফলে মানুষ যে অনেকখানি ধনসমৃদ্ধি ও বলবীর্য লাভ করেছে একথা সকলেই মানবেন। অন্ততঃ আজকের দিনে কেউই (মধ্যযুগের পাদ্রীদের সুরে সুর মিলিয়ে) বিজ্ঞানের দানকে নিছক জড়বাদ বলবেন না। আমাদের জগতের বাহ্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সাড়ে পনের আনাই যে বিজ্ঞানের দান একথা কেউই অস্বীকার করবেন না, করতে পারেন না। আমার বক্তব্য অন্য: আমি শুধু আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের লেখা থেকেই কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই দুটি সত্যের প্রতি:

এক, বিজ্ঞানকে সাধারণতঃ আমরা বিশ্বাস-নিরপেক্ষ ব'লে ধ'রে নিই, বিজ্ঞানের মূলসূত্র না জানার জন্যেই।

দুই, বিজ্ঞানের কীর্তি সিদ্ধ হলেই বলা চলে না যে, ধর্মের কীর্তি আনন্দ বা তার প্রতিষ্ঠার যুগ গত বলা বাহুল্য, প্রথম উক্তিটি যদি সত্য হয় তবে দ্বিতীয়টির সত্য হওয়ার সম্ভাবনাও বাড়ে, যেহেতু ধর্মের মূল ভর বিশ্বাসের 'পরেই। তাই আসুন, আজ এই নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে (সতেরো ও আঠারো শতকে)* মানুষের মন উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল বৈ কি। মানুষ বিজ্ঞানের কীর্তিকলাপ দেখে মুগ্ধ হ'য়ে বলা সুরু করল যে, এ জাজ্বল্যমান আলোর পাশে ধর্মের ধোঁয়াটে ভাব ভক্তি আনন্দকে অবাস্তব ব'লে বরখাস্ত করাই বিজ্ঞ তথা বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু তখনও রাজশক্তি ধার্মিকদের হাতে; চার্চের প্রতিপত্তি কেঁপে উঠলেও টলেনি। কাজেই এ নব অভিযানে—(বিশেষ ক'রে গ্যালিলিও কোপর্নিকসকে সমর্থন ক'রে বলার পরে যে পৃথিবীই সূর্যকে পরিক্রমা করছে)—গির্জার পাণ্ডাপুরুতরা রুখে উঠে বললেন যে, যেহেতু এসব প্রচার বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বকে মানতে চাইছে না সেহেতু দাও এ-কালাপাহাড়দের সাজা। ফলে গ্যালিলিওকে যেতে হ'ল জেলে ও ব্রুনো প্রমুখ বহু শহীদকে দেওয়া হ'ল প্রাণদণ্ড। বৈজ্ঞানিকদের দেগে দেওয়া হ'ল হেরেটিক ব্লাসফীমার ব'লে।

কিন্তু অসহিষ্ণু অত্যাচার উৎপীড়নের ফল হ'ল যা হবার তাই: মানুষ বলল ধর্মের পাণ্ডা-পুরুতকে যে, তাঁদের বাঁধন যতই শক্ত হবে সত্যজিজ্ঞাসুদের বাঁধনও ততই টুটবে—চোখ ফুটবে আরো তাড়াতাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে এল যন্ত্রতান্ত্রিক বিপ্লব (industrial revolution): রেল স্টীমার বিজলিবাতি ছাপাখানা এ-ও-তা—

* বিজ্ঞানের প্রধান কথা—প্রকৃতিকে দেখ, বোঝ, জান। এ বাণীটি প্রথম প্রচার করেন রজার বেকন—ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ায়। কিন্তু বিজ্ঞান ব্যাপক হ'য়ে ওঠে সব প্রথম—সপ্তদশ শতাব্দীতে কোপর্নিকসের মৃত্যুর পরেই, গালিলিওর জীবদ্দশায়—যদিও আরিষ্টটেল, আর্কিমিডিস, দাভিন্চি প্রভৃতি নানা লোকে ভিন্ন ভিন্ন যুগে বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের পরিচয় দিয়েছিলেন। The growth of the Physical Science by Sir James Jeans)

মানুষের চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে গেল, তার হৃদয়ের সব ভক্তি ভগবানকে ছেড়ে বরণ করতে ছুটল যুক্তিপন্থী বিজ্ঞানবাদকে। ফলে বিশ্বাস হ'য়ে দাঁড়াল অশিক্ষিতের সম্বল ও দুর্বলের সান্ত্বনা। বুদ্ধিমন্তেরা সবাই ভলটেয়ারের বিখ্যাত Dictionnaire Philosophique-এর সুরে বলা সুরু করলেন: যুক্তিই হ'ল মুক্তির পথ, বিশ্বাস হ'ল যা নেই তার কাছে হাত পাতা, যথা Holy Roman Empire, যে না হোলি, না রোমান, না এম্পায়ার ইত্যাদি ব্যঙ্গবিদ্রূপ। রুসো তাঁর বিশ্ববিশ্রুত Contrat Social-এ মন্ত্র দিলেন: "L' homme est ne´ libve, et partout il est dans les fers" অর্থাৎ মানুষ জন্মায় মুক্ত হ'য়ে, অথচ জগতে সে সর্বত্রই শৃঙ্খলিত হ'য়ে রইল (Contrat Social)। আরো কত মনীষী মনের ওকালতি করতে গিয়ে মন যার নাগাল পায় না তাকে ছোট করতে ছুটলেন বিজ্ঞানের নামে, বলা সুরু করলেন: বিশ্বাসই হ'ল যত নষ্টের গোড়া, কারণ সে দেবতার বরের লোভ দেখিয়ে চায় আমাদের অন্ধ করতে। এর পরে হার্বার্ট স্পেন্সারের সঙ্গে বুদ্ধিমন্তদের কোরাসে গান সুরু হ'ল: "Science is organised knowledge"—অতঃপর: যা নেই সায়েন্সে তা কোথাও নেই। এককথায়, ভগবানের বেদীতে বিজ্ঞানকে চড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পুরুতও বদল হ'ল—বিশ্বাসকে বরখাস্ত ক'রে বাহাল করা হ'ল বুদ্ধিকে, চেতনাকে বলা হ'ল বস্তুর একটা ক্ষণিক ফেনা, বুদ্বুদ। কাজেই বিশ্বাসের ধোঁয়াটে এলাকা ছেড়ে মানুষকে আসতে হুকুম করা হ'ল যুক্তি ও পরীক্ষার স্বচ্ছ আলোক-লোকে। মানুষ ধ'রে নিল—যুক্তির শৃঙ্খলেই মুক্তির নূপুর বেজে উঠবে, না উঠেই পারে না।

বৈজ্ঞানিকদের আত্মপ্রসাদ দ্রুতবেগে বেড়ে উঠছিল শুক্লপক্ষের শশিকলার মতনই—এমন সময়ে হঠাৎ আঠারো শতকের মাঝামাঝি ইংলণ্ডে হিউম-নামধারী এক দুষ্ট রাহু উদয় হ'য়ে একটি নিদারুণ প্রশ্ন ক'রে বসলেন। বললেন: "তোমরা বিশ্বাসকে অন্ধ ব'লে গঙ্গাযাত্রা করাতে চাচ্ছ—কিন্তু ভেবে দেখেছ কি যে তোমাদের বিজ্ঞানসাধনার মূলেও লুকিয়ে আছে এক সমান অন্ধ বিশ্বাস যে, প্রকৃতি শৃঙ্খলা (order) মেনে চলেন ও চলবেন চিরদিনই! এটা কি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে, না বিশ্বাস ক'রেই ধ'রে নেওয়া হয়েছে?" বৈজ্ঞানিকরা শুধু যে চমকে উঠলেন তাই নয়, থমকে গেলেন, কারণ এ-জেরার উত্তরে কোনো সাফাই-ই গাইতে পারলেন না। রাসেল তো তাঁর Is Science Superstitious প্রবন্ধে প্রকাশ্যেই অশ্রুপাত ক'রে বললেন: "The great scandals in the philosophy of science ever since the time of Hume have been causality and induction. We believe in both but Hume made it appear that our belief is a blind faith for which no rational ground can be assigned." ভাবার্থ: বিজ্ঞানের দর্শন বিপন্ন হয়েছে এই জন্যে যে হিউম দেখালেন যে, কার্যকারণসূত্র ও উপপাদন এ-দুই থিওরিই আসলে অন্ধ বিশ্বাসের 'পরে দাঁড়িয়ে। কারণ একথা যদি মেনে নিতে হয় তাহলে বিজ্ঞানের মূল শিকড়ে টান পড়ে, ধর্মকে আর সরাসরি বাতিল করা চলে না, কেন না সে বলতে পারে: "বিজ্ঞানেরও ভর যদি হয় বিশ্বাসের বনেদে তবে ধর্মকে বিশ্বাসভিত্তি ব'লে নামঞ্জুর করলে শুনব কেন?" কিন্তু রাসেল তবু হাল ছাড়েন নি, কান্নাকাটি করার পরেও চোখ মুছে আশা-কুহকিনীকে আঁকড়ে ধ'রে বলছেন: "And yet···I cannot help believing that there must be an answer but I am quite

unable to believe that it has been found." অর্থাৎ এ-সমস্যার সমাধান আছেই আছে আমি আজো মনে মনে বিশ্বাস করি, যদিও সে-সমাধান কেউ করতে পেরেছেন ব'লে আমার মনে হয় না।

এ-মহাসমস্যার মুখোমুখি হ'তে হয়েছে রাসেলের প্রিয়তম সতীর্থ তথা বন্ধু হোয়াইটহেড সাহেবকেও। তিনি তাঁর Science and the Modern World নামক বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে সমস্যাটির আলোচনা করেছেন এই ভাবে:

প্রথমত: তিনি অকুণ্ঠেই মেনে নিয়েছেন হিউমের উপপত্তি (theory) যে, "There can be no living science unless there is a widespread conviction in the existence of an order of things, and, in particular, of an order of Nature." অর্থাৎ কোনো প্রাণবন্ত বিজ্ঞান গ'ড়ে উঠতেই পারে না যদি এ-দৃঢ় বিশ্বাস ব্যাপক না হয় যে, প্রকৃতি দেবী স্বভাবে খামখেয়ালী নন, নিয়ম মেনেই চলাফেরা ক'রে থাকেন। একথার তাৎপর্য এই যে, প্রকৃতি দেবীর আইন কানুন মেনে চলাই স্বভাব একথা যদি সত্য না হয় তাহ'লে বলতেই হয়—হোয়াইটহেড সাহেবেরই ভাষায়—যে, "we do not know science to be true," যেহেতু "it may at any moment cease to give us control over the environment for the sake of which we like it." অর্থাৎ ধরুন জল যদি আজ যখন তখন মর্জি মাফিক জমাট হ'য়ে যায় তাহ'লে কী দারুণ অবস্থা হবে বলুন তো? জাহাজ চলবে কার বুক চিরে? কিংবা ধরুন, বাষ্প যদি বলে, "আমি কোনোদিকেই চাপ দেব না—তাহলে ট্রেন বেচারীরা চলবে কেমন ক'রে যাত্রী নিয়ে! কিংবা ধরুন, যদি হাওয়া বলে আমি কোনো স্পন্দনই বইব না, তাহ'লে আমরা কান থেকেও কালা। যদি আলো বলে আমি ছুটব না, তাহ'লে সূর্য থেকেও আমরা হব আঁধারবাসী। আর দৃষ্টান্ত দেওয়া বাহুল্য হবে। মোদ্দা কথাটা এই যে, প্রকৃতি স্বভাবে নিয়ম মেনে চলেন ব'লেই এ-বিরাট ব্রহ্মাণ্ড হু হু ক'রে চলেছে অগুন্তি গ্রহ তারা নীহারিকা নিয়ে—এ-বিশ্বাস যুক্তিভিত্তি প্রমাণ করতে না পারলে বিজ্ঞানের প্রাণ বাঁচলেও মান থাকে না। তাই তো রাসেলের এত কান্না যে, বিজ্ঞানের প্রধান পুরোহিতদের মধ্যে বিজ্ঞানের আর সে-প্রতিপত্তি নেই যে-প্রতিপত্তি নিয়ে ধুমধাম করছে তার যজমান রুষ জাপানী চীন।* ভারতের নয়া বিজ্ঞানোৎসাহীদেরও রাসেল এই দলে ভর্তি করতে পারতেন।

এর ফল কী হয়েছে—বা হতে যাচ্ছে—সেটা আমরা ভারতবর্ষে অবশ্য আজও ধরতে পারি নি—ধরতে সময় লাগবে। আপনিই তো বলেছেন—ওদেশের yesterday আমাদের to-day-ই হয়ে এসেছে। এর সহ-সিদ্ধান্ত (corollary): ওদের আজকের কান্নায় আমরা দোয়ার দেব আগামী কাল বা পরশু তরশু। দেখা যাক আমাদের এ-আশঙ্কা অমূলক কি না। History repeats itself—প্রবচনটি প্রায়ই সত্য হয় ব'লেই ভয় হয়। ভয় বলছি, কেন না আমরা অনেক সময়েই ঠেকে শিখলেও কেঁদে শিখতে চাই না যে, বিজ্ঞানকে ঈশ্বরের বেদীতে বসিয়ে ধর্মকে অপদস্থ করার ফল ভয়াবহ। তাই আমাদের সাবধান করতে আপ্তবাক্যে

* "Outlying nations such as the Russians, the Japanese and the young Chinese still welcome science with seventeenth century fervour. But the high begin to weary of the worship to which they are officially dedicated."
(Is Science Superstitious...Bertrand Russell)

বারবারই ধর্মের গুণগান করা হয়েছে, যথা মহাভারতে: "ধর্মো ধারয়তি প্রজাঃ"—ধর্মই মানুষকে ধারণ করে; উপনিষদে: "ধর্মং চর, ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্"—ধর্মাচরণ করো, ধর্মভ্রষ্ট হ'লে সর্বনাশ···। ভাগবতে উত্তরা বলছেন কৃষ্ণকে: "নান্যং ত্বদভয়ং পশ্যে যত্র মৃত্যুঃ পরস্পরম্"—অর্থাৎ,

যে জগতে আমরাই পরস্পরে হানি মৃত্যুবাণ
সেথা তুমি বিনা দিবে কে অভয়,
কে করিবে ত্রাণ ?

আমি কিন্তু ধর্মের গুণকীর্তন করছি এর ফলে তার প্রতিষ্ঠা বাড়বে ব'লে নয়, করছি দুটি উদ্দেশ্যে: প্রথমতঃ, দেখাতে যে, বিশ্বাসকে অপদস্থ ক'রে মানুষের শ্রীবৃদ্ধি হ'তে পারে না—না ধর্মে, না বিজ্ঞানে, না রাষ্ট্রে, না সমাজে; দ্বিতীয়তঃ, যাঁরা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু তাঁদের অন্ততঃ মনে করিয়ে দিতে হবে যে, ধর্মে অশ্রদ্ধার অবশ্যম্ভাবী ফল—মারামারি কাটাকাটি হানাহানি দ্বেষাদ্বেষি। আমার শেষ প্রতিপাদ্যটির প্রমাণ দেওয়ার বোধ হয় প্রয়োজন নেই, ইতিহাসের পাতায় পাতায় সে-প্রমাণ রক্তাক্ষরে লেখা হয়েছে। তবে প্রথম প্রতিপাদ্যটি সম্বন্ধে আরো কিছু উদ্ধৃতি দিতে চাই ওদেশের মনীষীদের লেখা থেকে।

যাঁকে স্বয়ং রাসেল একজন যুগপ্রবর্তক দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ব'লে মনে করেন ও হোয়াইটহেড "adorable genius" উপাধি দিয়েছেন সেই বিখ্যাত উইলিয়ম জেম্স এ-যুগে সবাইকে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ধর্ম সমর্থনে চম্‌কে দিয়েছিলেন তাঁর Varieties of Religious Experience-এর গবেষণায়। এ-বইটিকে এ-যুগে ওদেশের একটি যুগপ্রবর্তক গ্রন্থ ব'লে অভিনন্দিত করা হয়েছে, ধর্মে অবিশ্বাসীদের মধ্যেও অনেকের মনই ভাবতে সুরু করেছে—তাই তো! এ বইটি থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়া অবান্তর হবে, তার প্রয়োজনও নেই। তবে তাঁর এ-প্রখ্যাত বইটির উনশেষ অধ্যায় থেকে একটু উদ্ধৃতি না দিলেই নয়। তিনি বলেছেন যে উপসংহারে তাঁর এই কয়টি প্রত্যয় পর পর সাজাতে চান ধর্ম সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে যা তাঁর মনে হয়েছে বরণীয় ব'লে:

১। এ-দৃশ্য জগৎ আর একটি অলক্ষ্য গভীরতর অধ্যাত্মজগতের অংশমাত্র, আর এই অলক্ষ্য জগৎ থেকেই তার সার্থকতার রস উপচিত হয়।

২। এই উচ্চতর জগতের সঙ্গে মিলন তথা সুষমিত (harmonious) সম্বন্ধ স্থাপন করাই আমাদের যথার্থ লক্ষ্য।

৩। প্রার্থনা বা সে-জগতের সঙ্গে আন্তর যোগের—তাকে ভগবানই বলো বা ঋতম্ই (law) বলো—মাধ্যমে সত্যিকার কাজ সুসম্পন্ন হয়, এবং অধ্যাত্মশক্তির প্রবাহ ব'য়ে এসে মানসিক ও বাস্তব নানা ঘটনা ঘটে এ-দৃশ্য জগতের মধ্যে।

এছাড়া জেম্স সাহেব অকুণ্ঠেই স্বীকার করছেন সত্য ব'লে যে,

৪। ধর্ম জীবনের সঙ্গে যুক্ত হ'লে আসে যেন বরদা হ'য়ে, কবিত্বময় আবেশের রূপ নেয় আমাদের ঐকান্তিকতা ও বীর্যশক্তিকে উস্কে দিয়ে।

৫। ধর্ম আমাদের আশ্বাস দেয় নিরাপত্তার ও শান্তিভাবের এবং সেই সঙ্গে আর সবার সঙ্গে লেনদেনে স্নেহপ্রীতির জোয়ার জাগিয়ে দেয়।

পাছে অনুবাদটির অর্থপরিগ্রহ করতে কেউ বেগ পান এই ভয়ে মূল উদ্ধৃত করছি নিচে:

Summing up in the broadest possible way the characteristics of the religious life, as we have found them, it includes the following beliefs :—

1. That the visible world is part of a more spiritual universe from which it draws its chief significance ;

2. That union or harmonious relation with that higher universe is our true end ;

3. That prayer or inner communion with the spirit thereof—be that spirit 'God' or 'law'—is a process wherein work is really done, and spiritual energy flows in and produces effects, psychological or material, within the phenomenal world.

Religion includes also the following psychological characteristics :

4. A new zest which adds itself like a gift to life, and takes the form either of lyrical enchantment or of appeal to earnestness and heroism.

5. An assurance of safety and a temper of peace, and, in relation to others, a preponderance of loving affections.

জেম্‌স সাহেব তাঁর Varieties of Religious Experience-এ আরো অনেক গভীর কথা বলেছেন, কিন্তু সে-সব উদ্ধৃতি দেবার স্থানও এ নয়, তার প্রয়োজনও নেই। আমি তাঁর নাম উল্লেখ করলাম শুধু বলতে যে, তিনি অবিশ্বাসী যুক্তির তরফ থেকে পরীক্ষা করেও ধর্মসম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধায় পৌঁছেছিলেন। অবশ্য তিনি ছিলেন স্বধর্মে মনস্তাত্ত্বিকই বটে তাই ধর্মের নানা অনুভূতিকে অনুভব না ক'রে শুধু বিচারের পথ দিয়ে ঠিক বুঝতে পারেন নি। কেমন করে পারবেন ? যা শুধু উপলব্ধিগম্য—বোধির এলাকায় পড়ে—তাকে বিশ্লেষণী বুদ্ধি দিয়ে ব্যবচ্ছেদ ক'রে বুঝতে গেলে গোল বাধেই। একটি দৃষ্টান্ত দেই আমার এ-বক্তব্যটির ভাষ্যরূপে। বিখ্যাত যোগী কবি এ. ই ওরফে জর্জ রাসেল তাঁর Candle of Vision স্মৃতিচারণে লিখেছেন: "খুব কম মনস্তাত্ত্বিকই এদেশে কল্পনায় সমৃদ্ধ।...কম্পমান জলে চূর্ণ প্রতিবিম্বই কাঁপতে থাকে। এঁরা হ্রস্বদৃষ্টি তাই যা দেখেন তাতে তাঁদের মনে বিস্ময় জাগে না।" এ. ই আরো পরিষ্কার ক'রে বলেছেন এ-সব বিচারীদের ব্যাখ্যার অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে: "We have no words to express a thousand distinctions clear to the spiritual sense. If I tell of my exaltation to another who has not felt this himself, it is explicable to that person as the joy of perfect health, and he translates into lower terms what is the speech of the gods to men". অর্থাৎ আমাদের অন্তরাত্মার যে-সব স্পষ্ট ও গভীর অনুভূতি হয় তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদগুলির ব্যাখ্যা করবার ভাষা পাব কোথায় ? ধরো, আমি যদি বলি আমার পরমানন্দের কথা এমন কাউকে যার তার সঙ্গে আদৌ পরিচয় হয় নি, তাহ'লে সে তাকে হয়ত বা পূর্ণ স্বাস্থ্যের উল্লাসের সমার্থক মনে করবে। অর্থাৎ, দেবতারা মানুষের সঙ্গে যে-ভাষায় কথা কন সে-ভাষার সে তর্জমা করবে এক নিম্নতর (মানবিক) পরিভাষায়। কিন্তু তবু জেম্‌স সাহেব মানুষের নানা ধর্মীয় অনুভূতির পর্যালোচনা করতে গিয়ে অতীন্দ্রিয় নানা অনুভবের মহিমার আভাস পেয়েছিলেন বৈকি যার ফলে তাঁর মনে গভীর শ্রদ্ধা এসেছিল ধর্মের দিব্যতত্ত্বে।

(ক্রমশঃ)

প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

সকলেই জানেন যে সুদীর্ঘ বারো বছর পরে এবার আবার প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ হয়েছিল। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভের সময় যে দুর্ঘটনা হয়েছিল তাতে অনেকে মনে করেছিলেন যে এবারে হয়ত এত বেশী যাত্রীসমাগম হবে না। এ ছাড়া সরকার, রেলকর্তৃপক্ষ এবং কোন কোন ধর্মনেতা কুম্ভস্নানে যাওয়ার কোনও উৎসাহ দেন নাই ; তবু আমরা যখন ২০শে জানুআরি গঙ্গার অপর পাড়ে ঝুসিতে মেলাক্ষেত্রে পৌছুলাম তখন অগণিত তাঁবু, পতাকা, অসংখ্য ভজন কীর্তন দল এবং বিরাট জনসমুদ্র দেখে মনে হল বুঝি বা সমস্ত ভারতবর্ষের লোকই সেখানে সমবেত হয়েছে। স্পষ্ট প্রতীয়মান হল ভারতের প্রাণকেন্দ্র কোথায়। এই পুণ্যভূমিতে জন্ম হয়েছে বলে হৃদয় আনন্দে ও গর্বে পূর্ণ হয়ে গেল।

দেওঘর হতে রওনা হয়ে আমরা প্রথমে ৺কাশীতে গেলাম—উদ্দেশ্য বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করে পরে কুম্ভে যাব। পূর্বেও কয়েকবার ৺কাশী দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল, কিন্তু এইরূপ যাত্রীর ভীড় কখনও দেখি নাই। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বহু কুম্ভযাত্রী আমাদেরই মত কুম্ভে যাওয়ার পূর্বে বিশ্বনাথদর্শনে ৺কাশী হয়ে যাচ্ছেন। কেহ কেহ বললেন, '৺কাশীতে দ্বিতীয় কুম্ভ হচ্ছে।'

বারাণসী জংশন স্টেশন হতে প্রতি আধঘণ্টা অন্তর স্পেশাল ট্রেন ছাড়ছিল, বিশেষ করে ছোট লাইনে। আর প্রতি ৪।৫ মিনিট অন্তর বাসও যাচ্ছিল। এলাহাবাদের দূরত্ব কাশী হতে প্রায় ৯০ মাইল। আমরা ২১শে জানুআরি মৌনীঅমাবস্যার দিনেই কুম্ভস্নান করব ঠিক করেছিলাম। এর আগে ১৪ই জানুআরি মকর-সংক্রান্তিতেও স্নানের যোগ ছিল এবং পরে ২৬শে জানুআরি শ্রীপঞ্চমীতে আর একটি যোগও পড়েছিল। কিন্তু মৌনীঅমাবস্যার স্নানই সব থেকে বিখ্যাত ও ফলপ্রসূ—ইহাই সকলের ধারণা।

কয়েকজন সাধু ও ভক্তসহ আমরা ২০শে তারিখ ভোর ৪॥টায় বারাণসী জংশন স্টেশনে এসে দেখি প্লাটফরমে এলাহাবাদগামী একখানি গাড়ী ছোট লাইনে দাঁড়িয়ে আছে—কিন্তু তাতে এত ভীড় যে উঠবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। পরের ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। আধঘণ্টা পরে একখানি ট্রেন এলো, উহাও পূর্ব হতেই এত ভর্তি হয়ে গিয়েছিল যে তিলধারণের স্থানও সেখানে ছিল না। দুএকজন সঙ্গী কোনও মতে উঠে চলে গেলেন। মনটা একটু দমে গেল—পরের ট্রেনেও উঠতে পারব কিনা। দারাগঞ্জের টিকিট কেটে-ছিলাম—সেখান হতে মেলাক্ষেত্র খুবই কাছে। কলেরা ও বসন্তের টীকা না নিলে এবং তার সার্টিফিকেট না দেখালে টিকিট পাওয়া যাবে না। আমি দেওঘর হতেই টীকা ও সার্টিফিকেট নিয়ে যাওয়াতে কোনও অসুবিধা হয়নি। ২০।২৫ মিনিট পরে গোরখপুর হতে একখানি স্পেশাল ট্রেন এল—৩।৪ ঘণ্টা পূর্বে আসার কথা ছিল। এবার কয়েকজন জোয়ান কুলী আমাদের জানালা দিয়ে গাড়ীর মধ্যে কোনও রকমে ঠেলে ফেলে দিল—সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। কুলীকে খুশী করে দিয়ে

মনে মনে বাবা বিশ্বনাথের কছে বিদায় নিয়ে কুম্ভের কথা স্মরণ করতে করতে রওনা হলাম সকাল ৬॥ টায়। চার ঘণ্টায় এলাহাবাদে পৌছুবার কথা। কোনও কোনও স্টেশন হতে ট্রেন নড়তেই চায় না। এত বগী জুড়েছিল এবং এত যাত্রী তাতে উঠেছিল, মনে হচ্ছিল ইঞ্জিন বেচারা আর টানতে পারছিল না, তাই মাঝে মাঝে বেশ কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিচ্ছিল। যাই হোক আট ঘণ্টা পরে আমরা ঝুসী স্টেশনে পৌছুলাম—তার পরের স্টেশন দারাগঞ্জ—শুনলাম দারাগঞ্জে ট্রেন থামবে না। কাজেই আমরা সেখানেই নেমে পড়লাম। খাওয়া দাওয়া বিশেষ কিছু আর হয়নি। ৩।৪ জন কুলী নিযুক্ত করে তাদের মাথায় মাল দিয়ে হেঁটে মেলাক্ষেত্র অভিমুখে রওনা হলাম এবং মাঠের ও গ্রামের মধ্য দিয়ে আড়াই মাইল ধূলিধূসরিত রাস্তা অতিক্রম করে বেলা চারটা নাগাদ মেলাক্ষেত্রে পৌছুলাম। এলাহাবাদ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম হতে এক নম্বর পুলের পথের ধারে সাধু ও যাত্রীদের থাকার জন্য কতকগুলি খড়ের ঘর ও তাঁবুর ব্যবস্থা হয়েছিল—সেখানে গিয়ে সকলে উঠলাম। একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও মিশন হতে খোলা হয়েছিল। আমাদের মঠের প্রায় ৭০ জন সাধু ও সমসংখ্যক ভক্ত ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে এসে ওখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। দুপুরের ডাল ভাত ছিল। ধূলাপায়ে তাহাই অমৃতের ন্যায় খাওয়া গেল। পরে কয়েকজন সাধুকে নিয়ে মেলার শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। যেদিকে দেখি কেবল সাধুর আখড়া—বিভিন্ন বেশধারী সাধু এবং লক্ষ লক্ষ ভক্ত নরনারী কত দূরদুরান্তর থেকে কত কষ্ট সহ্য করে এসেছে, কিন্তু সকলেরই মুখে এক প্রশান্তি—তারা তীর্থরাজ প্রয়াগে এসেছে এবং পরদিন মৌনীঅমাবস্যার পুণ্যযোগে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর পবিত্র সঙ্গমে কুম্ভস্নান করে ও সাধুদর্শন করে জীবন ধন্য করবে! তখন প্রচণ্ড শীত, কিন্তু অদ্ভুত তাদের ভক্তি ও বিশ্বাস—ঐ দারুণ শীতে কোন আচ্ছাদন না পেয়েও উন্মুক্ত আকাশতলে কাটিয়ে দিল সমস্ত রাত! মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের গীত :

> 'গৃহছাদ তব অনন্ত আকাশ
> শয়ন তোমার সুবিস্তৃত ঘাস।'

এদের বিশ্বাস ও ভক্তি দেখলে নাস্তিক আস্তিকে পরিণত হয় এবং সাধারণ লোকও পায় ধর্মজীবনলাভের এক অপূর্ব অনুপ্রেরণা। এবারকার কুম্ভের এক বিশেষ আকর্ষণ "বিশ্ব-হিন্দু-পরিষদ।" ভারত ও ভারতের বাহির হতে বহু বিশিষ্ট হিন্দু নেতা সমবেত হয়েছেন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করার জন্য। আমাদের আস্তানার পাশেই বিখ্যাত সাধু করপাত্রীজীর শিবির—তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন হিন্দীতে—কয়েক সহস্র শ্রোতা সেখানে সমবেত হয়েছিলেন—তন্মধ্যে অধিকাংশই এসেছিলেন গ্রাম হতে। আনন্দময়ী মা, গীতাভারতী প্রভৃতি কয়েকজন মহিলা-সাধিকার শিবিরও ছিল। এক জায়গায় দেখলাম ১০৮ জন বৈদিক ব্রাহ্মণ সমস্বরে সমগ্র গীতা পারায়ণ করছেন। এছাড়া নির্বাণী, জুনা, নিরঞ্জনী প্রভৃতি আখড়ার বিরাট তাঁবু পড়েছে। গঙ্গা-যমুনার সুবিস্তীর্ণ বিরাট সমতল তটটি একটি বিরাট শহরে পরিণত হয়েছে। এ শহরের অধিবাসী—প্রায় সকলেই হয় সাধু না হয় ভক্ত এবং সকলেই অস্থায়ী। গঙ্গার অপর পারে সম্রাট আকবর-নির্মিত বিরাট দুর্গ ও এলাহাবাদ শহর। প্রায় ৮টি সেতু করা হয়েছে—গঙ্গা-পারাপারের জন্য। এক নম্বর, দু নম্বর, তিন নম্বর—এই ক্রমে সেতুগুলির নাম। দর্শনাদির পর ফিরে এসে রাত্রে খাওয়ার সময় শিবিরের

সহাধ্যক্ষ মহারাজ জানিয়ে দিলেন যে পরদিন অর্থাৎ ২১শে জানুআরি ভোর সাড়ে চারটায় নির্বাণী আখড়ার প্রথম শোভাযাত্রা বের হবে। সাধুদের সব খালি পায়ে যেতে অনুরোধ জানানো হল। পরদিন ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে আমরা ৪॥টা নাগাদ মা গঙ্গাকে স্মরণ করে বেরিয়ে পড়লাম। সমস্ত মেলাক্ষেত্র বিভিন্ন প্রকারের বাজনা, ভজন, পাঠ, জয়ধ্বনি ইত্যাদিতে গমগম করছিল। দু-ফার্লং এসেই আমরা মিলিত হলাম নির্বাণী আখড়ার শোভাযাত্রার সঙ্গে। প্রায় আধমাইল লম্বা শোভাযাত্রা—তাতে কেবল সাধুরাই যোগ দিতে পারেন। শোভাযাত্রার পুরোভাগে জটাভস্ম-বিভূষিত প্রায় তিন শত নাগা সন্ন্যাসী। সুসজ্জিত রথোপরি চার পাঁচজন মণ্ডলীশ্বর। সে এক অপূর্ব দৃশ্য—হাজার হাজার সাধু উষাকালে ভগবানের নাম স্মরণ করতে করতে চলেছেন তীর্থরাজ প্রয়াগে ত্রিবেণী-সঙ্গমে পুণ্য পূর্ণকুম্ভ স্নানে। অনেকে আবার গাইছেন, "হর হর হর মহাদেব, কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গে।" দুপাশে কাতারে কাতারে অসংখ্য ভক্ত নরনারী হাত জোড় করে অর্ধনিমীলিত নেত্রে সেই দিব্য দৃশ্য দর্শন করে নিজেদের ধন্য মনে করছেন। ভালভাবে সাধু ও শোভাযাত্রা দর্শনমানসে অনেকে সমস্ত রাত ধরে রাস্তার ধারে বসেছিলেন। সকলের মন আনন্দে ভরপুর—চিত্তে প্রশান্তির ছাপ। খালি পায়ে চলতে অনভ্যস্ত সাধুদের সেই দারুণ শীতে বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা বালুর ওপর দিয়ে দীর্ঘ পথ আস্তে আস্তে চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। সব কষ্টের লাঘব হল যখন সকলে পৌছুলাম গঙ্গাযমুনার পবিত্র সঙ্গমে। তিন নম্বর পুল দিয়ে আমাদের যেতে হল। সঙ্গমের কাছে এসেই প্রথমে মহামণ্ডলীশ্বর স্বামী কৃষ্ণানন্দজী রথ হতে নেমে অবগাহন স্নান করলেন। সাধুদের স্নানের স্থান পূর্ব হতেই সরকার নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন—মোটা দড়ি দিয়ে তা ঘেরা ছিল এবং শত শত পুলিস পাহারায় রত ছিল। মণ্ডলীশ্বরের স্নানের পরেই নাগারা জলে নামলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও সেই পবিত্র সঙ্গমে ও পবিত্র পূর্ণকুম্ভ যোগে স্নান করতে নামলাম। ভোর ৬-২০তে আমাদের স্নান প্রায় সমাপ্ত হল। অনেকে তাঁদের প্রিয়-জনের নাম করে তাঁদের কল্যাণকামনায় ডুব দিলেন। অনেকে সেই পবিত্র বারি কমণ্ডলুতে বা বোতলে করে ভরে নিলেন। শীত কাটাবার জন্য নাগা সাধুরা কেহ কেহ স্নানান্তে সর্বাঙ্গে বিভূতি লাগিয়ে ডন বৈঠক আরম্ভ করে দিলেন। ধীরে ধীরে ও শান্তভাবে প্রথম শোভাযাত্রাগামী সকলেরই স্নান হয়ে গেলে তাঁরা ফিরে গেলেন তাঁদের তাঁবুতে, এক নম্বর পুলের রাস্তা দিয়ে। অতঃপর নিরঞ্জনী আখড়া, জুনা আখড়া এবং বৈষ্ণব, অবধূত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সাধুরা একে একে শোভাযাত্রা সহকারে সঙ্গমে স্নান করে চলে গেলেন। তারপর সুরু হল ভক্তদের স্নান। অসংখ্য যাত্রী নৌকা করে সঙ্গমের মাঝখানে গিয়ে স্নান সেরে নিলেন। অবশ্য এই সুবর্ণ-সুযোগে নৌকাওয়ালারা বেশ কিছু আয় করে নিয়েছিল। কোনও কোনও নৌকা দুঘণ্টার জন্য দুতিনশত টাকা পর্যন্ত যাত্রীদের কাছে নিয়েছিল। ঘণ্টা দুই পরে আমরা আবার সঙ্গমে এসে দেখি যে চারিদিকেই বিরাট জনসমুদ্র—পুরুষ, নারী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা সকলেই কত আগ্রহ ও কত ভক্তি নিয়ে স্নান করছেন। সমস্ত দিন অমাবস্যাতিথি থাকাতে সমস্ত দিনই স্নান চলেছিল।

কুম্ভের ও প্রয়াগের মাহাত্ম্য অনেকের জানা থাকলেও এখানে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম; আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

কুম্ভযোগ

অনেকেই জানেন যে চার জায়গায় প্রতি বারো বছর অন্তর পূর্ণকুম্ভ-যোগ হয়। যথা হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনী। কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে পূর্ণকুম্ভ হয়, তা নিম্নে বলা হচ্ছে।

কুম্ভরাশিগতে জীবে যদ্দিনে মেষগে রবৌ।
হরিদ্বারে কৃতং স্নানং পুনরাবৃত্তিবর্জনম্॥

অর্থাৎ বৃহস্পতি কুম্ভরাশিতে এবং সূর্য মেষ-রাশিতে অবস্থানকালে, বসন্তকালে বিষুব সংক্রান্তি দিনে হরিদ্বারে কুম্ভযোগ হয়—ঐ সময় স্নান করলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

বৃষরাশিং গতে জীবে মকরে চন্দ্রভাস্করৌ।
অমাবস্যা তদা যোগঃ কুম্ভাখ্যস্তীর্থনায়কে॥

বৃহস্পতি বৃষরাশিতে এবং সূর্য ও চন্দ্র মকর রাশিতে অবস্থান কালে অমাবস্যা তিথিতে তীর্থরাজ প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ-যোগ হয়। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুআরি বৃহস্পতি বৃষরাশিতে প্রবেশ করেছেন এবং ২৩শে মার্চ পর্যন্ত তথায় অবস্থান করবেন। ১৪ই জানুআরি সূর্য মকর রাশিতে প্রবেশপূর্বক ১২ই ফেব্রুআরি পর্যন্ত সেখানে থাকবেন। সুতরাং ৯ই ও ১৪ই জানুআরিতেও কুম্ভস্নানের যোগ ছিল। কিন্তু ২১শে জানুআরি চন্দ্র মকর রাশিতে ছিলেন—ঐ দিন আবার অমাবস্যা ছিল, সুতরাং ২১শে জানুআরি (৭ই মাঘ) বৃহস্পতিবার বৃহস্পতির বৃষরাশিতে ও সূর্য-চন্দ্রের মকর রাশিতে অবস্থানকালে অমাবস্যা তিথিতে তীর্থরাজ প্রয়াগে প্রধান কুম্ভস্নানের যোগ ছিল।

সিংহরাশিং গতে সূর্যে সিংহরাশ্যাং বৃহস্পতৌ।
গোদাবর্যাং ভবেৎ কুম্ভঃ জায়তে খলু মুক্তিদঃ॥

অর্থাৎ সিংহে বৃহস্পতি ও রবির অবস্থান-কালে শ্রাবণ মাসে গোদাবরীতটে নাসিকে মুক্তিপ্রদ কুম্ভযোগ হয় এবং

মেষরাশিং গতে সূর্যে সিংহরাশ্যাং বৃহস্পতৌ।
উজ্জয়িন্যাং ভবেৎ কুম্ভঃ সর্বসৌখ্যবিবর্ধনঃ॥

সিংহে বৃহস্পতি ও মেষে রবির অবস্থানকালে কার্তিক মাসে উজ্জয়িনীতে পবিত্র ক্ষিপ্রানদীতে (ধারানগরী) সর্বমঙ্গলপ্রদ কুম্ভ স্নান হয়। উজ্জয়িনীর পূর্বে নাম ছিল অবন্তিকা। এছাড়া বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে ও সূর্য মেষরাশিতে অবস্থিত হলে বৈশাখ মাসে হরিদ্বারে এবং বৃহস্পতি বৃশ্চিকে ও সূর্য মকরে স্থিত হলে মাঘ মাসে প্রয়াগে অর্ধকুম্ভ হয়। কথিত আছে যে প্রাচীন কালে কেবলমাত্র সাধুসন্তরাই কুম্ভস্নানের জন্য একত্র সমবেত হয়ে নানাবিধ ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয় আলোচনাদি করতেন। ইদানীং কিন্তু লক্ষ লক্ষ ধর্মপিপাসু নরনারী পুণ্যার্জন-মানসে শত কষ্ট ও অসুবিধা স্বীকার করেও কুম্ভস্নান করেন।

হরিদ্বার ও প্রয়োগের পূর্ণকুম্ভ-যোগে সর্বাধিক লোক সমাগম হয়।

কুম্ভের ইতিহাস

পুরাণে কুম্ভস্নানের উল্লেখ আছে। দেবতা ও দানবগণ সম্মিলিতভাবে ক্ষীরোদসাগর মন্থন করলে পুষ্পক রথ, ঐরাবত হস্তী, পারিজাত বৃক্ষ, কামধেনু প্রভৃতি তেরটি অমূল্য রত্ন উত্থিত হয়। সেগুলি আপসে দেবতা ও দানবদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়। অবশেষে ধন্বন্তরি সুন্দর সুধাপূর্ণ কুম্ভ নিয়ে যখন উত্থিত হলেন তখন দেবতা ও দানবদের মধ্যে তার বণ্টন ও অধিকার নিয়ে ঝগড়া লাগল। সুধা-পান করলে দানবরা অমর হয়ে যাবে এবং চিরকাল দেবতাদের উৎপীড়ন করবে—এই ভয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্ত কাকের রূপ ধারণ করে

অতর্কিতে সুধাকুম্ভ নিয়ে পলায়ন আরম্ভ করেন। শুক্রাচার্যের উপদেশে দানবরা, বিশেষ করে রাহু ও কেতু জয়ন্তকে অনুসরণ করতে থাকে। তাদের হাত হতে অমৃতকুম্ভ রক্ষার জন্য জয়ন্ত প্রথমে হরিদ্বারে (ব্রহ্মকুণ্ডে), পরে প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে, তারপর নাসিকে ও উজ্জয়িনীতে কুম্ভ লুকিয়ে রাখেন।

দৈত্যগণ যখনই অমৃতকুম্ভ হস্তগত করার চেষ্টা করছিলেন তখনই সুধা যাতে না পড়ে যায় তজ্জন্য চন্দ্রদেব, কুম্ভটি যাতে না ভেঙ্গে যায় তজ্জন্য ভগবান সূর্য, এবং দৈত্যগণ যাতে নষ্ট করতে না পারে তজ্জন্য সুরগুরু বৃহস্পতি—এই তিন জন বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। সেজন্য পুরাণকারগণ ঐ তিন জনের অবস্থান অনুসারে কুম্ভস্নানের সময় নিরূপণ করেছেন। কুম্ভযোগ সম্বন্ধে নিম্নরূপ শাস্ত্রপ্রমাণ পাওয়া যায়:

গঙ্গাতীরে প্রয়াগে চ ধারাগোদাবরীতটে।
কলসাখ্যোহি যোগোঽয়ং প্রোচ্যতে শঙ্করাদিভিঃ॥

অর্থাৎ শ্রীশঙ্কর প্রভৃতি আচার্যগণ বলেছেন যে হরিদ্বারে, প্রয়াগে, ধারানগরীতে (উজ্জয়িনী) ও গোদাবরীতটে (নাসিকে) কুম্ভযোগে স্নান হয়।

কথিত আছে যে প্রতি স্থানে বারোদিন করে জয়ন্তের সঙ্গে দৈত্যদের যুদ্ধ হয়; ঐ সময় দু'চার ফোঁটা সুধা ঐ চারটি পবিত্রস্থানে পতিত হয়। দেবতাদের বারো দিন মানুষের কাছে বারো বছর। তাই বারো বছর অন্তর এই স্নান হয়। সুধামিশ্রিত এই পবিত্র জলে স্নান করলে সকলে অমৃতত্ব লাভ করবেন বা মুক্ত হ'য়ে যাবেন, এই বিশ্বাস নিয়েই রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, সাধু-গৃহী সকলেই এসে সমবেত হন। কতশত যুগ ধরে যে এই কুম্ভস্নান চলে আসছে তাহা বলা শক্ত; তবে কয়েক হাজার বছরের কম নয়।

তীর্থরাজ প্রয়াগ

এবার ত্রিবেণী বা তীর্থরাজ প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ হল; সেজন্য প্রয়াগ সম্বন্ধে দু-চারটি কথা বলে এই প্রবন্ধের উপসংহার করব। উত্তরপ্রদেশের একটি প্রধান শহর এলাহাবাদ—কেহ কেহ বলেন, এলাহাবাদ নাম দিয়েছিলেন সম্রাট আকবর। ইহার অর্থ আল্লার বাসস্থান। পূর্বে ইহা প্রয়াগ নামেই খ্যাত ছিল। পবিত্র গঙ্গা ও যমুনা এবং গুপ্তা সরস্বতী নদীর সঙ্গম এখানে হয়েছে বলেই ইহার প্রসিদ্ধি এত বেশী। মহাভারত, পুরাণ ও কৃত্যকল্পতরু নামক ধর্মশাস্ত্রে প্রয়াগের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। ভগবান বুদ্ধদেবের সময়ে এই প্রয়াগ কোশলরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি স্বয়ং এই স্থান পরিদর্শন করেছিলেন। হিন্দুমাত্রেরই ধারণা যে প্রয়াগ অতি পবিত্র তীর্থ—এইস্থানে অনেকে চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করেন, অনেকে অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করেন যে প্রয়াগে এলে পাপমুক্ত হওয়া যায়। অনেকের ধারণা এখানে মৃত্যু হলে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক যাত্রী হুয়েন সাঙ্‌ ও ফা হিয়েন প্রয়াগ দর্শন করেছিলেন। এঁদের ভ্রমণবৃত্তান্তে প্রয়াগের তখনকার দিনের গভীর আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার কথা উল্লেখ আছে। এঁরা লিখেছেন, তখন অধিবাসীরা সকলেই হিন্দু ছিলেন, সমগ্র ভারতবর্ষের রাজা-মহারাজা হতে সামান্য ব্যক্তি পর্যন্ত এখানে আগমন করতেন ও যথাসাধ্য দানাদি করতেন। লোকের বিশ্বাস ছিল যে প্রয়াগে দান করলে তার ফল হয় শতগুণ। রাজা হর্ষবর্ধন এখানে কয়েক-বার যথাসর্বস্ব, এমন কি নিজের রাজবেশ পর্যন্ত দান করেছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ লেখক কহ্লাণ তাঁর বিখ্যাত রাজতরঙ্গিণী পুস্তকে উল্লেখ করেছেন যে কাশ্মীরের রাজা জয়দীপ অষ্টম শতাব্দীতে প্রয়াগে আসেন এবং

৯৯৯৯৯টি অশ্ব দান করেন। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা নাকি বেদোদ্ধার-কল্পে এই পুণ্যক্ষেত্র প্রয়াগে বিরাট যজ্ঞ করেছিলেন; এ কাহিনীর উল্লেখ আছে মহাভারতে। ঋগ্বেদ ও শতপথ-ব্রাহ্মণেও গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমের কথা উল্লেখ আছে। সুতরাং প্রয়াগকে যে তীর্থরাজ বলা হয়েছে তাতে আর আশ্চর্য কি! গঙ্গা ও যমুনার তীরেই যুগ যুগ ধরে ভারতের সভ্যতা ও কৃষ্টি গড়ে উঠেছে। আর যেখানে এই বিখ্যাত পবিত্র নদীদ্বয় মিলিত হয়েছেন সে স্থানের মাহাত্ম্য ও প্রাধান্য যে কত বেশী, তা সহজেই অনুমেয়।

এই পবিত্রস্থানে এলে মানুষের মন সহজেই অন্তর্মুখ হতে চায়—এই পবিত্র সঙ্গমে স্নান করলে শরীর মন নিষ্পাপ হয়ে যায়, বিশেষ করে পূর্ণ কুম্ভযোগে প্রয়াগে অবগাহন করতে পারলে পুনর্জন্মের আর ভয় থাকে না; এ স্থানে পরম প্রশান্তিতে মন প্রাণ ভরে ওঠে।

প্রার্থনা

শ্রীমতী শিবানী মৈত্র

অনন্ত মাধুর্যে ভরা ঐ নাম খানি
কত বক্ষমাঝে দিল কত আশা আনি;
কত ব্যথিতের প্রাণ—অমৃতের মত
লভিল পরম শান্তি! যত ব্যথাহত
বঞ্চিত হৃদয়—হায় কি আনন্দধারা
তোমার নামের মাঝে পেয়েছে তাহারা!
তোমার চরণতলে দশদিক হতে
কত নরনারী আসে ভক্তিপ্রেমে মেতে
লভিতে পরম ধন। শঙ্কিত হৃদয়
তব কাছে আসি লভে পরম নির্ভয়।
কত শত দিক হ'তে কত শত জন
তোমার চরণে আসি নিতেছে শরণ!
হে চিরসুন্দর নাথ! দাও মোরে আশা-
তোমার চরণে ঢালি সব ভালবাসা
তব নাম স্মরি যেন হে হৃদয়স্বামী,
এ সংসার হ'তে যবে চলে যাব আমি।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

(এক)

[বলরামবাবুকে লিখিত]

শ্রীশ্রীহরি শ্রীচরণ ভরসা। ৺বৃন্দাবনধাম

(২২শে মার্চ, ১৮৯০)

নমস্কার নিবেদনঞ্চ বিশেষ

আপনার পত্র পাইয়া বিস্তারিত অবগত হইলাম। আপনার শরীর এখন সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয় নাই শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। সুরেশবাবুর পীড়া শুনিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলাম। সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তাঁহার যাহা মনে আছে তাহাই হইবে। মনুষ্য ভাবিয়া কোন প্রতিকার করিতে পারে না। তথাচ কেহ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। উপস্থিত জলবায়ু এখানকার ভাল নয়, হঠাৎ পরিবর্তন হইয়াছে। এখানে চৌদ্দআনা রকম লোক জ্বরে ভুগিতেছে, কোন ২ মন্দিরে লোক অভাবে কার্য বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। আপনাদের মন্দিরের প্রায় সকলে জ্বরে ভুগিতেছে। আমি ৩।৪ দিবস খুব ভুগিয়াছি, অদ্য দুই তিন দিন পথ্য পাইয়াছি মাত্র; শরীর বড় দুর্বল এবং অত্যন্ত অরুচি। সুবোধের জ্বর হইয়াছিল, এখন ভাল আছে। এবার এখানে একপ্রকার Peculiar জ্বর। সকলের এইরূপ হইতেছে। প্রথমে গা কামড়ান, তারপর কাশি, তারপর খুব জ্বর। পরে ২।৩ দিনের জ্বরে অত্যন্ত দুর্বল। অধিক গরম এখন পড়ে নাই। শেষ রাত্রে একটু ২ শীত হয়। মাতাঠাকুরাণী বোধ হয় চৈত্র মাসে ৺গয়ায় যাইবেন। তিনি কেমন আছেন এবং কোথায় আছেন লিখিবেন। আমার অসংখ্য প্রণাম তাঁহার চরণে জানাইবেন; বরাহনগরের সকলকে আমার নমস্কার জানাইবেন। ইহা নিবেদন। ইতি—

নিঃ শ্রীরাখাল

(দুই)

[বলরামবাবুকে লিখিত]

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা। ৺বৃন্দাবনধাম

(৩০শে মার্চ, ১৮৯০)

নমস্কার নিবেদনঞ্চ বিশেষ

বৃন্দাবনে এখনো জ্বরের প্রাদুর্ভাব খুব। এখন কমে নাই। শ্রীযুত ব্রহ্মচারিজীর জন্য ২।১টি ছোট Enameled বাটী রামচন্দ্র বেনিয়ার মারফৎ পাঠাইয়া দিবেন। কারণ উক্ত ব্রহ্মচারী কতকদিবস হইতে আমাকে লিখিবার জন্য কহিতেছেন। এখানে শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ (বহরমপুর edition) পর্যন্ত আছে, বক্রি নাই এবং আসিতেছে না। বক্রি কি এখানে আসিবে না আপনার নিকট আসিতেছে লিখিবেন। কালী ও বাবুরাম এতদিনে কলিকাতায় গিয়াছে কিনা লিখিবেন। ইহা নিবেদন। ইতি তারিখ ১৮ই চৈত্র

নিঃ শ্রীরাখাল

(তিন)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা। Behea

22nd December, 1895

প্রিয় হরিমোহন,

২।৩ দিবস হইল তোমার এক পত্র পাইয়া বিস্তারিত অবগত হইলাম। Change-তে তোমার উপকার হইতেছে না জানিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইলাম। ওখানকার Climate ত ভাল, তবে কেন তোমার উপকার হইতেছে না? আমার বিবেচনায় আর দিন ২০ দেখা উচিত, কারণ অনেক স্থানে হয়ত প্রথম উপকারবোধ হয় না, পরে থাকিতে ২ উপকার হয়। একলা আছ বলিয়া কোনরূপ মনে চিন্তিত বা উদাস হইও না, সর্বদা মনে প্রফুল্ল অবস্থায় থাকিবে। আমার যে বিপিনবাবুর নিকট হইতে যাওয়া ভার, নচেৎ তোমার নিকট চলিয়া যাইতাম। বিপ্রদাসবাবু তোমার তত্ত্বাবধান কেমন করেন, সকল আমাকে খুলিয়া লিখিবে। শ্রীশ্রীবৃন্দাবন যাইতে ইচ্ছা করিয়াছ; বেশ ত, একবার গিয়া দর্শনাদি করিয়া আসিবে। সেখানকারও Climate মন্দ নহে; তবে যৎপরোনাস্তি ঠাণ্ডা ও শীত, এইজন্য একটু বিলম্ব করিয়া যাইলে ভাল হয়। সেখানে আমাদের দুইজন আছেন এবং তথায় থাকিবার স্থান অতি সুন্দর আছে। যদ্যপি একাকী মন ওখানে না বসে, তাহা হইলে পত্রপাঠ আমাকে লিখিবে, আমি বৃন্দাবনে পত্র লিখিব ও বন্দোবস্ত করিব। কিন্তু বোধ হয় Brindaban অপেক্ষা Etowa-র জলবায়ু ভাল, তবে কাহার কোন স্থান suit করে কিছু বলা যায় না। আমার পত্রের জবাব দিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে, তাহার কারণ কলিকাতা হইতে যোগেন মহারাজ কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করেন, সেই সবগুলির জবাব দিতে আমি বড় ব্যস্ত ছিলাম। আজ ৪।৫ দিবস হইল তোমায় ডাইল কালী পাঠাইয়া দিয়াছে।

একটি বাবু, নন্দনবাগানে তাহার বাটী, তিনি—Arah-য় তাঁহার আত্মীয় একজন Dy. Collector—তাঁহার নিকট Change করিতে আসিয়াছেন এবং কতকটা উপকারও পাইয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করেন Etowah-তে কিছু দিন থাকিতে। তিনি একাকী, বয়স ২০।২২ আন্দাজ। ছোকরাটি ভাল, আমাদের সারদা মহারাজের আলাপী। তোমার সঙ্গে একত্রে থাকিবার সুবিধা কি হইতে পারে? তিনি খরচ ইত্যাদি half দিবেন। যেরূপ বিবেচনা কর আমাকে সত্বর লিখিবে। আর যদ্যপি বৃন্দাবন যাইতে ইচ্ছা কর তাহা হইলেও লিখিও। তথায় বাবুরাম ভায়া ও কালীকৃষ্ণ আছেন। আমার শরীর ২।১ দিন ভাল ও ২।৪ দিন মন্দ, এইরূপ অবস্থায় চলিতেছে। বোধ করি কোন কারণবশতঃ আমাকে কলিকাতায় সত্বর যাইতে হইবে। তুমি আহার ও বেড়ান ইত্যাদি বেশ সাবধানে করিবে। কোনরূপ মনে ভাবনা করিও না। সত্বর পত্র লিখিবে, কারণ আমি তোমার শরীর সুস্থ না থাকায় চিন্তিত আছি। আজও ব্যস্ত, অনেক পত্রের জবাব দিতে হইবে। ইতি—

Sincerely yours

Brahmananda

নৈষা তর্কেণ

শ্রীশিবশম্ভু সরকার

গঙ্গার ঢেউ ত্বলে ত্বলে যায়
আকাশের আলো পাখা মেলে তার 'পরে—
রাতের পরশে তিমিরে কি জ্যোছনায়
রূপের সাগর অপরূপে লীলা করে!

চোখ মেলে তুমি নাই দেখ যদি তবু—
রাশি রাশি ফুল ফুটিছে প্রহরে প্রহরে-
ঝরা ফুল হেরে খেদ জাগে পাছে কভু
ধরা ভ'রে নিতি কুসুম স্তবক শিহরে!

পাহাড়ে পাথারে আননে কাননে
আলোর নেশায় রূপের নিশান খোলে—
তুমি বচনে ও মনে, নাই নিলে মেনে
তবুও ভুবনে রূপের দেবতা দোলে!

সত্যের ছায়া আকাশেতে ভাসে
কায়া ধরে, আর কাঁদে হাসে এই ভুবনে-
মানা, না-মানায় কিবা যায় আসে
নদা বয়, ফুল সুরভি ছড়ায় পবনে!

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা*

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী নির্বেদানন্দ

অজানা সাগরবুকে পাড়ি

এসময় শ্রীরামকৃষ্ণের মন আধ্যাত্মিক ভাব-সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে উদ্দামবেগে ছুটে চলেছিল। শুধু মা-কালীর দর্শনলাভ করে তার গতিবেগ থামতে চাইল না; ভগবানকে আরো বহু রূপে দেখতে চাইলেন তিনি। তাঁর অন্তরে যে সর্বগ্রাসী ক্ষুধার আগুন জ্বলছিল, একটিমাত্র ভাবাবলম্বনে ভগবানকে উপলব্ধি করে সে আগুন নিভবে কেন? শৈশবে গ্রামের বাড়িতে তিনি রঘুবীরের পূজা করতেন। ভগবানকে সেই শ্রীরামচন্দ্ররূপে প্রত্যক্ষ করার জন্য তিনি পাগল হয়ে উঠলেন। পুরাণ-বর্ণিত অযোধ্যাপতি ক্ষত্রিয়রাজ এই রামচন্দ্রকে অসংখ্য হিন্দু নরনারী ঈশ্বরাবতার বলে আজও পূজা করে আসছেন। শ্রীভগবানকে রামরূপে আরাধনার আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ামাত্র তাঁর নমনীয় মন রামগতপ্রাণ বানরাধিনায়ক মহাবীরের ধাঁচে পুরোপুরি গড়ে উঠল। এই ভক্তরাজের সঙ্গে নিজের সত্তাকে একেবারে মিশিয়ে দিলেন তিনি। তাঁরই মত আহার, আচরণ এমন কি গাছের ডালে লাফিয়ে চলা ইত্যাদিও শুরু করলেন। মুখে সর্বদা 'রঘুবীর' নাম লেগে থাকত। এই অদ্ভুত আধ্যাত্মিক সাধনার শেষে শ্রীরামচন্দ্রের অনুপমা সহধর্মিণী, হাজার হাজার বছর ধরে হিন্দু নারীগণ কর্তৃক পূজিতা, সতীত্বের মূর্ত প্রতীক সীতাদেবীর দর্শনলাভে তিনি ধন্য হন।

যে স্থানটিকে এখন পঞ্চবটী বলা হয়, সেখানে তিনি একাকী বসেছিলেন সেদিন। হঠাৎ দেখেন, মুখে অসাধারণ গাম্ভীর্যের ভাব নিয়ে করুণা-মাখা নয়নে একদৃষ্টে তাঁকে দেখতে দেখতে বাগানের উত্তর দিক থেকে একটি স্ত্রীমূর্তি এগিয়ে আসছে। পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় ছিলেন তিনি; গঙ্গা, গাছপালা ইত্যাদি চারিদিকের সব কিছু জিনিস যেমন দেখছিলেন তেমনি সহজভাবে তাঁকেও দেখলেন। আচরণ ও অপরূপ দৃষ্টিতে অসাধারণ কমনীয়তা ফুটে ওঠা ছাড়া দেবীমূর্তির আর কোন চিহ্নই কিন্তু সে মনোরম মানবী-মূর্তিতে ছিল না। অবাক-বিস্ময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবছেন, ইনি কে? এমন সময় পাশের গাছ থেকে একটি হনুমান আনন্দে চীৎকার করে লাফিয়ে পড়ে, স্ত্রীমূর্তিটির কাছে ছুটে গিয়ে পরম ভক্তিভরে তাঁর চরণ-বন্দনা করল। চকিতে শ্রীরামকৃষ্ণের মন বলে উঠল, ইনি নিশ্চয়ই সীতাদেবী! চিন্তামাত্র সারাদেহ কণ্টকিত হয়ে উঠল; "মা মা" বলে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়তে উদ্যত হয়েছেন, এমন সময় বিপুল বিস্ময়ে দেখলেন, সীতাদেবী আরো এগিয়ে এসে তাঁর দেহে প্রবেশ করে তাঁর সত্তার সঙ্গে মিশে গেলেন। এই রোমাঞ্চকর অন্তর্ধানের পূর্বে সীতাদেবী তাঁকে বলে যান, "আমার হাসিটি তোমায় দিয়ে গেলাম"।

শ্রীরামকৃষ্ণের স্বাস্থ্য এদিকে বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের মনে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার করছিল। একাদিক্রমে তিন বৎসরকাল একটানা অধ্যাত্মসাধনার ও ভাবরাজ্যে বিচরণের ফলে

* লেখকের মূল গ্রন্থ Sri Ramakrishna & Spiritual Renaissance হইতে অনূদিত।

তাঁর শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। ঘুম বিন্দুমাত্র হত না, একরকম না খেয়েই থাকতেন তিনি। স্নায়ুমণ্ডলী যেন পুড়ে যাচ্ছিল। সারা শরীর জ্বলে যেতো এবং কখনো কখনো রোমকূপ থেকে বিন্দু বিন্দু শোণিত নির্গত হত। ভাগিনেয় হৃদয় প্রাণ ঢেলে সেবা না করলে এ সময় তাঁর শরীর বোধ হয় থাকত না। তাঁর দেহের এই অবস্থা দেখে মথুরবাবু বিচলিত হলেন, স্নেহোদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর চিকিৎসার জন্য কলকাতার একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক নিযুক্ত করলেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙ্গে পড়ছে দেখে গভীর উদ্বেগবশে মথুরবাবু ও রাণী রাসমণি অবিবেচকের মত ভেবে বসলেন যে তাঁর অটুট ব্রহ্মচর্য একবার ভেঙ্গে দিতে পারলে বোধহয় তাতে কিছু ফল হতে পারে। এই ভেবে টাকা দিয়ে নষ্টচরিত্র রমণীদের নিয়ে এসে কৌশলে তাঁকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করতে লাগিলেন। দুবারের চেষ্টা বিফল হল; শ্রীরামকৃষ্ণের মনে দেহবোধের কোন রেখাপাত করা গেল না। রমণীদের দেখামাত্র বিপদের সম্ভাবনা টের পেয়ে একেবারে দেহবুদ্ধি-বিরহিত হয়ে সরল বালকের মত তিনি ছুটে চলে যেতেন তাঁর হৃদয়পদ্মে নিত্যবিরাজিতা মা-কালীর কোলে, নিরাপদ আশ্রয়ে। দেখেশুনে রাসমণি ও মথুরবাবু বিস্ময়ে হতবাক হলেন। কাজটা বুদ্ধিহীনতাপ্রসূত হলেও তরুণ পূজারীর অকপট হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে সম্পূর্ণ সদিচ্ছা নিয়েই একাজে নেমেছিলেন তাঁরা। এখন তাঁরা এবং তাঁদের এই পরিকল্পনার কর্মনির্বাহকেরা সকলেই প্রাণে প্রাণে বুঝলেন যে এভাবে চেষ্টা করতে যাওয়াটাই বড় বোকামি হয়ে গেছে। এজন্য লজ্জিত এবং অনুতপ্তও হলেন সবাই। এই অগ্নিপরীক্ষায় শ্রীরামকৃষ্ণকে অক্ষত অবস্থায় উত্তীর্ণ হতে দেখে তাঁর প্রতি রাণী রাসমণির ও মথুরবাবুর বিশ্বাসের আর কোন কূল-কিনারা রইল না; অকপট, দুর্লভ ঈশ্বর-প্রেমিক বলে স্থিরবিশ্বাসে তাঁরা তাঁকে হৃদয়ে পূজার আসনে বসালেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে নীরোগ করার সব প্রচেষ্টা এভাবে বিফল হল দেখে এবং স্থানপরিবর্তনে স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হতে পারে ভেবে অবশেষে তাঁরা তাঁকে কিছু-দিনের জন্য তাঁর গ্রামের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময় তিনি কামারপুকুরে নিজ গৃহে ফিরে যান। নতুন পরিবেশের দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে এখানেও তাঁর বেগবান মন অধ্যাত্মমার্গে অগ্রসর হয়ে চলল। নিশাকালে শ্মশানে গিয়ে তিনি কঠোর তপশ্চর্যায় ব্রতী হতেন। আত্মীয়েরা ভাবলেন, তিনি পাগল হয়ে গেছেন। তাঁর শরীরের এই দুর্বল অবস্থা দেখে, এবং বোধ হয় পাগলও হয়েছেন ভেবে তাঁর জননীর আর উদ্বেগের সীমা রইল না। এর প্রতিকারকল্পে জননী তাঁর সাধ্যমত সব কিছুই করলেন। এমনকি ছেলেকে হয়ত ভূতে পেয়েছে ভেবে একজন ভূতের ওঝা-কেও ডাকালেন। যাই হোক, কয়েক মাস গ্রামে বাস করার পর শ্রীরামকৃষ্ণ একটু প্রকৃতিস্থ হলেন, সহজ মানুষের মত চলতে লাগলেন। শ্মশানে গিয়ে রাত্রে ধ্যান করা অবশ্য বন্ধ হল না; তবে তাঁর অস্থির ভাব চলে গেল, কান্না-কাটিও থামল। তাঁর জীবনযাত্রার এই ধারায় আত্মীয়েরা একরকম অভ্যস্ত হয়ে গেলেন। তেইশ বছর বয়সের জোয়ান ছেলেকে সংসারে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতে দেখে তাঁর জননীর কিন্তু বুক ফেটে যেত। তিনি ভাবলেন, বিবাহ দিলে বোধ হয় ছেলের মন ঘুরতে পারে। কি আশ্চর্য, সরল রামকৃষ্ণ এ প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন

তৎক্ষণাৎ। তাঁর জননী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামেশ্বর কালবিলম্ব করলেন না, স্থানীয় অঞ্চলে যোগ্যা পাত্রীর সন্ধান করতে লেগে গেলেন। কিন্তু মনের মত পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেল না। তাঁদের বিফলমনোরথ হতে দেখে ভাবাবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই একদিন বললেন যে, জয়রামবাটী গ্রামে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে তাঁর জন্য পাত্রী "কুটো-বাঁধা" হয়ে আছে। এ কথার খুব বেশী দাম কেউ দিলেন না। তবু একবার খোঁজ করা হল এবং তাঁর কথামত যথাস্থানে রামচন্দ্রের পাঁচ-ছয় বছরের কন্যা সারদামণির সন্ধানও মিলল। সকলে বিস্মিত হলেন। বিবাহে কোন পক্ষের অমত হল না। কিছুদিনের মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদামণি যথাবিধি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। তেইশ বছরের যুবকের সঙ্গে পাঁচ বছরের বালিকার এই অদ্ভুত বিবাহের কথা শুনে আধুনিকেরা বোধ হয় চমকে উঠবেন। কিন্তু হিন্দুদের কাছে এ বিবাহ দুটি আত্মাকে একসূত্রে বেঁধে দেবার ধর্মসম্মত বহিরঙ্গ অনুষ্ঠান ছাড়া আর কিছু নয়। হিন্দু শাস্ত্রমতে বাল্যবিবাহে যৌবনোদ্ভেদের পূর্ব পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলন নিষিদ্ধ থাকে। কাজেই এ বিবাহ পাশ্চাত্য সমাজে প্রচলিত বিবাহে বাগ্দানের চেয়ে বেশী কিছু নয়। তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে এসব প্রশ্ন ওঠেই না। তাঁর বিবাহ সবদিক থেকেই দুটি আত্মার আধ্যাত্মিক মিলন মাত্র; আর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সে সম্পর্কের মধ্যে এই আধ্যাত্মিক মিলনের ভাবই প্রকট ছিল; দৈহিক সম্পর্কের কোন চিন্তাই এই অতিমানব-দম্পতির দিব্যপ্রেমে আবিলতা মেশাবার সুযোগ কখনো পায় নাই।

বিবাহের পর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় দেড় বছর কামারপুকুরে ছিলেন। তারপর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আবার মা-কালীর পূজার ভার গ্রহণ করেন। মা কালী তাঁর জন্য যেন অপেক্ষা করেই ছিলেন—ফেরার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের মত তাঁর ঘাড়ে এসে পড়লেন। আবার তাঁর আধ্যাত্মিক উন্মাদনা দেখা দিল। ক্ষুধিত আত্মার আকুল অন্বেষণ চতুর্গুণ উদ্যমে আবার শুরু হল। মায়ের জন্য করুণ ক্রন্দনে গগন ভরে উঠল আবার; ভাবের আতিশয্যে তাঁর স্নায়ুমণ্ডলীও বিপর্যস্ত হতে লাগল। অবশ্য ধ্যানকালে বহুবিধ অদ্ভুত উপলব্ধি হওয়ায় স্নিগ্ধতা ও সান্ত্বনায় তাঁর মন ভরে যেত। এই সময় তাঁর দেহবোধ প্রায় থাকত না। মাসের পর মাস শরীরের কোন যত্নই নেন নি তিনি। মাথার চুল বড় হয়ে জট-পাকিয়ে গিয়েছিল। জড়বৎ নিশ্চল হয়ে যখন তিনি ধ্যানে বসতেন, তখন তাঁর দেহকে জড় পদার্থ ভেবে পাখীরা এসে মাথার ওপর বসত, খাদ্যের সন্ধানে ঠোঁট দিয়ে জটা ঠোকরাতো। ধ্যানকালে তিনি কখনো কখনো দেখতেন, তাঁরই অনুরূপ একজন যুবক সন্ন্যাসী তাঁর শরীর থেকে বেরিয়ে এসে কত কি উপদেশ দিয়ে আবার তাঁর শরীরে প্রবেশ করলেন। একবার দেখেন, এক অতি ভীষণ কৃষ্ণকায় পুরুষ তাঁর শরীর থেকে বেরিয়ে এল। বুঝলেন, এ পাপপুরুষ। সঙ্গে সঙ্গে ঐ সন্ন্যাসীটিও বেরিয়ে এসে তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন এবং ত্রিশূলের আঘাতে তাকে হত্যা করে আবার তাঁর শরীরে এসে প্রবেশ করলেন।

নিজ সরল বিশ্বাসের সন্ধানী আলো ফেলে মনের ভেতর তিনি তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়াতেন এবং মায়ের ও তাঁর মাঝখানে ব্যবধান সৃষ্টি করার মত যা কিছু দেখতে পেতেন সেখানে, সবল হস্তে তা সরিয়ে ফেলতেন তৎক্ষণাৎ। এ কাজটির পদ্ধতিও ছিল অভিনব। মন থেকে কাঞ্চনাসক্তি সর্বতোভাবে বর্জন করার জন্য তিনি অদ্ভুত একটি উপায় অবলম্বন করেছিলেন। এক

হাতে কয়েকটি টাকা ও অপর হাতে এক মুঠো মাটি নিয়ে তিনি বিচার করতেন যে, মাটির চেয়ে টাকার শ্রেষ্ঠতা কিছু নাই—'টাকা মাটি, মাটি টাকা।' আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভের পথে সহায়তা করা তো দূরের কথা, টাকা মানুষের মনে অহঙ্কার ও ভোগবাসনা বাড়িয়ে দেয়; কাজেই একমুঠো মাটির মতই তা তুচ্ছ। এই ভাবতে ভাবতে তিনি টাকা ও মাটি একসঙ্গে মিশিয়ে দুই-ই গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করতেন। যতক্ষণ না মনে হত কাঞ্চনত্যাগ পূর্ণাঙ্গ হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বারে বারে এরূপ করে চলতেন তিনি। জাতি-অভিমান এবং 'আমি অপরের চেয়ে বড়' এরূপ ভাবের উদ্দীপক সর্altবিধ অভিমান মন থেকে উৎখাত করার জন্য কিছুদিন তিনি মেথরদের পায়খানা স্বহস্তে পরিষ্কার করেছিলেন; নিজের চুল দিয়ে সেখানকার মেজে মুছে দিতেন। মনের নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য স্ত্রীলোকদের এবং অশুচি বিষয়ী লোকদের সঙ্গ তিনি সযত্নে পরিহার করে চলতেন।

তাঁর ইচ্ছাশক্তি এত দুর্দমনীয় ছিল যে, মন থেকে এভাবে একবার যা ত্যাগ করতেন, তাঁর স্নায়ু ও মাংসপেশী পর্যন্ত সে জিনিস আর সহ্য করতে পারত না কখনো—অতি তিক্ত, অতি বেদনাদায়ক বলে বোধ হত তার সংস্পর্শ। এই জন্যই পরবর্তী জীবনে স্ত্রীলোকদের সামান্য স্পর্শেও তাঁর শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা হত, অপবিত্র লোকের সংস্পর্শ তাঁর স্নায়ুমণ্ডলীকে বিপর্যস্ত করে তুলত এবং টাকা ছুঁলেই হাত যন্ত্রণায় বেঁকে যেত। উচ্চ আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন মনের সুরের সঙ্গে তাঁর দেহের সুরও একই পর্দায় বাঁধা ছিল; তাঁর ত্যাগের কঠোর সঙ্কল্পের বিপরীত পথে শরীর যখনই পা বাড়াত, তখনই শাস্তি পেতে হত তাকে।

এ সময়কার কঠোরতার ফলে তাঁর শরীরের ওপর অত্যধিক চাপ পড়ে। শরীর যে কীভাবে ভেঙ্গে আসছিল, তার বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়েছেন: "আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাবল্যে সাধারণ জীবের শরীরে ওরূপ হওয়া তো দূরে থাকুক, ওর এক চতুর্থাংশ বিকার উপস্থিত হলে শরীর ত্যাগ হয়। দিবারাত্রির অধিকাংশ ভাগ মা-র কোন না কোনরূপ দর্শনাদি পেয়ে ভুলে থাকতাম তাই রক্ষে, নইলে (নিজ শরীর দেখিয়ে) এই খোলটা থাকা অসম্ভব হত। তখন হতে আরম্ভ হয়ে দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল তিলমাত্র নিদ্রা হয় নাই। চক্ষু পলকশূন্য হয়ে গিয়েছিল, সময়ে সময়ে চেষ্টা করেও পলক ফেলতে পারতাম না। কতকাল গত হল, তার জ্ঞান থাকত না এবং শরীর বাঁচিয়ে চলতে হবে—একথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। শরীরের দিকে যখন একটু আধটু দৃষ্টি পড়ত তখন সেটার অবস্থা দেখে বিষম ভয় হত; ভাবতাম, পাগল হতে বসেছি নাকি? দর্পণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখতাম, চোখের পলক তাতেও পড়ে কি না। তাতেও চোখ সমভাবে পলকশূন্য হয়ে থাকত! ভয়ে কেঁদে ফেলতাম এবং মাকে বলতাম—'তোকে ডাকার ও তোর ওপর একান্ত বিশ্বাসে নির্ভর করার কি এই ফল হল? শরীরে বিষম ব্যাধি দিলি?' আবার পরক্ষণেই বলতাম, 'তা যা হবার হোক গে, শরীর যায় যাক, তুই কিন্তু আমায় ছাড়িস নি··· আমি যে মা তোর পাদপদ্মে একান্ত শরণ নিয়েছি, তুই ভিন্ন আমার যে আর অন্য গতি একেবারেই নাই!' এভাবে কাঁদতে কাঁদতে মন আবার অদ্ভুত উৎসাহে উত্তেজিত হয়ে উঠত, শরীরটাকে অতি তুচ্ছ হেয় বলে মনে হত এবং মার দর্শন ও অভয়বাণী শুনে আশ্বস্ত হতাম।" এই বর্ণনা থেকেই তাঁর সে-সময়কার

শরীর ও মনের অবস্থা বেশ ভালভাবেই বোঝা যায়। সত্যই তাঁর শরীরে আর কিছু ছিল না। সারা গা জ্বালা করা, রোমকূপ দিয়ে বিন্দু বিন্দু শোণিত নির্গত হওয়া এবং শরীরে কম্পন জাগা—সবই আবার বিপুলতর বেগ নিয়ে দেখা দিল। জীবনের আশা ক্রমেই ক্ষীণতর হয়ে আসতে লাগল। শুভানুধ্যায়ীরা প্রমাদ গণলেন, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আবার তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু আগের মত এবারেও তাতে ফল কিছু হল না।

কর্ণধারহীন অবস্থায় বিক্ষুব্ধ সাগরের বুকে একাকী পাড়ি লাগিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ শান্তিময় পরমানন্দ-ধাম খুঁজে বের করেছিলেন। লক্ষ্য-স্থলেই যে পৌঁছেছেন, সে কথা বুঝতেও বিলম্ব হয় নি তাঁর। বারে বারে পাড়ি দিয়ে তিনি এই পরমানন্দধামের ভূমি স্পর্শও করেছিলেন বহুবার। কিন্তু এই উদ্দাম অভিযানের মূল্যরূপে শারীরিক সুস্থতা বিসর্জন দিতে হয়েছিল তাঁকে। এই বিপদসঙ্কুল অভিযানের শ্রমে তাঁর শরীর এত-খানি ভেঙ্গে পড়েছিল যে ভগ্নস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের কোন আশা আর ছিল না। প্রচলিত চিকিৎসায় কোন ফল পাওয়া গেল না। চিকিৎসকেরা রোগনির্ণয়ই করতে পারলেন না। এ রোগও বোধ হয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের বাইরের। সাধারণ লোক বাহ্য লক্ষণ দেখে ভুল বুঝল; ভেবে বসল, তিনি পাগল হয়ে গেছেন; বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরা এর প্রতিকার-কল্পে যথাসাধ্য মাথা ঘামালেন। পূর্বেই আমরা দেখেছি, শ্রীরামকৃষ্ণদেবও কখনো কখনো নিজের মানসিক সুস্থতায় সন্দিহান হয়ে উঠতেন এবং শরীরের অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে খুবই বিচলিত হয়ে পড়তেন। কি যে হয়েছে, কি করলেই বা তা সারবে, সে বিষয়ে আলোকসম্পাত করে আসন্ন বিপদ থেকে তাঁর শরীরটাকে রক্ষা করতে পারে, এমন কোন লোকই কাছে-ভিতে ছিলেন না।

তীব্র তপস্যা ও আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবণতার ফলেই তাঁর এই যন্ত্রণার উদ্ভব; সেজন্য কোন ধর্মতত্ত্বপারঙ্গম ব্যক্তির পক্ষেই শুধু এসব লক্ষণ চিনে ও তার যথাযোগ্য প্রতিকারের ব্যবস্থা করে তাঁকে সুস্থ করে তোলা সম্ভবপর ছিল। কোন যোগ্য ধর্মগুরু যদি সেখানে থাকতেন, তাহলে একমাত্র তিনিই তাঁকে এ বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারতেন। যথাযোগ্য শিক্ষা দিয়ে, বলিষ্ঠ মুষ্টিতে হাত ধরে যোগশাস্ত্র-নির্দিষ্ট নির্ভুল পথে ভাবরাজ্যে তাঁর বেগবান মনকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, এমন একজন গুরুর সান্নিধ্য বড় প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল তাঁর। এর জন্য বেশীদিন আর অপেক্ষা করতে হল না; এরূপ একজন পথ-প্রদর্শক নিজেই এসে হাজির হলেন। সস্নেহে হাত ধরে তিনি সরিয়ে নিয়ে এলেন তাঁকে সাধনসমুদ্রের ঝটিকাবিক্ষুব্ধ অঞ্চল থেকে আর এ সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে অন্যদিকে যে পথ ধরে চলে পূর্বগ সাধকগণ শান্তিধামে পৌঁছেছেন, সেই সুপরিচিত পথ দিয়ে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে চললেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। সে অঞ্চলে সাগর অপেক্ষাকৃত শান্ত, ঝড়ঝঞ্ঝার ভয় সে পথে অনেক কম। এই গুরুর আগমনের ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মসাধনার দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়ে গেল।

সমালোচনা

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। ব্যাখ্যাকার :— শ্রীঅমূল্যপদ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক :— ঐ। ১৪।৩সি, বলরাম বসু ঘাট রোড। কলিকাতা ২৫ (ভবানীপুর)। মূল্য ৫৲ টাকা। ১।৵+৬২১+১১ পৃষ্ঠা।

সুলেখক শ্রীঅমূল্যপদ চট্টোপাধ্যায় বঙ্গভাষার ধর্মসাহিত্যে সুপরিচিত। তাঁহার লিখিত 'অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী', 'সরল পঞ্চদশী' ইত্যাদি বেদান্ত-গ্রন্থ পাঠকসমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। লেখক অদ্বৈত বেদান্তের যথার্থ মর্মজ্ঞ সাধক। উত্তম বিদ্যাগুরুমুখে তিনি সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তরহস্য সম্যক্‌ অবগত, আলোচ্য তাঁহার এই গীতাব্যাখ্যাটিও এই বিষয়ে পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করে। গভীর বিষয়ও অতি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হওয়ায় ব্যাখ্যাটি অতি অপূর্ব হইয়াছে। ব্যাখ্যাকার 'পঞ্চদশী' আদি বহু আকর গ্রন্থ হইতে অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্ত-প্রক্রিয়াসমূহ সুকৌশলে ব্যাখ্যান মধ্যে সুনিবিষ্ট করিয়া ইহাকে অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন। বেদান্তসিদ্ধান্ত-রত্নরাজির ইহা একটি মনোহর মালিকা বিশেষ। বহু প্রকরণগ্রন্থ ইহাতে গতার্থ হইয়া যায়। গ্রন্থটি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া খুব আনন্দ হইল। বাংলা ভাষায় এরূপ পুস্তক আর নাই। অনাবশ্যক জটিলতা কোথাও দেখিলাম না, অথচ সব কথাই সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার জটিল বিষয়ও সরল করিয়া বর্ণন করিতে সুপটু। ইহা তাঁহার সুদীর্ঘকালীন বেদান্ত-মননের পরিচয়। এই বইখানা পড়িবার পূর্বে পাঠককে 'অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী' ও 'সরল পঞ্চদশী' এই দুইখানি বই পড়িয়া লইতে অনুরোধ করি। তাহা হইলে এই গীতাব্যাখ্যার মাধুর্য পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ হইবে। সাধক-পাঠক পুস্তকের বহু স্থানে সূক্ষ্ম সাধনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাইবেন।

গীতা গৃহস্থ, সন্ন্যাসী সকলেরই উপযোগী গ্রন্থ। ইহার মূল কথা 'ত্যাগ'। সংসারে থাকিয়াও কি করিয়া ইহা করা যায় তাহাও গ্রন্থকার দেখাইবার ত্রুটি করেন নাই। বেদান্ত-বিচার গৃহস্থেরও কল্যাণপ্রদ। ভূমিকাটি বিশেষ মূল্যবান। ইহাতেও সংক্ষেপে বেদান্তের সাধন-ক্রম ও সিদ্ধান্তসমূহ বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার আচার্য শংকর-কৃত ভাষ্যের অনুবর্তন করিয়াছেন ও মধুসূদন সরস্বতী, আনন্দ গিরি, শংকরানন্দ প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যগণের মতও মধ্যে মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া ব্যাখ্যাটিকে যথেষ্ট ভাবসমৃদ্ধ করিয়াছেন।

প্রতি অধ্যায়ের প্রারম্ভে তত্তদধ্যায়ের প্রধান বিষয়গুলির উল্লেখ, গ্রন্থশেষে প্রতি অধ্যায়ের বিষয়সূচী ও অধ্যায়-দীপিকা অর্থাৎ অধ্যায়োক্ত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা,—সমগ্র ব্যাখ্যাটিকে ধারাবাহিক ও সুসম্বদ্ধরূপে উপস্থিত করিয়া বড়ই সুখবোধ্য করিয়াছে। অধ্যায়-দীপিকাগুলিও পর পর পড়িয়া গেলে গীতাশাস্ত্রের বক্তব্য বিষয়ে সুন্দর ধারণা হয়। এটিও ব্যাখ্যাকারের একটি সুন্দর ব্যাখ্যানকৌশল। গ্রন্থপাঠের পূর্বে এই অধ্যায়দীপিকাগুলি পড়িয়া লওয়া ভাল।

মুদ্রাযন্ত্রের প্রমাদ বিশেষ নজরে পড়িল না।

গ্রন্থকারের চিন্তাশীলতা, মননকুশলতা, সূক্ষ্ম-দৃষ্টি এবং গভীর বেদান্তজ্ঞানের পরিচয় গ্রন্থের সর্বত্র সুপরিস্ফুট। এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

এই সুচিন্তিত ও সুলিখিত গ্রন্থটি বাংলা গীতা-সাহিত্যে গ্রন্থকারের একটি বিশেষ মূল্যবান ও

আদরণীয় অবদান। বাংলা বেদান্ত-সাহিত্যে ইহা উচ্চস্থান দাবী করিবার যোগ্যতা রাখে।

আলোচ্য গ্রন্থের কতকগুলি ব্যাখ্যাস্থল কিছু বিচারণীয় বলিয়া মনে হইল। অবশ্য বেদান্তের আচার্যগণেরও কোন কোন প্রক্রিয়া-বিশেষে অল্পবিস্তর মতভেদ আছে। আর সে সব বিচারেরও অবসর ইহা নহে।

—**স্বামী ধীরেশানন্দ।**

আত্মানুসন্ধান। শ্রীঅনন্তকুমার দাস। শ্রীমতী কিরণময়ী দাস কর্তৃক ৯০নং শ্রীপল্লী, দেশপ্রিয় নগর, পোঃ বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১১৪, মূল্য ১·৫০।

ভারতবর্ষে মাতৃরূপে ঈশ্বরসাধনার পরম্পরা একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে; সেটি হল—ঘরে বাইরে ঈশ্বরকে একটি অভিন্ন স্নেহসূত্রে বাঁধা। গৃহে যিনি জননী তিনিই আবার সমগ্র বিশ্বে শক্তিসঞ্চারিণী; অনন্ত বিশ্বের বিধাত্রী যিনি, তিনিই আবার জননীরূপে সান্ত সংসারে আমার নিতান্ত আপনার। ঘরে মাকে যেমন সহজে প্রাণখুলে আমরা ডাকি তেমনি সহজভাবে বিশ্বজননীর স্নেহসান্নিধ্য লাভের জন্য মানুষের ব্যাকুলতা থাকা স্বাভাবিক। 'মা'-ডাকে পুত্রের যেমন আকুলতা, 'মা'র নিজেরও তেমনি আনন্দ। মাতৃরূপে সাধনার আকর্ষণ এই কারণেই বেশী।

'আত্মানুসন্ধান'-এর ভক্তিমান লেখক এই সহজ পথেই 'আত্মা'কে অনুসন্ধান করিয়াছেন, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সেতুটিকে উপলব্ধি করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি লেখক নন, সাহিত্যরচনা কিংবা ভক্তিমার্গের চর্চা করাও তাঁর উদ্দেশ্য নয়: বইটি পাঠ করিতে করিতে মনে হইবে একটি সহজ সরল মানুষ যেন আপন মনে মাতৃনাম কীর্তন করিতেছেন,—এতটুকু তাত্ত্বিক বা তার্কিক কুয়াশা তার মধ্যে নাই।

প্রেম বা ভালবাসা যাবতীয় দ্বন্দ্ব ও বিরোধ নিরসনের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। মানবজীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব দূরীকরণে এইটিই একমাত্র পথ। আর ভগবানের নাম করিতে করিতেই ভক্তি আসে, সর্বজীবে ভগবানের উপলব্ধি আসে, প্রেমে মনপ্রাণ আপ্লুত হইয়া যায়। ভগবান আমার অন্তরেই আছেন। অন্তরকে জানিলে এবং অন্তরের নির্দেশে সংসারে বিচরণ করিলে পথের অনেক কণ্টক আপনিই দূরে সরিয়া যায়। অমৃতময়ী মা নিজেই তো দিবারাত্রি উতলা—কী করিয়া সন্তানকে সুখী করিবেন, তার চলার পথ নিষ্কণ্টক করিবেন। কাজেই, সংসারী প্রাণ খুলিয়া 'মা'কে ডাকিলে এক অপারশক্তি তাকে উজ্জীবিত করে এবং সংসারে থাকিয়াও তিনি হন সন্ন্যাসী-তুল্য; যাকে এক অনুপম ভাষায় পাঁকাল মাছের সহিত তুলনা করিয়াছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু পাঁক তার গায়ে লাগে না। আবার বলিয়াছেন, হাতে তেল মাখিয়া কাঁঠাল খাইলে আঠা লাগে না। সেইরূপ ভক্তি-প্রেমে সংসারীর মনও এতখানি উঁচুতে উঠিয়া যায় যে সংসারজীবনের ক্ষুদ্রতা ও মলিনতা তাঁকে ক্ষুদ্র ও মলিন করিতে পারে না।

এই আদত কথাটিকেই 'আত্মানুসন্ধান'-এর লেখক নিজ ভঙ্গীতে ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রধানতঃ গদ্যগ্রন্থ হইলেও কতকগুলি কবিতা এবং গানও বইটিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুর-সংযুক্ত হইলে এই গানগুলিও সমাদর লাভ করিবে সন্দেহ নাই। বইটি অধ্যয়ন করিলে সংসারী মানুষ নির্মল আনন্দ অনুভব করিবেন, বইটির ব্যাপক প্রচার বাঞ্ছনীয়।

—**মনকুমার সেন**

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠে গত ১০ই ফাল্গুন (২২.২.৬৬) মঙ্গলবার শুভ শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ১৩১তম পুণ্য জন্মতিথি-উৎসব মহা আনন্দে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, উষাকীর্তন, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'কথামৃত' পাঠ, ভজন, শ্রীশ্রীকালীকীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

অপরাহ্নে স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী বন্দনানন্দ ইংরেজীতে ও স্বামী চিদাত্মানন্দ এবং সভাপতি মহারাজ বাংলায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী অবলম্বনে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

রাত্রে দশমহাবিদ্যার পূজা, শ্রীশ্রীকালীমাতার বিশেষ পূজা ও হোম হয়। রাত্রিশেষে মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ ২২ জনকে সন্ন্যাসব্রতে এবং ২০ জনকে ব্রহ্মচর্য-ব্রতে দীক্ষিত করেন।

পরবর্তী রবিবার ২৭শে ফেব্রুআরি সারাদিন-ব্যাপী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরের পূর্বদিকে নির্মিত এক মণ্ডপে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সুবৃহৎ প্রতিকৃতি ও তাঁহার ব্যবহৃত জিনিসপত্র সজ্জিত রাখা হয়। সারাদিনে প্রায় এক লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল।

স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে দুইদিন-ব্যাপী "সংস্কৃত সেমিনার"

বারাণসী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে যুগ-প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মোৎসব তিনদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে সুচারু-রূপে সম্পন্ন হয়। ঐ উৎসবে দুইদিনব্যাপী 'সংস্কৃত সেমিনার'-এর আশাতীত সাফল্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। গত বৎসরে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসবে অদ্বৈতাশ্রম-আয়োজিত অনুরূপ একটি 'সংস্কৃত সেমিনার' বারাণসী ক্ষেত্রের বিদ্বন্মণ্ডলীর, বিশেষতঃ সংস্কৃত-ভাষানু-রাগীদের বিশেষ আনন্দ দিয়াছিল।

১৩ই জানুআরি তিথিপূজার দিন, উষা-কীর্তন, বিশেষ পূজাহোমাদি, বেদপাঠ, কঠোপনিষৎ পাঠ, স্বামীজীর জীবনী পাঠ ও আলোচনা, সর্বসাধারণে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ, ভজনাদি ও রাত্রে ৺কালীপূজা হয়।

১৫ই ও ১৬ই জানুআরি স্বামীজীর মহা-জীবনের এক বিশেষ অধ্যায়ের কথা স্মরণ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় কাশীর বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এক রচনা ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়। বিষয়বস্তু ছিল 'বেদান্তধর্ম-প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্যবিবেকানন্দঃ'। সর্বসমেত ২৫টি রচনা আসিয়াছিল; বক্তৃতা-প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিল ২২জন ছাত্রছাত্রী। রচনা ও বক্তৃতা-প্রতিযোগিতায় যাঁহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই সংস্কৃতে শাস্ত্রী বা আচার্য উপাধিকারী।

বারাণসীর মহারাজা মহামান্য শ্রীমান বিভূতিনারায়ণ সিং বাহাদুর শনিবার ১৫ই জানু-আরি অপরাহ্নে উক্ত সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং ২৫ জন রচনাপ্রতিযোগীর প্রত্যেককে পুরস্কার প্রদান করেন। প্রতিযোগীদের মধ্যে ৯ জন ছাত্রী ছিল। ঐ দিন সভায় পৌরোহিত্য করেন বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপকুলপতি পণ্ডিত শ্রীসূর্যনারায়ণ মণি ত্রিপাঠী মহোদয়।

সভার স্বাগত-ভাষণে কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অপূর্বানন্দ বলেন, স্বামীজী সংস্কৃত ভাষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং ঐ ভাষার বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, এই ভাষার মধ্যেই ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐক্য ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা সন্নিহিত রহিয়াছে। বেদান্তের বাণী মানবাত্মার অমরত্ব ও ঐক্যের বাণী এবং ইহাতেই বিশ্বভ্রাতৃত্বের বীজ নিহিত।

উপকুলপতি পণ্ডিত ত্রিপাঠী তাঁহার অভিভাষণে বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্তদর্শন এবং প্রাত্যহিক জীবনে তাহার প্রয়োগ ভারতে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণে আশার এক অনির্বাণ আলো আনয়ন করিয়াছে। তিনি ছিলেন, বিশ্বের গণজাগরণের ঋত্বিক। তাঁহার জীবন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার মিলন-সেতুস্বরূপ। পাশ্চাত্য ভৌতিক বিজ্ঞান এবং ভারতীয় বেদান্তদর্শনের সম্মিলনই হইবে ভবিষ্যৎ মানবসভ্যতার শাশ্বত আদর্শ।

১৬ই জানুআরি রবিবার অপরাহ্ণ ৪টায় সভার কার্য আরম্ভ হয়। ঐ দিন সভায় পৌরোহিত্য করেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকুলপতি জাষ্টিস্ এন, এইচ, ভগবতী। সংস্কৃত বক্তৃতা-প্রতিযোগিতা শেষ হইলে উভয় দিনের ফলাফল জানাইয়া তিনি ২২ জন প্রতিযোগীকেই বিভিন্ন সংস্কৃত পুস্তক পারিতোষিকরূপে বিতরণ করেন। প্রতিযোগীদের মধ্যে ৩ জন ছাত্রী এবং ২ জন অন্ধ ছাত্র ছিল।

উভয় দিন সভায় বিভিন্ন পণ্ডিত ও সংস্কৃতের অধ্যাপকগণের কণ্ঠে বেদান্তের উপর স্বামীজীর নব আলোকপাত ভারতের গণজাগরণ এবং বিশ্বে সাম্য মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের পথ সুগম করিয়াছে—এই কথা সংস্কৃত ভাষায় ধ্বনিত হয়। তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত বলদেব উপাধ্যায় —ডিরেক্টর বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, মীমাংসারত্নম্ অধ্যাপক পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, অধ্যাপক ডাঃ নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (বি, এইচ, ইউ), পণ্ডিত ভি, এস, রামচন্দ্র শাস্ত্রী, অধ্যক্ষ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় (বি, এইচ, ইউ) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সভাপতির ভাষণে জাষ্টিস্ ভগবতী বলেন, বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই মহাবাক্যকে অবলম্বন করিয়া স্বামীজী আর্ত, পীড়িত, অশিক্ষিত অবহেলিত ও অস্পৃশ্যদের প্রত্যক্ষ নারায়ণ জ্ঞানে সেবাধর্মের প্রবর্তন করেন। ইহাই ভারতের শাশ্বত প্রেমের বাণী। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন তাঁহার প্রদর্শিত পথে 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—এই নীতি অবলম্বন করিয়া ভারতে ও সমগ্র বিশ্বে সাম্য, মৈত্রী, বিশ্বমানবতা ও মানবাত্মার মহিমা প্রচার করিতেছেন। বেদান্তের এই নবরূপায়ণ মানুষকে তাহার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে সক্ষম করিয়াছে।

দুই দিনই সভান্তে পণ্ডিত প্রফেসার টি, এস, ভাণ্ডারকার মহোদয় স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

রবিবার ১৬ই জানুআরি মধ্যাহ্নে দরিদ্র-নারায়ণ-সেবাও এই উৎসবের অন্যতম কার্যসূচী ছিল। প্রায় আড়াই হাজার দরিদ্রনারায়ণকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

দুই দিনই সভামণ্ডপ শিক্ষিত ও অনুরাগী শ্রোতৃমণ্ডলী-পূর্ণ ছিল। সভার সমস্ত কার্যই সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

কার্যবিবরণী

বেলঘরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম (Students' Home)-এর ৪৬তম (১৯৬৪-৬৫) বার্ষিক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাচীন গুরুকুল প্রথায় পরিচালিত এই বিদ্যার্থী আশ্রমে দরিদ্র ও মেধাবী কলেজ ছাত্রদের সম্পূর্ণ বিনাব্যয়ে রাখিয়া উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। আহার-বাসস্থান, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং পুস্তকাদি—ছাত্রদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছাত্রেরা এখানে পাইয়া থাকে। পড়াশুনার সঙ্গে তরুণ বিদ্যার্থীদের বিভিন্ন সদ্‌গুণগুলি বিকাশের জন্য বিদ্যার্থী আশ্রমের নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আংশিক খরচ বা পূর্ণ খরচ বহনকারী নৈতিক শিক্ষা গ্রহণেচ্ছু কিছুসংখ্যক ছাত্রও রাখা হয়। আলোচ্য বর্ষশেষে সর্বমোট ৯৫ জন আশ্রমিকের মধ্যে সম্পূর্ণ বিনাব্যয়ে ছিল ৬৪ জন; ১৪ জন আংশিক ও ১৭ জন পূর্ণ ব্যয় বহন করিয়াছে।

পরীক্ষার ফল সকল বিভাগেই বিশেষ সন্তোষজনক। প্রি-ইউনিভারসিটি পরীক্ষায় ২৬ জন, ডিগ্রী ফাইন্যাল পরীক্ষায় অনার্স কোর্সে ১০ জন ও পাসকোর্সে ২ জন, এবং এম.এ. পরীক্ষায় ১ জন পরীক্ষা দিয়াছিল। সকলেই পাস করিয়াছে। অনার্স পাইয়াছে ৯ জন—২ জন ফার্ষ্ট ক্লাস ও ৭ জন সেকেণ্ড ক্লাস।

অধিকাংশ ছাত্রের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার আশ্রমকে বহন করিতে হয় বলিয়া এই প্রতিষ্ঠানকে সহৃদয় জনসাধারণের দানের উপর নির্ভর করিতে হয়। খুবই আনন্দের বিষয়, বিদ্যার্থী আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্রেরাও তাহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন, বর্তমান বৎসরে মোট চাঁদার শতকরা ৩৮ ভাগ প্রাক্তন ছাত্রদের নিকট হইতে আসিয়াছে।

নিকটবর্তী অঞ্চলের নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের ছেলেদের জন্য আশ্রমের বিদ্যার্থীরা একটি নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা করে। সমাজ-সেবার কিছু না কিছু কাজ তাহাদের নিত্য-কর্মের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষ প্রয়োজনীয় আর একটি কাজ বিদ্যার্থীরা করে; সেটি হইতেছে কৃষির উদ্যোগ। প্রায় ৩৫ বিঘার মত জমিতে চাষবাস হইতেছে, ইহাতে তাহাদের শ্রমদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যার্থী আশ্রমের আর একটি কর্মবিভাগ রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ। সরকার-অনুমোদিত এই পলিটেকনিকে সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ৩ বৎসরের ডিপ্লোমা কোর্স-এ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। বর্তমান বৎসরে ইহার ছাত্রসংখ্যা ৭২০।

বিদ্যার্থী আশ্রমের বিবিধ কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিবেকানন্দ জয়ন্তী-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমেহের-চাঁদ খান্না সাড়ে তিন লক্ষ টাকায় নির্মিত এই দ্বিতল ভবনটির দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই ভবনের একতলায় আছে একটি প্রশস্ত সভাকক্ষ এবং দ্বিতলে লাইব্রেরী ও ফ্রী রীডিং রুমের ব্যবস্থা। লাইব্রেরী ও ফ্রী রীডিং রুমের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও পুস্তকাদি এখনও সংগৃহীত হয় নাই। আশ্রম-কর্তৃপক্ষ আশা করেন শীঘ্রই তাঁহারা এই বিভাগের কর্মোদ্যোগকে সফল করিয়া তুলিবেন।

রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন যক্ষ্মা হাসপাতালের বার্ষিক কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৪—মার্চ, ১৯৬৫) প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়; প্রতিষ্ঠাকালে শয্যাসংখ্যা (bed) ছিল ৩২; বর্তমানে এখানে ২৪০টি শয্যা আছে, তন্মধ্যে ১৩টি কেবিন ও ১৩টি কুটির (cottage)। কলিকাতা ও পাটনার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রদত্ত সম্পত্তির আয় হইতে এবং জনসাধারণের দানে ৩২জন রোগীকে বিনা-খরচে চিকিৎসা করা হয়। সরকারের ও দানশীল জনগণের সাহায্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায়

বর্তমানে যক্ষ্মা-রোগের চিকিৎসায় সর্ববিধ আধুনিক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আরোগ্য লাভের পর যক্ষ্মা-রোগীদের পুনর্বাসনেরও কিছু ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৫৩৩; তন্মধ্যে ৩১৭ জন রোগী বৎসরের মধ্যে ভর্তি হয় এবং ২১৬ জন পূর্ব বৎসরের। বৎসর-মধ্যে ৩২১ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং বৎসরের শেষে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ছিল ২১২। ১০৫ জন রোগীর অস্ত্রচিকিৎসা করিতে হয়।

কর্মচারী ও তাহাদের পরিবারবর্গের জন্য একটি জরুরী বিভাগ আছে, সেখানে ৩৫ জনের অন্যান্য চিকিৎসা করা হয়। বাহিরের রোগী বিভাগে ৩৮৮ জন যক্ষ্মা-রোগী ও ৯৩৬ জন সাধারণ রোগীকে চিকিৎসাবিষয়ক উপদেশ ও সাহায্য দেওয়া হয়।

মোট ৮৯ জন রোগীকে সম্পূর্ণ বিনা-খরচে চিকিৎসা করা হয়, ইহাদের মধ্যে ১০ জন তপশিলী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। ১৯ জন রোগীকে কম খরচে চিকিৎসা করা হয়।

৪০ জন রোগী আরোগ্যলাভের পরে স্থানীয় আরোগ্যোত্তর উপনিবেশে স্থান পায়। ইহাদের সকলকেই নানা প্রকার বৃত্তিমূলক কর্ম দ্বারা জীবিকা-নির্বাহের সুযোগ দেওয়া হয়।

অবৈতনিক হোমিওপ্যাথিক বিভাগে নূতন ৪,৭৪২ এবং পুরাতন ৬,৯৫২ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মিশন-কেন্দ্র খোলা হয় ১৯২০ খৃষ্টাব্দে। জানুআরি, ১৯৬০ হইতে মার্চ, ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ষগুলির কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

মঠবিভাগে নিত্য পূজা, উপাসনা, নিয়মিত ধর্মালোচনা ও সাময়িক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসব প্রতি বৎসর সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী যথোপযুক্ত মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে ওড়িয়া ভাষায় দশ খণ্ডে স্বামীজীর গ্রন্থাবলী প্রকাশন ও দরিদ্রনারায়ণ-সেবা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অবৈতনিক বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিষয়ের ৫,৩০০ পুস্তক রাখা হইয়াছে, পাঠাগারে ৮টি দৈনিক এবং ৪৩টি পত্রিকা লওয়া হয়।

মিশন-শাখা কর্তৃক একটি উচ্চপ্রাথমিক এবং একটি অবৈতনিক এলোপ্যাথিক চিকিৎসালয় পরিচালিত হয়। উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৬২ জন বালক ও ৮৭ জন বালিকা অধ্যয়ন করে। একটি এম. ই. স্কুল খোলা হইয়াছে। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে চিকিৎসালয়ে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ২৭,৮৬২।

রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটি সমগ্র ব্রহ্মদেশে সুপরিচিত। এই কেন্দ্রের ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রেঙ্গুনে কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্ত কর্তৃক ধ্যান ভজন পাঠ ও জনসেবার উদ্দেশ্যে সোসাইটি গঠিত হয়। কয়েক বৎসর নানা অবস্থার মধ্য দিয়া চলিবার পর ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সোসাইটি রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বর্তমানে রেঙ্গুনের বোটাটঙ্গ প্যাগোডা রোডে (230, Botataung Pagoda Road) সোসাইটির নিজস্ব ভবনে ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষামূলক কর্মধারা অনুসৃত হয়।

সোসাইটি-পরিচালিত বিরাট গ্রন্থাগারে ৭টি ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের ৪৪,৭৪১ খানি গ্রন্থ আছে। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে ৩০,৫৩৭ খানি পুস্তক পঠনার্থে প্রদত্ত হইয়াছিল।

পাঠাগারে ইংরেজী, বাংলা, বর্মী, হিন্দী, গুজরাতী, তামিল, তেলুগু ও উর্দু ভাষায় পত্র-পত্রিকা রাখা হয়। ১৬টি দৈনিক এবং ৯৮টি সাময়িক পত্রিকা আলোচ্য বর্ষে নিয়মিতভাবে লওয়া হইয়াছে। পাঠাগারে গড়ে দৈনিক পাঠক-সংখ্যা ৪০০।

৫৮টি সাধারণ সভা, এবং গীতা, উপনিষৎ ও মহাপুরুষবাণী অবলম্বনে ২৭১টি ক্লাস অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখানো হয় এবং শহরের নানাস্থানে ও বাহিরে বক্তৃতাদি দেওয়া হয়। বিভিন্ন ধর্মের আচার্যগণের জন্মদিন যথাযথভাবে উদ্‌যাপিত হয়। বর্মী ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী স্মরণিকা (Memorial volume) প্রকাশিত হইয়াছে।

আমেরিকায় বেদান্ত

নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বেদান্ত কেন্দ্র—অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ। এই কেন্দ্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছে :

অক্টোবর, ১৯৬৫ : একাগ্রতার অভ্যাস ; ঈশ্বরের মাতৃভাব ; অন্তর্জগতের সংযম ; আমাদের মুক্তিদাতা কে ? যোগের প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ।

নভেম্বর, '৬৫ : শরণাগতি অভ্যাস ; ব্রহ্ম ও ব্যক্তি-ঈশ্বর ; অশান্ত মনকে কিভাবে শান্ত করা যায় ; বাহিরে কর্মচাঞ্চল্য ও অন্তরে প্রশান্তি।

ডিসেম্বর, '৬৫ : 'তত্ত্বমসি' ; ভগবৎপ্রেম কিরূপে লাভ করা যায় ; শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ (শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে) ; খৃষ্ট ও বর্তমান সময় ; হিন্দুধর্মের মর্মবাণী।

এতদ্ব্যতীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত', গীতা এবং উপনিষৎ অবলম্বনে কয়েকটি ক্লাসও নিয়মিতভাবে করা হইয়াছিল।

বিবিধ সংবাদ

কার্যবিবরণী

বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমের কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৩—মার্চ, ১৯৬৫) প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য সময়ে আশ্রমে নিয়মিত পূজা উপাসনাদি, সাময়িক উৎসব, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়টি ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে পুনরায় খোলা হয়, মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ২,৯১৫। গ্রন্থাগারে ৬৫৮ খানি পুস্তক আছে। পাঠাগারের জন্য ১৫টি পত্র-পত্রিকা লওয়া হইতেছে। নরেন্দ্রপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সহযোগিতায় দরিদ্রদিগকে দুগ্ধ বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

স্বামীজীর জন্মোৎসব

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরিষদের (কলিকাতা-৬) উদ্যোগে গত ২১শে ও ২২শে জানুআরি মহাবোধি সোসাইটি হলে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের ১০৪তম জন্মোৎসব পালিত হয়। প্রথম দিবস অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ও সভাপতির আসন গ্রহণ করেন স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী।

সভাপতি মহারাজ জাতীয় জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী অনুসরণের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন এবং পরিষদ কর্তৃক বাংলার মনীষিগণের উপদেশ ও জীবনাদর্শ প্রচারের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। সভায় শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী, শ্রীহরিপদ ভারতী ও ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য স্বামীজীর বহুমুখী অবদানের বিষয় আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় দিবসে অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ ও শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। পরিষদের সভাপতি শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ স্বামীজীর সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত সাক্ষাতের এক ঘটনার বর্ণনা দেন।

আরিট (মেদিনীপুর): গত ২৬শে জানুআরি বুধবার মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দাসপুর থানার আরিট গ্রামে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব প্রতিপালিত হয়। তদুপলক্ষে সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ প্রভাত-ফেরী, বেলা ৩টায় স্বামী অন্নদানন্দ মহারাজ কর্তৃক বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের ভিত্তিস্থাপন, বিকাল ৪॥টায় জনসভা ও রাত্রিতে হাতে হাতে প্রসাদ-বিতরণ হয়।

জনসংখ্যার তথ্য

রাষ্ট্রপুঞ্জের সমীক্ষায় প্রকাশ, বিশ্বের জনসংখ্যা প্রতিমিনিটে ১২৫ জন, প্রতি দিন ১,৮০,০০০ জন করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বিশ্বে প্রতিদিন লোকসংখ্যা ৪০ হাজার করিয়া বাড়িত। আগামী ৩৫ বৎসরে বিশ্বের লোকসংখ্যা ৭০০ কোটিতে দাঁড়াইতে পারে।

ঐ সমীক্ষা অনুসারে সারা বিশ্বের জমি ও লোকসংখ্যার তুলনায় ভারতের জমির পরিমাণ ২ শতাংশ, লোকসংখ্যা ১৫ শতাংশ।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ২৩ কোটি ৬০ লক্ষ। ৩০ বৎসর পরে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ঐ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় মাত্র ১ কোটি ৫০ লক্ষ। ভারতে জনসংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতে শুরু হয় বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে। প্রতি বৎসর ভারতে জনসংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, তাহা অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যার সমান। ভারতে বৎসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ। অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যাও তাহাই। এই শতাব্দীর শেষে ভারতের জনসংখ্যা ৯০ কোটিতে দাঁড়াইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন।

শোকসংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত গত ৭ই জানুআরি (১৯৬৬ খৃঃ) রাঁচিতে সকাল ৮টা ৩৫ মিঃ সময়ে ৮৪ বৎসর বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি শিলং হইতে নবগঠিত বিহারের একাউন্টেন্ট-জেনারেলের রাঁচি অফিসে স্থানান্তরিত হন। ১৯১৩ হইতে এতাবৎকাল প্রধানতঃ তিনিই রাঁচিতে ভক্তগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীসারদাদেবী ও শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব এবং শ্রীশ্রীদুর্গাপূজাদি ও অন্যান্য উৎসবের প্রাণকেন্দ্র ছিলেন। তাঁহার স্বরচিত বহু পালা-কীর্তন রাঁচিতে বন্ধুগণ-সমভিব্যাহারে গীত হইত। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় রাঁচিতে শ্রীশ্রীগৌরী মা, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ প্রভৃতির শুভাগমন মুখ্যতঃ ইন্দুবাবুর উদ্যোগেই হইয়াছিল। অতি অমায়িক ও মিষ্টভাষী ছিলেন তিনি। তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

! শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

দিব্য বাণী

বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমাননগরীতুল্যং নিজান্তর্গতং
পশ্যন্নাত্মনি মায়য়া বহিরিবোদ্ভূতং যথা নিদ্রয়া।
যঃ সাক্ষাৎকুরুতে প্রবোধসময়ে স্বাত্মানমেবাদ্বয়ং
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে॥ ১

—দক্ষিণামূর্তিস্তোত্রম্—শঙ্করাচার্য

স্বপ্নের গড়া জগৎ যেমন মনেরই সৃষ্টি, তবু
দেখার সময় মনে হয় যেন বাহিরে তা রহিয়াছে,
(জাগরণে দেখা বিশ্বও তাই, আসলে থাকে তা মনে
মায়ার প্রভাবে মনে হয় যেন বাহিরেই সব আছে।
জ্ঞান-উদ্ভাসে সদাই যেজন মায়ার প্রভাবাতীত—
জাগ্রতে দেখা বিশ্বও যাঁর কাছে স্বপ্নের মত,)
দেখেন যেজন আপনারি মাঝে মায়া-গড়া বিশ্বেরে—
দর্পণমাঝে প্রতিবিম্বিত মহানগরার সম,
সমাধিতে (যাঁর সেটুকু দেখাও শূন্য-বিলান হয়)
দেখেন নিজেরে স্বরূপ কেবল অদ্বয়, অনুপম—
প্রণাম জানাই নত হয়ে সেই শ্রীগুরুরূপধারীরে,
(করুণাসাগর, মোহনাশী) সেই দক্ষিণামূর্তিরে।

নিধয়ে সর্ববিদ্যানাং ভিষজে ভবরোগিণাম্।
গুরবে সর্বলোকানাং দক্ষিণামূর্তয়ে নমঃ॥ ১৪

সকল বিদ্যার খনি, ভবরোগ-বৈদ্য যিনি, তাঁরে
প্রণতি জানাই সর্ব-লোক-গুরু দক্ষিণামূর্তিরে।

কথাপ্রসঙ্গে

সনাতন ধর্ম, ভগবান বুদ্ধ ও আচার্য শঙ্কর

ভারতের ধর্ম সনাতন ধর্ম। হাজার হাজার বছর পূর্বে সত্যদ্রষ্টাগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত বেদই এই ধর্মের ভিত্তি। সত্যদ্রষ্টাদের উপলব্ধিতে যে জ্ঞানরাশি উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহাই বেদ; জগৎ ও জীবন যে সত্যগুলি দ্বারা চালিত হয়, তাহাই বেদ।

মুষ্টিমেয় কয়েকজন ঋষি জগৎ ও বিশ্বের মূলে যে চরম সত্য রহিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য আকুল আগ্রহ লইয়া ব্রতী হইয়াছিলেন এবং তাহা জানিয়াছিলেনও। যে কোন দিক হইতেই হউক না কেন, এই সত্যকে জানিবার জন্য দুর্নিবার আগ্রহ যখন মনে জাগে, তাহার গভীরতা যে কতখানি, তাহা সাধারণ লোকের ধারণার অতীত। এই সত্যলাভে কি লাভ-লোকসান হইবে, এ প্রশ্নও সেখানে উঠে না। ভগবান বুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি সত্য-দ্রষ্টাদের জীবনে সত্যলাভের জন্য যে আকুল আগ্রহ দেখা যায়, সত্যলাভের জন্য সব কিছু, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিবার যে সুদৃঢ় সঙ্কল্প দেখা যায়, তাহার পরিমাপ করা সাধারণ মনের পক্ষে সত্যই অসম্ভব।

সত্যলাভের জন্য এই সর্বস্ব ত্যাগের পথ, নিবৃত্তি-মার্গ, মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্যই। সাধারণকে চরম সত্যলাভের পথে চালিত করিতে হইলে অন্য পথে তাহা করা ছাড়া সফলকাম হইবার কোন আশা নাই। সত্য-লাভের জন্য সর্বস্বত্যাগ করার সঙ্কল্প ও শক্তি সর্বসাধারণের মধ্যে থাকে না। কিছুটা ভোগ না করিলে মন সেখানে উচ্চতর মার্গে উঠিতেই চায় না, ত্যাগের শক্তিও সেখানে অল্পস্বল্প সংযমাভ্যাসের মাধ্যমে ধাপে ধাপে আসে। চরম সত্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সংযত ভোগের মাধ্যমে অগ্রসর হওয়ার পথ, ক্রমমুক্তির পথ, প্রবৃত্তিমার্গই সেখানে প্রশস্ত। সেখানে এই কথা বলিয়াই তাহাদের সত্যলাভের পথে নামাইতে হইবে যে তুমি যাহা চাহিতেছ, আমাদের কথামত চলিলে তাহা আরো অধিক পরিমাণে পাইবে। তাছাড়া, নিয়মিত ক্রিয়া-কর্মের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তামসিকতা কাটিয়া যায়, যাহা সত্যলাভের পথে চলিতে হইলে একান্ত প্রয়োজন। আর, কোন নিয়মপালন—তাহা যে উদ্দেশ্যেই করা হউক না কেন—মনকে গুছাইয়া আনে, ইচ্ছাশক্তিকে বাড়াইয়া দেয়। ইহাও সত্যলাভের জন্য একান্ত প্রয়োজন। কাম্যবস্তুলাভেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া চলিলেও এ পথ মানুষকে অন্ততঃ জাগ্রত ও শক্তিদৃপ্ত করিয়া তোলে।

বেদের মধ্যে সত্যদ্রষ্টারা তাই দুটি পথেরই সন্ধান দিয়াছেন—জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড। একটি পথ বিশ্বের মূল সত্যের, বিশুদ্ধ জ্ঞানের; অপরটি হইল বিশ্ব ও জীবন পরিচালক নিয়ম-গুলিকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধারাবদ্ধভাবে জীবন পরিচালিত করিয়া ইহজীবনে ও পরজীবনে অধিকতর ও উন্নততর আনন্দ লাভের—যাহা সকল মানুষই খুঁজিয়া বেড়ায় এলোমেলো ভাবে। তবে সেখানেও মূল সত্যকে চোখের সামনে রাখিয়া চলিতে হয়, যাহাতে এক-দিকে ভগবচ্চিন্তাজনিত আনন্দের আস্বাদ-লাভে চরম সত্যের প্রতি আকর্ষণ ক্রমশঃ বাড়ে এবং ভোগের অনিত্যতা ও অসারতার প্রতি

জাগ্রত মনের দৃষ্টি ক্রমনিবদ্ধ হওয়ায় উহার প্রতি আকর্ষণ ক্রমশঃ কমিয়া যায়। জীবনের প্রতিটি কর্মে ভগবানকে স্মরণ করিয়া চলিতে চলিতে মনে তিনি ক্রমশঃ গভীরতর ভাবে বসিয়া যান। বেদে তাই জ্ঞান ও কর্মের সংযোগসেতু রূপেই যেন উপাসনার কথাও রহিয়াছে

যে কোন বস্তু ও ঘটনা যে সত্য বা নিয়ম দ্বারা চালিত, তাহার জ্ঞান হওয়া মাত্র আমরা তাহাকে নিজ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য ইচ্ছামত কাজে লাগাইতে পারি। জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ। ব্যবহারিক জীবনে সত্যকে কাজে লাগাইবার সময় সাধারণ মানুষের সে সত্য সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞান না থাকিলেও চলে, শুধু বিজ্ঞানীদের নির্দেশিত প্রয়োগবিধিটুকু জানিলেই যথেষ্ট। বেদের কর্মকাণ্ড এই প্রয়োগ-বিধি লইয়াই। সেখানে বেদের নির্দেশমত যাগযজ্ঞাদি কর্ম নিখুঁতভাবে করিতে পারিলেই বাঞ্ছিত ফললাভ হইবে। কর্মফলের এই অমোঘ নিয়মানুবর্তিতা লক্ষ্য করিয়াই বেদের এই অংশ লইয়া গঠিত দর্শন পূর্বমীমাংসায় তাই বলা হইয়াছে, কার্য যথাযথ ভাবে করিলেই ফললাভ হইবে; জৈমিনির সূত্রে তাই কোথাও সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান বিশ্বনিয়ন্তা করুণাময় ঈশ্বরের বিশেষ উল্লেখ নাই। এমন কি যজ্ঞাদি কর্মে যে সব দেবতাকে আহুতিদান করিতে হয়, তাঁহাদেরও গুরুত্ব সেখানে কর্মের জন্য প্রয়োজন বলিয়াই। কর্ম ফল প্রসব করে নিজেরই গুণে, দেবতাদের বা অন্য কাহারো কৃপায় নহে। তাই সেখানে ভগবান ও দেবতাদের স্বরূপাদি লইয়া আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয় নাই

ঈশ্বরকে মূলে না রাখিয়া কর্ম করার ফল কিন্তু বেদের কর্মকাণ্ডের যাহা মূল লক্ষ্য—তাহার বিপরীতই হইবার—ইহলোকে এবং স্বর্গাদি-লোকে ভোগকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া ভুল হইবার সম্ভাবনা। বেদে অবশ্য স্পষ্টাক্ষরে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে স্বর্গাদি লোক হইতেও শুভকর্মফলাবসানে আবার ফিরিয়া আসিতে হয়—জন্মমৃত্যুর হাত হইতে চিরমুক্তি-লাভ ঘটে না। জৈমিনির মীমাংসাসূত্রে আত্মার স্বরূপ বা মুক্তির বিষয়ে কোন বিশেষ উল্লেখ না থাকিলেও পরবর্তীকালে ভাষ্যকার কুমারিল ভট্ট অবশ্য দুঃখের কবল হইতে মুক্তি পাইবার উপায় বলিয়াছেন: কাম্য কর্ম না করিয়া নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম শুধু কর্তব্য হিসাবে সমাধান করিলে এবং সংযত হইয়া চলিতে পারিলে আত্মা তাঁহার 'স্বস্থ' অবস্থা ফিরিয়া পান। এই অবস্থা লাভ করিলে সর্ব দুঃখের অবসান হয়। আত্মার স্বভাবতঃ 'চৈতন্য' নাই—'আমি'-বোধ নাই (দেহমনাদি সংযুক্ত যে চেতনা, লক্ষ্য এখানে তাহাই)—স্বভাবতঃ তিনি সুখ-দুঃখাতীত। ইহা বেদোক্ত চরম সত্যের ইঙ্গিত এবং ভগবান বুদ্ধদেব-প্রচারিত দুঃখের অবসানের, নির্বাণের অনুরূপ—যেখানে বলা হইয়াছে 'আমি'-ও মিথ্যা।

বেদের জ্ঞানকাণ্ডের বা বেদান্তের সত্যকে—যাহা বেদের সারকথা একেবারে ভুলিয়া শুধু কর্মকাণ্ডের উপর অত্যধিক জোর দেওয়ার ফলে, ঈশ্বরকে লক্ষ্যে না রাখিয়া কর্ম করার ফলে কালক্রমে জীবনের মূল উদ্দেশ্য ভগবানলাভ ধর্ম-কর্ম হইতে সরিয়া গিয়াছিল—ভোগই জীবনের লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল। আবার, পুরোহিতগণ ধর্মকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করিতেছিলেন—অব্রাহ্মণের, সাধারণ লোকের নিকট হইতে বেদকে দূরে রাখা হইয়াছিল; পুরোহিতদের কথামত

না চলিলে ধর্ম হইবে না—উপরন্তু পরলোকে ভীষণ দুর্দশাগ্রস্ত হইবার ভয় আছে—সাধারণের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল করা হইয়াছিল। বেদের সারকথা যে কি, সাধারণের তাহা জানিবার কোন উপায়ই ছিল না। ধর্মের এই গ্লানি দূর করিবার জন্য ঠিক সেই সময় ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে। তিনি বুঝিয়াছিলেন ধর্ম বলিয়া যে আচরণ চলিতেছে, তাহা মানুষকে দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি দিতে পারে না। রাজ্য ত্যাগ করিয়া কঠোর ত্যাগের পথ অবলম্বনে তিনি তাই মানুষের দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের পথ খুঁজিতে সাধনায় ব্রতী হইলেন এবং সাধনান্তে সফলকাম হইয়া ঘোষণা করিলেন সে পথের কথা। খুব চড়া পর্দাতেই সুর তুলিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন—ঈশ্বর মানিবার প্রয়োজন নাই, বেদকে প্রামাণ্য বলিবারও প্রয়োজন নাই। দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহা করিয়া চলিলেই হইল। ইহার জন্য কাহাকেও ভয় করিবার বা কাহারো কাছে করুণা প্রার্থনার প্রয়োজন নাই। খুবই চড়া সুর, কিন্তু সে পরিস্থিতিতে ইহারই প্রয়োজন ছিল। সর্বসাধারণের পক্ষে এসব কথা ধারণার বহির্ভূত, বিশেষ করিয়া বেদ ও ঈশ্বর না মানিয়া ধর্মপথে চলা ভারতবাসীর পক্ষে দুষ্কর; তবুও যে ভারত বুদ্ধের বাণী সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার একমাত্র কারণ—স্বামীজী বলিয়াছেন—তাঁহার হৃদয়, মানবদুঃখে তাঁহার সমবেদনার অসীমতা। স্বামীজী বলিয়াছেন, "নির্বাণে তাঁহার মহত্ত্ব বিশেষ কি? তাঁহার মহত্ত্ব in his unrivalled sympathy." "তাঁহার ধর্মে যে সকল উচ্চ অঙ্গের সমাধি প্রভৃতির গুরুত্ব, তাহা প্রায় সমস্তই বেদে আছে; নাই তাঁর intellect এবং heart—যাহা জগতে আর হইল না।" "সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য গভীর প্রেমের প্রথম প্রবাহ" বুদ্ধদেবের হৃদয় হইতেই নিঃসৃত হইয়া, "ভারতবর্ষ থেকে উত্থিত হয়ে ক্রমশঃ উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমের নানা দেশকে প্লাবিত করেছে।"

বুদ্ধদেব "বেদেরই সার কথা", বেদান্তোক্ত সত্যই প্রচার করিয়াছিলেন, অথচ বেদ মানেন নাই। সেজন্য স্বামীজী বৌদ্ধধর্মকে বলিয়াছেন, (হিন্দুধর্মের) "A rebel child"। দেশের তৎকালীন পরিস্থিতিতে চিরাচরিত প্রথা হইতে টানিয়া একেবারে বাহিরে না আনিলে লোকের হৃদয় সত্যের কিরণে উদ্ভাসিত করা সম্ভব হইত না—এই জন্যই বুদ্ধদেব এরূপ কঠিন নির্দেশ দিয়াছিলেন। বাঞ্ছিত ফলও তাহাতে ফলিয়াছিল—বুদ্ধের বাণী—বিশুদ্ধ জ্ঞানের বাণী ভারতবাসীর হৃদয়ে হৃদয়ে স্পন্দন তুলিয়াছিল

তবে, চরম সত্যের এত উচ্চ তত্ত্ব—যেখানে 'আমি'ও মিথ্যা, 'ঈশ্বর'ও মিথ্যা—ধারণা করিবার লোক কয়জন? বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের মুখে এই চরম সত্যের কথা শুনিতে শুনিতে সেখানে 'সংজ্ঞা ন অস্তি'—'আমি' থাকে না—শুনিয়া মৈত্রেয়ী চমকাইয়া উঠিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দকে (তখন নরেন্দ্রনাথ) শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন নিজ অমিতবল স্পর্শশক্তিসহায়ে সোজাসুজি এই চরম সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করাইতে চাহিয়াছিলেন, তখন বহির্জগতের সব কিছুর সঙ্গে তাঁহার 'আমিত্ব'ও 'যেন এক সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে একাকার হইতে ছুটিয়া চলিয়াছে' দেখিয়া স্বামী বিবেকানন্দও ইহাকে মৃত্যু বলিয়া ভাবিয়া চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন, 'তুমি আমার একি করলে!' আর ঈশ্বরকেই বা উড়াইয়া দিতে পারে কয়জন? ঈশ্বর যতক্ষণ

কথার কথা মাত্র, ধর্ম যতক্ষণ আলোচনার বিষয় মাত্র, ততক্ষণ আমরা সকলেই পারি—ঈশ্বরকে উড়াইয়া দিতে না পারাটাই তো আজকাল বুদ্ধিহীনতার, শিক্ষাহীনতার, কুসংস্কারের লক্ষণ! কিন্তু ধর্ম যেখানে যথার্থ ধর্ম—উপলব্ধির বিষয়—সেখানে? সেখানে ঈশ্বর ছাড়া অগ্রসর হইবার লোকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। তোতাপুরী যখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অদ্বৈতসাধনায় ব্রতী করিবার সময় মনকে অদ্বয়তত্ত্বে লীন করিতে বলিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবও প্রথম চেষ্টার পর বলিয়াছিলেন, 'হইল না'—মন একাগ্র করিবামাত্র পরমানন্দময়ী চিন্ময়ী মা-কালী আসিয়া সেখানে দাঁড়াইতেছিলেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে মন চাহিতেছিল না! চলার পথে কাহারো সাহায্য চাই না, আমার সুখ-দুঃখের অংশী রূপে কাহাকেও চাই না—এসব কথা শুনিতে বলিতে খুবই ভাল, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এত নির্ভীকতা লইয়া চলিতে পারে কয়জন?

তাই ভারতবাসীরা প্রথমে পরম আগ্রহভরে বুদ্ধের এই বাণী গ্রহণ করিলেও পরে বৌদ্ধধর্মকে ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল এই জন্যই, এবং এই জন্যই যে-বুদ্ধদেব ঈশ্বর মানিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াছিলেন, অধিকাংশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বিগণ (মহাযানপন্থীরা—চীন, তিব্বত, মালয়, জাপান প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধেরা) তাঁহাকেই ঈশ্বর করিয়া তাঁহারই পূজা করিয়া ছাড়িয়াছেন। ইহা ছাড়া সাধারণ মানুষের গত্যন্তর নাই।

বুদ্ধদেবের তিরোধনের পর কয়েকশত বৎসরের মধ্যেই ভারতে আবার তাই ধর্মের নামে অধর্মের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। সর্বোচ্চ পর্দায় জীবনের সুর বাঁধিতে না পারিলে ধর্মলাভ হইবে না—এই নির্দেশ সর্বসাধারণকে দিলে, অধিকারী-অনধিকারী নির্বিশেষে সকলকেই সন্ন্যাসীর আদর্শে ধর্ম পালন করিতে বলিলে যাহা না হইয়া পারে না তাহাই হইয়াছিল—ধর্মের নামে তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের বিকৃত আকার প্রভৃতি গোপন ভোগে মানুষ লিপ্ত হইয়া পড়িতেছিল, বেদের সার কথা লোকে আবার ভুলিয়াছিল। "(বৌদ্ধধর্মের) অধিকাংশ শক্তিই নেতিমূলক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হওয়াতে বৌদ্ধধর্মকে উহার জন্মভূমি হইতে প্রায় বিলুপ্ত হইতে হইল; আর যেটুকু অবশিষ্ট রহিল, তাহাও বৌদ্ধধর্ম যে সকল কুসংস্কার ও ক্রিয়াকাণ্ড নিবারণে নিয়োজিত হইয়াছিল, তদপেক্ষা শতগুণ ভয়ানক কুসংস্কার ও ক্রিয়াকাণ্ডে পূর্ণ হইয়া উঠিল "সর্বোপরি বৌদ্ধধর্মের জন্য আর্য, মঙ্গোলীয় ও আদিম প্রভৃতি ভিন্ন প্রকৃতির জাতির যে মিশ্রণ হইল, তাহাতে অজ্ঞাতসারে কতকগুলি বীভৎস বামাচারের সৃষ্টি হইল।"

"প্রধানতঃ এই কারণেই সেই মহান আচার্যের উপদেশাবলীর এই বিকৃত পরিণতিকে শ্রীশঙ্কর ও তাঁহার সন্ন্যাসীসম্প্রদায় ভারত হইতে বিতাড়িত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" আচার্য শঙ্কর আবির্ভূত হন বেদের সার কথা আবার শুনাইবার জন্য। তিনি বুদ্ধের মত আপসহীন ভাবে বেদের সার কথাগুলি প্রচার করিলেও বেদকে অস্বীকার তো করেনই নাই—বেদকেই প্রামাণ্য বলিয়াছিলেন। সাধনার স্তরবিশেষে ঈশ্বরোপাসনাদির প্রয়োজনও অস্বীকার করেন নাই।

বুদ্ধদেব সাধকজীবনে যাহা অবলম্বন করিতে বলিয়া গিয়াছেন—মধ্যপন্থা—তত্ত্ব সম্বন্ধেও তিনি সেই মধ্যপন্থাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। যতটুকু যুক্তিতে ধরা যায়, ততটুকুই বলিয়াছেন। অবিদ্যা হইতেই 'আমি'-বোধ (বিজ্ঞান) ও ক্রমে

দুঃখাদি সব কিছুর সৃষ্টি, ইহা বলিয়াছেন। অজ্ঞান কোথা হইতে আসিল, তাহা বলেন নাই। আবার অজ্ঞানের বিনাশের, আমিত্বের বিনাশের, নির্বাণের পর কি থাকে তাহাও বলেন নাই। বলেন নাই, কারণ তাহা মন-বুদ্ধির অতীত, ভাষার অতীত। জ্ঞানকাণ্ডের নাস্তিমূলক দিকটিই তিনি দেখাইয়াছেন, অস্তিমূলক দিকটিতে নীরব। কারণ উহা দেখাইতে গেলে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়—মনবুদ্ধির অতীত প্রদেশের ইঙ্গিত, যাহারা সেখানে গিয়াছেন তাঁহাদের কথা ছাড়া, অন্য কোথাও হইতে পাওয়া অসম্ভব।

শঙ্করাচার্য বেদান্তোক্ত উভয় দিকই দেখাইয়াছেন। যেখানে 'আমি'ও থাকে না, 'আমি'র অনুভবযোগ্য কিছুই থাকে না—সেখানে যাহা থাকে তাহা হইতেই আমিত্বের ও অন্য সব কিছুর উদ্ভব। 'নেতি' 'নেতি' করিয়া 'আমিত্বে'রও পারে যে অবস্থায় যাওয়া যায়, তাহা 'আমিত্বে'রই মহত্তম রূপ। তাহা আনন্দস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ ও সৎস্বরূপ। ইহার প্রমাণ? প্রমাণ একমাত্র সে সত্য যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহাদের কথা, বেদ, এবং নিজের উপলব্ধি। সত্যদ্রষ্টাদের উপলব্ধি বাদ দিয়া শুধু যুক্তি দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কিন্তু সত্যদ্রষ্টাদের কথায় বিশ্বাস করিতে মনে যত রকম সংশয় উঠিতে পারে, তাহার নিরসনের জন্য তিনি যে যুক্তি দিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। বিশ্ব ও জীবনের মূলে যে চরমসত্য রহিয়াছে, তাহা লইয়া আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত দার্শনিক মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে, যুক্তির দিক দিয়া শঙ্করের মত আজিও সেগুলির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

তাছাড়া আচার্য শঙ্কর ঈশ্বরোপাসনারও স্থান দিয়াছেন। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে, যতক্ষণ না চরমসত্য উপলব্ধি হইতেছে, ততক্ষণ যেমন 'আমি'-ও থাকে, জগৎও থাকে তেমনি জগৎকর্তা ঈশ্বর বা সগুণব্রহ্মও থাকেন।

হাজার হাজার বছর পূর্বে ভারতের তপোবনে সে সত্য উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহারই বিভায় ভারতের সভ্যতা, ভারতের সমাজ সমুজ্জ্বল। ভারতীয় জীবনাদর্শ এই চরম সত্যলাভ; অধিকারীভেদে এই আদর্শ বিভিন্নাকার হইলেও তাহা সবই এই সত্যাভি-মুখী, সর্বস্তরের জীবনাদর্শেরই পথপ্রদর্শক এই সত্যের আলোক। চরম সত্যের বিভায় উজ্জ্বল বলিয়াই এত হাজার বছর ধরিয়া বহু ঝড় ঝঞ্ঝা সহিয়াও তাহা নিজস্বতা লইয়া জীবিত আছে। মাঝে মাঝে স্বাভাবিক নিয়মে সমাজ- ও ধর্ম-জীবনের মালিন্যবশতঃ এই দীপ্তি ঈষৎ ম্লান হইয়া পড়িয়াছে—কিন্তু নির্বাপণের পূর্বে কোন সত্যদ্রষ্টার আবির্ভাবে উহা সর্বকালেই পুনরুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বুদ্ধ ও শঙ্কর সঙ্কট-ক্ষণে ভারতের নির্বাণোন্মুখ প্রাণশিখাকে যে বিপুল ভাস্বরতা দিয়াছিলেন, তাহা অতুলনীয়। বৈশাখী পূর্ণিমা ও শুক্লা পঞ্চমী তাঁহাদের আবির্ভাবে ধন্য। আজ বিশ্বের সঙ্কটক্ষণে প্রার্থনা করি, তাঁহাদের করুণায় বিশ্ববাসীর হৃদয় যথার্থ মানবপ্রেমে ও যথার্থ একত্ববোধের আলোকে পূর্ণ হইয়া উঠুক।

স্বামী তুরীয়ানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

(নিকুঞ্জবিহারী মল্লিককে লিখিত)

শ্রীহরিঃ শরণম্ গড়-মুক্তেশ্বর ২৪।১।'০৮

প্রিয় নিকুঞ্জলাল,

তোমার ১৬ই তারিখের পত্র হস্তগত হইয়াছে। সমাচার অবগত হইয়া প্রীত হইয়াছি। শ্রীমান অতুলের পত্রও পড়িয়াছি। তাহাকেও উত্তর লিখিব। মধ্যে আমার দাঁতের গোড়া ফুলিয়া গলাবেদনা প্রভৃতিতে কিছু কষ্ট দিয়াছিল। এখন অনেক ভাল আছি। এখানেও অল্প বৃষ্টি হইয়া লোকদের অনেকটা শান্ত করিয়াছে। আনাজের মূল্যও কিছু কমিয়াছে শুনিতেছি। দেশে শস্য যে নাই একেবারে এরূপ নহে। কেবল ব্যাপারীরা অর্থলোভে একজোটে ইহার মূল্য বাড়াইতেছে। লোভ বড়ই বিষমবস্তু। দয়াধর্ম সকলই নষ্ট করিয়া দেয়। এই লোভ যে কেবল অর্থেই নিবদ্ধ এমন নহে। নাম যশ মান্য ইত্যাদি ইহার অনেক রূপ আছে। ইহাই যত অনর্থের মূল। ইহার প্রেরণায় মানুষ কর্তব্যবুদ্ধি ভুলিয়া যায়। ইনি যদি একবার আপনার আসন কোথাও জমাইতে পান তবে ইহাকে আর সেখান হইতে তোলে কে? ক্রমে ইহার নাম হয় প্রেষ্টিজ। প্রেষ্টিজ রক্ষা করিবার জন্য মানুষ করিতে পারে না এমন কাজই নাই। কিন্তু কর্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। শুভ কর্ম শুভফল ও অশুভ কর্ম অশুভ ফল প্রসব করিবেই। সুতরাং কালে অশুভ কর্মফল একত্রিত হইয়া প্রেষ্টিজাদি যাহা কিছু সমূলে বিনাশ করিয়া দেয়। ইহারই নাম সংসার। ইহাই চক্ষের সম্মুখে নিয়তই ঘটিতেছে। আমরা মায়াবশে কেবল দেখিতে পাইতেছি না। অথবা দেখিয়াও নিজের বেলা সাবধান হইতে ভুলিয়া যাইতেছি। ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়াছ বোধ হয়। এই যে সেদিন বঙ্গের ছোটলাট হাইকোর্টের জজদের অনুরোধ করিয়াছেন যেন তাঁহারা তাঁহাদের রায়ে পুলিসের দোষকীর্তন না করেন, কিছু বলিবার থাকিলে গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়া পাঠান—ইহাও এই প্রেষ্টিজ রক্ষার প্রয়াস। কিন্তু বাস্তবিক এরূপ করিয়া কি প্রেস্টিজ থাকে? সুকর্মের ফলে প্রেষ্টিজ উৎপন্ন হয় এবং তাহার অভাবেই আবার উৎসন্নও যায়। ইহার অন্যথা হইবার নহে। এইরূপে সকল পাবলিক কার্যের উৎপত্তি স্থিতি নাশ। ধর্মে অর্থাৎ নিঃস্বার্থতায় উৎপত্তি ও স্থিতি এবং তাহার অভাবে নাশ হইবেই। কিন্তু ব্যক্তিগত দানাদি চিরদিন থাকিবে। কারণ ইহা হৃদয়ের জিনিস। হৃদয় থাকিলে ইহার কার্যও হইতে থাকিবে। এখানে নামযশাদি কোন উত্তেজক কারণ প্রেরক নহে। ইহা স্বতঃপ্রবাহিত করুণাতটিনী। সুতরাং কোন ভয়ের কারণ নাই। আমাদের দেশে অর্গেনাইজেসন এখনও সফল হইবার সময় আসে নাই। সাধারণ লোক অশিক্ষিত আর শিক্ষিতেরা চরিত্রবিবর্জিত। প্রভুর যেমন ইচ্ছা হইবে। P. B. সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, উহা তোমার নিকট থাকুক। পরে কিছু বলিবার হয় বলিব। আমি এখন কিছুদিন এইখানেই থাকিব বোধ হয়। আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

ধম্মপদ

নচিকেতা ভরদ্বাজ

যো চ পুব্বে পমজ্জিত্বা
পচ্ছা সো নপ্পমজ্জতি
সো ইমম্ লোকম্ পভাসেতি
অব্‌ভা মুত্তো ব চন্দিমা। ৩২।
যস্‌স পাপম্ কতম্ কম্মম্
কুসলেন পিথীয়তী
সো ইমম্ লোকম্ পভাসেতি
অব্‌ভা মুত্তো ব চন্দিমা। ৩৩।
অন্ধভূতো অয়ম্ লোকো
তনুকেত্‌থ বিপস্‌সতি
সকুণো জালমুত্তো ব
অপ্পো সগ্‌গায় গচ্ছতি। ৩৪ ॥ ধম্মপদ ॥

প্রথমে যে অবিবেকী প্রমত্ত—সে যদি পশ্চাতে
ধীর স্থিতপ্রজ্ঞ হয়—তাহলে সে মেঘমুক্ত চাঁদের মতন
আলো দেয় পৃথিবীকে। এবং যার পাপকর্ম কুশলধর্মের
কল্যাণে আবৃত তারও মুক্ত সত্তা স্নিগ্ধ চন্দ্রমাতে
প্রতীকা পরিব্যাপ্ত—সে তখন আলোর চারণ। ৩২।৩৩ ॥

অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন এ জগতে মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোকের
প্রজ্ঞান রয়েছে যারা প্রমুক্ত প্রকৃত দৃষ্টির
অধিকারী। জালমুক্ত পাখীর মতন
অতি স্বল্পলোক যারা পেতে পারে স্বর্গের শরার। ৩৪ ॥

ভগবৎপ্রসঙ্গ*

স্বামী মাধবানন্দ

এক

(বেলুড় মঠ।

শনিবার, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬২)

মা কালীই এবার ঠাকুর হয়ে এসেছেন।

শুধু আন্তরিকতার সঙ্গে ডাকলেই হবে। আমরা এক পা এগোলে তিনি একশ পা এগিয়ে আসেন। তিনি দয়াময়। তিনিই কৃপা করে দর্শন দেন। সাংসারিক বিপদ আপদ সুখদুঃখ কিছু থাকবেই। ওদিকে না তাকিয়ে ইষ্টকে ডেকে যেতে হবে। বেশী বলার কিছু নাই। তিনি আমাদের মাতৃভাষায়, বাঙলা ভাষায় কত সহজ করে ধর্মের কথা বলেছেন; কথামৃতে তা রয়েছে।

তাঁকে আপনার বোধ করবে। তিনি বাপ-মার চেয়েও আপনার। তাঁরই কিছু ভালবাসা আমরা সংসারে দেখতে পাই। সংসারের মধ্যে তাঁকে আপন করে নিতে হবে। তিনি আমাদের প্রার্থনা শোনেন। উতলা হবার কিছু নাই। দেখা দেবেনই দেবেন।

(বেলুড় মঠ।

রবিবার, ১৬ই অক্টোবর, ১৯৬২)

প্রাণের যোগ হচ্ছে সব চেয়ে বড় জিনিস। জাগতিক বিষয়ের জন্যই সবাই ছোটে কিন্তু ভগবানলাভের জন্য কজন চেষ্টা করে? আমরা বিশ্বাস করি, ঠাকুরই সাক্ষাৎ ভগবান। তিনি মানুষরূপে এসেছেন। আমাদের সামান্য ডাকও শোনেন।

একদিন না একদিন দেখা দেবেনই। শশী মহারাজ আমাকে বলেছিলেন, এ যুগে ঠাকুরকে যে স্মরণ করবে, তার কোন ভয় নাই। ঠাকুরের উপদেশ 'কথামৃত'তে পাবে। সংক্ষেপে খুব সরল করে বলা আছে। 'লীলাপ্রসঙ্গ', 'মায়ের কথা' এসব পড়বে। মা ও ঠাকুরের কথা আলাদা নয়। প্রার্থনা করলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। তবে দেখা পাওয়া বা তাঁর ডাক শুনতে পাওয়া—আমরা তৈরী নই বলে পাই না। দিনে নক্ষত্র দেখতে না পেলেও নক্ষত্র থাকে; তেমনি তাঁর সাড়া না পেলেও তিনি আছেন, আমাদের ডাক শোনেন। ঠাকুর এসে এ যুগে ধর্মজীবন খুব সহজ করে দিয়েছেন। জলহাওয়ার মত সহজ। কিন্তু তা অনুভব করতে হবে। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে তা দেখাতে হবে। সেইটিই হবে test.

(বেলুড় মঠ।

সোমবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬২)

আমরা কতটা মনপ্রাণ দিয়ে ডাকছি—তার উপর সব নির্ভর করছে। ছোট ছেলে যখন কাঁদে, মা তখন ভাতের হাঁড়ি ফেলেও চলে আসেন। তিনি আমাদের বাপমায়ের মত। যা করবে আন্তরিকতার সঙ্গে করবে। খুব বেশী যে করতেই হবে তার কোন মানে নাই। কিন্তু খুব ধৈর্য চাই। সাক্ষাৎ শিব এবং কালী ঠাকুরের রূপ ধরে এসেছেন। তিনিই আবার সর্বদেবদেবীস্বরূপ, স্বামীজী বলেছেন।

যার যা প্রাপ্য তিনি তাকে তা দেবেন। ঋণী থাকবেন না, বুঝলে? তোমাদের দুঃখ

* প্রথমাংশ প্রসঙ্গের অনুলিখন; দ্বিতীয়াংশ লিখিত পত্র হইতে সংকলিত।

দারিদ্র্য অভাব অভিযোগ কিছু কিছু থাকবেই কিন্তু স্মরণ মনন করতে ছেড় না।

(বেলুড় মঠ।
মঙ্গলবার, ২রা অক্টোবর, ১৯৬২)

ঠাকুরের মুখ দিয়ে যেসব কথা বেরিয়েছে, অপূর্ব জিনিস। তাঁর আশীর্বাদ ঐ সব কথার মধ্যে দিয়ে আসছে। ধর্মজীবনের আসল কথা ওতে বুঝতে পারবে। ভগবান দেখেন আমাদের আন্তরিকতা। স্বামী, স্ত্রী, বাপ, মা—সেই ভগবান ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর কাছে ছোট ছেলেমেয়ের মত আবদার করে ডাকবে। তাঁর কাছে জোর করবে, শুধু প্রার্থনা নয়। ধর্মজীবন একদিকে খুব সোজা, সহজলভ্য। আবার খুব শক্ত. যেন তিনি বহুদূরে। চাই শুধু আন্তরিকতা। আমাদের ডাক ঠিক ঠিক ভেতর থেকে হলে তিনি সাড়া দেবেন। তিনি আমাদের দোষ-ত্রুটি ধরেন না। ছোট ছেলে যখন খেলনা নিয়ে ভুলে থাকে, মা তখন আসেন না। কিন্তু খেলনা ছেড়ে যখন কাঁদতে থাকে, মা তখন ছুটে আসেন। আমাদেরও সেইরকম এই জাগতিক বিষয়ের লালসা ছেড়ে সেই ভগবানকেই চাইতে হবে। পুবদিকে যত এগিয়ে যাবে, পশ্চিম তত পিছনে পড়বে। সংসারের আসক্তি কমবে

ধ্যানজপ করতে করতে তোমাদের সদ্বুদ্ধি জেগে উঠবে। জপ খুব সোজা। ধ্যান সকলের হয় না। কিন্তু জপ সকলেই করতে পারে। কিন্তু প্রাণ থেকে হওয়া চাই। নাম ও নামী অভেদ। ভগবান কৃপা করে এই নামের মধ্যে তাঁর সব শক্তি দিয়েছেন। তাই ঠাকুর বলেছেন, 'জপাৎ সিদ্ধিঃ'। ঠাকুর এ যুগের জগদ্গুরু। আসল ধর্মের পথ দেখাবার জন্য তিনি এসেছেন।...

(বেলুড় মঠ।
বৃহস্পতিবার, ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৬২)

সাধনভজন করলে সুফল ফলবেই ফলবে। তবে দেরী হলে ব্যস্ত হবার কিছু নাই। ভগবানকে কি ভাবে ডাকতে হয় ঠাকুর তা দেখিয়ে গেলেন। 'কথামৃত'তে দেখতে পাবে। তিনি কৃপা করে মানুষের শরীর ধারণ করে এসেছিলেন। মাকে সঙ্গে নিয়ে।

ফলের দিকে বিশেষ নজর দেবার প্রয়োজন নাই। বীজ পুঁতলে গাছ হবেই। ফসল ফলবেই। অবিদ্যা নাশ হয়ে পরম জ্ঞান লাভ হবে। তার জন্য খাটতে হবে; আর চাই আন্তরিকতা। ভয় পাবার কিছু নাই। তিনি আমাদের আপনার হতেও আপনার। মন কি সহজে শুদ্ধ হয়? ছিপে মাছ ধরা দেখেছ না? মাছ-খেলানর মত। খানিকটা তিনি যেন আমাদের ছেড়ে দিয়ে দেখেন। তারপর টান দেবেন। একদিন না একদিন দেখা দেবেনই। খুব ডেকে যাও। অসংখ্য তাঁর রূপ। সেই চিন্তা করাই হচ্ছে আসল। এই নিয়ে বিবাদ করবার কিছু নাই। তাঁকে ভালবাসতে হবে। আপন বোধ করে নিতে হবে। প্রার্থনা করে যাবে—ভেতরের সব দুর্বলতা মলিনতা দূর করার জন্য আর তাঁর নিজের স্বরূপ দেখাবার জন্য। যে তাঁকে ঠিক ঠিক স্মরণ করবে, সে তাঁর দর্শন পাবেই।

(বেলুড় মঠ।
বুধবার, ১৪ই নভেম্বর, ১৯৬২)

ব্যাকুলতার সঙ্গে আন্তরিক ভাবে ভগবানকে ডাকতে হয়। (তাঁকে ডাকার সময়) যদি কিছুটা ভুলও হয়, আন্তরিকতা থাকলে কোন ক্ষতি হবে না। ঠাকুর বলেছেন না, ছোট ছেলে অনেক সময় বাবা বা মাকে ঠিকভাবে

উচ্চারণ করে ডাকতে পারে না। তাবলে কি তাঁরা দোষ ধরেন? কিম্বা ভুল ডাকলেও সাড়া দেন না?

ভগবান একজন। তাঁর নাম ও রূপ বিভিন্ন হলেও ঠাকুরকে চিন্তা করলে সুবিধাই হবে। স্বামীজী বলেছেন, তিনি সর্বদেবদেবী-স্বরূপ। বিশ্বাস রেখ নিজের উপরে, মন্ত্রের উপরে। ভগবান দেখা দেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছেন। একটু সাধনভজন করলে তিনি নিজে এগিয়ে আসেন।

জলে ডোবা লোকের মত ব্যাকুলতা প্রয়োজন।

সংসারের সব কাজ কর্তব্য বুদ্ধিতে করবে, বড় লোকের বাড়ীর দাসীর মত। কিন্তু মনের সব অংশ সংসারে খরচ করে দিও না। কিছু অংশ ভগবানের দিকে দিও। তাতে লোকসান নাই। সংসারে এসেছি অল্প দিনের জন্য।

ঠাকুর সূক্ষ্মশরীরে এখনও রয়েছেন।

(বেলুড় মঠ।
সোমবার, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৬২)

প্রশ্ন: মহারাজ, মন স্থির কেমন করে করা যায়? নানারকম কাজকর্ম করতে হয়। সন্ধ্যায় ধ্যান করতে বসলেই সেই সব চিন্তা আসে।

উত্তর: মনকে বলতে হবে, তুই এখন কিছুক্ষণ চুপ করে ব'স্। এখন বিরক্ত করিস না। আর ভগবানকে বলা, তুমি তোমার দিকে মনকে একটু টেনে নাও। এই অভ্যাস করে যেতে হয়। তাছাড়া ঠিক ঠিক ধ্যান কজনের হয়? মা-ও বলতেন, ধ্যান কি সহজে হয়? খুব ভাগ্যবান যারা, সে অতি অল্প, তাদেরই হয়। ভগবান ওতেই খুশী হন এই দেখে যে, সে চেষ্টা করছে। কাজেই অভ্যাস ছাড়তে নাই। আর জোর করলে মন অনেক সময় rebel (বিদ্রোহ) করে। এ ছাড়া Royal Road (রাজপথ) তো কিছু নাই।

দুই

(পত্রের মাধ্যমে)

(১)

প্রশ্ন: মন বড় চঞ্চল। উপায় কি?

উত্তর: অনেকেরই মন স্বভাবত: চঞ্চল। তবে অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে উহা বশে আসে। মন চঞ্চল হইলেও তুমি জপ ধ্যান করিতে ছাড়িও না। ভগবানের প্রতি একটু ভালবাসা হইলে তখন মন কতকটা শান্ত হইবে। এখন Struggle (খুব উদ্যম নিয়ে চেষ্টা) করিয়াই চল। (বেলুড় মঠ, ১০ই আগষ্ট, ১৯৬৪)

(২)

প্রশ্ন: মন স্থির কিছুতেই হয় না।

উত্তর: মন স্থির কি অত শীঘ্র হয়? আন্তরিক চেষ্টা করিয়া যাও, যথাসময়ে ঠাকুরের কৃপায় সফল হইবে। মন স্থির হউক বা না হউক তুমি নিয়মিত জপধ্যানে বসিতে ছাড়িবে না। মন যত বার বাহিরে চলিয়া যাইবে, ততবারই তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া আবার জপধ্যানে লাগাইবে। আসল কথা কেবল হায় হায় না করিয়া ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে অভ্যাস কর। তাঁহাকেই কাতর-ভাবে প্রার্থনা জানাইও। জপ এবং যতটুকু পার ধ্যান করিবার চেষ্টা করিও, তাহা হইলেই হইবে। (বেলুড় মঠ, ৭ই ১৯৬২)

(৩)

সাধকজীবনে অগ্রসর হইতে হইলে ভগবৎকৃপাই প্রধান অবলম্বন। এখন তো তোমার গুরু * ইষ্টপাদপদ্মে মিলিত হইয়াছেন। সুতরাং প্রাণের সহিত ঠাকুরকেই সব জানাও। তিনি পরম প্রেমময়, সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান তো বটেনই। তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, তোমার উচ্চ আদর্শ এই জীবনেই প্রতিফলিত হউক। তোমার পত্র হইতে আন্তরিকতা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এই আন্তরিক ডাক তিনি খুব শুনেন। গুরুও যে কৃপা করেন—সে সময় বুঝিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা জানিতে পারিলে তদনুরূপ ব্যবস্থা করেন। তুমি আদৌ হতাশ হইও না। বরং যেমন ডাকিতেছ তেমন ডাকিয়া যাও। রবিবাবুর একটি কবিতাংশ মনে পড়িতেছে—

করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে
কোথা নিয়ে যায় কাহারে,
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়া
এনেছ তোমারই দুয়ারে।

(বেলুড় মঠ, ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪)

* স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ

স্বরূপ

শ্রীমদন চৌধুরী

তোমরাই বল ভগবান শুধু বুদ্ধ,
শুনেছ, কেবল বুদ্ধ-আত্মা শুদ্ধ!
অথচ, আছেন সবাকার হৃদি মাঝে
শুদ্ধ আত্মা—একথা কি জানা আছে?

জ্ঞানের আলোকে চিনেছে যে সেই 'আমি'
দুঃখের আঁচে পুড়িয়া দিবস যামি
তার মনে হয়—আবার জন্ম নিই,
হৃদয় আমার সবাকারে সঁপে দিই!

আজো দেখি 'জরা' লাঠি ভর দিয়ে চলে,
রোগার্তপ্রাণ ভাসে চক্ষের জলে,
শোক-উচ্ছ্বাস শবযাত্রার কালে,
সন্ন্যাসী যান চন্দন প'রে ভালে।

মানুষজন্ম শ্রেষ্ঠ জন্ম জেনো—
প্রতি আত্মায় বুদ্ধের লীলা মেনো।
অমৃত-পুত্র তোমরা সকলে শুদ্ধ
গভীরে পৌঁছে দেখিবে সবাই বুদ্ধ।

চারি আর্যসত্য

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ

বুদ্ধদেব অনুত্তর ভিষক্।

তিনি বৈদ্যরাজ, মানুষের ভব-ব্যাধি নিরাকরণের জন্য তাঁর আবির্ভাব। যেখানে ব্যাধি, সেখানেই তার হেতু আছে--আরোগ্যলাভের আশা আছে এবং ভেষজ আছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের এই নিদানতত্ত্বকে বুদ্ধদেব গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই তুলনায় আপনার অনুপম শিক্ষা আর্যসত্য গড়ে তুলেছিলেন।

এই চারি আর্যসত্য বুদ্ধধর্মের কেন্দ্রে রয়েছে—এরই ভিত্তির উপর বুদ্ধবাণীর মর্মরপ্রাসাদ রচিত হয়েছে। সারবান এই ধর্মদেশনাকে বুদ্ধভক্তেরা অলৌকিক, অপূর্ব এবং অতুলনীয় বলেছেন।

অনেকে তর্ক করেন যে এই পরিকল্পনা বুদ্ধদেবের নিজস্ব নয়। তাঁরা বলেন অঙ্গুত্তর নিকায়ের চতুর্থ নিপাতে কিংবা দীর্ঘ নিকায়ের সঙ্গীতি-সূত্রে এই চারি সত্যের উল্লেখ নেই। বুদ্ধদেব তাঁর অন্তিমকালে বোধিসত্ত্বীয় ধর্ম বলেছিলেন, সেই সাঁইত্রিশটির মধ্যে চারি আর্যসূত্র স্থান পায়নি। তাই সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু তথাপি বৌদ্ধেরা বরাবরই এই তত্ত্বকে যে উচ্চ আসন দিয়ে এসেছেন—তা থেকে এই পরিকল্পনাকে বুদ্ধের দান বলেই স্বীকার করা সমীচীন।

সারনাথে প্রথম যে ভাষণ দিয়েছিলেন—সেখানেই চারি সত্যের প্রথম সন্ধান মেলে। বুদ্ধদেব বলেন, তিনি মধ্যমার্গ আবিষ্কার করেছেন—এই পথ এনে দেয় জীবনে কল্যাণময় সত্যদৃষ্টি, যার ফলে মানবজীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান মেলে, জাগ্রত হয় পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা এবং অভিজ্ঞা। আসে একান্ত নিবিড় শান্তি, সম্বোধির প্রকাশে হৃদয় প্রফুল্ল হয় এবং মানুষ তার ঈপ্সিত নির্বাণ লাভ করে। নিবাণকে বুদ্ধদেব নাস্তিত্ব হিসাবে দেখেন নি—দেখেছেন পরম সুখ রূপে—অশোক, বিরজ, ক্ষেমঙ্কর এবং উপশম।

এই কথা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব চারি সত্যের কথা উত্থাপন করেন। প্রথম আর্যসত্য দুঃখ। জন্মও দুঃখ, জরাও দুঃখ। ব্যাধি জর্জর করে, মরণও দুঃখের প্রবাহে মানুষকে কাতর করে। জীবনে প্রতি মুহূর্তে অপ্রিয়ের সহিত সংযোগে আসে লাঞ্ছনা। প্রিয়ের সহিত বিপ্রয়োগে আনে একান্ত ব্যথা ও বেদনা। সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধই দুঃখ। শেষের কথাটির ব্যাখার প্রয়োজন। পরে সেটা করা হবে।

দ্বিতীয় আর্যসত্য দুঃখের উৎপত্তি। কেন দুঃখ পুনঃপুনঃ মানুষকে আক্রমণ করে। বিনা কারণে সংসারে কিছুই ঘটে না—দুঃখের তাই কারণ আছে। তৃষ্ণাই দুঃখের হেতু—তৃষ্ণার ফলে মানুষ পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে—তৃষ্ণা ভোগানন্দে বর্ধিত হয়—এখন এখানে, তখন সেখানে কামনার চরিতার্থতা সন্ধান করে। তৃষ্ণা তিন রকম—কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা। সুখ ও ভোগের আশায় মানুষ উদ্বেল হয়ে ওঠে--মৃত্যুর পরে পুনর্জন্মের বাসনা করে এবং বর্তমান জন্মে ভোগানন্দের পিছনে ধাবিত হয়।

দুঃখ আছে বলে কিন্তু নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। তৃষ্ণাক্ষয়ই দুঃখক্ষয়। তৃতীয় আর্য সত্য তাই দুঃখনিরোধের কথা। যে তৃষ্ণা মানুষকে জন্মজন্মান্তর ক্লেশ দিচ্ছে, তার সম্পূর্ণ

বিলুপ্তি চাই, তৃষ্ণাকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করতে হবে—তৃষ্ণাকে পরিপূর্ণভাবে বিসর্জন দিতে হবে—তৃষ্ণা থেকে অপ্রবৃত্ত হয়ে তৃষ্ণা থেকে মুক্তিলাভ করতে হবে।

আর চতুর্থ আর্যসত্য দুঃখনিরোধমার্গ—যে পথ সাধনার পথ; সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি সেই বিবর্ধনের অষ্ট সোপান। বুদ্ধ তর্ক ও জল্পনাকে ঘৃণা করতেন, তিনি বলতেন ধর্মজীবনে অগ্রগতি আসে সাধনায়, আসে তপস্যায়। তপস্যায় অভ্যাসহীন ব্যক্তিকে তিনি আদৌ আমল দিতেন না। Sir Charles Elliot তাই তাঁর বিখ্যাত Hinduism and Buddhism নামক গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন :—"It is clear, therefore, that the Buddha regarded practice as the foundation of his system. He wished to create a temper and a habit of life. Men acquiescence in dogma, such as a Christian creed, is not sufficient as a basis of religion and test of membership." বুদ্ধ বেশ দর্পের সঙ্গে বলতেন—সমুদ্রের যেমন একটি আস্বাদ আছে, সে হল লবণাক্ত আস্বাদ—আমার ধর্ম ও বিনয় তেমনই এক রস, সে হল বিমুক্তির আনন্দ।

অষ্টাঙ্গ মার্গের কথাগুলিকে অনেকের নিকট অতিসাধারণ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু মূলতঃ তা নয়। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে তিনি যে কার্যপন্থা আবিষ্কার করলেন, তা সত্যই নূতন, বিস্ময়কর এবং অতুলনীয়। বুদ্ধের শিক্ষায় ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস নেই—রয়েছে মুক্তির দৃঢ়তা। দুঃখের আদিম কারণ অবিদ্যা বা অজ্ঞান—বুদ্ধ এই বিশ্বজগৎকে পর্যালোচনা করে পরম সত্যকে প্রজ্ঞাচক্ষুতে অবলোকন করতে পেরেছিলেন।

অষ্টাঙ্গ মার্গে হিজিবিজি কিছু নেই; আছে যে পথে মুক্তি আনে তারই নির্দেশ—অতি সরল, অতি সুন্দর ভাষায়। এ যেন এক নবীন বিশ্ব-চেতন মুক্তি-কেতন। এখানে ক্রিয়া-কলাপের কথা নেই—জগৎকর্তার কথা নেই, কৃপা বা শরণাগতির কথা নেই।

নৈতিক বীরত্বে বলীয়ান্ বুদ্ধ মানুষকে শক্ত হয়ে, সমর্থ হয়ে, আত্মনির্ভর হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে বলেছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥৬।৫

বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা আপনিই আপনাকে উদ্ধার করবে—সংসারের মোহগর্ত থেকে বেরিয়ে যোগারূঢ় হবে; কারণ মনই আত্মার বন্ধু। মনকে বিষয়াসক্ত করবে না—শুদ্ধ মনই মানুষের প্রকৃত হিতকারী। সংসারমুক্তির প্রতিকূল বিষয়াসক্ত মনই মানুষের পরম শত্রু—সেই মনই মানুষকে অধোগামী করে, বন্ধনের মাঝে ডোবায়। ধর্মপদে এই উপদেশই হুবহু দেওয়া হয়েছে।

আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ সাধক হৃদয় ও মনের পরিবর্তনই সুখের কারণ জেনে সৎকর্মে আত্ম-নিয়োগ করবেন—কারণ সৎকাজেই শুদ্ধ ও সুন্দর মনের জাগরণ হয় এবং পরিশেষে সমাধির আনন্দের মাঝেই জীবনের অভিব্যক্তি সার্থকতা লাভ করে

আত্মানুশীলনের প্রথম ধাপেই সম্যক্ দৃষ্টি—এটি কোনও দার্শনিক তত্ত্ববিচার নয়—চতুরার্য-সত্যের বোধ ও অধিগমকে বুদ্ধ সম্যক্ দৃষ্টি বলেছেন—সাথে সাথে কর্মফল এবং অনাত্মার স্বীকৃতিও আছে। সম্যক্ দৃষ্টিকে সংক্ষেপে বৌদ্ধদেশনার মৌলিক পরিচয় বলা যেতে পারে।

সম্যক্ সংকল্প হল বিলাস ও ভোগবাসনার পরিত্যাগ—কাউকে দ্বেষ করব না, কাউকে

হিংসা করব না, কারও কোনও ক্ষতি করব না—এই দৃঢ় ব্রত গ্রহণ করাই সত্য সংকল্প।

সম্যক্ বাক্ হল মিথ্যাকে, অনৃতকে পরিহার। কারও নিন্দায় লিপ্ত হবে না—কঠোর পরুষ বাক্য ব্যবহার করবে না—অলস এবং অনর্থক জল্পনা করবে না।

সম্যক্ কর্মান্ত হল প্রাণিহত্যা না করা, চুরি না করা এবং নৈতিক স্খলনের নিবারণ।

সম্যক্ আজীব হল জীবিকার বিশুদ্ধতা। সংসারে থাকতে হলে জীবিকা চাই, কিন্তু বুদ্ধদেব বলতেন, সেই সব কাজ করবে না, যে কাজে তোমার চিত্তের অবনতি ঘটে। অন্যায় আচরণে জীবন ধারণ করবে না—অন্নবস্ত্র আহরণ কর পবিত্র ও পুণ্য কর্মে। সেই হল পাপাচরণ, যাতে অন্যের ক্লেশ এবং বিপদ ঘটে; বৌদ্ধ গ্রন্থে যে সব জীবিকা গ্রহণে বারণ আছে, তাদের মধ্যে রয়েছে কসাইয়ের কাজ করবে না, হোটেলরক্ষক বা মদ্যবিক্রেতার কাজ করবে না, বিষ বিক্রয় করবে না ইত্যাদি।

সম্যক্ ব্যায়াম মানস উৎকর্ষের প্রয়াস—অধ্যাত্ম অনুশীলনের প্রযত্ন। মনে যাতে অশুভ চিন্তা না জাগে, তার প্রচেষ্টা করতে হবে। যদি জেগে গিয়ে থাকে তাকে দূর করতে হবে—মনে শুভ চিন্তা, কল্যাণকর ক্ষেমঙ্কর ইচ্ছার উদ্ভব ঘটাতে হবে—যাতে সৎ, শুভ, কল্যাণ এবং ক্ষেমের আবির্ভাব ঘটে, যাতে তারা প্রবৃদ্ধ হয়, পূর্ণতা লাভ করে—তার জন্য একান্ত অধ্যবসায় করতে হবে।

সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি বিশেষভাবে বৌদ্ধ সাধনার পরিচায়ক—মানসবিকাশের, আত্মোৎকর্ষের উপায়। কেহ কেহ বলতে পারেন এখানে বুদ্ধ শিষ্যের অন্তরে নিগড় বেঁধেছেন—তাকে মুক্তির স্বাধীনতা দেন নি। কিন্তু তা ঠিক নয়, বৌদ্ধ সাধকের ভয়ের কিছু নেই। শুভ এবং অশুভের পরিচয় নিয়ে শুভ চিন্তার বৃদ্ধি করতে হবে, অশুভ চিন্তার বিনাশ করতে হবে। যা সৎ তাকে প্রতিপালন করতে হবে, যা অসৎ তাকে ক্ষয় করতে হবে। মানুষের যা কিছু সুন্দর ও শোভন প্রবৃত্তি রয়েছে, তাকে লালন পালন করে তাকে পূর্ণ প্রবৃদ্ধ ও সর্বায়ত্ত করতে হবে।

সম্যক্ স্মৃতি কি? যখন ভিক্ষু নিজ কায়কে পরীক্ষা করে কায়ে আসক্তিহীন হয়ে, বীর্যশীল, প্রজ্ঞাতৎপর এবং স্মৃতিযুক্ত হয়ে লোভ ও বিষাদে আর আক্রান্ত হয় না, তখনই যে স্মৃতির অনুশীলন করে।

এইভাবে যখন সে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান নিয়ে স্মৃতিশীল হয়, তখনই তার সম্যক্ স্মৃতি অনুশাসন পালন করা হয়। বৌদ্ধেরা এই বিষয়টিকে খুবই গুরুত্ব প্রদান করেন। ধর্মপদে আছে:—

অত্তা হি অত্তনো নাথ কো হি নাথো
পরো সিয়া।
অত্তনা হি সুদন্তেন নাথং লভতি
দুল্লভং ॥ ১৬০

আত্মাই আত্মার নাথ, আত্মা ছাড়া অন্য কে নাথ হতে পারে? যার আত্মা দমিত, সে দুর্লভ প্রভুর আশ্রয় পেয়েছে।

সম্যক্ স্মৃতির অভ্যাসে আত্মজ্ঞান লাভের পর পরিপূর্ণ আত্মসংযম আসে। তখন কিছুই অমনোযোগের সহিত সম্পন্ন হয় না, কিছুই যন্ত্রের মত উদাসীনতায় করা হয় না। তখন ইচ্ছামূলক ও সংকল্পজাত সমস্ত কাজই সংযত হয়—শুধু তাই নয়, যে সব কাজ মন গ্রহীতার

মত নিরাসক্ত ভাবে গ্রহণ করে, সেগুলিও শান্ত ও সংযত হয়।

বুদ্ধ অনাত্মবাদী—এই কথা সকলেই বলেন। কিন্তু সে অনাত্মবাদ আত্মবাদের নামান্তর—যা আত্মা নয়, অনাত্মবাদে কেবল তাদের দেখানো হয়েছে—কিন্তু বুদ্ধ কোথাও আত্মাকে অস্বীকার করেন নি কেবল তার অনির্বচনীয় অনুভূতিকে বাগ্‌জাল-বদ্ধ করতে চান নি—যা করা যায় না। আত্মাই যে মানুষের পরিচালক বন্ধু একথা বুদ্দেব বারংবার বলেছেন।

শেষ এবং অষ্টম সোপান হল সমাধি। মনকে একাগ্র করতে পারলে সমাধি আসবে। মন চঞ্চল—সর্বদাই অস্থির হয়ে ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করছে, তাকে সংযত করে ধ্যান করতে হবে। ধ্যানের ফলে আবার সেই তুরীয় আনন্দ—সেই পরম সাম্যাবস্থা—যাকে সঠিকভাবে কথায় প্রকাশ করা যায় না—সেই সমাধিতে সিদ্ধিলাভ করলে প্রজ্ঞাচক্ষু খুলবে।

দীর্ঘ নিকায়ের শ্রামণ্যফলসূত্র নামক সূত্রে বুদ্ধদেব সমাধির আনন্দের চমৎকার বর্ণনা করেছেন। বিশুদ্ধির আলোকে সাধকের সর্বশরীর আলোকিত হয়, পরম শান্তিতে তিনি পূর্ণ হন।

চারিটি ধ্যানের মাধ্যমে তিনি ক্রমান্বয়ে ঊর্ধ্বে আরোহণ করেন এবং পরিশেষে নির্বাণ লাভ করেন। চিত্তের সেই সমাহিত অবস্থায় আসবক্ষয় জ্ঞানাভিমুখে চিত্তকে শমিত করেন। তিনি তখন যথাযথরূপে জানতে পারেন,—ইহা দুঃখ ইহা দুঃখসমুদয়, ইহা দুঃখনিরোধ, ইহা দুঃখনিরোধ-মার্গ। তিনি 'ইহা আসব', ইহা আসব-সমুদয়, ইহা আসব-নিরোধ, ইহা আসব-নিরোধমার্গ—যথাযথরূপে জানতে পারেন—এই ভাবে জেনে ও উপলব্ধি করে তাঁর চিত্ত কামাসব থেকে মুক্ত হয়, ভবাসব থেকে মুক্ত হয়, অবিদ্যাসব থেকে মুক্ত হয়।

বিমুক্ত চিত্তে "বিমুক্ত হয়েছি" এই বোধ পরিস্ফুট হয়—এই জ্ঞানের উদয় হয় জন্মক্ষয় হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, যাহা করণীয় করা হয়েছে। পুনর্জন্ম আর নেই—এই অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি প্রদীপ্ত হয়ে উঠেন।

চতুরার্যসত্যের একান্ত লক্ষ্য নির্বাণ। নির্বাণের নিরতিশয় সুখ এবং অনির্বচনীয় শান্তি এই জীবনেই পাওয়া যায়। পাবার পর নিস্পৃহ উদাসীনের মত বৈরাগ্যসাধনই তার কাম্য নয়, এই জগতের সুখদুঃখের মাঝেই শান্তধী হয়ে কল্যাণকর্মে আপনাকে নিয়োগ করতে হবে—নির্বাণলাভের পর বুদ্ধদেব নিজে যেমন কর্মসুন্দর জীবন যাপন করেছিলেন, সাধককে তেমনই অজস্র, সহস্রবিধ কর্মে জীবনের চরিতার্থতা খুঁজতে হবে। নির্বাণে লোভ, মোহ এবং দ্বেষের আগুন নির্বাপিত হয়ে সাধক অমৃতত্ব লাভ করেন এবং বিমুক্তি-সুখে উল্লসিত হন।

চতুরার্যসত্যের ভাস্বরচ্ছটায় যাঁদের প্রাণ উজ্জীবিত হয়েছে, যাঁরা অষ্টাঙ্গিক মার্গের পথে অনবরত চলেছেন, তাঁদের বলা যায় যাত্রী। যাত্রী যাবে অজানা দূর দেশে—বার্তায় বার্তায় সে এসে গন্তব্য পথে পৌঁছেছে—তারপর শনৈঃ শনৈঃ যাত্রা সুরু করেছে। যতই চলছে, ততই তার শ্রুত পথের নিদর্শন চোখে পড়ছে—তখন সে দৃঢ়নিশ্চয় হয়ে বহু দূরের ঈপ্সিত লক্ষ্যের উদ্দেশে ধাবমান হয়। এ আর্যপথে চলাও অনেকটা তাই।

মহাপণ্ডিত Grimm তাঁর The Doctrine of the Buddha গ্রন্থে পথের আটটি বিষয়বস্তুর আলোচনা শেষ করে বলেছেন "If we look it over once more, we see that its eight members are not joined together like

beads on a string, but coalesce into an organic unity. The way of deliverance consists in a constant effort after continued concentration of the mind, for the purpose of incessant objective meditation of all our thoughts, words and actions, as also of our whole conduct of life in general, by following the directions given by the Buddha in right recollectedness in order to win right view, in the form of holy wisdom."

মার্গ—অষ্টধা মার্গ—সে সুতায় গাঁথা মালার পুঁতি নয়—সে একটি সজীব সংহতি। মুক্তির একমাত্র পথ—অনবরত মনকে একাগ্র করে ধ্যান—আমাদের যা কিছু চিন্তা, যা কিছু কথা, যা কিছু কাজ, সব নিয়েই ধ্যান করতে হবে—বুদ্ধ সম্যক্ স্মৃতি সম্বন্ধে যে সব উপদেশ দিয়েছেন—সে সকল অক্ষরে অক্ষরে পালন করে সত্যদৃষ্টি লাভ করতে হবে। সত্যদৃষ্টি জাগ্রত হলে পুণ্য পবিত্র প্রজ্ঞার উদ্ভব হবে।

এই চারিটি আর্যসত্য জানলে বুদ্ধদেব নিজের সম্বন্ধে ধর্মচক্র-প্রবর্তন সূত্রে যা বলেছেন, সাধকেরও সেইরূপ অনুভূতি হয়। ইহা দুঃখ আর্যসত্য, ইহা দুঃখের হেতু আর্যসত্য, দুঃখ-নিরোধ সত্য, ইহা দুঃখনিরোধের মার্গ—এই আর্য সত্য অনুভূত হলে অশ্রুতপূর্ব ধর্মসমূহে সাধকের চোখ খোলে। তখন তিনি উপলব্ধি করেন আমার চক্ষু উৎপন্ন হল, জ্ঞান উৎপন্ন হল, বিদ্যা উৎপন্ন হল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হল, আলোক উৎপন্ন হল।

সংক্ষেপে বুদ্ধানুশাসনের মর্ম হল, বুদ্ধ সাধনায় উপলব্ধি করেছিলেন অবিদ্যাই সমস্ত দুঃখের মূল। অজ্ঞানের নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে জীব নিজের চারিপাশে এক পৃথক্ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে। অনাদি কালেই এই যাত্রা সুরু—অবিদ্যা থেকে জাগে নামরূপ—নামরূপের ফলে ষড়ায়তন। তখন জাগে স্পর্শ—স্পর্শের ফলে সুখ দুঃখ, প্রীতি ও বিদ্বেষ। তৃষ্ণার তাড়নায় জন্মজন্মান্তর ধরে চলেছে এই খেলা।

এই পীড়াকর খেলা বন্ধ করতে হবে—তার জন্য জানা চাই কোন পথে এবং কোন কারণে আমরা বাঁধা পড়ি।

সব্বম্ দুঃখম্ ছন্দমূলকম্ ছন্দনিদানম্ ছন্দো হি মূলম্ দুঃখস্য। সব দুঃখের মূল ইচ্ছা—ইচ্ছা থেকে জাত। ইচ্ছাই দুঃখের কারণ। অবিদ্যা-কে নাশ করতে চাই বিদ্যা যখন সমাধিতে সম্বোধি জাগল, কেবল তখনই জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞানের তমিস্রা বিদূরিত হল।

অতএব আমরা যেন বৈদ্যরাজ বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করি। হাতুড়ে চিকিৎসকের শরণ না নিয়ে বুদ্ধের শরণ লই, তাহলে আমরা একেবারে নিরাময় হয়ে যাব। অনন্তকালপ্রবৃত্ত এই সংক্লেশ তখন সমাপ্ত হবে, ক্ষীণাসব হয়ে তখন আমরা বুদ্ধের সাথে সাথে বলতে পারব:—"এক সময়ে ছিল তৃষ্ণা—সে ছিল অশুভ—সে আর নেই—এই-ই ভাল। এক সময় ঘৃণা ছিল—সেও ছিল অশুভ—সে আর এখন নেই, এক সময় মোহ ছিল—সে ছিল অশুভ—সে আর নেই।

লোভ, দ্বেষ ও মোহ অন্তর্হিত হয়ে এসেছে পরমা তৃপ্তি—এসেছে অপূর্ব শান্তি।" সেই প্রজ্ঞার আলোক জাগ্রত হোক—আমরা যেন বলতে পারি:—

এতম্ যো পরমম্ জ্ঞানম্ এতম্ সুখমনুত্তরম্ অশোকম্ বিরজম্ ক্ষেমম্। এসেছে পরম জ্ঞান—এসেছে অনুত্তর সুখ—শোক নেই—ধূলি নেই—মলিনতা নেই—এসেছে ক্ষেমঙ্কর পরমা শান্তি।

বিজ্ঞানের ট্রাজিডি ও সুমতি

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীদিলীপকুমার রায়

তাঁর[১] শিষ্য হোয়াইটহেডের মধ্যে এ-শ্রদ্ধার অনেকখানি সংক্রমিত হয়েছিল। তাই ধর্মকে তিনি শুধু মানুষের "one type of fundamental experience" নাম দিয়েই ডিশমিশ করেন নি, ধর্মের কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর অন্তরে তার দীপ্তির কিছু অবতীর্ণ হয়েছিল যার প্রসাদে তিনি বৈজ্ঞানিক হওয়া সত্ত্বেও কবির পদে উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁর নানা মিসটিক সমর্থনে। এক একটি ভাবোচ্ছ্বাস এত দীপ্যমান হয়ে উঠেছে এ-কবিত্বের আলোয় যে, তাঁর লেখা থেকে আর একটি উদ্ধৃতি দেবার লোভ সামলাতে পারছি না, উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও :—

"Religion is the vision of something which stands beyond, behind and within the passing flux of immediate things ; something which is real and yet waiting to be realised ; something which is a remote possibility and yet the greatest of present facts ; something that gives meaning to all that passes and yet eludes apprehension ; something whose possession is the final good and yet is beyond all reach ; something which is the ultimate ideal and the hopeless quest." (Science & the Modern World—Religion and Science অধ্যায়)

অর্থাৎ

ধর্ম কী ?—যা কিছু চলচঞ্চল তাহার অন্তরালে
বিরাজে সে নিত্য তত্ত্ব তারি মহাস্বপ্ন ; যাহা কিছু
ধ্রুব স্থির তবু আজো হয় নাই প্রমূর্ত বাস্তবে ;
দূরতম সম্ভাবনা, অথচ সে-সত্য মহত্তম ;
যাকিছু স্ফুরৎরঙ্গ চিরজীবী হয়ে তার রঙে
নয় অধিগম্য তবু ; উপলব্ধি সে-চিরন্তনের
জীবনের শ্রেষ্ঠ বর অভয়, অথচ কেহ তারে
পারে নি ধরিতে কভু ; সাধনার শেষ সিদ্ধি, তবু
পূর্ণিমা-মিলন তার দুরাশা পার্থিব সাধনায়।

শুধু তাই নয়, তিনি আরো বলেছেন যে ধর্ম আনে পূজার প্রেরণা যা বারবার স্তিমিত হ'লেও প্রতিবারই ফিরে আসে সমৃদ্ধতর আবেগের রূপে। ব'লে শেষে লিখছেন যে, কেবল ধর্মের এই ঋষিদৃষ্টি ও অজেয় বিকাশের দৃশ্যই আমাদের মনকে ভরসার ভিত্তি দেয় (The fact of the religious vision, and its history of persistent expansion is our one ground for optimism.)

কয়েক বৎসর হ'ল হ্যাভেলক এলিস সাহেব একটি কবিত্বপূর্ণ দার্শনিক বই লিখেছেন : "The Dance of Life" ; ভাষায় পাণ্ডিত্যে সারবত্তায় বইটি এযুগের একটি বিশিষ্ট সম্পদ। এমন কি, বৈজ্ঞানিক মহলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ইতিমধ্যেই সাড়া তুলেছে।

রাসেল প্রমুখ ধর্মবিমুখ বৈজ্ঞানিকেরা ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের স্বতোবিরোধ স্বয়ংসিদ্ধ ব'লে ধ'রে নিয়েছেন, এলিস নেন নি। তিনি বলেছেন ধর্মের প্রণোদনার (impulse) সঙ্গে কোনো মূলগত বিরোধই থাকতে পারে না। তাঁর মতে, এ-বিরোধের উদ্ভব হয়েছে শুধু এইজন্য যে, বৈজ্ঞানিকেরা চান ধর্মপ্রবৃত্তিকে (atrophy ক'রে) মেরে ফেলে শুধু বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তিগুলিকে অতিপুষ্ট ক'রে তুলতে আর

[১] উইলিয়ম জেমস্-এর।

ধার্মিকেরা চান যুক্তিকে বাতিল ক'রে নিছক বিশ্বাস ও হৃদয়বৃত্তি নিয়ে ঘর করতে। এর ফলে শেষটায় হয় কি, যখন বিজ্ঞানসর্বস্ব অধার্মিককে ধর্মসর্বস্ব অবৈজ্ঞানিকের পাশে দাঁড় করানো যায় তখন মনে হয় তারা যেন পৃথিবীর দুই মেরুতে দাঁড়িয়ে কথা কইছেন পরস্পরের অবোধ্য ভাষায়। কিন্তু-এলিস টুকছেন—এজন্যে দায়ী না ধর্ম না বিজ্ঞান, কেবল আমাদের একদেশদর্শিতা।

শুধু এলিসই নয়, আধুনিক বিজ্ঞানজগতের নিউটন আইনষ্টাইনও বলছেন: "সবচেয়ে সুন্দর অনুভূতি জাগায় কে? সৃষ্টির রহস্য। শিল্প ও বিজ্ঞানের উৎস এই অনুভূতিই বলব। যে-মানুষ এ-অনুভবে সারা দিতে অক্ষম, যে সৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হয় না সে জীবন্মৃত, অন্ধ। জীবনের রহস্য সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে ভয়ের সম্ভ্রম জড়িয়ে থাকলেও এই অন্তর্দৃষ্টিই ধর্মেরও উৎস। যা আমাদের কাছে দুর্ভেদ্য রহস্য তাও যে সত্যি আছে, তারই প্রকাশ যে হয় মহত্তম প্রজ্ঞায় ও দীপ্ত সৌন্দর্যে...এই জ্ঞান ও অনুভূতিই যথার্থ ধর্মভাবের মূলে। এই ভাবে—এবং কেবল এই ভাবেই—আমি ধর্মাত্মাদের সগোত্র ব'লে মনে করি নিজেকে।"*

এলিস ও আইনষ্টাইনের কথাই ঠিক—বৈজ্ঞানিকদের মূল প্রণোদনার বিরুদ্ধে তাই কিছুই বলবার নেই শুধু এইটুকু ছাড়া যে, বৈজ্ঞানিকেরা যখন স্বাধিকারপ্রমত্ত হ'য়ে ধর্মকে যাচাই করতে আসেন তাঁদের ল্যাবরেটরিতে ধার্মিককে তলব ক'রে তখনই গোল বাধে। এক ফরাসী মনীষী এই প্রবণতা সম্বন্ধে বড় চমৎকার ব্যঙ্গ করেছেন:

"Et disons le en passant: c'est un des spectacles les plus bouffons et les plus affligeants qui soient que de voir certaines mains grossières toucher à les âmes des saints. Après tant de mésaventures pitoy-ables, il devrait être entendu désormais que la sainteté n'est pas du ressort de science. Il n'y a de science positive que de ce qui se compte ou de ce qui se mesure. Or on ne compte pas, on ne mesure pas l'âme des saints, ni d'ailleurs, aucune ame.

(ভাবার্থ: একটা ভারি হসনীয় ব্যাপার সুরু হয়েছে সম্প্রতি: কয়েকটা চাষাড়ে হাত এসে মহাত্মাদের আত্মাকে পরীক্ষা করতে উঠে প'ড়ে লেগেছে। এসব হাতুড়েদের নিত্যনিয়তই পদস্খলন হচ্ছে, অথচ তবু তারা বুঝবে না কিছুতেই যে, মহাত্মাদের মাহাত্ম্য বিজ্ঞানের চৌহদ্দির বাইরে। যথার্থ বিজ্ঞান হ'তে পারে কেবল সেই সব বস্তুর যাদের গোনা যায়, মাপা চলে। কিন্তু মহাত্মাদের আত্মাকে—বা কোনো আত্মাকেই—না যায় গোনা না চলে মাপা।)

এখানে, মনে রাখবেন, আমি ভেক ভণ্ডের কথা বলছি না। সংসারে জাল জুয়াচুরি ভেল বুজরুকি সর্বত্রই ছিল আবহমানকাল—হয়ত থাকবেও চিরদিন, কে জানে? তবে মেকি মালির দেখা কোথায় না মেলে বলুন তো? বিজ্ঞান শিল্প সমাজসেবা বাণিজ্য রাজনীতি কোথায় ভেজাল নেই? তাই শুধু ধর্মের এলাকায়ই অধার্মিকদের ধর্মের মুখোষ প'রে দাপাদাপি করতে দেখে তাকে বরখাস্ত করলে চলবে কেন?

কিন্তু যতই বলি না কেন যে, বৈজ্ঞানিকদের

---

* I BELIEVE (George Allen & Unwin) ৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

ধর্মের বিচারক বাহাল করলে ধর্ম অপদস্থ হবে না; অপ্রতিভ হবে অনভিজ্ঞ বিচারকেরাই, বিজ্ঞানের প্রতিপত্তিতে ভাঁটা পড়লেও আবার থেকে থেকে নতুন আবিষ্কারের ফলে মানুষের মনে নব উৎসাহের বান ডাকে যার ফলে মানুষ ভেবে বসে যে, বিজ্ঞান সবজান্তা। তখন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবাদকে ধর্মের বিচারে চীফ জাষ্টিস পদবী দেওয়া হয় আর সব ভেস্তে যায়—পরম কাজী ভুল রায় দিয়ে গণ্ডগোল বাধান পদে পদেই। কিন্তু যেহেতু বৈজ্ঞানিকদের হাতেই আমাদের জীবনমরণ (আণবিক বোমার হুমকির পরে অন্ততঃ মরণ তো বটেই) সেহেতু ধার্মিকদের গোঁড়ামিকে গোঁড়ামি ব'লে সনাক্ত করতে পারলেও বৈজ্ঞানিকদের গাজোয়ারি হাকিমিকে ডগ্‌মাটিস্‌ম্ ব'লে চিনতে আমরা এত বেগ পাই, ভাবি ভুল ক'রে যে, বৈজ্ঞানিক মাত্রেরই বুঝি আশ্চর্য রকমের খোলা মন—open to conviction.

ভুল বলছি এই জন্যে যে, বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের নিজের নিজের ক্ষেত্রে খানিকটা মন খোলা রাখতে পারলেও অন্য কোনো গবেষণার আওনে আসতে না আসতে বেঁকে বসেন। বিখ্যাত মনস্বী কনান ডয়ল তাঁর The Edge of the Unknown গ্রন্থে লিখেছেন যে, ফ্যারাডে ও টিণ্ডাল ভৌতিক এলাকায় আসতে না আসতে আগে থাকতেই ধরে নিতেন "এ হ'তে পারে ও হ'তে পারে না" তারপর পরীক্ষা করতে ঝুঁকতেন কেবল এই সর্তে যে তাঁদের পরীক্ষার আগে মনগড়া সম্ভব-অসম্ভবের সূত্রটি সবাইকেই মেনে নিতে হবে (১২ অধ্যায়)।

কেম্ব্রিজের লাইব্রেরি থেকে আমি বিখ্যাত রাসায়নিক স্যর উইলিয়ম ক্রুক্স-এর নানা ভৌতিক পরীক্ষার বিবরণ (papers) পড়তাম সাগ্রহে। তিনি হোম নামে এক আশ্চর্য মিডিয়ামকে বার বার দেখেছিলেন শূন্যে উঠতে। তাঁর ল্যাবরেটরিতে ectoplasm এর ঘন হ'য়ে শ্রীমতী কেটি কিং-এর দর্শন পাওয়ার কথাও লিপিবদ্ধ করেছিলেন—তার ফটোও নিয়েছিলেন, তার সঙ্গে কথাবার্তাও কয়েছিলেন। অতঃপর তিনি রয়াল সোসাইটিকে লেখেন প্রফেসর শারপি ও স্টোককে প্রতিনিধি পাঠাতে—এসব পরীক্ষা চাক্ষুষ ক'রে রায় দিতে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকযুগলের মন এতই খোলা ছিল যে তাঁরা পিঠ পিঠ লিখে পাঠান যে এসব ভুতুড়ে লীলা নিয়ে চর্চা করা সময় নষ্ট। কনান ডয়ল লিখছেন যে, হোমকে স্যর উইলিয়ম ক্রুক্স অন্ততঃ পঞ্চাশ বার শূন্যে উঠতে দেখেছিলেন। কিন্তু কে শোনে? অন্ততঃ রয়াল সোসাইটির খোলামন বৈজ্ঞানিকেরা যে কান দিতে পারেন না একথা জানিয়ে তাঁরা গভীর গর্ব অনুভব করলেন। একেও কি বলবেন না বৈজ্ঞানিক গোঁড়ামি—যে বলে আমার বুদ্ধি যার নাগাল পায় না সে নাস্তি?

এরকম বৈজ্ঞানিক গোঁয়ার্তমির আরো অনেক দৃষ্টান্তই দিতে পারি কনান ডয়ল, স্যর অলিভার লজ, স্যর উইলিয়ম ব্যারেট প্রভৃতি গবেষকদের বই থেকে—(তাঁরা কত যে উপহাস সহ্য করেছেন "ভূত আছে" এ-রায় দেওয়ার জন্যে!)—কিন্তু আজকের দিনে সাইকিক রিসার্চ সোসাইটি তথা প্যারাসাইক-লজির প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে বৈজ্ঞানিকদেরও চড়া অসহিষ্ণু সুর একটু খাদে নেমে এসেছে ব'লে আর দৃষ্টান্ত জড়ো করার প্রয়োজন দেখি না। কেন না এযুগে অসহিষ্ণু বৈজ্ঞানিকেরাও ধর্ম অঘটন ভগবান প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে অঙ্গীকার না করলেও আর তেমন সঘনে অস্বীকার করেন না। রাসেলের পরম বন্ধু বিখ্যাত মনীষী লোয়েস

ডিকিন্সন এমন কথাও লিখতে ভয় পান নি: "Nothing that is important can be proved by reason." এক সময়ে বুদ্ধিসর্বস্ব বিজ্ঞানকে বুদ্ধির নাগালের বাইরে সব কিছুকেই নাস্তি ব'লে চলতে হয়েছিল অতীন্দ্রিয়বাদকে উপহাস করাটা খানিকটা সে-সময়ের যুগধর্ম ছিল ব'লে। কিন্তু কোনো আন্দোলন মনোভাব বা বিশেষ সাধনার সাময়িক উপযোগিতা স্বীকার ক'রে নিয়েও বলা চলে যে, সে-সাময়িক প্রয়োজনের সময় উত্তীর্ণ হবার পরে সে-আন্দোলনকে মহত্তর ও পূর্ণতর বিকাশের মধ্যে সার্থকতা খুঁজতেই হয়। এরই নাম বিবর্তন—evolution:

বিজ্ঞানের আজ সেই অবস্থা। একটা পূর্ণতর পরিণতির, সমৃদ্ধতর সুষমার (হার্মনির) অঙ্কে মহত্তর সার্থকতা খোঁজার তার সময় এসেছে। তাই তার বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে-সত্য আছে তাকে মানুষ এতদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে এলেও এ-সত্য যে আংশিকমাত্র একথাও বিজ্ঞানকে মানতে হবে—ছাড়তে হবে তার বৈজ্ঞানিক গোঁড়ামি ও একদেশদর্শিতা। এ-সুষমার পথও মাঝপথে কাটা হয়েছে বৈ কি। মানুষ যুগে যুগে এক একটি পথে একটানা চ'লে যখন শেষে চোরা গলিতে পৌছিয়ে দেখে যে সে-সে পথে আর এগুনো অসম্ভব তখন তাকে ফিরে এসে এমন পথের খোঁজ করতে হয় যে তাকে আরো এগিয়ে দিতে পারে। বস্তুতান্ত্রিকতা আমাদের অনেক কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করছে, কল্পিত ভয় থেকে মুক্তি দিয়েছে, অসহায় অদৃষ্টবাদ ছেড়ে স্বাবলম্বনের দীক্ষা দিয়ে মানবিক আত্মসম্ভ্রম বাড়িয়েছে—সবই সত্য। কিন্তু ঐ সঙ্গে এনেছে নাস্তিক অহঙ্কার যে বলে যে আমি সব পারি সব বুঝি। এ অহঙ্কার অবশ্য সত্যিকার ভাবুকদের মনকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি, কিন্তু বিজ্ঞানের নাস্তিক দর্শন বহু ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও হ্রস্বদৃষ্টি বিজ্ঞানোৎসাহী বস্তুতান্ত্রিককে আত্মশ্লাঘার খোরাক জুগিয়েছে যার ফলে সে যেন দুর্যোধনের মতন দাম্ভিক সুরেই বলা সুরু করেছে যে, ধর্ম হ'ল মনের আফিং এবং যে-বৈজ্ঞানিক এ-জগতে সুদুর্লভ মান পেল তার দোসর আর কে আছে? "মানঃ প্রাপ্তঃ সুদুর্লভঃ—কো নু স্বস্ততরো ময়া।"

দর্শনের দিক দিয়ে একথার ভাষ্য করা যায় এই ভাবে যে, বিজ্ঞানের বহির্মুখী দৃষ্টি বাহ্যজগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তথ্যাদি খুঁটিয়ে দেখে পরমাণুর মধ্যেও বিপুল শক্তির পরিচয় পেয়ে বুঝতে শিখেছে যে, জড়বাদ ব'লে এ-জগতে কিছুই নেই। সবই এক মহাশক্তির খেলা প্রতি পরমাণুর বুকেই চলেছে এক আশ্চর্য অভাবনীয় শৃঙ্খলার নৃত্য যার কিছুটা বুদ্ধি ধরতে পারে বটে কিন্তু সে-আভাসের মধ্যে দিয়েই সে দেখতে পায় যে, মহাবিশ্বশক্তির সৃষ্টিলীলার এক অতি সামান্য ভগ্নাংশই তার গোচরে এসেছে। তাই সে বলে মহামতি নিউটনের বিনয়ী সুরে "আমি একটি শিশু মাত্র যে সমুদ্রের তীরে খেলতে খেলতে গড়পড়তা উপল বা ঝিনুক পেরিয়ে খবর দিল এমন উপলের যা আর একটু বেশি মসৃণ, এমন ঝিনুকের যা আর একটু বেশি সুন্দর—কিন্তু সত্যের মহাসিন্ধু আমার সামনে অনাবিষ্কৃতই র'য়ে গেল।"

আজকের দিনে ক্ষুদ্রবুদ্ধি গোঁড়া বিজ্ঞানোৎসাহীরা বিজ্ঞানবুদ্ধিকে সর্বার্থসাধিকা ব'লে শৃঙ্গধ্বনি করলেও চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিকেরা সবাই ক্রমশঃ বিজ্ঞানের সীমা সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছেন। তাই তাঁরা বিজ্ঞানের পাণ্ডাদের সুরে সুর

মিলিয়ে বলেন না—"কো নু স্বস্ততরো ময়া" (আমার মতন কে আছে?) তাঁরা বলেন আইনষ্টাইনের মতন বিনয়ী সুরে যে, সৃষ্টি-লীলার অচিন্তনীয় মানচিত্রের অলক্ষ্য নীহারিকার গতিবিধির অভাবনীয় বেগ ও শৃঙ্খলার দৃশ্যে "আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি স্তম্ভিত হয়, ক্ষুদ্র দৃষ্টি অভিভূত হয়।" এডিংটন জীন ক্যারেল মিল্লিকান প্রমুখ মনীষীরা তাই বলেন না আর যে, বুদ্ধি যার তল পায় না সে নাস্তি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথিকা মনে পড়ে। এক পথিক বাড়ী ফিরে এসে তার বন্ধুকে বলে: "আমি কাল আসতে আসতে দেখলাম অমুক বাড়ীটা হঠাৎ হুড়মুড় ক'রে প'ড়ে গেল।" বন্ধু বললেন: "দাঁড়াও হে খবরের কাগজটা দেখি।" ব'লে দেখে বললেন: "ধেৎ। সব বাজে কথা। খবরের কাগজে তো লেখে নি বাড়ী পড়ার কথা!" পথিকবন্ধু বললেন: সে কি হে! আমি যে স্বচক্ষে দেখে এলাম।" উত্তরে বন্ধু অম্লানবদনে বললেন: "ও চোখের ভুল। খবরের কাগজে যখন লেখে নি তখন বাড়ী পড়তেই পারে না।" বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের প্রথম পর্বে বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক এই ভুলই করেছিলেন, বলেছিলেন: "মুনি ঋষি যোগী যতিদের দল যে-ভগবানকে দেখেছেন বলছেন তাঁর কোনো খোঁজ যখন আমার বৈজ্ঞানিক বকযন্ত্রে মিলছে না তখন বলবই বলব যে ও-দর্শন তাঁদের চোখের ভুল, স্বকপোল-কল্পিত। ভলটেয়ার বেকন হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ বুদ্ধিবাদীদের ভুল হয়েছিল এইখানেই: যে, বিজ্ঞান ও বুদ্ধি প্রকৃতির নানা শক্তির যে চমৎকার ছক কেটেছে তার বাইরে আর কিছুকেই মানা চলে না, বুদ্ধি যে-ছক কাটতে অক্ষম সে-ছক নামঞ্জুর।

কিন্তু এ-নিশ্চয়োক্তির নিশ্চয়তা ক্রমশঃ ফিকে হয়ে এল যখন ক্রমশঃ তাঁরা বিনয়ের কাছে দীক্ষা নিয়ে সৃষ্টিলীলার দুরবগাহ মহিমার কিছু আভাস পেলেন। এডিংটন বিজ্ঞানের এই change of front ওরফে নবদৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাস এত চমৎকার ক'রে দেখিয়েছেন তাঁর "Nature of the Physical World"-এ, যে বইটিকে য়ুরোপে অনেক বিশেষজ্ঞই অ্যালেক্সিস ক্যারেলের Man the Unknown নামক যুগপ্রবর্তক গবেষণার পাঙ্‌ক্তেয় করেছেন। ক্যারেলের বইটি মানুষের আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক গবেষণা। এডিংটনের বইটি বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক আলোচনা। একটি অন্তর্মুখী, অন্যটি বহির্মুখী। কিন্তু মজা এই যে, শেষে উভয়েই এসে পৌঁছেছেন একই সিদ্ধান্তে যে, জীবন তথা বিশ্ব এতই আশ্চর্য ও অগাধ যে, বুদ্ধি দিয়ে কেউই তল পেতে পারে না এ-যুগল রহস্যের। এই রহস্যের (mystery) কথা ভেবেই আইনষ্টাইন ও শ্বাইৎজারের মতন মহা-মনীষীও বিস্ময়ে আপ্লুত হয়েছিলেন। আইনষ্টাইন স্তবগান করেছিলেন religious reverence-এর, শ্বাইৎজার reverence for life-এর। জীন্‌সও তাঁর Mysterious Universe-এও সৃষ্টির আকাশতত্ত্ব ও বেগতত্ত্বের খবর দিতে গিয়ে শেষ অধ্যায়ে মানুষের ধর্ম-ভাবকে মান দিয়েছেন। এরই নাম বিজ্ঞানের সুমতি।

এ-সুমতির কিছু খবর দিতে প্রথম এডিংটনের বইটি থেকে দু-একটি উদ্ধৃতি দিই দেখাতে—কেন ও কীভাবে বিজ্ঞান তার জবরদখলের অনেকখানি ভূমিই ছেড়ে দিয়েছে ধর্মকে। যদিও বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের প্রথম পর্বে সে বলেছিল যে ধর্মকে সে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও দেবে না কিছুতেই।

প্রথমে এডিংটন দেখাচ্ছেন যে, বৈজ্ঞানিক

বিশ্লেষণী যুক্তি—যাকে এক সময়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের একমাত্র আরোহী ব'লে গণ্য করা হ'ত এবং বলা হ'ত যে, এ-বিচারী যুক্তি যাকে বাহাল করতে নারাজ সে নামঞ্জুর, কেন না যুক্তি ছাড়া অন্য কোনো পথে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান মিলতেই পারে না, সে-যুক্তির সাধ্য সীমাবদ্ধ। এডিংটন বলছেন: জ্ঞান দ্বিবিধ: symbolic অর্থাৎ প্রতীকসম্বন্ধীয় ও intimate অর্থাৎ অন্তরঙ্গ। ব'লে সূত্র দিচ্ছেন যে, যুক্তির এলাকা হ'ল প্রথমটি, কারণ দ্বিতীয়টিকে পরীক্ষা করতে এলেই দেখা যায় যে সে বিশ্লেষণের অতীত।* তাঁর ভাষ্য এই যে, ধরো বাতাস চলেছে জলের বুকে। ইকোয়েশন (সমীকরণ) ক'ষে দেখতে পাই ঘণ্টায় দুমাইল চললে বায়ু তরঙ্গ তুলতে পারে। জেনে মনে হ'ল: বাঃ জানা গেল কিসে কী হয়। কিন্তু তারপর একটি কবিতায় পড়লাম হাওয়া উঠতেই জলে হাসির কাকলি ধ্বনিত হ'ল,† মনেও ছোঁয়াচ লাগল এ-আনন্দের। এখন প্রশ্ন হ'তে পারে (লিখছেন এডিংটন): এ-হাসি তো কল্পনা, তবে এতে আনন্দ এও তো মায়া। বটে, কিন্তু এ-আনন্দ কল্পনা সব জড়িয়ে আর একটি জগৎ গ'ড়ে ওঠে যা প্রাণবন্ত, যা গণিতের ধার ধারে না। কিম্বা ধরো রসিকতা; (বলছেন তিনি) বুদ্ধি দিয়ে নানারকম রসিকতার বিশ্লেষণ ক'রে তার অনেক কিছুই জানা যায় কিন্তু সে-রসিকতায় হেসে কেন মন প্রফুল্ল হয়, কেন মনে হয়—ভাগ্যে মানুষ হাসতে পারে—এ-প্রশ্নের কোনো উত্তরই খুঁজে পাওয়া যায় না। এক কথায়, রসবোধ আর তথ্যজ্ঞান, গোনাগুন্তি আর পূজা-অর্চা এ-দুই একেবারে আলাদা চেতনার ছন্দ: একটা অন্তরঙ্গ অনুভূতি, অন্যটা প্রতীকের জ্ঞান। অপিচ: "We all know that there are regions of the human spirit untrammelled by the world of physics. In the mystic sense of the creation around us, in the expression of art in a yearning towards God, the soul grows upward and finds the fulfilment of something implanted in its nature. The sanction of this development is within us, a striving born with our consciousness or an inner Light proceeding from a greater power than ours······We are meant to fulfil something by our lives. There are faculties with which we are endowed, or which we ought to attain, which must find a status and an outlet in the solution."

(এর ভাবার্থ: পদার্থবিজ্ঞানের বাইরেও নানা জগৎ আছে। সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে নানা ভাবোদয়, শিল্পের মধুর ব্যঞ্জনা, ভগবানের জন্যে ব্যাকুলতা—এ সব কিছুর মধ্যে দিয়েই আমাদের অন্তরাত্মা এমন কোনো গভীর প্রাপ্তির আভাস পায় যার আকাঙ্ক্ষার বীজও আমাদের মধ্যেই বিদ্যমান এই যে বিকাশ—এর অনুমোদনও আমাদের অন্তরেই নিহিত, যে আমাদের চেতনার সহজাত, কিম্বা বলা যেতে পারে—এর উৎস এমন কোনো আলো যার জনয়িতা আমাদের মানবিক শক্তির চেয়ে কোনো মহত্তর শক্তি ···আমরা আমাদের জীবনের তীর্থযাত্রায় কোনো-না-কোনো পরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে চাই

---

* Nature of the Physical World, ১২ অধ্যায় (Science and Mysticism) দ্রষ্টব্য।

† এডিংটন উদ্ধৃত করেছেন একটি কবিতা:

There are waters blown by changing winds to laughter
And lit by the rich skies, all day. And after,
Frost, with a gesture, stays the waves that dance
And wandering loveliness. He leaves a white
Unbroken glory, a gathered radiance,
A width, a shining peace, under the night.

কৃতকৃত্য হ'তে। আমাদের মধ্যে নানান্ বৃত্তি আছে—আমাদের কর্তব্য সে সব বৃত্তিকে ফুটিয়ে তোলা—যারা চায় এক উজ্জ্বল আত্মমর্যাদায় আসীন হ'য়ে আমাদের এগিয়ে দিতে কোনো পরম সমাধানের দিকে।)

কাজেই এডিংটন বলছেন—অমুক জ্ঞান বাস্তব (real) আর অমুক জ্ঞান কল্পনা (unreal) এ ধরনের বিচার করতে গেলে পাকে পড়তে হবেই হবে। কারণ বিজ্ঞানের কারবার প্রতীকজ্ঞান নিয়ে: "To understand the phenomena of the physical world it is necessary to know the equations which the symbols obey but not the nature of that which is symbolised."

কাজেই, তিনি বলছেন: "এই বিজ্ঞানের জগৎ (যার নাম দিয়েছেন তিনি pointer readings-এর সমষ্টি) বাস্তব হ'লেও আন্তর জগৎ এর চেয়ে কিছু কম বাস্তব নয়।" কেমন? তিনি উপমা দিচ্ছেন রামধনুর। বিজ্ঞান বলে রামধনু হ'ল ঈথারের স্পন্দন যার তরঙ্গ '০০০০৪০ সেন্টিমিটার থেকে '০০০০৭২ সেন্টিমিটার লম্বা—স্পেক্‌ট্রস্কোপের এই অকাট্য বাণী। কিন্তু আমরা তো স্পেক্‌ট্রস্কোপ নই, কাজেই আমরা বলতে পারি বৈকি যে, রামধনুকে এইভাবে দেখাটাও জগতের একটা বিধান, যেমন বিধান তার তরঙ্গের দীর্ঘতা মেপে রামধনুর বর্ণতথ্য জানা। অন্য ভাষায় বলছেন সাহেব—"ধর্মের বিশিষ্ট বিশ্বাসকে বিজ্ঞানের তথ্য বা পদ্ধতি দিয়ে প্রমাণ করার কথা আমি ভাবতেই পারি না ("I repudiate the idea of proving the distinctive beliefs of religion either from the data of physical science or by the methods of physical science.")!

আমাদের দেশে একটা অভিযোগ ঘড়ি ঘড়ি শোনা যায় ধর্মের বিরুদ্ধে: যে, ধর্মের অনুভব উপলব্ধি দেখা শোনা ধরা ছোঁওয়া সবই ছায়াভ, ধোঁয়াটে। "মিসটিক" বিশেষণটি চলতি প্রয়োগে প্রায়ই misty-র সগোত্র ব'লে ধরা হয়। অর্থাৎ বিজ্ঞানের ঠিক উল্টো, যেহেতু বিজ্ঞান হ'ল আলো ভরা, স্পষ্ট, অতিপ্রত্যক্ষ—যেখানে না কি ঝাপসা কিছুই নেই। কিন্তু হাল আমলে—বলছেন সাহেব—বিজ্ঞানের এই একটা সুমতি মতন হয়েছে যে, আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিদের আমরা ছি ছি করি না তাদের অস্পষ্টতার জন্যে কারণ "We have travelled far from the standpoint which identifies the real with the concrete."—অর্থাৎ সেদিন আর নেই যেদিন আমরা বলতাম যে বাস্তব মানেই যা অতিপ্রত্যক্ষ, ধরা ছোঁওয়া যায়। বলি না কেন? কারণ বললে সব আগে গঙ্গাযাত্রা করাতে হয় ইলেকট্রন, নিউট্রন প্রভৃতি অদৃশ্য বৈদ্যুতিক ছোটাছুটিদের যাদের সম্বন্ধে হদিশ দেওয়া যায় কোনো মডেল এঁকে বা ছক কেটে নয়—কয়েকটি সমীকরণ (equation) পেশ ক'রে।

এডিংটনের লেখা অনেকস্থলেই দুরবগাহ হ'লেও তাঁর রসিকতার আমেজে মন খুশী হয় প্রায়ই তাঁর নানা মন্তব্যে। যথা, যেখানে তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিকের সংকটের কথা বর্ণনা করছেন:

When Dr. Johnson felt himself getting tied up in argument over Bishop Berkeley's ingenious sophistry to prove the non-existence of matter and that everything in the universe is merely ideal, he answered, striking his foot against a large stone till he rebounded from it: "I refute it thus." Just what that action assured him of is not very obvious, but apparently he found it comforting. And today the matter-of-

fact scientist feels the same impulse to recoil from these flights of thought back to something kickable, although he ought to be aware by this time that what Rutherford has left us of the large stone is scarcely worth kicking

(Chapter 12 · Science & Mysticism, pp. 326-7)

আরো অনেক সুচিন্তিত ভাবোদ্দীপক কথা বলেছেন সাহেব তাঁর এই চমৎকার বইটিতে যার আলোয় বিজ্ঞানের অনেক ধর্মবিমুখ যুক্তি তথা উক্তিকে নাকচ করা হয়েছে। তাঁর মধ্যে মনে হয় ধর্মের কিছু অনুভবও হয়েছিল নইলে ধর্মের নানা প্রতীতির সম্বন্ধে তিনি এমন গভীর কথা বলতে পারতেন না যে, ধর্মের নানা অনুভূতি মাপজোপের এলাকার বাইরে হ'লেও সে-সব জড়িয়েই তবে আমাদের ইন্দ্রিয়জগৎ গ'ড়ে উঠেছে বুদ্ধি দিয়ে যার সংশোধন করেন বৈজ্ঞানিকেরা। সেই সংশোধনের একটি— এডিংটনের মতে—এই স্বীকার যে ধর্মের নেত্র জগৎকে যে-ভাবে রূপান্তরিত ক'রে দেখে তাকে বলা চলে "মানবপ্রকৃতির দিব্যভাবের কীর্তি—the achievement of a divine element in man's nature" (১২ অধ্যায়)।

(ক্রমশঃ)

বিশ্বগীতি

শ্রীঅনন্তনাথ মুখোপাধ্যায়

মনের মাঝারে যত সুর বাজে
সবই যে তোমার লাগি—
হে রামকৃষ্ণ, চরণে তোমার
এই বোধটুকু মাগি!

বাহির বিশ্বে যাহা কিছু শুনি
সেও তব সুর, সেও তব বাণী—
এইটুকু যেন বুঝিবারে পারি,
মায়া-ঘুম হতে জাগি।

ভিতরে বাহিরে কোথা কোন ঠাঁই
তুমি ছাড়া আর কোন সুর নাই;
দেহ মন প্রাণ সেই সুরে যেন
হয় সদা অনুরাগী।

মহাপরিনির্বাণের বাণী

ব্রহ্মচারী বিদ্যাচৈতন্য

আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দকে একবার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, হিন্দু ধর্ম তো কখনো অন্য ধর্মাবলম্বীকে ধর্মান্তরিত করে নাই। তদুত্তরে বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, 'প্রাচ্যের প্রতি বুদ্ধ যেমন এক বাণী রাখিয়া গিয়াছেন, পাশ্চাত্যের প্রতিও আমার এক বাণী আছে।' বুদ্ধের কোন্ বিশেষ বাণীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন তাহার বিস্তারিত উল্লেখ নাই, আবার নিজের প্রচারিত কোন বিশেষ ধর্মমতও তিনি এখানে উল্লেখ করেন নাই। তবে উপরোক্ত প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, বুদ্ধোত্তর যুগে প্রাচ্যে তাঁহার মতাবলম্বীর ব্যাপক প্রসার স্বামী বিবেকানন্দকে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

মহানির্বাণের প্রস্তুতিপর্বে বুদ্ধের নিকট হইতে আমরা কয়েকটি সারগর্ভ বাণী শুনিতে পাই। বৈশালী রমণীয় স্থান, রমণীয় তার চৈত্যসমূহ। এই মনোহর পরিবেশে অন্তকালের তিন মাস পূর্বে সমগ্র ভিক্ষু শিষ্যমণ্ডলীর এক সমাবেশে বোধিসূর্য বুদ্ধের বাণী ঘোষিত হইয়াছিল—

'যে জ্ঞানলব্ধ সত্য আমি প্রচার করিয়াছি, জগতের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া, সর্ব প্রাণীর হিত ও উপকারের জন্য উহা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া কার্যে পরিণত কর, উহাকে ধ্যানের বিষয়ীভূত কর, দেশ-দেশান্তরে উহার বিস্তৃতি সাধন কর।'[১]

একদা পাঁচশত বৌদ্ধভিক্ষুর উদ্দেশ্যে যে প্রচারমন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল, কালক্রমে উহা রাজাপ্রজানির্বিশেষে নরনারীর হৃদয় জয় করিয়া প্রাচ্য ভূখণ্ডের এক প্রধান ধর্মে পরিণত হইল।

যে জ্ঞানলব্ধ সত্য প্রচার করিবার ভার বুদ্ধ শিষ্যদের হাতে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন উহার স্বরূপ কি? কোন্ পথ অবলম্বনেই বা উহাতে পৌছান যায়?

ভগবান তথাগত ভিক্ষু শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন, 'চারি সত্যের সম্যক্ জ্ঞান ও উপলব্ধির অভাবে আমার ও তোমাদের দীর্ঘকাল সংসার ভ্রমণ হইতেছে। ঐ চারি সত্য কি কি? আর্য শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তির সম্যক্ জ্ঞান। ঐ আর্য শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তি সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত ও উপলব্ধ হইলে ভবতৃষ্ণা উচ্ছিন্ন হয়, পুনর্জন্মের মূল বিনষ্ট হয়। তখন আর জন্মান্তর নাই।'

শাস্তা ভণ্ডগ্রামে আরও বলিলেন, 'অনুত্তর শীল সমাধি প্রজ্ঞা ও বিমুক্তি যশস্বী গৌতম কর্তৃক উপলব্ধ। স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া বুদ্ধ উহা ভিক্ষুদিগের নিকট প্রচার করিয়াছেন। দুঃখান্তকারী, চক্ষুষ্মান শাস্তা শান্ত।'[২]

বোধিদ্রুমতলে বুদ্ধত্বলাভের পর তিনি সাধনপথের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, সাধনাবস্থায় দুই চরম সীমা অবশ্য বর্জনীয়। কাম্যবস্তুর অনর্থরূপ ভোগ ও দেহনির্যাতন উভয়ই সমভাবে হেয়। উহাদের কোনটাই মানুষকে যথার্থ বোধি আনিয়া দিতে পারে না। এই দুই অন্ত পরিত্যাগ করিয়া যিনি মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেন তিনিই সম্বোধি নির্বাণ লাভ করেন।

১ দীঘনিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৮, অনুবাদক ভিক্ষু শীলভদ্র

২ ঐ— পৃঃ ১১০

এই মার্গ সনাতন ও উহা আর্য অষ্টাঙ্গিক নামে খ্যাত। যথা—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি।

সম্যক্ দৃষ্টি অর্থে দুঃখের উৎপত্তি, নিরোধ ও তদুপায়ের জ্ঞান। কামনা বিদ্বেষ ও হিংসা বর্জনই সম্যক্ সঙ্কল্প। মিথ্যা, পিশুন ও পরুষ ও বৃথা বাক্যালাপ হইতে বিরতিই সম্যক্ বাক্। হিংসা ব্যভিচার ও অদত্ত বস্তুর গ্রহণ হইতে বিরত থাকাই সম্যক্ কর্মান্ত। ন্যায়সঙ্গত উপায়ে জীবিকানির্বাহই সম্যক্ আজীব। মনে পাপ ও অকুশল ভাব উদয় না হইতে দেওয়া, মন বিশুদ্ধ করা, নব নব কুশল ভাবের আনয়ন ও ঐ ভাবের স্থায়িত্ব, বৃদ্ধি ও পূর্ণতা করার চেষ্টাই সম্যক্ ব্যায়াম। দেহ ও মনের যাবতীয় কার্য-কলাপ বিষয়ে সর্বদা স্মৃতিমান থাকাই সম্যক্ স্মৃতি। কাম ও অকুশল কর্ম ত্যাগ করিয়া বিতর্ক ও বিচার অতিক্রমপূর্বক প্রীতির অতীত হইয়া সুখ-দুঃখ রহিত, উপেক্ষা ও স্মৃতিরূপ পরিশুদ্ধ চতুর্থ ধ্যানে নিমগ্ন থাকাই সম্যক্ সমাধি।

অষ্টাঙ্গিক মার্গ গোতম কর্তৃক আবিষ্কৃত বলিয়া শ্রুত আছে। কিন্তু বুদ্ধ বলিয়াছেন, তিনি নতুন কিছু আবিষ্কার করেন নাই। সংযুক্ত নিকায় গ্রন্থে এই পথকে পুরাণ সনাতন ও পূর্ব পূর্ব বুদ্ধ কর্তৃক অনুসারী পথ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন বনানীর অভ্যন্তরে অগ্রগমনকালে বহুকালের পুরাণ, জনগণের দ্বারা পূর্বে ব্যবহৃত এক অতি প্রাচীন পথ কাহারও নয়নগোচর হইল। অনন্তর সেই পথ অনুসরণান্তে এক প্রাচীন নগর তথা আরাম, উপবন, পুষ্করিণী সম্বলিত বিরাট রাজপ্রাসাদেরও অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইল। পরে রাজা বা রাজমন্ত্রীর নিকট ব্যক্ত হইল যে গহন অরণ্যের মধ্যে অতীতে বহুজনদ্বারা অধ্যুষিত বিভিন্ন প্রমোদব্যবস্থায় পরিপূর্ণ রাজপ্রাসাদযুক্ত এক অতি প্রাচীন নগরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। মহাজন—আপনি সেই জীর্ণ নগর সংস্কারপূর্বক রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করুন। তচ্ছ্রবণান্তে রাজা বা রাজমন্ত্রী নগররক্ষায় যত্নপর হইলেন। ধীরে ধীরে উহা বিভিন্ন প্রচেষ্টার দ্বারা বর্ধিত, সমৃদ্ধ ও জনগণের কলনিনাদে পরিপূর্ণ হইল।

গোতম বলিয়াছেন, সেইরূপ আমিও প্রাচীন কালের সম্যক্ সম্বুদ্ধগণ কর্তৃক অনুসারী এক অতি প্রাচীন পথ, প্রাচীন মার্গ আবিষ্কার করিয়াছি।

পরিনির্বাণের প্রস্তুতিপর্বে নিজ উপলব্ধ জন্মমৃত্যু-ক্ষয়কারী অষ্টাঙ্গিক মার্গ যাহাতে তাঁহার শিষ্য ও ভিক্ষুগণ কর্তৃক আয়ত্ত হয় ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও সুষ্ঠু প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া যাহাতে তৎ-প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় সেইদিকে গোতমের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তথাগতের বাণী পর্যালোচনা করিলে আমরা ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে তিনি ভিক্ষু ও গৃহস্থ উপাসকবৃন্দের জন্য পৃথক পৃথক আচারবিধির নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। এই ধারণা প্রায় সর্বজনবিদিত যে তথাগত গৃহস্থ উপাসক নির্বিশেষে সকল নরনারীকে শ্রমণত্ব গ্রহণপূর্বক নির্বাণলাভের পথে অগ্রসর হইতে বলিয়াছেন। গোতমের উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে উহার সত্যতা কতখানি তাহা আলোচনার বিষয়। একবার আনন্দ তথাগতের দেহ সম্বন্ধে কর্তব্য কি জিজ্ঞাসা করিলে ভিক্ষুমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'আনন্দ—তোমরা তথাগতের শরীরপূজায় ব্যাপৃত হইও না। সদর্থে প্রযুক্ত হও, সদর্থের অনুসরণ কর, সদর্থে অপ্রমত্ত হও, দৃঢ়সঙ্কল্প হও।'[৩]

---

৩ দীঘনিকায়, পৃঃ ১২৯

উদ্ধৃতাংশ হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ মানুষপূজায় রত হউক ইহা তথাগত কিছুতেই চান নাই। কুশিনারায় গমনপথে বুদ্ধ যখন শালতরুর নীচে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তখন অকালে পুষ্পসকল পড়িয়া তাঁহার দেহ আচ্ছাদিত করিল। পত্রপুষ্পে শোভিত হইয়া প্রকৃতি যখন তথাগতকে সংবর্ধনা করিতে ব্যস্ত তখনও বুদ্ধ বলিয়াছেন, 'আনন্দ, কেবলমাত্র এইরূপ ঘটনা দ্বারা তথাগতকে যথার্থরূপে সম্মান, শ্রদ্ধা ও পূজা করা হয় না। যে ভিক্ষু বা ভিক্ষুনী ধর্মনিষ্ঠ নর বা নারী, উপদেশাবলী অনুসারে বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর কর্তব্যসমূহকে অবিরত পালন করেন, তাঁহারাই যথার্থরূপে তথাগতকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত অর্ঘ্য দান করেন। অতএব আনন্দ, অবিচ্ছিন্নভাবে বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর কর্তব্য পালনে রত হও, উপদেশাবলীর অনুসরণ কর। এইরূপ করিলে তোমরা বুদ্ধের যথার্থ সম্মান করিবে।[৪]

মানুষকে সদর্থে উদ্বুদ্ধ করিয়া গোতম কুশিনারায় আগমন করিয়াছেন। মহাপ্রস্থানের যাত্রার শেষ অঙ্ক উপস্থিত। যে জ্ঞানারুণের উদয়ে বোধিদ্রুমতল ঊষার প্রথম ক্ষণে নব প্রভায় দীপ্তি পাইয়াছিল উহা শত শত হৃদয়দীপ প্রজ্বলিত করিয়া অস্তাচলে গমনের আয়োজনে ব্যস্ত। যে মহান উদ্দেশ্য লইয়া তিনি জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন উহার সিদ্ধি হইয়াছে। গোতম জীবনের দুঃখকষ্ট কি তাহা জানিয়াছেন, দুঃখোৎপত্তির নিবৃত্তি কিসে হয় তাহাও সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার স্থূলদেহ শীঘ্রই মর্ত্যধাম হইতে বিদায় লইবে কিন্তু মানুষকে প্রেরণা দিবার, তাহাদের শুভ পথে চালিত করিবার জন্য থাকিয়া যাইবে শাস্তার বাণী—তথাগতের নির্দেশ। বুদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন, 'আনন্দ, আমি যে ধর্ম ও বিনয় উপদেশ দিয়াছি ও ঘোষণা করিয়াছি, আমার দেহান্তে তাহাই তোমাদের শাস্তা।' যে ভিক্ষু শিষ্যবৃন্দ তাঁহার বাণী যথাযথ উপলব্ধিপূর্বক দেশ হইতে দেশান্তরে প্রচার করিবেন, ধর্মের শাশ্বত মূলমন্ত্র নরনারীর সম্মুখে প্রদর্শন করিবেন, তাঁহাদের জন্য তিনি এক বাণী রাখিয়া গিয়াছেন। কুশিনারা গ্রামে পরিনির্বাণে প্রবেশ করিবার পূর্ব মুহূর্তে তিনি ভিক্ষুমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে বলিয়া গিয়াছেন, 'ভিক্ষুগণ, শ্রবণ কর, ধ্বংসই সর্বপ্রকার মিশ্র পদার্থের ধর্ম। যত্নসহকারে নিজের মুক্তির মার্গ পরিষ্কৃত কর।' নিজের মুক্তি করায়ত্ত না করিলে তাহার দ্বারা ধর্মপ্রচার কি করিয়া সম্ভব? আর প্রচারকার্য সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ না করিলে বুদ্ধের আগমনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে তাই অনিত্য সংসারে ভিক্ষু শিষ্যগণ যাহাতে নিজ ধর্মজীবনের উৎকর্ষ আনয়ন করিয়া সঙ্ঘের আধ্যাত্মিক স্রোতকে বুদ্ধ কর্তৃক নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত করিতে পারেন এবং তদ্দ্বারা জগতের যথার্থ মঙ্গল সাধন করিয়া মানুষকে শান্তির পথ দেখাইতে পারেন, উহার জন্য গোতম ভিক্ষু শিষ্যদের উপর এক মহান দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন।

আর সর্বসাধারণ গৃহস্থ, উপাসক, উপাসিকা-বৃন্দ, যাহাদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের জন্যই তিনি ভিক্ষুদের নিজ হাতে গড়িয়াছেন, তাহাদের প্রতি কি বুদ্ধের কোন বাণী নাই? দৈনন্দিন কর্মময় জীবনের ফাঁকে মানুষ যাহাতে ধর্মানুষ্ঠান করিতে পারে, পরম কারুণিক স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হইয়া তাঁহার সেবা-পূজার দ্বারা এক ধর্মোন্নত জীবন গঠনে ব্রতী হইতে পারে, তদ্বিষয়ে কি বুদ্ধের কোন অবদান নাই? সাধারণ মানুষকে তিনি সে পথেরও সন্ধান দিয়া গিয়াছেন।

---

৪ দীঘনিকায়, পৃঃ ১২৩

বুদ্ধের সময়ে হিন্দুধর্মে যে সব ক্রিয়াকাণ্ডের প্রচলন ছিল, যেমন যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, দেবতার আরাধনা ইত্যাদি, উহারা অভ্যুদয়াদি ও মানসিক শান্তি আনয়ন করিত সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণধর্মের ভিত্তি এমন কিছু সুদৃঢ় ছিল না যাহাতে মানুষ নূতন ধর্মমত উপেক্ষা করিতে পারে। বস্তুতঃ মানুষ যেমন চিরকাল নূতনত্বের নিকট মাথা নোয়াইয়াছে তেমনি বুদ্ধের সদ্য-উপলব্ধ বাণীর নিকটও তখনকার মানব মাথা নত করিল। ক্রিয়াকাণ্ডের নতি-স্বীকারের কারণহিসাবে স্বামী বিবেকানন্দের কথাই উল্লেখযোগ্য—'বৌদ্ধগণ যে সকল মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন, যে সকল প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সমগ্র জাতির সমক্ষে যে সকল আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ ধরিয়াছিলেন, বৌদ্ধধর্মের বিস্তার এইগুলির দরুণ যতটা হইয়াছিল, বুদ্ধের নৈতিক উপদেশ বা চরিত্রগুণে ততটা হয় নাই। বড় বড় মন্দির, জাঁকজমক-পূর্ণ অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপের সহিত সংগ্রামে গৃহস্থদের ব্যক্তিগত যজ্ঞকুণ্ডসমূহ দাঁড়াইতে পারিল না।'

গোতম বলিয়াছেন, 'ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ ও গৃহ-পতিদিগের মধ্যে পণ্ডিতগণ আছেন। তাঁহারা তথাগতের শরীরপূজা করিবেন।'[৫] এই তথাগত-শরীরপূজার নব রূপায়ণ মানুষকে আকৃষ্ট করিল। সাধকদের ধ্যানে প্রস্ফুটিত হইল বৌদ্ধ দেবদেবীর স্বরূপ, তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন দেবতার ঐশী শক্তি। অন্তর্যামী ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন বাহ্য পূজার, মানবীয় সেবার। বৌদ্ধ ধর্মেতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। ধর্মস্থাপনার্থ বুদ্ধাবতারের আবির্ভাব সকলে বিশ্বাস করিল, অষ্টাঙ্গিক মার্গে পূর্ণ আস্থা আনয়নপূর্বক সঙ্ঘকেই ধর্মপ্রচারের একমাত্র যন্ত্র বলিয়া জানিল। বুদ্ধ তাহাদের নিকট সাধকাগ্রণী জ্ঞানী তাপসই নন উপরন্তু পরম শুভকর, লোকহিতকর ইষ্টদেবতা। যাঁহারা বুদ্ধের বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রদ্ধাবনত চিত্তে মূর্তিপূজায় ব্রতী হইলেন সেই গৃহস্থ উপাসক-উপাসিকাবৃন্দই বুদ্ধপূজার পথিকৃৎ।

তাঁহাদেরই প্রচেষ্টায় দিকে দিকে মস্তক উত্তোলিত করিয়া দাঁড়াইল কারুকার্যমণ্ডিত মন্দির, পার্শ্বে চৈত্যসমূহ। মন্দির উৎসর্গীকৃত হইল দেবতার উদ্দেশ্যে, প্রতিষ্ঠিত হইল মর্মর-মূর্তি। উপাসকবৃন্দ ভক্তি-অর্ঘ্য ঢালিয়া দেবতার তুষ্টিবিধান করিলেন। বৌদ্ধধর্ম, সাহিত্য, শিল্প বিভিন্ন প্রান্তে বিস্তার লাভ করিল। ভিক্ষু প্রচারকবৃন্দ বুদ্ধের বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছিয়া দিলেন।

তথাগতের অমর বাণী বিফল হয় নাই। কুশিনারায় মহাপ্রস্থানের প্রস্তুতিপর্বে মানবের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া ভিক্ষু ও পণ্ডিতদের উদ্দেশ্যে যে বাণী একদা ঘোষিত হইয়াছিল, বৌদ্ধ ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সেই বাণীর পরি-পূর্ণতার সাক্ষ্য আজিও বহন করিয়া চলিয়াছে।

৫ দীঘনিকায়

শক্তির বিভিন্ন রূপ

ডক্টর শ্রীবিশ্বরঞ্জন নাগ

(১) যান্ত্রিক শক্তি

বিজ্ঞানের উন্মেষ হয়েছে মানুষের কৌতূহল ও সুষ্ঠুভাবে নিজের প্রয়োজনীয় কাজ করবার আগ্রহ থেকে। প্রতিদিন সকালে সূর্য ওঠে, রাত্রির অন্ধকার মিলিয়ে যায়, প্রকৃতির চেহারা মানুষের চোখে ধরা পড়ে, মানুষ তাপ অনুভব করে। সূর্যের এই অশেষ গুণ দেখে মানুষ সূর্যকে মনে করত একজন দেবতা যাঁর করুণাই আলো ও তাপ হয়ে পৃথিবীতে মানুষের জীবনধারণ সম্ভব করেছে। পরে আবিষ্কৃত হল আগুন—সূর্য যখন ডুবে যায় তখন এই আগুন থেকেই পাওয়া যায় আলো ও তাপ—তাই সূর্যের মত আগুনকেও বলা হয়েছে আর একজন দেবতা। কালক্রমে মানুষের কৌতূহল জেগেছে—এই দেবতাদুজনের প্রকৃত স্বরূপ কি? সূর্য কেন রোজ সকালে ওঠে? সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যে আলো পাওয়া যায়, আগুন থেকে যে তাপ পাওয়া যায় সেই আলো এবং তাপই বা কি? প্রকৃতিতে যত রকমের ঘটনা ঘটে তার সব কিছুতেই মানুষের কৌতূহল—কেন এই সব ঘটনা ঘটে? ঘটনাগুলির যোগসূত্র কি? কোন্ মূল নিয়ম সব ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে? এই মূল নিয়মটি জানাই বিজ্ঞানের একটি উদ্দেশ্য।

জীবনধারণের প্রয়োজনে মানুষের বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে হয়। শীতাতপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ঘর চাই, বস্ত্র চাই। শরীরকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য খাদ্য চাই। সমষ্টিগত জীবন যাপনের জন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করা চাই। পরস্পরের আদানপ্রদান করা চাই। প্রতিকূল অন্য মানবগোষ্ঠী বা জন্তুজানোয়ারের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা চাই। এই সব প্রয়োজন মেটাবার জন্য সভ্যতার আদিমযুগে নিজের কায়িক ক্ষমতার উপরেই মানুষ নির্ভর করত। পরবর্তীকালে প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করে আবিষ্কার করা হল নানারকমের যন্ত্রপাতি যা ব্যবহার করে অল্পায়াসে সব কাজ করা সম্ভব হয়। যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন বিজ্ঞানের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন ধরনের কাজের যে ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে ভাবলে দেখা যায় সব ক্ষেত্রেই মানুষকে কোন ভারী জিনিসকে হয় পৃথিবীর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে হয় বা এক উচ্চতা থেকে অন্য উচ্চতায় তুলতে হয়। দুটি ক্ষেত্রেই হাতের পেশীকে সঙ্কুচিত করে বলপ্রয়োগ করতে হয়। তাই বলপ্রয়োগে কোন জিনিসের কি পরিবর্তন হয় এ নিয়েই প্রথমে বিজ্ঞানে গবেষণা শুরু হয়। বলের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া নিয়ে বর্তমানে বিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা হয় তাঁর নাম দেওয়া হয়েছে বলবিদ্যা (Mechanics)। বলবিদ্যার অগ্রগতি থেকেই একভাবে বলা যেতে পারে বিজ্ঞানের সূচনা হয়েছে।

বলবিদ্যাকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—একটি হল স্থৈতিক বলবিদ্যা (Statics), দ্বিতীয়টি হল গতিজনক বলবিদ্যা (Dynamics)। বলবিদ্যার গোড়ার কথা হল বলের স্বরূপ। কোন বস্তুর উপর বলপ্রয়োগ করলে বস্তুটির কি পরিবর্তন হয় তা থেকে বল কি বোঝা যেতে পারে। বলপ্রয়োগে বস্তুর গুণাগুণের ওপর নির্ভর ক'রে বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন হতে

পারে। বস্তুটি পরিবর্তনীয় হলে বলপ্রয়োগে বস্তুটির আকারের পরিবর্তন হয়। যেমন একটি ইটের টুকরোয় হাতুড়ি দিয়ে ঘা দিলে টুকরোটি গুঁড়ো হয়ে যায় বা একতাল কাদামাটিতে চাপ দিলে তালটির চেহারা অন্য রকম হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে বস্তুর পরিবর্তন বলের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে ঠিকই কিন্তু তা বস্তুটির এমন সব গুণের দ্বারা নির্ণীত যার সহজ পরিমাপ করা যায় না। তাই পরিবর্তনীয় পদার্থের ওপরে বলের প্রভাব থেকে বলের সহজ সংজ্ঞা নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

অপরিবর্তনীয় (Rigid) পদার্থে বলের প্রভাবে যে পরিবর্তন হয় তা নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। দুরকমের পরিবর্তন হতে পারে। বস্তুটির অবস্থানের পরিবর্তন হতে পারে বা গতিবেগের পরিবর্তন হতে পারে। ধরা যাক পৃথিবীর ওপরে কোন ভারী জিনিস পড়ে আছে। জিনিসটিকে যদি দড়ি দিয়ে কপিকলে টাঙিয়ে দিয়ে দড়িটির খোলা দিকে বলপ্রয়োগ করা হয় তাহলে জিনিসটি ওপরে উঠে যায় বা জিনিসটির অবস্থানের পরিবর্তন হয়। এক্ষেত্রে জিনিসটির ওপরে দুটি বল কাজ করে। মাধ্যাকর্ষণের বল জিনিসটিকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে টানে এবং দড়িটির খোলা দিকে যে বলপ্রয়োগ করা হয় তা কপিকলের মাধ্যমে জিনিসটিকে ওপরের দিকে টানে। যদি এই বলদুটি সমান হয় তাহলে জিনিসটি স্থির থাকে কেননা এরা পরস্পরের বিপরীতে কাজ করে। যদি একটি বল অপরটির চেয়ে বেশী হয় তাহলে যেদিকে বলের পরিমাণ বেশী সেইদিকে জিনিসটি স্থানান্তরিত হয়। স্থৈতিক বলবিদ্যায় কোন বস্তুর উপরে বিভিন্ন দিকে বলপ্রয়োগ করলে বস্তুটির কিভাবে অবস্থানের পরিবর্তন হতে পারে তারই পর্যালোচনা করা হয়।

একটি জিনিসের উপরে একাধিক বল-প্রয়োগের ফলে যদি জিনিসটির সাম্যাবস্থা ব্যাহত হয় ও জিনিসটি স্থানান্তরিত হয় তাহলেই বলা হয় কাজ করা হয়েছে। এই কাজের পরিমাপ নির্দিষ্ট হয়েছে মোট বল ও স্থানান্তরণের দূরত্বের গুণফল। আগে যেসব কাজের কথা বলা হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে এমনিভাবেই কাজ করা হয়। সব জিনিসই সাম্যাবস্থায় কোন বলের প্রভাবে থাকে, তাই কাজ করতে গেলে আমাদের বাহুবল প্রয়োগ করে এই সাম্যাবস্থাকে ব্যাহত করতে হয়। যে বলের প্রভাবে জিনিসটি সাম্যাবস্থায় আছে বাহুবলকে তার সমান করতে হয়। কাজের প্রয়োজনে এমন অবস্থা হতে পারে যে আমাদের বাহুবল সাম্যাবস্থাকে পরিবর্তন করার উপযুক্ত নয়। স্থৈতিক বলবিদ্যার পর্যালোচনা থেকে যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হয়েছে, যার দ্বারা এসব ক্ষেত্রে কাজ করা সম্ভব। এইসব যন্ত্রপাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কপিকল, লিভার (Lever), গাড়ী ইত্যাদি। এদের দ্বারাই মানুষের সীমিত বাহুবল ব্যবহার করেও পিরামিড, বিরাট সব অট্টালিকা ইত্যাদি তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। এমনকি পৃথিবীকেই তুলে ফেলার কল্পনা করা সম্ভব হয়েছে। যন্ত্রপাতির ব্যবহার করলেও কাজ কিন্তু মানুষই করে এবং সব সময়েই কাজের পরিমাণ হল বাহুবল এবং যতটা দূর অবধি হাতটা সরান হয় তারই গুণফল। দেখা যাচ্ছে বস্তুর ওপরে বলপ্রয়োগের একটি ফল হল বস্তুটির অবস্থানের পরিবর্তন ও কাজ করা। কিন্তু কাজ পরিমাপের কোন নিরপেক্ষ সংজ্ঞা নেই বলে—বস্তুতে যেভাবে বলপ্রয়োগ করলে শুধুমাত্র বস্তুটি স্থানান্তরিত হয় তা থেকে বলের গুণগত সংজ্ঞা দেওয়া গেলেও পরিমাণগত সংজ্ঞা দেওয়া যায় না।

বলপ্রয়োগে বস্তুর দ্বিতীয় ধরনের পরিবর্তন হল গতিবেগের পরিবর্তন। ধনুক দিয়ে যখন তীর ছোড়া হয় তখন ধনুকের সাহায্যে ধাক্কা দিকে তীরটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ধাক্কা দেওয়াকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলা যায় ক্ষণস্থায়ী বল (Impulse) প্রয়োগ। যেসব বলের প্রভাবে কোন বস্তু স্থিতাবস্থায় থাকে তাদের কোন একটি বাড়িয়ে দিলে ঠিক তীরের মতই বস্তুটি গতিশীল হয়। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার এই ঘটনাকে ভিত্তি করেই নিউটন প্রথমে বলের সংজ্ঞা দেন। গতির প্রথম সূত্রে তিনি বলেন যে বলপ্রয়োগে বস্তুর গতির পরিবর্তন হয়। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে স্থৈতিক বলবিদ্যায় যখন কোন বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয় তখনও বলের একটি অসম অবস্থা আসে এবং বস্তুটি গতিশীল হয়। কিন্তু ধরা হয় যে এই গতিবেগ শূন্যের কাছাকাছি যেমনটা হয় যখন আস্তে আস্তে কপিকল ব্যবহার করে কোন ভারী জিনিসকে উঁচুতে তোলা হয়। সাধারণভাবে সব অবস্থায়ই বস্তুর উপরে বলপ্রয়োগ করলে, স্থির বস্তু গতিশীল হয়, গতিশীল বস্তুর গতিবেগের পরিবর্তন হয়। নিউটন গতির দ্বিতীয় সূত্রে বলেন যে বলপ্রয়োগে গতিশীল বস্তুর গতিবেগের যে পরিবর্তন হয় সেই পরিবর্তনের হার বলের সমানুপাতিক। অনুপাতের ধ্রুবকটির নাম দেওয়া হয় ভর। ভর কোন জায়গায় বস্তুর ভারের সমানুপাতিক, তাই নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রে বলের পরিমাণগত সংজ্ঞা পাওয়া যায়, কেননা বস্তুর ভর এবং গতিবেগের পরিবর্তনের হার বা ত্বরণ সহজেই মাপা যায়।

বলপ্রয়োগে বস্তুর গতির যে পরিবর্তন হয় এবং বিভিন্ন গতিশীল বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়, তাই হ'ল গতিজনক বলবিদ্যার বিষয়বস্তু। গতিশীল বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, দুটি গতিশীল বস্তুর সংঘাত হলে বস্তুদুটির গতিবেগ পরিবর্তিত হয়। এধরনের সংঘাতের সহজ উদাহরণ হল দুটি বিলিয়ার্ড বলের সংঘাত। দেখা যায় সংঘাতের পূর্বের বস্তুদুটির গতিবেগ ও ভরের গুণফলের সমষ্টি সংঘাতের পরবর্তী ভর ও গতিবেগের গুণফলের সমষ্টির সমান। ভর ও গতিবেগের গুণফলের নাম দেওয়া হয়েছে ভরবেগ (Momentum)। কাজেই বলা যেতে পারে সংঘাতের সময়ে ভরবেগের যোগফল ধ্রুব থাকে। এই সূত্রকে বলা হয় ভরবেগের ধ্রুবতার নিয়ম। সাধারণ অবস্থায় কোন বস্তুর ভরবেগ অপরিবর্তনীয়—শুধুমাত্র বলপ্রয়োগ বা সংঘাতেই ভরবেগ পরিবর্তিত হতে পারে। নিউটনের গতির সূত্রদুটিকে অন্যভাবে বলা যায় বলপ্রয়োগে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন হয় এবং ভরবেগের পরিবর্তনের হার বলের পরিমাণের সমান।

কোন বস্তুর ওপর বলপ্রয়োগ করে অবস্থানের পরিবর্তন ঘটিয়ে যেমন কাজ পাওয়া যায় তেমনি বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন ঘটিয়েও কাজ পাওয়া যায়। বায়ুচালিত যন্ত্রে বায়ুর প্রবাহ এসে ধাক্কা দেয় এবং যন্ত্রপাতির চাকা ঘুরতে থাকে। এই ঘূর্ণমান চাকা দিয়ে অন্যান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে জল তোলা হয়, গম ভাঙ্গা হয় বা অন্যান্য কাজ পাওয়া যায়। বিশেষভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় বায়ুপ্রবাহ ধাক্কা দিয়ে যখন চাকাটিকে ঘোরায় তখন বায়ুপ্রবাহের গতিবেগ হ্রাস পায় বা বায়ুর কণাগুলির ভরবেগ কমে যায়। এইভাবে বায়ুর ভরবেগের পরিবর্তন হয় বলেই বায়ুচালিত যন্ত্রে কাজ হয়। পালতোলা

জাহাজ যখন চলে তখনও বায়ুপ্রবাহই পালে ধাক্কা দিয়ে জলের আকর্ষণী বলের বিপরীতে জাহাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যায় ও কাজ হয়। এক্ষেত্রেও বায়ুপ্রবাহ পালে লাগলে বায়ুর ভরবেগের পরিবর্তন হয়। জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হওয়ার যন্ত্রেও গতিশীল জলধারা এসে যন্ত্রের টারবাইনে (Turbine) ধাক্কা দিয়ে টারবাইন ঘোরায় এবং জলধারার গতিবেগের পরিবর্তন হয় বলেই বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্রের চাকা ঘোরে। কাজেই দেখা যায় গতিশীল পদার্থ থেকে কাজ হলে গতিশীল পদার্থের ভরবেগ কমে যায়। বায়ুচালিত যন্ত্রে, পালতোলা জাহাজে বা জলবিদ্যুৎ-যন্ত্রে বায়ুপ্রবাহ বা জলধারা যখন ধাক্কা দেয় তখন এদের মধ্যে ভরবেগের বিনিময় হয়। যন্ত্রগুলি বায়ুপ্রবাহ বা জলধারা থেকে ভরবেগ আহরণ করেই কাজ করার ক্ষমতাসম্পন্ন হয়। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, বায়ুপ্রবাহ বা জলধারায় কাজ করবার ক্ষমতা সঞ্চিত থাকে—এই ক্ষমতাই যন্ত্রগুলিতে সঞ্চারিত হয়। গ্যালিলিও এই তথ্যটি সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, যখন কাজ পাওয়া যায় তখন কাজ করার ক্ষমতা কমে। এই কাজ করার ক্ষমতার নাম দেওয়া হয়েছিল Vis Viva বা জীবনী-শক্তি; পরবর্তীকালে একেই বলা হয়েছে শক্তি।

কোন বস্তু গতিশীল হলে বস্তুর নিজস্ব সত্তার সঙ্গে অন্য কিছু যুক্ত হয়, যার নাম হল শক্তি। বায়ুপ্রবাহের এই শক্তি আছে, জলধারার শক্তি আছে আবার কেউ যদি কোন জিনিস ছুড়ে দেয় তাহলে সেই ছুড়ে দেওয়া জিনিসেরও শক্তি হয়। প্রথমে বস্তুর ভর ও গতিবেগের বর্গের গুণফলকেই শক্তির পরিমাণ বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। নিউ-টনের গতির সূত্র থেকে পরে হিসাব করে দেখা যায়, শক্তির পরিমাণ বস্তুর ভর ও গতিবেগের বর্গের গুণফলের অর্ধেকের সমান।

গতিজনিত বলবিদ্যার আলোচনা থেকেই এভাবে বিজ্ঞানে শক্তির কথা আসে। গতিবেগ থেকে বস্তুর যে শক্তি আসে, তাকে বলা হয় গতিজনিত শক্তি (Kinetic Energy) বা সাধারণভাবে যান্ত্রিক শক্তি ; কেননা এই শক্তি ব্যবহার করেই বিভিন্ন যন্ত্রে কাজ হয়। আগে বলা হয়েছে যে কোন বস্তুর ওপরে যদি এমন-ভাবে বল প্রয়োগ করা হয় যাতে বস্তুটির শুধুমাত্র অবস্থানেরই পরিবর্তন হবে গতিবেগের পরিবর্তন হবে না, তাহলে অবস্থানের পরিবর্তন করে কাজ করা হবে। এভাবে কাজ করলে যে কাজ করে তার শক্তি ব্যয়িত হয়—অনেক ক্ষেত্রে এই ব্যয়িত শক্তি আবার স্থানান্তরিত বস্তুকে আশ্রয় করে। যেমন ধরা যাক কপিকল দিয়ে কোন ভারী জিনিসকে ওপরে তোলা হল। এবারে যদি কপিকলের দড়ির অন্যদিকে আর একটি ভারী বস্তু বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে এই দ্বিতীয় বস্তুটি প্রথমটি থেকে কম ভারী হলে ওপরে উঠে যাবে, প্রথমটি নেমে আসবে। দ্বিতীয় বস্তুটি তুলতে গিয়ে যে কাজ করা হল এবং শক্তি ব্যয়িত হল, স্পষ্টতই সে শক্তি প্রথম বস্তুটি থেকেই এসেছে। সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে, প্রথম বস্তুটিকে যখন উপরে তোলা হয়েছিল তখনই বস্তুটির কাজ করবার ক্ষমতা জন্মেছিল বা বস্তুটিতে শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল। অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য যে শক্তি জন্মে সেই শক্তির নাম হল অবস্থান-জনিত শক্তি (Potential Energy). অবস্থানজনিত শক্তিও যান্ত্রিক শক্তি, কেননা অবস্থানজনিত শক্তিকে সহজেই গতিজনিত শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় এবং যন্ত্র চালানো যায়। এমনি অবস্থানজনিত শক্তি ব্যবহার

করেই স্প্রীংএর বা ভার-ঝোলানো ঘড়ি চলে; আবার জলবিদ্যুৎ-শক্তিরও মূল উৎস উচ্চস্থানে সঞ্চিত জলের অবস্থানজনিত শক্তি।

শক্তিকে ভাবা যেতে পারে প্রকৃতির একটি বিশেষ প্রকাশ যা যান্ত্রিক শক্তি রূপে বস্তুকে আশ্রয় করে। সাম্যাবস্থায় বা স্থির অবস্থায় বস্তুর কোন শক্তি থাকে না, কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হলে বা গতিশীল হলে বস্তুতে শক্তি যুক্ত হয়। শক্তি বস্তুতে যুক্ত হলেই আমাদের অনুভবে আসে বস্তুর গতি বা পরিবর্তিত অবস্থান রূপে।

যান্ত্রিক শক্তি থেকে আলাদা আরও বিভিন্ন রূপে শক্তি প্রকাশিত হতে পারে। কপিকলের উদাহরণে বস্তুটিকে স্থানান্তরিত করায় যে কাজ করা হল তার শক্তি বস্তুতেই আশ্রয় নেয়। কিন্তু বস্তুর অবস্থানের অন্য ধরনের পরিবর্তন হতে পারে যাতে ব্যয়িত শক্তি বস্তুকে আশ্রয় করে না। যেমন ধরা যাক পৃথিবীপৃষ্ঠে রেখে কোন জিনিসকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঠেলে নিয়ে যাওয়া হল। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝা যায় যে এক্ষেত্রেও ভার তোলার মত কাজ করা হয়। কিন্তু সরান বস্তুটি থেকে আর কোন কাজ পাওয়া যায় না। মনে হতে পারে, যে কাজ করা হল তার জন্য ব্যয়িত শক্তি হারিয়ে যায়। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানে দেখা যায় যখন জিনিসটিকে ঠেলে নেওয়া হয় তখন জিনিসটির যে তল পৃথিবী-পৃষ্ঠের সংস্পর্শে থাকে সেই তলটির এবং পৃথিবী-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বেড়ে যায় বা তাপসৃষ্টি হয়। ঘর্ষণের সময়ে এই যে তাপ সৃষ্ট হয় তা আরও সহজে বোঝা যায় যখন কোন ধাতব অস্ত্রকে পাথরে ঘষে ধারালো করা হয়। এ থেকে বলা যেতে পারে যে, বস্তুটিকে ঠেলে নেওয়ার সময়ে যে শক্তি ব্যয়িত হল সেই শক্তিই তাপ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এই ধারণা যে সত্য, তা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। দেখা গেছে কাজ করা হলে কোন কোন ক্ষেত্রে যান্ত্রিক শক্তি তাপে রূপান্তরিত হয়, আবার এমন যন্ত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে যার দ্বারা তাপকেও যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে—যেমন হয় বাষ্পচালিত, তৈল-চালিত বা পারমাণবিক যন্ত্রে। তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, তাপ ও যান্ত্রিক শক্তি মূলতঃ এক —এরা শক্তিরই দুই ধরনের প্রকাশ। যান্ত্রিক শক্তি বস্তুর গতিবেগ ও অবস্থানের পরিবর্তন রূপে দেখা যায়; কিন্তু তাপশক্তি বস্তুকে আশ্রয় করলে বস্তুর একটি বিশেষ অবস্থা হয় যা আমাদের ত্বকে তাপের অনুভূতি আনে। কাল-ক্রমে প্রমাণিত হয়েছে, আমরা যাকে শব্দ বলে অনুভব করি তাও বস্তুর এক বিশেষ ধরনের গতিজনিত শক্তি। আলো, বেতারতরঙ্গ, বিদ্যুৎ ও চুম্বক শক্তি—এসবই শক্তির বিভিন্ন রূপ।

নিজস্ব প্রয়োজন মেটাবার জন্য যন্ত্রপাতির আবিষ্কার থেকে যে বলবিদ্যার সূচনা হয়েছিল তা থেকে মানুষ শক্তিকে জানতে পারে। শক্তি যান্ত্রিক শক্তিরূপেই মানুষের সাধারণ বুদ্ধিতে সহজে ধরা দিয়েছিল। আলো, তাপ এদের বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ঘটনা বলে মনে করা হত। মানুষ ভাবত আলো, তাপ এরা প্রকৃতির বিভিন্ন অতীন্দ্রিয় সত্তা—বিভিন্ন দেবতার বাহ্য রূপ। এদের স্বরূপ বুঝতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা আজ সিদ্ধান্ত করেছে, এ সবই হল শক্তির বিভিন্ন রূপ। প্রকৃতির যা কিছু প্রকাশ তার মূল বিষয় দুটি—একটি বস্তু এবং অন্যটি শক্তি। শক্তি প্রকাশ পায় আলো, তাপ, শব্দ, বেতারতরঙ্গ হয়ে; আবার বস্তুও এই শক্তিকে গ্রহণ ক'রে নিজেকে উদ্ভাসিত করে—নিজেকে চেতন জীবের অনুভূতিতে আনে।

জীবনশিল্প ও স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী তথাগতানন্দ

"আমরা যাকে বলি সাহিত্য, বলি ললিত-কলা, তার লক্ষ্য এই উপলব্ধির আনন্দ, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর এক হয়ে যাওয়ার যে আনন্দ। অনুভূতির গভীরতা দ্বারা বাইরের সঙ্গে অন্তরের একাত্মবোধ যতোটা সত্য হয় সেই পরিমাণে জীবনের আনন্দের সীমানা বেড়ে চলতে থাকে অর্থাৎ নিজেরই সত্তার সীমানা।

(সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্রনাথ)

ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান আমরা জানি, আমরা অনেকেই কিন্তু আমাদের মানসিক ভূগোলে এই 'পুণ্যভূমির' স্থান সম্পর্কে অবহিত নই। স্বামীজী বলেছেন, ভারত "ধর্ম ও দর্শনের দেশ।" তাঁর মতে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব "আধ্যাত্মিকতায় ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশে।"

স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ নিজের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ; প্রকৃতি ও জীবজগতের সঙ্গে তার কোন আত্মীয়তা আছে বলে মনে হয় না, জগতের মধ্যে সে কোন ঐক্য খুঁজে পায় না। শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণ বলেছেন, আমরা এক অখণ্ড আনন্দময় সত্তারই খণ্ডরূপ, এই সর্বব্যাপী আত্মাই আমাদের প্রকৃত সত্তা।

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।

অগ্নি, বায়ু, জল-স্থল সর্বত্র সেই চৈতন্য অনুপ্রবিষ্ট। তাঁকেই ঋষি বার বার প্রণাম করেন। বিশ্বপ্রকৃতি চৈতন্য-নিরপেক্ষ স্থুল পদার্থ-পুঞ্জ নয়। এক আনন্দময় সত্তা 'সর্ব-মাবৃত্য তিষ্ঠতি'—সব কিছু জুড়ে বিদ্যমান, জাগতিক মোহপাশ ও স্থুল দেহাভিমান ত্যাগ করেই তাঁর স্পর্শ পাই। এই মিলনই আমাদের কাম্য। এই অনন্ত জীবনেই আমাদের গতি, সম্পদ, আশ্রয় ও আনন্দ।

প্রাজ্ঞব্যক্তি সাধনার দ্বারা বিরোধ ও বেসুরকে বশ করেন। জড় ও চৈতন্যের মধ্যে ঐক্য দেখেন। এইটাই আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির ফলশ্রুতি। সেই সর্বব্যাপী চৈতন্যই সব হয়েছেন। তিনিই আবার রসস্বরূপ—রসো বৈ সঃ। তিনিই একমাত্র প্রেয়—প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ। ব্যক্তিমনের সঙ্গে বিশ্বমনের এই যে সংযোগ, ধ্যানালোকে অমূর্তের সঙ্গে মিলনে যে আনন্দ—সুখম্ আত্যন্তিকং—তাহাই আমরা কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পে, দর্শনে পেতে উন্মুখ হয়ে থাকি। এই ঐক্য-বোধেই আমাদের পূর্ণতা আসে।

শিল্পের মধ্য দিয়ে আমরা অসীমের মধ্যে হারিয়ে যাবার সাধনা করি। আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিত্বের বা সীমাবদ্ধতার অহঙ্কার আছে, তার বিলোপ ব্যতীত আমরা ঐক্যের সন্ধান পাই না, শিল্পসাধনার লক্ষ্য এই ব্যক্তিত্বের গণ্ডী হতে মুক্তির চেষ্টা। ঐক্যবোধের মধ্য দিয়েই আমাদের পূর্ণতা আসে। শিল্পীর জীবন ধন্য হয় যখন সে অসীমের এই হাতছানিকে প্রত্যক্ষ করে।

শিল্প মানে 'সত্যের সুন্দর অভিব্যক্তি।' ভগবান হলেন 'সত্যস্য সত্যম্।' তিনিই সুন্দরতম সৌন্দর্য। "ভগবানের অভিব্যক্তি শিল্পের পরাকাষ্ঠা।" এবং শ্রীঅরবিন্দের কথায় "শিল্প আবার অন্তঃপুরুষের জন্য, আত্মার জন্য—সৌন্দর্যকে আশ্রয় করে, তার ভিতর দিয়ে

অন্তঃপুরুষ, আত্মা যা গড়তে চায় সে সকলের প্রকাশের জন্য।" সৌন্দর্যের জন্য, ঐক্যের জন্য বা প্রেমের জন্য আমাদের যে আকূতি তার পরিসমাপ্তি সেই আত্মায়। তিনিই 'সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ।' সেই ভূমাকে অনুভবে আনার অর্থ হল অহং-লোপের পথের কাঁটা দূর করা। এই অনুভূতি দেয় একটা পরিপূর্ণ উপলব্ধির আনন্দ; যা ভূমা, যা অসীম, তা আমাদের অন্তরাত্মারই পরম স্বরূপ। অহং-বিস্মৃতি না হলে মগ্নতা আসে না; অহং-বিস্মৃত শিল্পীর ভাবদৃষ্টির সম্মুখে বিশ্বপ্রকৃতির দৃশ্য, গন্ধ, গানে বা মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, অভাব-বেদনা, আশা-নিরাশায় ভূমা বিরাটরূপে অপরূপ হয়ে দেখা দেন। এইরূপ যিনি দেখেন—উপলব্ধির পরম মুহূর্তে মানব-চেতনায় কোন আলম্বনকে আশ্রয় করে শিল্পের মাধ্যমে এই অসীম সুপ্রকট হয়ে ওঠে। এই রূপায়ণই শিল্প-সৃষ্টি। জীবন ও শিল্পসৃষ্টির মধ্যে নিবিড় যোগ এইখানেই।

সব শিল্পসৃষ্টিকেই অন্তরাত্মার বিকাশ হিসাবে দেখা প্রাচ্যস্বভাব। সত্যকার শিল্পসৃষ্টি হয় মানবের নিগূঢ় মর্মলোকে। অনুভূতির দ্বারা মানব-প্রাণ ভূমার সহিত, অসীমতার সহিত তন্ময়তা লাভ করে, তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়। অনুভূতি মানব-প্রাণকে নিখিল-প্রাণের মধ্যে মুক্তি দেয়, এই সর্বব্যাপিত্ব যে তার অন্তরাত্মার সত্যস্বরূপ, ইহা সে প্রত্যক্ষ করে। এই ধ্যানলব্ধ সত্যদর্শনই আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু এর জন্য চাই অতন্দ্র সাধনা; অসীমের ধ্যানেই ব্যক্তিত্বের বা সীমার অহঙ্কার বিলুপ্ত হয়। আত্মবিলয় বিনা শিল্পী হওয়ার আর অন্য পন্থা নাই। মনীষী কাণ্ট শিল্পকে "an object of disinterested satisfaction" অর্থাৎ নিঃস্বার্থ তৃপ্তিদায়ক বলেছেন। কারণ শিল্পটি বা আনন্দের অবলম্বন ও উদ্দীপকটি যেন আমাদের অহংবোধকে বিলুপ্ত করে আত্মবিস্মৃতির পথে নিয়ে যায়। Impersonality or detachment সত্ত্বগুণের আধিক্যে আসে। অবিভক্তং বিভক্তেষু তদ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্। "শিল্পঅর্থে প্রকৃতপক্ষে শীল ও প্রসাদগুণ যাতে আছে তাকেই শিল্প বলে। শিল্প মনে সাত্ত্বিক প্রসাদগুণ আনবে।

প্রসীদন্তে মনাংস ত্র তে…

অর্থাৎ মনকে প্রসন্ন করলে তাকে প্রসাদ বলে।" (অসিত হালদার)

শিল্প বা সাহিত্য ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি নয়—বস্তুতঃ ব্যক্তিত্ব (ego) থেকে আত্মার মুক্তি, জীবচৈতন্যের সহিত বিশ্বচৈতন্যের মিলন। সাহিত্যে বা শিল্পে আমরা এই দুর্লভ আত্মীয়তাই খুঁজি। শিল্পী অহংকারের দেওয়াল টপকিয়েই ভূমার সহিত, বিরাটের সহিত আত্মীয়তা করতে পারে, এর জন্যই দুশ্চর সাধনা, চোখের জলে সমস্ত অহংকার ঘুচাবার সাধনা। এই অনুশীলন বা আত্ম-কর্ষণের ফলে শিল্পী এবং শিল্প-রস-পিপাসু—যাকে সহৃদয় বলে—কাব্য নাট্য-চিত্র প্রভৃতি সুকুমার শিল্পের মাধ্যমে যে রসানুভূতি লাভ করে তাহা সচ্চিদানন্দস্বরূপ স্বপ্রকাশ আত্মচৈতন্যের অজ্ঞানাবরণ ভঙ্গের ফল, অতিরিক্ত কিছুই নয়। রসগঙ্গাধর বলেছেন, "ভগ্নাবরণা চিদেব রসঃ।" এই কাব্যানন্দকে অভিনব গুপ্ত বলেছেন, "পরব্রহ্মাস্বাদসচিবঃ" এবং বিশ্বনাথ বলেছেন, "ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ।" পূর্ণ ব্রহ্মস্বাদ নয়। অধ্যাপক হিরিয়ানা এ দুটিকে তত্ত্বতঃ সমগোত্রীয় বলে স্বীকার করেও বলেছেন জীবনর্চচার উপর উভয়ের গুরুত্ব ও স্থায়িত্ব সমান নয়। (Macgregor প্রণীত Aesthetic Experience in Religion) সাধক শিল্পীর বা সহৃদয়ের আনন্দ লৌকিক আনন্দ নয়, ব্রহ্মানন্দও নয়। তা আমাদের চিত্তকে সুখদুঃখের জগতের অনেক ঊর্ধ্বে

এক অলৌকিক জগতে নিয়ে গিয়ে মুক্তির আনন্দ দেয়। একেই আমরা ভাবজগৎ বলি। একেই লক্ষ্য করে ধ্যানী কবি Wordsworth বলেছেন,

"The gleam,
The light that never was on sea or land,
The Consecration, and the
poet's dream."

জগৎ ও জীবনের প্রতিস্তরে তার বাস্তব সত্তাতিরিক্ত একটি ভাব-সত্তা আছে। রসিক ভাবুকের দৃষ্টিতেই সেই ভাবসত্তা প্রকাশ পায়।

সাধারণ শিল্পীদের জীবনবোধের ব্যাপকতা ও গভীরতা নেই। তাদের জীবন-দর্শন সীমিত। তারা কোন গভীর প্রত্যয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় না, জীবন-চর্চা তারা করে না। অধিকাংশই ছন্নছাড়া ব্যক্তি। "Every artist is as bohemian as the deuce inside. (Thomas Mann)। এদের সৃষ্টি আত্মসিদ্ধির জন্য নয়—আত্মপ্রকাশের জন্য। এতে অহং-এরই প্রকাশ বেশী। এদের চিন্তা, ভাবনা ও কল্পনার প্রভাবে এদের ব্যক্তিজীবন পরিবর্তিত হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যের পথে' বলেছেন, "অনুভব মানেই হওয়া," তিনি বলেছেন, "বাইরের সত্তার অভিঘাতে সেই সেই হওয়ার বোধে বান ডেকে এলে মন সৃষ্টি-লীলায় উদ্‌বেল হয়।" "টেনিসনের কবিতা পড়িয়া আমরা টেনিসনকে যতো বড়ো করিয়া জানিয়াছি, তাঁহার জীবন-চরিত পড়িয়া তাঁহাকে তাহা অপেক্ষা অনেক ছোট করিয়া জানিয়াছি মাত্র।" (চারিত্রপূজা, রবীন্দ্রনাথ)

কথাশিল্পী সমরসেট মমের "The great novelists and their novels" বই থেকে প্রথম শ্রেণীর কথাশিল্পীদের জীবনের যে পরিচয় পাই তা মোটেই সুরুচির পরিচায়ক নয়। কয়েকজন ছাড়া আর সকলেরই জীবন কুৎসিত। এরা শুধুমাত্র কথাশিল্পী, বুদ্ধির চর্চা করে পাঠককে আনন্দ দেয়। জীবনের মান উন্নত করার তাগিদ এদের নেই। প্রতিভা আছে কিন্তু জীবন নেই। সেজন্যই আজ পাঠকসমাজ কোন সার্থক জীবন যাপনের প্রেরণা পাচ্ছে না। রাশি রাশি বই লেখা হচ্ছে, পাঠকরাও গোগ্রাসে গিলছে কিন্তু কোন উন্নতি হচ্ছে না। লেখকদের জীবন-দর্শন অত্যন্ত স্থূল। শ্রেয়ের প্রতিষ্ঠা, মানুষের কল্যাণ এবং উন্নতির ঊর্ধ্বগতি কোনটাতেই তাদের বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা নেই। প্রজ্ঞাদৃষ্টি বা emotional belief, যাকে Eliot বলেছেন 'wisdom', আজ কথাশিল্পীদের মধ্যে নেই। "The whole of modern literature is corrupted by what I call secularism, that it is simply unaware of, simply cannot understand the meaning of, the primacy of the Supernatural over the natural life, of something which I assume to be our primary concern."

(Religion & Literature, T. S. Eliot)

আর এক শ্রেণীর শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি আছেন যাঁরা রূপে, রঙে, রেখায়, সুরে—শিল্পভাবনা ও শিল্পকামনাকে দেহায়িত না করে নিষ্ঠাবান শিল্পীর সাধনা দিয়ে জীবনকেই সহস্রদল পদ্মের মতো ফুটিয়ে তুলতে চান। এঁরাই জীবন-শিল্পী। পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনার জন্য এঁরা জীবনটাকে ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করেন। সাধনার দ্বারা তাঁরা ভূমাকে, বৃহৎকে, অসীমকে পান। পঞ্চ-কোষের আবরণ সরিয়ে মেঘমুক্ত সূর্যের মত স্বপ্রকাশ আত্মা জীবকে লোকোত্তর আনন্দলোকে নিয়ে যায়। এ হ'ল রামপ্রসাদের ভাষায় মানবজীবন আবাদ করে সোনা ফলানো। সৌন্দর্যের এলাকায় শিল্প-সৃষ্টি কিন্তু সত্যের এলাকায় মানুষের কর্ম-জীবন। এঁরা জীবনসাধনার দ্বারা শিল্প-

সত্যকে জীবন-সত্যে পরিণত করার দুরূহ সাধনায় মগ্ন। এজন্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চারিত্র-পূজায়' বলেছেন, এঁরা 'মহাত্মা'। এঁদের জীবনের স্বর্গীয় দীপ্তি মানুষকে আকর্ষণ করে, প্রেরণা দিয়ে মহত্ত্বের পথে নিয়ে যায়। মাহাত্ম্যের সঙ্গে প্রতিভার এখানেই প্রভেদ। প্রতিভার এই কল্যাণশক্তি নেই, প্রতিভার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার মিলনে তা সম্ভব। 'ভক্তিভরে শেক্স্‌পিয়রের স্মরণমাত্র আমাদিগকে শেক্স্‌পিয়রের গুণের অধিকারী করে না, কিন্তু যথার্থভাবে কোন সাধুকে অথবা বীরকে স্মরণ করিলে আমাদের পক্ষে সাধুত্ব বা বীরত্ব কিয়ৎ পরিমাণেও সরল হইয়া আসে।' (চারিত্রপূজা।)

সাধারণ শিল্পীদের কাছে বহির্মুখী ইন্দ্রিয়ের চপল-চাতুর্য, তর্ক-বুদ্ধির চিন্তা-বিলাসই কাম্য, এদের শুধু বুদ্ধির কালচার। সাধক-শিল্পীদের লক্ষ্য ভূমানন্দ। তাঁদের আত্মার কালচার। ভগবান সত্য, জ্ঞান ও সৌন্দর্যের উৎস। সত্যকে, শিবকে ও সুন্দরকে জীবন-শিল্পীরা পেতে চান তপস্যার দ্বারা। এঁদের জীবন-চর্চার নিষ্ঠা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। এঁরা সাধু, মহাত্মা। মহাত্মা গান্ধী তাই বলেছেন: 'Association is the highest art'। তিনি সন্ন্যাসকেই জীবনের সবচেয়ে বড় শিল্প বলেছেন। শিল্প মানে সরল সুষমা।

সত্যের সাধক বলে সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ স্বামীজীকে বুদ্ধিজীবীরা জীবন-শিল্পী বলতে পারেন। স্বামীজীর সমস্ত বাণীর মূলে আছে মানুষের সুপ্ত আত্মার জাগরণের অভিপ্রায়। মানুষকে মান-হুঁস করা, জীববোধ ঘুচিয়ে তাকে আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত করা, তার body-consciousness দূর করে তার মধ্যে soul-consciousness জাগরণ করাই তাঁর লক্ষ্য। এই আত্মচেতনা বা অধ্যাত্ম-চেতনার জন্যই সমস্ত কর্ম-প্রবর্তন। সভ্যতার দ্বারা সুসংস্কৃত জীবন লাভ করে জগৎ-সত্যের মধ্য দিয়ে আত্ম-সত্যের এবং আত্ম-সত্যের মধ্য দিয়ে জগৎ-সত্যের অনুভূতি লাভ করাই আমাদের লক্ষ্য। এ না হলে মহতী বিনষ্টিঃ। তাই তাঁর গোড়ার কথা হল: 'Man-making is my mission'. তাঁর চোখে মানুষের মধ্যে রয়েছেন শিব—যিনি 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'।

মানুষের ইতিহাস মানবাত্মার মুক্তি অভিযানের বেদনাতুর ইতিহাস। Croce-র মতে ইতিহাস—'Story of liberty'। Toynbee দেখছেন ইতিহাসের মধ্যদিয়ে মানুষের ক্রম-অভিব্যক্তি,—evolution of soul এবং তাও ঐশী ইচ্ছার পরিপূরণের জন্য।

'মানুষ আপন চৈতন্যকে প্রসারিত করেছে অসীমের দিকে। জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে, বৃহত্তর ঐক্যকে আয়ত্ত করতে চলেছে।...মুক্তি পেতে হবে, মুক্তি নিতে হবে, এই যে তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।' (মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্রনাথ।)

শ্রীঅরবিন্দ অসীমের সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়ার এই প্রেরণাকে বলেছেন: 'The passionate aspiration of man upward to the Divine'. (Life-Divine, Vol. I.).

ইতিহাসের এই অভিপ্রায় ভারতের জীবন-দর্শনে স্পষ্ট ছাপ রেখে চলছে। স্বামীজীর মতে ভারত চলেছে with her own majestic step,...to fulfil the glorious destiny,...to regenerate man-the-brute to man-the-God'. তাই তিনি বলেছেন, 'Freedom, freedom is the song of my soul'. 'দেহ, মন এবং জীবাত্মার সামগ্রিক বন্ধন-মুক্তি বা স্বাধীনতাই উপনিষদের মূল মন্ত্র।'

ইতিহাসের গতির পশ্চাতে রয়েছে খাঁটি

মানুষ। তাঁদেরই সবল বাহু ও উর্বর মস্তিষ্ককে আশ্রয় করে ইতিহাসের জয়যাত্রা। সভ্যতার অগ্রগতির চাকা ঘোরাচ্ছে কার্লাইলের Hero, এমার্সনের Representative Man ও শ্রীঅরবিন্দের Superman Toynbee-র Selective minority বা elites. জনসাধারণ প্রেরণা পায় এঁদের জীবন ও বাণীকে কেন্দ্র করে। ঐতিহাসিক স্বামীজী বলেছেন: "অর্থ, পাণ্ডিত্য, বাক্‌চাতুরী—ইহাদের কোনটিরই বিশেষ মূল্য নাই। পবিত্রতা, খাঁটি জীবন এবং প্রত্যক্ষানুভূতি-সম্পন্ন মহাপ্রাণ ব্যক্তিরাই জগতে সমুদয় কার্য সম্পন্ন করে।" (পত্রাবলী —১ম, ৪৫৮ পৃ:) তাই তিনি সৈন্য, বোমা বা অন্যান্য কোন জিনিস চাননি। চেয়েছিলেন, "নচিকেতার মত···শ্রদ্ধাবান ১০।১২টি ছেলে পেলে আমি দেশের চিন্তা ও চেষ্টা নূতন পথে চালনা করে দিতে পারি।"

তিনি ছিলেন সত্যিকারের জীবন-শিল্পী এবং এই শিল্পের উদ্‌গাতা। সমস্ত উন্নতির মূলে ব্যক্তি-চরিত্রের উৎকর্ষ। মানুষের সুপ্ত আত্ম-শক্তি জাগরণের দিকেই তাঁর লক্ষ্য। জড়শক্তি অপেক্ষা চৈতন্য-শক্তির উপর তাঁর ছিল বিরাট আস্থা। "কায়-মন-বাক্য যদি এক হয়, একমুষ্টি লোক পৃথিবী উল্টে দিতে এই পারে—এই বিশ্বাস থেকে যেন সরে যেও না।"—এই তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়, মানুষকে তার জীবনের জন্য গৌরব বোধ করতে বলেছেন তিনি। তাঁর শ্রেষ্ঠ বাণী এই: 'Sacredness of human personality' —জীবনের আধ্যাত্মিক সত্তাকে স্বীকৃতি দেওয়া। মানুষের মধ্যে এই ব্রহ্মদৃষ্টিকেই রবীন্দ্রনাথ একটি 'মহৎ-বাণী' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'তাঁর (স্বামীজীর) বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েছে তখনি শক্তি দিয়েছে।'

Be and make এই তাঁর বাণী, তাই আমাদের প্রার্থনা শুধু অপাবৃণু, অপাবৃণু; আমাদের পঞ্চ-কোষের আবরণ উন্মোচনের প্রার্থনা। 'গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্'-কে মানুষী চেতনায় প্রকাশ করার প্রার্থনা। প্রতি বস্তুতে, প্রতি ভাবে যে ব্রহ্ম চিরবিরাজিত তাঁকে ব্যক্তি-চেতনার কাছে বাইরের স্থূল আবরণ যতটা সম্ভব সরিয়ে আনন্দ-স্বরূপে প্রকাশ করাই শিল্পীর কাজ। জীবন-শিল্পীও সাধনার দ্বারা—সত্য, ত্যাগ ও ধর্মনিষ্ঠার দ্বারা —বৃহত্তর জীবনের আনন্দ অনুভব করেন। প্রাত্যহিক জীবনের কাজে, কর্মে, চিন্তায়, ভাবনায় গূঢ় অনুপ্রবিষ্ট আত্মাকে প্রকাশ করার সাধনাই জীবন-শিল্পীর সাধনা। আমাদের হৃৎপদ্মকে ফোটানোর জন্য, আত্মানং বিদ্ধির সাধনার জন্য আমাদের সাধনাই জীবন-শিল্পীর সাধনা। পথ ক্ষুরস্য ধারা। শ্রীরামকৃষ্ণের 'মন ও মুখ এক করা'র সাধনাই জীবন-শিল্পীর সাধনা।

যে সব পূতচরিত্রের সংস্পর্শে এলেই আমরা পাই আত্ম-সংবিৎ-উদ্ভাসিত মুক্তিপথের ইঙ্গিত, তাঁরাই রবীন্দ্রনাথের 'মহাত্মা', Carlyle-এর 'Inspired text'। সমরসেট মম অকুণ্ঠ ভাষায় শ্রদ্ধা জানিয়েছেন জীবন-শিল্পীকে: 'The pictures they paint, the music they compose, the books they write and the lives they lead, of all these the richest in beauty is the beautiful life. That is the perfect work of art'. (S. Maugham ; Painted Veil.)

নাভি-তীর্থ (মণিপুর)

শ্রীমতী শিবানী দত্ত

এ রাজ্যের শান্ত পাহাড়গুলি মানুষের সঙ্গে কথা কয়ে যায়; পাহাড়ের গায়ে মেশানো গাছগুলি আমাদের দিকে দুই হাত বাড়িয়ে ডাকে, পাহাড়ের অচল শিখরে যেন স্তব্ধ হয়ে আছে চলার স্রোত। এ দেশের যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে সত্য-সুন্দরের স্পর্শ। এ যে রুদ্রেশ্বরের দেশ! একদিন নটরাজের ডমরু-ধ্বনিতে জেগে উঠেছিল এদেশ।

***

আমাদের যাত্রা শুরু হলো ফাল্গুন শেষের গোধূলির আলো-ছায়ায়। গাড়ী ছুটে চলেছে আপন গতিতে। দেখতে দেখতে পশ্চিম আকাশে জ্বলে উঠলো দিনান্তের চিতা। আর তারই আলোয় নিজ নিজ শিরস্ত্রাণ রাঙ্গিয়ে উঠে দাঁড়ালো সাতটি পাহাড়। ততক্ষণে সভ্যতার বাতিও জ্বলে উঠলো। আমরা ক্রমশঃ এগিয়েই চলেছি, আমাদের গন্তব্যের পথে। আদি জননীকে দেখবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা মাথা কুটে মরছে আমাদের চিন্তার দুয়ারে। কেমন সে স্তব্ধ জলরাশি, কত শক্তিশালী, যার গর্ভে জন্মেছে সাত পাহাড়ের দেশ, যার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে দেবতা আর দৈববাণী! ক্রমেই আমরা এগিয়ে চলেছি পাহাড় আর খাদের মধ্যবর্তী চিকণ রাস্তার ওপর দিয়ে, যার গৈরিক দেহ এঁকে বেঁকে এগিয়ে গেছে পাহাড়েরই পদপ্রান্তে গাঁয়ের দিকে। ক্রমে চারদিক ঘিরে নেমে এলো সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার। অন্ধকারের সাথে সাথে স্তিমিত হয়ে গেল অরণ্যের মন্ত্রপাঠ, দেখতে দেখতে রুদ্রেশ্বরের মন্দিরে জ্বলে উঠলো বাঁকা চাঁদের ক্ষীণ প্রদীপ।

পেছনে জনপদকে রেখে আমরা এসে পৌছলাম স্তব্ধ জলরাশির পাশে অচল শৈল-শিখরে। দূর থেকে দেখলাম মাটির মাথায় শোভা পাচ্ছে গাঢ় নীল তারকাখচিত চাঁদোয়া। শুক্লপক্ষের স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে পড়েছে নীল জল-রাশির ওপর। একে ঘিরে রচিত হয়েছে কত পুরাণ-কাহিনী; তার প্রমাণ অবশ্য ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যাবে না।

সে কাহিনী বসন্তকালের—মহাদেবকে সঙ্গে নিয়ে কৈলাসবাসিনী কোন নূতন স্থানে বাস করতে চাইলেন। মহাদেব বেরিয়ে পড়লেন স্থান খুঁজতে, খুঁজে পেলেন না মনোমত স্থান। এমন সময় নারদের আর্বিভাব ঘটলো মর্তে, মহেশের পদপ্রান্তে; তাঁরই কাছে মহাদেব জানলেন এই প্রদেশের কথা। নারদকে সাথে নিয়ে মহাদেব এলেন উত্তরাপথে, দেখলেন দেশটি—সাতটি পাহাড় দাঁড়িয়ে রয়েছে একে অন্যকে অতিক্রম করে। তাদের পায়ে মাথা কুটে মরছে বিশাল নীলাম্বুরাশি। মুক্তি চাইছে তারা সাগরের সঙ্গে মিশবার জন্য। মৌন পাহাড়ের বুকে সে বার্তা বুঝি পৌছায় না। শুধু পাহাড় আর পাহাড়, একটুকুও সমতল ভূমি চোখে পড়ে না। সাত পাহাড় সেজে উঠেছে বসন্তের ডাকে। পাহাড়ের জলরাশির বুকে খেলে বেড়াচ্ছে গুচ্ছ গুচ্ছ নীলকমল। জায়গাটি বিশ্বম্ভরের খুবই পছন্দ হলো, আপন ত্রিশূলাগ্র দিয়ে সমস্ত জলকে সঙ্কুচিত করলেন এই সরোবরটির বুকে—যার বর্তমান নাম লোকতাক্ হ্রদ। অফুরন্ত জল-রাশির চঞ্চলতার শেষ হলো, স্তব্ধ হয়ে গেল তা চিরদিনের জন্য, ত্রিশূলাগ্র বুকে নিয়ে বেরিয়ে এলো বিরাট মালভূমি। নাম হলো

মণিপুর। উমা মহেশ্বর অধিষ্ঠিত হলেন সেখানে। মহেশ্বরের নৃত্যে মণিপুরের আকাশ বাতাস হয়ে উঠলো সঙ্গীতময়। তাইতো এদেশবাসী সবার কণ্ঠে গান। আজও প্রতি বৎসর শিবপর্বতে উৎসব হয়ে থাকে। বৈশাখের মেঘ এসে শিব-শিবানীকে জানিয়ে গেল ফিরে যাবার আহ্বান। ফিরে যাবার কালে মহেশ্বর অনন্তনাগকে দিয়ে গেলেন ষোলশো প্রমিলাসহ এ রাজ্যটি। তাই এর আর এক নাম "প্রমিলা-রাজ্য।" এই অনন্তনাগ "পাখাংবাই" হলেন মৈতাই-পুরাণের আদি পিতা। মৈতাইরা তাঁরই বংশধর। কথিত আছে এ হ্রদের জল দিয়ে শিবপূজো করলে সর্ব-সিদ্ধি লাভ হয়; তাই মৈতাইরা বহু দূর দূরান্ত থেকে এ জল নিয়ে যায়, যেমন আমরা নিয়ে যাই গঙ্গাজল।

*

রাত্রি হয়ে যাওয়ায় আমরা আগের দিন লোকতাকের কাছেই একটি পাহাড়ী ডাকবাংলোয় উঠেছিলাম। ডাকবাংলোটি নাতিউচ্চ টিলার ওপর। ভোর বেলা আবার যাত্রা শুরু হলো। কথা রইলো রৌদ্রের তেজ বাড়ার আগে ফিরে আসব। কারো মুখেই কথা নেই, পাহাড়ী প্রভাত আমাদের তারই মতো নির্বাক করে তুলেছে। উচ্চে দেখা গেল শৈলচূড়া মোটেই সুক্ষ্ম নয়, একেবারে খাঁদা আর তারই ঢলে প্রকৃতি বসেছে পণ্যসম্ভার ফলফুল সাজিয়ে। প্রকৃতির খেলা দেখে অবাক হতে হয়। পাহাড়ের গায়ে ফুটে আছে শ্বেতবর্ণ উথাম্বাল (গাছ-পদ্ম)। কত নাম না জানা পাখির গান, কত বনফুলের সমারোহ! নেমে এলাম ফেলে যাওয়া পথে। ফিরে আসার সময় চোখে পড়লো একদল মেয়ে চলেছে, মাথায় তাদের তিনটে থেকে পাঁচটা পূর্ণকুম্ভ, অথচ অবলীলাক্রমে তারা প্রায় ছুটে চলেছে বাড়ীর পথে। অদ্ভুত এদেশের লোকের স্বাস্থ্য। এদের অনেকেই হিন্দু; তবে চার্চের দুয়ারেও ভিড়; দেখলে মনে হয় চার্চের ভক্তের সংখ্যাই বেশী। হিন্দু পর্বতবাসীরা প্রায় সবাই রুদ্রেশ্বরের পূজারী। পর্বত বিজয় করে যখন ফিরে এলাম বাংলোর দিকে তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। বাংলোয় ঢোকার মুখেই চোখে পড়লো একটি 'গোরস্থান'; সামনে রাখা হয়েছে প্রকাণ্ড একটি মহিষের শিং, মধু অর্থাৎ মদ্য, একটুকরো লাল রেশমী কাপড়, আরো কত কি। পরে শুনলাম শিংটি হলো কৃতজ্ঞতা আর সম্মানের নিদর্শন, যত বড় হয় ততই ভালো। মদ্য তো দিতেই হয়। আর লাল রেশমী কাপড়টি মুক্তির জয়কেতন। এসব নাকি আত্মার শান্তির জন্য। মৃত্যুকে ওরা আনন্দ ব'লে ধরে নেয় কারণ মৃত ব্যক্তি দুঃখ কষ্ট জরা থেকে মুক্তি পেলো। বরং জন্ম হলেই তারা দুঃখিত হয়। তাচ্ছিল্য আর দুঃখ প্রকাশ করতে তারা বাধ্য নবজাতকের মঙ্গলের জন্যই, কারণ সে দুঃখের পৃথিবীতে এলো। কিন্তু এই প্রথার মর্ম আজো অজানা রইলো—নবজাতকের প্রতি তাচ্ছিল্য কেন? নতুনকে বরণ করাই যেখানে মানুষের প্রাণধর্ম, সেখানে এ আচরণ অদ্ভুত। জীবনমৃত্যু সম্পর্কে এদের এই অদ্ভুত আচরণের কথা জেনে জীবনকে অন্য দৃষ্টিতে বিচার করে দেখবার অবসর আর পেলাম না। চলে এলাম হ্রদের পথে।

দূর থেকে চোখে পড়লো জলের রেখা কিন্তু প্রথম বুঝতে পারিনি। সাদা একটি রেখা ছাড়া কিছুই চোখে পড়ছিলো না। আঁকাবাঁকা

পাহাড়ী পথ। চারিদিকে দেবদারু গাছ। শুনেছি আরো কিছু এগিয়ে গেলে পাইনের বন চোখে পড়ে। এখানে মাটি শ্যামল। তারই বুক চিরে যে গৈরিক নতুন পথটি তৈরী হয়েছে, আমাদের গাড়িটি ছুটে চলেছে সেই পথে। গোধূলি থাকতেই গিয়ে পৌছলাম পাহাড়ের উপর টুরিষ্ট হাউসে। এখানে দাঁড়ালে বহুদূর ছড়ানো গ্রামগুলি চোখে পড়ে। চারিদিকে শুধু জল আর জল; হ্রদ যে এত বড় হতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না। পাহাড়ের আরাম কেদারা। তার পাশ ঘেঁসে ছুটে চলেছে ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকা। গাঢ় নীল জলের বুকে ভাসছে সাদা হাঁসের পাল, দূরে জলের ধার ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে বক এবং অন্যান্য পাখি। জলের মধ্যে ছোট ছোট বালুর চরে বাসা বেঁধেছে এদেশের হুলিয়া শ্রেণীর লোকেরা; যারা এ হ্রদের গাইড। এদের ঘরগুলি যেন জীবন্ত ছবি। উন্মুক্ত আকাশের নীচে শান্ত উদার জলরাশি। অসীম স্তব্ধতার বুকে মাঝে মাঝে ঢেউ তুলছে উত্তাল বাতাস। কবে কোন্ যুগে তারা মুক্তি চেয়েছিল, সাগর-সঙ্গমে যেতে চেয়েছিল; আজ তারা কত শান্ত, কত স্তব্ধ! ধীরে ধীরে নীল জল কালো হয়ে উঠলো। মনে হচ্ছিল আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি যুগান্তের পারে। যেখানে মানুষের পদশব্দ পৌঁছায় না। নতুন করে উপলব্ধি করলাম নীরবতাই মানুষকে অন্তর্মুখী করে।

সেখানেই রাত কাটিয়ে নেমে এলাম পাহাড়ের পাদপ্রান্তে। ভোরের আলোছায়ায় অনন্ত নীল পবিত্র জলকে ছুঁয়ে নিজেকে পবিত্র করলাম। কিছু হলুদ আর গৈরিক মাটি, আর একরকম ছোট ছোট দুধের মতন সাদা পাথর কুড়িয়ে নিলাম। মনে মনে একটি প্রণাম জানিয়ে এলাম এত সুন্দর পৃথিবীর পায়ে।

এবার সমতল যাত্রাপথ। এবার দেখবো ঐতিহাসিক ভূমিকে। জায়গাটির নাম "মৈরাং"। উঁচু-নীচু পথ ভেঙ্গে যেতে চোখে পড়ে নানা ধরনের মন্দিরের চূড়া। আরো কিছু এগিয়ে পুরো মন্দিরগুলিই চোখে পড়লো; নেমে কয়েকটিকে দর্শনও করলাম। মৈতাইদের পরিচ্ছন্নতা দেখবার জিনিস। ঝক্ ঝক্ করছে প্রতিটি মন্দিরপ্রাঙ্গণ। দেবতা দর্শন করলাম; রাধাকৃষ্ণের মূর্তিই বেশী, অবশ্য সাথে আরো অনেক দেবতা আছেন, যাঁদের সবার নাম আমার অজানা। আমরা প্রণামী দিলে ওরা আমাদের একটি কলাপাতার থালায় করে প্রসাদ হিসাবে কিছু ফুল, ক'টুকরো পদ্মের মৃণাল আর একটি আরতির সলতে দিল। বেরিয়ে এলাম মন্দির থেকে।

মন্দিরস্থাপত্যে আমার জ্ঞান বিশেষ নেই। সরল স্থাপত্যের বুকে যদি কোন নিখুঁত শিল্প লুকিয়ে থাকে, তা আমার চোখকে ফাঁকিই দেবে। মন্দিরগুলি দু-চালি আর চার-চালি। অন্দরমহলে রাধামাধব জিউ, নিত্যানন্দ। গোবিন্দজীর মূর্তিই বেশি। অবশ্য প্রত্যেক মন্দিরেই সংলগ্ন প্রকোষ্ঠে আছে রুদ্রেশ্বরের আসন। মূর্তিগুলি নিঃসন্দেহে সুন্দর। প্রত্যেক পল্লী আর ব্রাহ্মণবাড়ীতেই আছে দেবমন্দির, অন্ততঃ ধ্বজাশোভিত একটি খড়ের চালাঘর। এগিয়ে গিয়ে পেলাম সত্যকার শিল্পকে। যার সাথে মিশে আছে এ প্রান্তের নাম আর মৈতাই-ইতিহাসের একটি অধ্যায়—সে হলো মৈরাং-থৈবীর মূর্তি। এর পেছনে আছে একটি কাহিনী। একই গল্পের দুই রূপ, অর্থাৎ গল্পের আরম্ভ এক কিন্তু উপসংহারটি কিছু অদল বদল। থৈবী ছিলেন মৈরাং রাজার কন্যা। চিত্রাঙ্গদার বংশের মেয়ে। থৈবী ছিলেন অসিযুদ্ধে অপরাজেয়। তিনি

পণ করেছিলেন, যে তাঁকে পরাজিত করতে পারবে, তাকেই তিনি বরমাল্য অর্পণ করবেন। তাঁকে পরাজিত কেউ করতে পারেনি, কিন্তু সেনাপতির পুত্র খাম্বাকে তিনি মনে মনে বরণ করেছিলেন ব'লে তার কাছে স্বেচ্ছায় পরাজয় স্বীকার করলেন। রাজাকে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও শেষে বিবাহ দিতে হল। কিন্তু উৎসব-মুখর প্রাঙ্গণেই নাকি কোন দেবতার অভিশাপে এই দম্পতির দেহ প্রস্তরীভুত হয়ে যায়।

সেখান থেকে আমরা এগিয়ে গেলাম আরো কিছুদূর। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ঘাসের ওপর শেষ বেলার রোদ চিকচিক করছে। মনে হলো কিছু আগে এদিকে বোধ হয় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখানে এরকম প্রায়ই হয়ে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে আমরা উপস্থিত হলাম গত মহাযুদ্ধের একটি নিদর্শনের পাশে—যা জাতির কাছে তীর্থবিশেষ। একটা বিরাট ঢালু ঢিবি, তারই ওপর তৈরী হচ্ছে আই. এন্. এ. মেমোরিয়াল। নেতাজী এখানেই তুলেছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম বিজয়কেতন। শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে দেখছি, এমন সময় মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল এক ঝাঁক বুনো হাঁস। তারা ঘরে ফিরছে। তাদের পাখার শব্দে চমকে উঠলাম, মনে হলো কেউ যেন আমায় স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেল—

"স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।"

তার কিছুক্ষণ পরেই আমরা বাজার ঘুরে সেখান থেকে ফিরে এসেছিলাম অন্য পথে, সে রাস্তা হলো বিষণপুরের পথ। সেখানে দুদিন থাকা হলো। প্রথম দিন সকাল বেলা ঘুরতে বেরুলাম। বাজারের কাছে গাড়ী থামলে গাড়ীতে বসে বসেই চারিদিক দেখছি। চোখে পড়লো বাঁ-পাশের একটি পাহাড় থেকে দলে দলে মেয়েরা নেমে আসছে, সকলেরই পরনে 'উড়াই'রং 'ফানেক' আর সাদা 'ইনাফি'; মিছিলটা ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিলো। একজনকে জিজ্ঞেস করে শুনলাম আজ "চম্পকচতুর্দশী"। আজ তারা নিজেরাও চাঁপাগুচ্ছে সাজবে, ঠাকুরকেও সাজাবে। আমারও ইচ্ছে হলো শিবের মাথায় একটু জল দিয়ে আসার। পাহাড়ের ওপর দুগ্ধধবল মন্দিরটি যেন আকর্ষণ করছে। এই মন্দিরকেও ঘিরে আছে একটি লোকগাথা। একজন ব্রাহ্মণকন্যা এখানে শিবের পূজারী ছিল। তার পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে চম্পকচতুর্দশীর দিন ভূতনাথ রুদ্রেশ্বর তাকে দর্শন দিয়েছিলেন। সেই স্মৃতি নিয়েই এখানে গড়ে উঠেছে এই মন্দির। সেই থেকে আজও এইদিন বিশেষ পূজো হয় এখানে। মন্দিরে পৌঁছে দেখলাম বড় একটি তাম্রপাত্রে চাঁপা-ছিটানো জল রাখা আছে শিবের মাথায় দেবার জন্য, সাথে আছে একটি কলাপাতার চামচ

শিবলিঙ্গের সামনে জ্বলছে সারি সারি ঘিয়ের প্রদীপ। লক্ষ্য করার জিনিস, মন্দিরটির কোন ভিত নেই, পাহাড়ের গায়ে উঠেছেন লিঙ্গ আর তার চার পাশ থেকে দেওয়াল তুলে দেওয়া হয়েছে। পূজা সেরে মনের মধ্যে এক নিবিড় আনন্দ নিয়ে নেমে এলাম গ্রামের ভিতর। কি সুন্দর গ্রামটি! আশে পাশে এতটুকু নোংরা নেই। দেখলেই বোঝা যায় এটা 'মৈতাই-লাইকাই', বিরাট বিরাট সব বাড়ী। প্রায় প্রতিটি বাড়ীই আপাদমস্তক নীল সাদা কিংবা গৈরিক মাটিতে সুনিপুণভাবে নিকানো। প্রত্যেক বাড়ীতেই একটি সবজি বাগান, তুলসী-গাছ ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস আছে।

দেখলাম বাসনপত্র সব পিতলের। মণিপুরী বাড়ীতে আজও চিনামাটি আর এনামেলের সাম্রাজ্য বিস্তার হয়নি। ঘুরতে ঘুরতে একটি বাড়ীতে পৌছলাম, এখানেই আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এখানে এসে আবার সবার সাথে মিলিত হলাম। বিকেল বেলা সবাই মিলে রওনা হলাম গ্রামের কেনাবেচা দেখতে। বিকিকিনি সবই করে মেয়েরা; এসব ব্যাপারে পুরুষেরা গৌণ। মাথায় বোঝা, পিঠে ছেলে নিয়ে কেমন চলে এরা, সেটা দেখবার মত বৈকি! আজকাল অবশ্য পুরুষেরা মুখ্য হয়ে উঠছে। বাড়ী ফিরে এলাম। এমন গ্রাম দেখে সত্যই আনন্দ হয়। গরীব কি নেই? নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু কে একবেলা খাচ্ছে আর কে চারবেলা খাচ্ছে তা তাদের চেহারা দেখে বুঝবার উপায় নেই; যে একটাকার দিনমজুরী করছে সেও যখন দেবমন্দিরে যাবে তার গায়ে থাকবে একটি ধবধবে চাদর, পরনে থাকবে ততোধিক শুভ্র ধুতি। তাদের প্রতি জিনিসটি সত্যিই দেখবার মতো। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি পোষাক তাদের সবারই থাকবে। হয়তো সে ভিক্ষা করে খেতে পারে, কিন্তু ময়লা হয়ে রাস্তায় বেরুবে না। আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করলাম, তাদের জাতিবিচার আমাদের মতো প্রবল নয়। সঙ্গীত এবং নৃত্যশিল্প এদের জাতীয় সত্তা, এদের প্রায় সবাই কিছু গান গাইতে নাচতে এবং ছবি আঁকতে জানে। বাড়ী এসে দেখলাম যানবাহন দাঁড়িয়ে আছে আমাদের জন্য। চললাম। পথে দেখলাম, একটি বাড়ীর উঠানে বর্ষশেষ ও বর্ষারম্ভ উৎসব পালন করা হচ্ছে। মেয়েদের 'অতিথি আহ্বান' নৃত্য এবং শিশুদের' গোষ্ঠলীলা' খুব ভালো লাগলো।

পরদিনই আমরা সেখান থেকে চলে এসে-ছিলাম। এবার ঘরে ফেরার পালা এ-উপ নগরের ছবি চিরদিন মনের পটে আঁকা থাকবে। পাহাড়ের বুক চিরে তৈরী হয়েছে রাঙ্গা মাটির পথ, কৃষি-অফিস, স্বাস্থ্য-কেন্দ্র, আরো অনেক কিছু। এ দেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যাও অগণ্য। ফেরার পথে আরেকটি দিন থামলাম আরেকটি গ্রামে। এই গ্রামটিতে বাস আদি মৈতাইদের, অর্থাৎ এখনো যাদের ধর্ম সম্পূর্ণ আদিম, যদিও জীবনটা নয়। তারা ঘোর শৈব। পূজা করে ভৈরব আর সূর্যদেবতার। নিজেদের "সেনামাহী" বলে পরিচয় দেয়। এরা এখনো আদিম প্রথায় পূজা করে থাকে। তাছাড়া এই সম্প্রদায়ের সাধুদের সম্বন্ধে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে। এখানে এসেই প্রথম শুনলাম সূর্য-মন্দিরের কথা। শুনলাম নতুন পুরাণকাহিনী। এদের পুরাণে আছে, মৈতাইদের আদি লোক-গুরুর নাম হলো গুরু শিদাবা। গুরু শিদাবা হলেন সূর্যের পিতামহ আর পাথাংবা হলেন সূর্যের পিতা এবং মা হলেন দেবী সেনামেহী। এ গ্রামের অধিবাসীরা সেই সেনামেহী দেবীর সাধক। সেনামেহীকে আবার দেবীভৈরবীও বলে। পথে ক'জন সেনামাহী সাধুর দর্শন পেলাম কিন্তু আলাপ করতে সাহস হলো না। তাদের রুদ্র সজ্জা দেখলেই কেমন যেন ভয় করে। আর একটি জিনিস লক্ষ্য করার, এ গ্রামের অধিকাংশ লোকের গায়ের রং কালো, চেহারা বেশ উন্নত। সন্ন্যাসীদের প্রত্যেকের হাতে আছে সিঁদুর-মাখানো এক একটি বড় শঙ্খ; শুনেছি শঙ্খধ্বনি দিয়েই তারা একে অন্যকে আহ্বান করে।

*

আবার এসে পদার্পণ করলাম শহরের পথে, যাত্রা আর ফেরা একই জায়গায় এসে শেষ হলো। আকাশে তারা আর মাটিতে জোনাকী। ক্রমান্বয়ে তারা জলছে আর নিবছে, ভারি ভালো লাগলো আকাশ-মাটির এই খেলা।

পথের সন্ধানে

ব্রহ্মচারী প্রসূন

মন রে কৃষিকাজ জান না
এমন মানবজমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা ॥

—রামপ্রসাদ

বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানবমনের জটিলতা সরল করার প্রচেষ্টা চলছে। তাই মানবধর্মেরও নববিন্যাস সাধিত হচ্ছে ক্রমে ক্রমে। ধর্মবিজ্ঞানের অনুশীলন মানুষকে করতেই হবে কারণ তাতে সে যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাঁচার মত বাঁচতে শিখবে, পাবে জীবনধারণের উপযোগী প্রকৃতজ্ঞান। চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসার ক্ষেত্রে আদর্শ পন্থা অবলম্বন করতে শিখবে সে, শিখবে আদর্শ আত্মবিন্যাস বা সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ। আদর্শ আচরণবিধি শিখবে সে, শিখবে আদর্শ সমাজ গঠনের ধারা। আর জানবে সমস্ত জিনিসের অন্তর্নিহিত চরম ও পরম সত্যকে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও জগতের অন্যান্য সকল অবতার মহাপুরুষগণই বলে গেছেন, ঈশ্বরলাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। জীবনযাত্রীর ক্ষমতা ও জীবনের শ্রেণীভেদে পথও বিভিন্ন এই ঈশ্বরলাভের। জীবনের যে কোনও স্তর হতেই ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরাভিমুখে যাত্রা করতে পারে যদি তার পাথেয় হয় আত্মবিকাশের সাধনা। মানুষের অন্তরেই যে অবস্থান করছেন সেই ঈশ্বর, সেই অন্তরাত্মা। বর্তমানে পৃথিবীর মানুষ প্রতীক্ষা ক'রে রয়েছে সেই ধর্মের জন্য যে ধর্ম পৃথিবীর সকল মানুষের মাঝে আনবে সেই সহযোগিতা যার বলে বলীয়ান হয়ে তারা পরাভূত করবে মানবতার সকল সাধারণ শত্রুদের, দারিদ্র্য অত্যাচার ও যুদ্ধ—সকল রোগকে।

আধুনিক যুগের আধুনিক মানুষের কর্তব্য তাই যুগের জটিল সমস্যাগুলোর সমাধানের ক্ষেত্রে নিজস্ব অবদান সৃষ্টি করা,—রাজনৈতিক ও আদর্শগত বিদ্বেষের পরিবর্তে শান্তি, সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ আনয়ন করা, জাতিগত বিবাদ দূর ক'রে সাম্য আনয়ন করা, সকল মানুষের জন্য স্বাধীনতা, সম্বল ও শিক্ষা আনয়ন করা। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষদের উদ্দেশ্যের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্য এ ধরনের সার্বজনীন প্রচেষ্টার একান্ত প্রয়োজন। বুদ্ধ ও শঙ্করের বাণীর সমন্বয় ঘটিয়েছেন তাই স্বামী বিবেকানন্দ, যুগেরই প্রয়োজনে। তাঁর জীবন ও বাণীর মধ্যে আমরা সেই আহ্বানই শুনি যা বুদ্ধদেবের নৈতিক আদর্শবাদ ও শঙ্করাচার্যের আধ্যাত্মিক আদর্শবাদের এক সুষম মিলন ঘটিয়েছে। মানুষের নৈতিক জীবন অবশ্যই আধ্যাত্মিক সচেতনতার প্রকাশ, এ দু'টি জিনিস ভিন্ন থাকলে পূর্ণাঙ্গ হয় না।

বর্তমান বিশ্বের মানবমনের প্রধান উপাদান যুক্তি। বর্তমান বিশ্বের বিন্যাস পুরোপুরি যুক্তি-সংক্রান্ত। আধুনিক যুক্তিবাদী মন ধর্মের মাধ্যমে তাই চাইবে পরম সত্যকে—বহুর মাঝে ঐক্যের অনুভূতিকে। ঈশ্বরকে তারা চাইবে সম্বন্ধসূত্ররূপে যেখানে সমস্ত বস্তুজগৎ প্রবেশ করছে, অবস্থান করছে এবং সার্থকতা লাভ করছে। জীবনকে তারা দেখতে চাইবে কর্মে পরিণত ধর্ম হিসেবে।

বিজ্ঞানী মনের ধর্মজিজ্ঞাসা তাই সদা জাগ্রত। বিজ্ঞানী মন চায় এমন সত্য যা প্রয়োগ করা যাবে জীবনের প্রতি পদে পদে। মানবব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ আনয়ন করার

প্রচেষ্টার আশু প্রয়োজন বিজ্ঞানী মনের, প্রয়োজন সেই মহান শক্তির সূত্রাবলী নির্ণয় ক'রে সকল মানবসন্তানদের কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার। প্রকৃতির প্রথম নিয়মের বিবর্ধনই ধর্ম। ধর্ম হচ্ছে আত্মসংরক্ষণের ক্ষেত্রে মানব-আবেগের সেই অভিব্যক্তি যার দ্বারা মানুষ চায় পার্থিব প্রতিকূল প্রভাবের বিরুদ্ধে তার অন্তরের প্রধান উদ্দেশ্যকে বজায় রাখতে। ধর্ম তাই মানুষের জীবনসত্তার প্রধান ও অচ্ছেদ্য অংশ।

বিভিন্ন ধর্মের ভাবের আদানপ্রদান ক্রমশঃ জ্ঞানের পরিধিকে বর্ধিত করবে এবং অজ্ঞানতা, তা যতটুকুই থাক, দূর করবে,—এ আশা মানুষ স্বভাবতই করে। বিজ্ঞানের যুগে ভবিষ্যতের ধর্ম কি হবে মানুষের, এ কথা ভাবলেই মনে আসে যে, ধর্ম ক্রমশঃ নিজের সংজ্ঞা নিজেই দেওয়ার চেষ্টা করছে। মানুষের ধর্মীয় অভিজ্ঞতার উপরই প্রধান জোর পড়ছে বর্তমানের ধর্মব্যাখ্যায়। আধুনিক মানুষ তার কর্মব্যস্ত জীবনের সঙ্গে সাধারণভাবে প্রচলিত ধর্মব্যাখ্যার সঙ্গতি খুঁজে না পেলেও ধর্মাসক্তি ত্যাগ করতে তো পারছে না!

আত্মসংরক্ষণের এবং স্বচ্ছন্দ জীবনবাসনার প্রেরণায় যদি ধর্মের প্রয়োজনবোধ আসে তা হ'লে মানুষ ও তার পরিবেশের সমন্বয়ের প্রচেষ্টার সঙ্গে তা ক্রমশঃ জড়িত হবে এবং সামাজিক নিরীক্ষারও প্রেরণা জোগাবে। বর্তমানে জীবনের পরিসর অনেক বেড়েছে। বিজ্ঞান, শিক্ষা, রাজনীতি, দর্শন ও ন্যায়নীতি প্রভৃতি হচ্ছে জীবনের বিভিন্ন বিভাগ। মানুষের মন স্বভাবতই চাইছে তার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটাতে, নতুন ক'রে সংশ্লেষণ করতে। তাই মানুষের প্রচণ্ড কর্মপ্রগতির প্রভাবে ভবিষ্যতের নব ধর্মের বিপুল সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, যা সুরু হয়ে গেছে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের পুণ্য আবির্ভাবের সঙ্গে। ব্যক্তিজীবনে ধর্মের অবস্থান কোথায়, ধর্মের প্রভাব কি এবং ধর্মের অনুধাবনে মানুষের শক্তি কেমন ক'রে বৃদ্ধি পায়,—এ সব জিনিস মানুষ যখন প্রকৃতই জানতে পারবে তখন মানুষের জীবন নিঃসন্দেহে আরও মধুর হবে।

মানবজীবনে মনন যেমন, কর্মও সে রকম তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আত্মচেতনা ও কর্ম এ দু'টি মিলেই গঠন করে প্রকৃত মানব-সংস্কৃতি। সমস্ত জগৎ এক চিরন্তনী গতির মধ্যে অবস্থান করছে। মানুষ এর একটি একক। বিজ্ঞানী মন বস্তুজগৎকে ক্রমাগত বিশ্লেষণ ক'রে শেষে বুঝতে পারে যে, সকল বস্তুরই উৎস এক মহান শক্তি যার সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভবপর নয়। মানবাত্মা ও বস্তু-জগতের এই যোগসূত্রের আদি ও অন্ত নেই। মানুষের কর্মের মধ্যে শুধু যে বৃথা কষ্টই আছে, তা বলা যায় না। কর্মের মধ্য দিয়েও মানুষ পরম শান্তি লাভ করতে পারে। মানুষের প্রতিটি ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া রয়েছে। তাই মানুষ ক্রমশঃ নৈতিক জীবনোপযোগী কর্মময় জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হবে এ কথা ধ'রে লওয়া চলে। তাই এ সম্ভাবনার কথাও উদয় হয় যে, মানুষ উত্তরোত্তর বিভিন্ন ধর্মসূত্রে জ্ঞাত ঐশ্বরিক শক্তি ও সত্যের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে। মানুষের লক্ষ্য প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হওয়া। আর এটাই মনে হয় মানবাত্মার মুক্তির লক্ষণ। এ বিষয়ে মানবাত্মা নিজেই নিজের নিয়ন্ত্রণকারী, অন্য কোনও নিয়মকানুনের প্রয়োজন নেই। তাই কর্ম হবে তার উপাসনা। কারণ সে সমাজের জন্য কাজ করবে, সমাজকল্যাণের চেষ্টা করবে নিজের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই। সে বুঝবে নিজের কল্যাণের জন্য যা করা

প্রয়োজন সমষ্টিগত কল্যাণের জন্যও তা-ই প্রয়োজন।

সে ধর্ম তাই হবে মানবজীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান, কেবলমাত্র সমাজের একটি বিলাস বা ফ্যাশনের উপাদান নয়। সে ধর্ম হচ্ছে মানবের মধ্যে ঈশ্বরদর্শন, মানবাত্মার অন্তরের সম্পদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। যদি মনে করা যায় যে, এই মানবরূপে ঈশ্বরদর্শন কেবলমাত্র আদর্শ বা ধারণা তা হলেও স্বীকার করতেই হবে যে বিজ্ঞান ও রাজনীতিপ্রধান বর্তমানের এই চলমান বিশ্বের কর্মপ্রণালীর সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য সূত্র এই ধর্মবিজ্ঞান।

আমরা চাইব সেই ভবিষ্যতের দিকে যখন প্রতিষ্ঠানগত ধর্মের প্রয়োজন আর থাকবে না, যখন মানবসমাজ সেই স্তরে উন্নীত হবে যেখানে দৈনন্দিন আধ্যাত্মিক সত্য তার কাছে সদা জাগ্রত থাকবে। এই কর্মমাধ্যমে ধর্ম অশুভ ভাবকে পরাজিত করবে, এর পূজা ও ধ্যানপদ্ধতি হবে প্রয়োগধর্মী সেই প্রকার কর্ম ও বিশ্বাস যা স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত কিন্তু মানবীয় ধারায় সার্থকরূপে মহিমান্বিত। আধুনিক বিজ্ঞান অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই ধর্মকে।

বিশ্বরঙ্গমঞ্চে আমরা দেখছি কত বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মানুষের এক বিরাট সমাবেশ। তার সমন্বয় সাধিত হ'তে পারে একমাত্র ধর্মের বৈজ্ঞানিক পুনরীক্ষণের দ্বারা। বিশ্বের আধুনিক ঋষি বিবেকানন্দের প্রদর্শিত আলোকে বেদান্তের অবদান থাকবে এই পুনরীক্ষণের মধ্যে। হিন্দুমতে একত্বই সত্য, বহুত্ব মিথ্যা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, এই এক নিত্য বস্তুই একই মনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নভাবে অনুভূত হয়ে এক ও বহুরূপে প্রতিভাত হয়। এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক যুক্তিসঙ্গত।

ভবিষ্যতের ধর্ম হবে গতিশীল জগতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এগিয়ে চলার আহ্বান। এ ধর্ম মানুষকে শক্তি দেবে, অন্তরাত্মাকে করবে বিকশিত, জগৎকে করবে প্রকৃতপক্ষে সুখসম্পদের ক্ষেত্র, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানকে দেবে বাস্তবরূপ। এক বিশ্বের আদর্শ হবে এর মূলসূত্র। এ ধর্ম নিজ প্রভাবে বিশ্ব রাজনীতির মধ্যে আনয়ন করবে মানবিকতা-বোধ। গতিশীল জগৎ এখন যে পর্যায়ে তাতে মানুষের ধর্মেরও যে নববিকাশ হবে,— এ ধারণাই বৈজ্ঞানিক যুক্তিসঙ্গত। বর্তমানের বিজ্ঞানী মন চাইবে, ধর্ম তার মানসিক জগতে আনবে বিশ্বাস ও ধারণার ক্ষেত্রে দেবে বোধগম্য ও বুদ্ধিদীপ্ত এক অর্থ। কারণ ধর্মই মানুষের আবেগ ও ভাবকে নিয়ন্ত্রিত করে। বর্তমানের মানুষের আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম হোক তার সমাজ ও দেশের বিভিন্ন বৈষম্যের মধ্যে সমন্বয়যন্ত্র, ধর্ম করুক প্রত্যেকটি মানুষকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উৎপাদনাত্মক জীবনের অধিকারী। বর্তমানের মানুষের ধারণায় ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধের অস্তিত্ব অভিন্ন হতে পারে না। বর্তমানের বিশ্লেষণকারী মানবসত্তা সর্বাগ্রে স্থান দেবে সেই ধর্মকে যে ধর্ম তাকে উন্নত মস্তকে দাঁড়াতে শেখাবে এবং উন্নত শ্রেণীর কার্যে প্রেরণা দেবে।

উপনিষদের অমৃতবাণীর মধ্যে এই বিজ্ঞানী মনের আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর মিলে যায়। নিত্য অনুষ্ঠিত সত্য, তপ, সম্যক্ জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্য দ্বারাই এই আত্মা লভ্য। আত্মাই অনুভবনীয়, শ্রবণীয়, বিচার্য ও নিশ্চিতরূপে ধ্যেয়। আত্মাকে জানলেই সব জানা হল, কারণ আত্মাই সব। ধীমান ব্রহ্মজিজ্ঞাসু সেই

আত্মার বিষয় জেনে প্রজ্ঞা অবলম্বন করবেন। উপনিষদের মূল বক্তব্য—স্বরূপতঃ আমরা সকলেই ব্রহ্ম।

স্বামীজী বলেছেন, "ধর্ম মানুষের অন্তরের অপরিহার্য অঙ্গ…জীবনমাত্রই অন্তর্জীবনের বিবর্তন।…ধর্মবিজ্ঞান মানবাত্মার বিশ্লেষণ-মূলক। উপলব্ধিই ধর্ম।…আমরা চাই কর্মে পরিণত ধর্ম।…ধর্ম এমন একটি ভাব, যাহা পশুকে মানুষে ও মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে।…বেদান্ত সাধারণতন্ত্রী ঈশ্বরকেই প্রচার করে।…বেদান্ত আমাদিগকে কি শিক্ষা দেয়? প্রথমতঃ বেদান্ত শেখায় যে, সত্য জানিতে হইলে মানুষকে নিজের বাহিরে কোথাও যাইবার প্রয়োজন নাই।…সময় আসিতেছে যখন মহান মানবগণ জাগিয়া উঠিবেন এবং ধর্মের এই শিশুশিক্ষার পদ্ধতি ফেলিয়া দিয়া তাঁহারা আত্মা দ্বারা আত্মার উপাসনারূপ সত্যধর্মকে জীবন্ত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিবেন।"

প্রার্থনা

শ্রীবেণু বন্দ্যোপাধ্যায়

'মানুষই দেবতা' এ মহা বারতা
ঘোষিলে কে তুমি বীর,
বিবেকানন্দ, অগ্নিসাধক,
(তব) চরণে নোয়াই শির!
ধ্যানেতে তোমার হ'ল দরশন
নরের হৃদয়ে জাগে নারায়ণ,
বজ্রনিনাদে ঘোষিলে সে বাণী,
ভাঙ্গিলে মোহপ্রাচীর ॥

রুদ্র, তোমার বেজেছে বিষাণ
নরদেবতার ওঠে জয়গান—
বিশ্ব জুড়িয়া জাগিছে মানুষ
উন্নত করি শির!
জাগিছে, তবুও তারা পথহারা
ছুটিছে আঁধারে পাগলের পারা—
দীপ্ত সূর্য! রশ্মি তোমার
ঘুচাক ঘোর তিমির

সমালোচনা

খাপখোলা তলোয়ার : সুমণি মিত্র। বিবেক-ভারতী, ৫৭, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯। পৃঃ ৪৭৯ ; মূল্য আট টাকা।

তাঁর 'নরেন' সম্বন্ধে ঠাকুর বলতেন; 'খাপখোলা তলোয়ার'। সুমণি মিত্র তাঁর তিন খণ্ডে পরিকল্পিত বিবেকানন্দ-জীবনভাষ্যের প্রথম খণ্ড 'সপ্তর্ষির ঋষি' গ্রন্থে স্বামীজীর জীবনের মূল পর্বটি বিশ্লেষণ করে সুধীসমাজের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডটি আধুনিক জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়করূপে স্বামীজীর সংগ্রামী-সত্তার অন্তরঙ্গ রূপায়ণ, সেদিক থেকে 'খাপখোলা তলোয়ার' নামটি সমগ্র গ্রন্থের তাৎপর্য সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। বিবেকানন্দ-ভাবধারায় প্রদীপ্ত লেখকের ভাষাও এ গ্রন্থে যেমন শাণিত, তেমনি বহুবিস্তৃত মনন ও অধ্যয়নে সুসমৃদ্ধ। পূর্ববর্তী গ্রন্থের মতো এ গ্রন্থেও পাদটীকায় লেখকের সুপরিণত চিন্তার ঐশ্বর্য পাঠককে বিস্ময়াবিষ্ট করে রাখে। গ্রন্থের আদ্যন্ত তাঁরই স্বহস্ত-অঙ্কিত চিত্রনিদর্শনগুলি লেখকের ভক্তিসমুজ্জ্বল অনুভবজগতের লাবণ্যে এক অখণ্ড ভাবতাৎপর্যের সৃষ্টি করেছে।

'খাপখোলা তলোয়ারে'র আটটি অধ্যায়ের মধ্যে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তৃতীয় অধ্যায় : স্বামীজীর যুক্তিবাদ ; চতুর্থ অধ্যায় : সংগ্রামী সন্ন্যাসী ; পঞ্চম অধ্যায় : নর-নারায়ণ-বাদ। রুচিভেদে অন্যান্য অধ্যায়ের প্রতিও পাঠকদের অনুরাগ হওয়া স্বাভাবিক। তবে লেখকের বক্তব্য সবচেয়ে সুবিশ্লেষিত ও সুসংহত ঐ তিনটি অধ্যায়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই এ গ্রন্থের শেষদিকে অনেক পরিমাণে দেখা দিয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে সারদাদেবীর কথাও এসেছে। এ সব-কিছুই লেখক তাঁর বিচিত্র কথনকৌশলে একই সঙ্গে একান্ত ঘরোয়া অথচ রীতিমতো বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপিত করেছেন। বইটি পড়তে পড়তে অনেক সময়ই মনে হয়েছে, কবিতার বাহ্য আবরণটুকু ত্যাগ করে সম্পূর্ণ প্রবন্ধকাররূপে দেখা দিলেই লেখক হয়তো পাঠকসমাজে বেশী স্বীকৃতি পেতেন। কিন্তু সব আভিধানিক সংজ্ঞার বাইরে নতুন সাহিত্যকৃতির মূল্যও কিছু কম নয়। এ ক্ষেত্রে অন্ততঃ বেশী।

বিবেকানন্দ-মননের অন্যতম অপরিহার্য এই গ্রন্থটি প্রকাশে যিনি এবং যাঁরা সহায়তা করেছেন, তাঁরা সকলেই জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন। বিপুলকায় অন্তঃসারহীন তথাকথিত "উপন্যাস" রচনার ভীড়ে তাঁরা অন্ততঃ এটুকু প্রমাণ করেছেন যে, কেবল পৃষ্ঠা ও মূল্যের অঙ্কে সাহিত্যের মূল্যবিচার হয় না—একথা মনে রাখবার মতো সুস্থবুদ্ধি কিছু লোক এখনও এদেশে আছেন।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

চয়ন। শ্রীপ্রমথভূষণ রায়চৌধুরী। প্রকাশক—শ্রীহরিদাস ঘোষ, ৭৪এ, চক্রবেড়িয়া রোড নর্থ, কলিকাতা ২০। পৃষ্ঠা ১৬২ ; মূল্য ৫৲।

গ্রন্থখানির অবতরণিকায় শ্রীমধুসূদন বেদান্তশাস্ত্রী লিখিয়াছেন : "দর্শনশাস্ত্র অতীব দুরবগাহ্য তথাপি শাস্ত্রব্যসনী ৯২বৎসরবয়স্ক বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত প্রমথভূষণ রায়চৌধুরী মহাশয় অতিশয় স্থৈর্য ও উৎসাহকারে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, ষড়্দর্শন-রূপ তীব্র কণ্টকাকীর্ণ মহামহীরুহে আরোহণ করিয়া যাহা চয়ন করিয়া 'সূত্রে মণিগণা ইব' নিজের প্রাঞ্জল ভাষায় 'চয়ন'-গ্রন্থে উপন্যস্ত করিয়াছেন তাহার তুলনা মিলে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না।" গ্রন্থটি আদ্যন্ত পাঠ করিলে এই কথার যাথার্থ্য উপলব্ধ হয়। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

Shri Ramakrishna Souvenir—1966. Institute of Social Education and Recreation, Ramakrishna Mission Ashrama, Narendrapur, 24 Parganas. Pp. 146.

আলোচ্য স্মরণিকাটি নানা দিক হইতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে : বিশিষ্ট লেখকগণের সুলিখিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী, উৎকৃষ্ট কাগজে শোভন মুদ্রণ, সুন্দর চিত্রের সন্নিবেশ।

"Ramakrishna Mission Ashrama, Narendrapur" প্রবন্ধে প্রতিষ্ঠাকাল হইতে আশ্রমটির ক্রমোন্নতি পরিস্ফুট। "Institute of Social Education and Recreation, Ramakrishna Mission Ashrama" সচিত্র প্রবন্ধটিতে সমাজশিক্ষা ও উন্নয়নমূলক কর্মধারার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

Our Traditional Values and National Culture—The Call of the Gita by Dr. Kailashnath Katju, Need for Spiritual and Moral Teachings in Educational Institutions by Sj. Saraswathi Gourishankar, Bengal in the Nineteenth Century by Hiranmay Banerjee, Sankara and Ramanuja by Swami Adidevananda. The Secret of Tapas by Dr. K. M. Munshi—প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা: ইউনাইটেড ষ্টেটস্ ইনফরমেশন সার্ভিস, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৮১।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের রূপ লইবার পর ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর যে সংবিধানটি মঞ্জুর হয় ও যুক্তরাষ্ট্রের ১৩টি আদি রাষ্ট্রের দুইতৃতীয়াংশ দুই বৎসর ধরিয়া যাহাকে স্বীকৃতি দান করে এবং পরবর্তী কালে বিভিন্ন সময়ে সংশোধিত হইয়া যাহা বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে, এই সচিত্র পত্রিকাটিতে পৃথিবীর সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রাচীনতম লিখিত সেই সংবিধানের ক্রমবিকাশ ও বর্তমান রূপ সুষ্ঠুভাবে পরিবেশিত হইয়াছে। কংগ্রেসের কর্ম-পদ্ধতি, আইন-প্রণয়ন-রীতি প্রভৃতি বিস্তারিত নির্ভরযোগ্য বিবরণও পত্রিকাটিতে পাওয়া যাইবে।

Common Words—(A simple English-Bengali Dictionary for boys and girls)—Compiled by Sures C. Das, M. A. General Printers & Publishers P. Ltd. Calcutta 13. Pp. 200, Price Rs. 2/-.

পাঁচ হাজার প্রচলিত ইংরেজী শব্দের এই অভিধান-প্রকাশ অভিনন্দনযোগ্য। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ এই পুস্তকখানি কাছে রাখিলে বিশেষ লাভবান হইবে সন্দেহ নাই। অভিধানখানির বৈশিষ্ট্য : নির্বাচিত ইংরেজী শব্দের সহজ বাংলা অর্থ, প্রত্যেক শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ, কোন কোন শব্দের ব্যাখ্যামূলক অর্থ স্থলবিশেষে অর্থবোধ সুস্পষ্ট করিবার জন্য চিত্র দেওয়া হইয়াছে। অভিধানটি যে ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, ইহার দ্বিতীয় সংস্করণই তাহা প্রমাণ করে।

বাণী ও প্রার্থনা (পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)। পরমশরণানন্দ-সঙ্কলিত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বানপ্রস্থ আশ্রম, দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা ৩৫। পৃষ্ঠা ১৭৮; মূল্য ২৲।

প্রার্থনা ও স্তোত্রাদি, প্রার্থনা-সঙ্গীত ও বিবিধ প্রসঙ্গ—এই তিনটি স্তবকে ব্যাপ্ত সংকলনগুলিতে সংকলয়িতার উত্তম রুচিবোধের পরিচয় বিদ্যমান। দ্বিতীয় সংস্করণটি আরও জনপ্রিয়তা লাভ করিবে, মনে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কেন্দ্রের প্রধান কার্য আধ্যাত্মিক ও সাধারণ শিক্ষা বিস্তার। প্রতি সপ্তাহে ক্লাস ও বক্তৃতা এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয়।

'বিবেকানন্দ তামিল বিদ্যালয়' এবং 'সারদা দেবী তামিল বিদ্যালয়'—সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত এই বিদ্যালয়-দুইটিতে আলোচ্য বর্ষে ২৮১ জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করিয়াছে। তামিল ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হইলেও ছাত্রছাত্রীগণকে জাতীয় ভাষা (Malay) এবং ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য নৈশ বিদ্যালয়ে তামিল ও ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গ্রন্থাগারে ইংরেজী, তামিল, মালয়ালম, হিন্দী ও বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের ৪,৯৫৯ খানি পুস্তক আছে, আলোচ্য বর্ষে ৩৮৫ খানি নূতন বই সংযোজিত হয়। পাঠাগারে ৮টি দৈনিক ও ৫২টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। শিশুদের জন্য একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ছাত্রাবাসে ৫৫টি ছাত্র ছিল। ছাত্রাবাসটি মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত। বিদ্যার্থীরা নিয়মিত প্রার্থনা-ভজনাদি ও খেলাধুলার মাধ্যমে মানুষ হইতেছে। ৮ হইতে ১৭ বৎসরের আশ্রম-বালকবৃন্দ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র।

আলোচ্য বর্ষে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দ আশ্রমের বাহিরে বিভিন্ন স্থানে ১৫টি বক্তৃতা দেন।

আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা হয়।

উৎসব-সংবাদ

ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব গত ২২শে ফেব্রুআরি যথারীতি উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রত্যুষে মঙ্গলারাত্রিক, মধ্যাহ্নে ষোড়শোপচারে পূজার্চনা, ভজন, অপরাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও আলোচনা হইয়াছিল। তৎপর সান্ধ্য আরাত্রিক সম্পন্ন হয়। মন্দির-প্রাঙ্গণে আয়োজিত আলোচনা-সভায় পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্ত, বিদ্যুৎ ও জলসেচ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মং শু প্রু চৌধুরী ইংরেজীতে সংক্ষিপ্ত মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ অনুসরণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে বিশ্বের সংঘাতবিক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনাদর্শ অনুসরণ করা অতি প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ব্রহ্মচারী সুকুমার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদার ধর্মমতের ব্যাখ্যা করেন। প্রাদেশিক পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী জনাব আবতুল মোত্তালিব ভুঁইয়া রামকৃষ্ণ মিশনের সমবেত উপাসনা ও কর্মপদ্ধতির প্রশংসা করেন। এই উৎসব উপলক্ষে প্রায় এক হাজার লোক বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

গত ১৫ই ফাল্গুন অপরাহ্নে ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা

তমলুক, গোপ-মহিলা কলেজ—মেদিনীপুর, চিঁচড়া, মাতৃমন্দির—জয়রামবাটী, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ—কামারপুকুর, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ—কোয়াল-পাড়া, সুভাষ হাইস্কুল—গরগড়িয়া, সারেঙ্গা, শ্যামাপদ উচ্চ বিদ্যালয়—বিক্রমপুর, রায়পুর হাইস্কুল, বনমালী বিদ্যামন্দির—তপ্তদামদী, মণ্ডলগুলি, মণিপুর, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—কাঁথি, পারুলিয়া-হাইস্কুল, বিজয়কৃষ্ণ জাগৃহি বাণীপীঠ—ম'রিশদা, নেতাজী মিলন সঙ্ঘ—কুমীরদা, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়—বনমালী চট্টা, জীবনকৃষ্ণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়—নাচিন্দা, বলাগেড়িয়া, আদর্শ বিদ্যাপীঠ—খেজুরী, গুরুপ্রসাদ বালিকা বিদ্যানিকেতন—কুঞ্জপুর, চতুর্ভুজচক প্রাথমিক বিদ্যালয়—ঘাটকুমারী, খেজুরী, রামকৃষ্ণ বিদ্যাভবন—খানিপুর, আজুয়া, বেলদা ইত্যাদি স্থানে 'বিশ্বসভ্যতায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অবদান', 'জাতীয় জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও যুগাচার্য বিবেকানন্দ', 'যুগধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ', 'ভারতীয় নারীজাতির আদর্শ ও মাতা সারদাদেবী', 'শিক্ষা ও ছাত্রজীবন' ইত্যাদি সম্বন্ধে মোট ৪২টি বক্তৃতা দিয়াছেন। তন্মধ্যে ৩৮টি ছায়াচিত্রের মাধ্যমে প্রদত্ত হইয়াছে।

দেহত্যাগ-সংবাদ

আমরা অতি দুঃখিত চিত্তে সঙ্ঘের দুইজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ-সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতেছি :

স্বামী সিদ্ধানন্দ

গত ১০ই মার্চ বেলা ১০টা ১০ মিনিটের সময় বারাণসী সেবাশ্রমে স্বামী সিদ্ধানন্দ ৭৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত অক্টোবর (১৯৬৫) মাসে আমাশয় ও প্রসটেট গ্ল্যাণ্ড বৃদ্ধিজনিত উপসর্গে আক্রান্ত হইলে তাঁহাকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়। চিকিৎসকগণ তাঁহার ক্যান্সার হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করেন। ইতিমধ্যে অন্যান্য উপসর্গও দেখা দেয়। উপযুক্ত চিকিৎসায় কোন ফল হয় না, অবশেষে তাঁহার দেহাবসান ঘটে।

স্বামী সিদ্ধানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। কয়েক বৎসর তিনি শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দ মহারাজের সেবা করিয়াছিলেন। তিনি স্বামী অদ্ভুতানন্দ-জীর কথোপকথন লিখিয়া রাখেন, পরে ইহা 'সৎকথা' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

স্বামী সিদ্ধানন্দ জীবনের অধিকাংশ কাল ৺কাশীধামে অতিবাহিত করেন। তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

স্বামী জ্ঞানানন্দ

গত ১৮ই মার্চ বেলা ১১টা ১৫ মিনিটের সময় স্বামী জ্ঞানানন্দ কনখল সেবাশ্রমে ৭৪ বৎসর বয়সে সহসা মস্তিষ্ক হইতে রক্তক্ষরণের ফলে (cerebral stroke) দেহত্যাগ করেন। দীর্ঘকাল তিনি কাশীতে বাস করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ-এ কিছু দিন কাটাইয়া গত ৮ই মার্চ তিনি কনখলে গিয়াছিলেন। ১৮ই মার্চ সকাল ৬টা ৩০ মিনিটের সময় তাঁহার ষ্ট্রোক হয়, বেলা সাড়ে আটটা পর্যন্ত তাঁহার জ্ঞান ছিল। এই সময়ে তাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের ও শ্রীশ্রীমায়ের নাম জপ করিতে দেখা যায়, তিনি তাঁহাদের ফটো-অ্যালবাম বুকের উপর ধরিয়া রাখিয়া-ছিলেন। বেলা সাড়ে চার ঘটিকার সময় নীলধারার গঙ্গাবক্ষে তাঁহার দেহ সলিলসমাধি দেওয়া হয়।

তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। কিছুকাল শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করিবার সৌভাগ্যও তাঁহার হইয়াছিল। তাঁহার আত্মা শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

আমেদাবাদ শ্রীবিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে গত ১২.২.৬৬ শনিবার বৈকালে স্থানীয় অখণ্ডানন্দ হলে শ্রীবিবেকানন্দ পাঠচক্রের বার্ষিক মহোৎসব এবং বেদান্তকেশরী শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজী মহারাজের ১০৪ তম জন্মজয়ন্তী উৎসব মহাসমারোহে প্রতিপালিত হয়। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় পাঠচক্রের বার্ষিক বিবরণী পঠিত হয়। প্রবচনে অংশ গ্রহণ করেন অধ্যাপক প্রকাশ গর্জর, অধ্যাপক বদ্রিনারায়ণ অলোক ও অধ্যাপক ফিরোজ দাবর। বক্তাগণ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনী ও বাণী অবলম্বনে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন। সভাপতি স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ সারগর্ভ ভাষণ দেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ১৩১তম জন্মজয়ন্তী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে (মণিনগর) গত ২২.২.৬৬ মঙ্গলবার প্রতিপালিত হয়। ভোর হইতে উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও নবচণ্ডী পাঠ হয়। বৈকালে ৫-৩০ হইতে ৯-৩০ পর্যন্ত শ্রীবিবেকানন্দ-পাঠচক্র দ্বারা অনুসৃত কার্যক্রমের মধ্যে মুখ্য ছিল বেদমন্ত্র আবৃত্তি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ, শ্রীশ্রীমার উপদেশ পাঠ, স্বামিশিষ্য-সংবাদ পাঠ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী ও উপদেশ পাঠ, নামধুন, আরতি, ভজন, কীর্তন। ভক্তদের হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অনুরূপ কার্যসূচী দ্বারা গত ১৪.১২.৬৫ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১১৩তম জন্মজয়ন্তী এবং গত ১৩.১.৬৬ স্বামী বিবেকানন্দজীর ১০৪তম জন্মজয়ন্তী উৎসব প্রতিপালিত হইয়াছিল।

বরাহনগর পিপল্‌স্ লাইব্রেরীর নিজস্ব ভবনে গত ১৩ই ফেব্রুআরি স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহস্থ ভক্ত, লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন ও ভবনাথের কয়েকটি স্মারক চিহ্ন সম্বলিত একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষ্যে লাইব্রেরী-ভবনের সন্নিকটস্থ শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরীদেবীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে আয়োজিত সভায় সভাপতি স্বামী নির্বাণানন্দজী ও স্বামী নির্জরানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভবনাথ সম্বন্ধে হৃদয়-গ্রাহী আলোচনা করেন। লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীঅসিতবরণ মুখোপাধ্যায় কার্যবিবরণী পাঠ করেন।

ভবনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত (১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ) 'আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা' ও 'দক্ষিণ বরাহনগর পাবলিক লাইব্রেরী' (সম্ভবতঃ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে) একত্র হইয়া 'বরাহনগর পিপল্‌স্ লাইব্রেরী' নামে পরিচিত হয়। ভবনাথ ও তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) 'আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা'-র একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন।

আরারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে এই বৎসর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে অষ্টপ্রহর নামসংকীর্তন, দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা, রামায়ণকীর্তন ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী অনুপমানন্দ মহারাজ।

আশ্রমস্থ দাতব্য চিকিৎসালয়ে গত বৎসর ২৬,৬৫১ জন রোগীকে বিনামূল্যে হোমিও-প্যাথিক ঔষধ বিতরণ করা হয়।

ভালিয়া সারদা সঙ্ঘ: গত ৩রা চৈত্র বৃহস্পতিবার হইতে তিনদিনব্যাপী এক উৎসবে শ্রীশ্রীসারদাদেবীর পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত তেলো-

ভেলোর মাঠসংলগ্ন 'ডাকাতে কালী'র প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, ধর্মসভা, শ্রীশ্রীচণ্ডী ও গীতা পাঠ, ভক্তিমূলক সঙ্গীত প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ সভাপতিত্ব করেন ও সুপরিচিত কবি বিমল ঘোষ (মৌমাছি) প্রধান আতিথির আসন গ্রহণ করেন। 'মালশ্রী'র সভ্যবৃন্দ কর্তৃক পরিবেশিত গীতিবিচিত্রা 'পরমা প্রকৃতি মা সারদা' ও 'মহিষ-মর্দিনী' এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি শ্রীপ্রহ্লাদ গঙ্গোপাধ্যায় (বেতারশিল্পী) ও সঙ্ঘসম্পাদক শ্রীকুমার সরকার এবং স্থানীয় জনগণের সহযোগিতা ও পরিশ্রমে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

কার্যবিবরণী

গোয়ালিয়র (এম. পি.) রামকৃষ্ণ আশ্রমের কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। স্থানীয় ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া শিবজ্ঞানে জীবসেবার উদ্দেশে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে একটি ধর্মশালায় ধর্মালোচনা, ভজন ও জনসেবামূলক কার্য শুরু করেন। ইহার পর জহর নগরে একটি ভবনে আশ্রম স্থানান্তরিত হয়, বর্তমানে আশ্রম এখানেই অবস্থিত। গত পাঁচ বৎসরে সাপ্তাহিক গীতা-ক্লাস, নিয়মিত 'কথামৃত' আলোচনা, একাদশীতে রামনামসঙ্কীর্তন এবং সাময়িক উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আশ্রমের কর্মপ্রসারের জন্য নিজস্ব জমির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

স্টেক্লোস্কোন

দুইজন সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক দীর্ঘ পনের বৎসর গবেষণা করিয়া 'স্টেক্লোস্কোন'-জাতীয় নকল কাচের উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই নকল কাচ এতই মজবুত যে ইস্পাতের মতো শক্তি বহন করে, সামান্য আঘাতে ভাঙিয়া যায় না। এই বিচিত্র পদার্থটি কাচের অংশের সহিত কৃত্রিম আলকাতরা মিশ্রিত করিয়া সৃষ্ট।

যাত্রীবাহী গাড়ি, স্নানের জল রাখিবার চৌবাচ্চা, জাহাজের বিভিন্ন হালকা পার্টস, মোটর গাড়ি, ঘরের আসবাবপত্র, সুটকেশ—এই সব এই নকল কাচ 'স্টেক্লোস্কোন' হইতে প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ মন্তব্য করিয়াছেন। প্ল্যাস্টিক শিল্পের ন্যায় 'স্টেক্লোস্কোন'-শিল্পটিও জগতের বিভিন্ন চাহিদা মিটাইতে পারিবে বলিয়া বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস।

ভ্রম-সংশোধন

১৩৭২, ফাল্গুন সংখ্যা ; ৫৭ পৃষ্ঠা, ২য় লাইন: '১৩ই মাঘ বৃহস্পতিবার' স্থলে '১২ই মাঘ বুধবার' পড়িবেন। ৮ম লাইন: '১৪ই মাঘ' স্থলে '১৩ই মাঘ' পড়িবেন। ৫৯ পৃষ্ঠা, ১৫শ লাইন: '২৫শে মাঘ' স্থলে '২৪শে মাঘ' পড়িবেন।

১৩৭২, চৈত্র সংখ্যা ; ১১৪ পৃষ্ঠা, ১২শ লাইন: 'মাধবানন্দজী অধ্যক্ষ হইবার পর' স্থলে 'মাধবানন্দজীর পর' পড়িবেন।

দিব্য বাণী

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥ ১।৩।৩-৪ ॥

কঠোপনিষদ্

দেহ-রথে রথী আত্মা, ইন্দ্রিয় তাহার অশ্ব, মন বল্গা, বুদ্ধি সে সারথি,
বিষয় তাহার পথ—সে পথেতে অশ্বগণ নিয়ে চলে রথ সহ রথী।
(দেহেন্দ্রিয়মন ছাড়া বিষয়সম্ভোগ নাহি হয় কদাচন)
দেহেন্দ্রিয়মন সহ সংযুক্ত আত্মাই ভোক্তা—কহে জ্ঞানিগণ।

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥ ১।৩।৫ ॥

চঞ্চল মানস যার, নহে সমাহিত,
সে-মনের সহ যুক্ত বুদ্ধি যার অবিবেকী হয়,
(দুর্বল) সারথি-হস্তে দুষ্ট অশ্ব সম
ইন্দ্রিয়েরে বশে রাখা সাধ্য তার নয়।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে॥ ১।৩।৮ ॥

বিবেকী যাহার বুদ্ধি, সংযত মানস যার, পবিত্র যাহার দেহ-মন,
(হেলায় চালায়ে রথ যাইতে সে পারে দিব্যধামে-)
লভে সে পরম পদ, লভিলে যা পুনর্জন্ম হয় না কখন।

কথাপ্রসঙ্গে

দেশসেবকের আদর্শ

মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লের জন্ম-শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষে ডক্টর রাধাকৃষ্ণন তাঁহার জীবনাদর্শের যে বিশেষ দিকটির প্রতি দেশ-সেবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, তাহা হইল ত্যাগ অবলম্বনে সেবা। ইহাই চিরন্তন ভারতীয় আদর্শ। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভ পর্যন্ত স্বাধীনতা-লাভের জন্য .য সংগ্রাম বিপুলতর বেগে চলিয়াছিল তাহার বীর যোদ্ধাদের জীবন ছিল এই আদর্শের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এ ভিত্তিভূমি হইতে বহু দেশসেবকের জীবনাদর্শ সরিয়া আসিতে সুরু করে স্বাধীনতা লাভের পর হইতেই। বহুজনের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির এই বৈসাদৃশ্য প্রকট হইবার পর মহাত্মা গান্ধী যতদিন জীবিত ছিলেন প্রার্থনাসভায় প্রায় প্রতিদিনই তিনি স্বাধীনতালাভের জন্য সংগ্রামের দিনের আদর্শের কথা স্মরণ করাইয়া উহাতে দেশসেবক-গণকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর এবিষয়ে সজাগ করাইয়া দিবারও লোক যেন ক্রমে বিরল হইয়া গেল। এই ত্যাগের আদর্শ ক্রমবিলুপ্ত হওয়ায় তাহার বিষময় ফল আজ ফলিতেছে—সর্বত্রই আজ জনগণের মধ্যে সন্দেহ ও অসন্তোষ আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। হৃদয়ের সহিত সংস্পর্শহীন বুদ্ধিমাত্র অবলম্বনে হয়ত কোনরূপে শাসনযন্ত্রকে অবিকল রাখা সম্ভব হয়, কিন্তু ইহা জনগণের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা কখনই আকর্ষণ করিতে পারে না। কেহ আমার প্রতি দরদী কি না, তাহা বুঝিবার জন্য কোন সুচিন্তিত সুবিন্যস্ত বক্তৃতা শুনিবার প্রয়োজন হয় না, আচরণ দেখিয়া সকলে স্বতই তাহা বুঝিতে পারে; আবার বুদ্ধিজ ভাষার আবরণ সত্যকে কখন ঢাকিয়া রাখিতেও পারে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, মস্তিষ্কের ভাষা সকলে বুঝিতে পারে না কিন্তু হৃদয়ের ভাষা তৃণগুচ্ছ হইতে আরম্ভ করিয়া ভগবান পর্যন্ত সকলেই বোঝে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দেশাত্মবোধের প্রথম ব্যাপক প্রসারের সহায়কগণ, মহাত্মাজী, নেতাজী প্রভৃতি দেশের জনগণের সকলেরই হৃদয়ে যে গভীর শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের উচ্চপদ বা ক্ষমতার জন্য নহে—ত্যাগনিষ্ঠ চরিত্রেরই জন্য; ক্ষেত্রবিশেষে বুদ্ধিজ ভুলভ্রান্তির প্রাচুর্যও হৃদয়কর্তৃক অধিকৃত শ্রদ্ধার এই আসনকে টলাইতে পারে নাই। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন দেশের কল্যাণসাধনের পথের দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন মহামতি গোখ্‌লে যে বিষয়টির প্রতি জোর দিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিয়া—জনসেবকদের জীবন ত্যাগপূত হওয়া এবং জনসেবার ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতা অনুস্যূত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তিনি যথার্থই বলিয়াছেন যে, দেশের ভাগ্যনিয়ন্তাদের নির্বাচন জাতি- বা সম্প্রদায়-ভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে, তাহা চরিত্র- ও যোগ্যতা-ভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন; এরূপ না হওয়ার জন্যই দেশে বর্তমান বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইয়াছে।

সেবাযজ্ঞে অগণিত দেশপ্রেমিকের ত্যাগ ও সেবার বিমল ভাবমণ্ডিত জীবনাহুতি প্রদানের ফলস্বরূপ যে স্বাধীনতা আমরা লাভ করিয়াছি, বহিরাগত দুইটি দুর্যোগের ক্ষণে তাহাকে রক্ষা করিয়াছে দেশের সর্বত্রব্যাপী জনসাধারণের

হৃদয় হইতে উৎসারিত (সাময়িক হইলেও ঐকান্তিক) স্বতঃস্ফূর্ত ত্যাগ ও সেবার সুদৃঢ় সংকল্প। জনগণের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা লাভ করিয়া এই স্বাধীনতাকে রক্ষা করিবার এবং উহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিবার জন্য দেশসেবকগণের, বিশেষ করিয়া নেতাগণের জীবনকে ত্যাগনিষ্ঠসেবা-ভিত্তিক করার প্রয়োজন যে অনিবার্য, বর্তমান পরিস্থিতি তাহা আমাদের সকলেরই নিকট সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

পাশ্চাত্যে মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর ভারতীয় চিরন্তন ভাবধারা প্রচারের দ্বারা ভারতকে বিশ্বসভায় গৌরবের আসনে বসাইয়া এবং তাহার ফলে ভারতীয়তার প্রতি জাতির শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনিয়া স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই 'কলম্বো হইতে আলমোড়া' পর্যন্ত যখন পূর্ণ ত্যাগ, অতুলনীয় স্বদেশপ্রেম ও সেবার সর্বোচ্চ ভাবমণ্ডিত জীবনোদ্ভূত বিপুল শক্তিময় বাণীর বিদ্যুৎস্পর্শে মৃতপ্রায় জাতিকে জাগরিত ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতেছিলেন, তখন ভারতকে উন্নতির পথে গতিবেগসম্পন্ন করিবার জন্য কয়েকটি মূল সূত্র তিনি দিয়া গিয়াছেন, যাহা ভারতের কল্যাণের জন্য সর্বকালেই প্রয়োজ্য। তাহার মধ্যে একটি হইল—দেশসেবক হইতে হইলে কি কি গুণ থাকা আবশ্যক। কথাগুলি আমরা বহুবার শুনিয়াছি, তথাপি বর্তমান সময়ে ইহা আর একবার অনুধাবন করা বিশেষ প্রয়োজন। তিনি বলিয়াছেন, স্বদেশহিতৈষী হইতে হইলে তিনটি গুণ থাকা একান্ত আবশ্যক। "প্রথমতঃ হৃদয়বত্তা—আন্তরিকতা আবশ্যক। বুদ্ধি, বিচারশক্তি আমাদের কতটুকু সহায়তা করিতে পারে? উহারা আমাদিগকে কয়েক পদ অগ্রসর করাইয়া দেয় মাত্র, কিন্তু হৃদয়-দ্বার দিয়াই মহাশক্তির প্রেরণা আসিয়া থাকে। প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে।" দেশের জনগণের দুঃখদুর্দশার চিন্তা আমাদের হৃদয়কে কি তোলপাড় করিয়া তোলে?—"এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদের পরিত্যাগ করিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে—তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদের পাগল করিয়া তুলিয়াছে? দেশের দুর্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নামযশ, স্ত্রীপুত্র, বিষয়সম্পত্তি, এমনকি শরীর পর্যন্ত ভুলিয়াছ? তোমাদের এরূপ হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে, তবে বুঝিও তোমরা প্রথম সোপানে—স্বদেশহিতৈষী হইবার মাত্র প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়াছ।"

দ্বিতীয় সোপান হইল জনগণের দুর্দশা নিবারণের কার্যকর পন্থা আবিষ্কার—"মানিলাম, তোমরা দেশের দুর্দশার কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই দুর্দশার প্রতিকার করিবার কোন উপায় স্থির করিয়াছ কি? কেবল বৃথাবাক্যে শক্তিক্ষয় না করিয়া কোন কার্যকর পন্থা আবিষ্কার করিয়াছ কি? মানুষদের গালি না দিয়া তাহাদের যথার্থ কোন সাহায্য করিতে পার কি?"

তৃতীয় সোপান হইল কার্যসাধনের জন্য প্রয়োজন হইলে সর্বস্বত্যাগ করিবার ও সর্ববাধা চূর্ণ করিয়া অগ্রসর হইবার অটুট সংকল্প—"তোমরা কি পর্বতপ্রায় বাধাবিঘ্নকে তুচ্ছ করিয়া কাজ করিতে প্রস্তুত আছ? যদি সমগ্র জগৎ তরবারিহস্তে তোমাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি তোমরা যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছ

তাহাই করিয়া যাইতে পারো কি? যদি তোমাদের স্ত্রী-পুত্র তোমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, যদি তোমাদের ধন-মান সব যায়, তথাপি কি তোমরা উহা ধরিয়া থাকিতে পারো?···নিজপথ হইতে বিচলিত না হইয়া তোমরা কি তোমাদের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে পারো? তোমাদের কি এরূপ দৃঢ়তা আছে?"

"যদি এই তিনটি জিনিস তোমাদের থাকে, তোমরা অলৌকিক কার্য সাধন করিতে পারো। তোমাদের সংবাদপত্রে লিখিবার অথবা বক্তৃতা দিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন হইবে না।···তোমরা যদি পর্বতের গুহায় গিয়া বাস কর, তথাপি তোমাদের চিন্তারাশি ঐ পর্বতপ্রাচীর ভেদ করিয়া বাহির হইবে।···অকপটতা, সাধু উদ্দেশ্য ও চিন্তার শক্তি অসামান্য।"

ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতা

স্বাধীনতালাভের পর হইতে আমাদের দেশে উচ্ছৃঙ্খলতা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে। বিশেষ করিয়া ছাত্রসমাজে বর্তমানে মাঝে মাঝে উহা ভয়াবহ ও লজ্জাকর রূপ ধারণ করিতেছে। যাহারা দুদিন পরে দেশসেবার বিভিন্ন বিভাগে, দেশের শৃঙ্খলারক্ষার কাজেও আত্মনিয়োগ করিবে, শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইবে, তাহাদের এই-জাতীয় আচরণ মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে।

জীবনের কোন কোন দিকে কিশোর ও যুবমনের অসংযত উচ্ছৃঙ্খল আচরণের ঢেউ বর্তমান যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে উঠিতেছে; কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করিবার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করিবার যে মনোবৃত্তি এদেশে একদল ছাত্রের মধ্যে দেখা যাইতেছে, তাহা আর কোথাও এভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে কিনা, জানি না।

শৃঙ্খলা ছাড়া কোন মহৎ জীবন গঠিত হইতে পারে না, কোন সংগঠন বা সঙ্ঘবদ্ধ বড় কাজ চলিতে পারে না, দেশ উন্নত হইতে পারে না। নিজের ও অপরের কল্যাণের জন্য ইহার প্রয়োজনের অনিবার্যতা স্বাভাবিক ভাবে মনে জাগা প্রয়োজন; যেমন খেলার সময় রেফারীর নির্দেশ বা কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলিতে মনে একথা ওঠে না যে, বাধ্য হইয়া কিছু করিতেছি। স্বতঃস্ফূর্ত সে বোধের জন্য আমাদের হয়ত আরো কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইবে। সুদীর্ঘকাল পরাধীন থাকিয়া বাধ্য হইয়া ভয়ে নিয়ম মানিয়া চলার ফলে স্বাধীনতালাভের পর এখনো আমাদের মনে বোধ হয় এভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—নিয়ম মানিয়া চলিতে গেলেই আমার ব্যক্তিস্বাধীনতায় আঘাত লাগিবে।

তাছাড়া ইহার জন্য যে মানসিক শিক্ষার প্রয়োজন তাহা এখনো শিক্ষা-ব্যবস্থায় স্থান পাইল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতিতে বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধন ও প্রসারের ব্যবস্থাই রহিয়াছে, তাহার উন্নতির জন্যই চিন্তা দেওয়া হইতেছে, কিন্তু মনের উৎকর্ষসাধনের, ইচ্ছাশক্তি-বর্ধনের কোন ব্যবস্থাই এখনো হইল না। স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষার ক্ষেত্রে তথ্যসংগ্রহ অপেক্ষাও মনের উৎকর্ষসাধনের উপরই জোর দিয়াছেন বেশী; কতকগুলি সচ্চিন্তার ছাপ মনে পুনঃ পুনঃ দেওয়া ও কতকগুলি নিয়মিত অভ্যাসের মাধ্যমে ইহা করা যায়। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়া তিনি পথের নির্দেশও দিয়া গিয়াছেন। তাহার কোনটিই যথাযথরূপে আয়ত্ত করার ব্যবস্থা বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় নাই। যত শীঘ্র উহার প্রবর্তন করা যায়, ততই মঙ্গল। জীবননিয়ন্ত্রণে মানসিক প্রবণতার প্রভাব বুদ্ধির প্রভাব অপেক্ষা বহুগুণ অধিক।

ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতা রোধের জন্য একটি কাজ ছাত্রগণই করিতে পারে। দেখা যায়, উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রের সংখ্যা অতি অল্প। এই অল্প কয়েকজনই গণ্ডগোল বাধাইয়া তোলে; ইহাদের প্রেরণাও নিজস্ব অথবা বাহিরের উত্তেজনা-প্রসূত, তাহা সঠিক করিয়া বলা কঠিন। অধিকাংশ ছাত্রই এরূপ বিশৃঙ্খলার পক্ষপাতী নহে; সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগৃহে যে কয়টি লজ্জাকর ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই ইহা প্রকট। কিছু ছাত্র ঘটনাস্থলেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছে, দু-একটি ছাত্র-সংগঠন ইহার তীব্র প্রতিবাদ এবং ইহা নিবারণে সক্রিয় অংশও গ্রহণ করিয়াছে। ইহা খুবই আনন্দ ও আশার কথা। ইহা হইতেই মনে হয়, শুভচিন্তাশীল সদ্ভাবাপন্ন ছাত্রগণ, যাঁহারা বুঝেন যে শিক্ষাব্যবস্থাকে এভাবে বিপর্যস্ত করিলে ছাত্রদেরই ক্ষতি সর্বাপেক্ষা অধিক, তাঁহারা অগ্রণী হইয়া উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিরোধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিলেই ইহা অতি সহজে নিবারিত হইবে।

অন্যায় বলিয়া যাহা বোঝা যাইতেছে, তাহা হইতে শুধু বিরত থাকিলেই চলে না, তাহার প্রতিরোধে সক্রিয় না হইলে স্বল্পসংখ্যক অন্যায়কারীদেরই প্রকারান্তরে সমর্থন করা হয়। অতি পুরাতন বৈদিক স্তোত্রেও তাই দেখা যায়, তেজ, বীর্য, ওজঃ (সংযমজনিত শক্তি) প্রভৃতি প্রার্থনার সঙ্গে এই প্রার্থনাও করা হইতেছে—"মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি" —তুমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্রোধস্বরূপ, তুমি আমাকে অন্যায়দ্রোহী কর। আশিষ্ট, দৃঢ়-সংকল্পবান, সংযত ছাত্রের অভাব স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী প্রমুখ সিংহসদৃশ মহা-মানবের জন্মভূমিতে আছে বলিয়া বিশ্বাস করি না। তাঁহারা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একটি ছাত্রসংঘটন করেন, যাহার শাখা প্রতি স্কুল-কলেজেই থাকিবে, এবং যাহার কাজ হইবে মাঝে মাঝে ছাত্রজীবনের কল্যাণ-অকল্যাণের দিকগুলি আলোচনা করা, অর্থকরী বিদ্যালাভের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে যথার্থ 'মানুষ' হওয়া যায় তাহার আলোচনা করা, এবং ছাত্রসমাজে অন্যায় বলিয়া যাহা মনে হইবে তাহার প্রতিরোধে তৎক্ষণাৎ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা, তাহা হইলে অতি সহজে ছাত্রসমাজ হইতে উচ্ছৃঙ্খলতা বিদূরিত হইবে এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টির মঙ্গলকর জীবনের দ্বারও উন্মুক্ত হইবে। অল্প কয়েকজন অকপট চরিত্রবান ছাত্র অগ্রণী হইলেই ইহা সহজে সংসাধিত হইবে। সংখ্যায় কিছু যায় আসে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন— "চরিত্রই বাধাবিঘ্ন-স্বরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।" "বিশৃঙ্খল জনতা শত বৎসরে যাহা করিতে পারে না—মুষ্টিমেয় কয়েকটি অকপট সঙ্ঘবদ্ধ এবং উৎসাহী যুবক এক বৎসরে তদপেক্ষা অধিক কাজ করিতে পারে।"

দেশের এই দুর্দিনে 'মানুষে'র একান্ত অভাব। দোষ কাহার তাহা শুধু প্রচার করিয়া লাভ নাই—ইহার প্রতিকারে বদ্ধ-পরিকর হইতে হইবে। ছাত্রগণকেই 'মানুষ' হইয়া ভবিষ্যতে নিজেদের চেষ্টাতেই দেশের কল্যাণের পথ প্রশস্ত করিতে হইবে। এক সময় যেমন স্কুলে-কলেজে, গ্রামে-গ্রামে সর্বত্র ছাত্রসমাজে বহু বাধা সত্ত্বেও সংযমের দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিষ্ঠ 'মানুষ' হইবার ব্যাপক প্রয়াস দেখা গিয়াছিল, এবং সে প্রয়াস সাফল্যও আনিয়াছিল, সেই দুর্নিবার ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন প্রয়াসের একান্ত প্রয়োজন এখন আসিয়াছে। দেশমাতৃকার সেবারূপে, নরনারায়ণের সেবারূপে গ্রহণ করিয়া যাহারা ইহাতে অগ্রণী হইবে, মানবকল্যাণে অবতীর্ণ স্বামী বিবেকানন্দের আশীর্বাদ তাঁহাদের শিরে শতধারে বর্ষিত হইবে, "তাদের মুখে সরস্বতী বসবেন, তাদের বক্ষে মহামায়া মহাশক্তি বসবেন।"

বুদ্ধদেব স্মরণে

স্বামী আদিনাথানন্দ

যখন অন্তঃসারশূন্য বাহ্যাড়ম্বরসর্বস্ব, নিষ্প্রাণ বৈদিক ক্রিয়াকলাপে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের আকাশ-বাতাস কলুষিত, পরলোকে সুখলাভের উদ্দেশ্যে অবাধ পশুবলি ধর্মার্জনের প্রকৃষ্ট পন্থারূপে বিবেচিত, যজ্ঞবেদীমূলে প্রাণিবধ অনুপাতে ধর্মলাভ সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত, পুরোহিতকুলের অপকৌশলে ভারতের ব্রাহ্মণেতর আপামর জনসাধারণ অজ্ঞান ও কুসংস্কারপঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, বিদ্যাচর্চায় বিশেষ সম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকার, ক্ষত্রিয় রাজকুলের সহায়তায় ধর্মধ্বজী পুরোহিতকুলের প্রচণ্ড বিধি-নিষেধের নাগপাশে সমাজজীবন পঙ্গু, যূপকাষ্ঠ ও বধ্যভূমি হইতে উত্থিত অগণিত অসহায় নিরীহ প্রাণীর সকরুণ মর্মভেদী আর্তনাদে ও হাহাকারে পবিত্র সনাতন ধর্মের একটি বিকৃত রূপ প্রকাশিত, তখন বিধির বিধানে, ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত 'সম্ভবামি যুগে যুগে'—এই অঙ্গীকার পালনার্থ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে অনুপমহৃদয় ও ক্ষুরধার বুদ্ধি সমন্বিত গৌতম বুদ্ধ—ভারতের ত্রাণকর্তা ও 'এশিয়ার আলো'—ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন একটি রাজবংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া। তাঁহার লোকোত্তর দিব্য জীবন ও সহজ সরল প্রাণস্পর্শী উদার বাণীর প্রভাব সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ড উদ্ভাসিত করিয়াছিল। গ্রীস দেশে সক্রেটিস (Socrates) ও চৈনিক কনফুছে (Confucius) তাঁহার সমসাময়িক। উক্ত তিন জন লোকনায়কই যে মতবাদ প্রচার করিতেন তাহাতে নৈতিক আদর্শবাদ (Ethical idealism) বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। অপার্থিব বিষয় সম্বন্ধে তাত্ত্বিক বিচার পরিহার করিয়া, ইহজীবন ও সমাজজীবন যাহাতে উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত হয় তাহার নির্দেশ তাঁহারা দিয়াছেন।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এমন এক আধ্যাত্মিক ভাবপ্লাবন প্রাচ্য ভূখণ্ডে উত্থিত হয় যে, সেই সময় হইতে প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতে ও ভারতেতর দেশসকলে উহা বিস্তৃতি লাভ করে; বিশেষতঃ ভারতের ইতিহাসে এক 'স্বর্ণযুগে'র সূচনা হয়।

বুদ্ধদেবের বাণী 'মৈত্রীভাবনার বাণী', যাহাকে অন্য কথায় বলা হয় 'ব্রহ্মবিহার।' মাতা প্রাণ দিয়া যেমন সর্বক্ষণ পুত্রকে রক্ষা করেন, সেইরূপ অপরিমেয় প্রেমভাব হৃদয়ে পোষণ করিতে হইবে। চিত্ত নির্দ্বন্দ্ব, অহিংস ও নির্বিরোধ করিয়া উহাতে ঊর্ধ্ব অধঃ সর্বদিকে, সমগ্র জগতের প্রতি অপরিমিত দয়াভাব জাগ্রত করিতে হইবে। ইহাই গীতার 'ব্রাহ্মী স্থিতিঃ'

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

(গী ৫ম অঃ ১৯)

তিনি যে-ধর্ম প্রবর্তন করিলেন তাহার মূলকথা—অষ্টশীল অভ্যাস, সমাধি ও করুণা। এই তিনটি স্তর কার্যকারণ-সম্বন্ধে বিধৃত। একটির যথাযথ অভ্যাসে দ্বিতীয় অবস্থা লাভ হইবে এবং উহা হইতে তৃতীয় অবস্থার উদ্ভব ঘটিবে। একটিকে বাদ দিলে অপরটি লাভ করা যাইবে না।

এদেশে ও পাশ্চাত্যে 'ধর্ম' সম্বন্ধে যে প্রচলিত ধারণা বর্তমান, শ্রীবুদ্ধের 'ধর্ম' তাহা হইতে

সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ধর্ম বলিতে সাধারণতঃ বুঝায় সাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস, আপ্তবাক্য বা কোনও প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থে (Book of Revelation) বিশ্বাস, অনুশাসনমূলক বহু আইনকানুন মানিয়া চলা, পৌরোহিত্যে আস্থা স্থাপন এবং কোনও গুরুস্থানীয় ব্যক্তির নিকট আত্ম-সমর্পণ ভগবান তথাগত এই প্রকার ধর্মের বিরোধিতা করিয়া গিয়াছেন। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ তাই তাঁহার ধর্মকে হিন্দু ধর্মের 'বিদ্রোহী সন্তান' (A rebel child) আখ্যা দিয়াছেন। বুদ্ধদেব ধর্মের সনাতন লক্ষ্যের উপরই জোর দিয়াছেন; তৎকালীন পৌরোহিত্য-শাসিত সমাজের জনগণকে নৈতিক আদর্শের দিকে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কারণ পুরোহিতকুল ছিলেন স্বার্থান্ধ, স্বীয় অভ্যুদয়কামী এবং বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অত্যন্ত গোঁড়া ও ব্যভিচারী; সর্বসাধারণের জীবনের মান উন্নয়নের কোনও চেষ্টাই তাঁহাদের ছিল না—কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান সাধন করাইয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত থাকিতেন।

ভগবান তথাগত যুগপ্রয়োজনে বেদের 'কর্মকাণ্ড' পরিত্যাগ করিয়া 'জ্ঞানকাণ্ড' প্রচার করিয়া ধর্ম ও সমাজকে এক উচ্চতর নৈতিক স্তরে উন্নীত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, বেদ ও ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হইয়াও মানবমন উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে উপনীত হইতে পারে এবং পরিশেষে মোক্ষলাভও করিতে পারে—প্রয়োজন শুধু আত্মবিশ্বাস, স্বার্থত্যাগ ও জীবনবিশ্লেষণ।

মানবমনের আদিম প্রবৃত্তিগুলিকে সমূলে বিনাশ করিয়া তৃষ্ণাশূন্য পরম প্রশান্তির একটি অবস্থা লাভ করাই ধর্মের লক্ষ্য। পশুবলিদানে বা পুরোহিতকুলের সন্তুষ্টিবিধানেই সেই অবস্থাপ্রাপ্তি সম্ভব হইবে না। অথবা কেবল 'হে ঈশ্বর!' 'হে ঈশ্বর!' করিলেও সাহায্য নামিয়া আসিবে না। আত্মশক্তি-বলে নিজেকে উচ্চতর পবিত্র অবস্থায় উন্নীত করিতে হইবে। গীতায় বহু শ্লোকে এইভাবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভগবান বুদ্ধদেবের শিক্ষাপ্রণালী ছিল এইরূপ—সর্বপ্রথম অষ্টশীল অভ্যাস দ্বারা হৃদয় ও বুদ্ধি পবিত্র করিতে হইবে। ইহা সাধিত হইলেই জগৎ জীবন ও জীবের স্বরূপ প্রজ্ঞা-সহায়ে উপলব্ধ হইবে। এই প্রজ্ঞা বা বোধ লাভই অষ্টশীল অভ্যাসের চরম ফল। ভগবান তথাগত স্বীয় জীবনে ইহা লাভ করিয়াছিলেন এবং এই প্রত্যক্ষমূলক ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেব-প্রচারিত অষ্টশীল বলিতে বুঝায়—সাধুদৃষ্টি, সাধুসঙ্কল্প, সদ্‌বাক্য, সদ্ব্যবহার, সৎপথে জীবিকার্জন, সৎচেষ্টা, সৎচিন্তা ও সাধুধ্যানে চিত্ত সমাহিত করা। ইহার সম্যক্ সাধনে চিত্তের নির্মল অবস্থা লাভ হয়। উক্ত শীল অভ্যাসের ফলে চিত্ত কামনাশূন্য হইলেই জীবের 'অহং-বোধ' নাশ হইবে—ইহাকেই তিনি বলিলেন নির্বাণলাভ অথবা বোধিলাভ। এই নির্বাণ একটি প্রশান্তিময় আনন্দময় অবস্থা, ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না—সুতরাং শূন্যস্বরূপ বলা হয়। বস্তুতঃ ইহাই জীবের স্বরূপাস্থিতি, কারণ নির্বাণলাভের পর জীবত্ব ঘুচিয়া যায়—শিবত্বপ্রাপ্তি ঘটে—ইহাই জীবন্মুক্তির অবস্থা। জীবত্বের অবসানে চিত্তে জাগিয়া উঠে 'অপার করুণা'। তখন তিনি 'বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ'—এই ভাব লইয়া জগতে বিচরণ করেন। মহাযানী বৌদ্ধশাস্ত্রে ইহাকে 'বোধিসত্ত্ব' অবস্থা বলা হয়। হীনযানপন্থীগণ এই অবস্থা বোধগম্য করিতে সক্ষম নন, কারণ তাঁহারা শূন্যস্বরূপ হইতে চান—সব লয় করিয়া দিয়া। জাতকের মূল শিক্ষা এই যে, 'আত্মত্যাগ'-বলে বহু জন্ম-জন্মান্তরে এই বোধিসত্ত্ব অবস্থা লাভ হয়।

বুদ্ধদেব বলিতেন—জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে নিস্তারলাভই প্রকৃত জীবনসমস্যা, কারণ জীবন দুঃখময়। ব্রহ্ম, ঈশ্বর, আত্মা কি বস্তু—এই জাতীয় সমস্যা তর্কদ্বারা মীমাংসা করিবার চেষ্টা বৃথা। হৃদয় ও বুদ্ধি পরিশুদ্ধ হইলে এই সকল তাত্ত্বিক সমস্যা মানুষ নিজেই সমাধান করিতে পারিবে; নির্মল বোধের উদয় হইলে ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে কোন অজ্ঞান থাকিবে না। মনে হয় সেইজন্য 'ঈশ্বর কি আছেন?'—এই প্রশ্ন করিলে ভগবান তথাগত মৌন থাকিতেন; ঈশ্বরতত্ত্ব ভাষায় বুঝান যায় না, কারণ উহা 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্'—অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিবার বিষয়। যুক্তির অবতারণা করিলেই যুক্তিজাল বৃদ্ধি পাইবে—সমস্যার কোন সমাধান তাহাতে হইবে না।

তিনি কার্যকারণবাদ অনুসরণ করিয়া জন্মান্তরবাদ প্রচার করিলেন। সকল কর্মই ফলপ্রসূ; এবং কর্মফলের দ্বারা বদ্ধ হইয়া জীব-সত্তা বহুবার জন্মগ্রহণ করে এবং বিভিন্ন যোনি প্রাপ্ত হয়। অষ্টশীল অভ্যাসের দ্বারা বাসনার ক্ষয় হইলে এই 'পুনরাবর্তন' বন্ধ হইয়া যায়।

তাঁহার মতে অজ্ঞান হইতে কামনা, কামনা হইতে সদসৎ কর্ম ও কর্মফল এবং তাহা হইতে জীবনমৃত্যুপ্রবাহের উদ্ভব। কামনানাশে দুঃখনাশ ও দুঃখনাশে পরমানন্দপ্রাপ্তি হয়। ইহা ইহ-জীবনেই লাভ করা সম্ভব। ইহা উপনিষদুক্ত মতবাদের সম্পূর্ণ অনুগামী।

অজ্ঞানাচ্ছন্ন, দরিদ্র জনগণের প্রতি অদ্ভুত সহানুভূতিতেই তাহার গৌরবের আসন প্রতিষ্ঠিত—এই সহানুভূতি মনুষ্য ব্যতীত অপর সকল প্রাণীর প্রতিও সমভাবে প্রয়োজ্য। সংস্কৃত ভাষায় প্রচার করিতে বলিলে তিনি বলিতেন, "আমি দরিদ্রের জন্য, জনসাধারণের জন্য আসিয়াছি। আমি প্রচলিত ভাষায় উপদেশ দিব।" যেকালে আসমুদ্রহিমাচল সংস্কৃত ভাষাকে 'দেবভাষা' বলা হইত এবং একমাত্র সংস্কৃত ভাষাই গৌরবের আসন অধিকার করিয়াছিল, কথ্যভাষাকে অজ্ঞ ও মূর্খের ভাষা জ্ঞান করা হইত, সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান না থাকিলে বা গ্রন্থাদি উক্ত ভাষায় প্রণয়ন না করিলে অবহেলিত ও পণ্ডিতসমাজে স্থান পাইবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত সেই কালে শাক্যমুনির এইরূপ সঙ্কল্প কিরূপ মহান ত্যাগ ও বিশাল হৃদয়ের নিদর্শন তাহা সহজেই অনুমেয়। ইতিহাসের দৃষ্টিতে ভগবান বুদ্ধদেব মানবিকতাবাদের (Humanism) প্রথম প্রচারক। তবে ইহা কিন্তু জড়বাদমূলক নহে। কারণ তিনি জীবসত্তার জন্মান্তর গ্রহণ স্বীকার করিতেন।

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, বুদ্ধদেব একটি কাজও, একটি চিন্তাও নিজের জন্য করেন নাই, সকলই পরার্থে করিয়াছেন। স্বামীজী কর্মযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতার শেষভাগে শ্রীবুদ্ধকেই আদর্শ কর্মযোগী বলিয়া বিঘোষিত করিয়াছেন। তিনি ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল কোন ভেদই রাখেন নাই; বলিয়াছেন, সকলেই স্ব স্ব অভিনিবেশ- ও পুরুষকার-বলে নির্বাণের পথের সন্ধান করিয়া লইতে সক্ষম। এই মহতী আশ্বাসবাণী পদদলিত অবহেলিত জনগণের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা-মাত্র তাঁহারা নবীন উদ্যম লাভ করিয়াছিলেন এবং দলে দলে তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন।

পূজ্যপাদ স্বামীজী চাহিয়াছিলেন, হিন্দুগণ বুদ্ধদেবের উচ্চ হৃদয় লইয়া সমুন্নত চরিত্র গঠন করুক; ব্রাহ্মণগণের অপূর্ব ধীশক্তি ও দার্শনিক চিন্তার সহিত বুদ্ধদেবের লোকোত্তর মহান হৃদয় ও অসাধারণ লোককল্যাণ-চিকীর্ষা সংযুক্ত হইলে আদর্শ চরিত্র গঠিত হইবে।

শ্রীবুদ্ধের জীবন ও বাণী অনুধ্যান করিয়া আমরা সত্যই ধন্য। বর্তমান সময়ে আমাদের কর্তব্য ভগবান বুদ্ধদেবের সাম্যবাদ, জন্মান্তরবাদ উদার সহনশীলতা এবং 'জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শনম্' প্রভৃতি শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করিয়া জীবভূমি হইতে উন্নীত হইবার জন্য সচেষ্ট হওয়া।

'সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু'

স্বামী ধীরেশানন্দ

ভাবুক বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন :—

'আমি সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল।' —ইহা ব্যক্তিবিশেষের ব্যর্থতার খেদোক্তি নহে, ইহা যে সংসারে সকল প্রাণীরই চিরন্তন মর্মভেদী ক্রন্দন, হতাশার হাহাকার ধ্বনি! মানুষ কত আশায় বুক বাঁধিয়া অশেষ কষ্টে অর্থ সঞ্চয় করে, ঘর বাঁধে, পুত্রকন্যার বিবাহ দেয় এবং মনে করে যে অতঃপর সকলকে লইয়া নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে পরম শান্তিতে, মহাসুখে দিনাতিপাত করিবে। কিন্তু অলক্ষ্যে তাহার অদৃষ্টদেব হাসেন। অদৃষ্টের অলংঘনীয় নিয়মে, নিষ্ঠুর দৈবের রূঢ়, নির্মম কশাঘাতে মানুষের এই সুখস্বপ্ন একদিন যেন তাসের ঘরের ন্যায় হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার বড় সাধের সাজানো বাগান যেন অকস্মাৎ শুকাইয়া যায়। তখন তাহার অশান্ত, শোকমুহ্যমান চিত্তে কেবল নৈরাশ্যের করুণ সুরটিই বাজিতে থাকে, জীবন দুর্বিষহ দুঃখময় বলিয়া মনে হয়। স্বামীজী বলিতেন—'দুঃখের মুকুট মাথায় পড়িয়া সংসারে সুখ আসিয়া মানুষের নিকট উপস্থিত হয়।' ইহা রূঢ় বাস্তব। সুখ ও দুঃখ মানুষের নিত্য-সহচর।

দেখিতে পাওয়া যায়, সংসারে সকলেই নিজের অনুকূল বস্তুটি কামনা করে এবং স্বার্থবিরোধী পদার্থ ত্যাগ করিয়া থাকে। অর্থাৎ সুখপ্রদ হইলে কোন বস্তুকে সে গ্রাহ্য মনে করে এবং তদ্বিপরীত অর্থাৎ দুঃখপ্রদ পদার্থকে সে ত্যাজ্য বলিয়া জানে।

মানুষ কি চায় না, অর্থাৎ কোন্‌টি তাহার ত্যাজ্য ইহাই প্রথম বিচার করা যাউক। এ কথা একবাক্যে সকলেই স্বীকার করিবে যে দুঃখ কেহ চায় না। কিন্তু দুঃখ জিনিসটা কি? দুঃখ বলিয়া জগতে কোন পদার্থ আছে কি? মনে হইবে, কেন, সর্প ব্যাঘ্র আদি পদার্থ কত দুঃখপ্রদ। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। সাপুড়ে সাপের খেলা দেখাইয়া জীবিকা উপার্জন করে। সর্প তাহার নিকট কত প্রিয়! কত যত্নে সে উহাদের প্রতিপালন করে! শুনিতে পাওয়া যায়, স্নেহাস্পদ কন্যার বিবাহকালে সর্বাপেক্ষা ভাল অর্থাৎ বিষধর সর্পটি, খেলা দেখাইয়া অর্থ উপার্জনের জন্য সে জামাতাকে যৌতুকস্বরূপ প্রদান করে। সার্কাসওয়ালা ব্যাঘ্রের খেলা দেখাইয়া অর্থ উপার্জন করে। ব্যাঘ্র তাহার উপার্জনের সাধন, তাই ব্যাঘ্র তাহার নিকট প্রীতির বস্তু। ব্যাঘ্রীর নিকটও ব্যাঘ্র কত প্রিয়! সর্পব্যাঘ্রাদি কোন কিছুই একান্ত দুঃখপ্রদ নহে। সর্বথা হেয় বা ত্যাজ্য এরূপ কোন পদার্থই জগতে পাওয়া যায় না। আমাদের নিকট যাহা অতি ঘৃণিত, তাহাও কোন কোন জীবের ভোজ্যরূপে প্রিয়।

এভাবে যদি ইহাও বিচার করা যায় যে জগতে সকলে কি চায়, তাহা হইলে সকলে একবাক্যে বলিবে সুখ চাই, আনন্দ চাই! ধনী-ভিখারী-নির্বিশেষে সকলেই সুখ বা আনন্দ চায়। জগতে সকলেই সুখের পশ্চাতে ধাবমান। কিন্তু এই সুখ জিনিসটি কি? সুখ বলিয়া কোন পদার্থ আছে কি? লোকে মনে করে, কেন স্ত্রী, পুত্র, ধন, বাহন, অন্ন—এই সবেতেই তো সুখ। কিন্তু স্ত্রী যদি সদা সুখরূপই হইত তবে সে-স্ত্রী কোন বিগর্হিত কর্ম করিলে লোকে তাহাকে ত্যাগ করে কেন? পুত্র যদি নিয়ত

সুখপ্রদই হইত তবে অযোগ্য, অবাধ্য ও নিন্দিত-কর্মকারী পুত্রের মুখদর্শনও লোকে করিতে চাহে না কেন? ধনেই যদি সুখ থাকিত তবে অশেষ-ঐশ্বর্যপালিত হইয়াও লোকে দুঃখী কেন? এইরূপে দেখা যায় যে, কোন পদার্থই একান্ত-ভাবে সুখপ্রদ বা সুখরূপ নহে

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে বাহিরে সুখদুঃখ বলিয়া যদি কোন পদার্থই জগতে না থাকে, তবে লোকে যে সুখদুঃখ অনুভব করে তাহা কি?—ইহার উত্তরে বলা যায়, সুখদুঃখের অনুভব হয় মনে। অতএব, উহা মনেরই। সুখদুঃখ বলিয়া কোন জিনিস বাহিরে নাই। উহা মনের একটি ভাবনামাত্র। একই বস্তু মনে বিভিন্ন ভাবনা আনিতে পারে। বন্ধুসহ আমি কোথাও যাইতেছি। সম্মুখে একটি বৃদ্ধাকে দেখিয়া আমি 'মা' 'মা' বলিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলাম। বন্ধুর নিকট তিনি সাধারণ একজন মহিলা ছাড়া আর কিছুই নন। অপর এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে 'ভগিনী' বলিয়া সম্বোধন করিল। কেউ বা তাঁহাকে 'কন্যা'রূপে বা অন্য কোনরূপে দেখিল। এখন এই নারীটি বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্নরূপে প্রতীত হইতেছেন মাত্র। 'মা', 'ভগিনী', ইত্যাদি বাহিরে কিছুই নাই, এগুলি সবই বিভিন্ন ব্যক্তির মনোময়ী কল্পনা। বাহিরে কেবল একটি স্থূল দেহমাত্র বিদ্যমান। তাহাকেই স্ব স্ব ভাবনানুযায়ী কেহ মাতৃরূপে, কেহ বা ভগিনীরূপে, কেহ বা কন্যারূপে দর্শন করিতেছে। তেমনি সুখদুঃখ বলিয়াও কোন পদার্থই জগতে নাই বাহিরে বিশাল জগৎ পড়িয়া রহিয়াছে এবং যে পদার্থ যখন আমার অনুকূল বলিয়া মনে হয় তখনই সেটি আমার সুখপ্রদ বলিয়া প্রতীত হয় মাত্র। সেই পদার্থই পরমুহূর্তে বা কালান্তরে প্রতিকূল মনে হইলে দুঃখপ্রদ বলিয়া ভান হয়। বিষয় কিন্তু নির্বিকার। বিষয়ের প্রতি স্বরচিত অনুকূলতা-বা প্রতিকূলতা-বুদ্ধিই আমার সুখদুঃখ অনুভবের কারণ।

কিন্তু সুখ বা দুঃখ যখন আমরা অনুভব করি, সে অনুভবও তো স্থায়ী হয় না। সুখ অনুভব করিতেছি কিন্তু চিত্ত অন্য ব্যাপারে যখনই লিপ্ত হইল তখনই সে সুখানুভবও বিলুপ্ত হইল। তদ্রূপ দুঃখ অনুভব করিতে করিতে যখনই চিত্ত বিষয়ান্তরে ধাবিত হইল দুঃখও তখনই অদৃশ্য হইল। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে অনুভবকালেই কেবল সুখদুঃখ বিদ্যমান। ঐ অনুভবের পূর্বে বা পরেও তাহা নাই। অসহ্য দেহব্যথায় কাতর ব্যক্তিও যখন মূর্ছিত বা নিদ্রিত হইয়া পড়ে তখন আর তাহার সে দুঃখবোধ থাকে না। কিন্তু পুনঃ জাগ্রদবস্থায় ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করিতে থাকে। পুত্রশোকাতুরা মাতাও গভীর নিদ্রাকালে পরমসুখে মগ্ন হইয়া থাকে, তখন কোন শোক, কোন দুঃখবোধও তাহার থাকে না। দুঃখবোধ করিবার করণ মনটিও তখন নাই। কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে জাগ্রতে মন উদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই শোক, দুঃখবোধ ফিরিয়া আসে। সুতরাং সুখদুঃখ মনঃসমকালীন। অর্থাৎ যখন যে অবস্থায় মন আছে তখনই সেই অবস্থায় সুখদুঃখ আছে, আর যখন মন নাই তখন সুখদুঃখও নাই। অনুভব বা জ্ঞানকালেই সুখদুঃখের বিদ্যমানতা বা সত্তা। অনুভবের পূর্বেও ইহা নাই এবং পরেও ইহা থাকে না। ইহাকেই বেদান্তে বলে 'জ্ঞাত সত্তা' বা 'জ্ঞানসমকালীন সত্তা' বা 'প্রাতিভাসিক সত্তা'। অর্থাৎ সুখদুঃখাদি কেবল একটা সাময়িক প্রতীতিমাত্র, সুতরাং উহা মিথ্যা।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষ স্বপ্নকে লওয়া যাউক। স্বপ্নে কত কি বিচিত্র সৃষ্টি, কত

অভিনব পদার্থই না মন কল্পনা করিয়া থাকে! কিন্তু ঐ সকল পদার্থ বস্তুতঃ কিছুই নাই। মনের কল্পনাকালেই উহাদের স্থিতি। স্বপ্নদর্শনের পূর্বেও ঐ পদার্থসমূহ ছিল না এবং স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলেও উহাদের আর দেখা যায় না। কেবল স্বপ্নানুভবকালেই ঐ সকল পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল ও সেগুলিকে বাস্তব বলিয়া মনে হইতেছিল। জাগ্রতে ফিরিয়া আসিয়া স্বপ্নদৃষ্ট-পদার্থের আর কোন বাস্তব সত্তাই অনুভূত হয় না।

সেইরূপ যখন স্বপ্নানুভব হয় তখন জাগ্রৎ পদার্থও আর থাকে না এবং উহার অনুভবও হয় না। স্বপ্নভঙ্গে জাগ্রৎ অবস্থায় মন উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই জাগ্রৎ সৃষ্টি ভাসিয়া উঠে। পুনরায় মন স্বাপ্নসৃষ্টি কল্পনা করিতে থাকিলে এই বিশাল জাগ্রৎপ্রপঞ্চ আর থাকে না। সুষুপ্তি-অবস্থায় যখন মন বিলীন হয় তখন পূর্বোক্ত উভয় সৃষ্টি এবং তদনুভবও আর ভান হয় না। এইরূপে দেখা গেল যে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয়ই মনঃসমকালীন বা অনুভবসমকালীন। অতএব এই উভয় অবস্থা এবং অবস্থাগত পদার্থসমূহও জ্ঞাতসত্তা অর্থাৎ প্রাতিভাসিক, শুধু একটা সাময়িক প্রতীতিমাত্র, মিথ্যা।

কিন্তু 'আমি' থাকি। এই নিয়ত-পরিবর্তনশীল তিন অবস্থায় 'আমি' সতত বিদ্যমান। অবস্থাগুলি পরস্পর পৃথক, এক অবস্থায় অন্য অবস্থা থাকে না, কিন্তু 'আমি' এই সর্বাবস্থাগুলির মধ্যে একভাবে 'অনুগত' হইয়া আছি। অতএব জাগ্রদাদি অবস্থা ও তাহার সুখদুঃখাদি ধর্ম হইতে 'আমি' পৃথক্, ইহাই স্পষ্ট অনুভব হয়।

সুষুপ্তিতে মহা আনন্দ, মহা সুখ সকলেই অনুভব করিয়া থাকে। জাগ্রৎ ও স্বপ্নের সংখ্যাতীত মানঅভিমান, আশানৈরাশ্য, ভাল-মন্দ, সুখদুঃখ নিরন্তর অনুভব করিয়া জীব পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে ও একটু সুষুপ্তিসুখের জন্য লালায়িত হয়। কষ্টলব্ধ প্রভূত ধনের বিনিময়েও সে একটু সুষুপ্তিসুখ লাভার্থ ব্যাকুল হয় ও সেজন্য কত চেষ্টাই না সে করিয়া থাকে! সুষুপ্তিতে এত আনন্দ আসে কোথা হইতে? সুষুপ্তিতে কোন দুঃখ থাকে না; তাহার কারণ দুঃখের নিমিত্ত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার—এই সব ।কছুই সেখানে নাই। সেখানে থাকি কেবল একা 'আমি'। তাহা হইলে ইহাই প্রমাণিত হইল যে যখন আমাতে একমাত্র 'আমি' থাকি তখনই সুখ। অর্থাৎ সুখ আমারই স্বরূপ। জগতের কোন সুখই সুষুপ্তি-সুখতুল্য নহে। মন বুদ্ধি আদি আগন্তুক উপাধিগুলি আসিয়া হাজির হইলেই যত দুঃখদ্বন্দ্ব আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন 'আমি' তাহাদের সহিত জড়িত হইয়া নিজেকে সুখী-দুঃখী, কর্তা-ভোক্তা মনে করিয়া সংসার-সাগরে হাবুডুবু খাইতে থাকি।

শংকা হইতে পারে যে, সংসারেও তো লোকে সুখ ভোগ করে। হাঁ, করে, কিন্তু তাহা কতটুকু? দেখিতে দেখিতে উহা যেন কর্পূরের ন্যায় উবিয়া যায় এবং পরিণামে দুঃখই দিয়া থাকে। সাংসারিক সুখ যেন বিষসংপৃক্ত মিষ্টান্ন। মানুষের চিত্ত বিষয়-ভোগলালসায় সদা চঞ্চল, তাই সে দুঃখী। চাঞ্চল্যই দুঃখ। প্রভূত আয়াসে প্রার্থিত বস্তুর প্রাপ্তিতে চিত্ত যখন ক্ষণিক শান্ত হয় তখন সেই শান্তচিত্তে যে সুখ অনুভূত হয় তাহাই বিষয়ানন্দ বা বিষয়সুখ। কিন্তু পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে, আনন্দ বিষয়ে নাই। শান্ত চিত্তে যে আনন্দ অনুভূত হয় তাহা আমার স্বস্বরূপভূত আনন্দেরই অস্ফুট প্রতিবিম্বমাত্র। চঞ্চল জলের উপরিভাগে যেমন চন্দ্রবিম্ব সম্যক্ প্রতিবিম্বিত হয় না, স্থির জলই সম্যক্ প্রতিবিম্বধারণে সমর্থ, ইহাও তদ্রূপ।

কিন্তু এই বিষয়ানন্দও নিন্দিত, বিনাশী ও দুঃখরূপ বিষয়সহচারী বলিয়া বিনাশী ও সর্বথা ত্যাজ্য। শুদ্ধদর্পণতলে প্রতিবিম্বিত মুখমণ্ডলই সকলের প্রিয় হইয়া থাকে, অশুচিপদার্থপূর্ণ ভাণ্ডে বা সুরাপাত্রে প্রতিবিম্ব-দর্শনে কেহ রুচি প্রকাশ করে না, বিষয়ানন্দও তদ্রূপ। বিষয়ানন্দও স্বরূপানন্দেরই অতি ক্ষুদ্রতম অংশ। ঐ স্বরূপানন্দেরই অধিক প্রকাশ হয় সুষুপ্তিতে। কিন্তু উহাও অজ্ঞান-ব্যবহিত বলিয়া পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপটির পূর্ণ অভিব্যক্তি তখনও হয় না। কিন্তু যেটুকু হয় তাহাতেই সর্বজীব পরিতুষ্ট, এবং উহার তুলনা জগতে পাওয়া যায় না। জাগতিক কোন আনন্দই সুষুপ্তির আনন্দসহ তুলিত হইতে পারে না, ইহা সর্বজনপ্রত্যক্ষ। আবার, বিচারজনিত জ্ঞানসহ মন যখন স্বস্বরূপে স্থিত হয় তখন নির্দ্বৈত ও অজ্ঞানাবরণবিরহিত যে স্বরূপানন্দ অভিব্যক্ত হয় তাহা বর্ণনাতীত। সুষুপ্তির আনন্দও তাহার নিকট তুচ্ছ।

সুতরাং দেখা গেল স্বস্বরূপে স্থিত থাকাই সুখ। স্বস্বরূপ-বিচ্যুতি ঘটিলেই দুঃখ। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, মানুষ যখন সুস্থ থাকে, ভাল থাকে, তখন তাহাকে, 'কেন ভাল আছ' বা 'কেন সুখে আছ'—এরূপ প্রশ্ন কেহ করে না। কিন্তু যদি কেহ বলে, 'বড় কষ্টে আছি' 'বড় কষ্টে দিন কাটিতেছে'—তখন লোকে তাহার দুঃখের কারণ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। যাহা স্বাভাবিক অবস্থা, সে বিষয়ে কাহারও শংকা হয় না। অগ্নি উষ্ণ। তাহা কেন উষ্ণ, এরূপ প্রশ্ন কাহারও মনে জাগে না। জল শীতল। উহা কেন শীতল, এ প্রশ্নও কেহ করে না। কারণ উহা স্বাভাবিক। কিন্তু যদি বিপরীত হয় তবে লোকে প্রশ্ন করে। যদি অগ্নি শীতল ও জল উষ্ণ হয় তবে লোকে জিজ্ঞাসা করিবে, কি করিয়া উহা সম্ভব হইল, কোন্ নিমিত্তবশতঃ উহা ঘটিল। সেইরূপ সুখে থাকাই জীবের স্বভাব। কারণ সুখ তাহার স্বরূপ। তাই সুখে থাকিলে অর্থাৎ স্বরূপে থাকিলে কোন প্রশ্ন হয় না, নিজের মনেও কোন অশান্তি জাগে না। দুঃখ অর্থাৎ স্বরূপবিচ্যুতি ঘটিলেই প্রশ্ন হয়, অশান্তি হয়—কেন ওরূপ হইল এই শংকা মনে জাগে। অতএব স্বস্থতাই সুখ ও অস্বস্থতা অর্থাৎ স্বরূপবিচ্যুতিই দুঃখ।

এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, সুষুপ্তি যখন বহুলাংশে স্বস্থতাবশতঃ একটি পরম আনন্দময় অবস্থা, তখন উহাই কাম্য এবং কুম্ভকর্ণের ন্যায় সকলের কেবল সুষুপ্ত হইয়া থাকিবারই চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু তাহা তো সম্ভব নহে? উহাও একটি অজ্ঞানময় অবস্থাবিশেষ। জাগ্রৎ- ও স্বপ্ন-ভোগপ্রদ কর্মক্ষয়ে সুষুপ্তি-অবস্থা জীবের স্বাভাবিকভাবেই আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে এবং উহা জীব স্বেচ্ছায় করিতে পারে না। চেষ্টা করিলেও কেহ ইচ্ছামত সুষুপ্ত হইতে পারে না। চেষ্টা করিতে গেলে স্বপ্নই বৃদ্ধি পাইবে, সুষুপ্তি আসিবে না।

তবে দুঃখসাধন দেহ, মন, বুদ্ধি আদির সাহচর্য রহিত হইয়া পরম আনন্দময় স্বস্বরূপে স্থিতিলাভ করিবার উপায় কি?—উপায় বিচার। মন, বুদ্ধি আদিই দ্বৈত জগৎপ্রপঞ্চ আমাতে আনয়ন করতঃ বিবিধ দ্বন্দ্ব ও দুঃখের দুর্নিবার স্রোতে আমাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু এই মন, বুদ্ধি আদি সবই আগন্তুক, জাগ্রৎ ও স্বপ্নে থাকে কিন্তু সুষুপ্তিতে থাকে না। ইহারা আগমাপায়ী, নিয়ত-পরিবর্তনশীল ও অনিত্য বলিয়া একান্তই মিথ্যা। এখন মনের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় একমাত্র বিচার। সমাধি আদির অভ্যাস মনকে সাময়িকভাবে রুদ্ধ করিয়া রাখে মাত্র। উহার বিলোপ

করিতে পারে না। ব্যবহারকালে যে 'অহং' —'আমি' 'আমি' করে, সে 'অহং'ও তো সুষুপ্তিতে থাকে না। কিন্তু 'আমি' তখন একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাই কি? কখনই নহে। 'আমি' থাকি—ইহাও সকলের অনুভব-সিদ্ধ কথা। মন, বুদ্ধি, অহংকার রহিত সেই 'আমি'ই আসল 'আমি'। উহাকে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। উহা অনুভবমাত্রস্বরূপ। সেই 'আমি'ই জাগ্রৎ ও স্বপ্নে আগন্তুক মনবুদ্ধি-সহ জড়িত হইয়া মিথ্যা অহংকারের রূপ ধারণ করি এবং তখন সংসারে অশেষ দুঃখের স্রোতে ভাসিয়া চলি।

বেদান্তশাস্ত্র বিচারপ্রসূত জ্ঞানদ্বারা 'হৃদয়-গ্রন্থিভেদের' কথা বলিয়াছেন। এই গ্রন্থিভেদ হইলেই সর্বসংশয় দূর হয়, পাপপুণ্য সর্বকর্ম ক্ষীণ হয়, সর্বদুঃখনিবৃত্তি হয় এবং পুরুষ স্বস্বরূপে স্থিতি লাভ করিয়া পরম আনন্দময় অবস্থালাভে কৃতকৃত্য হন। এখন এই 'হৃদয়গ্রন্থিভেদের' অর্থ কি? কত লোকে ইহার কত বিভিন্ন ব্যাখ্যাই দিয়া থাকেন! সরল সহজ কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—হৃদয় অর্থ মন বা বুদ্ধি। উহার ভেদ অর্থ উহার নাশ অর্থাৎ উহার অসত্তাবোধ, মন, বুদ্ধি আদি বস্তুতঃ নাই, এইটি জানা। বস্তুতঃ মন, বুদ্ধি আদি কোন পদার্থই যে নাই, এগুলি প্রাতিভাসিক, একটা মিথ্যা প্রতীতিমাত্র, এবং একমাত্র আত্মাই—'আমি'ই—সর্বাবস্থায় একরূপে নির্বিকার থাকিয়া সদা বিদ্যমান—এইটি জানার নামই 'হৃদয়গ্রন্থিভেদ।'

কিন্তু মন বুদ্ধি আদির বিদ্যমান দশাতে অর্থাৎ জাগ্রতে (স্বপ্নের মন ও তাহার কার্য সব কিছুই প্রাতিভাসিক ইহা সর্বলোকসম্মত, তাই কেবল জাগ্রতের কথাই ধরা হইল) যতই কেহ বিচার করুক না কেন যে মন আদি বস্তুতঃ নাই, একটা মিথ্যা প্রতীতিমাত্র,—সে জ্ঞান কখনও অপরোক্ষ হইবে না,—উহা পরোক্ষই থাকিয়া যাইবে। কারণ তৎকালে, বিচারকালে সাক্ষাৎ মন রহিয়াছে, সুতরাং কি করিয়া বোঝা যাইবে যে মন নাই? সেইজন্য তৎকালে সাধকের এমন একটা অবস্থার স্মৃতির প্রয়োজন, যখন মন থাকে না; যেমন সুষুপ্তি বা সমাধি। সমাধি তো আর সকলের হয় না? কিন্তু সুষুপ্তি অল্পবিস্তর সকলেরই হয়। সুষুপ্তিকালে মনবিহীন 'আমি' থাকি। এটি সকলেরই প্রত্যক্ষ। সেই প্রত্যক্ষের স্মৃতিসহ যদি জাগ্রতে কেহ বিচার করে যে জাগ্রতেও মন বস্তুতঃ নাই, তাহা হইলেই জাগ্রৎকালেও মনের অভাব প্রত্যক্ষ অনুভব হইবে ও মন-রহিত এক সুখস্বরূপ 'আমি'ই অবশেষ থাকিয়া যাইব। এই বিষয়ে স্ফটিক ও জবাকুসুমের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। যে কখনও স্বচ্ছ স্ফটিক অন্যকালে দেখে নাই, স্ফটিকের সম্মুখে জবাকুসুম যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ সে কখনই এবং কোন প্রকারেই বুঝিতে পারিবে না যে স্ফটিক স্বচ্ছ, লাল নহে। তাহাকে অন্যত্র স্বচ্ছ স্ফটিক দেখাইলে পর সেই স্মৃতিবলে সে নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিবে যে স্ফটিক স্বচ্ছ, জবাকুসুম-সান্নিধ্যে রক্ত স্ফটিক দৃশ্যমান হইলেও স্ফটিক রক্তবর্ণ নহে, স্ফটিকের রক্তিমা জবাকুসুমরূপ উপাধিনিবন্ধন মিথ্যা প্রতীত হইয়া থাকে মাত্র। তখনই স্ফটিকের স্বচ্ছতার অপরোক্ষ জ্ঞান তাহার হইবে।

এইরূপ বিচারসহায়ে দেহাদি সর্বপদার্থের পারমার্থিক সত্যত্ববুদ্ধির নিঃশেষে বিলোপ ঘটিয়া থাকে এবং স্বস্বরূপভূত ও সুখস্বরূপ আত্মাতেই স্থিতিলাভ হয়। এই স্বরূপস্থিতিই মোক্ষ। পরমানন্দপ্রাপ্তি বা সর্বদুঃখনিবৃত্তি ইহারই নাম।

অতএব দেখা গেল যে, অর্থবুদ্ধি বিষয়ে সত্যত্ববুদ্ধি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ দুঃখনিবৃত্তি হয়

না। দেহাদি বিষয় আছে, ইহা সত্য—এই বুদ্ধি থাকিলেই দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। বাহ্য বিষয় ও দেহাদি পদার্থ কিছুই বস্তুতঃ নাই, কেবল মিথ্যা প্রতীতিমাত্র—ইহা জানিতে পারিলে তবেই যথার্থ সুখপ্রাপ্তি, আত্মস্থিতি বা দুঃখনিবৃত্তি হয়। এ কথাই কোন তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ স্বীয় অনুভববলে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

'ন জারা জায়েগা জবৃতক্
নজারা নামরূপোঁকা।
ন জব্ জায়ে নজর তবৃতক্
নিঠুর দুঃখ দুইকী॥'

—যতক্ষণ পর্যন্ত নানারূপাত্মক দ্বৈতের নজর অর্থাৎ সত্যবুদ্ধি জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত নিষ্ঠুর দ্বৈত-দুঃখ কখনই নিবৃত্ত হইবে না।

অর্থবুদ্ধি না করিলে অর্থাৎ অর্থাধ্যাস ত্যাগ করিলে থাকে শুধু জগতের প্রতীতিমাত্র। প্রাতীতিক জগৎ লইয়া ব্যবহারে শুধু বিনোদই হয়। অর্থবুদ্ধি অর্থাৎ বিষয়ের সত্যত্ববুদ্ধিই দুঃখের হেতু। অর্থবুদ্ধি না থাকিলে বিক্ষেপ, অশান্তি, দুঃখ কোথায়? দ্বৈত ছাড়িয়া মানুষ যাইবে কোথায়? যাইবার তো জায়গা নাই। **সুতরাং দ্বৈত নাই, অর্থাৎ উহার সত্যত্ব-বুদ্ধিত্যাগই দ্বৈতের ত্যাগ।** দুঃখদ দ্বৈতের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায় এই ত্যাগ—ইহাই সর্ব বেদান্তও একবাক্যে ঘোষণা করিয়া থাকেন। তখন কেবল আনন্দ। প্রতীতিমাত্র, মিথ্যা দ্বৈতের খেলা দর্শনে তখন আনন্দই হয়, কোন বিক্ষেপ বা দুঃখ হইতে পারে না। ঐন্দ্রজালিকের মিথ্যা ক্রীড়াদর্শনে সকলের বিনোদমাত্রই হয়, কোন বিক্ষেপ বা দুঃখ কাহারও হয় কি?

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই অবস্থাত্রয় আমাদের প্রাকৃতিক পাঠশালা। এই পাঠ-শালায় আমাদের শিক্ষণীয়—এই বিচার। এই বিচার কোন দেশ, কাল বা সম্প্রদায় বিশেষে আবদ্ধ, সীমিত নহে। ইহা সার্বজনীন। স্বানুভূত এই অবস্থাত্রয়ের বিচার সহায়েই ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে জগতের সকলেই স্বস্বরূপ-স্থিতিরূপ পরমলক্ষ্যে পৌছিয়া কৃতকৃত্য হইতে পারেন। ইহাই বেদান্তোক্ত অসাম্প্রদায়িক সাধন এবং ইহাই সার্বজনীন শ্রেয়োমার্গ শাশ্বত সুখলাভের উপায়।

"বাণীর অমৃত ঢালো"

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ঘনতমসায় সব ডুবে যায়!
অকাশ কালোয় কালো!
হে রামকৃষ্ণ! আনো দিগন্তে
নবীন উষার আলো!
হেথা যেন কেহ দুখী নাহি রয়!
সকলেই হোক্ আনন্দময়,
নিরাময়, সবে সবার মাঝারে
দেখে যেন শুধু ভালো!

তুমি বলে গেলে, 'কারে দিবে ফেলে?
সবই সেই নারায়ণ!
শুষ্ক তুলসী—ঠাকুর-সেবায়
তারও আছে প্রয়োজন!'
যত মত তত পথ—এই কথা!
নব-জীবনের শোনালে বারতা!
যুগের তৃষিত অধরে তোমার
বাণীর অমৃত ঢালো!

বিজ্ঞানের ট্রাজিডি ও সুমতি

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীদিলীপকুমার রায়

আপনার সঙ্গে আমার সবচেয়ে বড় মিল এই যে আপনিও মানেন যে, ধর্মীয় অনুভব উপলব্ধি যার কাছে প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছে সে ধর্ম সম্বন্ধে অনুভবের বাইরের কোনো সাক্ষীরই প্রমাণের তোয়াক্কা রাখে না। সে বলে তার দেখার কথা, শোনার কথা, অনুভবের কথা, যথা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।" আমি জানি সেই সূর্যকল্প মহাপুরুষকে যিনি অজ্ঞান তমসার যবনিকার আড়ালে দাঁড়িয়ে। অথবা বৃহদারণ্যকের (২.৪.৫): "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো, নিদিধ্যাসিতব্যঃ"—"শুধু আত্মাকেই দেখা চাই, শোনা চাই, জানা চাই, চেনা চাই।" আপনি আরো লিখেছেন: "যারা অবৈজ্ঞানিক হিসেবে জানে যে, পায়ের নিচে মাটিও আছে, আর মাথার উপরে আকাশ আছে তাদের পক্ষে এইটেই সুখবর যে, বৈজ্ঞানিকরা এখন শুধু 'মাটি ছাড়া আর কিছু জানবার নেই'—এমন কথা আর জোর ক'রে বলছেন না, আকাশের দিকে চাওয়াকেও আর মূর্খতা ব'লে অবজ্ঞা করছেন না।"

এ-কথায় সায় দিয়েও আমার শুধু এইটুকু টুকবার আছে যে, আজকের দিনে বৈজ্ঞানিকদের মনে বিজ্ঞানের সর্বার্থসাধিকা শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে বলেই তাঁদের সুর ফিরেছে। রাসেল এতে বেশি দুঃখ পেয়েছেন দুটি কারণে। প্রথমটির কথা বলেছি বিজ্ঞানের ট্রাজিডির ভিতরকার রূপটা খুলে দেখাতে: যে, যুক্তিতে বিশ্বাসও মূলতঃ অন্ধ বিশ্বাস, হিউমের এ-অভিযোগের কোনো প্রতিবাদ তিনি খাড়া করতে পারছেন না। দ্বিতীয়তঃ তাঁকে বেজেছে এই জন্যে যে, বিজ্ঞানের যে-সন্ধানের ফলে মানুষের শক্তি বাড়ছে তার মান হু হু ক'রে বাড়লেও যে-বিজ্ঞান নিছক সত্যসন্ধানী তার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা আজ মুমূর্ষু।*

একে আমি নাম দিয়েছি বিজ্ঞানের ট্রাজিডি এজন্যে নয় যে, আমি রাসেলের সঙ্গে একমত যে, বিজ্ঞানে শ্রদ্ধাকে আজ মুমূর্ষু বলা চলে বিজ্ঞানের শক্তিমত্তায় শ্রদ্ধা বাড়ার জন্যে। আমি শুধু দেখাতে চেয়েছি—বিজ্ঞান প্রথম দিকে যে ভাবত সে সবজান্তা ও সবপার্তা হ'তে পারে, তার এ-বিশ্বাস তাকে ভুল পথে চালিয়েছিল ব'লেই সে ধর্মকে মিথ্যা দিশারি নাম দিয়ে অপদস্থ করতে চেয়েছিল।

কিন্তু রাসেল প্রমুখ কয়েকজন বিজ্ঞানপূজক এ-অত্যুক্তি করলেও মানুষের মন থেকে ধর্মের মূলোচ্ছেদ করা শুধু যে সহজ নয়, তাই নয়, করতে গেলে সে এমন অথই জলে পড়ে যে তার শেষটা মনে হয়ই হয় যে, ধর্ম আত্মা ভগবান পরকাল প্রভৃতি যদি সবই মিথ্যা হয়, যদি এই কথাই সত্যি হয় যে, এ-বিশাল অচেতন

* J. B. S. Haldane তাঁর Inequality of Man-এ "A Mathematician Looks at Science" প্রবন্ধে লিখছেন: "I feel that Russell's preoccupation with mathematical physics is largely responsible for the pessimism which attributes to scientists. He writes: 'While science as the pursuit of power becomes increasingly triumphant, science as the pursuit of truth is being killed by a scepticism which the skill of the men of science has generated'." (p. 240)

গতিশীল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পৃথিবী নামে জীবজগতে চেতনার জন্ম হয়েছে দৈবাৎ, অথচ মরণ নিশ্চিত (থার্মডাইনামিক্স-এর দ্বিতীয় বিধান অনুসারে—তার পরে আমরা কেউ থাকব না শুধু কোটি কোটি নিশ্চেতন শক্তি-পারাবার নাহক ছুটোছুটি ক'রে চলবে—কত কোটি বৎসর, কে জানে ?) তাহ'লে এ-বাঁচা তো বিড়ম্বনা। কেনই বা মানুষ স্বপ্ন দেখবে শিব সত্য সুন্দর চিরন্তনের ? সে বলবেই বলবে : এ-সৃষ্টি যদি নিরর্থক, লক্ষ্যহীন দাপাদাপি মাত্র হয় তবে এসো যে যতটা পারি ভোগ ক'রে নিই—eat drink and be merry for tomorrow we die, ওরফে চার্বাকের ভাষণে : "যাবদ্ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।"

ট্রাজিডি এল বিজ্ঞানের গোড়াকার উপপত্তিটিই (premise) ভুল ছিল ব'লে : যে, এ-বস্তুবিশ্বের মূল উপাদান জড় কিনা অচেতন, এবং এহেন জড় জগতে জীবের প্রাণ মন চৈতন্য এ সবই অবান্তর, অন্তিম সত্য হচ্ছে এর জাড্য, ওরফে অচেতনতা। তাঁরা মহাত্মা মহাপুরুষদের এজাহার সরাসর অস্বীকার ক'রে বললেন : "ওঁদের কথা আমরা মানতে যাব কী দুঃখে যখন আমার বিশ্লেষণী বুদ্ধির সৃষ্ট বকযন্ত্রে ভাগবত চেতনার রসের ছিটে ফোঁটারও দেখা পাচ্ছি না ?" মহাপুরুষেরা বললেন : "যে-বিশ্বচৈতন্যের রসের খবর পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি, সে-ভূমাকে দেখে জেনে চেখে চিনে তুমিও ধন্য হ'তে পারো যদি চাও। কিন্তু চাইলে ছাড়তে হবে এই দাবি যে, তিনি দেখা দেবেন তোমার সর্তে তোমার বকযন্ত্রে—তোমার স্ট্যাটিস্টিক্সকে মান দিতে। বলতে হবে তোমাকেও : আমি তোমার শরণ নিলাম তুমি আমাকে গ্রহণ ক'রে আমাকে দেখা দিয়ে কোলে তুলে আমাকে ধন্য করো। তোমার কী ইচ্ছা আমাকে জানাও আমার চেতনাকে তার প্রামাণিক জড়তা থেকে মুক্তি দিয়ে।" বৈজ্ঞানিক একথায় রেগে ওঠে বললেন : "অসম্ভব। আগে থাকতে মেনে নেব কেমন ক'রে ? আগে জানব তবে মানব।" মহাপুরুষ বললেন হেসে : "এ-সর্ত ক'রে তাঁর দেখা পাওয়া অসম্ভব। কেননা তাঁর বিধান—আমরা জেনেছি প্রত্যক্ষভাবে—আগে মানলে তবে জানতে পারবে।" এরই খৃষ্টান নাম—meekness ওরফে humility, সংস্কৃত নাম—দীনতা, শরণাগতি। মহাপুরুষ বললেন, অনু-কম্পায় গ'লে "আনন্দের সমুদ্র তোমার আশপাশে ব'য়ে চলেছে বন্ধু, কিন্তু তার সঙ্গে যোগসূত্র তোমাকে অর্জন করতে হবে যদি সে-আনন্দ-সাগরে স্নান ক'রে ধন্য হ'তে চাও। এ-যোগ-সূত্রের একটিমাত্র পথ আছে : তোমার ক্ষুদ্র অহং-এর দাবিকে নাকচ ক'রে মাথা নোয়াতে হবে অজানা সত্তার কাছে অন্তরের দিশাকে বরণ ক'রে প্রশ্নসংশয়দের দাবিদাওয়াকে দাবিয়ে রেখে।" বৈজ্ঞানিক বললেন : "অসম্ভব। যে-পরীক্ষা নিরীক্ষা পরিসংখ্যানের পথে চ'লে আমি আজ জগন্নাথ হয়েছি সে-পদবী আমি ছাড়তে নারাজ।" মহাপুরুষ বললেন হেসে : "বেশ, তবে চলো এই মিথ্যে পদবীর ঘোড়শোয়ার হ'য়ে তোমার সীমাবদ্ধ যুক্তিবিচারকে লাগাম ক'রে, দেখ ঘুরেফিরে—ওপথে যা পাও তাতে মন ভরে কি না। আমার মন যে-পথে ভরেছে সেপথে আমি চলব। কেবল ব'লে রাখি—লিখে রাখো—যে, এই গোয়ালে একদিন না একদিন সবাইকেই মাথা মুড়ুতে হবে—এই শরণাগতির আবাহনের মন্ত্র জপ ক'রে—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—যদি মৃত্যুলোক থেকে অমৃতলোকে উত্তীর্ণ হ'তে চাও। তাই এখন আসি। যখন দেখবে

যে তোমার পথে চ'লে না পাবে মনে শান্তি, না আনতে পারবে তা জগতে—গণমনের আসুরিক প্রবৃত্তিরা আস্কারা পেয়ে সুরু করবে সৃষ্টি করতে মারণাস্ত্র (যার শেষ পরিণতি আণবিক বোমা); যখন দেখবে যে, বৈজ্ঞানিক যান্ত্রিকতার নানা আবিষ্কারে মানুষের বাহ্য সমৃদ্ধির চাবিকাঠি মিললেও কোনো গভীর আন্তর সার্থকতার দিশা মেলে না, প্রেম জাগে না, প্রাণের ভাষা থাকে না, বুকের মধ্যে কেবল শূন্যতার হাহাকারই ফুলে ওঠে, তখন হয়ত আসবে তোমার চিত্তে সেই দীনতার ডাক যে অন্তরদেবতাকে বলে: "আমি চাই অমৃত হ'তে, কেবল তার পথ জানি না, তুমি পথ দেখাও—কারণ আমি জেনেছি যে, এ-ভাবের সুর আমার হৃদয়ে জেগেছে তোমারি কৃপায়। সেই কৃপাকেই আমি চাই আরো পূর্ণভাবে পেতে, যে-আলোর কণিকা দিয়েছ আমাকে তাকেই জ্বালিয়ে রেখে পথ খুঁজে পাবই পাব কেন না আমি জানতে পেরেছি যে এই-ই তোমার বিধান।"

বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞ হেসে এ-সুরকে মিডীভাল (সেকেলে) ব'লে বাতিল করলেন ব'লেই দেখতে পেলেন না যে, আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়েই এই শ্রদ্ধার বীজ থাকলেও তাকে লালন না করলে ফসল ফলে না। কিন্তু ক্রমশঃ পরে যখন দেখলেন যে কোনো প্রশ্নেরই চরম উত্তর মানস বুদ্ধিবিচারের পথে পাওয়া যায় না, মনের কালি কাটে না, স্বভাবের বর্বর নিচুটান কাটানো সময়ে সময়ে অসম্ভব হ'য়ে অশান্তিতে মন অন্ধকার হ'য়ে আসে তখন গভীরদর্শী কোনো কোনো বৈজ্ঞানিকের মনে দাবিয়ে-রাখা ধর্মে-শ্রদ্ধার চারাগাছ ফের মাথা তুলল, তাঁরা একটু একটু ক'রে এই কথাটি বুঝবার কিনারায় এলেন যে, বিজ্ঞান ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে না পারলেও অপ্রমাণ করতেও যখন পারে না, তখন মহাপুরুষদের কথায় কান দিয়ে তাঁদের নির্দেশপথে চলতে চেষ্টা করতে যদি নাও পারি তাহলেও যাঁরা সেপথে চ'লে অনেক কিছু আনন্দময় সত্য উপলব্ধি করছেন তাঁদের এজাহারকে বাতিল করা হবে অযৌক্তিক। যে-পথে চ'লে তাঁরা অধ্যাত্ম-সত্যের দেখা পেয়েছেন সে-পথে না চ'লেই তার লক্ষ্যসিদ্ধি সম্বন্ধে মত দেওয়া হবে গাজোয়ারি ঔদ্ধত্য। এই কথাটিই বড় চমৎকার ক'রে বলেছেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার জেম্‌স জীন্‌স তাঁর অনবদ্য THE MYSTERIOUS UNIVERSE-এর শেষ অধ্যায়ে। এখানে এ-অধ্যায়টির চুম্বক দেওয়ার স্থান নেই। তবু তাঁর শেষের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

তিনি অগ্নিময় ব্রহ্মাণ্ডের বেগময় সত্তার পরিচয় দিয়ে বলছেন যে, আজকের দিনে বৈজ্ঞানিকের কাছে এ-ব্রহ্মাণ্ডকে আর মনে হয় না এক বিশাল যন্ত্র যে গাণিতিক ভঙ্গিতে চলেছে তার নির্দিষ্ট পথে; মনে হয় বরং এক বিশাল চিন্তার আধার যেখানে মন বস্তুর স্রষ্টা তথা নিয়ন্তা হ'তে চলেছে—খণ্ড মন নয় অবশ্য—সেই মহামন যার অতল গর্ভে অণুপরমাণুর নিত্য অধিষ্ঠান। বলতে সুরু করেছেন তিনি বিনয়ী ভঙ্গিতেই যে, এক সময়ে আমরা বিজ্ঞানের সত্য-আবিষ্কারের ক্ষমতা সম্বন্ধে যতই কেন না বড়াই ক'রে থাকি—"No scientist who has lived through the last thirty years is likely to be too dogmatic either as to...the direction in which reality lies." বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নোবেল লরিয়েট অ্যালেকসিস ক্যারেল তাঁর যুগপ্রবর্তক MAN THE UNKNOWN-এ এই কথাটিই বারবার বলেছেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যে বিজ্ঞান এতদিন

কেবল বাহ্য বস্তুজগতেরই খবর চেয়ে এসেছে —সে-খবর পেয়ে সে যথেষ্ট লাভ করেছেও বটে, কিন্তু তবু—বলছেন তিনি জোর দিয়েই—বিজ্ঞানের লক্ষ্য শুধু মানুষের বাহ্য সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধান নয়, তাকে চাইতে হবে মানুষের আন্তর (আধ্যাত্ম) সাধনা মানুষের কাজে লাগতে। তাই "As much importance should be given to feelings as to thermodynamics. It is indispensable that our thought embraces all aspects of reality."* কারণ আমাদের সন্ধানী চিন্তা মানুষকে সমগ্রভাবে নিরীক্ষা পরীক্ষা না করলে হবে যা হয়েছে (হায়রে!): "We have gained the mastery of everything which exists on the surface of the earth, excepting ourselves."† এ-যুগের আর একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক জে. বি. রাইন তাঁর বিখ্যাত NEW FRONTIERS OF THE MIND-এও ক্যারলের সুরে সুর মিলিয়ে বলছেন যে, অবশেষে আমাদের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে আজ, তাই এতদিনে আমাদের চোখে পড়েছে আমাদের সমাজের সত্যি সত্যি কী টলমলে অবস্থা, আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমাদের সব অবস্থা জানতে হবে আমাদের নিজেদেরকে, নৈলে আমাদের দুরবস্থার নিরসন হবার নয়।···কারণ যথার্থ আত্মজ্ঞান না হ'লে আমরা আগেকার যুগের মতন চলব সেই সনাতন হাৎড়ে হাৎড়ে চলার পথে—আর এভাবে চলার পথে যে বিপদ সমূহ তা কি আর বলতে হবে?[১]

এ-বিপদ যে কী তা কি আজ কারুর অজানা আছে দু' দুটো বিশ্বযুদ্ধের নরকতাণ্ডবের পর? বিজ্ঞান ভেবেছিল যে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষ-কে প্রকৃতির নানা শক্তির 'পরে কর্তৃত্ব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রামরাজ্য আসবেই আসবে—সৌভ্রাত্রের হাটে বসবেই বসবে সমৃদ্ধির অফুরন্ত আনন্দমেলা—দেখতে দেখতে পত্তন হবেই হবে বিশ্বসাম্রাজ্যের (one world, one empire) যেখানে নানাজাতি দেবে প্রেমের রাজকর—যে-রাজ্যের কথা Norman Angel তাঁর The Great Illusion সবপ্রথম বইটিতে এঁকে ছিলেন মোহন রঙে পঞ্চাশ ষাট বৎসর আগে। কিন্তু আমাদের মধ্যে যে-বর্বর অসুরের বাস তাকে না স্থানচ্যুত করতে পারলে কে বসাবে এই রামরাজ্য? বার্নার্ড শ মিথ্যা বলেন নি যে মানুষের নানা আসুরিক প্রবৃত্তিকে যদি বিশ্ব-প্রেমের কাছে দীক্ষা নিতে বাধ্য ক'রে সভ্যভব্য করতে না পারা যায় তাহলে যে-কোনো মহৎ কাজেই তাকে নিয়োগ করো না কেন সে সব ভেস্তে দেবে যেমন কাম ও অহঙ্কার যে-কোনো প্রেমকে ভেস্তে দেয় আবিল ক'রে।

কিন্তু এ-মহাসাধনার ভার নিতে পারে না, দিশা দিতে পারে না আমাদের বস্তুবিচারী মানস বুদ্ধি (materialistic intellect) যা বিজ্ঞানের প্রধান হাতিয়ার। হাত পাততে হবে বুদ্ধির পারে বোধির কাছে যে বলে: "জ্ঞাত্বা

---

* Chapter VIII The Remaking of man ... ... MAN THE UNKNOWN,

† Chapter I, Need of a Better Knowledge of Man ...... MAN THE UNKNOWN

১ "...... the most urgent problem of our disillusioned and floundering society is to find out more about what we are, in order to discover what we can do about the situation in which we exist today. In the conduct of our ...... outward and inward lives, we recognise more and more the need for a profounder self-knowledge than any former age had. Until we know more about ourselves ...... we are moving blindly in a world whose patterns are constantly more complex and hazardous." (Chapter 1.)

দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ"—ভগবানকে জানলে তবেই মানুষ জীবন্মুক্ত হ'তে পারে, নৈলে নয়। বিজ্ঞান আজকের দিনে চাইছে যে-ঠুনকো আত্মজ্ঞান নানা মনস্তাত্ত্বিক মনোবিকলনের বিশ্লেষণের আলোয়, সে-আলো কিছুদূর অবধি পথ দেখাতে পারে বটে কিন্তু তার সাধ অসীম হ'লেও সাধ্য সামান্যই। তাই বৈজ্ঞানিককে নত হতে হবে শেষমেশ মহাপুরুষেরই পায়, দিশা চাইতে হবে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ প্রমুখ অবতারকল্প মহামানবের তথা ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষদের কাছে। নৈলে সাধন হবে না নব-আবাহন গভীর-তম আত্মবোধের—মিলবে না পরাবিদ্যার বর—প্রেম বিশ্বাস বিশ্বাত্মবোধ—শুধু মস্তিষ্কচালনী বুদ্ধির কাছে মিলবে না এ দিশা, কেন না :

"The limitations of reason become very strikingly, very characteristically, nakedly apparent when it is confronted with that great order or psychological truths and experiences which we have hitherto kept in the back-ground—the religious being of man and his religious life. Here is a realm at which the intellectual reason gazes with the bewildered eyes of a foreigner who hears a language of which the words and spirit are unintelligible to him and sees everywhere forms of life and principles of thought and action which are absolutely strange to his experience. He may try to learn this speech and understand this strange and alien life, but it is with pain and difficulty, and he cannot succeed unless he has, so to speak, unlearned himself and become one in spirit and nature with the natives of this celestial empire."

ভাবার্থ : "বুদ্ধির যে সীমা কোথায় সেটা অতি নগ্নভাবে ধরা পড়ে যখন তাকে আধ্যাত্মিক জগতের সত্য ও উপলব্ধি-সমূহের সামনাসামনি দাঁড় করানো যায়—যে-জগৎকে আমরা এতদিন ধর্তব্যের মধ্যেই আনি নি। এই একটি জগতের সামনে পড়লে বুদ্ধির যুক্তি-তর্ককে বাত্মূঢ় হ'য়ে তাকিয়ে থাকতে হয়, যেন সে কোথাকার কোন্ পরদেশী, যে না বোঝে এখানকার ভাষা, না বোঝে তার নিগূঢ় অর্থ। এ-জগতের সংস্পর্শে সর্বত্রই জীবনের এমন সব রূপের, চিন্তার, কর্মের তত্ত্বের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটতে থাকে যা তার অভিজ্ঞতায় একেবারেই চৈনিক হেঁয়ালি। অবশ্য সে এই ভাষা শিখবার, এই অচেনা অজানা জীবন বুঝবার চেষ্টা করতে পারে; কিন্তু তাতে প্রতি পদে তার বাধা ও বেদনা বাজে। এ-চেষ্টা তার বিড়ম্বনা—যদি না সে আপন গণ্ডীর শিক্ষাদীক্ষা নিঃশেষে ভুলে গিয়ে এই অমৃতলোকের অধিবাসীদের সঙ্গে ধর্মে ও প্রকৃতিতে এক হ'তে শেখে।*

এ ধরনের কথা শুনলে প্রথমটায় বুদ্ধিসর্বস্ব মানুষের চটে ওঠা আশ্চর্য নয়, কারণ কোনো কিছু 'জানি না' কবুল করতে মানস বুদ্ধির নধর অহমিকায় আঘাত লাগে, সাধুসন্তের কাছে মাথা নত করতে হবে ভাবতেও সে রেগে আগুন হ'য়ে ওঠে। কিন্তু প্রতি নব সত্য নব উপলব্ধিরই দাম দিতে হয় সব আগে আত্মাভিমানকে বর্জন ক'রে বলতে শিখে : "আমি জানি না, কিন্তু সত্যিই জানতে চাই, তাই চাই পথের দিশা—কোন্ পথে গেলে জানা যায় "যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োন্যদ্ জ্ঞাতব্যম্ অবশিষ্যতে"—যা জানলে—অর্থাৎ পরা বিদ্যা—আর কিছু না জানলেও চলে—কিন্তু তিনি যে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির নাগালের বাহিরে, কেন না :

* শ্রীঅরবিন্দের Psychology of Social Development, ১৩শ অধ্যায়; শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর অনুবাদ।

"The mind and the intellect are not the key. They can only trace out and revolve in a circle of half-truths and uncertainties. But in the mind and life, in all the action of the intellectual, the aesthetic, the ethical, the dynamic and practical, the emotional, sensational, vital, physical being, there is that which sees by identity and intuition and gives to all these things such truth and such certainty and stability as they are able to compass." "Man's road to supermanhood will be open when he declares boldly that all he has yet developed, including the intellect of which he is so rightly, and yet so vainly proud, are now no longer sufficient for him, and that to uncase, discover, set free this greater power within shall be henceforward his great preoccupation."

ভাবার্থ:—"মন ও বুদ্ধি আধ্যাত্মিক জগতের শ্রেষ্ঠ দিশারি নয়। এরা যা পারে, সে হচ্ছে একটা অর্ধ-সত্যের ও অনিশ্চয়তার বৃত্ত এঁকে তারই বর্ত্মে চক্রাকারে আবর্তন করতে। কিন্তু মানুষের মন ও প্রাণ, বুদ্ধি ও সৌন্দর্যজ্ঞান, নীতিবোধ ও গতিধর্ম, ব্যবহারিক কর্ম ও ভাবপ্রবণতা, ভোগ-লোলুপতা ও শারীর চেতনা এ সবের মধ্যেই আছে সেই পরম চেতনা যার দৃষ্টি সকল সৃষ্টির স্বরূপের সঙ্গে একাত্মতার ফল, এবং এই চেতনাই মন প্রাণ বুদ্ধি ইত্যাদির প্রত্যেককে দান করছে ততটা সত্য, ততটা স্থিতি, ততটা প্রতিষ্ঠা, যতটা তারা প্রত্যেকে ধারণ করতে সক্ষম।" "মানবে অতিমানব হবার পথ খুলে যাবে তখনই—যখন সে নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষণা করবে যে, এতদিন পর্যন্ত সে যা গ'ড়ে তুলেছে, আয়ত্ত করেছে (এমন কি বুদ্ধি পর্যন্ত—যার জন্যে সে ন্যায়তঃই, এবং কতকটা অবোধের মতনও বটে, গর্ব অনুভব করে) তা আর তার পক্ষে যথেষ্ট নয়, এবং তার নিজের মধ্যেকার বৃহত্তর শক্তিকে মুক্ত করাই হবে তার পরম ধ্যান, চরম স্বপ্ন।"*

এই-যে-সত্য, এই-যে-চেতনা মানুষকে আবহমানকাল বর্তমানের শোকাবহ বাস্তবতার পর্ব থেকে অনাগত আলোর যুগান্তরের দিকে রওনা ক'রে দিয়ে এসেছে, এ কি কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা মানস যুক্তিতর্কের ধার ধারতে পারে? যুক্তিতে তো সে বিধৃত নয়, যুক্তিই যে এ-দৈব প্রেরণায় বিধৃত—তাকে প্রকাশ ক'রে তবেই না যুক্তির সার্থকতা! সে যে ধ্রুব করায়ত্তকে ছাড়ে অন্তরের দুর্নিবার প্রণোদনায়, বিচক্ষণ যুক্তির সাবধানী তাগিদে তো নয়। নীটশের ভাষায় বলতে গেলে বলা যায়, সব অধিগত সম্পদকে সে ছাড়ে এই জন্যেই যে সে অন্তরে অন্তরে জানে যে, "Um die Erfinder von neuen werthen sich die welt"—অর্থাৎ "নূতনের (values) পূজারীকেই বিশ্ব প্রদক্ষিণ করে।"

বিজ্ঞান ভালো করতে গিয়ে মন্দও করেছে কম নয়—টেনে এনেছে আমাদের সর্বধ্বংসের সামনে। তাই হয়ত আজ তার বুদ্ধি অহঙ্কার নম্রশীর্ষ হ'য়ে বিনয়ের কাছে হাত পেতেছে আলোর জন্যে। এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনকে মানতে হয়েছে যে, কেবলমাত্র বিজ্ঞানের চর্চায়ই মানুষের মুক্তি নেই। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে কালি-ফর্ণিয়ায় তিনি একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন,

* শ্রীঅরবিন্দের Psychology of Social Development, ২২শ অধ্যায়; শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর অনুবাদ।

বিজ্ঞান কী ভাবে চলেছে আত্মঘাতের পথে। দুঃখ করেছিলেন এই ব'লে যে, "বিজ্ঞান যুদ্ধে আমাদের হাতে জুগিয়ে দিয়েছে পরস্পরকে বিষ দেবার বা বিকল করবার ক্ষমতা, আর শান্তিকে আমাদের করেছে কর্মব্যস্ত অনিশ্চিত ও যন্ত্রের দাস।" (পীটার মাইকেল মোর-এর সদ্যোজাত "EINSTEIN" জীবনী থেকে উদ্ধৃত।)

এ-ট্রাজিডির কথা আরো বিশদ ক'রে লিখেছেন অলডাস হক্সলি তাঁর বহুপঠিত ENDS AND MEANS-এ। তাঁর BELIEFS অধ্যায়ে তিনি যা লিখেছেন, এখানে তার চুম্বকটুকু দিচ্ছি:

"আমরা আজ আর বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের যুগের মুগ্ধ আত্মপ্রসাদের যুগে নেই, এসে পড়েছি মোহভঙ্গের দুঃখময় প্রভাতে যখন গোলাপী নেশা কেটে গেছে দেখতে পেয়ে যে, বিজ্ঞান আমাদের উন্নততর হাতিয়ার জুগিয়েছে নিম্নতর লক্ষ্যসিদ্ধির জন্যে। বিজ্ঞান মানুষের আর একটা অপকার করেছে এই যে, আজকের গণমত বিজ্ঞানের গোনা-গন্তির জগৎকেই এ-ব্রহ্মাণ্ডের নিত্য রূপ ব'লে ধরে নিয়ে সিদ্ধান্ত করেছে—প্রথম যুগের বৈজ্ঞানিকদের মতন*- যে সৃষ্টির না আছে কোনো মাথামুণ্ডু, না আছে কোনো উদ্দেশ্য। কিন্তু এহেন জগতে কেউই বাঁচতে চায় না। লক্ষ্যহীন গতির নেশায় মত্ত হয়ে থাকতে পারে মানুষ কদিন? কাজেই জীবনের 'পরে একটা উদ্দেশ্য আরোপ করতে তারা জাতীয়তা, ফ্যাশিসম্ ও কম্যুনিসম্‌কে বরণ করেছে—দার্শনিক দিক দিয়ে যাদেরকে হসনীয়ই বলব। কিন্তু হ'লে হবে কি, এ-সব বুলির মধ্যে দিয়ে তারা জীবনের যাহোক একটা অর্থ খুঁজে পায় তো, তাই এ নিয়ে করে দুরন্ত সিংহনাদ।

আশা করা যাক গণমনও ক্রমশ বুঝবে ঘা খেতে খেতে যে, এসব বুলিতে নেই শান্তি কি সান্ত্বনা, মানুষকে সার্থক হ'তে হলে চাইতেই হবে মানবতাকে কাটিয়ে দিব্য জীবনে প্রতিষ্ঠা—ভগবানের আবাহনে নব ধর্মরাজ্যের প্রবর্তনে। শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রীর মন্ত্রঝংকৃত ভাষায়:

A deathbound littleness is not all we are:
Immortal our forgotten vastnesses
Await discovery in our summit selves.

মৃত্যুঘেরা নগণ্যতা নহে তো স্বরূপ আমাদের:
বিস্মৃত বিপুল ব্যাপ্তি আছে পথ চেয়ে—কবে তারে
আমরা চিনিয়া লব আপনার সত্তার শিখরে।

আজকের বিজ্ঞান যে-পথে চলেছে সে-পথ ভুল পথ বলি না, কিন্তু শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানকে বরণ করতে হবেই হবে মানবাত্মার শিখর-অভিযান, অমৃত-তীর্থযাত্রা। এ-সাধনারও দিশা পাবেই পাবে অনাগত যুগের বৈজ্ঞানিক যদি সে সত্যি চায় সে-দিশা ও বরণ করে সে-সন্ধানের সর্ত ও সাধনা। সেই দিনই কেবল বিজ্ঞানের কাপালিক ট্রাজিডির অবসান হ'য়ে তার সবেজাগা সুমতির শেষফল ফলবে—জ্ঞান প্রেম ভক্তি ও সেবার মহাসমন্বয়ে

---

* যদিও এযুগের বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টিভঙ্গির বদল হয়েছে তাদের সুমতি হয়েছে ব'লে, তাই একথা তাঁরা আর বলেন না। আজ তাঁরা কী সুর ধরেছেন একটু আগেই তার ছবি এঁকেছি।

আলমবাজার মঠ

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

আজ হইতে তিয়াত্তর বৎসর পূর্বে কোন এক স্নিগ্ধ অপরাহ্নে আপনি যদি কোন বন্ধুর সহিত বা একাকীই আলমবাজার মঠে যাইতেন, আপনাকে কলিকাতার বীডন স্কোয়ারে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া চিতপুর রোড হইয়া বাগবাজার পুলের উপর দিয়া কাশীপুর রোড ধরিয়া বরাহনগর বাজারে পৌছাইতে হইত। তখনকার দিনে সামান্য কয়েকটি পয়সা খরচ করিয়া শেয়ারের গাড়ীতে বীডন স্কোয়ার হইতে বরাহনগর বাজারে আসা যাইত। কাছেই রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে ফাগুর প্রসিদ্ধ খাবারের দোকান। সেই দোকান হইতে মঠের সাধুদের জন্য খাস্তা কচুরি কিনিয়া লইয়া যাইতে পারিতেন। শুনা যায় শ্রীশ্রীঠাকুর ফাগুর দোকানের কচুরি ভালবাসিতেন।* যেখানে এই দোকান ছিল সেখানে এখন প্রকাণ্ড ত্রিতল বাটী। নিম্নতলে ডাক্তারখানা ও কয়েকটি দোকান। দ্বিতলে ব্যাঙ্ক, ত্রিতলে অনেক গৃহস্থ আশ্রয় পাইয়াছেন।

তাহার পর কিন্তু আপনাকে হাঁটিতে হইত। অবশ্য নিজের গাড়ী থাকিলে আর হাঁটিতে হইত না।...তাহার পর আলমবাজার চৌমাথায় পৌছিয়া মঠের সন্ধান করিলে যে কেহ আপনাকে মঠবাড়ী দেখাইয়া দিত। কিছুক্ষণ সাধুসংসর্গে পুণ্যসঞ্চয় করিয়া আরও মাইল দেড়েক উত্তরে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলানিকেতন। রানী রাসমণির অমর কীর্তি ভবতারিণীর মন্দিরও দেখিয়া আসিতে পারিতেন। উহা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী বলিয়াই বিশেষ পরিচিত।

আর যদি নৌকায় যাইবার আপনার ইচ্ছা হইত, বড়বাজার বা আহারীটোলার ঘাট হইতে নৌকা ভাড়া করিয়া আলমবাজারে লোচন ঘোষের ঘাটে গিয়া পৌছিতেন। গঙ্গার নিসর্গ শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। ঘাটের উপর দ্বাদশ শিবমন্দির দর্শন করিয়া পূর্ব দিকে কিছু দূর অগ্রসর হইলেই চৌমাথা। সে স্থান হইতে অল্প দূরেই মঠ।

এখন কিন্তু কলিকাতা হইতে ৩২ বা ৩৪নং বাসে, কিংবা ট্রেনে দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে নামিয়া একেবারে আলমবাজার চৌমাথায় পৌছিতে পারেন। কাছেই পোষ্ট অফিস। তাহার কিছু পশ্চিমে ৯৫নং দেশবন্ধু রোড (পশ্চিম)—এর দ্বিতল বাড়ীতেই মঠ ছিল।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আদি লীলা কামারপুকুরে, মধ্য লীলা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে ও কলিকাতার শ্যামপুকুর অঞ্চলে এবং অন্ত্যলীলা কাশীপুর উদ্যানবাটীতে।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট রবিবার রাত্রি ১টার পর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব মহাসমাধিমগ্ন হন। ৯০নং কাশীপুর রোডস্থ উদ্যানবাটীর লীজ (Lease)-ও প্রায় ফুরাইয়া আসে। তখন তাঁহার গৃহত্যাগী শিষ্যদের কোন আশ্রয় ছিল না। শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন সন্ধ্যাকালে ভক্তপ্রবর সুরেশচন্দ্র মিত্রকে দর্শন দিয়া তাঁহার ছেলেদের সাহায্য করিতে আদেশ করেন। সুরেশচন্দ্রও তদনুসারে স্বামীজীকে বাড়ীর অনুসন্ধান করিতে বলেন, এবং তিনি মাসিক

---

* শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় (২য় সংস্করণ) পৃষ্ঠা—১৫৪।

যে অর্থ সাহায্য করিতেন[১] তাহাও করিতে থাকিবেন এ প্রতিশ্রুতি দেন।

বাড়ীর অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। অবশেষে কাশীপুর উদ্যানবাটীর প্রায় এক মাইল উত্তরে বরাহনগরে প্রামাণিক ঘাট রোডে টাকীর প্রসিদ্ধ জমিদার মুন্সীদের ভগ্নপ্রায় দ্বিতল বাড়ীটি মাসিক ১০৲ টাকায় ভাড়া লওয়া হয়। গৃহত্যাগী ভক্তদের একটু আশ্রয় মেলে।[২] ভক্ত ভবনাথ বাড়ীটি ভাড়া করিয়া দেন।*

১৮৯০-৯১ খৃষ্টাব্দে পূজনীয় মাষ্টার মহাশয় মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের নিকট হইতে অনেক শিক্ষিত যুবক বরাহনগর মঠের সন্ধান পাইয়া তথায় যাতায়াত আরম্ভ করেন। তন্মধ্যে সুধীরচন্দ্র চক্রবর্তী (স্বামী শুদ্ধানন্দ), কালীকৃষ্ণ বসু (স্বামী বিরজানন্দ), খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (স্বামী বিমলানন্দ), গোবিন্দচন্দ্র শুকুল (স্বামী আত্মানন্দ), হরিপদ চট্টোপাধ্যায় (স্বামী বোধানন্দ) এবং সুশীলচন্দ্র চক্রবর্তী (স্বামী প্রকাশানন্দ)-ই প্রধান। কালীকৃষ্ণ বসু প্রমুখ কয়েকজন যুবক বরাহনগর মঠেই যোগ দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন এই ভগ্নপ্রায় সংকীর্ণ বাড়ীতে স্থানাভাব ঘটিল। সেই কারণে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে আরও মাইল-দুই উত্তরে আলমবাজারে মঠ স্থানান্তরিত হইল। গৃহত্যাগী যুবকেরা সেখানে আশ্রয় পাইলেন। বৃদ্ধা গোপালের মা ও গৌরী-মাও মাঝে মাঝে সেখানে আসিয়া এক তলায় একখানি ঘরে থাকিতে লাগিলেন।[৩]

শুনা যায় প্রামাণিক ঘাট রোডের ৺বৈদ্যনাথ দে মহাশয় কাশীপুর শ্যামাচরণ মৈত্র লেনের ৺নবীন গুড়ের (৺নবীনচন্দ্র দে মহাশয়ের) আলমবাজারের বাড়ীটি মাসিক ১০৲ টাকাতেই ভাড়া করিয়া দেন।

স্বামীজীর মধ্যম ভ্রাতা ৺মহেন্দ্রনাথ দত্তের বর্ণিত আলমবাজার মঠবাড়ীর চিত্রটি এইরূপ: "মোটা-থামওয়ালা বাটী, সদর-দোর দিয়ে ঢুকে, দুটো ছোট ছোট রক্, সামনে উঠান ও তার পশ্চাতে তিনফোকর ঠাকুরদালান। উঠানের একপাশে ঘোরান সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে দক্ষিণ ও পূর্বদিকে দুটো বারাণ্ডা। পূর্বদিকের বারাণ্ডার পশ্চাতে একটা বড় ঘরের সামনে একটা ছোট ঘর। দক্ষিণের বারাণ্ডা দিয়ে তিন খানা ঘরে যাওয়া যায়। বাঁদিকের ঘরটি ঠাকুর-ঘর। ঠাকুরঘরের পাশ দিয়ে নীচে নামবার সিঁড়ি। সিঁড়ির পূর্ব কোণের ঘরটিতে ভাঁড়ার থাকতো। দক্ষিণের আর একখানি ঘরে সকলে থাকতো। এ ছাড়া বাড়ীটার পশ্চিম দিকেও তিনখানা ঘর ছিল। তার একটিতে শশী মহারাজ থাকতেন। তার পাশের ঘরটিতে কালী মহারাজ থাকতেন। আর একখানিতে তুলসী মহারাজ থাকতেন। নীচে রান্নাঘরের সুমুখে একটা গলি, তার পরে বাঁধান পুকুর। পূর্বদিকেও আর একটি পুকুর ছিল। লাটু মহারাজ মঠে আসিয়া দোতলায় পূর্বদিকের বড় ঘরখানিতে থাকতেন।"[৪]

পূজনীয় স্বামী অখণ্ডানন্দজী তাঁহার "স্মৃতি-কথায়" লিখিয়াছেন—"মঠবাড়ী এত বড়, কিন্তু

১ The History of Sri Ramakrishna Mission—Page. 43

২ বরাহনগর মঠের বিশদ বিবরণ ১৩৭১ সালের চৈত্র ও ১৩৭২ সালের বৈশাখ মাসের উদ্বোধন পত্রিকায় দেখিতে পাওয়া যাইবে।

* শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা। (২য় সংস্করণ) পৃষ্ঠা—২৭৫

৩ The History of Sri Ramakrishna Misson. Page—68

৪ শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা (২য় সংস্করণ)—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়—পৃষ্ঠা ২৯৭

ভাড়া মাত্র ১০৲ টাকা। ইহার কারণ দুজন লোক এ বাড়ীতে আত্মঘাতী হইয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। এজন্য এই বাড়ীর ভাড়াটিয়া জুটিত না।”

ভূতের বাড়ী বলিয়া সাধুদের মধ্যে বেশ ঠাট্টা তামাসা চলিত। নিজেদের মধ্যেই কয়েকজন ছাদের উপর ডাম্বেল গড়াইয়া গড়্‌গড়্‌ শব্দ করিতেন যাহাতে অন্যান্য সাধুরা ভয় পান। লাটুমহারাজ (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) ভূতের ভয়ে সমস্ত রাত্রি ঘরে আলো জ্বালিয়া রাখিতেন।[৫]

গঙ্গাধর মহারাজের ‘স্মৃতিকথা’য় আরও জানিতে পারা যায় যে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে যখন তিনি তীর্থপর্যটনের পর আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসেন, তখন ঐ স্থানে স্বামী প্রেমানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, শিবানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, ও সচ্চিদানন্দ (বুড়ো বাবা) প্রভৃতি মহারাজেরা বাস করিতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, সারদানন্দ ও ত্রিগুণাতীত মহারাজ প্রায়ই কলিকাতায় থাকিতেন।[৬] আরও কিছুদিন পরে তাঁহারা স্থায়িভাবে সকলেই আলমবাজার মঠে বাস করিতে থাকেন।

স্থানাভাবে সাধুরা বাটী পরিবর্তন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের আর্থিক অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটিল না। অনেকেই প্রায় “কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ” হইয়া থাকিতেন। বাহিরের অপরিচিত কোন ভদ্রলোক আসিলে একখণ্ড বহির্বাস টানিয়া লইয়া পরিতেন। আহারাদির ব্যবস্থাও অনুরূপ ছিল। দিনের বেলায় কোন রকমে ভাত, ডাল ও চচ্চড়ি, এবং রাত্রে শুক্‌নো রুটি জুটিত। যে দিন অল্প একটু দুধ মিলিত, সে দিন উৎসব লাগিয়া যাইত।[৭]

৫ স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃঃ ১৬৫
৬ ঐ পৃঃ ১৩১
৭ ঐ পৃঃ ১৩৩

এখানেও ধ্যানধারণা ও শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠে দিন কাটিত। স্বামীজীর বক্তৃতাগুলি পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া এই সময় মঠে আসিত। গুরুভ্রাতারা সকলেই সাগ্রহে সেই সকল পুস্তিকা পাঠ করিতেন। স্বামী অভেদানন্দ হৃষীকেশের মণ্ডলীশ্বর স্বামী ধনরাজ গিরির নিকট শারীরক-ভাষ্য পড়িয়া আসেন। স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রতিদিন বৈকালে দুইঘণ্টাকাল বেদান্তভাষ্য পড়িতেন। আলমবাজার মঠে বৈদিক বিদ্যালয় স্থাপন করার চেষ্টাও হইয়াছিল। কিন্তু অর্থের ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাবে সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।[৮]

বরাহনগর মঠের ন্যায় আলমবাজার মঠেও শশী মহারাজ নিজস্কন্ধে সানন্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার্চনার ভার লইয়াছিলেন। পূজার জন্য অপরের বাগানে ফুল তুলিতে গিয়া অনেক সময় তাঁহাকে অপমান সহ্য করিতে হইত। ভোগাদি সংগ্রহের জন্য তিনি ভিক্ষা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তখন আর সুরেশচন্দ্র মিত্র ও বলরাম বসু মহাশয়দ্বয় জীবিত নাই যে মঠের অভাব অনটন দূর করিয়া দিবেন।

হরিপ্রসন্ন মহারাজ তখন এটোয়ায় ডিষ্ট্রিক্ট ইন্‌জিনিয়ার। ভ্রাম্যমাণ সুবোধানন্দজীর নিকট হইতে আলমবাজার মঠের আর্থিক দুর্গতির কথা শুনিয়া তিনি কিছুদিন প্রতি মাসে ষাট টাকা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। স্বামীজী আমেরিকা হইতে ফিরিলে হরিপ্রসন্ন মহারাজ তাঁহার বৃদ্ধা মাতার ভরণপোষণ ও কনিষ্ঠ-ভ্রাতার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া মঠে যোগ দেন। মঠ তখন বর্তমান বেলুড় মঠের দক্ষিণে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ীতে।

৮ স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃঃ ১৩৫

সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে হরিপ্রসন্ন মহারাজের নূতন নামকরণ হয় স্বামী বিজ্ঞানানন্দ।

আলমবাজার মঠের আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। শ্রীশ্রীঠাকুর নাগেশ্বর চাঁপা ফুল খুব ভালবাসিতেন। একদিন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের জন্য ঐ ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিতে স্বামী অখণ্ডানন্দকে বলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ ও স্বামী সুবোধানন্দ ঘুঘুডাঙ্গায় (বর্তমানে—উত্তর দমদম) ডি. গুপ্তের বাগানে উক্ত ফুলের সন্ধানে যান। সেখানে গিয়া মালীদের কাছে শুনিলেন, ঘুঘুডাঙ্গা স্টেশনে (দমদম স্টেশনে) যাইবার বড় রাস্তার (বর্তমান খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সরণী) উত্তর ধারে সাতপুকুরের বাগানে এই ফুল পাওয়া যাইবে। স্বামী অখণ্ডানন্দ সেখানে একাকীই গেলেন। কিন্তু দেখিলেন গাছ আছে বটে, তাহাতে তখনও ফুল ধরে নাই। মালীরা তাঁহাকে বলিল, সতের-আঠার দিন পরে আসিলে ফুল পাওয়া যাইবে।

স্বামী অখণ্ডানন্দ সংকল্প করিয়াছিলেন ফুল না লইয়া মঠে ফিরিবেন না। তাই তিনি বারাসত অঞ্চলের কয়েকটি গ্রামে ভ্রমণ করিয়া পল্লীগ্রামের অবস্থা দেখিতে লাগিলেন। সেখানকার ভগ্নস্বাস্থ্য ও রুগ্ন লোকদিগকে দেখিয়া তাঁহার কোমল অন্তরে ব্যথা লাগিল। তিনি স্বাস্থ্যরক্ষার সহজ উপায়গুলি তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন।

কয়েকটি গ্রাম পরিদর্শন করিয়া আঠার দিন কাটিল। তখন সাতপুকুরের বাগানে আসিয়া দেখিলেন—"সুন্দর সুবাসিত ফুলভারে নত নাগেশ্বর চাঁপার গাছটি মৃদুমন্দ ভ্রমর-গুঞ্জনে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।" গঙ্গাধর মহারাজের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। মালীরাও তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত মনে কলাপাতার ঠোঙা করিয়া বিস্তর নাগেশ্বর চাঁপা ফুল তাঁহার হাতে দিল। তিনিও উহা লইয়া মহানন্দে আলমবাজার মঠে ফিরিলেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁহার পক্ষাধিককাল অজ্ঞাতবাসের কাহিনী শুনিয়া এবং রাশিকৃত নাগেশ্বর চাঁপা ফুল পাইয়া যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন; পরমানন্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে ফুলগুলি নিবেদন করিলেন।[৯]

পাশ্চাত্য দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বামী বিবেকানন্দ শশী মহারাজকে আলমবাজার মঠেই একদিন বলিলেন—"তুই যে ঠাকুরের পূজা ফাঁদলি, কে যোগায় তোর নিত্য পান, বুট, আর মিছরির পয়সা? তোর ঘণ্টা নাড়ার বাড়াবাড়ি দেখলে আমার ভয় হয়।" শশী মহারাজ সহাস্যে উত্তর দিলেন—"তোমায় ঐ নিয়ে ভাবতে হবে না। যাঁর পূজা ফেঁদেছি, তিনিই তাঁর ভোগের পয়সা যোগাবেন।"[১০]

নিষ্ঠাবান রামকৃষ্ণানন্দের এ কথা কোন দিনই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় নাই। "তিনি যখনই ভাবতেন ঠাকুরকে কি ভোগ দেবেন, তখনই কোন না কোন ভক্তপ্রেরিত এক কুঁদা মিছরি, মালসাভরা নবীনের রসগোল্লা ও ঠাকুরসেবার অন্যান্য দ্রব্যাদি আসিয়া পৌঁছিত।"[১১]

যে সকল যুবক আলমবাজার মঠে যোগ দেন তাঁহাদেরও কথা এখানে কিছু বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সুশীল মহারাজের বরাহনগর মঠে যাতায়াত ছিল। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে গৃহত্যাগ করিয়া তিনি আলমবাজার মঠে যোগ দেন এবং সেই স্থানেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী প্রকাশানন্দ নামে অভিহিত হন।

---

৯ স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃঃ ১৫৫।

১০ উদ্বোধন—বিবেকানন্দ-শতবার্ষিক সংখ্যা, পৃঃ ১৯৩।

১১ স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ-কৃত, পৃঃ ১০৬।

খগেন মহারাজ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এই মঠে যোগ দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার নূতন নামকরণ হয়—স্বামী বিমলানন্দ। সুধীর মহারাজ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মঠে যোগ দেন এবং ঐ বৎসরই মে মাসে স্বামীজীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা পান। তিনি স্বামী শুদ্ধানন্দ নামে ভূষিত হন। শুকুল মহারাজ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ঐ মঠে যোগ দেন এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আত্মানন্দ—এই নাম প্রাপ্ত হন। হরিপদ মহারাজ এই মঠে যোগ দিয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম হয়—স্বামী বোধানন্দ।[১২]

কানাই মহারাজ ও যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই মঠেই স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাস লইয়া যথাক্রমে নির্ভয়ানন্দ ও নিত্যানন্দ নাম প্রাপ্ত হন। ইঁহারা দুজনেই বরাহনগর মঠে যাতায়াত করতেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীও বরাহনগরে। তিনি নানাভাবে বরাহনগর মঠের সাধুদিগের সেবা করিতেন। সস্ত্রীক কাশীবাস কালে কাশীধামেই তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ ঘটে। তাঁহার আপনজন কেহ না থাকায় তিনি আলমবাজার মঠে আসিয়া উপস্থিত হন। তাহার কয়েক মাস পরেই স্বামীজী আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমন করেন।[১৩]

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ বসু আলমবাজার মঠে যোগ দেন এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহারা যথাক্রমে স্বরূপানন্দ ও সুরেশ্বরানন্দ নামে অভিহিত হন।

১২ উদ্বোধন—বিবেকানন্দ-শতবার্ষিক সংখ্যা।

১৩ স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃঃ ১৩৪।

১৪ The History of Sri Ramakrishna Mission. p. 117

আলমবাজার মঠেও সাধু-সজ্জনের সমাগম হইত। পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন, অধ্যাপক বহুবল্লভ শাস্ত্রী, সিন্ধু প্রদেশের প্রসিদ্ধ "সোফিয়া" পত্রিকার সম্পাদক (ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়) প্রায়ই সাধুদিগের সহিত দেখা করিতে আসিতেন। নাগ মহাশয়ও একদিন সস্ত্রীক আলমবাজার মঠে আসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। স্বামীজীর মার্কিন ভক্ত ডাক্তার টার্ন বুল (Dr. Turn Bull) কলিকাতায় আসিবার পর প্রায়ই এই মঠে আসিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদিগের পূতসঙ্গ লাভের নিমিত্ত দক্ষিণেশ্বরে রায়বাহাদুর প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ীতে তিনি কিছুদিন বাসও করিয়াছিলেন। স্বামীজীর মধ্যম ভ্রাতা মহিমবাবু বা মহেন্দ্রনাথ দত্ত কলিকাতার সিমলা অঞ্চল হইতে পদব্রজে আলমবাজার মঠে আসিয়া গঙ্গাধর মহারাজের ভ্রমণকাহিনী শুনিতেন। সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ও মধ্যে মধ্যে এই মঠে আসিয়া সাধুদের সাহচর্য লাভ করিতেন। শশিপদবাবু বরাহনগরে যে বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহার সাহায্যকল্পে আমেরিকা হইতে স্বামীজী কয়েকবার কিছু টাকা পাঠাইয়াছিলেন।[১৫]

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে উত্তর ভারতের তীর্থস্থানগুলি দেখিবার মানসে রানী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাসের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেওঘরে উপস্থিত হইয়া অনেকগুলি দেহাতীকে দুর্ভিক্ষপীড়িত ও বিশেষ দুর্দশাপন্ন দেখিয়া অনুকম্পায় মথুরবাবুকে বলেন—"তুমি তো মার দেওয়ান। এদের এক মাথা করে তেল ও একখানা করে কাপড় দাও। আর পেটটা ভরে একদিন খাইয়ে দাও।" বহু ব্যয়ের আশঙ্কায় মথুরবাবু প্রথমে

১৫ স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃঃ ১৭৭—১৮৯।

একটু ইতস্ততঃ করিলেন, পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের একান্ত ইচ্ছা দেখিয়া কলিকাতা হইতে উপযুক্তসংখ্যক কাপড় আনাইয়া এই কাজ সুসম্পন্ন করেন। ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দেও মথুরানাথের জমিদারিতে গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে দিয়া অনুরূপ জনসেবা করান। শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশে ভক্তদিগের মধ্যে মথুরবাবুই বোধ হয় সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে জনসেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন।[১৬]

বরাহনগর মঠে থাকিতে এবং পরেও গৃহত্যাগী ভক্তেরা শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শে কিছু কিছু জনসেবা করিতেন বটে, কিন্তু আলমবাজার মঠে থাকাকালেই উহা বিস্তৃতি লাভ করে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে স্বামীজী যখন বিশ্রামার্থে দার্জিলিঙ পর্বতে, তখন গঙ্গাধর মহারাজ (স্বামী অখণ্ডানন্দ) মুর্শিদাবাদ জেলায় মহুলা গ্রামের দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবা আরম্ভ করেন। স্বামীজী দার্জিলিঙ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বামী প্রেমানন্দের নিকট এই সেবা-কার্যের কথা শুনিয়া নিজ তহবিল হইতে দেড়শত টাকা গঙ্গাধর মহারাজকে পাঠাইয়া দিলেন। স্বামী নিত্যানন্দ ও ব্রহ্মচারী সুরেন্দ্রনাথকে তাঁহার কাজে সাহায্য করিবার জন্য মহুলায় পাঠাইলেন।

এই সেবাকার্যে মঠের সকলেই গঙ্গাধর মহারাজকে উৎসাহিত করেন এবং অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠান। হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) আলমবাজার মঠ হইতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন গঙ্গাধর মহারাজকে একখানি পত্রে লেখেন—"তুমি যে মহৎ কার্যের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছ, তাহার আর তুলনা নাই। আমি দুর্বল, তোমাকে আর কি উৎসাহিত করিব। সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি, দুর্বলের বল, সকল শুভ উদ্দেশ্যের সিদ্ধিদাতা তোমার উদ্যম সফল করুন, এবং তোমাকে অজর ও দীর্ঘজীবী করিয়া এইরূপ আরও শত শত জনহিতকর শুভ কাজের উদ্যোগী করুন।··· রাজা তিনদিন পূর্বে তোমাকে ৯৫৲ টাকা পাঠাইয়াছেন, আজ ১০৲ টাকা পাঠাইতেছেন।"[১৭]

পূজনীয় মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন গঙ্গাধর মহারাজকে আলমবাজার মঠ হইতে ৫০৲ টাকা পাঠান এবং লেখেন—"আমাদের এখান হইতে ২ জন··· যশোহর ইত্যাদি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষনিবারণে সাহায্যের জন্য যাইবে। যদি না যাওয়া হয়, তবে তোমার ওখানেই পাঠাইব।"[১৮]

জনসেবা-পরিচালনার নির্দেশও আলমবাজার মঠ হইতে দেওয়া হইত। উক্ত পত্রের অপর অংশে দেখা যায়—"তোমরা adultদিগকে যে ½ সের করিয়া চাউল দিবে মনে করিয়াছ সে উত্তম কথা। কিন্তু উহার মধ্যে বাছিয়া দিবে। ···যতক্ষণ না আমাদের লোক যায় ততক্ষণ আন্দুলবেড়িয়া বা অন্যত্র রিলিফ খুলিও না। এ সম্বন্ধে যাহা আবশ্যক পরে লিখিব।"

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই স্বামী ব্রহ্মানন্দ আলমবাজার মঠ হইতে স্বামী অখণ্ডানন্দকে আর একখানি পত্রে লেখেন—"ভাই গঙ্গাধর, আমি গত পরশু দিবস তোমাকে ইনসিয়র্যান্স করিয়া ১৫০ টাকা পাঠাইলাম।···বাছিয়া বাছিয়া যাহারা যথার্থই অকর্মণ্য, কোনরূপ খাটিয়া খাইতে অক্ষম, তাহাদিগকেই চাউলাদি দিবে। আমাদের এখান হইতে একজন বোধ

১৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ।

১৭ স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র—উদ্বোধন, চৈত্র, ১৩৭১।

১৮ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র—উদ্বোধন, বৈশাখ, ১৩৭২।

হয় শীঘ্রই যশোহর খুলনার দিকে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যাইবে।"[১৯]

আলমবাজার মঠ হইতেই যে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয় এবং শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শ বিশদভাবেই দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয় তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

শুধু দুর্ভিক্ষ নিবারণই নয়। এই সময় স্বামী অখণ্ডানন্দজী অনাথ বালকদিগের জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে সংকল্প করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট তিনি নটুবিহারী দাস নামে ৯।১০ বৎসরের একটি বালকের সন্ধান পান, এবং তাহাকে মহুলায় লইয়া গিয়া অনাথ আশ্রমের সূত্রপাত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ইহাই প্রথম অনাথ আশ্রম। তদবধি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত ছাত্রাবাসগুলিতে এবং বিভিন্ন আশ্রমে অনেক অনাথ বালক-বালিকা প্রতিপালিত হইতেছে।[২০]

মঠ আলমবাজারে স্থানান্তরিত হইবার পর পাশ্চাত্য হইতে ফিরিয়া ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুআরি স্বামীজী কলিকাতায় পৌছান সেই বৎসর হইতে তাঁহারই প্রবর্তিত নিয়মাবলী মঠে চালু হয়, এবং মঠের সমস্ত কাজ তদনুসারেই নির্বাহ হইতে থাকে।[২১] এমন কি জনসেবার কার্যও তাঁহার ইচ্ছামত চলিত। আলমোড়া হইতে লিখিত ২০-৬-১৮৯৭ তারিখের স্বামীজীর একখানা পত্রে দেখা যায়—"I have sent some of my boys to works in the famine districts. It has acted like a miracle." দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে আমার কয়েকটি ছেলেকে পাঠাইয়াছি। উহাতে অপূর্ব কাজ হইয়াছে।" ৯-৭-৯৭ তারিখের পত্রেও দেখা যায়—"My boys are working in the midst of famine and disease and misery—nursing by the mat-bed of Cholera-striken Pariah and feeding the starving Chandala." "আমার ছেলেরা দুর্ভিক্ষ, রোগ ও দুর্দশার মধ্যে কাজ করিতেছে। মাদুরে শায়িত কলেরাক্রান্ত অচ্ছুতের সেবা করিতেছে, অনশনক্লিষ্ট চণ্ডালকে আহার দিতেছে।"[২২]

মঠের সকল কাজে সকল সাধুরই মতামত লওয়া হইত। এই ভাবে মঠ ও মিশনের একটি সুষ্ঠু নিয়মকানুন গড়িয়া উঠিলে বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ১লা মে কলিকাতার বাগবাজারে বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতে সকল সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদিগকে ডাকিয়া এক সভায় সকলকে বুঝাইয়া বলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী প্রচার করিতে হইলে এবং তাঁহার আদর্শে দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করিয়া দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিতে হইলে একটি বলিষ্ঠ সঙ্ঘের প্রয়োজন। একথা তিনি প্রতীচ্য দেশ ভ্রমণ করিয়া বেশ বুঝিয়াছেন। তখন সকলেই উৎসাহ ও আনন্দের সহিত স্বামীজীর প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং সেই সভাতেই "রামকৃষ্ণ মিশন" প্রতিষ্ঠিত হইল। তখন সকলে আলমবাজার মঠেই অবস্থান করিতেছিলেন।[২৩]

ইহার এক বৎসর পূর্বে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে স্বামীজী আমেরিকা হইতে লণ্ডনে

১৯ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র—উদ্বোধন, বৈশাখ, ১৩৭২।

২০ স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী অন্নদানন্দ প্রণীত পৃ. ১৪২।

২১ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র—উদ্বোধন, চৈত্র, ১৩৭১।

২২ Letters of Swami Vivekananda.

২৩ The life of Swami Vivekananda.

আসিয়া তাঁহার কাজে সাহায্য করিবার জন্য স্বামী সারদানন্দকে ডাকিয়া পাঠান। তাহার পরেই স্বামী অভেদানন্দের ডাক পড়ে। তাঁহারা দুজনেই আলমবাজার মঠ হইতে বিদেশ যাত্রা করেন।[২৪]

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে শশী মহারাজকেও স্বামীজী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) আলমবাজার মঠ হইতে মান্দ্রাজে প্রেরণ করেন। তাঁহার সঙ্গে যান স্বামীজীরই সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী সদানন্দজী। মান্দ্রাজে গিয়া শশী মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার্চনা পূর্বের মতই প্রাণ দিয়া করিতে থাকেন, এবং তাঁহার জীবনাদর্শ ও অমিয়বাণী প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় মান্দ্রাজ মঠ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।[২৫]

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে একদিন নরেন্দ্রনাথকে কাছে ডাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর এক টুকরা কাগজে লিখিলেন—নরেন লোক শিক্ষা দিবে। নরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ আপত্তি করিয়া বলিলেন—না, আমি পারিব না। শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিয়া উত্তর দিলেন—তোর ঘাড় পারিবে।[২৬] ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে যেদিন স্বামীজী আমেরিকার চিকাগো সহরে উপস্থিত হন, সেই দিন হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের এই কথা বিশেষভাবে ফলবতী হইতে আরম্ভ করে।

ইউরোপ ও আমেরিকায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনালোকে হিন্দু ধর্মের নূতন ব্যাখ্যা ও বেদান্ত প্রচারে যে অত্যধিক পরিশ্রম হয়, তাহাতে স্বামীজীর শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। দেশে ফিরিয়া তাঁহার শ্রমের কিছুই লাঘব হইল না। অবিরাম অভ্যর্থনার উত্তর দেওয়া, সংগঠনমূলক কার্যাবলীর জন্য চিন্তা ও নানা স্থানে বক্তৃতা চলিতেই লাগিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুআরি আলমবাজার মঠ হইতে তিনি একখানি পত্রে লেখেন:—

"I have not a moment to die, as they say···I am almost dead. As soon as the Birthday (celebration of Sri Ramakrishna) is over I will fly off to the hills. ... I do not know whether I would live even six months more or not, unless I have some rest."[২৭]—"লোকে যেমন বলিয়া থাকে, আমার মরিবারও অবসর নাই, আমারও সেইরূপ অবস্থা। অত্যধিক পরিশ্রমে আমি মৃতপ্রায়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইলেই আমি কোন পার্বত্য প্রদেশে পলাইব। বিশ্রাম না লইলে আমি আর ছয় মাসের বেশী বাঁচিব কি না সন্দেহ।"

আলমবাজার মঠ হইতেই স্বামীজী দার্জিলিঙ যাত্রা করেন, সঙ্গে যান স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও ভক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া স্বামীজী আলমবাজার মঠেই অবস্থান করেন। এই স্থানেই এবং এই সময়েই স্বামি-শিষ্যসংবাদ-প্রণেতা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে মন্ত্র-দীক্ষা দেন।[২৮]

এক বৎসর আগের ঘটনা। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে আলমবাজার মঠে ঠাকুরের জন্মতিথি-উৎসব উপলক্ষ্যে গৃহী-ভক্তগণ প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন

২৪ The History of Sri Ramakrishna Mission. p. 95, 98.

২৫ ঐ p. 118

২৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

২৭ Letters of Swami Vivekananda.

২৮ স্বামিশিষ্য-সংবাদ, পূর্বকাণ্ড, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, পৃ. ৪৪-৪৮।

প্রধান উদ্যোক্তারা দুই রকম প্রসাদের ব্যবস্থা করিতে চাহিলেন—সাধারণ লোকদিগের জন্য কলাইডালের খিচুড়ি, এবং বিশিষ্ট ভদ্রলোকদিগের জন্য ভুনি খিচুড়ি। মঠের সন্ন্যাসীরা ইহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তাঁহারা সকলের জন্যই ভুনি খিচুড়ি প্রস্তুত করিতে বলিলেন। শেষে পর্যন্ত ভুনি খিচুড়িই হইল।

এই ব্যাপারেই দক্ষিণেশ্বরে সাধারণ মহোৎসবের দিন স্ত্রীলোকদিগকে উৎসবে যোগ দিতে নিষেধ করিয়া কলিকাতার নানা স্থানে "প্লাকার্ড" টাঙ্গান হইয়াছিল, এবং স্ত্রীলোকেরা যাহাতে হোরমিলার কোম্পানীর ষ্টীমারের টিকিট না পান, তাহার জন্যও চেষ্টা করা হইল। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ কয়েকজন যুবকের সাহায্যে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু দেখা গেল এই বৎসর অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কিছু বেশীই হইয়াছে।[২৯]

আমরা বরাহনগরের ৺হরিদাস বোড়াল মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, একথা স্বামীজীর কর্ণগোচর হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "দু'চার জন পতিতাই যদি উদ্ধার না পাইল, তবে পতিতপাবন ঠাকুরের আবির্ভাবের কি প্রয়োজন ছিল?"

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন কলিকাতায় ভীষণ ভূমিকম্প হয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১৪ই জুনের এক পত্রে লেখেন—"গত পরশ্ব দিবস বৈকালে এখানে এক অতি ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া আমাদিগের মঠের অনেক স্থান ভগ্ন এবং অনেক স্থানে crack হইয়া গিয়াছে। এ বাড়ী শীঘ্রই ছাড়িতে হইবে।[৩০]

জুন মাসের ১৫ তারিখে আলমবাজার মঠ হইতে লিখিত স্বামী তুরীয়ানন্দের একখানি পত্রে দেখা যায়—"মঠের কোন স্থান যদিও একেবারে পড়িয়া যায় নাই, কিন্তু অনেক স্থানই ফাটিয়া বিশেষ জখম হইয়া একেবারে বাসের অনুপযুক্ত করিয়াছে। আমরা পরদিন হইতেই বাড়ীর সন্ধান করিতেছি, কিন্তু সুবিধামত পাওয়া যাইতেছে না।"[৩১]

স্বামীজীও এই সংবাদ পাইয়া আলমোড়া হইতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন এক পত্রে লিখিলেন—"A number of boys are already in training, but the recent earthquake destroyed the poor shelter we had to work in, which was only rented, any way. Never mind. The work must be done without shelter and under difficulties[৩২] "কতকগুলি ছেলেকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু ভাড়া করা যে সামান্য আশ্রয়ে থাকিয়া আমাদের কাজ চলিতেছে, এখনকার ভূমিকম্পে তাহা ভগ্নপ্রায়। যা হয় হোক, ভাববার কিছু নাই। আশ্রয়হীন হইলেও এবং নানা অসুবিধার মধ্যে পড়িলেও আমাদের কাজ চলিতে থাকিবে।"

যুগমানবের শুভ সংকল্প কখনও ব্যর্থ হয় না। অনতিকাল মধ্যেই ভাগীরথীর পূর্বকূলে কোন সুবিধাজনক স্থান না পাইয়া পশ্চিম তীরেই ৺নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাগানবাড়ীতে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুআরি মঠ স্থানান্তরিত হইল।[৩৩]

২৯ স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃ. ১৫৮

৩০ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র—উদ্বোধন, বৈশাখ, ১৩৭২।

৩১ স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র—উদ্বোধন, ১৩৭২।

৩২ Letters of Swami Vivekananda.

৩৩ The History of Sri Ramakrishna Mission. p. 124.

আলমবাজার পোষ্ট-অফিসের কিছু পশ্চিমে ৯৫নং দেশবন্ধু রোডে পুরাতন মঠ-বাড়ী কিছু নূতন আকার ধারণ করিয়া এখনও দাঁড়াইয়া আছে। তবে তাহা এখন অন্য লোকের অধিকারে। বাহির হইতে সে মঠ-বাড়ী আর চিনিবার উপায় নাই। উহার সম্মুখভাগে যে জোড়া জোড়া থামওয়ালা বারান্দা ছিল তাহা লুপ্ত হইয়াছে। তৎ-পরিবর্তে সেখানে রহিয়াছে অনেকগুলি দোকানঘর। মঠের সম্মুখেই রাস্তার অপর দিকে ৺জয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের যে প্রকাণ্ড থামওয়ালা বাড়ী ছিল, তাহারও কোন অস্তিত্ব নাই। তবে তাঁহার বংশধরেরা সেই স্থানেই নূতন বাড়ী নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন, এবং তাঁহাদের পুরাতন ঠাকুর-দালানটি এখনও কোনরকমে টিকিয়া আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য যে বাড়ী হইতে ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসিবৃন্দ যে স্থানে বাস করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন, সঙ্ঘের ধাত্রীস্বরূপা সেই মঠ-বাড়ীর স্মৃতিরক্ষার কি কোন উপায় হয় না?

প্রেম-রূপ

শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

রাজ্য-ধন স্বপ্নসম হল মূল্যহীন
হে বুদ্ধ, তোমার কাছে! বসি নিশিদিন
যোগাসনে, সিদ্ধ হয়ে নির্বাণ লভিয়া
সেথা হতে যবে তুমি আসিলে ফিরিয়া
জীবতরে অন্তহীন করুণার ধারা
ঝড়াইলে দুনয়নে, প্রেমে হলে হারা!

মা-কালীরে জ্ঞান-খড়্গে দ্বিখণ্ডিত ক'রে
লভি জ্ঞান, রামকৃষ্ণ আসিলেন ফিরে।
সে-হৃদয়ও তৃণ 'পরে পদভার হেরি
অন্তহীন বেদনায় উঠিল গুমরি!

লীন হয়ে ব্রহ্মে, নির্বিকল্প সমাধিতে
বীরেশ বিবেকানন্দ ফিরিলা জগতে;
কহিলেন, 'জনেকেরও মুক্তির কারণে
লাখ বার জন্ম নিতে ইচ্ছা জাগে প্রাণে

নিত্য পূর্ণ শুদ্ধ বোধ স্বরূপ যাঁহার
তিনিই অসীম নিত্য প্রেম-পারাবার।

প্রাণের পরিচয়

শ্রীজীবনকৃষ্ণ দে বেদান্তবিনোদ

গ্রীষ্মকালে যদি একটু বেশী গরম পড়ে, তবে আমরা অমনি বলিতে থাকি "উঃ, কি বিশ্রী গরমই পড়েছে! একেবারে প্রাণান্ত করে তুলেছে।" আবার শীতের দিনে যদি একটু কড়া শীত পড়ে, তাহা হইলেও বলি "বাপরে বাপ! কী ঠাণ্ডা! শীতে মারা গেলাম।" ঝড়বৃষ্টি-বজ্রপাতের সময়ে আমরা প্রাণভয়ে গৃহমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করি। রোগে শোকে আমাদের প্রাণ মুহ্যমান হয়; আবার আনন্দের দিনে আমাদের প্রাণ যেন উল্লাসে পূর্ণ হইয়া উঠে। আমাদের আমিত্বের সাথে প্রাণের সম্বন্ধ এতই ঘনিষ্ঠ যে 'আমিটাই' প্রাণ না প্রাণটাই 'আমি', তাহা বুঝিতে পারি না। আহারান্তে আমরা মনের সুখে নিদ্রা যাই, কিন্তু প্রাণের বিশ্রামও নাই, নিদ্রাও নাই; সে বেচারী জাগ্রত থাকিয়া শরীরের সর্বত্র রক্ত চলাচল করায়, ভুক্তান্ন পরিপাকের ব্যবস্থা করে, তাহা হইতে গ্রহণযোগ্য সারাংশদ্বারা রক্তমাংস অস্থিমজ্জা মস্তিষ্কাদির পুষ্টিসাধনে নিযুক্ত থাকে, আর অসারাংশ বহির্নিষ্কাশনের পথে প্রেরণ করে,—এক কথায় আমাদের দেহরক্ষার্থ যাহা কিছুর প্রয়োজন সেই সমস্ত কর্তব্য সম্পাদনে ব্যস্ত থাকে। আর জাগ্রতাবস্থায় তো তাহার অক্লান্ত সেবার কথাই নাই; তাহার সাহায্য ব্যতীত একটি শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই, চলাফেরা কাজকর্ম করা তো দূরের কথা।

প্রাণ যে কেবলমাত্র আমাদের দেহযন্ত্রটি সৃষ্টি করিয়া সেই দেহের ভিতরে থাকিয়া অহর্নিশি আমাদের সেবায় নিযুক্ত থাকে, শুধু তাহাই নহে। এই প্রাণই যে সূর্যচন্দ্র আকাশ-বাতাস অন্ন প্রভৃতি রূপে আমাদিগকে বহির্জগৎ হইতে নিরন্তর প্রাণ আহরণ করিয়া জীবিত থাকিতে সাহায্য করে, একথা আমরা আমাদের অনাদি জ্ঞানভাণ্ডার শ্রুতি হইতে জানিতে পারি। শ্রুতি বলেন, "আদিত্যো হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণঃ" (প্রশ্নোপনিষদ্ ৩।৮), সূর্য প্রাণের বাহ্য অভিব্যক্তি। "এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য এষ পর্জন্যো মঘবানেষ বায়ুঃ। এষ পৃথিবী রয়ির্দেবঃ সদসচ্চামৃতং চ যৎ॥ (প্রশ্নঃ উপঃ ২।৫)। এই প্রাণ অগ্নি হইয়া প্রজ্বলিত হন। সূর্যরূপে তাপ দেন, ইনি মেঘ, ইনিই বায়ু, ইনি পৃথিবী, ইনিই অন্নরূপে সকলকে পুষ্ট করেন; (অধিক কি) যাহা স্থূল, মূর্ত, যাহা সূক্ষ্ম, অমূর্ত, যাহা অমৃত, এই প্রাণই সেই সমস্ত হইয়াছেন। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী"॥ (কৈবল্যঃ উপঃ ১৫; মুণ্ডক ২।১।৩)। "ব্রহ্ম হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়, এবং প্রাণ হইতে মন, ইন্দ্রিয়সমূহ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং বিশ্ববিধাত্রী পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে।" * এইখানেই প্রাণের নিষ্কাম সেবার ইতি হয় নাই; আমাদের মৃত্যুর পরেও প্রাণের সেবার বিরাম হয় না। আয়ুষ্কাল শেষ হইলে

* শ্রুতির এই সকল উক্তিতে আধুনিক মনে অবিশ্বাস আসিতে পারে। সেজন্য দুই একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। আমাদিগকে একথা ভুলিলে চলিবে না যে এই সকল সত্য বর্তমান সময়ের বহু সহস্র বৎসর পূর্বে ঋষিগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল; সেযুগে তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিবার প্রণালীও এ যুগের প্রণালী হইতে পৃথক ছিল। বৈদিক যুগের মন যে কবিত্বপূর্ণ ছিল, একথা সর্ববাদিসম্মত। তাঁহারা সূক্ষ্মতম দার্শনিক তথ্যাদিও যে অপূর্ব কবির ভাষায় এবং

যখন আমরা পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করি, তখনও প্রাণ আমাদের কর্মসংস্কার এবং কর্মফলাদির বোঝা স্ব-স্কন্ধে উঠাইয়া লইয়া আমাদিগকে দেহান্তর বা লোকান্তর প্রাপ্ত করাইবার উদ্দেশ্যে আমাদের সাথে সাথে যাত্রা করেন। আমরা কিন্তু এমনই অকৃতজ্ঞ যে আমাদের এই জীবন-মরণের—এই জন্ম-জন্মান্তরের অকৃত্রিম বন্ধুটির পরিচয় লইবার চেষ্টা ভুলিয়াও কখনো করি না এবং এই অকৃতজ্ঞতার ফলে অন্তহীন জন্মমৃত্যু-চক্রে পিষ্ট হই। শ্রুতি বলেন যে, তোমরা যদি প্রাণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় অবগত হইয়া প্রাণোপাসনা দ্বারা প্রাণাত্মবিদ্ হইতে পার, তবে অমরত্ব লাভ করিবে (অর্থাৎ মৃত্যুর পরে তোমাদের ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি ঘটিবে)—

উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভুত্বঞ্চৈব পঞ্চধা।
অধ্যাত্মং চৈব প্রাণস্য বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে ॥
(প্রঃ উঃ ৩।১২)

প্রাণের উৎপত্তি, আগমন, স্থিতি, বিভুত্ব, বাহ্য এবং অধ্যাত্ম ভেদে পঞ্চবিধ অবস্থিতি জানিয়া (উপাসক) অমরত্ব প্রাপ্ত হন। সুতরাং একবার আমাদের লক্ষ লক্ষ জন্মের এই নিষ্কাম সেবকটির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় জানিবার চেষ্টা করিলে ক্ষতি কি ? অতএব যে পরম পুরুষের সহিত প্রাণের অবিনাভাব সম্বন্ধ, তাঁহার চরণে, এবং যে সকল মহর্ষিবৃন্দ অশেষ কৃপাপরায়ণ হইয়া আমাদের হিতার্থে প্রাণের নিগূঢ় তত্ত্ব বিবৃত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাদের সাহায্যে প্রাণের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবার প্রয়াস পাই।

অতি প্রাচীনযুগে আশ্বলায়ন নামক জনৈক ঋষি প্রাণতত্ত্ব জানিতে অভিলাষী হইয়া পরম ঋষি পিপ্পলাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ভগবন্! কুত এষ প্রাণো জায়তে ?"—ভগবন্! এই প্রাণ কোথা হইতে জন্মগ্রহণ করে ? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "আত্মনঃ এষ প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষে ছায়া এতস্মিন্নেতদাততম্।" (প্রঃ উপঃ ৩।৩)—বৎস ! আত্মা (বা পরমেশ্বর) হইতে এই প্রাণ জন্মলাভ করে ; ছায়া যেরূপ সর্বদা পুরুষের অনুগত থাকে, এই প্রাণও তদ্রূপ সর্বদা পরমেশ্বরকে অনুসরণ করে (প্রাণশ্ছায়াবদীশ্বর-মনুগচ্ছতি—আনন্দগিরি)। এক্ষণে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে এই জন্মলাভ ব্যাপারটা কি

বহুস্থলে রূপকের ছদ্মবেশে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, আমাদের উপনিষদ্গুলিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পরিভাষাও ছিল পৃথক। এই সকল কারণে তাঁহাদের উক্তির মর্ম অনুধাবন করিবার জন্য সশ্রদ্ধ চিন্তাশীলতার আবশ্যক। সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে ইহা বুঝা যাইবে। যেমন—সূর্যের একটি নাম 'সপ্তাশ্ব' ; সূর্যদেব সাত ঘোড়ার রথে চড়িয়া আকাশমার্গ পরিভ্রমণ করেন, কথিত আছে। বর্তমান বিজ্ঞানের দৃশ্যমান আলোক-তত্ত্বে আমরা বুঝিয়াছি যে, ইহার অর্থ সূর্যকিরণে সাতটি দৃশ্যমান বর্ণ বর্তমান। আমাদের ঋষিরা বৃক্ষাদিরও প্রাণ আছে বলিয়া গিয়াছেন—"অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ" ; সেই সত্য আমাদের বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু জগৎসমক্ষে প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন। শ্রুতি বলেন যে, যদি তোমার অপান বায়ুর ক্রিয়া না থাকে, তবে তুমি উদান বায়ুর ক্রিয়াফলে আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে ; আর যদি তোমার উদান বায়ুর ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়, তবে অপানপ্রভাবে তোমাকে নিজ শরীরের ভারে মাটিতে শুইয়া থাকিতে হইবে, দাঁড়াইতে কিংবা চলিতে পারিবে না। ইহা হইতেই কি বুঝা যায় না যে তাঁহারা 'অপানবায়ু' কথাটি আধ্যাত্মিক অপানবায়ুর অতিরিক্ত 'মাধ্যাকর্ষণ' শক্তি অর্থে, এবং 'উদানবায়ু'ও তদ্রূপ 'সৌর আকর্ষণ' শক্তি অর্থে ব্যবহার করিতেন ? শুধু পরিভাষার তফাৎ মাত্র! বর্তমানকালের বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন—"জড় বলিয়া কিছু নাই, সবই শক্তি" ; Lord Kelvin বলিয়াছেন, "পদার্থ (matter) এবং মন (mind) একই উপাদানে সৃষ্ট ; আর আমাদের শ্রুতি কোন্ আদিম যুগে বলিয়া গিয়াছেন যে প্রাণ হইতেই মন, পঞ্চভূত এবং পঞ্চভূতাত্মক জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। একটি পরমাণু যে শক্তির ঘনীভূত অবস্থামাত্র, তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, একথা 'প্রপঞ্চসারতন্ত্রে' বিবৃত শক্তির উন্মেষ প্রসঙ্গ একটু অভিনিবেশ সহকারে পড়িলেই বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

প্রকারের ; ইহার অর্থ সাধারণ প্রাণীর ন্যায় মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়া নহে। প্রাণের এই জন্মগ্রহণ ব্যাপারের প্রকৃত তথ্য আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নির্বিকল্প সমাধির দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারি। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হইতেন, তখন তাঁহার প্রাণ-ক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ থাকিত, শ্বাসপ্রশ্বাস বা হৃৎস্পন্দন একেবারেই থাকিত না ; আবার যখন সেই সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইতেন, তখন তাঁহার প্রাণের ক্রিয়া পুনরায় আরম্ভ হইত। ঠিক সেই প্রকার প্রলয়কালে বিশ্বব্যাপী প্রাণশক্তি পরমেশ্বরে বিলীন অবস্থায় থাকে, এবং সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রাণ যেন সেই ভগবদ্‌বিধানেই জগৎসৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্পন্দিত হয়। 'জন্ম লাভ করে' এই অর্থেই বুঝিতে হইবে। তাঁহা হইতে পৃথক্‌ত্ব প্রাপ্ত হয়, এরূপ অর্থে নহে ; কারণ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় তিন অবস্থাতেই প্রাণ পরমেশ্বরেই আশ্রিত থাকে। ভগবদধিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই স্পন্দনের দ্বারা প্রাণ অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের এবং তত্তৎনিবাসী দেবমনুষ্য পশুপক্ষী কীটপতঙ্গাদির, —এককথায় স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় পদার্থেরই সৃষ্টি করে। আধুনিক জড়বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে, কোন পদার্থই 'নষ্ট' হইলে শূন্য হইয়া যায় না—তাহার সূক্ষ্মতর কারণেই পর্যবসিত হয়। জগতের যাবতীয় পদার্থ এভাবে তাহাদের মূল কারণ শক্তিতে পর্যবসিত হইতে পারে, এবং শক্তি হইতেই আবার সেগুলি অনুকূল পরিবেশ পাইলে উদ্ভূতও হয়। জড়বিজ্ঞানের এই আবিষ্কার প্রাণতত্ত্ব বুঝিতে খুবই সহায়তা করে। বিশ্বজগতের সব কিছুই প্রাণ হইতে উদ্ভূত এবং প্রাণেই উহার বিলয় হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে প্রাণ হইতে জগৎসৃষ্টির কথা বর্ণিত আছে। (ব্রহ্মানন্দবল্লী ১ম অনুবাক)*

চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রাণই যে সৃষ্টির মূল, তাহা একাধিক শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। নিত্যমুক্ত পুরুষ সনৎকুমার দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছিলেন, "যথা বা অরা নাভৌ সমর্পিতা এবমস্মিন্ প্রাণে সর্বং সমর্পিতম্ ; প্রাণঃ প্রাণেন যাতি" ইত্যাদি (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৭.১৫.১) "রথচক্রের শলাকাসমূহ যেমন চক্রের নাভিতে (Hub) সংলগ্ন থাকে, সেই প্রকার সমস্ত প্রাণে আশ্রিত রহিয়াছে ; প্রাণ স্বাধীনভাবে গমন করে।" ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রাণকে মহারাজের মুখ্যমন্ত্রীর ন্যায় পরমেশ্বরের সর্বার্থসম্পাদক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। "অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্" (প্রশ্নঃ উপঃ ২।৬) : "রথচক্রনাভিতে চক্র-শলাকাসমূহের ন্যায় সমস্তই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত আছে।" "প্রাণস্যেদং বশে সর্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্" (প্রশ্নঃ উপঃ ২।১৩) ; "ত্রিভুবনে যাহা কিছু আছে তৎসমস্তই প্রাণের বশীভূত।" "প্রাণেন হীদং সর্বমুত্তব্ধম্" (বৃহদারণ্যক, ১৩.২৩) "প্রাণের দ্বারাই জগৎ বিধৃত আছে।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন যে তাঁহার পরা-প্রকৃতি প্রাণদ্বারা এই জগৎ বিধৃত আছে (গীতা ৭।৫)। গৌড়পাদাচার্য বলিয়াছেন, "সর্বং জনয়তি প্রাণশ্চেতোংশূন্ পুরুষঃ পৃথক্" (মাণ্ডূক্যকারিকা ১।৬) ; "প্রাণ সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করে এবং পুরুষ চৈতন্যাংশের কারক।

* ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও প্রশ্নোপনিষদে প্রাণোপাসনার উপদেশ আছে।

"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ"—এখানে আত্মা হইতে আকাশ অর্থ ঠিক নহে। আত্মা নির্বিকার, তাঁহার বিকার হইতেই পারে না। এই হেতু আত্মা হইতে প্রকৃতি, প্রকৃতি হইতে প্রাণ এবং প্রাণ হইতে আকাশ ইত্যাদি এই প্রকার শ্রুতিসম্মত অর্থই গ্রাহ্য।

"প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্বাণি ভবতি" (ছান্দোগ্য, ৫।১।১৫ এবং ৭।১৫।৪); "প্রাণই নামরূপের দ্বারা পরিজ্ঞাত মূর্ত পদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া অমূর্ত ইন্দ্রিয়াদি এবং আশা, আকাজ্ঞা প্রভৃতি সব হইয়াছে।" আমরা একটু অভিনিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারি যে আমাদের চিন্তা, কল্পনা, ভাব (Ideas), ভালবাসা, প্রেম, ভক্তি, তথা লজ্জাঘৃণারাগদ্বেষাদি যাবতীয় সদসৎ প্রবৃত্তি, সবই প্রাণের ভিন্ন ভিন্ন প্রবাহ বা প্রকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

এ জগৎ যে প্রাণস্পন্দনের দ্বারা সৃষ্ট এবং প্রাণস্পন্দনের দ্বারা সঞ্জীবিত, তাহা আমরা শ্রুতি ও তন্ত্র উভয় শাস্ত্র হইতেই জানিতে পারি। কঠোপনিষদে আছে "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্" (২।৩।২); "সমস্ত জগৎ এবং যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই প্রাণস্পন্দনের ফলে নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে স্পন্দিত হইতেছে।" শক্তির স্পন্দন দ্বারা যে কিরূপে বিশ্বের সৃষ্টি হয়, তাহা আমরা প্রপঞ্চসারতন্ত্র হইতে জানিতে পারি। আর প্রাণস্পন্দনের উপরে যে স্থিতি (প্রাণরক্ষা) নির্ভর করে, তাহা আর আমাদিগকে কাহারও নিকট হইতে শিখিবার প্রয়োজন হয় না; প্রাণস্পন্দন থামিয়া যাওয়ার অর্থ যে মৃত্যু, তাহা কাহারও অজানা নাই। আমরা ইহাও বেশ জানি যে আমাদের প্রাণস্পন্দন যদি অসমভাবে বা অনিয়ন্ত্রিতরূপে হইতে থাকে, তবে তাহাও মারাত্মক হয়। সুতরাং জগতের সৃষ্টি এবং স্থিতির জন্য ঠিক তালে তালে এবং নিয়মিত ভাবে (Rhythmically) প্রাণের স্পন্দন হওয়া আবশ্যক। স্থূল সূক্ষ্ম অনন্তকোটী স্তরে প্রাণের এই Rhythmical Vibration দ্বারা, একই প্রাণতত্ত্ব অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডে এবং অনন্তকোটী নামরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে।

প্রাণদ্বারা যেরূপ ক্রম অনুসারে জগতের সৃষ্টি হয়, তাহাও আমরা শ্রুতি হইতে জানিতে পারি। মুণ্ডকোপনিষদে আছে—"তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে। অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসু চামৃতম্॥" (১।১।৮); অর্থাৎ "সৃষ্টি-উপযোগী প্রণিধান বা পর্যালোচনা দ্বারা ব্রহ্ম উপচয়প্রাপ্ত হয়েন; তখন ব্রহ্ম হইতে অব্যাকৃত (গুণসাম্যাবস্থাপন্ন অবিভাজ্যমান) প্রকৃতি উৎপন্ন হয়; তাহা হইতে প্রাণ,† প্রাণ হইতে মন, মন হইতে পঞ্চবিধভূত তন্মাত্রা (এবং তাহা হইতে স্থূলভূত); তাহা হইতে ভূরাদি লোকসমূহ উৎপন্ন হয়; লোকাধিবাসী মনুষ্য দ্বারা কর্ম কৃত হয়, কর্ম হইতে কর্মফল (অমৃত) সমুৎপন্ন হয়; (সেই সমষ্টি-কর্মফলই ভবিষ্যৎ সৃষ্টির বীজ বা কারণ হয়,—এই প্রকারে সৃষ্টিপ্রবাহ চলিতে থাকে)।" ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "যদ্ ব্রহ্মণ উৎপদ্যমানং বিশ্বং তদনেন ক্রমেণ উৎপদ্যতে, ন যুগপদ্ বদরমুষ্টিপ্রক্ষেপবৎ।" ব্রহ্ম হইতে এই ক্রমানুসারেই জগৎ সৃষ্ট হয়, একমুষ্টি কুল ছড়াইয়া দিবার মত একসঙ্গে নহে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে প্রাণ হইতে অমূর্ত মন, এবং মন হইতে ক্রমে ক্রমে স্থূলতর মূর্ত পদার্থাদির সৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রাণ হইতেই যে জগতের সৃষ্টি হয়, তাহা প্রশ্নোপনিষদেও আছে: "স প্রাণমসৃজত, প্রাণাচ্ছ্রদ্ধাং খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীন্দ্রিয়ং মনঃ অন্নমন্নাদ্বীর্যং তপো মন্ত্রাঃ কর্ম লোকাঃ, লোকেষু চ নাম চ॥" (৬।৪)। এইরূপে প্রাণের উন্মেষাত্মক স্পন্দনে জগদ্ব্রহ্মাণ্ড অভিব্যক্ত হয়,

† ভাষ্যকার প্রাণ অর্থে 'হিরণ্যগর্ভ' বলিয়াছেন; হিরণ্যগর্ভ প্রাণোপহিতচৈতন্য, আমরাও প্রাণকে চৈতন্যাধিষ্ঠিত বলিয়া আসিতেছি। তাছাড়া কেহ কেহ প্রাণ অর্থে Vital Force বলিয়াও ব্যাখ্যা করেন।

প্রাণ দ্বারাই তাহা বিধৃত থাকে; পুনরায় প্রলয়কালে প্রাণের নিমেষাত্মক স্পন্দনে বিলোমক্রমে স্বস্ব বিশিষ্টতা হারাইয়া সবই প্রাণে বিলীন হয়।

এই প্রাণশক্তি ভগবানের শক্তি; শক্তি ও শক্তিমানে প্রভেদ নাই, এই জন্য প্রাণকেও ব্রহ্ম (অপর ব্রহ্ম) বলা হইয়াছে; যথা—"প্রাণো হ্যেষ আত্মা" (ব্রহ্মোপনিষদ্ ১); "যঃ এষ প্রাণঃ সা এষা প্রজ্ঞা···প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা" (কৌষীতকী উপঃ)। "প্রাণ ইতি স ব্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষতে" (বৃহঃ উপঃ ৩।৯।৯)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই প্রাণকেই জ্ঞানবলক্রিয়াত্মিকা-দেবাত্মশক্তি বলা হইয়াছে। যোগিবর শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, "Prakriti is the WILL and EXECUTIVE POWER of Prusha. It is not a separate entity, but one and the same with Him." "প্রকৃতি পুরুষেরই ইচ্ছাশক্তি এবং কার্যকারিণী শক্তি; ইহা পুরুষ হইতে পৃথক্ নহে, পুরুষ এবং প্রকৃতি অভিন্ন।"

এই প্রাণ এবং চৈতন্য (জ্ঞান) দ্বারা যে কিরূপ সম্মিলিত ভাবে সৃষ্টিস্থিত্যাদি কার্য সম্পাদিত হয়, তাহা আমরা গভীর অভিনিবেশ লইয়া সৃষ্ট যে-কোন পদার্থের অন্তর্নিহিত তথ্য পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারি। যেমন ধরা যাক আমার সম্মুখে একটি ৭৫।৮০ ফুট উচ্চ আম্রবৃক্ষ আছে। মাটির ভিতরে উহার নূতন নূতন শিকড়গুলি (যাহা অতীব সূক্ষ্ম এবং এত কোমল যে স্পর্শ করিলেই ভাঙ্গিয়া যায়) তদপেক্ষা বহুগুণ কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া প্রবিষ্ট হইতেছে; এই প্রক্রিয়ার অন্তরালে যে শক্তিটি নিহিত আছে, তাহা অচিন্তনীয় নহে কি? দ্বিতীয়তঃ, মাটির ভিতর হইতে শিকড়গুলি রস আকর্ষণ করিয়া আনিয়া ৮০ ফুট উর্ধ্বে প্রেরণ করিতেছে। তৃতীয়তঃ সেই একই রস হইতে পাতার উপযুক্ত রস পাতাগুলিকে, ছালের উপযোগী কষায়-রসটুকু ছালকে, Silico-calcium-প্রধান রসটুকু কাণ্ডকে ইত্যাদি যথাযথভাবে বৃক্ষের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পরিবেশন করিতেছে; ভুলিয়াও ফলের মিষ্ট রস ছালের ভিতরে বা কাণ্ডের প্রয়োজনীয় রস পাতার ভিতরে দিতেছে না। চতুর্থতঃ মাটির ভিতর হইতে উপাদান আনিয়া উহাকে সুগন্ধ পদার্থে, মধুতে পরিণত করিয়া তাহা প্রতিটি ফুলের ভিতরে এবং শর্করাপ্রধান রস প্রতিটি ফলের ভিতরে রাখিতেছে। পঞ্চমতঃ, ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রকারের নব নব বৃক্ষসৃষ্টির জন্য অনুরূপ শক্তি পরিকল্পনা এবং ভবিষ্যৎ অঙ্কুরটি সাবালক না হওয়া অবধি তাহার জন্য খাদ্যটুকু পর্যন্ত আঁটির ভিতরে সঞ্চিত রাখিয়া কঠিন আবরণ-দ্বারা তাহা রক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে। এইরূপে প্রতিটি কার্য সুনিপুণভাবে সম্পাদিত হইতেছে; অনন্ত কোটি ক্ষেত্রে ইহা ঘটিতেছে, কিন্তু কোথায়ও কোন ভুলভ্রান্তি কিংবা ইতস্ততঃ ভাব নাই। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তৃণ হইতে দেবতা পর্যন্ত সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের ভিতরেই নিয়ত এবম্বিধ চৈতন্যসমন্বিত প্রাণের কার্য—ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মশক্তির লীলা বিদ্যমান; চৈতন্য-টুকুই আত্মা, এবং প্রাণ তাঁহারই জ্ঞানবল-ক্রিয়াত্মিকা শক্তি; চৈতন্য আশ্রয়, প্রাণ আশ্রিত। এই চৈতন্য এবং প্রাণ উভয়ই বিশ্বব্যাপী, উভয়ই এক এবং অদ্বিতীয়। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন,"—বাহ্যদৃষ্টিতে নামরূপের যতই বৈচিত্র্য, যতই বিভিন্নতা থাক না কেন, তত্ত্বহিসাবে সবই এক, অভিন্ন।

শ্রুত্যুক্ত প্রাণপ্রসঙ্গ হইতে এইরূপে আমরা জানিতে পারি যে প্রাণ জগতে মাত্র একটিই; আপনার প্রাণ হইতে আমার প্রাণ বিভিন্ন নহে, বা আমার প্রাণ হইতে পশুপক্ষীতৃণলতাদির

প্রাণও ভিন্ন নহে। সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে প্রাণশক্তির একমাত্র উৎস পরমপুরুষ পুরুষোত্তম; আর ধাতুপরমাণু হইতে হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা অবধি আমরা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন রূপের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের যন্ত্র মাত্র। প্রকাশের পার্থক্য দ্বারা শক্তির বা তদধিষ্ঠান চৈতন্যের ভিন্নত্ব প্রমাণিত হয় না। প্রাণের এই ঐক্যজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকেই প্রাণাত্মবিদ্ বলা হইয়াছে; ব্যষ্টিপ্রাণের সহিত এই বিশ্বব্যাপী প্রাণের তাদাত্ম্য উপলব্ধি দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়।

ওঁ নমো ব্রহ্মণে ব্রহ্মশক্তয়ে প্রাণায় চ ওঁ ॥

সোঽহম্

শ্রীগুরুদাস দাশ

মানব জনম লভিলে যখন
　　হ'য়োনা মায়ার ভৃত্য,
আত্মজ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়া
　　আলোকিত কর চিত্ত!

নিজেরে শুধাও - কোথা হ'তে এলে,
এ ধরায় কেন জনম লভিলে,
কোন্ সে অজানা দেশে যাবে পুন
　　কিবা আছে চিরসত্য?

'আমি' কোন্ জন—দেহ, না অন্য?
　　স্বরূপ তাহার কি,
মৃত্যুর পারে আর কিছু আছে?
　　সার সত্যটি কি?

এ বিশ্ব মাঝে এতো শৃঙ্খলা;
　　চালায় তাহারে কে?
শুধু অচেতন শক্তি, নিয়ম,
　　অথবা চেতন সে?

আপন স্বরূপ, বিশ্বস্বরূপ
　　ফুটিবে যখন মনে
দাস আর নাহি রহিবে জড়ের,
　　রাজা হবে সেইক্ষণে।

মানব জনম হবে সার্থক,
　　লাভ হবে অমৃতত্ব—
অসীমের সনে হবে একাকার,
　　বিশ্ব চলিছে নির্দেশে যাঁর
দেখিবে নিজেরে তাঁরি সাথে এক—
　　চির অবিনাশী তত্ত্ব।

শিক্ষাপ্রসঙ্গ

স্বামী ভূধরানন্দ

বর্তমানে শিক্ষাসম্বন্ধে বহু আলোচনা হইতেছে। উন্নতিমূলক উপযুক্ত জাতীয় শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে নিরূপিত হইয়া দেশে এখনও প্রবর্তিত হয় নাই। জাতির উন্নতি সর্বাপেক্ষা অধিক নির্ভর করে শিক্ষার উপর। যে জাতির শিক্ষিতের সংখ্যা যত উচ্চ সেই জাতি তত উন্নত। ইদানীং শিক্ষার মান খুব উন্নত না হইলেও উহার উন্নয়নের নানাবিধ চেষ্টা হইতেছে। প্রয়োজনমত যোগ্য শিক্ষকের অভাব, যথাযোগ্য পুস্তকের অভাব, সর্বোপরি যথেষ্ট অর্থের অভাব ইত্যাদিও উপযুক্ত শিক্ষার প্রবর্তনের পথে অন্তরায় রহিয়াছে।

শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু সুনির্বাচিত না হইলেও শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত মতভেদ নাই। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অধিকাংশ বিশিষ্ট মতানুযায়ী পাওয়া যায় যে, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হইল চরিত্রবান, আত্মবিশ্বাসী এবং সমাজ ও দেশের প্রয়োজনসিদ্ধির উপযুক্ত লব্ধবিদ্য 'মানুষ' তৈয়ারী করা, কেবলমাত্র অর্থোপার্জনের উপযোগী বিদ্যায় ভূষিত করা নহে। চরিত্র গঠিত না হইলে লব্ধবিদ্য, তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি দ্বারাও দেশের কল্যাণ না হইয়া অকল্যাণ হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। এজন্য অর্থকরী বিদ্যাদানের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের চরিত্রগঠনের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের চিন্তাই ক্রমে সংস্কারে পরিণত হয়, এবং সংস্কারই চরিত্রের নিয়ামক। সেজন্য চরিত্রগঠনে প্রয়োজন সচ্চিন্তার পরিবেশন। ধর্মের মাধ্যমে ইহা সহজে করা যায়। ধর্মকে বাদ দিয়া শিক্ষা সম্পূর্ণও হয় না। কারণ আমাদের জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি ধর্ম—উহাই জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। ধর্ম বলিতে স্বামীজী বলিয়াছেন, "অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশসাধন," "যে ভাবধারা পশুকে মানুষে এবং মানুষকে দেবতায় পরিণত করে।"

শিক্ষার মাধ্যমে 'মানুষ' হওয়ার অর্থ, যে চরিত্রবান ব্যক্তি দেহ মন সুস্থ ও বলিষ্ঠ রাখিয়া বিজ্ঞানাদির জ্ঞানে ভূষিত হইয়া জীবনসংগ্রামে জয়ী হওয়ার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। এইরূপ শিক্ষা বিদ্যার্থীকে নিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সম্পন্ন করিয়া তাহার মস্তিষ্ক উচ্চ চিন্তা ও আদর্শে পূর্ণ করে, দুর্বল স্বার্থপর না করিয়া দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ ও সাহসী করে, সংঘবদ্ধ হইয়া কার্য করিতে শিক্ষা দেয়; শিক্ষা তাহার মজ্জাগত হইয়া সংস্কারে পরিণত হয়।

প্রাচীন কালের গুরুগৃহে শিক্ষার মধ্যে এই 'মানুষ' গড়িবার দিকটিতে বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া হইত। অভিভাবকগণ বালকদের গুরুগৃহে পাঠাইতেন। সেখানে ব্রহ্মচর্যব্রত, সেবা ও অধ্যয়নের মাধ্যমে এবং বিশেষ করিয়া জলন্ত পাবকসদৃশ আচার্যের জীবনের সংস্পর্শে যুবকগণ বহুবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিমল চরিত্রেরও অধিকারী হইয়া সমাজে ফিরিয়া আসিত। শুধু যে তাহাদিগকে বেদাদি শিক্ষাই দেওয়া হইত তাহা নহে, জাগতিক বিদ্যাও দান করা হইত; 'পরা' ও 'অপরা' উভয় বিদ্যাই। চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, ফলিত জ্যোতিষ, কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য, যুদ্ধবিদ্যা, অস্ত্রনির্মাণ, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি বহুবিধ বিদ্যার তখন প্রভূত

উন্নতি হইয়াছিল। আচার্যগণই বিদ্যার্থিগণের সব ব্যয়ভার বহন করিতেন। বিবিধাকার দানের মাধ্যমে সমাজ আচার্যগণকে এ বিষয়ে সহায়তা করিত।

গুরুগৃহগুলির পরিবেশও ছিল বিদ্যার্থীদের জীবনগঠনের অনুকূল। লোকালয় হইতে দূরে মনোরম অনাড়ম্বর পরিবেশে উহা স্থাপিত হইত। মনের একাগ্রতা সাধনের জন্য এরূপ পরিবেশ অপরিহার্য।

একাগ্র মন এত শক্তিসম্পন্ন হয় যে, উহা দ্বারা অনায়াসে এবং স্বল্প সময়ে জ্ঞান আহরণ সম্ভব হয়। মন একাগ্র না হইলে, সুষ্ঠুরূপে মনোযোগ দিতে না পারিলে অধ্যয়ন কোন অবস্থায় সন্তোষজনক হয় না। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—"আমার মতে মনের একাগ্রতা-সাধনই শিক্ষার প্রাণ, শুধু তথ্যসংগ্রহ করা নহে। আবার যদি আমাকে নূতন করিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইত এবং নিজের ইচ্ছামত আমি যদি তাহা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে শিক্ষণীয় বিষয় লইয়া আমি মোটেই মাথা ঘামাইতাম না। আমি আমার মনের একাগ্রতা ও নির্লিপ্ততার ক্ষমতাকেই ক্রমে ক্রমে বাড়াইয়া তুলিতাম; তারপর এভাবে গঠিত নিখুঁত যন্ত্রসহায়ে খুশিমত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিতাম। মনকে একাগ্র ও নির্লিপ্ত করিবার ক্ষমতাবর্ধনের শিক্ষা শিশুদের একসঙ্গেই দেওয়া উচিত।" গুরুগৃহে গুরুর পবিত্র জীবনের সংস্পর্শে বিদ্যার্থীদের জীবনে স্বাভাবিকভাবেই পবিত্রতা অনুপ্রবিষ্ট হইত। শিক্ষায় অধিক দৃষ্টি নিবদ্ধ হইত বিদ্যার্থীর অন্তরস্থ জ্ঞানের উন্মেষের পথের বাধাপসারণে; সুযোগ্য মালী যেরূপ নির্দিষ্ট চারাগাছটিকে উহার পূর্ণ বৃদ্ধির জন্য বেড়া ও সার দিয়া, গোড়া খুঁড়িয়া, পর্যাপ্ত বারি সেচন ও বৃহৎ বৃক্ষের আচ্ছাদন হইতে রক্ষা করিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করে, উপযুক্ত অভিজ্ঞ গুরুও তদ্রূপ অপ্রাপ্তবয়স্ক শিষ্যকে তাহার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথের প্রতিবন্ধ অপসারণের ও অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্বের বা দেবত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মচর্যব্রত পালনের উপযুক্ত ব্যবস্থা, প্রয়োজন অনুরূপ খাদ্য-ব্যবস্থা, বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ-সম্পাদনে যত্ন এবং যথেষ্ট পরিমাণে স্নেহসেচন ও স্বাধীনতাদান করিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করেন।

অভিজ্ঞ আচার্যের তত্ত্বাবধানে প্রায় দ্বাদশবর্ষ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্য জাগ্রত আত্মপ্রত্যয়-সহ দেবোপম চরিত্রের অধিকারী হইয়া নিজগৃহে প্রত্যাগমনের অভিলাষ গুরুকে নিবেদন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলে তিনি এইরূপ আশীর্বচন উচ্চারণ করিতেন, 'উঠ বৎস, সাহস অবলম্বন কর, বীর্যবান হও, সমুদয় দায়িত্ব আপনার স্কন্ধে লও—জানিয়া রাখ তুমিই তোমার অদৃষ্টের সৃজনকর্তা। তুমি যাহা কিছু বল বা সহায়তা চাও তাহা তোমার ভিতরেই রহিয়াছে।'

অর্জিত জ্ঞানকে সংস্কারে পরিণত করিয়া পূর্ণ মানুষ তৈয়ার করিবার রীতি তখনকার আচার্যগণ জানিতেন। সমাজ তখন এইরূপ চরিত্রবান মানুষ দ্বারা পূর্ণ ছিল। প্রাচীন কালের এই শিক্ষাব্যবস্থাই ভারতের জাতীয় শিক্ষার মূলভিত্তি। দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থার নানারূপ গলদ ও শিক্ষিতগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া এবং পূর্বোক্তরূপ শিক্ষা-পদ্ধতির পুনরায় প্রচলনে দেশের সকল রকমে উন্নতি হইবে মনে করিয়া ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ কম্বুকণ্ঠে দেশবাসীকে

আহ্বানপূর্বক বলিয়াছেন, "আমার বিশ্বাস—গুরুর সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া গুরুগৃহ-বাসেই প্রকৃত শিক্ষা হইয়া থাকে। গুরুর সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে না আসিলে কোনরূপ শিক্ষাই হইতে পারে না।"

বর্তমান কালে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সহিত প্রাচীনকালে এই গুরুকুলপ্রথার যথাসম্ভব সংমিশ্রণ সাধন করিতে হইবে—সাহিত্য-শিল্প-বিজ্ঞানাদি জাগতিক শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণ যাহাতে চরিত্রবলেও বলীয়ান হইয়া উঠিতে পারে, তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ও পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়া অপর দেশের যে শিক্ষা উৎকৃষ্ট ও হিতকারী বিবেচিত হইবে তাহা নিজেদের ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। অন্ধ অনুকরণ কখনো কল্যাণজনক হইবে না।

ব্রহ্মচর্যের প্রতি বিদ্যার্থিগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করা প্রয়োজন। সংযমই সকল শক্তির উৎস – এটি তাহাদের প্রবিষ্ট করাইতে হইবে। বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "যোগীরা বলেন মনুষ্যদেহে যত শক্তি অবস্থিত, তাহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি ওজঃ। এই ওজঃ মস্তিষ্কে সঞ্চিত থাকে; যাহার মস্তিষ্কে যে পরিমাণে ওজোধাতু সঞ্চিত থাকে, সে সেই পরিমাণে বুদ্ধিমান ও আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান হয়। ইহাই ওজোধাতুর শক্তি।··· কামজয়ী নরনারীই কেবল এই ওজোধাতুকে মস্তিষ্কে সঞ্চিত করিতে সমর্থ হন।" ছাত্রগণের হৃদয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি, ভারতীয়তার প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্য শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃতের চর্চা, এবং ছাত্রদের ধর্মজীবন গঠনে প্রয়াস একান্ত প্রয়োজন। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "সংস্কৃত শিক্ষায় সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণমাত্রেই জাতির মধ্যে একটা গৌরব, একটা শক্তির ভাব জাগিবে।"··· "আমি ধর্মকে শিক্ষার ভিতরকার সার জিনিস বলিয়া মনে করি।"··· "আধ্যাত্মিকতাই জীবনের অন্যান্য কার্যসমূহের ভিত্তি। আধ্যাত্মিক সুস্থতা ও সবলতা সম্পন্ন মানব যদি ইচ্ছা করেন অন্যান্য বিষয়েও দক্ষ হইতে পারেন; আর মানুষের ভিতর আধ্যাত্মিক বল না আসিলে, তাহার শারীরিক অভাবগুলি পর্যন্ত ঠিক ঠিক পূরণ হয় না।" (শিক্ষাপ্রসঙ্গ)।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচীন গুরুকুলপ্রথার সহিত বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির সমন্বয় চাহিয়াছিলেন। আধুনিক যুগের সাহিত্য-শিল্প-বিজ্ঞানাদি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণকে যাহাতে চরিত্রবলে বলীয়ান—যথার্থ "মানুষ" করিয়া তোলার শিক্ষাও দেওয়া হয়, তাহা তিনি চাহিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণমিশনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি স্বামীজীর সেই ইচ্ছাকে বাস্তবরূপায়িত করিবার প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত।

বর্তমান সময়ে দেশে ছাত্রসংখ্যার তুলনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অতি অল্প। তাছাড়া মনোমত প্রতিষ্ঠানগঠনে অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য বহুবিধ বাধাও রহিয়াছে। তথাপি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে যাহাতে স্বামীজীর ইচ্ছানুরূপ গড়িয়া তোলা যায় তাহার বিশেষ চেষ্টা করা প্রয়োজন। ছেলেদের যথার্থ শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইলে ইহা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই। শুধু অর্থকরী বিদ্যালাভই নয়, জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার জন্য, দেশের ও সমাজের যথার্থ কল্যাণকারী হইবার জন্য আরো যে সব যোগ্যতার প্রয়োজন, তাহা সবই পরিবেশন করার আয়োজন প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

ইহার জন্য বর্তমানে কয়েকটি দিকে নজর দেওয়া মনে হয় অসম্ভব নহে, বিশেষ করিয়া নূতন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িবার সময় তাহা করা যায়, স্কুলের জন্য তো বটেই।

ইহার জন্য, বলা বাহুল্য, শিক্ষকদের নিজের জীবন ও আচরণের দিকে সর্বাগ্রে নজর দিতে হইবে। নিজের আচরণে যদি আদর্শের বিপরীত হয়, তাহা হইলে ছাত্রগণকে আদর্শনিষ্ঠ করানো সম্ভবপর নহে।

আদর্শনিষ্ঠ, সহানুভূতিশীল শিক্ষকের সংস্পর্শে ছাত্রগণ যত অধিক সময় কাটাইতে পারে ততই ভাল। সেজন্য শিক্ষায়তনগুলি আবাসিক হইলেই সবচেয়ে ভাল হয়। উহা সম্ভবপর না হইলে অন্ততঃ অর্ধ-আবাসিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেখানে ছাত্রগণ সকালে যাইয়া শিক্ষকগণের সহিত সারাদিন কাটাইয়া সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিতে পারে। আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান। সকালে ও বিকালে ক্লাস করিতে পারিলেই ভাল। দ্বিপ্রহরে ছাত্রগণের আহারের ও বিকালের জলযোগের আয়োজন শিক্ষায়তনের মধ্যেই থাকিবে। বর্তমানে প্রচলিত 'ডে-ষ্টুডেন্টস হোম'গুলির অনুকরণে ইহা করা যায়; ছাত্রগণ স্বল্পব্যয় বহন করিবে, বাকী ব্যয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি বহন করিলেই ভাল। অবসর-সময়ে পাঠের সুবিধার জন্য লাইব্রেরীও সেখানে থাকিবে। খেলাধুলার মাঠ এবং ব্যায়ামাগারও থাকা চাই।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্থান সহরাঞ্চলে হইলে তাহা সহর হইতে ২।৩ মাইল দূরে কোন উন্মুক্ত অঞ্চলে হওয়া চাই। ফুলবাগান, সবজিবাগান প্রভৃতির জন্য জমিও যথেষ্ট থাকা প্রয়োজন। ছাত্রগণ সেখানে অবসরকালে নিজেরা একটু আধটু বাগানের কাজ করিতে পারিলে আরো ভাল হয়। সহজ, স্বাভাবিক ভাবে ছাত্রদের মনে আনন্দময় ভাব, সামান্য শারীরিক শ্রম, একাগ্রতা, আত্মবিশ্বাস, পবিত্রতা ও সর্বোপরি কিছু ধর্মভাব যাহাতে প্রবেশ করে, তাহার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুরই আয়োজন সেখানে রাখিতে হইবে। একটি প্রার্থনাগৃহ একান্ত প্রয়োজন। স্কুলের কার্যারম্ভের পূর্বে ছাত্রগণ যেখানে সমবেত হইয়া প্রার্থনা, ভজন ইত্যাদিতে কিছুক্ষণ কাটাইতে পারে। এই গৃহে ধর্মাচার্য-গণের আলেখ্য থাকিবে, প্রার্থনাদির সময় ধূপ জ্বালানো হইবে, ফুলদানিতে কিছু ফুলও থাকিবে। এমন একটি পরিবেশ হওয়া চাই, যেখানে প্রবেশ করিবামাত্র মন স্বতই শান্ত হইয়া আসে। অভ্যাস ছাড়া মনের মধ্যে কোন কিছুর ছাপ স্থায়ভাবে দেওয়া যায় না।

এককথায়, যে গুণগুলি ছাত্রজীবনে অর্জন করা প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়, সেগুলিকে কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ছাত্রদের মনে নিয়মিতভাবে পরিবেশনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কতক-গুলি সদভ্যাসের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। দৈনন্দিন কার্যসূচীতে সেগুলি থাকা প্রয়োজন। অথচ সর্বদা নজর রাখিতে হইবে, ছাত্রেরা যেন কখনও ভাবিবার অবসর না পায় যে তাহাদের স্বাধীনতা ব্যাহত হইতেছে। সহানুভূতিশীল শিক্ষকগণের সহিত কেবল পড়াশুনার সময় নয়, খেলাধুলা, প্রার্থনা, গল্পগুজব প্রভৃতির সময়ও মেলামেশার ফলে পরস্পরের প্রতি ভালবাসার বন্ধন দৃঢ়তর হইবে, এবং ছাত্রগণ অনুভব করিতে পারিবে যে তাহারা যাহা শিখিতেছে তাহা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে। এরূপ হইলে শিক্ষা 'মানুষ' তৈয়ারীর উপযোগী হইবে।

ছাত্রগণের আবাস হইতে দুইতিন মাইলের মধ্যে শিক্ষায়তনগুলি রাখিতে পারিলে আরো একটি সুফল হইবে; ছাত্রগণ সকালে সেখানে হাঁটিয়া যাইতে ও বিকালে হাঁটিয়া ফিরিতে পারিবে। অধিকাংশ ছাত্রকে খাওয়ার পরই হাঁটিয়া অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া বিদ্যালয়ে আসিতে হয়। ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর।

লাইব্রেরীতে সর্বধর্মের মহাপুরুষদের, বড় বড় দেশনেতা, সাহিত্যিক প্রভৃতির জীবনী এবং আলেখ্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

মনে হয়, আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হইলে আমরা এভাবে বা উন্নততর অন্য কোন উপায়ে ছাত্রগণকে অর্থকরী বিদ্যালাভের সহিত চরিত্রবলেও বলীয়ান করিয়া তুলিয়া দেশের যথার্থ কল্যাণ করিতে পারিব।

পরলোকে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু

গভীর দুঃখের বিষয়, গত ১৬ই এপ্রিল, ১৯৬৬, শনিবার বিকাল ৫টা ৩২ মিনিটের সময় দেশনন্দিত শিল্পসাধক, নন্দলাল বসু ৮৩ বৎসর বয়সে শান্তিনিকেতনে তাঁহার নিজস্ব ভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন-যজ্ঞের এই অন্যতম প্রধান ঋত্বিকের দেহাবসানে শিল্পজগতের, বিশেষতঃ ভারতীয় চিত্রকলার যে ক্ষতি হইল, তাহা অপূরণীয়।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর মুঙ্গের জেলার খড়্গপুরে তিনি জন্মলাভ করেন; তাঁহার পিতা পূর্ণচন্দ্র বসু তখন সেখানে কর্মব্যপদেশে বাস করিতেন।

দ্বারভাঙ্গাতে তাঁহার ছাত্রজীবন আরম্ভ হয়। ১৬ বছর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে তিনি ভর্তি হন এবং ২০ বছর বয়সে এন্ট্রান্স পাশ করিয়া এফ.এ পড়িবার জন্য মেট্রোপলিটনে (বিদ্যাসাগর কলেজ) ভর্তি হন। কিন্তু শিল্পের প্রতি আকর্ষণের আধিক্য-হেতু পাস করা সম্ভব হইল না। শিক্ষার অন্যান্য বিভাগে পড়াইবার জন্য অভিভাবক-গণের চেষ্টাও ব্যর্থ হইবার পর তিনি কলিকাতা গভর্ণমেন্ট স্কুল অব আর্টস্-এ ভর্তি হন। অবনীন্দ্রনাথ তখন উহার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের ভারতীয় চিত্রাবলী তাঁহাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে অবনীন্দ্রনাথ প্রিন্সিপ্যাল ই. বি. হ্যাভেলের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। প্রিন্সিপ্যাল হ্যাভেল তাঁহার শিল্পনৈপুণ্যে প্রীত হন। স্কুলে এবং পরে বাড়ীতে অবনীন্দ্রনাথের নিকটই তিনি শিক্ষালাভ করিতে থাকেন। ছাত্রাবস্থায় অঙ্কিত তাঁহার বহু চিত্র প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

এই সময় ভগিনী নিবেদিতা একদিন আর্টস স্কুলের এই তরুণ শিল্পীর চিত্রনৈপুণ্যে বিশেষ আকৃষ্ট হন। ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বতোভাবে পুনরুজ্জীবনের জন্য ভগিনী নিবেদিতা যে বিষয়ে যাঁহাকে উন্নতির সহায়ক দেখিতেন, তাঁহাকেই যথাসাধ্য সহায়তা ও অনুপ্রেরণা দান করিতেন। রাজনীতিক্ষেত্রে অগ্নিযুগের ঋত্বিকদিগকে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে তিনি যেভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, সেই ভাবেই অসীম আগ্রহ লইয়া ভারতীয় শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনের জন্য অনু-প্রেরণা দান ও সহায়তা করিয়াছিলেন নন্দলাল বসুকে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি লেডি হেরিংহাম অজন্তা গুহার চিত্রগুলি নকল করিতে আসিয়াছিলেন; ভগিনী নিবেদিতাই সে সময় নন্দলাল বসুকে সেখানে পাঠাইয়া দেন তাঁহার কাজে সহায়তা করিতে। নন্দলালবাবুর সহকর্মী অসিত হালদারও তাঁহার সঙ্গে যান। ভগিনী নিবেদিতার নিকট তিনি নানাভাবে যে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, পরজীবনে কৃতজ্ঞচিত্তে তিনি পুনঃপুনঃ সে কথার উল্লেখ করিতেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বিশ্বভারতীর কলাভবনে যোগ দিবার পর শান্তিনিকেতনের সহিত নন্দলাল বসুর আত্মীয়তা গভীর হইয়া উঠে এবং এক বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সেখানেই তিনি স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকেন;

কলাভবনের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন ১৯২২ খৃষ্টাব্দে। শান্তিনিকেতনের কলাভবন তাঁহারই কীর্তি বহন করিতেছে। বহু বিদেশাগত ছাত্র এখানে ভারতীয় ছাত্রদের সহিত ভারতীয় শিল্প শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। ছাত্রদিগকে তিনি ভালবাসিতেন গভীরভাবে, স্বাধীনতা দিতেন তাহাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে। কলাভবন ও শান্তিনিকেতনের সহিত তাঁহার স্মৃতি নিবিড় ভাবে বিজড়িত।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি রবীন্দ্রনাথের সহিত চীন, জাপান, মালয় ও ব্রহ্মদেশ ঘুরিয়া আসেন, এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত যান সিংহলে।

মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনেও তিনি যোগ দিয়াছিলেন; ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে লবণআইন-অমান্য আন্দোলনে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। মহাত্মাজীর আহ্বানে কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে তিনি ভারতশিল্পের প্রদর্শনী সজ্জিত করেন।

ভারতীয় শিল্পে তাঁহার অতুলনীয় অবদানের জন্য ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে কাশী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'ডক্টরেট' উপাধিতে ভূষিত করেন; বিশ্বভারতী তাঁহাকে 'দেশিকোত্তম' উপাধি দেন কিছুকাল পরে। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার তাঁহাকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে এবং ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'ডি. লিট.' উপাধিতে ভূষিত করেন।

ভগিনী নিবেদিতার সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের ফলে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত নিবিড় আত্মীয়তা গড়িয়া উঠে। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুরের মন্দিরটি তাঁহার পরিকল্পিত। শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলিপূত মাটির ঘরগুলিকে ঠিক সেই ভাবেই রক্ষা করিয়া, এবং সেগুলির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই তিনি মন্দিরটির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কামারপুকুরের কথা উঠিলেই তিনি উহাকে তাঁহার পরমতীর্থ বলিয়া বর্ণনা করিতেন। বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের বেদী এবং উহার পৃষ্ঠপট, মন্দিরগাত্রের নবগ্রহের মূর্তি প্রভৃতি বহু অঙ্গ তাঁহার শিল্পনৈপুণ্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। উদ্বোধন কার্যালয়ের সহিতও তাঁহার বিশেষ প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত বহু পুস্তকের প্রচ্ছদপট এবং উদ্বোধন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাগুলির বহু চিত্রাদি তিনি আঁকিয়া দিয়াছিলেন।

অনন্যসাধারণ গুণভূষিত হইয়াও তিনি অতি সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মধুর আচরণের সংস্পর্শে যাঁহারা একবারও আসিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই নিকট তাঁহার নিরহঙ্কার ভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত।

তাঁহার দেহাবসানে শিল্পজগতের ও বিশ্বভারতীর যে ক্ষতি হইল, তাহা অপূরণীয়। উদ্বোধন কার্যালয়ের ক্ষতির পরিমাণও অপরিমেয়।

এই মহাপ্রাণ শিল্পাচার্যের দেহ-নির্মুক্ত আত্মা ভগবচ্চরণে চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

শিল্পচর্যায় শিল্পাচার্য নন্দলাল

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তী

মর্মরিত শালবীথির ছায়ায় স্তব্ধবেদনায় নিথর হয়ে আছে কলাভবন। নিদাঘদিনের প্রখর দুপুরে লালধুলোর ঘূর্ণীহাওয়া তাকে ছুঁয়ে চলেছে বারে বারে—ফেলেআসা দিনের কত স্মৃতি বাতাসের ঐ উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে হৃদয় মথিত করে যেন বেরিয়ে আসছে। কত দিনের নিবিড় সম্পর্ক তাঁর সাথে! এই ভবনের অন্তরালে কত গ্রীষ্ম এসেছে ঘুঘুডাকা ক্লান্ত দুপুরে শ্রান্ত পথিকের রূপ ধরে, কত বর্ষা এসেছে মল্লার-রাগে নৃত্যপরা হয়ে, বাউলের একতারায় আগমনীর সুরে কত শরৎ বিধৃত হয়েছে রূপে রঙে; তুলির স্পর্শে সজীব হয়েছে সোনার ফসলে উপচেপড়া হেমন্তলক্ষ্মী, কুহেলী আবরণে নিজেকে ঢেকে প্রকাশিত হয়েছে শীতঋতু আর বিচিত্র সাজে কতবার কতভাবে মূর্ত হয়েছে চিরহরিৎ বসন্ত। শান্তিনিকেতনের এই শান্ত-পরিবেশে দিনের পর দিন আচার্য নন্দলাল একান্তে শিল্পদৃষ্টি তুলে ধরেছেন প্রকৃতির বিবর্তনের ছন্দলয়ের দিকে—মনের গভীরে প্রেরণা পেয়ে পুলকিত চিত্তে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছেন শিল্পচর্যার জোয়ারজলে। প্রাণ দিয়ে যা অনুভব করেছেন আবেগ দিয়ে তা নিঃশেষে প্রকাশ করেছেন তুলি ও বর্ণের অপরূপ বিন্যাসে; রঙের জগতে রূপের জগতে স্বচ্ছন্দ গতিতে বিচরণ করেছেন আপন আনন্দে বিভোর হয়ে। কল্পনার ভাবলোকে আরূঢ় থেকেও তিনি বাস্তব সংসারকে দূরে না রেখে তার সঙ্গে সংযোগসূত্র বেঁধেছেন অতি নিপুণভাবে। তাঁর শিল্পীসত্তা বাস্তব জীবনকে ঘিরে অজস্র ধারায় উৎসারিত হয়ে প্রতিফলিত করেছিল বর্ণরশ্মির বর্ণসম্ভার; তাঁর বস্তুধর্মী চিত্রও তাই এক অদৃশ্য মায়ায় মনকে বাস্তবতার উর্ধ্বে নিয়ে যায়! বিশ্বপ্রাণের আবেগ-উচ্ছ্বাস নিয়ত স্পন্দিত হয়েছে তাঁর শিল্পপ্রচেষ্টায়। বনানীর শ্যামলিমার মাঝে লালমাটির পথ বেয়ে যারা দলবেঁধে গান গেয়ে চলেছে তাদের উচ্ছলতা চিত্রের রেখাবন্ধনী ছাপিয়ে উঠে মনকে জানিয়ে যায় শিল্পী নিজেকে কতটা একাত্ম করে নিয়েছেন পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে, কত নিবিড় ভাবে অনুভব করেছেন গ্রামীণ জীবনের সুখদুঃখ হাসিকান্নাকে। সাঁওতাল পল্লীর নিতান্ত সাধারণ ঘটনাও দরদী-মনের ছোঁয়া পেয়ে রূপায়িত হয়েছে অপরূপ মহিমায়। জীবনের নাট্যমঞ্চের একপাশে বসে গেছেন শিল্পী রঙতুলি হাতে করে আর একের পর এক ছবি এঁকে চলেছেন—সাধারণ ঘটনাও সেখানে জীবন্ত তাৎপর্য নিয়ে অসাধারণ হয়ে ফুটে উঠেছে।

ঘনায়মান অন্ধকার দিনে গুরু অবনীন্দ্রনাথ শিল্পসাধনার যে দীপশিখাটি উর্ধ্বে তুলে ধরে-ছিলেন তারই বিচ্ছুরিত আলোয় শিষ্য নন্দলাল দেখতে পেলেন শিল্পপরিক্রমার নূতন সরণী—নূতন দিগন্তের দিক্‌চক্ররেখা ধীরে পরিস্ফুট হ'ল অপস্রিয়মাণ তমিস্রা ভেদ করে। রূপছন্দের অনুসরণ করে সুরু হ'ল পথচলা। অনির্বাণ শিখায় জ্বলে রইল সাধনার দীপটি আর তারই আলোয় শিল্পচেতনা ছুটে চলল অর্গলমুক্ত পথে বাধাবন্ধহারা। নিত্যনূতন শিল্পসম্পদ আহরণ করে চললেন চলন্তি পথের দুধার থেকে; সৃষ্টির ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে উঠল অভিনব চিত্ররূপে। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ভাব ও রীতি এসে মিলেছিল

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকৃতির ভিতর কিন্তু উত্তর-সাধক নন্দলাল মনে প্রাণে সাড়া দিলেন প্রাচ্য-ভূমির শাশ্বত রূপকলার আহ্বানে—ভারতের ভাবগঙ্গার পেলব পলিতে অঙ্কুরিত হ'ল চারু-শিল্পের শ্যামল সম্ভাবনা। সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশের হাতছানিতে সে অচিরে বিকশিত হয়ে উঠল রূপে রসে ছন্দে। প্রতীচীর শিল্পে অপার্থিব সৌন্দর্য প্রকাশের অবকাশ নেই; বস্তুজগতের অপরূপ ব্যঞ্জনা সেখানে রূপে রঙে বিধৃত হয়ে আছে। অথচ চোখের দেখা ছাড়িয়ে মনের গভীরে একান্ত নিভৃতে শিল্পের রসাস্বাদনে বিভোর থাকা ভারতের আবহমানকালের ঐতিহ্য। প্রাচীন ভারতের শিল্প তার সকল শিল্পকর্মে অরূপের বাণী চিরদিন বয়ে এনেছে রেখার বন্ধনে, রঙের আভাসে, ভাস্কর্যের ভঙ্গীতে আর স্থাপত্যের উৎকর্ষে। অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্পের এই ইন্দ্রিয়াতীত আবেদনে মুগ্ধ হয়েছিলেন তাই প্রতীচ্যের প্রভাব কাটিয়ে তাঁর শিল্প যাত্রা করেছিল প্রাচ্যরীতির অভিযানে। গুরুর এই অভিযানকে নিজ শিল্পশৈলীর দিশারী-রূপে নন্দলাল বরণ করে নিয়েছিলেন—রেখার সাবলীল ছন্দকে মনোনীত করেছিলেন ভাব-প্রকাশের অন্যতম মধ্যম হিসাবে।

ভারতীয় চিত্রকলার শিল্পৈশ্বর্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে প্রেরণা লাভের উৎসমুখে কল্যাণীমূর্তিতে দাঁড়িয়ে নন্দলালকে দিনের পর দিন উৎসাহ দিয়েছেন ভারতকল্যাণে নিবেদিত-প্রাণা ভগিনী নিবেদিতা। কালের যবনিকার অন্তরালে লুকিয়ে-থাকা ভারতসংস্কৃতির গৌরবময় শতাব্দীগুলি দুর্নিবার আকর্ষণে নিবেদিতাকে টেনে নিয়ে গিয়েছে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য-সৌধের সিংহদ্বারে—অভ্যন্তরে প্রবেশ করে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন আস্তীর্ণ স্মারকপ্রান্তে। তাঁর ক্রান্তদৃষ্টির সম্মুখে উদ্ঘাটিত হ'ল আগামী ভারতের নবরূপ—শিল্পের পুনরভ্যুদয়ের উপর যার ভবিষ্যৎ আশা নিহিত। ভাবী জাগৃতির আগমনপথ সুগম করতে তাই তৎপর হয়ে উঠলেন তিনি। শিল্পসংস্কৃতির পুনর্জাগরণে অবনীন্দ্রনাথকেও তিনি অনুপ্রাণিত করেন। নিবেদিতার অনুপ্রেরণায় নন্দলালও ভারতীয় ভঙ্গীতে নিজস্বভাবে চিত্রকৃতি সুরু করেন। জননীর মমতায় ঘিরে, অকৃত্রিম স্নেহধারায় অভিসিঞ্চিত করে নিবেদিতা নন্দলালকে নিয়ে গেলেন ভারতীয় চিত্রকলার চিরায়ত সৌন্দর্যের বেদীমূলে—চিরসুন্দরের উপাসনার সংকল্প নিয়ে নন্দলাল নিবিষ্ট হলেন শিল্পসাধনায়। তাই অজন্তার ভিত্তিচিত্রের অনুকৃতি করতে বসে তিনি আবেগবিহ্বল চিত্তে নিজেকে হারিয়ে ফেললেন; বিচিত্র চিত্ররাজি তাঁর শিল্পীসত্তায় ঝংকার তুলে আনন্দতানে মেতে উঠল; মুখর অতীত রূপরসের বরণডালা সাজিয়ে নবীন অতিথিকে অভিনন্দিত করে নিয়ে গেল নন্দনসৌধের মণিকুট্টিমে—শিল্পীমনের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হ'ল চিরকালের জন্য। সেই উচ্চ সৌধশিখর থেকে তিনি দেখতে পেলেন জাগ্রত শিল্পচেতনার সুদূরবিস্তৃত পরিধি। নবোদ্যমে প্রাণবন্যাধারায় প্লাবিত করলেন ঊষর শিল্পক্ষেত্র; দিকে দিকে জেগে উঠল নূতন প্রাণের স্পন্দন—পুনরুজ্জীবনের দোলায় হিল্লোলিত হ'ল ভারতীয় শিল্পকলা; সার্থক হ'ল নিবেদিতার স্বপ্ন।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে নিবেদিতা নন্দলালকে নিয়ে গেলেন সনাতন ভারতের আত্মিকরূপের সংস্পর্শে; অন্তর্দৃষ্টির বিমল আলোয় নন্দলাল বিভোর হয়ে দেখলেন সেই বিভাসিত রূপটি।

অধ্যাত্মচিন্তার আবেষ্টনে সকল কর্মপ্রচেষ্টায়

ছন্দোবদ্ধ ভাবটি ধীরে অনুপ্রবিষ্ট হ'ল শিল্পীর অন্তরে দীর্ঘমূল বিস্তার করে—উত্তরকালে তাই তিনি স্বতঃস্ফূর্তপ্রকরণে রূপের প্রদীপ দিয়ে আরতি করে চললেন অপরূপের মানসমূর্তি। আত্মনিবেদনের সুরটি অন্তরে ধ্বনিত হয়ে অভিব্যক্ত হ'ল ভক্তিরসনিষ্যন্দী তুলির রসধারায় বিচিত্র বর্ণপ্রলেপে রেখার সৌকর্যে আর রূপের মধুরিমায়। রূপের পূজারী ক্রমে জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে রূপাতীতলোকের দ্বারদেশে উপনীত হলেন—মঙ্গলজ্যোতির উদ্ভাসিত আলোকে সুন্দরের সোপান অতিক্রম করে আশ্রয় পেলেন সত্যসুন্দরের পদপ্রান্তে। সবিতৃ-মণ্ডলমধ্যবর্তী হিরণ্ময়বপু পুরুষের সৌন্দর্যচ্ছটায় ভাস্বর হয়ে একে একে প্রকাশিত হ'ল আচার্যের পৌরাণিক চিত্রাবলী। মহাযোগী শংকরের রূপসৃষ্টির আবেদনে তাই মিলেছে অভ্রভেদী শৈলশিখরের গাম্ভীর্য আর নীলাম্বর গভীর ব্যাপ্তি; বর্ণবিন্যাসে ফুটেছে ভিখারীর রিক্তসৌন্দর্য। রূপলাবণ্য যোজনায় শিল্পী প্রতিপদক্ষেপে প্রকাশ করেছেন ভারতের চিরকালের শ্রদ্ধানত ভাবটি এবং সেইজন্যই আচার্যের তুলির স্পর্শে প্রতি দেবচরিত্র বা মহামানবচরিত্রই দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে মহিমোজ্জ্বল অভিব্যক্তিতে। কল্পনার মন্দাকিনীতে অবগাহন করে পৌরাণিক চিত্র মাত্রই অপূর্ব বর্ণচ্ছটায় উঠে এসেছে রসোত্তীর্ণ সৈকতভূমিতে নবোদিত সূর্যের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য অঙ্গে ধারণ করে।

অন্তহীন যাত্রাপথে মহাকালের স্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে অগণিত প্রাণের আবর্ত সৃষ্টি করে; তারই প্রবাহে আজ আনন্দসাগরে যাত্রা করেছে শিল্পাচার্যের মুক্ত আত্মা। বসুন্ধরার কোলে সেখানে যখনই অসীম আশা নিয়ে শিল্পীমন বিকশিত হয়ে উঠবে, শ্রদ্ধার অর্ঘ্য সাজিয়ে শিল্পী যখন যথার্থই নিজেকে উৎসর্গ করবে শিল্পসাধনার বেদীমূলে, উর্ধ্বলোক থেকে আচার্যের আশিসধারা নেমে এসে শিল্পীকে এগিয়ে নিয়ে যাবে চরমপ্রাপ্তির লক্ষ্যে - শিল্পের হবে অমৃতসাগরে উত্তরণ।

শ্যামাসঙ্গীত

(সুর -- রামপ্রসাদী)

শ্রীসুধীরকুমার দাস

বক্ষে ধরেন শিব যে চরণ,
আমি শরণ নিলাম সেই চরণে।
ভয় নাই মাগো আর মরণে॥

যা করছি মা মর্ত্যলোকে
সব কিছুই মা দিলাম তোকে
আপনার বলতে রইলো শুধু
ওই চরণের শরণ মনে।
ভয় নাই মাগো আর মরণে॥

(আমি) বিশ্বজনে বলবো ডেকে,
তোরা দেখে যারে আমার মাকে,
মা বসে আছেন আলো করে
সবার হৃদি-সিংহাসনে।
ভয় নাই মাগো আর মরণে॥

সমালোচনা

Parliament of Religions (1963-1964) Published by Swami Sambuddhananda, Secretary, Swami Vivekananda Centenary, 163, Acharya Jagadish Bose Road. Calcutta 14. Pp. 409+xvi. Price Rs. 18/-.

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত Parliament of Religions স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবে একটি যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছিল। স্বামীজীর উদাত্ত বাণীর মধ্যে মানবসমাজ সেদিন ধর্মসমন্বয়ের গভীর সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। ধর্মসমন্বয়ের মহাবাণীই যে মানবজাতিকে যথার্থ ভ্রাতৃত্বের সূত্রে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারে এ তত্ত্ব মানুষ সেদিন নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করিয়াছিল।

সেই ধর্মমহাসভার অবিস্মরণীয় কাহিনীকে মানস-নেত্রের সম্মুখে রাখিয়া স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁহার জন্মভূমি কলিকাতা নগরীতে ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের জানুআরি মাস পর্যন্ত একটি ধর্মমহাসভার অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। এই ধর্মমহাসভায় যে-সকল বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করা হইয়াছিল সেগুলির অধিকাংশ সংগ্রহ করিয়া সম্প্রতি Parliament of Religions নামক একটি সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। চিন্তা ও মননশীলতার জগতে এই সঙ্কলন-গ্রন্থটি একটি বহুমূল্য সম্পদ।

ধর্মসমন্বয়ের জগতে স্বামীজীর অতুলনীয় ভূমিকার উপর এই গ্রন্থে নানা দিক হইতে বিভিন্ন মনীষিগণ উজ্জ্বল আলোক সম্পাত করিয়াছেন। বিভিন্ন রচনাগুলির দীপ্তিতে স্বামীজীর বিরাট ও বহুমুখী প্রতিভার একটি মহৎ আলেখ্য পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখে আবির্ভূত হয়। এই গ্রন্থের প্রারম্ভ-কথায় তাই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার অভ্রান্তভাবেই বলিয়াছেন - "It is needless to add that the towering personality of Swami Vivekananda emerges out of all these discourses as the great guide of the future of humanity"

গ্রন্থটিতে রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি (সম্প্রতি-লোকান্তরিত) স্বামী মাধবানন্দজীর ও শতবার্ষিকী সমিতির সভাপতির ভাষণ ব্যতীত ৫৮টি রচনা স্থান পাইয়াছে। রচনাগুলি চিন্তাশীলতা ও ওজস্বিতার দিক হইতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

- ধর্মসমন্বয় যে কেবল একটি পবিত্র সঙ্কল্পমাত্র নহে, তাহার যে একটি গভীর তাৎপর্য আছে, স্বামীজীর বাণীর আলোকে বহু মনীষী এই গ্রন্থে তাঁহাদের রচনার মাধ্যমে ইহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ধর্মসমন্বয়ের প্রকৃত অর্থ, প্রত্যেক ধর্মই আপন বৈশিষ্ট্য অনুসারে মানুষের ধর্ম-জীবনকে পুষ্ট করিবে।

স্বামী মাধবানন্দজীর ভাষণে সকল ধর্মের এই প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করিয়া বলা হইয়াছে —"The religion of the less advanced tribes is as much religion as that of more civilized communities."

শতবার্ষিকী সমিতির সভাপতি শ্রীপ্রশান্ত-বিহারী মুখোপাধ্যায়ের ভাষণ পাণ্ডিত্য ও মনস্বিতায় ভাস্বর একটি মনোজ্ঞ রচনা। তাঁহার একাধিক উক্তি উদ্ধৃত করার প্রলোভন সংবরণ করা দুঃসাধ্য। ধর্মের প্রয়োজনীয়তাকে শ্রীমুখোপাধ্যায় সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার প্রদীপ্ত ভাষণে তিনি একস্থলে বলিয়াছেন —"The emphasis on inner life has therefore to be re-established, for the

very practical reason to bring order in the outer life. The principle of the one who experiences the inner life is to become all things to all men throughout his life. …He promises sincerity, he commands trust, he spreads goodness and gives the impression of God and truth and spreads it everywhere. His every act is a meditation and worship."

জীবন-তত্ত্ব ও দর্শনের ব্যাখ্যাতারূপে স্বামীজীর অসামান্য ভূমিকার বিশ্লেষণে দুইটি অসাধারণ প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রবন্ধদুইটি Mrs. Maria Burgi লিখিত Western and Indian Minds' structure and Vivekananda এবং Science and Vivekananda. প্রথম প্রবন্ধে Madam Burgi দেখাইয়াছেন যে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সম্পর্কে দ্বৈততত্ত্বের সমস্যা কেমন করিয়া স্বামীজীর দর্শনব্যাখ্যার মধ্যে তাহার সমাধান খুঁজিয়া পাইয়াছে। Mrs. Burgi বলেন—"It is the problem of contradictions as explained in the Maya doctrine by Vivekananda which reveals to us, Westerners, the characteristic Indian outlook of philosophy. …Indian metaphysics constitutes a method and in order to help us to transcend opposition and to do it 'here and now' it asks us to follow different paths adapted to the temparament of each one of us—actif, affectif, reflectif. Different paths are the Yogas which Vivekananda exposes to the West with an unsurpassable clarity for us and mind's austerity."

Science and Vivekananda প্রবন্ধে Mrs. Burgi ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে বিজ্ঞান তাহার সাম্প্রতিক গবেষণার দ্বারা চরম সত্যের সম্বন্ধে যে তত্ত্বের আভাস পাইতেছে স্বামীজী বিজ্ঞানের এই পরিণতির সম্বন্ধে পূর্বেই তাঁহার অনুরূপ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছিলেন।

Mrs. Burgi-র মতে "In the gross, mechanical materialism of our environment Swami Vivekananda, profoundly rooted in the spirit of Advaita Vedanta was able to foresee the dawn of a new Era and to point the way to a new epoch. This prophet of titanic strength and superhuman courage raised his voice to give spiritual expression to the new perspectives of the West. আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে সাম্প্রতিক আবিষ্কার স্বামীজীর প্রচারিত অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্তকে কি বিস্ময়করভাবে সমর্থন করিতেছে এ প্রবন্ধটি পাঠ না করিলে তাহা অনেকের নিকট অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে। Mrs. Burgi তাঁহার প্রবন্ধের শেষ ভাগে এই স্মরণীয় উক্তি করিয়াছেন—"Vivekananda came to the West to attest the strength and the significence of life's non-manifested power. His presence among us was like a guiding beacon of power and of light, which the benevolent Providence had seen fit to send us. He showed us the way to broader reality, away from the suffocating workshops of the Machine."

এই গ্রন্থের আরও অনেক মূল্যবান প্রবন্ধের পরিচয় পুস্তক-সমালোচনার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে দেওয়া সম্ভব নহে। দর্শন, বিজ্ঞান, স্বামীজীর প্রচারিত জীবনবাদ এবং বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে এ গ্রন্থে যে সকল উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার তুলনা যথার্থ ই বিরল। স্থানাভাববশতঃ স্বামী রঙ্গনাথানন্দের Swami Vivekananda's Synthesis of Science and Religion, শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদারের Universal Religion,

Gustav Mensching রচিত The Message of Swami Vivekananda, স্বামী সৎপ্রকাশানন্দের The Buddha, Sri Sankaracharya and Swami Vivekananda প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধগুলির কেবল নামোল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হইল।

বস্তুত: স্বামীজীর জন্মশতবর্ষে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের এই সার্থক আয়োজনটি কেবল আবেগ ও উচ্ছ্বাসের মধ্যে নিঃশেষিত হয় নাই। গভীর চিন্তা ও নিপুণ বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে স্বামীজীর বাণীর পুণ্য মহিমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া এই শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রার্থিত কৃতার্থতা লাভ করিয়াছে।

—প্রেমবল্লভ সেন

স্মৃতি-সঞ্চয়ন ঃ স্বামী তেজসানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ থেকে প্রকাশিত। পৃঃ ১৪৯; মূল্য—সাড়ে তিন টাকা। মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব এবং মহাপুরুষসংশ্রয়—বহুজন্মদুর্লভ এই সৌভাগ্যত্রয়ের মিলিত আস্বাদে পরিপূর্ণ 'স্মৃতি-সঞ্চয়ন' সাম্প্রতিক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যে এক অমূল্য সংযোজন। বেলুড় মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসী পূজনীয় স্বামী তেজসানন্দ মহারাজ বর্তমান বাংলাদেশের শিক্ষা-জগতে অনন্য ও অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। শ্রীরাম-কৃষ্ণ-ভাগীরথীর পুণ্যোদকস্পর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের জীবন-ধারায় প্রবাহিত হয়ে তাঁর অন্তর্জীবনে যে অমৃতসঞ্চয় রেখে গেছে, অতীত-স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে তারই কিছু অংশকণা তিনি পাঠকদের উদ্দেশে প্রকাশ করেছেন। 'উদ্বোধন'-পত্রিকায় প্রকাশকালে এই স্মৃতি-চিত্রগুলি পাঠকসমাজে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সেকথা আজও অনেকেরই মনে আছে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় সেই স্মৃতি-চিত্র-চতুষ্টয়ের সঙ্গে জীবনীচিত্রও সংযোজিত হওয়ায় দিব্যজীবনের পটভূমিতে স্মৃতির উজ্জ্বলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী অখণ্ডানন্দ—এই চারজন শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানের সংক্ষিপ্ত জীবন ও তাঁদের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত স্মৃতির প্রকাশে চিরায়ত সাহিত্যের সংযম, গভীরতা ও ওজোগুণ-মণ্ডিত ভাষা বিশেষ সহায়ক হয়েছে। সেই সঙ্গে পাঠকের অন্তরে অধ্যাত্ম-আগ্রহের উদ্দীপনেও এ গ্রন্থের মূল্য অপরিসীম। পরম-শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ স্বামী প্রেমেশানন্দজীর লিখিত ভূমিকায় আছে—"দেবপ্রতিম এই সব মহা-পুরুষদের সান্নিধ্যে আসিয়া যে-সকল ব্যক্তি ধন্য হইয়াছেন, নিঃসন্দেহে তাহারা সুকৃতিবান। ইঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনস্মৃতিতে অবশ্যই মহা-পুরুষদের পবিত্র সৌরভ ভরিয়া থাকে—আর সে সৌরভে অন্যরাও আমোদিত হয়। বর্তমান স্মৃতি-পুস্তিকাখানিরও প্রকৃত মূল্য এইখানে।" উদ্ধৃত মন্তব্যসম্বন্ধে পাঠকমাত্রেই একমত হবেন। এ বই একবার পড়ে বহুবার পড়তে ও ভাবতে ইচ্ছা জাগবে। বলা বাহুল্য, খুব কম বই সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে।

সমগ্র গ্রন্থের স্মৃতিসৌরভ যে প্রশান্ত লাবণ্যে এ গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে বিধৃত, তার জন্য প্রচ্ছদ-শিল্পী শ্রীবিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তী আমাদের আন্তরিক সাধুবাদের যোগ্য। প্রকাশনার ক্ষেত্রে শ্রদ্ধা, সৌন্দর্য ও রুচির সমন্বয় বিশেষ প্রশংসনীয়।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

মুক্তধারা ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [সংস্কৃতানু-বাদ ঃ অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, সাহিত্যশাস্ত্রী] ১৩২।৫, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, কলিকাতা ৩১। মূল্য—পাচ টাকা।

ভারত-সংস্কৃতি ও সংস্কৃতভাষা একহিসাবে সমার্থক। সংস্কৃতের ধ্রুপদী পটভূমি না থাকলে

এ দেশের জীবন, মনন, সাহিত্য বা সাধনা কোনটিই সম্পূর্ণতা পায় না। সংস্কৃত অধিকাংশ আধুনিক ভারতীয় ভাষার জননীস্বরূপা, বর্তমান ভারতবর্ষের চিরন্তন ভাব-উৎস। ভাষাশাস্ত্রের পণ্ডিতমণ্ডলী ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বের মূলান্বেষণে 'সংস্কৃত'-চর্চার দ্বারাই সবচেয়ে লাভবান হয়েছেন। ভারতীয় ভাষাসমূহের সব সমৃদ্ধির সবচেয়ে বড়ো কারণ সংস্কৃতের বিপুল ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্য। স্বাভাবিকভাবেই, সংস্কৃতের এই বহুযুগব্যাপী ধারণীশক্তি লক্ষ্য করে একালের বিদ্বন্মণ্ডলীর এক উল্লেখযোগ্য অংশ রাষ্ট্রভাষার বিরোধ নিরসনে সংস্কৃতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর নানা ক্ষেত্রে জাতীয় জীবনে সংস্কৃতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখিত। বিশেষতঃ তাঁর পরিকল্পিত ও আংশিক-লিখিত 'India's message to the World' গ্রন্থের সূচনায় ভারতবর্ষের ভাষাগত ঐক্যসম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য আজকের দিনে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"এমন একটি মহান পবিত্র ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে. অন্য সমুদয় ভাষা যাহার সন্ততিস্বরূপ। সংস্কৃতই সেই ভাষা। ইহাই (ভাষাসমস্যার) একমাত্র সমাধান।"

কোন বিশ্রুতকীর্তি লেখকের রচনাকে সংস্কৃতে অনুবাদের অর্থ সর্বভারতীয় ভাবলোকের সঙ্গে তার সংযোগ-সাধন। কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ তো সংস্কৃতানুবাদের ক্ষেত্রে সে হিসাবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় লেখক। আধুনিক বাংলায় সংস্কৃতের সবচেয়ে সার্থক প্রভাবের নিদর্শন রবীন্দ্ররচনাবলী। ভাষার নিজস্ব প্রতিভার সঙ্গে কবিব্যক্তিত্বের অলৌকিক ব্যঞ্জনায় মিশে রবীন্দ্রনাথ যেমন বাংলার কবি, তেমনি সংস্কৃত-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী এর আগেই রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' অনুবাদ করে সুধীজনের প্রীতি অর্জন করেছেন। তাঁর 'মুক্তধারা' নাটকের সুন্দর সাবলীল অনুবাদটিও সহৃদয় সাহিত্যানুরাগীদের প্রশংসাধন্য হবে, সন্দেহ নেই। অনুবাদ মূলানুগ, অথচ অনুবাদকের অনায়াস-নৈপুণ্যে মূলরচনার সৌরভ ও সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ। 'মুক্তধারা' নাটকের বন্ধনমুক্তির আদর্শ সর্বভারতীয় সংস্কৃতের স্পর্শে নবীনতর সার্থকতা লাভ করেছে।

প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ছে, বাংলা মূলরচনায় সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার দেশজ সারল্য সংস্কৃত অনুবাদে রক্ষা করা কঠিন। সেদিক থেকে সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃত সংলাপ-প্রয়োগের কৌশল আরো সহায়ক হ'তে পারে।

এ যুগের বঙ্গসংস্কৃতিকে যাঁরা সংস্কৃতভাষার পুণ্যগঙ্গোদকে অভিষিক্ত করার ব্রত গ্রহণ করেছেন, তাঁদের অন্যতম পুরোধারূপে 'মুক্তধারা'র অনুবাদক অধ্যাপক ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী আন্তরিক অভিনন্দনযোগ্য। সংস্কৃতে রূপান্তরিত মুক্তধারা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত গ্রন্থাগারসমূহের সম্পদ বৃদ্ধি করুক—এই প্রার্থনা।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দের ৬৪তম কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে সেবাশ্রমের উল্লেখযোগ্য সেবাকার্য :

(১) অন্তর্বিভাগীয় সাধারণ হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা ১৩৬। ২,৩৫২ জন রোগীকে ভরতি করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১,৮৬১ জন আরোগ্য লাভ করে। ৭৮৬ জন রোগীর অস্ত্রচিকিৎসা করা হয়। দৈনিক গড়ে ৯৫টি শয্যা রোগীদের দ্বারা অধিকৃত ছিল। গঙ্গার ঘাট ও রাস্তা হইতে আনিয়া ৩৫ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

(২) বাহিরের রোগীর চিকিৎসা-বিভাগে (শিবালা-শাখাসহ) ৫৭,৭০২ জন নূতন এবং ১,৭৪,৫৯৪ জন পুরাতন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। রোগীর সংখ্যা দৈনিক গড়ে ৬৩৭। এই বিভাগে মোট ৪,৩৬৭টি অস্ত্রচিকিৎসা করা হয় এবং ৩৯,৩৬৭টি ইন্‌জেকশন দেওয়া হয়।

(৩) বৃদ্ধ ও আতুর নিবাসে—যাহাদের কোন সংস্থান নাই এইরূপ ১৩ জন পুরুষ ও ২৩ মহিলাকে রাখা হইয়াছিল।

(৪) সাহায্যদান বিভাগ হইতে ১০৫ জন অসহায় ও বৃদ্ধ মহিলাকে মাসিক আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে, মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২,১৪৪.২৫ টাকা।

(৫) সাময়িক ও বিশেষ সাহায্য-বিভাগ হইতে বিপন্ন ১০৭ জন ভ্রমণকারীকে খাদ্য বা অর্থ সাহায্য করা হয়, মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১,৪৩৫.৯৩ টাকা। এতদ্ব্যতীত ৩০১.৩৩ টাকা মূল্যের ৭০টি কম্বল ও ধুতি বিতরণ করা হয়।

(৬) প্যাথলজি বিভাগে ৭,৯৮০টি নমুনা পরীক্ষিত হয় এবং এক্স-রে ও ইলেক্‌ট্রোথেরাপি বিভাগে ১,৬২৭ জন রোগীর পরীক্ষা করা হয়।

(৭) শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তীর উদ্বৃত্ত তহবিলের আয় হইতে রচনা-প্রতিযোগিতা, শিশুদের বই ইত্যাদিতে ২৩১ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ১৩৯ জন দরিদ্র শিশুকে ৭৬৮ খানি পুস্তক দেওয়া হইয়াছে।

(৮) আলোচ্য বর্ষে ২৫টি শয্যা সমন্বিত চক্ষু-বিভাগ খোলা হইয়াছে।

(৯) সেবাশ্রমের কর্মীদের সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য একজন অভিজ্ঞ পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে ও অধ্যাপনায় একটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী পরিচালিত হইতেছে।

বহু বিশিষ্ট চিকিৎসক সেবাশ্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া বিভিন্ন বিভাগের কার্য পরিচালনা করেন। রোগীদের সেবা-শুশ্রূষার অধিকাংশ কার্যই মিশনের ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়; ভক্তবৃন্দও সেবাকার্যে অনেক সহায়তা করেন।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং সহৃদয় জনগণের সাহায্যে পবিত্র তীর্থ কাশীধামে এই সেবাশ্রমের মাধ্যমে নরনারায়ণসেবার কাজ সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে।

খেতড়ি (রাজস্থান) রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দিরের ১৯৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। যুগাচার্য

স্বামী বিবেকানন্দ খেতড়িতে যে ভবনে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই প্রাসাদোপম ভবনটি ও অন্য একটি ভবন খেতড়ির রাজা বাহাদুর স্বামীজীর পুণ্য স্মৃতি রক্ষাকল্পে রামকৃষ্ণ মিশনকে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে দান করেন। এই ভবনদ্বয়েই রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

বর্তমানে এই কেন্দ্র কর্তৃক একটি মাতৃমন্দির (Maternity Home), একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার পরিচালিত হইতেছে। পাঠাগারে ৫০টি পত্র-পত্রিকা লওয়া হয়। ৩ হইতে ৭ বৎসরের শিশুদের জন্য ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে 'সারদা শিশুবিহার' নামে প্রাক্-প্রাথমিক নার্সারি স্কুল খোলা হইয়াছে। আশ্রমে নিয়মিতভাবে গীতা আলোচনা এবং সাময়িক উৎসব করা হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত

চিকাগো বিবেকানন্দ বেদান্ত-সোসাইটি : অধ্যক্ষ স্বামী ভাষ্যানন্দ। রবিবারের সভায় নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি প্রদত্ত হইয়াছিল :

নভেম্বর, ১৯৬৫ : আধ্যাত্মিক জীবনে খাদ্যের প্রভাব ; চঞ্চল মনকে বশে আনা ; সুখের সন্ধানে ; জীবনে যাহা অবশ্যম্ভাবী।

ডিসেম্বর, '৬৫ : ফ্রয়েড ও বেদান্ত মতে স্বপ্নতত্ত্ব ; যে জগতে আমরা বাস করি ; শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী ; প্রকৃতিস্থ কে ?

জানুআরি, '৬৬ : মৌনাবলম্বনের শক্তি ; বেদান্তের প্রয়োজন ; জগতে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ; ইচ্ছাশক্তি বাড়াইবার উপায় ; যাঁহারা সরল তাঁহারাই ধন্য।

এতদ্ব্যতীত প্রতি মঙ্গলবারে উপনিষৎ আলোচনা হইয়াছিল।

উৎসব-সংবাদ

ময়মনসিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২রা মার্চ বুধবার হইতে ৪ঠা মার্চ শুক্রবার পর্যন্ত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩১তম জন্মতিথি উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

২রা মার্চ বুধবার বৈকালে মহিলাসভায় নেতৃত্ব করেন স্থানীয় জজ সাহেবের পত্নী শ্রীযুক্তা নন্দরানী দেবী। তিনি ও বিশিষ্ট মহিলাগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। প্রবন্ধপাঠ, আবৃত্তি প্রভৃতি সভার অঙ্গ ছিল।

৩রা মার্চ বৈকালে স্থানীয় প্রবীণ উকিল শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ। তৎপর প্রবীণ উকিল শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দেব, শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক, প্রফেসার শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সরকার, শ্রীতুষারকান্তি দেব, শ্রীনিত্যগোপাল দাস প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ আলোচনা করেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করে।

৪ঠা মার্চ শুক্রবার মঙ্গলারতি, বেদস্তুতি, শ্রীশ্রীগীতাপাঠ, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ ও 'কথামৃত' পাঠ, ভজন ও রামায়ণ-গান প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব হয়। বৈকালে প্রায় ৪ হাজার লোককে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৮ই এপ্রিল হইতে ১১ই এপ্রিল পর্যন্ত চারদিনব্যাপী শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। পূজা-ভজনাদি দ্বারা উৎসব আরম্ভ হয়। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত জনসভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন ও তৎপত্নী শ্রীমতী শান্তি সেন "আমেরিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা প্রচার" সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন।

মহকুমাশাসক শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়, তমলুক কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীদ্বিজদাস চৌধুরী এবং মঠাধ্যক্ষ স্বামী অন্নদানন্দজী প্রভৃতিও ভাষণ দেন। পরে বেতার-শিল্পী শ্রীপূর্ণ দাস বাউল-সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

দ্বিতীয় দিন ডক্টর সেনের সভাপতিত্বে আশ্রমের নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবের অন্যান্য দিন শ্রীজগবন্ধু চক্রবর্তী, শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী, শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সুরশিল্পী ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। পরিশেষে "সাবিত্রী-সত্যবান" সবাক্ চিত্র প্রদর্শনীর মধ্য দিয়া উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কাঁথি : গত ৮ই এপ্রিল হইতে দিবসত্রয়-ব্যাপী কাঁথি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। বিশেষ পূজাদি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ, হরিনাম-সংকীর্তন, ও প্রসাদ-বিতরণ উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল; প্রতিদিন সন্ধ্যায় ধর্মসভার ব্যবস্থা ছিল। স্বামী নির্জরানন্দ, স্বামী মহানন্দ ও স্বামী বিশোকাত্মানন্দ মহারাজ যুগোপযোগী ভাষণ প্রদান করেন। স্থানীয় মহকুমাশাসক শ্রীদীপককুমার রুদ্র, সেকেণ্ড অফিসার শ্রীবিমলচন্দ্র মৈত্র, বি. ডি. ও. শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বসু, অধ্যাপক শ্রীভুবনমোহন মজুমদার এবং অধ্যাপক শ্রীবনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয়ও ধর্মসভায় মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সভান্তে সুগায়ক শ্রীবেচু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীহরিপদ কর সঙ্গীত পরিবেশন করেন। প্রত্যহ প্রায় ২,০০০ করিয়া জনসমাগম হইত। ১০ই এপ্রিল রবিবার নিকটবর্তী গ্রামসমূহ হইতে সমাগত ১৫টি হরিসংকীর্তন সম্প্রদায়ের হরিনাম-সংকীর্তনে আশ্রমপরিবেশ আনন্দ-মুখরিত হইয়াছিল। তিন দিনে মোট প্রায় ৭,০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিবিধ সংবাদ

ধুবড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠা

ধুবড়ী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে নবনির্মিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-উৎসব ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ৩০শে মার্চ হইতে ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, বাস্তুযাগ, সপ্তশতীহোম, শ্রীশ্রীকালীপূজা, ভজন, যাত্রাভিনয়, ধর্মগ্রন্থ-পাঠ ও ধর্মসভার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। স্বামী পরশিবানন্দ, স্বামী প্রণবাত্মানন্দ, অনুপমানন্দ, স্বামী ইজ্যানন্দ, প্রভৃতি উৎসবের অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদান করাতে সকলের মনে উৎসাহের সঞ্চার হয়। সর্বসাধারণের অর্থসাহায্যে এই মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছে এবং এজন্য প্রায় ৪২,০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। বগড়ীবাড়ীর শ্রীমতী সিন্ধুরানী চৌধুরাণী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তিটি গড়াইয়া দিয়াছেন।

উৎসবের শেষদিন প্রায় ৮,০০০ লোককে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়।

মিহির সেনের পকপ্রণালী অতিক্রম

কলিকাতার বিখ্যাত সাঁতারু ৩৬ বৎসর-বয়স্ক ব্যারিষ্টার শ্রীমিহির সেন গত ৬ই এপ্রিল বুধবার সকাল ৭টা ২৪ মিনিটের সময় পক প্রণালী অতিক্রম করিয়া প্রথম ভারতীয় হিসাবে এই সম্মান লাভ করিয়াছেন।

ভারত ও সিংহলের মধ্যে পকপ্রণালীর দুরত্ব ২২ মাইল। শ্রীমিহির সেনের এই পথ অতিক্রম করিতে সময় লাগে ২৫ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট। তিনি ৫ই এপ্রিল মঙ্গলবার সকাল ৫।৪০ মিনিটের সময় সিংহলের তালাইমান্নার নিকটবর্তী ওল্ড লাইটহাউসের নিকট হইতে যাত্রা আরম্ভ করেন। ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের সংযোগের ফলে এখানে স্রোত খুব বেশী থাকায় মিহির সেনকে পকপ্রণালীর দূরত্ব ছাড়াও বেশী দূরত্ব অতিক্রম করিতে হয়। তিনি পকপ্রণালী অতিক্রম করিতে সমুদ্রের হাঙ্গর, বিষধর সর্প ও বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের সম্মুখীন হন। পূর্ণিমার দিনে এই পথ অতিক্রম করিতে তাঁহাকে প্রবল ঢেউয়ের সঙ্গে সারাক্ষণই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইতে হয়। তাঁহার সাফল্যের পিছনে ভারতীয় নৌবহরের কর্তৃপক্ষের ও স্থানীয় জেলেদের সহযোগিতা অনেকখানি কাজ করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সর্বাপেক্ষা কাজ করিয়াছে তাঁহার অদম্য দৃঢ়তা। যে পথ বারো ঘণ্টায় পার হইবার কথা ছিল, সে পথ পার হইতে লাগিয়াছে প্রায় ২৬ ঘণ্টা। ইহাতেই বুঝা যায় তাঁহাকে কি পরিমাণ বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। ইতিপূর্বে শ্রীমিহির সেন ইংলিশ চ্যানেল সন্তরণে অতিক্রম করিয়াছিলেন। বিশ্বের মধ্যে তিনিই প্রথম সাঁতারু, যাঁহার ভাগ্যে 'ডাবল্' লাভ অর্থাৎ ইংলিশ চ্যানেল ও পকপ্রণালী অতিক্রম করা সম্ভব হইয়াছে। ইংলিশ চ্যানেল ও পক পার হওয়ার দ্বৈত কীর্তির অধিকারী বিখ্যাত সন্তরণবিদ্ শ্রীমিহির সেনের অসামান্য সাফল্যের জন্য ভারতবাসী মাত্রই গর্বিত।

উৎসব-সংবাদ

হুগলী জেলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসংঘ কর্তৃক ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩১তম জন্মোৎসব গত ২২শে হইতে ২৮শে ফেব্রুআরি পর্যন্ত প্রত্যহ পূজাপাঠাদিসহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজী সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন ২২ তারিখ শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৩ তারিখ অধ্যক্ষ শ্রীগোপালচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীপ্রতুল চন্দ্র চৌধুরী, ২৪ তারিখ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ও অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার। ২২ ও ২৩ তারিখ সভান্তে রামায়ণ গান করেন শ্রীসুধীর কুমার চৌধুরী। ২৪ তারিখ সভান্তে রহড়া রামকৃষ্ণ বালকাশ্রম কর্তৃক 'শ্রীশ্রীমা' সবাক্ চিত্র প্রদর্শিত হয়। ২৫ তারিখ 'বামাক্ষ্যাপা' নাটক অভিনীত হয়। ২৬ তারিখ শ্রীজ্ঞানরঞ্জন সেনের সভাপতিত্বে বিবেকানন্দ শিশুশিক্ষা-মন্দিরের ছাত্রছাত্রীদের বিচিত্রানুষ্ঠান ও পারিতোষিক বিতরণের পরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমার বিষয়ে ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা ও অধ্যাপিকা শ্রীমতী কণা সেনগুপ্তা। সভান্তে ভাগবত পাঠ করেন শ্রীসীতারাম ভাগবতাচার্য। ২৭শে ফেব্রুআরি রবিবার নরনারায়ণের সেবায় প্রায় বাইশ শত লোক প্রসাদ গ্রহণ করে। বৈকালে কালীকীর্তন ও সন্ধ্যায় লীলাকীর্তন হয়। ২৮শে ফেব্রুআরি সন্ধ্যায় 'মহা উদ্বোধন' নাটক অভিনীত হয়।

খেপুত (মেদিনীপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১০ই ফাল্গুন (১৩৭২) মঙ্গলবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব উষা-কীর্তনসহ মঙ্গলারতি, প্রাতে প্রভাতফেরী, পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজা হোম, মধ্যাহ্নে প্রসাদ-

বিতরণ, রাত্রে কীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

পরদিন ১১ই ফাল্গুন বুধবার 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা হইয়াছিল।

নাটশাল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩১তম জন্মোৎসব উপলক্ষে ৪ঠা মার্চ সকালে পূজা-হোম-পাঠাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিকালে এক ধর্মসভায় স্বামী বিশ্বদেবানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় অধ্যাপক শ্রীবিনয় কুমার সেনগুপ্ত 'কথামৃত' আলোচনা করেন। পরে চারি সহস্র ভক্তকে চিঁড়া ও ফলমূল প্রসাদ বিতরণ করা হয়। রাত্রে রামায়ণগান হইয়াছিল।

৫ই মার্চ সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের সম্পর্কে আলোচনা ও 'কথামৃত' পাঠ এবং রাত্রে রামায়ণ-গান হয়। ৬ই মার্চ আয়োজিত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন স্বামী অন্নদানন্দ এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন সঙ্গীতাচার্য শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী। রাত্রে রামায়ণগান হয়।

সিঁথি রামকৃষ্ণ সংঘ (কলিকাতা ৫০): গত ৬ই মার্চ হইতে ৯ই মার্চ এবং ১৭ই হইতে ২০শে মার্চ পর্যন্ত ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব-উৎসব আশ্রম-প্রাঙ্গণে সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে সংঘের বিদ্যামন্দিরের ছাত্রগণ কর্তৃক নাট্যাভিনয়, রাধারমণ কীর্তনসমাজের কীর্তন, স্বামী পুণ্যানন্দজী কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি, প্রাচ্যবাণী কর্তৃক সংস্কৃতনাটক, রামরতন সাংখ্যশাস্ত্রীর ভাগবত-কথকতা এবং শিকদার-বাগান সমাজের শ্রীরামকৃষ্ণ-যাত্রাভিনয় সকলের প্রশংসা অর্জন করে। বিভিন্ন দিনে ধর্মপ্রসঙ্গ করেন স্বামী জীবানন্দ, স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, স্বামী নির্জরানন্দ, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা এবং ডঃ রমা চৌধুরী। ইহা ছাড়া বিখ্যাত রামায়ণগায়ক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী তিন দিন রামায়ণ গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। প্রতিদিন এই আনন্দানুষ্ঠানে হাজার হাজার নরনারী যোগদান করেন। সমাপ্তিদিবসে একটি শোভাযাত্রা সিঁথি অঞ্চল পরিক্রমা করে এবং পরে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। সিঁথি অঞ্চল উৎসবের কয়দিন খুব আনন্দমুখর হইয়া উঠে।

টালিগঞ্জ: গত ১৯শে ও ২০শে মার্চ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, ইন্দ্রাণী পার্ক, টালিগঞ্জ কর্তৃক স্থানীয় পল্লীবাসিগণের সহযোগিতায় ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একত্রিংশ-দধিক শততম আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিন পূজাদি ও প্রভাতফেরী লইয়া পল্লী-পরিক্রমার পর অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় ভক্তিমূলক গান ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ করা হয়। সন্ধ্যা ৬॥টায় আরাত্রিকের পর অনুষ্ঠিত জন-সভায় সভাপতি স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, প্রধান অতিথি ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এবং স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। শ্রীগণপতি পাঠক উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সভান্তে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পরদিন সন্ধ্যারতির পর শ্রীতারক দাস মল্লিক মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুরের অবতারতত্ত্ব আলোচনা করেন। পরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পাঠচক্র ও সেবাশ্রম (গান্ধী কলোনী) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-গীতিআলেখ্য পরিবেশন করেন।

এই উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজের শুভেচ্ছাবাণী সহ একটি জয়ন্তীগ্রন্থ প্রকাশ করা হইয়াছে।

বেহালা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাঠচক্র, পর্ণশ্রী : গত ২৭শে ও ২৮শে মার্চ দুইদিন এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব পূজার্চনা, শাস্ত্রপাঠ, কীর্তনসহ পল্লী-পরিক্রমা, ভজন প্রভৃতির মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়াছে। ধর্মসভায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদা-দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' ব্যাখ্যা করেন। শ্রীমতী সুমতি মুখোপাধ্যায় 'সীতার পাতালপ্রবেশ' বিষয় অবলম্বনে কীর্তন করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীসারদা সংঘের সভ্যাগণ সান্ধ্য আরাত্রিকভজন এবং বিশিষ্ট শিল্পিগণ ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। উৎসবে পর্ণশ্রী অঞ্চলের শত শত নর-নারী যোগদান করিয়াছিলেন।

বাণীদেবীর দেহত্যাগ

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, নিউ-আলিপুর শ্রীসারদা আশ্রমের অন্যতমা প্রতিষ্ঠাত্রী ও সম্পাদিকা বাণীদেবী গত সোমবার ২৫শে এপ্রিল বৈকালে উক্ত আশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকট ১৪ বৎসর বয়সে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। বাল্য হইতে দীর্ঘকাল (১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) তিনি নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উক্ত বিদ্যালয়ে প্রথমে তিনি ছাত্রীরূপে আসিয়াছিলেন; শিক্ষালাভের পর সেখানেই অন্যতমা শিক্ষিকার ও পরে প্রধান শিক্ষিকার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার সরল ও অমায়িক ব্যবহার তাঁহার সহকর্মিণী ও ছাত্রী-গণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। তাঁহার আত্মা শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে শাশ্বত শান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

সরোজকুমার কাঞ্জিলালের দেহত্যাগ

আমরা দুঃখিত চিত্তে জানাইতেছি যে, দুর্গাপুর প্রকল্পের চীফ ইঞ্জিনীয়ার সরোজকুমার কাঞ্জিলাল গত ২৫শে ফেব্রুআরি করোনারি থ্রম্বোসিসে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে মাত্র ৫৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন এবং শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে সর্বজনপরিচিত শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রলাল কাঞ্জিলালের তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র।

ভারত ও বঙ্গ সরকারের বহু প্রয়োজনীয় বিভাগে তিনি দক্ষতার সহিত কার্য করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম টেলিফোন বিভাগের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। কলিকাতার স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন বিভাগ তাঁহারই কীর্তি। দুর্গাপুর প্রকল্পের জন্য আহূত হইয়া তিনি উহার বিভিন্ন বিভাগ অতি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেন।

বাংলার যুবকদিগকে যাহাতে নানাবিধ কর্মে নিযুক্ত করিয়া বাংলার তথা ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান করা যায়, ইহা তাঁহার জীবনের স্বপ্ন ছিল।

তাঁহার দেহত্যাগে একটি হৃদয়বান একনিষ্ঠ কর্মীর অভাব ঘটিল। তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

দিব্য বাণী

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥

—মুণ্ডকোপনিষদ্—৩।১।৮

(সবার অন্তর-বাসী পরমেশ যিনি
একমাত্র শুদ্ধ-মনবুদ্ধি-গম্য তিনি।)
চক্ষু বাক্ আদি অন্য ইন্দ্রিয় সকল
তাঁহারে ধরিতে গিয়া হয় যে বিফল।
যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে কিম্বা তপস্যায়
তাঁহার স্বরূপ কভু জানা নাহি যায়।
অবয়বহীন সেই পরম-আত্মারে
নিরন্তর একমনে ধ্যান যেবা করে,
আত্মধ্যানে হয় যাঁর বিশুদ্ধ অন্তর—
আত্মা হন তাঁরি শুদ্ধবুদ্ধির গোচর।

কথাপ্রসঙ্গে

অন্তর্মুখিতা বা আধ্যাত্মিকতা—মানবতাকে বাঁচাইবার উপায়

মানুষের মনের চাহিদার কোন শেষ নাই। পাওয়া যতই যাক না কেন, তৃষ্ণা চিরঅপরিতৃপ্তই থাকিয়া যায়, এবং আরো চাহিয়া চলে।

পথের ভিখারী, যে হয়ত পেট পুরিয়া খাইতেই পায় না, পরিবার কাপড় পায় না, দুবেলা পেট পুরিয়া খাওয়া, দুখানা নূতন কাপড় পাওয়াই তাহার নিকট তখন জীবনের পরম কাম্য। সে যদি তাহা পায়, কিছুদিন বেশ আনন্দে কাটাইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার পরই মন আবার আরো বেশী কিছু চাহিবে—আহার ও পরিচ্ছদের মান সে আরো একটু উন্নত করিতে চাহিবে। তৃষ্ণার দাহ আবার সুরু হইবে। তাহাও যদি পায়, তবুও তৃষ্ণা মিটিবে না। যে পরিবেশে যখনই যে উন্নীত হইবে, সেই পরিবেশেই সে চাহিবে উহার মধ্যে সবচেয়ে ভালভাবে, আরো উন্নততর ভাবে থাকিতে। ক্রমে হয়ত বাড়ী, গাড়ী, অর্থ, সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা, সম্মান সবই ক্রমে ক্রমে সে প্রভূত পরিমাণে পাইল; কিন্তু তথাপি তাহার চাওয়া কোথাও থামিবে না। লালসার এই চির-অতৃপ্ত রূপ অনেকসময় অতি উৎকট ভাবে সর্বজনসমক্ষে প্রকট হইয়া পড়ে অত্যন্ত ধনী প্রতিষ্ঠাবান সম্মানী ব্যক্তিদের মধ্যেও, এবং মহাভারতে বর্ণিত রাজা যযাতির উক্তিই স্মরণ করাইয়া দেয়—"যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। একস্যাপি ন পর্যাপ্তম্"—পৃথিবীতে যত প্রকারের যে পরিমাণ ভোগ্য-বস্তু আছে, তাহা যদি সমস্ত একত্র করা হয়, তাহা একজন মাত্র মানুষের তৃষ্ণা-নিবারণের পক্ষেও পর্যাপ্ত হয় না।

ইহাই হইল তৃষ্ণার রূপ। তাই তৃষ্ণা যতক্ষণ থাকে, মানুষ যত ভোগ্যবস্তু লাভ করুক না কেন কখনও তৃপ্ত হইতে পারে না, অশান্তির আগুনে মন পুড়িতেই থাকে। শুধু তাহাই নহে, উহা ক্রমে বাড়িয়াই চলে, কারণ ভোগ যত বেশী করা যায় তৃষ্ণা ততই তীব্রতর হইতে থাকে। তৃষ্ণার পিছনে ছুটিয়া মানুষ যাহার জন্য ছোটে সেই শান্তি ও অফুরন্ত আনন্দ কখনও লাভ করিতে পারে না। তাই, কঠোপনিষদে আছে, নচিকেতাকে যমরাজ যখন বিপুল ঐশ্বর্য, বিশাল সাম্রাজ্যাদি, এবং তাহা প্রাণ ভরিয়া ভোগ করিবার মত অতি দীর্ঘ পরমায়ুও দিতে চাহিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, 'আমি যাহা দিলাম, তাহা ছাড়া আরো যদি কিছু ভোগ করিবার ইচ্ছা তোমার মনে জাগে তো বল, তোমাকে তাহা সবই দিব—কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি—এ সব লইয়া যতদিন খুশি—শরদো যাবদিচ্ছসি—বাঁচিয়া থাক', তখন নচিকেতা সবই প্রত্যাখ্যান করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ'—আমাকে কত সম্পদ আপনি দিবেন যমরাজ? যত বিপুল পরিমাণেই দিন না, মন তাহাতেও তৃপ্ত হইবে না—মানুষ কখনো বিত্তলাভে তৃপ্ত হয় না।'…আর বলিয়াছিলেন, 'জীবন যত দীর্ঘই হউক না কেন, একদিন তাহার শেষ আছে—জীবন স্বল্প; যাহার মাধ্যমে ভোগ করা যায় সেই দেহেন্দ্রিয়ও জীর্ণ, জরাগ্রস্ত হয় একদিন।'

দেহেন্দ্রিয় এক সময় জীর্ণ হয়, ভোগ করিবার শক্তি হারায়, কিন্তু ভোগতৃষ্ণা তখনো প্রবল থাকে; রাজা যযাতি দীর্ঘ সহস্র বৎসর পুত্রের যৌবন লইয়া মর্ত্য ও স্বর্গের শ্রেষ্ঠ ভোগ্যবস্তুসকল উৎসাহী হইয়া ভোগ করিবার পর এই সত্যটিই তাঁহার পুত্রকে বলিয়াছিলেন, তৃষ্ণা 'ন জীর্যতি জীর্যতঃ'। একটি দেহ নষ্ট হইবার পর এই বিষয়-ভোগেচ্ছা, এই চির-অতৃপ্ত তৃষ্ণা, এই বাসনাই আমাদের টানিয়া লইয়া চলে জীবন হইতে জীবনান্তরে; একটি দেহ বিনষ্ট হইবার পর তাহার চাই আর একটি দেহ, যাহার মাধ্যমে আবার সে ভোগের জন্য বিষয় আহরণ করিতে পারে। স্থূলদেহ সহজে নষ্ট হয়, কিন্তু মন, যাহা সূক্ষ্মদেহের অঙ্গীভূত, এত সহজে নষ্ট হয় না; যতক্ষণ এই তৃষ্ণা থাকে ততক্ষণ উহাকে বুকে লইয়া সে দেহ হইতে দেহান্তর আশ্রয় করিয়া দীর্ঘায়িত করিয়া চলে জীবনপথ।

দেহান্তরে এই তৃষ্ণার বিকাশ ঘটে কিছুটা বিষয়ের সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া, কিছুটা দেখিয়া, কিছুটা শুনিয়া, এবং কিছুটা পূর্বাজিত অভিজ্ঞতাবশে স্বতই। তৃষ্ণাচালিত হইয়া বিষয়লাভের জন্য উহার পিছনে ছোটার প্রবৃত্তি মনে যখন অতি-প্রবল হইয়া উঠে, তখনই উহা মানুষকে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করে। সমাজে, রাষ্ট্রে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লালসার এই অসংযত প্রকাশই সর্ববিধ দুর্নীতি, অত্যাচার ও অনিষ্টের মূলে রহিয়াছে। মনের এই বিষয়ের পশ্চাদ্ধাবন-প্রবৃত্তিকে সংযত করিবার একমাত্র উপায়, যে জন্য সে তৃষ্ণাচালিত হইয়া বিষয়ের পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়ায়, তাহাকে সেই আনন্দ অন্য উপায়ে দেওয়া। আমাদের লক্ষ্য বিষয় নয়, লক্ষ্য আনন্দলাভ; বিষয়ের মাধ্যমে আনন্দ লাভ হয় বলিয়াই বিষয় আমাদের প্রিয়। কিন্তু আনন্দ কি বিষয়ে থাকে? বিষয় মূর্ত—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু; কিন্তু আনন্দ মনেরই একটি অবস্থা মাত্র—অমূর্ত; পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা আনন্দকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, উহার কার্যকে পারি (যেমন পারি না মনকে বা অন্তরিন্দ্রিয়গুলিকে)। যেমন আমরা বিদ্যুৎ দেখিতে পাই না, আলো, গতি প্রভৃতি উহার কার্যগুলিকে দেখি। বহিরিন্দ্রিয় মূর্ত বিষয়কে স্নায়ুস্পন্দনাকারে মস্তিষ্ককেন্দ্রে বাহিত করিলে সেখানে একটি প্রতিক্রিয়া হয়। এ পর্যন্ত স্থূল বস্তুর সহিত তাহার সংযোগ, এ পর্যন্ত ক্রিয়া স্থূল। কিন্তু তাহার পর যে অন্তরিন্দ্রিয়গুলি মস্তিষ্ককেন্দ্র হইতে সেই প্রতিক্রিয়াকে মন পর্যন্ত বাহিত করে এবং মনে তজ্জনিত যে প্রতিক্রিয়া হয় তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের গোচর নহে—তাহা অমূর্ত। কারণ মন ও অন্তরিন্দ্রিয় অচেতন পদার্থবিশেষ হইলেও যেসব অচেতন বস্তু আমাদের বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাদের উপাদান অপেক্ষা সূক্ষ্মতর উপাদানে গঠিত। (এই সূক্ষ্ম উপাদানগুলির শাস্ত্রীয় নাম 'তন্মাত্র'; এই তন্মাত্রগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া মাটি, জল, আলোক প্রভৃতি আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য স্থূল পদার্থের উপাদান সৃষ্টি করে)। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগজনিত যে প্রতিক্রিয়া মনে হয়, তাহাই বিষয়ানুভূতি। এগুলি সূক্ষ্ম হইলেও এগুলিকে পরস্পর হইতে পৃথক ভাবে আমরা অনুভব করি। কিন্তু এই সব অনুভূতিজনিত যে আনন্দ, তাহা এক—রূপের অনুভূতিজনিত, শব্দের অনুভূতিজনিত, স্পর্শের অনুভূতিজনিত আনন্দের স্বরূপ একই; মাত্রায় তারতম্য অবশ্য সর্বক্ষেত্রেই থাকিতে

পারে। এই আনন্দ আমাদের অন্তরেই প্রচ্ছন্ন থাকে, বিষয়ে নহে; ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে বিষয় বিভিন্ন ধাপের মধ্য দিয়া বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ারূপে মনে পৌছাইয়া সেখানে একটি অবস্থার সৃষ্টিমাত্র করিতে পারে যাহা আনন্দের উৎসমুখটি খুলিয়া দিবার সহায়ক হয়। বহির্বিষয়ের সহিত সংযোগ ছাড়াও মনের এই অবস্থা হইতে পারে। বহিরিন্দ্রিয় হইতে মন পর্যন্ত পথের যে কোন স্থানে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটিলেই তাহা সম্ভব। যেমন একটি ছবি দেখিতেছি ও দেখিয়া আনন্দ পাইতেছি। ছবিটির সহিত চোখের সংযোগের ফলে চোখের স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে দেখার কেন্দ্রে যে প্রতিক্রিয়া হয়, ছবির সহিত চোখের সংযোগ এবং তাহাতে সংশ্লিষ্ট স্নায়ুর স্পন্দনের মাধ্যম ব্যতীতও যদি কোন কারণে মস্তিষ্ককেন্দ্রটিতে তাহার অনুরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটানো যায়, তাহা হইলেও কিন্তু আমাদের মনে ছবি দেখার এবং তজ্জনিত আনন্দের অনুভূতি জাগিবে। অতি অল্পক্ষণের জন্য হইলেও ইহা কিন্তু প্রতিনিয়তই ঘটিয়া থাকে। চোখের সামনে কোন বস্তু রাখিলে চোখের রেটিনায় উহার প্রতিবিম্ব পড়ে। উহার প্রতিক্রিয়াটি মস্তিষ্ককেন্দ্রে যে প্রতিক্রিয়া ঘটায়, ছবিটিকে চক্ষুর সম্মুখ হইতে সরাইয়া লইবার পরও কিছুক্ষণের জন্য সে প্রতিক্রিয়াটি স্থায়ী হয়; সেই সময় আমরা চোখের সামনে ছবি না থাকিলেও ছবি দেখি এবং দেখিয়া আনন্দ পাই। এই সত্যটির জন্যই আমরা চলচ্চিত্রে বস্তুর সাবলীল গতি দেখিতে পাই, এই সত্যটির জন্যই ঘূর্ণমান আলোকবিন্দু মনে আলোকবৃত্তের (বস্তুতঃ কোন আলোকবৃত্ত না থাকিলেও) প্রতীতি জন্মায়। আবার বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগ ছাড়া স্মৃতিজনিত প্রতিক্রিয়ায় মনে আনন্দের উৎসমুখ খোলার মত অবস্থা হইতে পারে; যেমন হয় স্বপ্নে। আবার গভীর নিদ্রায়, সুষুপ্তিতে মনের উপর বহির্বিষয়, মস্তিষ্ককেন্দ্র, অন্তরিন্দ্রিয় কোন কিছুই ক্রিয়াশীল হয় না, কোন কিছুর সহিত সংযোগও থাকে না; অথচ তখন আনন্দ অনুভব করি আমরা। এই আনন্দ সম্পূর্ণরূপে বিষয়নিরপেক্ষ। স্বপ্ন পর্যন্ত স্থূলরূপে না হইলেও সূক্ষ্মাকারে, স্মৃতির আকারে বহির্বিষয়ের সহিত সংস্পর্শ কিছু থাকে—একথা হয়ত বলা চলে; কিন্তু এখানে তাহাও থাকে না। বিষয়ানুভূতিরাহিত্যই এখানে আনন্দের কারণ।

মনের একটি বিশেষ অবস্থাই যখন আনন্দের উৎসমুখ খুলিবার কারণ, এবং বিষয়ের সহিত সংযোগ ছাড়াও যখন তাহা ঘটা সম্ভব, তখন বিষয়নিরপেক্ষ ভাবে মনের এই অবস্থা আনিতে পারিলেই আর আমাদের আনন্দের জন্য উন্মত্ত হইয়া ভিখারীর মত জাগতিক বিষয়ের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হয় না। কিন্তু চেষ্টা করিয়া মনের এই অবস্থা আনা কি বাস্তবিক সম্ভব? যাঁহারা বিশ্বের স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম সব সত্তাই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যাঁহারা স্বয়ং এই আনন্দলাভ করিয়া 'আত্মারাম', বহির্জগতের কোন কিছুর উপর নির্ভর না করিয়াও সদানন্দময় হইয়াছেন, তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে ইহা নিশ্চয়ই সম্ভব। সম্ভব, শুধু এইটুকুই বলেন নাই, মন এবং মন অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর সত্তা, আনন্দময় সত্তাকে (কারণশরীর) সাক্ষাৎ ভাবে দেখিয়া, উহাদের ধর্ম জানিয়া তাঁহারা বিষয়নিরপেক্ষ আনন্দলাভের পন্থারও নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন, বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগ ব্যতিরেকেই তজ্জনিত আনন্দ অপেক্ষাও

অধিকতর আনন্দের উৎসমুখ খুলিবার পথ দেখাইয়াছেন।

অতি প্রাচীনকালেই জীবনের এত বড় একটি সমস্যা সমাধানের কার্যকরী বাস্তব উপায় আবিষ্কার করিয়াছিল বলিয়াই ভারতীয় সভ্যতা অন্তর্মুখ হইতে পারিয়াছে এবং সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া সে ভাব বজায় রাখিয়াছে। যুগে যুগে বহির্মুখিতার নূতন নূতন এবং প্রচণ্ড বেগবান দুর্যোগ আসিয়াও তাহার এই অন্তর্মুখী ভাবকে নিশ্চিহ্ন করিতে পারে নাই (কোন দিন পারিবেও না)। বিষয়-নিরপেক্ষ আনন্দ লাভের সন্ধান পাইয়াছিল বলিয়াই ভারত ভোগ অপেক্ষা ত্যাগকেই উচ্চাসন দিতে পারিয়াছে, ত্যাগ ও সেবাকেই জাতীয় আদর্শ করিতে শিখিয়াছে ।

কারণ, ত্যাগই অর্থাৎ বহির্বিষয় হইতে আনন্দ আহরণ করার দ্বার রুদ্ধ করাই হইল জীবনে শ্রেষ্ঠ, অবাধিত, অফুরন্ত আনন্দ লাভের পথ। আমাদের সভ্যতার নিয়ামক সত্যদ্রষ্টাগণ সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিয়াই একথা বলিয়া গিয়াছেন, এবং সাধারণ মানুষ এপথে কিভাবে চলিলে বিষয়নিরপেক্ষভাবে এই আনন্দ লাভ করিতে পারে, তাহার সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। উপায় আর কিছুই নহে, প্রত্যহ নিয়মিতভাবে অভ্যাসসহায়ে মনকে বহির্বিষয় হইতে গুটাইয়া আনিয়া, বহির্বিষয়ের চিন্তা হইতে নিবৃত্ত করিয়া উহাকে অন্তর্মুখ করার এবং সেখানে একটিমাত্র নাম বা রূপের চিন্তায় তাহাকে একাগ্র করার, অথবা চিন্তাশূন্য করার চেষ্টা করা। আমরা জানি, নাম অথবা রূপ ছাড়া চিন্তার কোন পৃথক অস্তিত্ব নাই । একটু বিশ্লেষণ করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, কোন চিন্তার বিষয় হয় কোন কথার আকারে অথবা কোন ছবির আকারে অথবা উভয়ের মিলিত আকারে মনে ভাসিয়া উঠিতেছে ; ইহা ছাড়া চিন্তা হয়ই না। সাধারণ অবস্থায় মন অতি চঞ্চল ভাবে একটি হইতে অপর একটি নাম ও রূপে ছুটিয়া বেড়ায়, অনেক সময় পরস্পরের মধ্যে যুক্তিসম্মত, বা দেশকালগত কোন সামঞ্জস্যও থাকে না। সাধারণ অবস্থায় ইহা আমাদের নজরে পড়ে না—মনকে একটি-মাত্র নাম বা রূপে একাগ্র করিবার বা চিন্তাশূন্য করিবার চেষ্টা করিলেই তাহার এই চঞ্চল রূপটি স্পষ্ট দেখা যায়। একটি বিশেষ নাম-রূপে একাগ্র করিবার সময় মন যতবার অন্যত্র চলিয়া যায়, ততবারই উহাকে ঘুরাইয়া আনিয়া পূর্ব-স্থানে স্থির করিবার চেষ্টা করিতে হয়—'যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্। ততস্ততো নিয়ম্যৈতৎ আত্মন্যেব বশং নয়েৎ।' ইহারই নাম অভ্যাস, এবং একমাত্র এরূপ অভ্যাস সহায়েই মনকে স্থির করা সম্ভব। এভাবে অভ্যাস-সহায়ে মনকে অন্তর্মুখী ও একাগ্র করার চেষ্টা যত সফলতার পথে অগ্রসর হয়, অন্তর্নিহিত আনন্দের দ্বার ততই অবারিত হইতে থাকে। বাঞ্ছিত প্রিয় বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়াদির সংযোগে আনন্দের এই দ্বার অবারিত করার সহায়ক যে অবস্থা মনে হয়, মনস্থির হওয়ার ফলে মনের সে অবস্থা আপনা আপনি হইতে থাকে ; অনেক বেশী করিয়াই হইতে থাকে। সত্যদ্রষ্টাগণ এদেশের সর্বসাধারণের জন্য মনস্থির করিবার সহজ সরল যে কয়েকটি উপায় নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, উহাদের মধ্যে একটি হইল ভগবদ্ভক্তি দ্বারা মনকে শান্ত করার প্রচেষ্টা। প্রতিদিন প্রভাত, দ্বিপ্রহর, সন্ধ্যা প্রভৃতি সময়ে, বিশেষ করিয়া দৈনন্দিন কার্যারম্ভের পূর্বে প্রভাতে শ্রীভগবানের কোন নামের বা রূপের চিন্তার পুনরাবৃত্তি, বা নিজ নিজ রুচিমত প্রার্থনা ও ভজন প্রভৃতি নিয়মিত-

ভাবে করিয়া চলিলে মন ক্রমে স্থির হইয়া আসে। মনকে একাগ্র করার জন্য ভজনের শক্তি অসীম। শিশুদের মন পর্যন্ত সঙ্গীতে একাগ্র হয়। ছন্দের দোলায় মনকে পুনঃপুনঃ একই ভাবে দোলা দেওয়াই (যাহা একাগ্রতা-সাধনের একটি বিশেষ উপায়) ইহার মূল।

এভাবে চেষ্টার ফলে মন ক্রমে যত অন্তর্মুখী ও একাগ্র হয়, অন্তর্নিহিত আনন্দের দ্বার ততই অবাধিত হইতে থাকে। দেহ-মনপ্রাণে ততই উহা একটি প্রশান্তির প্রলেপ বুলাইয়া দেয়। একাগ্রতা যত গভীর হইতে থাকে, এই প্রশান্তির প্রলেপও তত গাঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী হইতে থাকে। আনন্দলাভেচ্ছু মন এই স্থির আনন্দের আস্বাদ যত বেশী পায়, ততই সে উহা আরো বেশী পাইবার জন্য আগ্রহী হয়—আনন্দের জন্য বাহিরে ছুটাছুটি করার প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন ততই তাহার কমিতে থাকে। দৈনন্দিন কর্মারম্ভের পূর্বে মনকে এভাবে স্থির করিয়া আনার আরো একটি সুফল হইল—মানসিক চঞ্চলতা কমিয়া যাওয়ায় দৈনন্দিন কাজকর্ম আরও সুষ্ঠুভাবে করা যায়। কর্মক্ষমতাও বাড়িয়া যায়। সংসারে কর্মের মাধ্যমে অমৃতত্ব ও নিত্য আনন্দ লাভের উপায় রূপে গীতায় যাহা বর্ণিত আছে—মনকে নির্লিপ্ত রাখিয়া, মনের সাম্যভাব বজায় রাখিয়া অথচ উৎসাহী হইয়া কার্য করা (অন্যান্য কর্ম-ক্ষেত্রের তো কথাই নাই, যুদ্ধক্ষেত্রের মত প্রচণ্ড চিত্ত-বিক্ষেপকারী কর্মক্ষেত্রেও মনের এই সাম্য বজায় রাখিয়া কাজ করা), স্বামীজীর কথায়, প্রচণ্ড কর্ম-তৎপরতার মধ্যে চিরপ্রশান্ত থাকা—সেই লক্ষ্যের দিকেই আমাদের ধীরে ধীরে অগ্রসর করাইয়া দেয় নিত্য নিয়মিত মন স্থির করার এই অভ্যাস। ইহার সফলতা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপকে মধুময় করিয়া তোলে তৃষ্ণাজনিত অতৃপ্তি ও অশান্তির দাবানলে বিষয়নিরপেক্ষ স্থির প্রতিক্রিয়াহীন আনন্দসলিল সিঞ্চনে ; দৃপ্ততর তো করেই।

আমাদের অন্তর্নিহিত আনন্দের উৎসমুখ অবাধিত করার সহায়ক এইরূপ আরো বহুবিধ নিত্যকর্মের দ্বারা আমাদের সভ্যতা ও সমাজ নিয়ন্ত্রিত। নিজের মধ্যে তলাইয়া যাইয়া নিজের স্বরূপের সন্ধানের নামই আধ্যাত্মিকতা ; ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই আমাদের সমাজকে, আমাদের জীবনকে আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক বলা হয়। মানুষকে 'মানুষ' করার ইহা একটি রাজপথ। ব্যক্তিগত বা জাতি-গত আনন্দ লাভের পথ প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে অপর ব্যক্তির বা রাষ্ট্রের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া হইতে, অপরের সুখসুবিধা এমনকি সর্বনাশের দিকেও দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া ধন, মান, আধিপত্য প্রভৃতি ভোগ্যবস্তু আহরণে প্রবৃত্ত হওয়া হইতে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে মানুষকে নিবৃত্ত করার ইহাই একমাত্র পথ—তাহার জীবনকে আধ্যাত্মিক করার, হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিয়া আনন্দের জন্য বহির্জগতের বিষয় আহরণে প্রয়োজনরহিত করার চেষ্টা করা।

আমাদের সভ্যতায় সমাজের সর্বস্তরে অবস্থিত প্রত্যেকটি লোক যাহাতে এই বিষয়নিরপেক্ষ আনন্দের আস্বাদ কিছুটা পায়, তাহারই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবস্থা করা রহিয়াছে ; যে সভ্যতায় সর্বসাধারণের জীবনকে এভাবে অন্তর্মুখী করিয়া দ্বেষ-হিংসা-সংঘর্ষের মূল কারণ অত্যধিক এবং অসংযত বিষয়তৃষ্ণাকুল অশান্তিময় স্তর হইতে অনাবিল আনন্দময় সংযত উচ্চতর জীবনস্তরে তুলিবার ব্যবস্থা থাকে, তাহার নাম আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক সভ্যতা ; আমাদের সভ্যতা এই ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের এ ভিত্তিভূমি ত্যাগ করিয়া বহির্মুখী ভাবের ভিত্তিতে দাঁড়াইবার ভয় অবশ্য ভারতের ভাগ্যবিধাতার কৃপায় বহুপূর্বে কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ বহির্মুখী সভ্যতার সর্ববিধ প্রলোভন কাটাইবার মত শক্তিমান এখনো হয় নাই ; যাহার ফলে দুর্নীতি ও অন্যায় ক্রমশই আমাদের উপর অধিকতর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। ইহার প্রতিকারের এক-মাত্র পথ হইল বহির্জীবনের মান উন্নত করার চেষ্টার সঙ্গে সর্বসাধারণের অন্তর্জীবনের মানও উন্নত করার চেষ্টা করা এবং এদেশে তাহা করিবার সহজতম উপায় হইল ভগবানের প্রতি মন একাগ্র করিবার বা সাধারণভাবে মন চিন্তা-শূন্য করিবার নিত্য অভ্যাস সহায়ে মনকে বিষয়-নিরপেক্ষ আনন্দের আস্বাদলাভের দিকে অগ্রসর করাইবার ব্যবস্থাগুলির পুনঃপ্রচলন করা। যাঁহারা নেতৃস্থানীয় তাঁহাদের জীবনাদর্শে ইহা দেখানো এবং সর্বপ্রকারে ইহার সমর্থন এবং উৎসাহদানই জনগণকে এবিষয়ে আকৃষ্ট করিবার উপায়। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়ের লোককেই নিজনিজ পন্থাবলম্বনে এবং যাঁহারা ভগবানে বিশ্বাসী নহেন তাঁহাদিগকে সাধারণ-ভাবে একাগ্রতার সাধনে প্রয়াসী করার মত সুযোগ ও উৎসাহপ্রদান শিক্ষা প্রভৃতির মাধ্যমে অবিলম্বে করা প্রয়োজন। দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা তাহাতে ব্যাহত হইবে বলিয়া মনে হয় না— যদি ব্যবস্থাগ্রহণের সময় কোথাও পক্ষপাতিত্ব দেখানো না হয়। মনঃসংযমের ব্যবস্থা সকল ধর্মেই আছে, মানুষ সাধারণতঃ সেগুলিকে অভ্যাস করিতে ক্রমশঃ ভুলিয়া যায় ; সেগুলিকে শুধু জীবনে রূপায়িত করাই হইল কাজ। আমরা সকলেই ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়া এবিষয়ে উদাসীন থাকিলে জাতির উন্নতিপথের বাধাপসারণ বিলম্বিতই হইবে।

মানুষের আদর্শ হিসাবে আমরা আজ যাহা চাহিতেছি—ধর্মদ্বেষহীনতা, সাম্য, দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিলোপসাধন, পারস্পরিক প্রীতি— তাহা সবই পাইবার ইহাই হইল সহজপথ। ধর্মের পথে, আধ্যাত্মিকতার পথে অন্তর্জীবন-গঠনের বাস্তব ব্যবস্থা ছাড়া কোন 'বাদ' দিয়াই তাহা সম্ভব নহে, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে তো নহেই। শুধু ভারতবর্ষ কেন, স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন, পাশ্চাত্যেও নহে ; বলিয়াছেন, জড়বাদের ভিত্তিভূমি হইতে সরাইয়া আনিয়া আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না করিলে পাশ্চাত্যসভ্যতারও বিনাশ আসন্ন হইবে। আজ জগতের বিষম অবস্থায় ইহার সম্ভাবনা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি—আপাতদৃষ্টিতে অতি উন্নত, অতি সুসভ্য মানুষেরও আধিপত্য ও সম্পদ লাভেচ্ছু মনের অপরিমেয় অসংযত ভোগ-তৃষ্ণা জাতীয়তা ও মতবাদের রূপ ধরিয়া এবং উহাদের সংহতির শক্তি লইয়া হিংস্র পশুর মত মানবতার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াও কি আমরা সত্যের দিকে ফিরিয়া তাকাইব না, এই বহির্মুখী সভ্যতার দিকেই বা শূন্যপানে নিরপেক্ষ দৃষ্টি মেলিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিব ?

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

(১)

Bagh Bazar
57 Ramkanta Bose's St.
(১৯ শে মে, ১৮৯৭)

My dear Akhandananda,

তোমার পত্র পাইয়াছি। আমি কলিকাতায় থাকার দরুন সময়মত জবাব দিতে পারি নাই। যাহা হউক তোমরা বেশ করিয়া কার্য করিবে। টাকার পুনরায় আবশ্যক হইলে ১০।১২ দিন আগে লিখিবে। তোমরা যদি গ্রাম হইতে ভিক্ষা না করিতে পার তাহা হইলে ১০ টাকা ঐ fund হইতে আপাততঃ লইয়া নিজ ব্যয়ের জন্য নির্বাহ করিবেক। এখান হইতে টাকা গেলে সেই টাকা হইতে উক্ত fund-এ দিবে; যদ্যপি বেশী লোকের আবশ্যক না হয় তাহা হইলে সকলে গুলতান করিবার আবশ্যক কি আছে? যে মত বিবেচনা হয় করিবে। ইতি

Brahmananda

(২)

শ্রীশ্রীগুরুদেব-
পাদপদ্মভরসা

৫ই জুন, ১৮৯৭
আলমবাজার মঠ

ভাই গঙ্গাধর,

তোমার ২রা জুনের এক পত্র পাইলাম। আমরা বসুমতী কাগজে রিপোর্ট দিতে আরম্ভ করিয়াছি—যদি তোমরাই বসুমতীতে একেবারে পাঠাও তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু মঠে যেন প্রতি সপ্তাহে একখানি করিয়া তোমাদের কার্যবিবরণ-সম্বলিত পত্র আসে। মিররে আমরা ক্রমশঃ ঐ কার্য-বিবরণ প্রকাশ করিব। তোমরা ঐখানকার ভদ্রলোকদিগকে বলিয়া ইংরাজী কাগজে কার্য-বিবরণ প্রকাশ করিবে। যদি···কোন পত্রিকায় কার্য-বিবরণ প্রকাশ হয়, তবে সেই পত্রিকা মঠে পাঠাইবে। টাকা পাঠাইয়াছি; টাকাপ্রাপ্তির সংবাদের জন্য চিন্তিত আছি, সংবাদ দিয়া চিন্তা দূর করিবে। তোমরা আমার নমস্কার ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—

দাস
ব্রহ্মানন্দ

ভগবৎপ্রসঙ্গ*

স্বামী মাধবানন্দ

(বেলুড় মঠ, মঙ্গলবার, ১৬ই অক্টোবর, ১৯৬২)

ঈশ্বরলাভই জীবনের উদ্দেশ্য। আমরা গাড়ীঘোড়া, ভাল বাড়ী ইত্যাদি লাভের জন্য জন্মাইনি। সাধনভজনের দ্বারা ভগবানকেই লাভ করতে হবে। ভগবান একজনই, কিন্তু বিভিন্ন তাঁর নাম ও রূপ। এই নিয়ে ঝগড়া করার কিছু নাই। দক্ষিণদেশে বিষ্ণুর ভক্ত শিবের মন্দিরে যাবে না; আবার শিবের ভক্ত বিষ্ণুর মন্দিরে যাবে না। আমাদের ক্ষুদ্র মন নিয়ে অনন্তকে কি করে বুঝব?

ভগবান অতি দুর্লভ জিনিস। অপূর্ব বস্তু। তিনি টাকাকড়ি বা পদমর্যাদা দেখেন না; শুধু প্রাণের কথা শোনেন। তাঁর কাছে ছোট ছেলের মত আবেদন-নিবেদন জানাবে। তাঁর দয়াই আসল। সাধনভজন একটুও করলে তিনি এগিয়ে আসেন। নিজে যতটুকু পার চেষ্টা করে যাও। পূর্বদিকে যত এগোবে পশ্চিম ততই পিছনে পড়বে। সংসারের আসক্তি ততই ধীরে ধীরে কমে আসবে। উইপোকা দেখেছ না? দেখতে কত ছোট কিন্তু চেষ্টার ফলে কত বড় 'ঢিপি' তৈরী করে ফেলে। তাই প্রয়োজন চেষ্টা ও আন্তরিকতা। জোয়ার এলে আর দাঁড় টানতে হয় না। হাওয়া পেলে পাল তুললেই হল।

ঠাকুর দয়া করে মানুষের শরীর ধরে এসেছেন। তিনি পরমগুরু। তাঁর মধ্যেই সব ভাব রয়েছে। তাঁর স্থূলশরীর চলে গেলেও তিনি সূক্ষ্মশরীরে ভক্তহৃদয়ে এখনও রয়েছেন।

(বেলুড়মঠ, বৃহস্পতিবার, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৬২)

ভগবানই একমাত্র সারবস্তু। বাকী সব ছায়া মাত্র। ভগবান আছেন, এইটি ষোলআনা বিশ্বাস করতে হয়। এযুগে ঠাকুর বৈজ্ঞানিকের মত নিজের অনুভূতি দিয়ে দেখে তবে বলে গেলেন।

মা তাঁকে দেবী বলেই জানতেন। তাই তাঁর শরীর গেলে মা কেঁদে উঠলেন; বললেন: মা কালী গো, কোথায় গেলে গো?

আবার ঠাকুরও তাঁকে দেবী বলে জানতেন। একদিন মা তাঁর পদসেবা করতে করতে জিজ্ঞেস করছেন: তুমি আমাকে কি মনে কর?

অমনি ঠাকুর বলে উঠলেন: যে মা মন্দিরে ভবতারিণীরূপে পূজো পাচ্ছেন, সেই মা-ই এখন নহবতে রয়েছেন (তাঁর গর্ভধারিণী মা) আবার তিনিই এখন আমার পায়ে হাতবুলিয়ে দিচ্ছেন।

কাজেই তিনিই এক। ঠাকুর পুরুষশরীর নিয়ে এলেও তাঁর মাতৃভাব।

খুব চেষ্টা করে যাও। প্রথমে চোখ বুজলেই তো অন্ধকার। তা হোক্‌গে যাক। এইভাবে চেষ্টা করতে করতেই হবে।

(বেলুড় মঠ, বুধবার, ৩১শে অক্টোবর, ১৯৬২)

ঠাকুর জীবরূপ ধারণ করে কি ভাবে প্রার্থনা করতে হয় দেখিয়ে গেলেন। যে নামেই ডাক, জানবে ভগবান এক। প্রাণ ভরে ডাকতে ডাকতেই মনের মলিনতা সব চলে যাবে।

ছোটছেলে যখন যন্ত্রণা পেয়ে চিৎকার করে ডাকে মা তখন ছুটে আসেন। এক

* প্রসঙ্গের অনুলিখন।

মিনিটও দেরী করেন না। কাজেই ধৈর্য হারিও না। সময় হলে তিনি আসবেনই আসবেন। অসময়ে এলে কদর হবে না। এমন প্রতিজ্ঞা থাকা চাই যে, তাঁরই দয়ায় আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব, কিছুতেই ছাড়ব না। তিনি ভেতরেই আছেন। সর্বত্র আছেন।

ভক্তি তোমাদের ভেতরেই আছে। তা নইলে তোমরা এখানে আসবে কেন? সময় পেলেই তাঁর নাম করে যাবে। দেখবে সংসার মধুময় হয়ে উঠবে। সংসার কর ক্ষতি নাই কিন্তু সাংসারিকতা ত্যাগ করতে হবে। জলে নৌকো থাকে কিন্তু নৌকোর ভেতরে জল ঢুকলেই বিপদ। সকলের আশ্রমে বা কনভেন্ট-এ যোগ দেবার প্রয়োজন নাই। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গার মত ভক্তিকে আশ্রয় করে সংসার করতে হয়। তাঁকে পেতেই হবে নইলে শান্তি নাই। টাকাকড়ি ইত্যাদি পেলে সাংসারিক সুখ হয় কিন্তু তাঁকে না পাওয়া পর্যন্ত আসল শান্তি হবে না।

(বেলুড় মঠ, বৃহস্পতিবার, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৬২)

শ্রীচৈতন্য নামের মাহাত্ম্যের কথা বলেছেন। নামরূপ বীজ বটগাছের বীজের মত। নেবার সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য সব হয়ে যাবে না। তবে হবেই। মন্ত্র শুধু repeat করলেই (আওড়ালেই) হবে না। চাই অনুরাগ ও ঐকান্তিকতা।

তিনি সর্বত্র আছেন, যেন লুকিয়ে। আড়াল থেকে সব দেখছেন। তিনি এক শুভদিনের জন্য প্রতীক্ষা করে বসে আছেন। ঠাকুর বলেছেন, আন্তরিক হলে একদিন হবেই। কত কত জন্ম নিতে হয়েছে। কত কত বাসনা ছিল! সে সব কিছুটা পূর্ণ না হলে ঈশ্বরদর্শন হয় না। কত সংখ্যা জপ করলাম, কত প্রার্থনা স্তবস্তুতি করলাম—এতে মন দেবার প্রয়োজন নাই। মন প্রাণ ঢেলে খুব ডেকে যাও।

সেই কাঠুরিয়ার গল্প পড়েছ ত? ক্রমশঃ এগিয়ে যেতে হবে বিশ্বাস করে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাও

প্রশ্ন: মহারাজ, সেবার ভাবে কাজ করা কেমন?

উত্তর: সেবাবুদ্ধিতে সকল কাজ করা। স্বামীজী বলেছেন, Work is worship. প্রতিটি কাজকে পূজা হিসাবে গ্রহণ করতে তিনি বলেছেন। কোন কাজই ছোট নয়। সর্বভূতে তিনি রয়েছেন এইটি ভেবে তাঁরই সেবা করছি মনে করতে হবে। যেমন মন্দিরে ঠাকুরসেবা। সব সময়ে একটা ভাব নিয়ে চলতে হবে—যেন ঠাকুরই বিভিন্ন মূর্তিতে আমাদের সেবা নেবার জন্য এগিয়ে এসেছেন। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' —এর নামই Practical Advaita.

তুমি তো সাধু হবার জন্য এসেছ। শুধু 'কথামৃত' পড়লে হবে না। ...স্বামীজীর বইগুলি ভাল করে পড়বে। Through স্বামীজী ঠাকুরকে বোঝার চেষ্টা করবে।

আর একটি কথা মনে রাখবে। সঙ্ঘের সেবাই ঠাকুরের সেবা। কাজেই সব সময়ে বিচার করবে, আমি সঙ্ঘের সেবা করতে এসেছি, না সঙ্ঘের সেবা নিতে এসেছি।

(বেলুড় মঠ, সোমবার, ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৬২)

আজ Christmas Eve. বিশেষ শুভদিন। মন্ত্রে বিশ্বাস করে সাধন করলে অবিদ্যানাশ হয়। আনন্দলাভ হয়। ভগবানকে প্রসন্ন করতে হলে নিষ্ঠার সঙ্গে আন্তরিক ভাবে ডেকে যেতে হবে।

নিজেকে দীন হীন কখনো ভাববে না। যা হয়েছে, হয়ে গেছে। সেজন্য ভেব না। ঠাকুরের কাছে তোমরা আবদার করবে। জোর করবে ছোট ছেলের মত, বলবে কেন দেখা দেবে না? তিনি যে আমাদের অত্যন্ত আপনার জন। পরম আত্মীয়।

একশর মধ্যে নিরানব্বইটা কেউ ভাল করলে সাধারণ মানুষ ভুলে যায় কিন্তু একটা মন্দ করলে মনে রাখে। আর ভগবান? তিনি নিরানব্বইটা দোষের কথা ভুলে যান কিন্তু একটি মাত্র ভালর কথা মনে রাখেন। এই হল মানুষের সঙ্গে ভগবানের তফাৎ। বুঝলে ত? ঠাকুর বলতেন, আমরা যখন যতটুকু ডেকেছি তিনি শুনে রেখেছেন। তিনি পিঁপড়ের পায়ের নূপুরের ধ্বনিটিও শুনতে পান।

ঠাকুরকে স্মরণ করা, চিন্তা করা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। সাক্ষাৎ ভগবান মানুষের রূপ ধরে এসেছেন। মানুষ যা নিয়ে মেতে আছে, তিনি সেই দিক দিয়েই গেলেন না। ...তার মুখ দিয়ে মা কালীই কথা বলেছেন। তাই তাঁর কথা পড়লে মনে খুব জোর পাবে। মনে হবে আমাকে কেউ ডোবাতে পারবে না। তিনি সকলের জন্য কত কেঁদেছিলেন!

আমাদের দেরী যদি হয়—তাতে ভগবানের দোষ নয়, তাঁর নামের দোষ নয়। আমাদের মনে অনেক কামনা-বাসনা আছে বলেই ঠিক ঠিক হয় না। তাই দেরী হয়। তিনি লুকিয়ে রয়েছেন ভেতরে বাইরে সর্বত্র।

(বেলুড় মঠ, শুক্রবার, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৬২)

তাঁর ওপরে ভক্তি হলে ব্যাকুলতা আসে। জলে চুবিয়ে ধরলে যেমন জলে ডোবা লোক একটু বাতাসের জন্য হাঁপিয়ে ওঠে, সাধকের তখন তেমনি অবস্থা হয়। তখন ভগবানের দর্শন পাওয়া যায়।

ঠাকুর নিজ মুখে বলেছেন যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ। নূতন অবতার হয়ে না আসা পর্যন্ত তিনি সূক্ষ্ম দেহে থাকবেন, স্বামীজী বলেছেন।

ভাব নিয়ে করতে পারলে সব কাজই তাঁর পূজা হয়। সব কাজের মধ্যে তাঁর স্মরণ মনন রাখবে। পদ্মপত্র জলে থাকে কিন্তু জলে ভিজে না। তেমনি সংসারে অনাসক্ত ভাবে কি করে থাকা যায় ঠাকুর ও মা তাঁদের জীবনে, কাজে-কর্মে আমাদের তা দেখিয়ে গেলেন। অজ্ঞান আমাদের মোহগ্রস্ত করে রেখেছে—তাই এই দুরবস্থা!

ভগবান আমাদের সব চেয়ে আপনার জন। তিনি প্রেমময়। কিন্তু তাহলে সংসারে এত দুঃখকষ্ট কেন? তার নানা কারণ। আমাদের আগের আগের বাসনা ও কার্য অনুযায়ী সুখদুঃখ ভোগ হয়। তাঁর দয়া হলে জ্ঞান ভক্তি সবই লাভ হয়। কিন্তু Secret (রহস্য) হ'ল ব্যাকুলতা। তাঁর দিকে মন গেলে তিনি প্রসন্ন হন।

স্বামীজী বলেছেন, গরুতে মিথ্যা কথা বলে না, দেয়ালে চুরি করে না; কিন্তু গরু গরুই থাকে, দেয়াল দেয়ালই থাকে। মানুষ অন্যায় করে কিন্তু আবার ভক্তিবিশ্বাসের বলে জ্ঞান লাভ করে। হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দজী) বলতেন, কেমন জান? কাপড়ে সাবান লাগানোর মত। প্রথমে বোঝা যায় না অত ময়লা কেমন করে যাবে। কিন্তু কাচতে কাচতে সব ময়লা আলাদা হয়ে যায়। তখন কেমন পরিষ্কার দেখায়। তখন আবার উল্টো। বোঝাই যায় না যে কাপড়ে কোন কালে ময়লা ছিল।

(বেলুড় মঠ, শনিবার, ১২ই জানুআরি, ১৯৬৩)

বর্তমান যুগে শারীরিক কঠোরতার বিশেষ প্রয়োজন নাই। আর বাইরের কঠোরতা করলেই তাঁকে পাওয়া যায় না। শেকল ধরে জলের নিচে যাওয়ার মত তাঁর পবিত্র নাম জপ করতে করতে এগিয়ে যেতে হবে। ভগবানের সব শক্তি ঐ নামেই রয়েছে। চাই নামে বিশ্বাস আর একাগ্রতা। বিভীষণ একজনের কাপড়ের খুঁটে রামনাম লিখে বলে দিয়েছিলেন, বিশ্বাস করে সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যাও, ডুবে যাবার ভয় নাই।

কিন্তু পেলেনা বলে হতাশ হয়ে যাবে না। মনের বাসনা দূর না হলে কিন্তু তাঁর দর্শন বা কৃপা সহজে পাওয়া যায় না। হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দজী) বলতেন, ভগবান তো আর সাপ নন, মন্ত্র পড়লেই চলে আসবেন! তিনি অতি আপনজন। দয়াঘন মূর্তি। ভালবাসার মূর্ত প্রতীক। ভালবাসা দিয়েই তাঁকে বাঁধতে হবে।

তিনি ভেতরে বাইরে সর্বত্র রয়েছেন। নেবুর রসের মধ্যে যেমন নেবু ফেলে দেয়—তেমনি। কাজেই তাঁর চিন্তা দ্বারা নূতন ভাবে এবার জীবন গঠন করার চেষ্টা করতে হবে। ঠাকুর বলতেন, শ, ষ, স। সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর। সহ্য করা সংসারজীবনেও একান্ত প্রয়োজন।

সৎকাজ, সৎচিন্তা ও প্রার্থনা—এর দ্বারা ভগবানে ভক্তি হয়। আগুন প্রথমে জ্বালান খুবই শক্ত। বৈদিক যুগে কাঠে কাঠে ঘসে আগুন বের করা হয়েছিল। এই ভক্তি-বিশ্বাসের আগুনকে নিভতে দেওয়া চলবে না। ঠাকুরতো কত ভরসা দিয়ে গেলেন। মানুষ কত দুর্বল, কত অন্যায় করে কিন্তু নিজের চেষ্টায় ও ভগবানের কৃপায় সে ভগবান লাভ করতে পারে।

"তিনি অন্তরে বাহিরে আছেন।"

"অন্তরে তিনিই আছেন। তাই বেদ বলে 'তত্ত্বমসি'। আর বাহিরেও তিনি। মায়াতে দেখাচ্ছে নানা রূপ; কিন্তু বস্তুতঃ তিনিই রয়েছেন।"

"দর্শন করলে একরকম, শাস্ত্র পড়লে আর এক রকম। শাস্ত্রে আভাস মাত্র পাওয়া যায়। তাই কতকগুলো শাস্ত্র পড়বার কোন প্রয়োজন নাই। তার চেয়ে নির্জনে তাঁকে ডাকা ভাল।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত

‘পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার’

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ভারতকে অবনতির এক চরম অবস্থা থেকে টেনে তুলে আনার জন্যে, মহা জড়তার আবরণ সরিয়ে মানুষের অন্তর্নিহিত আত্মার শক্তিকে, দেবত্বকে প্রকট করে দেবার জন্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব। শুধু ভারতের নয়, সারা জগতের মানুষের জন্যেই তাঁরা এসেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা যথাযথ রূপে গ্রহণ করে স্বামী বিবেকানন্দ সে কাজ সমাধা করে গেছেন—জাতির ধমনীতে ধমনীতে আত্ম-বিশ্বাসের বিদ্যুৎ সঞ্চারিত করে, তার জড়তার ভিত নাড়িয়ে দিয়ে তাকে আত্ম-বিকাশের পথ ধরিয়ে দিয়ে গেছেন, তার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে গেছেন; ফলে জাতি সর্ববিষয়ে আত্মার এই মহিমাকে প্রকাশ করে এগিয়ে চলেছে। সাহিত্য, রাজনীতি, দর্শন, চারুকলা প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে জাতির নিজস্ব বলিষ্ঠ ভাবপ্রকাশের সহায়করূপে এসেছেন বহু মহামানব। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাবে ভারতের যে চিরন্তন বাণী জাতির অন্তস্তল আলোড়িত করে তুলেছিল, মানুষের সেই দেহাতীত অমিতবীর্য অমর আত্মার মহিমাকেই প্রকট করেছেন তাঁরা। নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) সমকালেই ভারতে পরপর জন্মগ্রহণ করেছেন কয়েকজন মহামানব।

নরেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুআরি, কলিকাতায়। রবীন্দ্রনাথের জন্ম এর দু'বছর আগে এবং গান্ধীজীর জন্ম এর ছ'বছর পরে ১৮৬৯-এ। এঁদের পিছু পিছু শ্রীঅরবিন্দ এলেন ১৮৭২-এ। কালে-ভদ্রে এক-আধজন মহামানব সর্বত্রই জন্মে থাকেন। কিন্তু তৎকালীন নির্জীব সমাজকে প্রাণচঞ্চল করবার জন্যে দরকার ছিল এতগুলি প্রতিভা-সম্পন্ন লোকের একের পর এক আসা। পৃথিবীর ইতিহাসে একই দেশে এতগুলি মহারথীর এইভাবে উপর্যুপরি আবির্ভাব কদাচিৎ ঘটে যখন ঘটে তখন বুঝতে হবে সেই দেশের ভবিষ্যৎ বিশাল সম্ভাব্যতায় সমুজ্জ্বল। ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই একদিন ধর্মে এবং কর্মে মহান হয়ে উঠবে।

বিবেকানন্দের চেহারায় এবং চালচলনে একটা রাজকীয় মহিমা বিচ্ছুরিত হোতো। তিনি ছিলেন যেন মূর্তিমান মহাবীর্য। কণ্ঠে জ্ঞান ও কর্মের জয়ধ্বনি নিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ালেন তিনি। যেমন পারতেন সাঁতার কাটতে, নৌকা বাইতে, ঘোড়ায় চড়তে তেমনি পারতেন সুকণ্ঠের সঙ্গীতে সবাইকে মুগ্ধ করতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মধ্যেও তিনি ছিলেন একজন সেরা ছাত্র। সংস্কৃতে ও ইংরেজীতে তাঁর দস্তুরমতো দখল ছিল। পাশ্চাত্যের সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে নরেন্দ্রনাথ খুব যুক্তিবাদী হয়ে উঠেছিলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু হিন্দু-শাস্ত্রে ঋষিদের যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা আছে তাও তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। এটা তাঁর মনে হয়েছিল, ঋষিগণ প্রকৃতই সত্যান্বেষী ছিলেন এবং সত্যকে জানবার জন্যে কোন ত্যাগেই তাঁরা কুণ্ঠিত ছিলেন না। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন, এমন একজন সত্যদ্রষ্টা পুরুষকে দেখবার জন্যে নরেন্দ্র ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ তাঁর বহু-বাঞ্ছিত মনের মানুষটিকে খুঁজে পেলেন। শাস্ত্রে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির যে-বর্ণনা তিনি পেয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণে সেই উপনিষদ্‌কে জীবন্ত দেখে তিনি বিস্ময়ে

শ্রদ্ধায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এখানে একটা কথার উল্লেখ থাকা ভালো। শ্রীরামকৃষ্ণে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে নরেন্দ্রনাথের দীর্ঘদিন লেগেছিল। এ-সম্পর্কে স্বামীজী তাঁর শিষ্যা নিবেদিতাকে একবার বলেছিলেন, "I fought my master six long years, with the result that I know every inch of the way, every inch of the way." বুদ্ধির অহংকার নিয়ে যে-যুবক একদা সংশয়াকুল চিত্তে গুরুদেবের কাছে যাতায়াত করতেন, সেই নরেন্দ্রনাথই উত্তরকালে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা থেকে এক পত্রে লিখেছিলেন—

"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন কি না জানি না, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি একঘেয়ে। রামকৃষ্ণ পরমহংস, the latest and the most perfect--জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিত-চিকীর্ষা, উদারতায় জমাট; কারুর সঙ্গে কি তাঁর তুলনা হয়? তাঁকে যে বুঝতে পারে না, তার জন্ম বৃথা। আমি তাঁর জন্মজন্মান্তরের দাস, এই আমার পরম ভাগ্য! তাঁর একটা কথা বেদ-বেদান্ত অপেক্ষা অনেক বড় তস্য দাসদাসোঽহং, তবে একঘেয়ে গোঁড়ামি দ্বারা তাঁর ভাবের ব্যাঘাত হয়—এই জন্য চটি। তাঁর নাম বরং ডুবে যাক--তাঁর উপদেশ ফলবতী হোক, তিনি কি নামের দাস?"

পূর্ণ আত্মসমর্পণ আর পরিপূর্ণ ভাবে জানা একই কথা। জ্ঞান ও প্রেম এক বৃন্তেরই দুটি ফল!

বিবেকানন্দ নরেন্দ্রনাথের সন্ন্যাস-জীবনের নাম; নরেন্দ্রনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণই বিবেকানন্দ করে তৈরী করেছিলেন। তৈরী করেছিলেন একটা বিরাট উদ্দেশ্য নিয়ে এবং সেই উদ্দেশ্যটি ছিল সকল ধর্মই মূলতঃ সত্য—এই সমন্বয়ের বাণীকে বিশ্বময় ঘোষণা করা। বস্তুতঃ সকল ধর্মের রাস্তাতেই ভগবানলাভ হয়—এই উদার বাণীর পতাকাতলে সবাইকে মেলানোর জন্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ পৃথিবীতে এসেছিলেন। যত মত তত পথ—এই সত্য ঘোষণা করবার অসীম শক্তি এসেছিল শ্রীরামকৃষ্ণ একে একে মুসলমান, খ্রীষ্টান ও বৈষ্ণব প্রভৃতি বিচিত্র সাধনার পথে একই পরম উপলব্ধির শিখরে পৌঁছেছিলেন বলে।

দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলে যে-সত্য তিনি লাভ করলেন তাকে বিশ্বময় প্রচার করবার কতই না প্রয়োজন ছিল! বিজ্ঞানের কল্যাণে দূরত্ব আজ নিশ্চিহ্ন-প্রায়, physical annihilation of space আর কল্পনা নয়। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষগুলি আজ একে অন্যের কতই না কাছাকাছি এসে পড়েছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আজ যদি মৈত্রীতে প্রতিষ্ঠিত না হয়, আমরা যদি একে অন্যকে সহানুভূতির সঙ্গে জানবার চেষ্টা না করি তবে তো আমাদের এই নৈকট্য একটা মহা অনর্থের সৃষ্টি করবে। কিন্তু মানুষে মানুষে মৈত্রী কি শুধু স্বাধীনতার ভিত্তিতেই সম্ভব নয়? একজন মানুষকে যখন তার নিজস্ব রুচি এবং বিশ্বাস অনুযায়ী চলবার স্বাধীনতা আমরা দিই তখনই শুধু তার মন পেতে পারি। প্রত্যেকটি ধর্মবিশ্বাসেরই সমান অধিকার আছে সগৌরবে বেঁচে থাকবার এবং প্রতিবেশী যাতে শ্রদ্ধাবান তাকে শ্রদ্ধা করা প্রতিবেশীর অবশ্য-কর্তব্য—এই সত্যকে যুগের মর্মে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যেই কি শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব নয়?

তাঁর যুগবাণীর জয়ধ্বনি দিগ্‌দিগন্তে বহন করে নিয়ে যাবার জন্যে নরেন্দ্রনাথকে বেছে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ অণুমাত্রও ভুল করেননি। শিষ্যের কণ্ঠে তো গুরুরই বাণীর প্রতিধ্বনি! সেই

স্বাধীনতার স্তব-গান! বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠে বারম্বার ধ্বনিত হয়েছে: 'Freedom, oh Freedom!' is the cry of life. 'Freedom, oh Freedom!' is the song of the Soul. গুরুও তো জীবদ্দশায় বারম্বার বলেছিলেন: কারও ভাব নষ্ট করতে নেই; কেননা যে কোন একটা ভাব ঠিক ঠিক ধরলে তা থেকেই ভাবময় ভগবানকে পাওয়া যায়; যে যার ভাব ধ'রে তাঁকে ডেকে যা। হিন্দুশাস্ত্রে, বিশেষত: গীতায়, স্বভাবের উপরে, স্বধর্মের উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক মানুষেরই ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা অনুপম শুচিতা ও স্বাতন্ত্র্য আছে। আমরা যখন এই স্বাতন্ত্র্যকে বলি দিয়ে অন্যকে অনুকরণ করতে যাই তখন সেটা আত্মহত্যারই সামিল হয়। স্বভাব এবং স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত করে আমরা যখন নিজেদের মতো করে অন্যদের বানাতে যাই তখনও আমরা তাদের বিষম ক্ষতি করি। তাই ঠাকুর বারম্বার বললেন: আর কারও ভাবের নিন্দা করিস নি বা অপরের ভাবটা নিজের ব'লে ধরতে বা নিতে যাসনি। পৃথিবীতে যিনি এসেছিলেন মৈত্রীর পতাকাতলে বিচিত্র-প্রকৃতির, বিচিত্র-রুচির, বিচিত্র-বিশ্বাসের নর-নারীকে মেলানোর জন্যে তিনি নিঃসংশয়ে স্বাধীনতাতেই সেই মৈত্রীর দৃঢ়তম ভিত্তি দেখেছিলেন। একথা নিমেষের জন্যেও যেন না ভুলি, বিবেকানন্দের বাণীতে শ্রীরামকৃষ্ণেরই প্রতিধ্বনি! বিবেকানন্দের নিজস্ব ভাষায়: "All that has been weak has been mine, and all that has been life-giving, strength-giving, pure, and holy has been his inspiration, his words, and he himself." "আমি যদি কোন দুর্বলতা পরিবেশন করে থাকি, সে আমারই। আর আমি যা দিয়েছি তার মধ্যে যা-কিছু বলপ্রদ, প্রাণপ্রদ, শুভ্র এবং শুচি সে-সমস্তের মূলে তাঁরই প্রেরণা, সে সমস্ত তাঁরই কথা, সে সমস্ত তিনিই স্বয়ং।"

এই বিজ্ঞানের যুগে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ-গুলিকে একত্রে মেলানোর জন্যে 'যত মত তত পথ' এই বাণীর যেমন একান্ত প্রয়োজন ছিল তেমনি প্রয়োজন ছিল অনুন্নত, অবহেলিত, পদ-দলিত দুর্ভাগা জনসাধারণকে ওঠানোর। বিবেকানন্দের জীবনীতে রোমা রলাঁ লিখেছেন, "Every human epoch has been set its own particular work. Our task is, or ought to be, to raise the masses, so long shamefully betrayed, exploited, and degraded by the very men who should have been their guides and sustainers." "মানবের প্রতিটি যুগেরই করণীয় নিজস্ব একটি বিশেষ কাজ আছে। আমাদের কাজ হচ্ছে বা হওয়া উচিত, যাদের আমরা এত কাল নির্লজ্জভাবে শোষণ করেছি, যাদের নীচুতে আমরা নামিয়ে এনেছি, যাদের সঙ্গে আচরণে আমরা বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছি, সেই জনসাধারণকে উপরে ওঠানো; আমাদের কর্তব্য ছিল তাদের পথপ্রদর্শক হওয়া, তাদের রক্ষা করা।"

বিবেকানন্দ যুগের এই কাজে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। গুরুদেবের মহা-প্রয়াণের পর পরিব্রাজক বিবেকানন্দ যখন আর্যাবর্ত ভ্রমণ করে দাক্ষিণাত্যের ওপর দিয়ে চলছিলেন তখন ভারতবর্ষের কঙ্কালসার মূর্তির নগ্নতার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের অভিজ্ঞতা তাঁকে বেদনায় অভিভূত করে দিলো। ক্ষুধাতুর অর্ধ-উলঙ্গ লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসীর ম্লান মুখচ্ছবি তাঁর স্বপ্নের মধ্যেও আনাগোনা করতে লাগলো। মনের মধ্যে দিবারাত্রি উঠছে কেবল তাদেরই চিন্তার তরঙ্গ! অবশেষে

যখন কুমারিকা অন্তরীপে স্বামীজী পৌছালেন তখন জীবনকে তিনি উৎসর্গ করে দেবার পথ খুঁজে পেলেন যারা সকলের নীচে, সকলের পিছে সেই সর্বহারাদের ধূলিধূসরিত নগ্নপদপ্রান্তে।

এরপর স্বামীজীর আমেরিকা গমন। চিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলনে তাঁর কম্বুকণ্ঠের সেই ঐতিহাসিক ভাষণে হিন্দুধর্মের মর্মবাণী ধ্বনিত হলো। সেই বাণী পাশ্চাত্য কান পেতে শুনলো শ্রদ্ধার সঙ্গে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখন থাক। আমেরিকায় স্বামীজী সেই অভিযানের চরম সাফল্যের মুহূর্তেও তাঁর স্বদেশের বুভুক্ষু দরিদ্রনারায়ণদের কথা ভুলতে পারেননি। ধনকুবেরদের সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বিলাসের সহস্র উপকরণের মধ্যে তিনি ঘুমাতে পারছেন না তাঁর স্বদেশের ক্ষুধার্ত জনসাধারণের অপরিসীম দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে। আমেরিকা থেকে ঐ সময়ে লেখা স্বামীজীর চিঠির পর চিঠিতে জনসাধারণের জন্যে তাঁর অসীম সহানুভূতির প্রকাশ রয়েছে।

উপনিষদে আমরা পড়েছি—পিতৃদেবো ভব মাতৃদেবো ভব।

যুগের কর্ণে স্বামীজী নূতন বাণী শোনালেন, 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব।' "For the next fifty years this alone shall be our keynote —this, our great Mother India. Let all other vain gods disappear for that time from our minds. This is the only god that is awake, our own race—'everywhere his hands, everywhere his feet, everywhere his ears, he covers every thing'. All other gods are sleeping."

কিন্তু অজ্ঞানের ঘন-মেঘে আচ্ছন্ন জড়প্রায় জীবন্মৃত জনসাধারণকে মনুষ্যত্বের প্রদীপ্ত মহিমার মধ্যে কেমন করে প্রাণচঞ্চল করে তুলবেন তিনি? ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে দার্জিলিং থেকে লেখা চিঠিতে এই প্রশ্নের তিনি জবাব দিয়েছেন। ঐ চিঠিতে আছে: "প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ ঐটি—রাজশাসন ও দম্ভবলে দেশের সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া। ... কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা! ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রেরও সুখসাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরিবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল? শিক্ষা—জবাব পাইলাম!"

ভারতবর্ষের আশাহত জড়পিণ্ডবৎ জনসাধারণকে আত্মবিশ্বাসে ও প্রাণ-চাঞ্চল্যে শক্তিমান করে তুলবার জন্যে স্বামীজী তাই বেদান্তের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। নিবেদিতা আপনার গুরুদেব সম্পর্কে লিখেছেন, "strength, strength, strength was the one quality he called for in woman and in man.' "শক্তি, শক্তি, শক্তি! নর-নারীর মধ্যে এই শক্তিকেই তিনি জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন।" স্বামীজীর কণ্ঠে শক্তিরই আবাহনগীতি সমস্ত উপনিষদে তো এই শক্তিরই জয়ধ্বনি। স্বামীজী, তাই, নিবেদিতাকে একদা বলেছিলেন. So I preach only the Upanishads. If you look you will find that I have never quoted anything but the Upanishads. And of the Upanishads it is only that one idea—strength.

স্বামীজীর Vedanta and Indian Life বক্তৃতায় আছে: People get disgusted many times at my preaching Advaitism. I do not mean to preach Advaitism or Dvaitism or any ism in the world. The only ism that we require now is the wonderful idea of the Soul—Its eternal might, Its eternal strength, Its eternal purity and its eternal perfection."

"আমার মুখে অদ্বৈতবাদ শুনে লোকে অনেক সময় বিরক্ত হয়। দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদ বা পৃথিবীর অন্য কোন বাদ আমি প্রচার করতে চাই না; একমাত্র যে 'বাদ'-এ আমাদের এখন প্রয়োজন আছে, সেটি হচ্ছে আত্মাসম্বন্ধে অদ্ভুত ধারণা—আত্মার অনন্ত শক্তি, আত্মার অন্তহীন নির্মলতা, আত্মার নিত্য পূর্ণতা।"

স্বামীজী আবার বলছেন, "Let me tell you, strength is what we want. And the first step in getting strength is to uphold the Upanishads, and believe—I am the Soul". "আমি তোমাদের বলছি, আমাদের এখন প্রয়োজন শক্তি, আর এই শক্তি অর্জনের প্রথম সোপান হচ্ছে উপনিষদকে ধারণা করা এবং বিশ্বাস করা যে 'আমি হচ্ছি আসলে আত্মা'।" সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, অপরাজেয় সেই আত্মা, যাকে তরবারি ছেদন করতে পারে না, আগুন পোড়াতে পারে না, বাতাস শুকাতে পারে না

আসলে বিবেকানন্দ ছিলেন শক্তি-মন্ত্রেরই উপাসক। তিনি বিশ্বাস করতেন দুর্বলতাই সকল পাপের, সকল অমঙ্গলের মূল কারণ। কম্বুকণ্ঠের ওজস্বিনী ভাষায় কতবার তিনি জলদ-মন্দ্রে ঘোষণা করেছেন, "Know that all sins and all evils can be summed up in that one word, weakness". আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর—এই প্রার্থনাই নিরন্তর তাঁর কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হোতো। নিবেদিতা নিজের গুরুদেব সম্পর্কে The Master as I saw Him গ্রন্থে এক জায়গায় লিখেছেন: How often did the habit of the monk seem to slip away from him and the armour of the warrior stand revealed. 'কতবার দেখেছি তাঁর অঙ্গ থেকে সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন খসে পড়েছে এবং ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে যোদ্ধার বর্ম!'

নিবেদিতার এই মন্তব্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য! বিবেকানন্দ নিঃসংশয়ে তৈরী হয়েছিলেন ক্ষত্রিয়ের কঠিন ধাতুতে! জীবন তাঁর কাছে ছিল একটি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। পদে পদে বাধা। বাধার শেষ নেই, সংগ্রামেরও শেষ নেই। পরাজয়েরও কি শেষ আছে? যেখানে একটা সংগ্রাম শেষ করে তরবারি কোষবদ্ধ করতে উদ্যত হচ্ছি সেখানে কোথা থেকে আহ্বান আসছে নূতনতর, কঠিনতর এবং বৃহত্তর সংগ্রাম সুরু করবার। আরামের লোভে, দুঃখের ভয়ে যদি সংগ্রামকে এড়িয়ে চলি বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরায় কুড়াতে হবে সকলের ঘৃণা, পড়ে থাকতে হবে সকলের পশ্চাতে, সকলের পদতলে।

তাইতো তরুণ ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করে বিবেকানন্দ যে-ডাক দিয়েছেন সেই ডাকের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে অতন্দ্র প্রহরীর তূর্যনাদ। এই বর্ম-পরা ক্ষাত্রবীর্যে দুর্জয় বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে আজ আমরা জানাবো, তাঁর আগ্নেয়-বাণীর বিপুল তাৎপর্যকে আমরা সম্যক-ভাবে উপলব্ধি করবো। কারণ আজ আমাদের

সব চেয়ে প্রয়োজন শক্তিসাধনার। শরীরে, মনে, আত্মায় আমাদিগকে সর্বাগ্রে বলিষ্ঠ হতে হবে।

স্বামীজী বললেন, জাতি হিসাবে আমরা বাক্‌সর্বস্ব হয়ে পড়েছি। কেননা শরীরে মনে আমরা দুর্বল। সর্বাগ্রে দেহে মনে আমাদের যুবকদের শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। তখন শক্তির পিছু পিছু ধর্ম আসবে। First of all, our young men must be strong. Religion will come afterwards. নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—এই বাণী স্বামীজীর কণ্ঠে কতবার উৎসারিত হয়েছে!

কিন্তু গোড়াতেই যদি গলদ থেকে যায় অর্থাৎ নিজের উপরে যদি বিশ্বাসের বিন্দু-বিসর্গ না থাকে অর্থাৎ আমি কোন কর্মেরই নই—এই ধারণা যদি কারও মনের মধ্যে শিকড় গাড়ে তবে তো তাকে দিয়ে পৃথিবীতে কিছুই করানো যাবে না। আত্ম-অবিশ্বাসে তার বাহু নিশ্চল নির্বীর্য হয়ে থাকবে। তাই স্বামীজী বারম্বার বললেন: Believe, therefore, in yourselves. The secret of Advaita is--Beleive in yourselves first, and then believe in anything else. আগে নিজেদের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করো, তার পর অপর কিছুতে বিশ্বাস কোরো।

প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের একটা মূল্য আছে। আমরা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছি পৃথিবীকে এমন-কিছু দেবার জন্যে যা আর কেউ দিতে পারে না। এই রকমের একটা সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকলে তবেই না মানুষ নিজেকে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা করতে পারে! তাই যে-মানুষ নিজেকে অপরিমেয় মূল্য দিয়ে থাকে আর যে-মানুষ নিজেকে কোন মূল্যই দেয় না—এ দুয়ের অপরাধ পাশাপাশি রাখলে হীনমন্যের অপরাধের কাছে দুর্বিনীতের অহঙ্কারের অপরাধ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। খ্যাতনামা ইংরেজ সাহিত্যিক চেষ্টারটন (G. K. Chesterton) কবি ব্রাউনিং-এর কাব্য-আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন: The crimes of the devil who thinks himself of immeasurable value are as nothing to the crimes of the devil who thinks himself of no value.

উপরে স্বামীজীর যে উক্তিগুলি উদ্ধৃত হয়েছে তাদের মুকুরে একটি বিপুল সত্যকে আমরা প্রতিবিম্বিত দেখতে পাই। এই সত্যটি হলো অধঃপাতিত ভারতবর্ষের অভ্যুত্থান শক্তি-অর্জনের মধ্য দিয়ে। উপনিষদের আশ্রয়-গ্রহণ একটা হীনবীর্য, নির্জীব জাতিকে প্রাণ-চাঞ্চল্যে জীবন্ত করবার জন্যে। উপনিষদ বলেছে, দেহে আত্মবুদ্ধি আরোপ করার মূঢ়তাই সমস্ত দুর্বলতার মূলে। আসল মানুষটাতো আত্মা। সেই কথাই ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের লেখায়:

যে আমার সত্য পরিচয়
মাংসে তার পরিমাপ নয়;
পদাঘাতে জীর্ণ তারে নাহি করে দণ্ড-পল-গুলি,
সর্বস্বান্ত নাহি করে পথপ্রান্তে ধূলি।

'মুক্তধারা' নাটকে শিবতরাইয়ের রাজদ্রোহী ধনঞ্জয় বৈরাগী রাজশক্তির দম্ভকে ভাঙবার জন্যে জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে। মারের ভয় থেকে তাদের মনকে মুক্ত করবার জন্যে ধনঞ্জয় তাদের হাতে তুলে দিয়েছে আত্মিক শক্তির অনুপম অস্ত্র। উত্তরকালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের নিরস্ত্র জনসাধারণ আত্মার দুঃখ-বরণের সীমাহীন শক্তিকে আশ্রয় করেই বৃটিশের মারের সাগর পাড়ি দিয়েছিল। পুলিশের লাঠির ঘায়ে সত্যাগ্রহীদের মাথার খুলি চৌচির হয়ে ভেঙে যাচ্ছে—এইতো রাজদ্রোহের অনিবার্য পরিণাম

এবং সেই প্রচণ্ড মারের মুখে লাগছে না বলা কত শক্ত! যাতে শিবতরাই-এর বিদ্রোহী প্রজারা মাথা তুলে বলতে পারে লাগছে না তার জন্যে ধনঞ্জয় বৈরাগী গণেশ সর্দারকে বলেছে, "আসল মানুষটি যে তার লাগে না, সে যে আলোর শিখা। লাগে জন্তুটার, সে যে মাংস, মার খেয়ে কেঁই কেঁই করে মরে।"

অন্যায়ের কাছে বশ্যতা-স্বীকারই অন্যায়ের স্পর্ধাকে অটুট রেখেছে। বশ্যতা-স্বীকারের মূলে ভীরুতা। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে সে শক্তি রাখে বিদ্রোহীকে মেরে ফেলবার। 'রক্তকরবী'র রাজা এই মারের ভয় দেখিয়েই বিদ্রোহিণী নন্দিনীকে বলেছে, "আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি? তোমাকে যে এই মুহূর্তে মেরে ফেলতে পারি।" প্রাণ হারাতে আমরা স্বভাবতই ভয় করি। আঘাতের যন্ত্রণাকে আমরা ভয়ে এড়িয়ে চলতে চাই। কিন্তু ভয়ের মূলে তো দেহাত্মবুদ্ধির মূঢ়তা। আসল মানুষটা যে আলোর শিখা এবং দেহটা যে আমার একটা বাহন মাত্র, এই সত্য সম্পর্কে জনসাধারণ অচেতন হয়ে আছে। যে-মুহূর্তে তারা আপনাদিগকে জানবে অনন্ত শক্তির আধার ব'লে তাদের মধ্যে জাগবে সত্যের জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে যে-কোন দুঃখের অগ্নি-কুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়বার মহাবীর্য।

সমস্ত দুর্বলতা, ভীরুতা, ক্লীবতা থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করবার জন্যে বিবেকানন্দ দিগন্তপ্রসারী জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন দেশ-জোড়া মূঢ়তার তমসার বিরুদ্ধে। বেদান্তকে করেছিলেন তার হাতিয়ার। বেদান্ত মানুষের সম্মুখে তার সত্যপরিচয়কে উদ্ঘাটিত করেছে। আসল মানুষটি অনন্ত শক্তির আধার আত্মা—এই পরম ঘোষণা বেদান্তের কণ্ঠে!

কিন্তু বেদান্তের আত্মতত্ত্ব তো গুহায় নিহিত রয়েছে! উপনিষদ্ তো সন্ন্যাসীদের মোক্ষপথের পাথেয় হয়ে আছে। বনের বেদান্তের বাণীকে যদি সর্বসাধারণের জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা যায়, আত্মা যদি আপামর-জনসাধারণের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে, তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগবে এবং সেই আত্মবিশ্বাসের জাগরণের ফলে তারা একটা মহৎ আদর্শের জন্যে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যেতেও কুণ্ঠিত হবে না। বিবেকানন্দ তাই বললেন, আত্মবিশ্বাসে ভারতবর্ষকে বলীয়ান করবার জন্যে বেদান্তকে সাধারণের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে নামিয়ে আনো হিমালয়ের অরণ্যের ছায়া থেকে। "It must come down to the daily, everyday life of the people; it shall be worked out in the palace of kings, in the cave of the recluse, it shall be worked out in the cottage of the poor, by the beggar in the street, every where any where it can be worked out." উপনিষদের আত্মতত্ত্ব নিয়ে কুটীর থেকে প্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্র আলোচনা চলেছে, অদ্বৈততত্ত্বের বহুল প্রচারের ফলে আত্মকেন্দ্রিকতার মৃত্যু-জাল দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে আত্মবৎ ভালোবাসছে এবং সমস্ত দুর্বলতা পরিহার করে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুঞ্জয় এক একটি পুরুষ-সিংহ হয়ে উঠেছে—এ মহান স্বপ্ন বিবেকানন্দের সমস্ত অন্তরকে জুড়ে ছিল। বিবেকানন্দ যাঁকে মার্কিন সন্ন্যাসী বলতেন সেই কবি ওয়াল্ট্ হুইট্‌ম্যানেরও বর্ণনায় সেরা সহরের অন্যতম লক্ষণ হচ্ছে, where speculations on the soul are encouraged.

রবীন্দ্রনাথ জাতিকে পান করিয়েছেন উপনিষদেরই এই সঞ্জীবনী রস তাকে

সমস্ত দুর্বলতা থেকে মুক্ত করবার জন্মে। নৈবেদ্যের কবিতাগুলি মূলতঃ উপনিষদের প্রেরণায় রচিত এবং তাদের অনেকগুলিতে মাভৈঃ মন্ত্র ধ্বনিত হয়েছে। একটা কবিতা এখানে উদ্ধৃত করলাম যার মধ্যে উপনিষদে বিঘোষিত বীর্যের আদর্শের জয়ধ্বনি।

তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন—
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
দৃঢ় বলে, অন্তরের অন্তর হইতে,
প্রভু মোর। বীর্য দেহো সুখের সহিতে
সুখেরে কঠিন করি। বীর্য দেহো দুখে
যাহে দুঃখ আপনারে শান্তস্মিত মুখে
পারে উপেক্ষিতে। ভকতিরে বীর্য দেহো
কর্মে যাহে হয় সে সফল, প্রীতি স্নেহ
পুণ্যে ওঠে ফুটি। বীর্য দেহো ক্ষুদ্রজনে
না করিতে হীনজ্ঞান, বলের চরণে
না লুটিতে।

আর গান্ধীজী তো পরিষ্কার করেই বলেছেন: "power resides in the people এবং আমি গত একুশ বৎসর ধ'রে চেষ্টা করে আসছি এই সহজ সত্যটুকু জনসাধারণকে বুঝাবার জন্মে যে তারাই শক্তির আধার, পার্লামেন্ট নয়। গান্ধীজীর আহ্বানে যখন জনসাধারণ Civil Disobedience আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে চরম দুঃখকে বরণ করে নিলো এবং হাজার হাজার মানুষের সেই দুঃখ-বরণের ফলে বৃটিশ-শাসন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তখন আত্মা সত্য—এই তত্ত্বই কি নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হলো না? বিবেকানন্দ স্বপ্ন দেখেছিলেন, আত্মার অপরিসীম শক্তিতে বিশ্বাসী ভারতের জনসাধারণ আপনাদিগকে দুর্বল ও অধম মনে করার মোহ থেকে মুক্ত হয়ে বাধার পর বাধাকে জয় করতে করতে সাফল্য থেকে সাফল্যের শিখরে চলেছে। তাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষের হাতে বিশ্ববিজয়ের পতাকা। আমেরিকা থেকে ফিরে তিনি কলকাতায় যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার মধ্যে আছে: India must conquer the world, and nothing less than that is my ideal.

কিন্তু একমাত্র স্বাধীন বলিষ্ঠ ভারতবর্ষের কথাই পৃথিবী শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনবে। আর আত্মার শক্তির অদ্ভুত প্রকাশই তো শ্রীরামকৃষ্ণের শুচি-শুভ্র জীবনে। তাঁর জীবন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিবেকানন্দ বলেছেন, it is the most marvellous manifestation of soul-power that you can read of, much less to expect. বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠে উপনিষদের আত্মার শক্তিরই জয়ধ্বনি। রবীন্দ্রসাহিত্যে সেই ধ্বনিই শুনতে পাই। গান্ধীজীর অহিংস গণবিপ্লবের মধ্যে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হলো, সকলের মধ্যেই আত্মা বিদ্যমান এবং আত্মার অদ্ভুত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে অতি সাধারণ মানুষও দুর্বলতা থেকে মুক্ত হতে পারে

কিন্তু অপূর্ণ থেকে যাবে এই আলোচনা যদি স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক উদ্বোধিত নব্য ভারতের শক্তিসাধনা প্রসঙ্গে এই সঙ্গে স্মরণ না করি স্বদেশের সেই প্রাতঃস্মরণীয় রণগুরু, ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজের সমন্বয়-মূর্তি সুভাষচন্দ্রকে যিনি শক্তির জয়ধ্বনি করলেন, নতুন ভারতের মর্মে প্রতিষ্ঠিত করলেন মহাভারতের কৃষ্ণকে যাঁর কণ্ঠে—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'।

শক্তির বিভিন্ন রূপ

ডক্টর শ্রীবিশ্বরঞ্জন নাগ

(২) শব্দ

প্রকৃতির যে বিশেষ ঘটনা আমাদের কানে অনুভূতি আনে তাই শব্দ। একটু বিশেষভাবে অনুসন্ধান করলেই বোঝা যায় যে শব্দের সঙ্গে তিনটি জিনিস বিশেষভাবে জড়িত; একটি হ'ল শব্দের উৎস, দ্বিতীয়টি হ'ল শব্দের প্রসারণ, তৃতীয়টি হ'ল আমাদের কান—যা দিয়ে শব্দকে অনুভব করা হয়। একভাবে দেখতে গেলে আমাদের সব ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কান হ'ল সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়। শত শব্দের মধ্যে কান একটি বিশেষ শব্দকে বেছে নিতে পারে। অসংখ্য যন্ত্রের ঝনঝনার মধ্যে প্রত্যেকটি যন্ত্রের সুর আমাদের কানে আলাদাভাবে ধরা পড়ে। শব্দের উৎসের বৈশিষ্ট্য এবং দূরত্ব সম্পর্কে ধারণাও কান সহজেই আমাদের এনে দেয়। শব্দের এই গুণগুলি আমাদের কাছে এমনিতে সহজ ও সাধারণ বলেই মনে হয়, কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানের অশেষ উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও শব্দকে ধরার জন্য কানের মত ক্ষমতাসম্পন্ন কোন যন্ত্র আজও আবিষ্কৃত হয় নি। কানের এই গুণাগুণ বুঝতে হ'লে আমাদের শরীরতত্ত্ব এবং বিভিন্ন অনুভূতির গোড়ার কথা জানা প্রয়োজন। এখন পর্যন্ত তা আমাদের পুরোপুরি জানা সম্ভব হয়নি। কিন্তু শব্দের উৎস এবং প্রসারণ সংক্রান্ত সব কথাই জানা গেছে।

দেখা গেছে শব্দ উৎস থেকে গ্রাহকের কাছে পৌঁছাতে সবসময়ে একটি মাধ্যম ব্যবহার করে। সাধারণ অবস্থায় বায়ুই এই মাধ্যমের কাজ করে। খুব সহজ একটি পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে, যদি শব্দের উৎস ও গ্রাহকের মধ্যবর্তী জায়গায় কোন বস্তু না থাকে তাহলে শব্দ গ্রাহকের কাছে পৌঁছাতে পারে না। একটি কাঁচের জারের মধ্যে একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টা রেখে যদি বাজানো যায় তাহলে জারের বাইরে ঘণ্টাটির শব্দ শোনা যায়; কিন্তু জারটিকে পাম্প ব্যবহার করে বায়ুশূন্য করা হ'লে আর বাইরে শব্দ শোনা যায় না। কাজেই ঘণ্টাটি যে শব্দ তৈরী করে তা জারের বায়ুকে আশ্রয় করেই দূরবর্তী জায়াগায় পৌঁছায়। পদার্থ যে কোন অবস্থায়ই শব্দকে প্রসারিত করতে পারে। বায়বীয়, তরল বা কঠিন যে কোন পদার্থই শব্দের মাধ্যম হিসাবে কাজ করতে পারে। তবে শব্দকে প্রসারিত করার কাজে বিভিন্ন পদার্থের ক্ষমতায় তারতম্য আছে। কঠিন পদার্থই শব্দকে খুব সহজে প্রসারিত করতে পারে। তরল পদার্থে প্রসারণের সময় শব্দের জোর খুব কমে যায়। আর বায়বীয় পদার্থে প্রসারণের ক্ষমতা নির্ভর করে তার ঘনত্ব, তাপ-মাত্রা ও চাপের উপরে।

শব্দ উৎস থেকে গ্রাহকের কাছে পৌঁছাতে কিছু সময় নেয়। বিদ্যুৎ চমকাবার সময়ে এটা খুব সহজেই ধরা পড়ে। বিদ্যুৎ চমকালে আলো ও শব্দ একই সময়ে তৈরী হয় কিন্তু আমরা আলো দেখবার অনেক পরে শব্দ শুনতে পাই। কত সময়ের পরে শব্দ গ্রাহকের কাছে পৌঁছাবে তা শব্দের উৎসের দূরত্ব ও মাধ্যমের উপরে নির্ভর করে। শব্দ কোন একটি বিশেষ গতি নিয়ে প্রসারিত হয়; এই গতিবেগ বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের এবং তা নির্ভর করে মাধ্যমের তাপমাত্রা, চাপ এবং আরোও কয়েকটি গুণের উপরে। এথেকে সহজেই প্রমাণিত হয় যে, যখন শব্দসৃষ্টি হয় তখন শব্দের উৎস মাধ্যমে

কোন বিশেষ ধরনের পরিবর্তনের সৃষ্টি করে। এই পরিবর্তন নির্দিষ্ট গতিবেগ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং কানে বায়ুর এই পরিবর্তিত অবস্থাই শব্দের অনুভূতি সৃষ্টি করে।

শব্দ কিভাবে উৎপন্ন হয় তা নিয়ে অনুসন্ধান করলে মাধ্যমে শব্দ-প্রসারণের সময়ে যে পরিবর্তন হয় তা বোঝা যেতে পারে। আমরা কথা বললে, কোন বাদ্যযন্ত্রে আঘাত করলে, কোন ধাতব পদার্থকে হঠাৎ মাটিতে ফেললে, হাততালি দিলে, জোরে বায়ু বইলে, দুটি জিনিসে ঘর্ষণ করলে—এমনি অসংখ্য রকমের ঘটনায় শব্দ উৎপন্ন হয়। এই অসংখ্য ঘটনাগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যখন শব্দের উৎসটি কাঁপতে থাকে তখনই শব্দ সৃষ্ট হয়। এটা সকলেরই সাধারণ অভিজ্ঞতা যে, যখন ধাতব পাত্রে হঠাৎ আঘাত লেগে শব্দ সৃষ্ট হয় তখন পাত্রটিকে হাত দিয়ে ধরে রাখলে শব্দ বন্ধ হ'য়ে যায়। তারের বাদ্যযন্ত্রে যখন শব্দ তৈরী হয় তখন তারটির কম্পন তো চোখেই ধরা পড়ে বা তারটিতে হাত দিয়েও অনুভব করা যায়। কোন জিনিস যদি খুব তাড়াতাড়ি কাঁপতে থাকে তাহলেই শব্দের সৃষ্টি হয়।

বিভিন্ন ধরনের শব্দের যে অনুভূতি আমাদের হয়, বিজ্ঞানের পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, সেগুলি শব্দের উৎসের কম্পনের বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে। এই বিশেষত্বকে তিনটি গুণ দিয়ে পরিমাপ করা হয়। একটি কম্পনের অঙ্ক, অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে উৎসটি কতবার কাঁপে। দ্বিতীয়টি হ'ল কম্পনের বিস্তার, অর্থাৎ সাম্যাবস্থা থেকে উৎসটি কাঁপনের সময়ে দুদিকে কতটা এগিয়ে যায়—তৃতীয়টি হ'ল কম্পনরূপ বা ঠিক কি ভাবে কাঁপছে। কম্পনাঙ্কের তারতম্য আমাদের মোটা বা সরু গলার অনুভূতি আনে। যদি কোন শব্দের কম্পনাঙ্ক খুব বেশী হয় তাহলে সেই শব্দ আমাদের কাছে সরু বলে মনে হয়; আবার কম্পনাঙ্ক যদি কম হয় তাহলে মোটা বলে মনে হয়। কম্পনের বিস্তারের উপরে নির্ভর করে শব্দটি জোরালো কি আস্তে হচ্ছে সেই অনুভূতি। বিস্তার যদি বেশী হয় তাহলে শব্দটি জোরালো মনে হয় এবং যদি কম হয় তাহলে মনে হয় শব্দটি আস্তে হচ্ছে। কম্পনরূপের উপর নির্ভর করে কোন শব্দের নিজস্বতা। একই কম্পনাঙ্কের এবং একই বিস্তারের যদি দুটি শব্দের কম্পনরূপ আলাদা হয় তাহলে শব্দ দুটি বিভিন্ন বলে মনে হয়। এই কারণেই বিভিন্ন বাদ্য-যন্ত্রের একই রকম জোরাল একই সুর আলাদা বলে মনে হয়। যখন "সা" সেতারে এবং বেহালায় বাজানো হয় তখন কম্পনাঙ্ক একই থাকে কিন্তু সেতারের সা ঠিক বেহালার সা-র মত শোনায় না।

শব্দের উৎসের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, উৎসের বিভিন্ন ধরনের কম্পন থেকেই শব্দের বিচিত্রতা আসে। আমরা যখন শব্দ শুনি তখন বায়ুই এই কম্পন আমাদের কানে পৌঁছে দেয়। উৎসটিকে ঘিরে থাকে বায়ু এবং কম্পনের সময়ে বায়ুর অণুগুলিতে ধাক্কা লাগে। এই ধাক্কার ফলে বায়ুর অণুগুলিও কাঁপতে আরম্ভ করে এবং বায়ুর ঘনত্ব পবিবর্তিত হয়। ঘনত্বের পরিবর্তন বায়ুতে তরঙ্গের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক যেমন কোন পুকুরে ঢিল ছুড়লে পুকুরের জলের সব অণুগুলি ওঠা-নামা আরম্ভ করে এবং তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। জলের তরঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় জল যেন তরঙ্গের কেন্দ্র থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, আসলে এটা আমাদের দৃষ্টিভ্রম। জল ছড়িয়ে পড়ে না, শুধুমাত্র অণুগুলির ওঠানামাই ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের ছোটবেলার ঢিল ছুড়ে তরঙ্গ সৃষ্টি করে ভাসান নৌকাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা থেকেই এই উক্তির

সত্যতা বোঝা যায়। জলের তরঙ্গের মতই শব্দের উৎস যখন বায়ুতে শব্দতরঙ্গ তৈরী করে তখন বায়ুর অণুগুলিতে উৎস থেকে কাঁপন সঞ্চারিত হয় এবং অণু থেকে অণুতে এই কাঁপন ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের কানে অণুগুলির কাঁপনের ধাক্কাই শব্দানুভূতির সৃষ্টি করে।

দেখা যাচ্ছে যে বস্তুর কম্পমান অবস্থা সম্পর্কে আমাদের অনুভূতিই হ'ল শব্দ। যদি কোন বস্তু গতিশীল হয় তাহলে বস্তুটির গতিজনিত শক্তি থাকে। অন্যান্য সব শক্তির মতই এই গতিজনিত শক্তি থেকে আমরা কাজ পেতে পারি। বায়ুচালিত যন্ত্রে গতিশীল বায়ু ব্যবহার করে যন্ত্র চালানো হয়। যন্ত্রের চাকা বায়ুর ধাক্কায় ঘুরতে আরম্ভ করে এবং এই ঘুর্ণমান চাকাটি বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে। জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গতিশীল জলধারার শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। এ দুটি ক্ষেত্রে বায়ু বা জলধারার গতিবেগ সবসময়ে একই দিকে থাকে। কিন্তু গতির দিক যদি সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, যেমন হয় কম্পমান জিনিসের গতিতে, তাহলেও বস্তুটির এমনি শক্তি থাকে। খুব সহজ উদাহরণ দিয়ে কম্পমান বস্তুর শক্তি প্রমাণ করা যায় না—কিন্তু যদি ভাবা যায় যে কোন বস্তুকে কম্পমান করতে হ'লে শক্তি ব্যয় করতে হয় এবং মনে রাখা যায় যে শক্তির মোট পরিমাণ ধ্রুব, তাহলেই বোঝা যায় কম্পমান অবস্থায় বস্তুটিতে শক্তি থাকবে। অঙ্ক কষে প্রমাণ করা যায় যে বস্তুর গতিজনিত শক্তি গতিবেগের বর্গের সমানুপাতিক। কাজেই গতিবেগের দিক পরিবর্তন করলে শক্তি একই থাকে। এ থেকে করা যায় যে কম্পমান বস্তুর শক্তি সাধারণভাবে সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হবে কেননা কম্পমান বস্তুর গতিবেগের পরিমাণ পরিবর্তিত হয় কিন্তু কম্পমান বস্তুর গড়ে একটি শক্তি থাকবে। একটি বিশেষ ধরনের যন্ত্র, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'র‍্যালে ডিস্ক', ব্যবহার করে অধ্যাপক র‍্যালে কম্পমান বস্তুর শক্তিও অন্যান্য শক্তির মতই বিশেষভাবে প্রমাণ করেন। র‍্যালে ডিস্কের উপরে যখন শব্দ করা হয় তখন ডিস্কটি ঘুরতে থাকে যেমন বায়ুচালিত যন্ত্রের চাকা হাওয়ায় ঘোরে। বর্তমানে আরো অনেক নূতন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলিতে কম্পমান বস্তু বা বায়ুতে শব্দের শক্তিকে সোজাসুজি বিভিন্ন কাজে লাগানো হচ্ছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অতিশব্দ (Ultrasonic) ব্যবহারকারী যন্ত্রগুলি। যদিও বায়ুতে কম্পন হ'লেই শব্দ উৎপন্ন হয় কিন্তু আমাদের কানের ক্ষমতা সীমিত হওয়ার ফলে শুধুমাত্র কম্পনাঙ্ক প্রতি সেকেণ্ডে ২০ থেকে ১৫,০০০ হাজারের মধ্যে হ'লেই আমাদের শব্দের অনুভূতি আসে। কম্পনাঙ্ক এর কম বা বেশী হ'লে আমরা সে কম্পনকে অনুভব করতে পারি না। যদি বায়ুর কম্পন এমনি হয় যে কম্পনাঙ্ক পনের হাজারের বেশী তাহলে এই কম্পনকে অতিশব্দ বলা হয় কেননা এই কম্পন আমাদের শুনতে পাওয়া শব্দের মতই, কিন্তু কম্পনাঙ্ক সে শব্দের চেয়ে বেশী। এমনি অতিশব্দ ব্যবহার করে আজকাল কাচ বা অন্যান্য ভঙ্গুর জিনিস কাটা হচ্ছে ঠিক যেমন বিভিন্ন ধাতুর জিনিস ধারালো যন্ত্র দিয়ে কাটা হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে শব্দ হ'ল শক্তির এক ধরনের প্রকাশ। এই শক্তি বস্তুকে আশ্রয় করেই প্রকাশিত হয়। একভাবে বলা যেতে পারে কম্পমান বস্তুর শক্তিই হ'ল শব্দ এবং এই শক্তি আমাদের কানে এসে পৌছালে আমরা শব্দকে অনুভব করি। আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে জিহ্বা ও নাসিকা সোজাসুজি বস্তুকে অনুভব করে। আর কান অনুভব করে এক ধরনের বস্তুআশ্রয়ী শক্তিকে। অপর দুটি ইন্দ্রিয় অনুভব করে বস্তুনিরপেক্ষ শক্তি আলো ও তাপকে।

রাজস্থানের মেলা উৎসব ও ব্রত পার্বণ

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

আনুষ্ঠানিক বার ব্রত পার্বণ সব দেশেই সব জাতেই চিরদিন আছে; পুরানো ধারাটি থাকে আবার বদল হয়। নতুন ধারা আসে, পুরোনোকে বদলায়, নতুন রূপ দেয়, তবু একটি ধারা থেকেই যায়

সব দেশের মত রাজস্থানেও নানা ধারার নানা শাখাপ্রশাখায় মানুষের উৎসব পার্বণ ছিল। এখনো আছে যদিও রাজতন্ত্র উঠে যাবার পর মেলায় জৌলুষ উৎসব আর তেমন নেই।

এই সব মেলা পার্বণ উৎসবের কিছুটা বার ব্রত পার্বণ পর্যায়ে; কিছু শুধু ব্রত, কিছু শুধু পার্বণ উৎসব, কিছু তার শুধু পূজা পার্বণের অঙ্গ মন্দির-দেবালয়ে; আবার তার কতকগুলি মেলা পার্বণ ব্রত একেবারে সর্বভারতীয়। যেমন বছরের প্রথম থেকেই ধরি জন্মাষ্টমী। এটি একেবারে সর্বভারতীয় পূজা পার্বণ ব্রত পালন ব্যাপারের অঙ্গ এতে মেলা সেই, উৎসবও সেই, জনসাধারণের একেবারে মন্দির-দেবালয়ের ব্রত পার্বণ অনুষ্ঠান। পূজা উপবাস হল প্রধান অঙ্গ। এমনি হল পরবর্তী একটি সমস্ত ভারতের পার্বণ উৎসব—অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ উত্তরদক্ষিণ পূর্বপশ্চিম সভ্য নগরবাসী গ্রামীণ আদিবাসী সকলের উৎসব—এ হল দেওয়ালী।

দীপাবলী। দীপান্বিতা কার্তিকী অমাবস্যা। এটি একেবারে উৎসব পার্বণ মেলা কালীপূজা লক্ষ্মীপূজা ব্রত—সব মিশানো পার্বণ।

এই দেওয়ালীতে সাধারণ ঘরে ঘরে দীপমালা দান ছাড়াও লক্ষ্মীপূজা, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে গজলক্ষ্মীপূজা, পরিজনদের মিষ্টান্ন খাওয়ানো পাঠানো, বিজয়াদশমীর মত আমাদের; নতুন কাপড় দেওয়া, তত্ত্ব করা আপনজনদের; বাড়ী পরিষ্কার করা, রং করা, চুনকাম করাও হল দেওয়ালীর একটা বিশেষ কাজ। সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বছর দেওয়ালীর আগের ত্রয়োদশীতে ধনতেরস্ (ধনত্রয়োদশী) বাসনপত্র আনুষ্ঠানিক ভাবে কেনা হয়; রাজস্থানে বম্বে-গুজরাটে বিশেষ করে কিছু না হলে একটি চামচও কেনা চাই। ধনতেরসের পরদিন হয় ভূতচতুর্দশী সেদিন হল আমাদের দেশের 'চোদ্দ প্রদীপ'-দান, 'চোদ্দ শাক'-ভক্ষণ; উত্তরপশ্চিম ভারতে হল ছোট 'দেওয়ালী'; তার পরদিন ওদেশে এদেশে মহালক্ষ্মী মহাকালী পূজার অমাবস্যা। সেদিন আমাদের হল কালীপূজা তো বটেই, লক্ষ্মীপূজার সঙ্গে অলক্ষ্মী-বিদায়। তারপর দিনটি হল রাজস্থানের 'দ্যুত' প্রতিপদ (জুয়াখেলা অবাধে) এবং গোবর্ধনের মেলা উৎসব। শ্রীকৃষ্ণের গিরিগোবর্ধন-ধারণ মেলার উৎসব আবার সঙ্গে রাজ্যের যত গোধন বলীবর্দ আছে সকলের অর্চনা—শিং রঙিয়ে দেওয়া লাল নীল রঙে, ক্ষুর ধুইয়ে দেওয়া, খাবার দেওয়া বিশেষ করে।

এর পরবর্তী সর্বভারতীয় উৎসব ও মেলা হল হোলী। আমাদের দেশে দোলবিহার, ফাগুয়া বা হোলী পাঞ্জাবে উত্তরপ্রদেশে রাজস্থানে মাদ্রাজে, গুজরাট বম্বে মধ্যপ্রদেশ উড়িষ্যা—প্রায় সব দেশেই হোলী বা দোল একই রকমের রঙের আনন্দের উৎসব;

আবার মন্দিরেও দেবতারও হোলী বা ফাল্গুনী পূর্ণিমার বসন্তোৎসব অভ্র-আবীরে রঙীন।

বছরের শেষ উৎসব ও পার্বণ ব্রত—এও সারা ভারতের ব্রত ও পার্বণ; মেলা ঠিক নয়—এ হল শ্রীশ্রীরামনবমী।

এইবার পাঁচটি বড় পার্বণ ও উৎসব আমাদের হিন্দু সকলেরই প্রায় এক এবং একই রকমের। পূজা পাঠ, ব্রত উপবাস, খাওয়ানো, তত্ত্ব করা, তত্ত্ব পাঠানো, আর হোলীতে উন্মত্ত রং খেলা এসব সব প্রদেশেই সকলে করেন। মেয়েরা করেন স্নান দান উপবাস ব্রতপালন, পূজা-অর্চনা। পুরুষরাও ব্রত করেন, কম অবশ্য। আর সকলে করে উৎসবের হৈ হৈ আনন্দ প্রমোদ, যেমন হোলীর দিন, দেওয়ালীর দিন। মোটামুটি শাস্ত্র-আচার মেনে বা না মেনে এই কয়েকটি পূজাপার্বণে আমরা সমস্ত ভারতবাসী একেবারে এক জাতি ও এক ভাবময়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চার বর্ণেরই উৎসব এক। মনে হয় 'চার আশ্রমী' বালক যুবক প্রৌঢ় বৃদ্ধরাও এ উৎসবে মিশে যান, নিতান্ত সন্ন্যাসী দণ্ডী না হলে।

এখন বলি রাজস্থানের ছোটখাটো এবং বড় বড় উৎসব-পার্বণের কিছু কথা, যা সেকালে—মানে ৬০।৭০ বছর আগের কালে ছিল, এখনো কিছু আছে, কিন্তু প্রায় নেই; রাজা-মহারাজের রাজত্ব উচ্ছেদের পর থেকে প্রায় উঠে গেছে।

'কাল'কে এই একপুরুষের নিমেষের মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না। 'কাল' 'মহাকালে'র গতিপথ কারুর জানা নেই। তবু যেন কোন খানে মানুষের মনে 'পুরোনো'র উপর হারানোর উপর একটু মোহময় মমতা থেকে যায়। তাই থেকে জন্ম নেয় ইতিহাস ও সেকালের কথা এবং পুরোনো কথা। হস্তিনাপুর বা দিল্লীর পুরোনো ধ্বংসাবশেষ, কোণারকের মন্দির-দেউল, কিংবা অজন্তা-ইলোরার মূর্তি-চিত্রাবলীর মত এই সব প্রথায় ও ঐতিহ্যে এক মোহ ও মহিমময় রূপ আছে।

রাজস্থানের সব প্রদেশের মধ্যে জয়পুর ও উদয়পুর বা মেবার দেশের উৎসবগুলোই বেশী প্রচলিত। যোধপুর মাড়োয়ার জশলমীর বিকানীর এগুলি প্রসিদ্ধ জায়গা হলেও সেসব জায়গায়ও বড় উৎসবে প্রায় ভেদ নেই, ছোটোখাটো আনুষ্ঠানিক বিধিনিষেধ থাকলেও।

জয়পুরে বছরের প্রথম উৎসব-মেলা হল বৈশাখ মাসে নৃসিংহ-চতুর্দশীতে 'নরসিংহের মেলা'।

নৃসিংহ মেলাটাই হল হিরণ্যকশিপুবধ নৃসিংহ অবতারের। প্রতি মেলারই বিশেষ বিশেষ অঙ্গ আছে; সওয়ারী বেরুলো মানে শোভাযাত্রা করে রাজকীয় চতুরঙ্গবাহিনী হাতী ঘোড়া (উট) রথ পদাতিক সৈন্য সমারোহে সাজিয়ে (কখনো কুচকাওয়াজ করতে করতে) বেরুলো। বিশেষ বিশেষ মেলায় তার বিশেষ অঙ্গ হল কোনোটিতে দেবীদর্শন, রাজদর্শন ও যুদ্ধযাত্রায় অভিনয় নানারকম।

নৃসিংহ মেলায় কিন্তু ঐ শোভাযাত্রাটা হত না। এটি যেন একটা 'যাত্রা'র মত। সহরের মাঝখানে এক চওড়া পথের ওপর একপাশে একটি প্রকাণ্ড বাঁধানো জায়গায় একটি মঞ্চ করে আসর হত। সাদা চাদর পাতা বিরাট আসর। তার একপাশে একটি কাগজের তৈরী মোটা মোটা স্তম্ভ বা থাম। তার কাছাকাছি ঝকমকে একটি চেয়ার পাতা। সেটি হল দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সিংহাসনের প্রতীক আসন। সেই সিংহাসনে রাজপুত রাজাদের মত চৌগোঁপ্পা গালপাট্টা বাঁধা

জরীদার জাঁকজমকালো পোষাক ও গহনা পরা মাথায় পাগড়ী মুকুট শোভিত মহারাজা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু সমাসীন থাকতেন।

তাঁর পাশে প্রহ্লাদরূপী একটি ক্ষুদ্র রোগা টিঙ্‌টিঙে বালক দাঁড়িয়ে। তার কাছাকাছি তার গুরুমশাইরা—প্রসিদ্ধ ষণ্ড ও অমর্ক বসে। কিছু সেপাইসান্ত্রী ও চোপদার 'নকীব' রাজসভায় উপযোগী ভাবে দাঁড়াত।

আর রাস্তার এদিকে ওদিকে সর্বত্র আলো ফুল বাঁশী পুতুল খেলনার বাজার রঙে উজ্জ্বল ঝলমল, শব্দে মুখর হয়ে থাকত।

চারদিকের বাড়ীর ছাত প্রাঙ্গণ পথের ফুটপাথ লোকে লোকারণ্য এবং সে-দেশীয় প্রথায় মেয়েদের মাঙ্গলিক গানে মুখর।

সেই মঞ্চ ও মণ্ডপ দর্শকে ভরা। তার মাঝে আমরা, বহু ছোট বড় বালকবালিকা সমবেত হতাম।

সভাটি জমজমাট দর্শক ও অভিনেতাদের নিয়ে। আর চতুর্দিকের ছাতে সিঁড়িপথে রকে বাজারে তিলধারণের জায়গা নেই বল্লেই ঠিক হয়। গ্রাম-গ্রামান্তরের লোকও এসে সহরের মেলায় জড় হয়েছে। ঘাগরা লুগড়ী (ওড়না) ভারি ভারি গহনা পরা ঘোর ফিকে লাল সবুজ নীল রঙের বসনে সজ্জিত মেয়েরা ঘোমটা দিয়ে তারস্বরে শ্রীকৃষ্ণের লীলাসঙ্গীত গানে মেলা মুখর করে রাখত।

হেনকালে সন্ধ্যার ঘোর ঘোর সময়ে নকীবের ভেঁছ বা বাঁশী বেজে উঠত ভোঁ ভোঁ করে – যাত্রা বা মেলার আরম্ভ হওয়ার নির্দেশ। আর হিরণ্যকশিপুর ক্ষুদ্র নকল রাজসভাটি তৎপর হয়ে উঠত।

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু নানা প্রশ্নোত্তরের পর ক্রন্দনরত ভীত বালক প্রহ্লাদকে স-গর্জনে জিজ্ঞাসা করতেন, 'কোথায় তোর হরি? কোথায় সেই কৃষ্ণ? দেখাতে পারিস? কোথায় থাকে সে?' (তাঁর ভাইয়ের বধকারী শত্রু!)

প্রহ্লাদ জবাব দিচ্ছেন, 'তিনি সর্বত্র আছেন।' যদিও গলার স্বর শোনা যায় না—বালক অভিনেতার। কিন্তু প্রতি বছর দেখা এবং আবাল্য শোনা গল্প ছোট বড় কারুরই বুঝতে বাধা হয় না।

হিরণ্যকশিপু আবার গর্জন করেন, 'এখানে আছে সে? এই থামের মধ্যে?'

প্রহ্লাদ বলেন, 'আছেন।'

এবারে নাটকীয় ভাবে হিরণ্যকশিপু তাঁর তরোয়াল কোশমুক্ত করে থামের ওপর আঘাত করলেন।

কাগজের থাম ছিঁড়ে পড়ল।

আর দর্শক-এর শিশুসংঘ সভয়ে আচম্বিতে দেখল থামের ভিতর থেকে সোনালী ও রূপালী কেশরওয়ালা একটি সিংহ গর্জন করতে করতে বেরিয়ে দুই বাহু আস্ফালন করতে করতে হুঙ্কার দিয়ে হিরণ্যকশিপুকে ধরে নিয়ে কোলের ওপর ফেলে তাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে দিল তাঁরই সিংহাসনে বসে। যদিও এদিকে সিংহের কেশরের জামার নিচের দিকটাতে চুড়ীদার পাজামা-পরা দুটি মানুষের পা দেখা যাচ্ছিল। তবু একে সন্ধ্যা, তাতে সিংহের ভয়াবহ গর্জন ও আকার হুঙ্কার দেখে শুনে সমবেত আমরা ছোটরা তখন ত্রস্ত। তারপর সুরু হত প্রহ্লাদের স্তব-স্তুতি। এবং জনতার জয় জয় রব হৈ হৈতে মেলাভঙ্গ।

এই হল বছরের প্রথম মেলা। এতে 'লওয়াজমা' 'সওয়ারী' (শোভাযাত্রা) রাজদর্শন ব্যাপারটা থাকত না। মেলার পথ তখন অন্ধকার, বিদ্যুৎহীন সেকালে। মিটমিটে আলোয় লোকে পুতুল, খাবার ও অন্যজিনিস কিনছে। পথে অবশ্য গ্যাসের আলো জ্বলত।

বৈশাখ মাসে এর পরে মেলার উৎসব না থাকলেও দেবালয়ে গোবিন্দজী, গোপীনাথজী মদনমোহনের ছোট বড় সব দেবালয়ে সারামাস-ব্যাপী উৎসব ফুল-সাজের।

গোবিন্দজীর 'ফুল বাংলা', অর্থাৎ 'পুষ্প-গৃহ' বা 'কুঞ্জালয়' রচনা, সারাটি মন্দির ফুলেফুলে সাজানো সেদিন। ফুলশিঙার হল (ফুল-শৃঙ্গার) শুধু বিগ্রহকে ফুলসাজে সাজানো। রত্নবেদী থেকে দেওয়ালের গা, সিংহাসনের সমস্ত অপূর্ব সুন্দর ফুলের কারুকাজ করা হয়, প্রায় সাদা ফুলে ডাকের চকচকে রঙীন কাগজ দিয়ে লাল নীল সবুজ সাদার ফুলকাজ। কখনো কখনো কোনো শ্রেষ্ঠী, শ্রেষ্ঠ শেঠ ধনীরাও এই 'ফুলশিঙার' ফুল বাংলা উৎসব করেন দেবতার। মন্দিরকর্তৃপক্ষদের তরফ থেকে সাধারণতঃ একদিনই হয়। মহারাজার তরফ থেকেও একদিন হয়। সেদিন সমস্ত মন্দিরের বাইরেও ফুলসাজ হত। একবার কোন শেঠ শুধু গোলাপফুলের 'শৃঙ্গার-বেশ' দেন দেবতার; সে এক অপূর্ব শোভা দেখেছিলাম। কবে বাল্যকালে, তবু মনে আঁকা আছে।

বৈশাখমাস ভোর দেবতাদের 'ঝারা' 'শীতল' বৈশাখী উৎসবও থাকে। তার সঙ্গে আর একটি উৎসব থাকে অক্ষয় তৃতীয়ায়। রাজস্থানে বলে 'আখাতীজ'। অক্ষয় দান পুণ্যের ব্রত নিয়ম এটি; জলদান, ব্রাহ্মণদের অন্নদান, ধনদান—নানাব্রতময় এটি। এইদিনে রাজকীয় কোষাগারের কিছু 'মোহর'কে রূপান্তরিত করা হত আরো চাপ দিয়ে চেপ্টে পাতলা করে। সেই মোহর দিয়ে সেদিন রাজারানীদের 'নজর' করার প্রথাও ছিল। ঐ তিথিতে বিশেষ একটি পুণ্যতিথির দরবার বসত।

এরপর জ্যৈষ্ঠ মাস। এ মাসে মেলা নেই, পার্বণ উৎসব কিন্তু মন্দিরে দেবালয়ে আছে—'জলযাত্রা'। অর্থাৎ স্নানযাত্রারই মত দেবতার স্নানাঙ্গ উৎসব। কিন্তু এদেশে বা জগন্নাথধামে ও অন্যত্র স্নানযাত্রা একদিন মাত্র হয়, আর অন্য রকমের অঙ্গরাগময় স্নানের উৎসব।

এ হয় বৈশাখ সংক্রান্তি থেকে একাদশী, দুটি পূর্ণিমা নিয়ে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি অবধি। একটু অন্য ধরনের এ স্নান—শীতল উৎসব। গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন সকলেরই মন্দিরের মাঝখানে ছোট ছোট ফোয়ারার মুখ আছে। মেঝের নীচে জলাধার, সেই আটদশটি ফোয়ারার মুখ খুলে দেওয়া হয়। বেলা বারোটা-একটা থেকে তিন-চারটে অবধি সেই ফোয়ারার জলে বিগ্রহ সিক্ত ও শীতল হন। সামনের দর্শকদের সর্বাঙ্গ ভিজে যায়, সামনের প্রাঙ্গণ জলে থৈ থৈ করে। পুরোহিত-পূজারীরাও সিক্ত বস্ত্রে মালা চন্দন তুলসী বিতরণ করেন। তারপর ফোয়ারার মুখ বন্ধ করে দেবতার সিক্তবাস বদলে আরতি—গোধুলি-আরতি হয়। প্রায় সারাদিনের 'জলযাত্রা' ঐ পাঁচ দিন হয়। কখনো রাজকীয় বিশেষ বিশেষ দিনে আবার বাইরের প্রাঙ্গণের বাগানের ফোয়ারাগুলিও খোলা হয়। উত্তর-ভারতের দুর্ধর্ষ গরমের দিন। মানুষ জীবজন্তু ময়ুর পায়রা পাখীদেরও যেন জলে ভেজার আনন্দের পর্ব পার্বণ হয় সেদিন। দেবতার ফোয়ারায় জলে ভিতরে ভিজে বসে থাকে। বাইরেও তেমনি লোক জড় হয়।

আষাঢ় মাসের রথযাত্রা উৎসব কিন্তু গোবিন্দজীর দেশে নেই। গোবিন্দজী গোপী-নাথজী বাংলাদেশে জগন্নাথের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। তাই রথযাত্রা এদিকে বাংলার সর্বত্র আছে। যদিও মন্দিরের গোবিন্দজী মন্দিরেই থাকেন নানানামে, কিন্তু জগন্নাথরূপে মূর্তিতে

তাঁকে রথযাত্রা করতেই হয় এদেশে। এই রথযাত্রাটি কিন্তু মনে হয় দক্ষিণের ও উৎকলের থেকে নেওয়া।

শ্রাবণে এসে পড়ে ঝুলন উৎসব। কোনো মন্দিরে পাঁচ দিন, কোথাও দশ দিন, কোথাও পনের দিন ধরে শ্রীরাধা-গোবিন্দজীর ঝুলন উৎসব। দোলনা করে মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহের দোলায় ঝুলনের উৎসব হয়। অবশ্য বিশ্বম্ভর-তনু 'বিগ্রহ' সিংহাসনপীঠেই সমাসীন থাকেন শ্রীরাধা-সহ। চারদিকের বেদীটি একটি রূপার ঝুলন আকারের ঘেরা বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। উপরে থাকে দোলনার ডাণ্ডীটি। চার দিকে চারটি রূপার দণ্ড। সেইটিই নেড়ে দেন পুরোহিত-পূজারীরা—ঠিক মনে হয় বিগ্রহ ঝুলনে বসে দুলছেন। নড়ে শুধু বেষ্টনীটি।

এ তো গেল মন্দিরের উৎসবপ্রথা। দেশে কিন্তু শ্রাবণ-ভাদ্র সারামাস ঘরে ঘরে বনে বাগানে ছাতে দোলনা টাঙানো—আর তাতে দোলার ধুম পড়ে যায়। গাছে গাছে পথের ধারে দোলনা টাঙানো—'পাটকড়ি' নিয়ে আবাল-বৃদ্ধবনিতার দল জমে। বুড়া-বুড়ীদেরও দোলার শখ কম নয় সেদেশে। যত গান চলে—ঝুলনসঙ্গীত, কাজরীসঙ্গীত, মেঘের আহ্বান, তত সারাদিন 'দোলা' চলে। 'দোলনা' আর খালি থাকে না। যেখানে শক্ত গাছে ডাল সেখানেই ঝুলা।

এ ছাড়া এই শ্রাবণী ঝুলন পূর্ণিমার আর একটি নাম আছে রাখী পূর্ণিমা।

এই রাখী পূর্ণিমারও খুব মহৎ ও গভীর একটি ঐতিহ্য আছে। সমস্ত রাজস্থানে 'রাখী' যেন একটি বন্ধুত্বের প্রীতির শরণাগতির নির্ভরতার প্রতীকোৎসব-পূর্ণিমা, রাজোয়াড়ার সমস্ত শ্রেণীর মানুষের হৃদয়ে। এই রাখীবন্ধন পূর্ণিমার একটি নিজস্ব মহিমময় গভীর ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিতময় ভাব আছে। রক্ষাবন্ধন থেকে 'রাখী'বন্ধন কথাটি হয়েছে। রাজস্থানে গল্প আছে দুর্বাসা মুনির সময়ে এর প্রচলন হয়। তাতে জাতিধর্ম নরনারী নির্বিশেষে বন্ধুত্বের বন্ধন, ধর্মবন্ধন, কল্যাণ-বন্ধন, শরণাগতির বন্ধনের সুগভীর সুবিস্তৃত নিষ্ঠাময় আশ্চর্য পবিত্র মহিমময় ক্ষেত্র থাকে। অজানা অন্তঃপুরিকা অচেনা নরনারী একনিমেষে একটি সুতোর রাঙা রাখী পাঠিয়ে চিরকালের ভাইবোনের সম্পর্কের বন্ধন গ্রহণ ও বরণ করে নিতে পারেন। হয়ত চিরকালই দেখা চেনা পরিচয় হল না। ঐ পাতানো ভাইবোন সম্পর্কের দুটি মানুষে কিন্তু একটি সুগভীর স্নেহ, শ্রদ্ধাময় সম্পর্ক ও বিশ্বস্ত প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়ে গেল।

এ রাখীবন্ধন বহুকালের প্রথা। একই ভাবে আছে, কিন্তু এ বন্ধন যে কত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের বন্ধন, সব সম্প্রদায় ধর্ম জাতি নির্বিশেষে, তারও ইতিহাস ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়।

চিতোরের মহারানা সঙ্গ—সংগ্রামসিংহের বিধবা মহারানী রাজমাতা কর্ণাবতী (করুণাবতী) এক সময়ে মাণ্ডু আর গুর্জর প্রদেশের সুলতান বাহাদুর দ্বারা চিতোর আক্রান্ত হলে হুমায়ুন বাদশাকে মণিমুক্তাখচিত একটি রাখী পাঠান —'রাখী-ভাই'রূপে বরণ করে। হুমায়ুন তখন বাঙলাদেশে বিজয়যাত্রায় বেরিয়েছেন।

এই রাজপুত রাখীবন্ধনের এমনি মহিমান্বিত খ্যাতি ও প্রভাব ছিল, মুসলমান সম্রাটের কাছেও, যে তিনি তখনি বাংলার দিক থেকে ফিরে এলেন; আর অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম করে বললেন ব্রাহ্মণ দূত ও অন্য সাঙ্গোপাঙ্গোদের, 'এই রাজপুত-ভগিনীর রক্ষার জন্য আমার সব ঐশ্বর্য রথম্ভর দুর্গ পর্যন্ত উৎসর্গ করতে পারি।'

ফিরে তিনি এলেনও বটে, গুর্জর সুলতান বাহাদুরশাকে পরাজিতও করলেন; কিন্তু মহারানী রাজমাতা কর্ণাবতী তখন আর বেঁচে ছিলেন না। তেরো হাজার অন্তঃপুরবাসিনী পরিজন সপত্নী সখী সহচারিণীদের নিয়ে 'জহরব্রত' করে অগ্নি প্রবেশ করেছিলেন। বিজয়ী শত্রুর কবলে পড়ে লাঞ্ছনা অপমান মর্যাদাহানির আতঙ্কে সেকালের রাজপুত ঘরানার প্রথামত মৃত্যুই কাম্য মনে করেছিলেন।

সম্রাট হুমায়ুন না-দেখা 'শরণাগত রাখী-ভগিনী' রানা-মহিষীর সপরিজনে জহরব্রত পালনে মৃত্যুবরণে খুবই ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হন। কিন্তু রানা সঙ্গের পুত্র মহারানা বিক্রমজিৎকে রাজ্য উদ্ধারে পূর্ণ সহায়তা করেন এবং রাজ্য-উদ্ধারও হয়। আর গুর্জর সুলতান পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন।

'রাখী'বন্ধনের রাখীসম্পর্কের মহিমার এ একটি আশ্চর্য দিক। পুরুষের পৌরুষকে বাড়ায়, চরিত্রের দৃঢ়তা বাড়ায়, ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে, নরনারী নির্বিশেষে। অনেক সময়ে বিপন্ন নারী অথবা কোনো বিবাহে স্বয়ম্বরা হতে ইচ্ছুক মেয়েও এই 'রাখী' পাঠাতেন প্রিয়জনের উদ্দেশে ব্রাহ্মণের হাতে।

আবার এ বন্ধুত্বের নিদর্শন ও প্রীতি যেমন সমান সমান ও অসমান সম্পর্কে, বর্ণবিভেদেও, তেমনি ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদেরও বিশেষ চিহ্ন এটি।

এই রাখীবন্ধনকে এখনো আমাদের ৺বিজয়ার প্রণাম আশীর্বাদ আলিঙ্গনের মত একটি জাতীয় উৎসবের আনন্দময় সম্পর্ক বলে ধরা হয়।

রাখীর গল্প অনেক আছে ছোট বড় সব ঘরেই।

তার মাঝে বলবার মত গল্প—"রাজস্থান"-লেখক তখনকার 'এজেন্ট'-প্রধান রাজপুতানার 'রাজপুত ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস'লেখক শ্রদ্ধেয় টড্ সাহেবের লেখায় পাই।

টড্ বলেন, অনেক রাজপুত মহিলার সঙ্গে তাঁর'রাখী ভাই' সম্পর্ক হয়েছিল। রাজপুত প্রথামত তিনি সেই ভগিনীদের মণিমুক্তা-গাঁথা রাখীগুলি আনন্দিত হয়ে গ্রহণও করতেন আর ওদেশের প্রথামত তিনটি কিংবা পাঁচটি 'মোহর' বোনদের উপহার পাঠাতেন। রানা ভীমসিংহের এক বোন তাঁর 'রাখী'বোন ছিলেন। যতদিন বেঁচেছিলেন প্রতি বছরই তিনি রাখীপূর্ণিমাতে সাহেবকে রাখী পাঠাতেন। এমন তিনচারটি বহুমূল্য রাখী সাহেবের কাছে ছিল। সেগুলি বিলাতে নিয়ে যান। আপনার জন করে নেওয়া সম্ভ্রমে অভিভূত হয়ে এই সম্পর্ক পাতানোর সম্মান ও ঐতিহ্য তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

টড্ বলেন, এই বোনদের চোখে দেখার সুযোগ তাঁর জীবনে হয়নি (হুমায়ুন কর্ণাবতীর মতই), যদিও কখনো কখনো ঐ ভগিনীরা আলাপ আলোচনা করতে বেরুতে, সাক্ষাৎ করতেও চেয়েছেন।

কিন্তু টড্ রাজস্থানের নিয়ম-প্রথাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। নিয়ম অতিক্রম করাটা ঠিক মনে করতেন না। তাই চিরদিনই না-চেনা না-দেখা ভাইবোনের সম্পর্কের মাধুর্যটুকুই বিদেশী-রচিত ইতিহাসেও লেখা রইল। আরেক জায়গায় বলেন, বুঁদীর রানী তখন নাবালক রাজার জননী; বুঁদীরাজ মৃত্যুকালে সন্তান আর রাজ্যের ভার টড্কে দিয়ে যান। এই রাজমাতাও কুলপুরোহিতের হাতে তাঁকে 'রাখী' পাঠান; সেই অবধি তাঁদের মধ্যে রাজকার্যে অন্য পরামর্শে পর্দার আড়াল থেকে নানানকম আলাপ কথাবর্তা

হত। কত সময় রানীমাতা চিঠিপত্রও দিতেন প্রয়োজনমত। কিন্তু চাক্ষুষ অপরিচিতই থেকে যান। (টড্ বলেন, তাঁদের কথাবার্তা চিঠিপত্র বেশ শিক্ষিত সমাজের মতই তাঁর মনে হয়েছে। অবান্তর হলেও এটি উল্লেখযোগ্য)। এই রাখীবন্ধন-সম্পর্ককে মোগল সম্রাট আকবর থেকে সকলেই সম্মান করতেন। এমন কি ঔরঙজেবের উদয়পুরের মহারানা রাজসিংহের রানীকে এই সম্পর্কে লেখা চিঠি পাওয়া যায় রাজস্থানের ইতিহাসে। (ক্রমশঃ)

অশেষ করুণা

শ্রীশান্তশীল দাশ

অশেষ করুণা তোমার ঠাকুর,
বারে বারে তুমি বাঁচাও মোরে ;
যতবার আমি প'ড়ে প'ড়ে যাই,
ততবার তুমি তোল যে ধ'রে।
যখনি ঘনায় গভীর আঁধার,
পথ ভুলে যাই, করি হাহাকার ;
পথের নিশানা তুলে ধরো তুমি,
সব কালো মেঘ যায় যে সরে ;
বারে বারে তুমি বাঁচাও মোরে।
কেউ আছে আর কেউ-বা না থাক,
তুমি আছ যেন একথা কভু
ভুলে নাহি যাই, যত ব্যথা পাই,
যতই আঘাত আসুক প্রভু।
তোমার পরশে সকল বেদনা
ধুয়ে মুছে হবে অমলিন সোনা,
তোমার মূরতি চির সুন্দর
আমায় হৃদয় থাকুক ভ'রে ;
বারে বারে তুমি বাঁচাও মোরে।

বন্যানিয়ন্ত্রণ

অধ্যাপক শ্রীচিরঞ্জীব সরকার

ইতিহাস পর্যলোচনা করলে দেখা যায় যে নগর, জনপদ, শস্যক্ষেত্র ইত্যাদি নদীতীরবর্তী স্থানেই প্রথম গড়ে ওঠে। এর কারণ প্রধানতঃ দুটি। প্রথমতঃ জল মনুষ্যজীবনে এক অপরিহার্য বস্তু এবং নদীতীরবর্তী স্থানে জল সুলভ। দ্বিতীয়তঃ, চলাচলের ও যানবাহনের পক্ষে নদী একটি প্রকৃষ্ট পথ। নদী উহার জলপ্রবাহের সাথে যে পলি বহন করে আনে নদীর নিম্নভাগে (downstream) নদীতীরবর্তী অঞ্চলসমূহে বন্যার সময় তা জমা প'ড়ে ঐ অঞ্চলসমূহকে উর্বর করে তোলে। কিন্তু বন্যা প্রবল আকার ধারণ করলে নগর, শস্যক্ষেত্র ইত্যাদির প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। বহু মনুষ্য এবং গৃহপালিত গবাদি পশুর প্রাণ বিনষ্ট হয়। ব্যাপক বন্যার ফলে বহু কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। অবশ্য কোন অর্থমূল্যেই মনুষ্যজীবনের মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। বন্যার প্রকোপ হতে আত্মরক্ষার জন্য মানবসমাজ নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করেছে। এই প্রসঙ্গে সেই বিভিন্ন উপায়গুলি সংক্ষেপে বর্ণিত হল।

বন্যা ও তার কারণঃ বন্যার সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, যখন ফেনায়িত জলধারা নদীর ভিতর দিয়ে বেগে প্রবাহিত হয়ে দুই কূল ছাপিয়ে পার্শ্ববর্তী নগর, জনপদ, শস্যক্ষেত্র ইত্যাদি প্লাবিত করে তখন তাকে বন্যা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক ভাষায়, কোন প্রবল বর্ষণের পরে নদীতে যে জলধারা প্রবাহিত হয় তাকে বন্যার জলধারা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য, কতখানি জল প্রবাহিত হলে বন্যা বলা চলে তার সঠিক সীমা কিছু নেই।

বন্যার ভয়াবহ ধ্বংসলীলার কথা আমরা প্রায় সকলেই শুনেছি এবং সংবাদপত্রে পাঠ করেছি। অনেকের আবার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও রয়েছে। কয়েক বৎসর পূর্বেও আমাদের দেশে বন্যায় প্রায় প্রতিবৎসরই বহুলোকের এবং গৃহ-পালিত গবাদি পশুর প্রাণ বিনষ্ট হোত। এ ছাড়া বহু কোটি টাকা মূল্যের শস্য এবং ধন-সম্পত্তি নষ্ট হোত। নদীযোজনাসমূহের তৈয়ারির পরে বন্যা এবং তার ধ্বংসলীলা অনেকাংশে কমে গেছে, যদিও এখনও মাঝে মাঝে বন্যার খবর পাওয়া যায়। শুধু আমাদের দেশেই নয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং অন্যান্য দেশেও বন্যার প্রবল ধ্বংসলীলার খবর পাওয়া যেত। অথচ মজার কথা এই যে, কোন নদীর বন্যার দ্বারা ধ্বংসলীলা যতক্ষণ না সাধিত হয়েছে, ততক্ষণ সেই নদীর বন্যানিয়ন্ত্রণের কথা কেউ ভাবেনি।

এখন দেখা যাক বন্যার উৎপত্তি কোথা থেকে এবং কি কি কারণে বন্যার প্রবলতা কম ও বৃদ্ধি হয়। এখানে শুধু বৃষ্টিপাতজনিত বন্যা সম্বন্ধেই আলোচনা করা হবে। এছাড়া বন্যা আরও অনেক কারণে হতে পারে। যথা, প্রবল সাইক্লোন অথবা ভূমিকম্পের জন্য সমুদ্রে প্রবল জলস্ফীতি এবং তৎকারণে সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে এবং নদীতে বন্যা, ইত্যাদি। বৃষ্টি থেকে যে বন্যার উৎপত্তি তার আলোচনাকালে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক শব্দের আলোচনা প্রয়োজন। সেগুলি নিম্নলিখিত আলোচনার মাধ্যমে দেওয়া হোল।

বৃষ্টিধারা যখন আকাশ থেকে পৃথিবী-পৃষ্ঠে নেমে আসে তখন তা নিম্নলিখিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

বৃষ্টিধারার অবতরণকালে এবং পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হবার পরেও একটা অংশ বাষ্প হয়ে আকাশে উড়ে যায়। একে বলে 'ইভাপোরেশন্' (evaporation)। আর একটা অংশ উদ্ভিজ্জাদিতে আটকে যায় এবং মৃত্তিকা স্পর্শ করতে পারে না। এই অংশটিকে বলা হয় 'ইণ্টারসেপ্‌শন্' (interception)। একটি অংশ হ্রদ ও অন্যান্য আবদ্ধ জলাশয়কে পূর্ণ করে। একে বলা হয় 'ডিপ্রেশন্ স্টোরেজ' (depression storage)। এই অংশগুলি বাদে বৃষ্টিধারার যে জল মৃত্তিকাপৃষ্ঠ স্পর্শ করে তার একটি প্রধান অংশ মৃত্তিকার ভিতর প্রবেশ করে। এই অংশটিকে বলা হয় 'ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্' (infiltration)। প্রত্যেক মৃত্তিকার ভিতরে কিছু না কিছু জলকণা (moisture) থাকে। এবং প্রত্যেক মৃত্তিকারই মাধ্যাকর্ষণশক্তির বিরুদ্ধে সর্ব উচ্চ কিছুটা পরিমাণ জলকণা দীর্ঘকাল ধরে রাখবার ক্ষমতা থাকে। এই জলকণার পরিমাণকে ঐ মৃত্তিকার 'ফিল্ড ক্যাপাসিটি' (field capacity) বলে। মৃত্তিকার মধ্যে কোন এক অবস্থায় যে পরিমাণ জলকণা থাকে তা ঐ মৃত্তিকার 'ফিল্ড ক্যাপাসিটি' অপেক্ষা যতখানি কম তাকে ঐ মৃত্তিকার ঐ অবস্থার 'ফিল্ড্ ময়শ্চার ডেফিসিয়েন্সি' (field moisture defficiency) বলা হয়। আবার, মৃত্তিকার ভিতর খনন করে কিছুদূর গেলে দেখা যাবে যে একটা সীমার নীচে মৃত্তিকাকণিকার ভিতরকার ফাঁকগুলি জলকণা দ্বারা পূর্ণ থাকে (saturated)। ঐ জলকণাপূর্ণ মৃত্তিকার সর্ব উচ্চ সীমা বা পৃষ্ঠকে (level) 'ওয়াটার টেব্‌ল্' (water-table) বলে। মৃত্তিকার ভিতরের এই সঞ্চিত জলরাশি থেকেই কূপ, নলকূপ প্রভৃতিতে জল পাওয়া যায়। আবার মৃত্তিকা-ভ্যন্তরস্থ এই সঞ্চিত জলরাশি হতেই জল নদীতেও প্রবাহিত হয় এবং সেই জলপ্রবাহকে নদীর 'বেস্ ফ্লো' (base-flow) বলে। বহু নদীতে (বিশেষ করে যে সব নদীতে সম্বৎসর প্রবাহ থাকে) এই মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ জলপ্রবাহই গ্রীষ্মকালে এবং অন্য শুষ্ক আবহাওয়ার সময় জলপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখে।

বৃষ্টির জলের যে অংশ মৃত্তিকার ভিতর প্রবেশ করে তা প্রথমে মৃত্তিকার 'ফিল্ড্ ময়শ্চার ডেফিসিয়েন্সি' পূর্ণ করে এবং তৎপরে তা 'গ্রাউণ্ড ওয়াটার টেব্‌লে' গিয়ে মিলিত হয়, এবং মৃত্তিকার ভিতরের সঞ্চিত জলরাশির পরিমাণ বৃদ্ধি করে। সর্বোচ্চ যে হারে বৃষ্টির জল মৃত্তিকার ভিতর প্রবেশ করে তাকে ঐ জমির 'ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্ ক্যাপাসিটি' (infiltration capacity) বলে। বৃষ্টিধারার হার যখন জমির 'ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্ ক্যাপাসিটি' অপেক্ষা বেশী হয়, তখন বৃষ্টিধারার বাকী পরিমাণ পৃথিবীপৃষ্ঠের উপরে সঞ্চিত হয় এবং ভূপৃষ্ঠের উপরে প্রবাহিত হয়। এই প্রবাহিত জলধারার নাম 'ওভারল্যাণ্ড্ ফ্লো' (overland flow)। 'ওভারল্যাণ্ড্ ফ্লো' যখন নদীর ভিতরে এসে পড়ে প্রবাহিত হয় তখন তাকে নদীর প্রবাহ বা 'ডিস্‌চার্জ' (discharge) বলে। এই প্রবাহ-এর পরিমাণ মাপবার একক (unit) হোল 'কিউসেক' (cusec.), অর্থাৎ নদীর কোন এক জায়গায় (cross-section) ভিতর দিয়ে যত ঘনফুট জল প্রতি সেকেণ্ডে প্রবাহিত হয় (cubic foot per second)। যন্ত্রদ্বারা এই জলপ্রবাহের পরিমাপ বিভিন্ন উপায়ে করা হয়।

বৃষ্টিপাতের পরে নদীতে যে জলপ্রবাহ আসে তার পরিমাণ নিম্নলিখিত পরিমাপগুলির

উপর নির্ভর করে, যথা, বৃষ্টিপাতের হার, উচ্চ অববাহিকার (catchment-basin) ক্ষেত্রফল, মৃত্তিকার 'ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্ ক্যাপাসিটি' ইত্যাদি। এর মধ্যে উচ্চ অববাহিকার মৃত্তিকার 'ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্ ক্যাপাসিটি'র উপর নদীর জলপ্রবাহ বহুলাংশে নির্ভর করে। যেমন, একই উচ্চ অববাহিকার উপরে একই পরিমাণ বৃষ্টিপাতের হার বিভিন্ন পরিমাণ জলপ্রবাহ সৃষ্টি করতে পারে। বৃষ্টিপাতের পূর্বে কিছুদিন যদি কোন বৃষ্টি না হয়ে থাকে তবে মৃত্তিকা বেশ শুষ্ক থাকে এবং উহার 'ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্ ক্যাপাসিটি' খুব বেশী হয়। অতএব, জলপ্রবাহের পরিমাণ অনেক কমে যায়। 'ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্ ক্যাপাসিটি' জমির উপরিভাগের ঢাল (slope), উদ্ভিজ্জাদির পরিমাণ, উচ্চ অববাহিকার 'ওরিয়েণ্টেশন্' (orientation), বৃষ্টিপাতের সময় জমির শুষ্কতা বা আর্দ্রতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। পূর্বেকার বারিপাতের জন্য মৃত্তিকা যদি জলকণাপূর্ণ থাকে (saturated) এবং উচ্চ অববাহিকার জমির ঢাল বেশী ও উদ্ভিজ্জাদির পরিমাণ কম হয়, তবে উহার 'ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্ ক্যাপাসিটি' খুবই কম হবে। ঐ সময় খুব উচ্চ হারে বারিপাত হলে নদীর জলপ্রবাহ প্রবল আকার ধারণ করে এবং ঐ জলপ্রবাহকে বন্যা আখ্যা দেওয়া হয়।

বন্যানিয়ন্ত্রণ : (১) বাঁধনির্মাণ ও নদীগর্ভ-খনন সহায়ে :

বন্যানিয়ন্ত্রণের উপায় বা পদ্ধতিকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা :

(১) নদীর দুই তীরে সমান্তরাল বাঁধ নির্মাণ, যাতে নদীর জলরাশি দুই কূল প্লাবিত করতে না পারে। এতে নদীর ভিতর প্রবাহিত জলরাশির পরিমাণ কমান হয় না।

(২) নদীর অভ্যন্তরস্থ জলরাশির প্রবাহের পরিমাণ হ্রাস না করে জলপৃষ্ঠের উচ্চতা (level of water-surface) হ্রাস করান, যাতে জলরাশি দুই কূলের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে।

(৩) সেই সকল প্রক্রিয়া যাহা দ্বারা নদী-অভ্যন্তরস্থ জলরাশির পরিমাণ অথবা জলপ্রবাহের হারের পরিমাণ হ্রাস করা যায়। এই প্রক্রিয়াগুলি মোটামুটি দুই প্রকারের। যথা, নদীর উপরে আড়াআড়িভাবে (across the river) বাঁধনির্মাণ ; এবং নদীর উচ্চ অববাহিকার জমির উপরিভাগের প্রকৃতির পরিবর্তন।

উপরোল্লিখিত প্রক্রিয়াগুলির ভিতর প্রথমটি অর্থাৎ নদীর দুই তীরে সমান্তরাল বাঁধনির্মাণ বহুকাল পূর্ব হতে ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে নদীতীরস্থ জনপদ, শস্যক্ষেত্র প্রভৃতিকে বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা করা সম্ভব। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় বহুকাল পরে একটি বিশেষ ত্রুটি দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে সমতলভূমিতে। উল্লেখযোগ্য ত্রুটি এই যে,নদীর দুই তীরে বাঁধ যখন ছিল না, তখন নদীর জল যে সমস্ত পলি বহন করত তার অধিকাংশই বন্যার জলের সাথে গিয়ে নদীতীরবর্তী অঞ্চলসমূহের উপর পড়ে সেই সকল জমিকে উর্বর করে তুলত। এবং বন্যার জল সরে যাবার কালে (during receeding flood) নদীপার্শ্বস্থ জমির উপরিভাগের পলিমুক্ত জল নদীর ভিতর প্রবেশ করে নদীর গর্ভপৃষ্ঠের (river-bed) উপরে বন্যার সময়ে সঞ্চিত পলিরাশি ধুয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু নদীতীরে বাঁধ দেবার ফলে বন্যার জলরাশি নদীতীরস্থ অঞ্চলের উপর প্রসারিত হতে না পারায় জলরাশি দ্বারা বাহিত প্রায় সমস্ত পলিই নদীর গর্ভপৃষ্ঠের উপরে পতিত হয়ে গর্ভপৃষ্ঠকে উঁচু করে তোলে। ফলে, পর পর বৎসরের বন্যার জলপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যায় এবং

পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে উচ্চতর বাঁধের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাঁধের উচ্চতা বাড়াবার একটা সীমা আছে। তাছাড়া তীরবর্তী জমিপৃষ্ঠের উচ্চতা পূর্বে যেমন ছিল তাই থেকে গেছে। অতএব এখন কোথাও বাঁধ ভেঙ্গে গেলে যে বন্যা হবে তা আগের থেকে অনেকগুণ বেশী ক্ষতিকর হবে। বিশেষ করে বাঁধনির্মাণের পরে ঐ সমস্ত স্থানের অধিবাসীদের মনে একটা নির্ভাবনার ভাব এসে যায় এবং তারা তখন আর বন্যা থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত নয়। এবং এখন বন্যার জলপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাবার ফলে জীবনহানির এবং ক্ষতির পরিমাণ বেশী হবার আশঙ্কা থাকে। দ্বিতীয়তঃ, প্রায় সমস্ত পলি নদীর গর্ভপৃষ্ঠে পতিত হবার দরুন গর্ভপৃষ্ঠ ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে এমন হতে পারে যে উহা পার্শ্ববর্তী (নদীতীরবর্তী) জমিপৃষ্ঠ হতে উঁচু। তখন ঐ সমস্ত জমি থেকে বর্ষার জল নিষ্কাশন খুব কষ্টসাধ্য এবং একরূপ অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। একবার এই অবস্থা প্রাপ্ত হলে এ সমস্যার সমাধান অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে নদীর গর্ভপৃষ্ঠ খনন করে গভীর করলে নদীতে জলপৃষ্ঠের উচ্চতা হ্রাস করা যেতে পারে, যাতে বন্যার জলরাশি দুই কূলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অবশ্য এই প্রক্রিয়াদ্বারা নদীতীরবর্তী অল্পদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট স্থানে বন্যানিয়ন্ত্রণই সম্ভব, কারণ নদীর পুরো দৈর্ঘ্যকে এইভাবে খনন করা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ এবং একরূপ অসম্ভবই বলা চলে। আবার অনেক সময়, নদী যদি বাঁকা পথে প্রবাহিত হয়, এবং সেই বাঁকা পথ যদি অশ্বক্ষুরের (horse-shoe bend) আকার ধারণ করে, তবে জলের প্রবাহ পথে ঘর্ষণজনিত বাধা (frictional resistance) বেশী হওয়ায় জলপ্রবাহের গতি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং জলপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যায়। বন্যার সময় জলপৃষ্ঠের উচ্চতা নদীতীরের উচ্চতা অপেক্ষা বেশী হলে বন্যা হয়। এমতাবস্থায় খানিকটা স্থান খনন করে নদীর গতিপথ সোজা করে দিলে বেশীর ভাগ জল এই সোজা পথে প্রবাহিত হবে এবং বক্রপথের তীরবর্তী জমি বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাবে।

আবার, অনেক সময় নদীতীরবর্তী কোন স্থানকে বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা করতে হলে ঐ স্থানের নদীর প্রবাহপথের উচ্চভাগ (upstream) থেকে একটি পৃথক কৃত্রিম খাল (diversion-channel) খনন করে নিম্নভাগের (downstream) প্রবাহপথে কোথাও যোগ করা যেতে পারে, যাতে নদীর জলপ্রবাহ দুইভাগে বিভক্ত হয় এবং নির্দিষ্ট স্থানের পার্শ্ববর্তী নদীপথে জলপ্রবাহের পরিমাণ হ্রাস পায়।

আগেই বলা হয়েছে যে উপরি-উক্ত পদ্ধতিগুলি বন্যার জলরাশির বা জলপ্রবাহের হারের পরিমাণ হ্রাস না করে নদীতীরবর্তী কোন এক স্বল্পদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট এবং বিশেষ অঞ্চলকেই মাত্র বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম। কিন্তু এইসকল প্রক্রিয়া দ্বারা নদীর নিম্নভাগের সমস্ত উপত্যকাতে ব্যাপকভাবে বন্যানিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।

এখন তৃতীয় বিভাগের দুইটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে। এই দুইটি পদ্ধতির মধ্যে প্রথমটি হোল নদীর উচ্চভাগের কোন এক স্থানে নদীর উপর আড়াআড়িভাবে বাঁধ নির্মাণ করে বন্যানিয়ন্ত্রণের পক্ষে কার্যকরী একটি কৃত্রিম জলাধার প্রস্তুত করা। এই কৃত্রিম জলাধারের আয়তন এবং গভীরতা এমনভাবে স্থির করা হয় যাতে বন্যার জলের একটি প্রধান অংশকে

এই জলাধারে আটকে ফেলা যায়। প্রথমে দেখা যাক এই কৃত্রিম জলাধার কিভাবে বন্যা-নিয়ন্ত্রণের কাজ করে। যে বাঁধ এই জলাধার প্রস্তুত করে সেই বাঁধের খানিকটা অংশ এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় যাতে ঐ অংশের উপর এবং ভিতর দিয়ে জলপ্রবাহের পথ থাকে। বাঁধের এই অংশকে 'স্পিল্‌ওয়ে' (spillway) বলে। প্রথমেই হিসাব করে দেখা হয় জলপ্রবাহের হার কি পরিমাণ হলে বাঁধের নিম্নভাগের (downstream) নদীপ্রবাহ-পথে জলরাশি নদীখালের ভিতরে দুই তীরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, অর্থাৎ, বন্যা না ঘটায়। বন্যার সময় 'স্পিল্‌ওয়ের' ভিতর দিয়ে সর্বোচ্চ এই পরিমাণ জলই প্রবাহিত হতে দেওয়া হয় ; আর জলাধারের জলসংরক্ষণের ক্ষমতা এমন হওয়া আবশ্যক যাতে বন্যার বাকী পরিমাণ জল জলাধারের ভিতর আটকে ফেলা যায়, অন্ততঃ সাময়িকভাবে। এইখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে জলাধার, বাঁধ প্রভৃতি নির্মাণ করতে হয় ভবিষ্যতের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে, অর্থাৎ ভবিষ্যতে বন্যার জলপ্রবাহের হার কি পরিমাণ হতে পারে তা নির্দিষ্ট করে। কতদূর ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে বন্যার সর্বোচ্চ জলপ্রবাহের হারের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হবে তা নির্ভর করে নদীপ্রকল্পের আর্থিক সঙ্গতির উপর এবং বন্যা নিরোধ করে যে পরিমাণ সম্পত্তি ইত্যাদি রক্ষা করা হবে তার মূল্যের উপর। এই ভবিষ্যৎ ১০০ বৎসর, ২০০ বৎসর অথবা হাজার বৎসরও হতে পারে। সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে একশত, দুইশত বা সহস্র বৎসরে সর্বোচ্চ কি পরিমাণ বন্যার জলপ্রবাহের হার হবে তা দেখা হয়। ইহাকে বলা হয় শত বা সহস্র বৎসরে একবার বন্যা (once in hundred or thousand year flood)। এই সংজ্ঞা থেকে স্বভাবতঃই মনে হতে পারে যে, এই বৎসর যদি এইরূপ বন্যা একবার হয় তবে আর একবার ঐ পরিমাণ বন্যা একমাত্র একশত বৎসর পরেই হওয়া সম্ভব। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। সঠিক ধারণা এই যে প্রতি বৎসরই ঐ পরিমাণ বন্যা একশততে একবার হবার সম্ভাবনা (one percent chance every year)। এইজন্য এইরূপ বন্যাকে একশততে একবার সম্ভাব্য বন্যা (one percent chance flood) আখ্যা দেওয়া হয়। সেইরূপ এক হাজার বৎসরের সর্বোচ্চ পরিমাণ বন্যাকে এক হাজারে একবার সম্ভাব্য বন্যা (point one percent chance flood) বলা হয়। পূর্বে পূর্বে নদীর উচ্চ অববাহিকায় কি কি সময়ে কিরূপ এবং কি কি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং ঐ সকল বৃষ্টিপাত হতে নদীতে কি পরিমাণ জলপ্রবাহের হার উৎপন্ন হয়েছে, এই সকল তথ্য হতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভবিষ্যতে কি পরিমাণ বন্যা হইতে পারে তাহা স্থির করা হয়। নদী-প্রকল্পের জলাধার, বাঁধ ইত্যাদির আয়তন (size) কোন এক বিশেষ বন্যার উপরে ভিত্তি করেই স্থির করা হয়। যদি ভবিষ্যতে কখনও ইহা অপেক্ষা বেশী বন্যা আসে, তবে সেই বন্যার জলপ্রবাহের সর্বোচ্চ হার জলাধারের ভিতর প্রবেশ করবার পূর্বেই জলাধার পূর্ণ হয়ে যাবে এবং সেই জলাধার বন্যানিয়ন্ত্রণের দিক থেকে সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যাবে। তখন, যাতে জলাধারের জলপৃষ্ঠের উচ্চতা বাঁধের পক্ষে বিপজ্জনক সীমা অতিক্রম না করে সেজন্য, বাঁধ থেকে জলনিষ্কাশনের হার ঐ বন্যার সর্বোচ্চ জলপ্রবাহের হারের সমান হবে, এবং জলাধার তৈয়ারী না করা হলে ঐ বন্যাতে নদীর নিম্নভাগে যে ক্ষতি সাধিত হত, জলাধার সত্ত্বেও একই পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হবে।

অতএব ইহা হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন যে, কোন বন্যানিয়ন্ত্রক নদীপ্রকল্প কোন এক বিশেষ বন্যার (design flood, যথা, one percent বা point one percent chance flood) জন্যই তৈয়ারী করা সম্ভব। এই বন্যানিয়ন্ত্রক প্রকল্প তৈয়ারী হওয়া সত্ত্বেও ঐ বিশেষ বন্যা অপেক্ষা বেশী পরিমাণ বন্যার জলপ্রবাহের হার নদীতে আসা সম্ভব এবং তখন বন্যানিয়ন্ত্রণের দিক থেকে ঐ প্রকল্প সম্পূর্ণ অকেজো। এখানে এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে জনসাধারণের মনে একটা ধারণা আছে যে, কোন বন্যা-নিয়ন্ত্রক নদীপ্রকল্প তৈয়ারী হবার পরে ঐ নদীর নিম্নভাগের উপত্যকাতে ভবিষ্যতে আর বন্যার ভয় নেই। এবং এই ধারণার উপর ভিত্তি করে লোকে ধীরে ধীরে নদীর নিম্নভাগের পূর্বেকার বন্যা-অধ্যুষিত অঞ্চলে জনপদ, শিল্পাঞ্চল প্রভৃতি গড়ে তোলে এবং নির্ভাবনায় বসবাস করতে থাকে। কিন্তু দেখা গেল যে এই ধারণা ভ্রমাত্মক এবং ইহাতে বিপদের সম্ভাবনা থাকে। নদীর নিম্নভাগের উপত্যকার বন্যাঅধ্যুষিত অঞ্চলে বসবাসকে ইংরেজীতে flood plain encroachment বলে। এইরূপ বসবাসের পূর্বে বন্যানিয়ন্ত্রক মন্ত্রণালয়ের মতামত-গ্রহণ প্রয়োজন।

আবার অনেকসময়ে জলাধারনিয়ন্ত্রণ কালেও নদীর নিম্নভাগের উপত্যকাতে বন্যার উদ্ভব সম্ভব। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ধরা যাক নদীর উচ্চ অববাহিকায় এবং নদীর নিম্নভাগের উপত্যকাতে প্রবল বারিপাত হচ্ছে। এই বারিপাতের ফলে জলাধারে প্রবল এক বন্যা আসবার সম্ভাবনা দেখে জলাধারের জল খুব দ্রুত নিষ্কাশন করা হোল, যাতে বন্যার একটি প্রধান অংশ জলাধারের খালি-করা জায়গায় আটকে ফেলা যায়। কিন্তু জলাধারের জল খুব দ্রুত নিষ্কাশনের ফলে নদীর নিম্নভাগে জলপ্রবাহের হার বারিপাতজনিত জলপ্রবাহের হারের সহিত মিলিত হয়ে প্রবল বন্যা ঘটাতে পারে। এইজন্য জলাধারনিয়ন্ত্রণ (reservoir-operation) সুচিন্তিত উপায়ে করা প্রয়োজন।

বন্যানিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে জলাধারা প্রস্তুত হলে তা দিয়ে আরও কতকগুলি উদ্দেশ্য সাধিত হয়; যেমন, জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন, সেচের জন্য জলসরবরাহ, মৎস্য-চাষ ইত্যাদি। এই সকল নদীপ্রকল্পকে বহুউদ্দেশ্যসাধক নদীপ্রকল্প (multipurpose river-valley project) বলা হয়। অবশ্য বন্যানিয়ন্ত্রণের সাথে অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধন করতে গেলে জলাধার, বাঁধ ইত্যাদির আয়তন (size) বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং তাতে বেশী অর্থের প্রয়োজন।

অনেকসময় উচ্চ অববাহিকায় নদীর এবং উহার শাখা-প্রশাখার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁধ দ্বারা জলাধার নির্মাণ (soil conservation dams and reservoirs) করে বন্যানিয়ন্ত্রণ এবং নদীর নিম্নভাগের জলপ্রবাহকে পলিমুক্ত করা হয়। কিন্তু এই ধরনের প্রকল্পের সমালোচকেরা বলেন যে, কয়েক বৎসর পরে জলাধারগুলিতে পলি জমা পড়ে উহাদের আয়তন অনেকাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং তখন ঐগুলি উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য-সাধনের দিক থেকে অকেজো হয়ে পড়ে। তাছাড়া এতে একটি বিপদের সম্ভাবনাও থাকে। বিভিন্ন জলাধার থেকে জলনিষ্কাশন সুপরি-কল্পিত উপায়ে না করা হলে ঐ সকল নিষ্কাশিত জল নদীর নিম্নভাগে (downstream) কোথাও একত্র মিলিত হয়ে প্রবল বন্যার আকার ধারণ করতে পারে। এজন্য এ সকল প্রকল্পে জলাধার থেকে জলনিষ্কাশন খুবই সুচিন্তিত এবং সুপরি-কল্পিত উপায়ে করা উচিত, এবং বিভিন্ন জলা-

ধারের ও বাঁধের পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন।

(২) উচ্চ অববাহিকার জমির উপরিভাগের প্রকৃতির পরিবর্তন সহায়ে :

আগেই বলা হয়েছে যে, কোন জমির ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্ ক্যাপাসিটির কম-বেশীর উপর বন্যার জলপ্রবাহের হারের পরিমাণ বহুলাংশে নির্ভর করে। উচ্চ অববাহিকার জমির উপরিভাগের (জমিপৃষ্ঠের) প্রকৃতির পরিবর্তন করে সাধারণতঃ তিনটি প্রধান কার্য সাধিত হয়, যথা : (১) জমির ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্ ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা, (২) বৃষ্টিপাতজনিত জমিপৃষ্ঠের উপরে প্রবাহিত জলধারার (overland flow) গতিবেগে বাধা সৃষ্টি করে এই জলপ্রবাহের নদীপথে প্রবেশের সময় বৃদ্ধি করা, যাতে নদীপথে প্রবাহিত জলপ্রবাহের হারের (discharge) পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, এবং (৩) উচ্চঅববাহিকার জমিপৃষ্ঠ থেকে বৃষ্টিপাতের ফলে মৃত্তিকা ধুয়ে যাওয়া (soil-erosion) রোধ করা। এই কার্যগুলি সাধারণতঃ তিনটি উপায়ে সাধিত হয়। যথা, (১) জমির 'কন্‌টুর লাইন' (contour line) বরাবর স্বল্প উচ্চ এবং স্বল্পআয়তনযুক্ত (about 6 to 9″ in height and 5 to 6 ft. in base width) বাঁধ নির্মাণ, (২) 'কন্‌টুর লাইন' বরাবর জমি চাষ করা (contour farming), এবং (৩) উচ্চ অববাহিকায় উদ্ভিজ্জাদির পরিমাণ বৃদ্ধি করা (aforestation)। কোন জমির উপরিভাগে সমউচ্চতাবিশিষ্ট জায়গার উপর দিয়ে যদি কাল্পনিক রেখা টানা হয় তবে সেই রেখাকে 'কন্‌টুর লাইন' বলা হয়। অতএব 'কন্‌টুর লাইন' বরাবর সকল ভূমিপৃষ্ঠের উচ্চতা সমান। এখন দেখা যাক এই তিনটি উপায়ে উপরি-উক্ত কার্যাবলী কিভাবে সাধিত হয়। প্রথমে দেখা যাক কন্‌টুর বাঁধ কিভাবে কাজ করে। পূর্বে বলা হয়েছে যে বৃষ্টিপাতের হার যখন জমির ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্ ক্যাপাসিটি অপেক্ষা বেশী হয় তখন অতিরিক্ত বৃষ্টির জল জমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নদীতে পড়ে জলপ্রবাহের সৃষ্টি করে। কন্‌টুর বাঁধ নির্মাণের ফলে স্বল্পগভীর ছোট ছোট বহু জলাশয় নদীর উচ্চ অববাহিকার উপরে সৃষ্ট হয় বৃষ্টিপাতের সময়। এই জলাশয়গুলি বৃষ্টির জল অনেকসময় ধরে উচ্চ অববাহিকার জমির উপর ধরে রাখে, এবং তার ফলে উচ্চ অববাহিকার 'ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্ ক্যাপাসিটি' বৃদ্ধি হয়, 'ইভাপোরেশন্' বেড়ে যায় এবং ফলে 'ওভারল্যাণ্ড ফ্লো' অনেক কমে যায়। এছাড়াও জলাশয়গুলিতে জল অনেকসময় ধরে আটকে থাকায় 'ওভারল্যাণ্ড ফ্লো'র হার হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং তাতে নদীর জলপ্রবাহের হার বহু পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। আবার 'ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্' বৃদ্ধি পাবার দরুন ভূগর্ভে সঞ্চিত জলরাশির পরিমাণ বৃদ্ধি হয় এবং 'ওয়াটার টেবিল'এর উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। ইহাতে একদিকে যেমন বন্যার জলপ্রবাহের হার হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে প্রবল বন্যার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়, অন্যদিকে তেমনি নদীতে গ্রীষ্মকালে এবং অন্যান্য শুষ্ক আবহাওয়ার সময় জলপ্রবাহ অব্যাহত থাকে। 'কন্‌টুর বাঁধ' দ্বারা আরও একটি প্রধান উপকার সাধিত হয়। বৃষ্টিপাতের সময় উচ্চ অববাহিকার জমির উপরিভাগের মৃত্তিকা ধুয়ে যাবার ফলে বর্ষাকালে নদীতে জলের সহিত প্রচুর পরিমাণে পলি প্রবাহিত হয়। বৃষ্টির কণিকাগুলি যখন জমির উপরিভাগের মৃত্তিকার উপর বেগে পতিত হয় তখন মৃত্তিকাকণিকাগুলি পরস্পর আলগা হয়ে যায় এবং পরে ওভারল্যাণ্ড ফ্লোর সহিত প্রবাহিত

হয়ে নদীতে গিয়ে পড়ে। এইভাবে প্রতিবৎসর নদীর উচ্চ অববাহিকা থেকে লক্ষ লক্ষ টন উর্বর মৃত্তিকা ধুয়ে যায় এবং সমুদ্রে বা নদীর মোহানায় গিয়ে জমায়েত হয়। অবশ্য অনেক সময় বন্যার সাথে নদীর নিম্নভাগের নদীতীরবর্তী অঞ্চলসমূহেও পলি জমা পড়ে সেই অঞ্চলসমূহকে উর্বর করে তোলে। কিন্তু নদীর জলপ্রবাহের সহিত বাহিত এই পলিই নানাবিধ নদীসমস্যার একটি প্রধান কারণ। আবার এই পলি বন্যা-নিয়ন্ত্রক জলাধারে জমা পড়ে উহার আয়তন এবং গভীরতা কমিয়ে দেয় এবং জলাধারগুলির কার্যকারিতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। নদীর উচ্চ অববাহিকায় কন্‌টুর বাঁধ দিয়ে স্বল্পগভীর জলাশয়গুলি সৃষ্টির ফলে বৃষ্টিকণিকাগুলি আর মৃত্তিকা স্পর্শ করতে না পারায় মৃত্তিকাকণিকা-গুলি আলগা হয় না। এবং এই জলাশয়গুলির উপরিভাগ থেকে ওভারল্যাণ্ড ফ্লো হবার ফলে উচ্চ অববাহিকার জমির উপরিভাগ থেকে মৃত্তিকার ক্ষয় বন্ধ হয়

কন্‌টুর ফারমিং (contour farming)-এর অর্থ হোল কন্‌টুর রেখা বরাবর জমি চাষ করা। ইহার জন্য কৃষকদিগের ভিতরে ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন যাতে তারা জমির ঢালের দিকে চাষ না করে কন্‌টুর রেখা বরাবর চাষ করে। জমির ঢাল বরাবর চাষ করলে ঢাল বরাবর ছোট ছোট অসংখ্য নালার সৃষ্টি হয়। এতে ওভারল্যাণ্ড ফ্লো অত্যন্ত বেশী হয় এবং জমির উপরিভাগের মৃত্তিকাও ঐ জলের সহিত বহুল পরিমাণে বাহিত হয়। পক্ষান্তরে কন্‌টুর রেখা বরাবর চাষ করলে 'কন্‌টুর্ বাঁধ'-এর অনুরূপ ফল পাওয়া যায়।

তৃতীয় উপায় হোল নদীর উচ্চ অববাহিকার জমিতে উদ্ভিজ্জাদির পরিমাণ বৃদ্ধি করা। ইহাতেও পূর্বোক্তরূপ ফল পাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জের শিকড়গুলি মৃত্তিকার ভিতরে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। এই সকল শিকড় থেকে আবার অতি সূক্ষ্ম শিকড়সকল চারিদিকে বিস্তৃত হয়। এই শিকড়গুলি উহাদের চারিদিকে জলকণা ধরে রাখে। ইহাতে জমির ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্ ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এছাড়াও উদ্ভিজ্জাদি ওভাল্যাণ্ডফ্লো-কে বাধা প্রদান করে উহার গতি কমিয়ে দেয়। ফলে ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্ বৃদ্ধি এবং নদীর জলপ্রবাহের হার হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। আরার শিকড়গুলি মৃত্তিকা-কণিকাগুলিকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকায় উচ্চ অববাহিকার জমির উপরিভাগের মৃত্তিকা-ক্ষয় বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়।

একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বন্যা-নিয়ন্ত্রণের যে কয়টি পদ্ধতি বিবৃত হোল তার সব কয়টিই সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ পদ্ধতির প্রয়োগে সব দিক দিয়ে সুফল পাওয়া যাবে তা নির্ভর করে সেই সমস্যার প্রকৃতির উপর। সেইজন্য কোন বিশেষ উপায় বা পদ্ধতি গ্রহণের পূর্বে সমস্যার প্রকৃতির বিশদ পর্যালোচনা একান্তই প্রয়োজন। অবশ্য এই পর্যালোচনা প্রকল্পের আর্থিক সঙ্গতির উপর লক্ষ্য রেখেই করতে হবে। কিন্তু সর্বশেষে উল্লিখিত পদ্ধতিগুলি, অর্থাৎ উচ্চ অববাহিকার জমির উপরিভাগের প্রকৃতির পরিবর্তনসাধন সর্বক্ষেত্রেই সুফল দেবে এবং সকল নদীর উচ্চ অববাহিকাতেই, অর্থাৎ দেশের সর্বত্র এই সকল প্রকল্প সুপরিকল্পিত উপায়ে গ্রহণ করা বিধেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়

(১৮৬৩—১৮৯৬)

শ্রীঅজিত সেন

যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুদয় ঘটে তখনই ভগবান অবতীর্ণ হন। উনবিংশ শতাব্দীতে এমনি এক প্রয়োজনে 'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্' যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব। পুতঃসলিলা গঙ্গার পূর্বতীরস্থ দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ীর কুঠীর ছাদের উপর দাঁড়িয়ে তিনি ব্যাকুল হয়ে ডাকতেন নবযুগপ্রবর্তনে যাঁরা তাঁকে সহায়তা করবেন, তাঁর সেই লীলাসহচরদের, আত্মজ-প্রতিম যুবকবৃন্দকে—'তোরা সব কে কোথায় আছিস আয় রে!' যুবকভক্তদের আসা স্থুরু হল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের শেষার্ধ হতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, বাবুরাম, বলরাম, নিরঞ্জন, মাষ্টার, যোগীন' প্রভৃতি এসে পড়লেন।

যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের গৃহী শিষ্য ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাম আজ বিস্মৃতপ্রায়। কেবলমাত্র ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়বস্তুতে পরিণত। প্রায়-বিলুপ্ত ইতিবৃত্তের সূত্র অনুসরণে ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত ভবনাথ-স্মৃতিসঞ্চয়নে এই সংকলন নিছক অনুলিখন মাত্র।

বরাহনগরে অতুলকৃষ্ণ ব্যানার্জী লেনে ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের শেষ-ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। গায়ের রং অতি উজ্জ্বল অর্থাৎ গৌরবর্ণ। মুখ গোল ও ঈষৎ চাপা এবং মুখে কালো (কুঞ্চিত) দাড়ি। এক কথায় সুপুরুষ চেহারা ছিল। এই প্রিয়দর্শন যুবক অতীব ভক্তিমান ছিলেন। অতি অমায়িক প্রকৃতির ও ভক্তভাবের এই যুবকের ঈশ্বরের নামে চোখ জলে ভরে যেত। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞান করতেন।

ভবনাথের পিতার নাম রামদাস চট্টোপাধ্যায় ও মাতার নাম ইচ্ছাময়ী দেবী। এঁদের দুটিমাত্র সন্তান হয়েছিল। একটি পুত্র ও অপরটি কন্যা। পুত্র ভবনাথ বড় এবং কন্যা ক্ষীরোদবালা ছোট।

ভবনাথ যখন জন্মগ্রহণ করেন, সমাজের সর্বস্তরে তখন পরিবর্তনের প্রচণ্ড জোয়ার চলেছে। ইয়ং বেঙ্গলদের অনুকরণে ও স্বেচ্ছাচারিতার নগ্নপ্রভাবে বরাহনগরের নৈতিক কাঠামো (অন্যান্য বহু স্থানের মতই) ভেঙ্গে পড়তে সুরু করেছে। এইভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর শ্রীযুক্ত শশিপদবাবুর নেতৃত্বে দক্ষিণ বরাহনগরের যুবকেরা বিভিন্ন দেশহিতকর সৎকার্যে এগিয়ে এলেন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ বরাহনগরে ২৭শে অক্টোবর তারিখে "স্টুডেন্টস্ ক্লাব" স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান মূলতঃ জনশিক্ষা ও আত্মোন্নতি বিধানের জন্য নৈশ বিদ্যালয়, রবিবাসরীয় বিদ্যালয়, নৈতিক সুশিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি নানা জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করে। এই প্রতিষ্ঠানের সহিত ভবনাথ ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়িত ছিলেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ বরাহনগরে প্রতিষ্ঠিত হ'ল "আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা"। ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়,

কালীকৃষ্ণ দত্ত, উপেন্দ্রনাথ দত্ত, হরিনারায়ণ দাঁ, প্রভাতচন্দ্র দত্ত, গোপালচন্দ্র দে, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, দাশরথি সান্যাল প্রভৃতি দক্ষিণ বরাহনগরবাসী যুবকগণ এই সকল সমাজসেবা-মূলক কর্মে পুরোধার আসন গ্রহণ করেন।

ভবনাথ নরেন্দ্রনাথের বন্ধু ছিলেন। ভবনাথও নরেন্দ্রনাথের মত যৌবনের প্রারম্ভে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতেন এবং নিরাকারের ধ্যান করতে ভালবাসতেন। তবে নরেন্দ্রনাথের প্রতি ভবনাথের ছিল অকৃত্রিম আনুগত্য। ভবনাথ নরেন্দ্রনাথকে এত গভীর ভালোবাসতেন যে সুবিধা পেলেই নরেন্দ্রনাথকে বরাহনগরে অতুলকৃষ্ণ ব্যানার্জী লেন-এ নিজ বাড়ীতে নিয়ে এসে খাওয়াতেন। তখন কলকাতা থেকে সোজা দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের সাধারণ ব্যবস্থা ছিল না; ফলে কলকাতা থেকে বরাহনগর পর্যন্ত গাড়িতে এসে তারপর হেঁটে দক্ষিণেশ্বর যেতে হত। অন্যথায় খরচ অনেক বেশী পড়তো। যাই হোক বরাহনগরে নরেন্দ্রনাথ ও ভবনাথের অন্যান্য বন্ধুবান্ধব যথা সাতকড়ি লাহিড়ী, দাশরথি সান্যাল, (এঁরা উভয়েই নরেন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন) ভুবন মোহন দাস, হরিদাস বড়াল, বিপিন সাহা, মহেন্দ্রনাথ পাল, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসেন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে।

"জুটিলেন ভবনাথ পরম সুন্দর।
বরাহনগর কাছে গঙ্গাতীরে ঘর॥
নবীন বয়স তেঁহ ব্রাহ্মণের ছেলে।
উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠ হয় এই কালে॥
আত্মবন্ধু প্রতিবেশী করে উপহাস।
শুনিয়া প্রভুর পদে তাঁহার বিশ্বাস॥"

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি]

তবে—

"প্রভুভক্ত ভবনাথ সদ্‌বুদ্ধি গুণে।
পরের ব্যঙ্গোক্তি কানে আদতে না শুনে।"

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয়ের পর ভবনাথ প্রায়ই তাঁর কাছে আসতেন ও মাঝে মাঝে কালীবাড়ীতে রাত কাটাতেন। তাঁর বাবা মা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন তাঁকে নানা ভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। বরঞ্চ দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরও বেড়ে গেল। এই সময়ে ভবনাথ আমিষআহার এবং তাম্বূলাদি বর্জন করেন। একথা জানতে পেরে রামকৃষ্ণদেব একদিন তাঁকে বলেছিলেন—"সে কিরে! পান-মাছে কি হয়েছে? কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই হ'ল আসল ত্যাগ।"

ভবনাথ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অতি উচ্চ ধারণা ছিল। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বহুবার 'নরেন্দ্র, রাখাল' প্রভৃতির সঙ্গেই তাঁর নামোল্লেখ করতেন, এঁদের সকলকেই নিত্যসিদ্ধ বলতেন। বলরামকে বলেছিলেন: এদের খাইও তাহলে অনেক সাধুদের খাওয়ানো হবে। এরা (নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, পূর্ণ প্রভৃতি) সামান্য নয়, এরা ঈশ্বরাংশে জন্মেছে। এদের খাওয়ালে তোমার খুব ভালো হবে।

ভবনাথ ও নরেন্দ্রনাথ (উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ) দুজনে ভারি মিল। হরিহর আত্মা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই ভবনাথকে নরেন্দ্রনাথের কাছে বাসা করতে বললেন। ওঁরা দুজনেই অরূপের ঘর। ভবনাথের প্রকৃতিভাব আর নরেন্দ্রনাথের পুরুষভাব।

ভবনাথ ছিলেন জন্মসাধক। যুগাবতার নিজেই বলেছেন—"নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ

এরা সব নিত্যসিদ্ধ, এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ।" রামকৃষ্ণদেবের এই গৃহী-শিষ্যের অন্তর্বাসনা ছিল সন্ন্যাস। তবে ঈশ্বরের ইচ্ছার কে কবে নিরিখ করতে পেরেছে? ভবনাথকে তাই সংসার করতে হ'ল।

তাঁর বিবাহপ্রসঙ্গে রামকৃষ্ণদেব ভক্তদের কাছে বলেছেন (৭ই মার্চ, ১৮৮৫)—

"ভবনাথ বিয়ে করেছে বটে, কিন্তু সমস্ত রাত্রি স্ত্রীর সঙ্গে কেবল ধর্মকথা কয়। ঈশ্বরের কথা লয়ে দুজনে থাকে। তারপর আমি বললুম, পরিবারের সঙ্গে একটু আমোদ আহ্লাদ করবি, তখন ভবনাথ রেগে রোক করে বললে—কি! আমরাও আমোদ আহ্লাদ নিয়ে থাকবো?"

বরাহনগর কুটীঘাট রোডের ওপরে কালীকৃষ্ণের বাড়ী থেকে কিছু দূরে জয়নারায়ণ ব্যানার্জী লেনের কাছ বরাবর অবিনাশ দাঁ মহাশয়ের বাড়ী। ইনি ভবনাথের অত্যন্ত পরিচিত জন ছিলেন। তখন কলকাতায় সবে ক্যামেরার চল সুরু হয়েছে। অবিনাশের একটি ক্যামেরা ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) নিজের ছবি কাকেও তুলতে দিতেন না। ভবনাথ অবিনাশকে ডেকে এনেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি তোলার জন্যে। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে রাধাকান্ত-মন্দিরের সম্মুখস্থ রোয়াকে এই ছবি তোলা হয়। (১৮৮৩—'৮৪ খৃষ্টাব্দ) এই ছবিটিই ঘরে ঘরে পূজিত হচ্ছে।

একদিন দেবেন্দ্র ঠাকুরের ঘরে ঠাকুরের ফটো দেখে নিয়ে যেতে চান; ঠাকুর তাঁকে সেই ফটোটি না দিয়ে বলেন যে, অবিনাশ সেদিন ফটো তুলে নিয়েছে, তার কাছে পাওয়া যাবে; ভবনাথকে বললে সে অবিনাশকে তাগাদা দিয়ে আনিয়ে দেবে।

প্রায় কুড়ি বৎসর বয়ঃক্রমকালে মল্লিকপুরের অভয়চরণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কন্যা কিরণশশী দেবীর সঙ্গে ভবনাথের বিবাহ হয়। অর্থাৎ আনুমানিক ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে। এই সময়ে তিনি বরাহনগরের একটি স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। তবে তাঁর এই চাকরি খুব বেশী দিন থাকেনি। এর কিছুদিন পরেই ভবনাথের স্ত্রীর সঙ্কটাপন্ন পীড়া হয়; ফলে প্রকৃতপক্ষে ভবনাথকে সংসারের ঝামেলায় গভীরভাবে জড়িয়ে পড়তে হয়। তবে পরম করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায় ভবনাথের স্ত্রী কিরণশশী দেবী এযাত্রায় আরোগ্য লাভ করেন। বিবাহিত হলেও ভবনাথের বিষয়াসক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল। কিন্তু এই সময় থেকেই চাকরি ইত্যাদি চেষ্টার জন্য ভবনাথের পক্ষে রামকৃষ্ণদেবের নিকটে নিয়মিত যাতায়াত ব্যাহত হতে থাকে।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট ভবনাথ, হাজরা, শ্রীম প্রভৃতি রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়েছিলেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুন ভবনাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে পাণিহাটী মহোৎসবে গিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে, আরও একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ভবনাথপ্রমুখ বরাহনগরবাসী যুবকগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা"র, (১৮৭৬) পাঠাগার ও "দক্ষিণ বরাহনগর পাবলিক লাইব্রেরী" (১৮৮২) সম্ভবতঃ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে একত্র হয়ে "বরাহনগর পিপলস্ লাইব্রেরী" নামে পরিচালিত হতে সুরু করে। এবং সবচেয়ে আনন্দের কথা ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে এই পাঠাগারের নিজস্বগৃহের উদ্বোধন হয়েছে। ভবনাথ ও নরেন্দ্রনাথ এই "আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা"র (বর্তমান "বরাহনগর পিপলস্ লাইব্রেরী" নামে পরিচিত) একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন।

পরমহংসদেবের গলরোগের বৃদ্ধি হলে ভক্তগণ খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তাঁরা উপযুক্ত চিকিৎসাদির জন্য অবশেষে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর (২৭শে অগ্রহায়ণ) পরমহংসদেবকে শ্যামপুকুর থেকে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে নিয়ে এলেন। এই উদ্যানবাটীতে (২২শে এপ্রিল, ১৮৮৬) কথাপ্রসঙ্গে ভবনাথ মাষ্টার মহাশয়কে বলেছিলেন: বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নতুন স্কুল হবে শুনলাম; আমারও তো অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে—চেষ্টা করলে হয় না? রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভবনাথের অনিয়মিত আসাযাওয়া নিয়ে বহুবার ভক্তদের কাছে অনুযোগও করেছেন। আবার সস্নেহ অন্তরে ভবনাথের জন্য গভীরভাবে চিন্তিতও হয়েছিলেন, কেননা ভবনাথ সংসারে পড়েছেন। [শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) "ওকে খুব সাহস দে।"]

ইতিমধ্যে অলক্ষ্যে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির লগ্ন এসে পড়ল। ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ, ইংরাজী ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট পরমহংসদেব মহাসমাধিতে লীন হলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর নরেন্দ্রনাথ যুবকভক্তগণকে একত্র করে একটি মঠ স্থাপনের সঙ্কল্প করলেন। ইহার জন্য কিছু অর্থের প্রয়োজন—একটি স্থান অন্ততঃ চাই। পরম করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায় সুরেশচন্দ্র মিত্র (পরমহংসদেব ইঁহাকে সুরেন্দ্র বলতেন) মাসিক কিছু টাকা দিতে রাজি হলেন। ভবনাথকে একটি বাড়ী যোগাড় করতে বলা হলে তিনি মুন্সীদের ভূতের বাড়ীখানা মাসিক ১১৲ টাকা হিসাবে ভাড়া করে দিলেন। ভবনাথ ও হুটকো গোপাল দুজনে মিলে বাড়ীখানা পরিষ্কার করে ফেললেন। দু-চার মাসের মধ্যেই সব হ'ল। এভাবে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আশ্বিন মাসে বরাহনগর মঠ প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধির কিছুকাল পরে ভবনাথ বরাহনগর অতুলকৃষ্ণ ব্যানার্জ্জী লেনের বাড়ী বিক্রী করে দিয়ে ভবানীপুরে গিরিশ ডাক্তার রোডে বাড়ী কিনেছিলেন। এই সময়ে ভবনাথের একমাত্র কন্যা প্রতিভাদেবীর জন্ম হয়। তারপর তিনি সরকারী বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের পদ নিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই বরাহনগর মঠে ভবনাথের যাতায়াত কমে গিয়েছিল।

বরাহনগর মঠ ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ পাঁচ বৎসর কাল চলেছিল। এর পরে বরাহনগরের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণ আলমবাজারে একটি দোতলা বাড়ীতে মঠ স্থানান্তরিত করলেন।

আলমবাজার থেকে লোচন ঘোষের ঘাটে যাবার রাস্তার দক্ষিণ পাশে এই বাড়ী অবস্থিত। রাস্তার উত্তরে চট্টোপাধ্যায়দের মোটা থামওয়ালা বাড়ী। সদর দরজা পূর্বদিকের গলির ভিতর। আলমবাজার মঠে ভবনাথ সুযোগ পেলেই মধ্যে মধ্যে আসতেন ও অন্যান্য শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের সঙ্গে আনন্দ ও উৎসবাদি করতেন। স্বামীজী ভবনাথকে যে কত গভীরভাবে ভালোবাসতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় চিকাগো থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত (১৮৯৪) স্বামীজীর (১৪১ নং) পত্রে—"ভবনাথ তোমাদের ভালবাসে কিনা? তাকে আমার আন্তরিক প্রীতি ও ভালবাসা দিও।" ভবনাথের সংগঠন-ক্ষমতা স্বামীজীর অজ্ঞাত ছিল না—(পত্র নং ১০২)..."হরমোহন, ভবনাথ, কালীকৃষ্ণবাবু, তারকদা প্রভৃতি সকলে মিলে একটা যুক্তি কর..." ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে স্বামী রামকৃষ্ণা-

নন্দকে লিখিত (পত্র নং ২৪১), "ভবনাথ, কালী-কৃষ্ণবাবু প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করবে।" স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত (পত্র নং ১৪৯) পত্রেও স্বামীজীর বন্ধুপ্রীতির আন্তরিক উত্তাপ মেলে—"কালীকৃষ্ণ, ভবনাথ, দাশু, সাতু, হরি চাটুজ্যে সকলকে তোমরা ভালোবাসো কিনা —সব লিখবে।"

ভবনাথ সুগায়ক ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে তিনি একাধিক গানও গেয়েছিলেন। সেই সব গানের কয়েকটির প্রথম পদ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হ'ল।

(ক) ধন্য ধন্য আজি দীন, আনন্দময়ী! (১১.৩. ১৮৮৩.)

(খ) দয়াময় তোমা হেন কে হিতকারী— (বলরামবাটীতে ৭.৪.১৮৮৩.)

(গ) গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ কোরো না (২৯.৯.১৮৮৪.)

কিছু সাহিত্যসেবাও তিনি করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত "নীতি-কুসুম" ও "আদর্শ নরনারী" গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

কলিকাতা ত্যাগের পর নকীপুর, সাতক্ষীরা প্রভৃতি নানা জায়গা ঘুরে রোগাক্রান্ত দেহে (কালাজ্বর) ভবনাথ কলকাতায় ফিরে বাদুড়বাগানে রামকৃষ্ণ দাস লেনে ভাড়া বাড়ীতে এসে উঠলেন। এই সময়ে কলকাতায় প্লেগ দেখা দেয়। ভবনাথকে জোর করে মধুপুর পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেখান থেকে ফিরে এসে মাত্র একমাস রামকৃষ্ণ দাস লেনে অবস্থান করার পর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে মাত্র ৩৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে এই একনিষ্ঠ কর্মযোগীর অকাল তিরোভাব ঘটে।

এই মহাসাধকের শেষকৃত্য কাশীপুর শ্মশানে (অধুনা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মহাশ্মশান) বহু সাধক-মণ্ডলীর উপস্থিতিতে সুসম্পন্ন হয়।*

জাগো!

শ্রীপ্রহ্লাদ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রেমের পৃথিবী কার অভিশাপে
হোলো আজি মরুময়,
আকাশে বাতাসে শুধু হাহাকার-
ভরা নিশ্বাস বয়!
মানুষের মাঝে 'মানুষ' সুপ্ত
স্বার্থ-তিমিরে চেতনা লুপ্ত
মানবের প্রাণ দেয় যে বিশ্বে
দানবের পরিচয়!

সকল হৃদয়ে আসীন হে দেব,
লুকায়ে থেকো না আর,
পূর্ণ বিভায় ওঠো, জেগে ওঠো
অন্তরে সবাকার!
মিথ্যা ও ছলে আবিল কর্মে
লোভ-দ্বেষ-ভরা জীবনমর্মে
ধ্বংস করিয়া ফোটাও সেথায়
সত্য স্বরূপ তার!

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ, শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা (চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়), শ্রীরামকৃষ্ণ (সুবোধচন্দ্র দে) প্রভৃতি পুস্তক অবলম্বনে লিখিত।

ঈশ্বর

শ্রীযোগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়

ভগবান পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে ঈশ্বর কথাটি বুঝাতে তিনটি সূত্র লিখেছেন :—

(১) 'ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ-বিশেষ ঈশ্বরঃ'।

(২) 'তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞত্ববীজম্'। আর,

(৩) 'স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনান-বচ্ছেদাৎ'।

(১) ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয় যাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, সেই পুরুষ-বিশেষকে ঈশ্বর বলে। **ক্লেশ** কি? পতঞ্জলি বলেন— অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পাঁচ রকম মনোধর্মই **পঞ্চ ক্লেশ**—এগুলো সবই মিথ্যাজ্ঞান। যেটা যা নয়, সেটাকে তাই ব'লে বুঝা অর্থাৎ অনিত্য, অশুচি, দুঃখ, ও অনাত্মপদার্থের উপর নিত্য, শুচি, সুখ ও আত্মতা জ্ঞানের নাম **অবিদ্যা**। **অস্মিতা** হচ্ছে দ্রষ্টা ও দর্শনশক্তিকে, জীববুদ্ধি ও স্বরূপচৈতন্যকে একই ব'লে বোধ। অর্থাৎ মনবুদ্ধি প্রভৃতিতে 'আমি' প্রতীতিই **অস্মিতা**। যে সুখ একবার ভোগ করা গেছে, তার কথা মনে হ'লেই আবার সেটা ভোগ করার যে কামনা বা ইচ্ছা তারই নাম **রাগ**; আর যে দুঃখ একবার ভোগ করা গেছে, তার উপর যে বিরাগ বা অপ্রবৃত্তি তারই নাম **দ্বেষ**। জীব-মাত্রেরই দেহেন্দ্রিয়ের সঙ্গে একটা 'আমি' সম্পর্ক পাতানো আছে। জীব এই পাতানো সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে চায় না। তেমনি ধনাদি বিষয়ের সঙ্গেও একটা 'আমার' সম্পর্ক পাতানো আছে—এ থেকেও বিচ্ছিন্ন হ'তে চায় না; তাই জীবের মৃত্যুভীতি। পূর্ব পূর্ব জন্মার্জিত এই মৃত্যুভয়রূপ সংস্কারই **অভিনিবেশ**।

তারপর কর্ম। কর্ম দ্বিবিধ—কুশল ও অকুশল।

এই দ্বিবিধ কর্মের যে ফল তাকে **বিপাক** বলে।

আশয় কি? না, কর্মানুরূপ যে বাসনা (অনুকূল বা প্রতিকূল সংস্কার) তাকে **আশয়** বলে। এগুলি সবই চিত্তধর্ম; কিন্তু পুরুষ ফলভোক্তা ব'লে তারই ধর্ম ব'লে অভিহিত হয়।

যিনি উল্লিখিত ক্লেশাদি সব কিছুতেই নির্লিপ্ত,—এর কোনটাই যাঁকে ছুঁতে পারে না, সেই পুরুষ-বিশেষই ঈশ্বর। পুরুষ-বিশেষ বলেছেন এই জন্য যে, কৈবল্যাবস্থাপ্রাপ্ত অনেক পুরুষ আছেন যাঁরা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ দেহরূপ ত্রিবিধ বন্ধন ছেদন ক'রে কৈবল্য প্রাপ্ত হয়েছেন। ঈশ্বর সেরূপ নন। তাঁর বন্ধন কখনো ছিল না—কখনো হবে না। তিনি নিত্যমুক্ত, নিত্য স্বপ্রতিষ্ঠ ঈশ্বর-স্বরূপ। সেজন্য তাঁকে ক্লেশাদি থেকে মুক্তপুরুষ না ব'লে পুরুষ-বিশেষ বলা হয়েছে। তিনি সদাই ঈশ্বর—সদাই মুক্ত। তাঁর ঐশ্বর্যের সম বা অধিক ঐশ্বর্য আর কারু নাই। ঐশ্বর্যের পরাকাষ্ঠা তাঁতে আছে ব'লে তিনি ঈশ্বর।

(২) তিনি নিত্য, নিরতিশয়, অনাদি ও অনন্ত। তিনি জীবাত্মার মত চিত্তের সঙ্গে মিলে মিশে বাসনা-নামক সংস্কারের বশীভূত হন না। তিনি এক অসাধারণ অচিন্ত্য শক্তি-যুক্ত ও দেহাদি-রহিত আত্মা বা পরমপুরুষ। নিরতিশয় জ্ঞান (জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা) আছে

ব'লে তিনি ঈশ্বর। তিনি বিশেষত্বপূর্ণ ব'লে অনুমান দ্বারা সিদ্ধ নন—কেবল শাস্ত্র থেকেই তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হ'তে পারে। নিজের সম্বন্ধে কোন প্রয়োজন না থাকলেও জীবের প্রতি অনুগ্রহ করা রূপ প্রয়োজন তাঁর আছে। সকলকে জ্ঞানোপদেশ দ্বারা উদ্ধার করবো,—প্রাণিগণের প্রতি এরূপ অনুগ্রহই সে প্রয়োজন।

[তাই তিনি ধর্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন (গীতা ৪।৮)।]

(৩) ঈশ্বর সর্বপ্রথমে উৎপন্ন ব্রহ্মাদিরও উপদেষ্টা; কারণ তিনিই সকলের আদি। কালশক্তি তাঁতে অস্তমিত। পূর্ব পূর্ব গুরুগণ সকলেই কালাধীন—উৎপত্তি-বিনাশশীল, পরিমিতায়ুঃ। ঈশ্বর কপিলাদি গুরুসকলেরও গুরু; তাঁর সম্বন্ধে কাল অনুমাপক হয় না। তিনি সকল কালেই আছেন। যেমন বর্তমান সৃষ্টির আদিতে স্বীয় নিত্যমুক্ত স্বভাব দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব জানা যায়, অপরাপর সর্গেও সেরূপ জানা যায়।

*

মায়াতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই ঈশ্বর। তিনি মায়াধীশ; মায়াকে আশ্রয় ক'রে সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়াদি কার্য করেন। যখন মায়া তাঁতে লীন অবস্থায় থাকে তখন তিনি ব্রহ্ম। ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে থেকে জীবকে স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত করছেন (গীতা ১৮।৬১)।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন :

ঈশ্বরই কর্তা—জীবের 'আমি কর্তা বোধ অজ্ঞান থেকে হয়। ঈশ্বরের শক্তিতে সব শক্তিমান। হাঁড়ির নীচে আগুন আছে। তাই হাঁড়ির ভিতরে জলের মধ্যে আলু বেগুন চাল ডাল লাফাতে থাকে। জ্বলন্ত কাঠ টেনে নিলে সব চুপ। পুতুলনাচের পুতুল বাজিকরের হাতে বেশ নাচে, হাত থেকে পড়ে গেলেই চুপ। ঈশ্বরদর্শন না হওয়া পর্যন্ত আমিই সদসৎ সব কাজ করছি এ ভুল থাকে। এ তাঁরই মায়া—সংসার এই মায়ার খেলা! বিদ্যামায়া আশ্রয় করলে—সৎপথ ধরলে, তাঁকে লাভ করা যায়। তখন বোঝা যায়, তিনিই কর্তা, আর আমি অকর্তা; তাঁর ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে; তিনি করান, তাই করি চাঁদামামা সকলেরি মামা।

ঈশ্বর ও কর্মফল—তিনিই সব করাচ্ছেন, তিনিই কর্তা; মানুষ যন্ত্রস্বরূপ,—নিমিত্তমাত্র। আবার এও ঠিক যে কর্মফল আছেই আছে। লঙ্কামরিচ খেলেই পেট জ্বালা করবে। তিনিই ব'লে দিয়েছেন যে পেট জ্বালা করবে। পাপ করলেই তার ফলটি পেতে হবে!

যে ঈশ্বর দর্শন করেছ সে কিন্তু পাপ করতে পারে না। যার সাধা গলা তার সুরেতে সা, রে, গা, মা-ই এসে পড়ে। সিদ্ধ লোকের বেতালে পা পড়ে না।

কিন্তু পাপের শাস্তি দেবেন কি না দেবেন সে হিসেবে তোমার দরকার কি? সে তিনি বুঝবেন। বাগানে কত গাছ, কত পাতা, সে হিসেবে তোমার দরকার কি? তুমি আম খেতে এসেছ আম খেয়ে যাও।

এ সংসারে ঈশ্বরসাধন জন্য তুমি মানবজন্ম পেয়েছ। ঈশ্বরের পাদপদ্মে কিরূপে ভক্তি হয় তাই চেষ্টা করো। বিচার ক'রে তোমার কি হবে? আধ পো মদে তুমি মাতাল হ'তে পারো, শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, তা জেনে তোমার কি হবে?

ঈশ্বরই গুরু—গুরু এক সচ্চিদানন্দ (ঈশ্বর)। তিনিই গুরুরূপে এসে শিক্ষা দেন। মানুষের কি সাধ্য অপরকে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত করে। যাঁর এই ভুবনমোহিনী মায়া,

তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত করতে পারেন। সচ্চিদানন্দ-গুরু বই আর গতি নাই।

সদ্‌গুরু লাভ হ'লে জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘোচে। গুরু কাঁচা হ'লে গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা। যারা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান হয় নাই, তারাই কাঁচা গুরু। তাই ঈশ্বর যুগে যুগে লোকশিক্ষার জন্য নিজে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন।

যদি মানুষ গুরুরূপে চৈতন্য করে তো জানবে যে সচ্চিদানন্দই ঐ রূপ ধারণ করেছেন। গুরু যেন সেথো; হাত ধরে নিয়ে যান। মানুষ-গুরুর কাছে যদি কেহ দীক্ষা লয়, তাঁকে মানুষ ভাবলে হবে না; তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবতে হয়—তবে তো বিশ্বাস হবে! বিশ্বাস হ'লেই সব হ'য়ে গেল। একলব্য মাটির দ্রোণ তৈয়ার করে বনেতে বাণ-শিক্ষা করেছিল। মাটির দ্রোণকে সাক্ষাৎ দ্রোণাচার্য জ্ঞানে পূজা করতো—তাতেই বাণশিক্ষায় সিদ্ধ হ'লো।

ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু—

সংসারের সব কিছুই অনিত্য। শরীর এই আছে, এই নাই। তাই তাড়াতাড়ি তাঁকে ডেকে নিতে হয়। সব মন দিয়ে তাঁকেই আরাধনা করা উচিত। ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু। নিষ্কাম হ'য়ে তাঁকে ডাকতে হয়। দানাদি কর্ম সংসারী লোকের প্রায় সকামই হয়। নিষ্কাম হ'লে ভাল —তবে নিষ্কাম কর্ম বড় কঠিন। তা ব'লে দয়ার কাজ কি কিছু করবে না? তা নয়, সামনে দুঃখকষ্ট দেখলে সামর্থ্য থাকলে নিশ্চয় দেওয়া উচিত। অন্নদানের চেয়ে জ্ঞানদান, ভক্তিদান, আরও বড়।

তবে নিষ্কাম কর্ম ঈশ্বরলাভের একটা উপায়। কিন্তু ঈশ্বরের উপর আন্তরিক ভক্তি না থাকলে অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম করা বড় কঠিন। মনে করছি, নিষ্কামভাবে করছি কিন্তু হয়ত যশের ইচ্ছা গেছে, নাম বার করবার ইচ্ছা এসে গেছে। আবার বেশী কর্ম জড়ালে কর্মের ভিড়ে ঈশ্বরকে ভুলে যায়।

যে শুদ্ধ ভক্ত, সে ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না। বেশী কর্মের ভিতর যদি সে পড়ে ব্যাকুল হয়ে সে প্রার্থনা করে—হে ঈশ্বর, কৃপা করে আমার কর্ম কমিয়ে দাও; আমার মন বাজে খরচ হয়ে যাচ্ছে। 'ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু'—এ বোধ না থাকলে শুদ্ধা ভক্তি হয় না।

তাঁকে লাভ হ'লে বোধ হয় তিনিই কর্তা, আমি অকর্তা। তবে কেন তাঁকে ছেড়ে নানা কাজে জড়িয়ে মরি? কর্ম আদিকাণ্ড; জীবনের উদ্দেশ্য নয়। সাধন করতে করতে এগিয়ে পড়লে শেষে জানতে পারবে যে ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু।

ঈশ্বর ও শুদ্ধ আত্মা—

(হাজরার প্রতি) তুমি শুদ্ধ আত্মাকে ঈশ্বর বল কেন? শুদ্ধ আত্মা নিষ্ক্রিয়, 'তিন অবস্থা'র সাক্ষী স্বরূপ। যখন ভাবি তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন, তখন তাঁকে 'ঈশ্বর' বলি।

ষোড়শীপূজা

শ্রীশঙ্কর রায়চৌধুরী

সারদা ও রামকৃষ্ণ মিলে গঙ্গাতটে
গৈরিকের মুক্তরাগ লাগে লীলা-নাটে।
রাতে রামকৃষ্ণ সদা ভাবমগ্ন হন
ভাবের জগতে মন থাকে অনুক্ষণ।
সমাধিতে রামকৃষ্ণ লীন হন সদা
দেখি বড় ভয় পান জননী সারদা।
এই মহাভাব ভাঙা হয় অতি ভার
কিছুতেই নাহি খুলে সমাধির দ্বার।
অনভ্যস্তা মাতা ডাকে কাঁদিয়া হৃদয়ে—
কি করিলে সংজ্ঞা হয় দাও তাহা কয়ে।
ঠাকুর সে কথা পরে জানিলা যখন
ধীরে ধীরে তাঁরে তিনি নিজমুখে কন
কোন্ ভাবে কোন্ নাম শুনাইলে তবে
দেহে তাঁর পুনরায় বাহ্যজ্ঞান হবে।
ভাবে সমাধিতে আর ঈশ্বরকথায়
ঈশ্বর-আবেশে প্রতি রাত কেটে যায়।
এইভাবে একসাথে করি রাত্রিবাস
অপূর্ব সে দিব্যলীলা চলে আটমাস।
এরই মাঝে এল ফলহারিণী-শ্যামার
পূজারাতি, অমানিশা নিবিড় আঁধার।

ঠাকুর সেদিন ডাকি হৃদয়েরে কন---
মোর ঘরে কর শ্যামাপূজা-আয়োজন।
দীনু পুজারীরে সাথে লইয়া হৃদয়
যথাসাধ্য পূজা-আয়োজনে রত হয়।
যথাকালে আসি রামকৃষ্ণের আহ্বানে
জননী সারদা বসে দেবীর আসনে।
পূজক-আসনে বসে জগতের গুরু,
বিধিমতে দেবীপূজা হয়ে যায় সুরু।
দেবীপদে রামকৃষ্ণ যা করে অর্পণ
ভাবমগ্না সারদা তা করেন গ্রহণ।
পূজার মাঝারে হয়ে সমাধিতে লয়
পূজ্য ও পূজক মিশে এক আত্মা হয়।
পূজা-শেষে প্রভু মা-র চরণকমলে
সাধনার সব ফল দিলা অর্ঘ্য-ছলে।
দ্বাদশ বৎসর ধরি কত না সাধন,
কত ত্যাগ, কি তপস্যা, কত আরাধন!
তাহার সকল ফল জপমালা সনে
সঁপি মূর্তিমতী মহাশক্তির চরণে
দ্বাদশবৎসর-ব্যাপী সাধন-যজ্ঞেতে
পূর্ণাহুতি দান করিলেন এই মতে।

সমালোচনা

বিবেকচূড়ামণিঃ—অনুবাদক : স্বামী বেদান্তানন্দ, প্রকাশক : স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা ৩৮০ ; মূল্য ৪৲।

অদ্বৈতবেদান্তদর্শনের প্রকরণ-গ্রন্থসমূহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে শঙ্করাচার্যকৃত 'বিবেক-চূড়ামণিঃ' গ্রন্থখানি চির-উজ্জ্বল হইয়া আছে। সাধক ও মুমুক্ষুগণের কণ্ঠহারস্বরূপ 'বিবেকচূড়া-মণিঃ' গ্রন্থের সার্থকতা শুধু নামে নয়, জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি করাইবার ক্ষমতা ইহার অসীম। নামরূপাত্মক সংসারের মিথ্যাত্ব, ব্রহ্মব্যতিরিক্ত সত্তার অনস্তিত্ব এবং জীবের সচ্চিদানন্দস্বরূপত্ব প্রতিপাদন অতি দুরূহ। কিন্তু শব্দের মনোহারিত্ব, ভাষার প্রাঞ্জলতা, যুক্তির সুগমতা ও উপস্থাপনের কৌশলে দুরূহ বিষয়ও প্রথম শিক্ষার্থীর নিকট দুর্বোধ্য থাকে না। এই প্রকরণ-গ্রন্থে আচার্য শঙ্করের লেখনী-মুখে নির্ঝরের মতো অমৃতধারা নিঃসৃত হইয়াছে। যুগাচার্য স্বামীজী 'বিবেকচূড়ামণিঃ' গ্রন্থটিকে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন। স্বামীজীর বাণী ও রচনায় অনেকস্থলে ইহার উদ্ধৃতি দৃষ্ট হয়।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে মূল সংস্কৃত শ্লোক, তাহার নীচে অন্বয় ও বাংলা শব্দার্থ, তৎপরে সরল বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপনিষদ্ ও ভগবদ্গীতা হইতে উদ্ধৃতি দিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ; এই ব্যাখ্যা বিষয়-বস্তু অনুপ্রবেশে বিশেষ সাহায্য করিবে। বাংলা ভাষায় বিবেকচূড়ামণির এইরূপ একটি সংস্করণের বিশেষ অভাব ছিল, আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ায় সে অভাব দূর হইল সন্দেহ নাই। বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত এই 'বিবেক-চূড়ামণিঃ' বাংলার ঘরে ঘরে প্রচারিত হইয়া বিবেকের আলোক প্রজ্বালিত করুক—এই প্রার্থনা।

কঠোপনিষদ্—অনুবাদক ও সম্পাদক ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য। প্রকাশক : বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, পোঃ বজবজ, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ৪৬৪ ; মূল্য ৭৲।

উপনিষদের বাণী মহা জাগরণের বাণী। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, 'উপ-নিষদের বাণী দ্বারা সারা জগৎকে সজীব, সবল ও প্রাণবন্ত করা যায়।' স্বামীজী কঠোপনিষদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। বস্তুতঃ কবিত্ব-পূর্ণ ভাষা, উচ্চভাব, নচিকেতার মতো দুর্লভ ব্রহ্মবিদ্যাধিকারী ইত্যাদির সমাবেশবশতঃ এই উপনিষদ্খানি উপনিষৎসমূহের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'। জ্ঞানলাভের পথে শ্রদ্ধা অপরিহার্য, কঠোপনিষদের অনুধ্যানে মানুষের মধ্যে শ্রদ্ধা জাগরিত হয় বলিয়া ইহার প্রয়োজন সর্বাধিক।

আলোচ্য গ্রন্থে মূল উপনিষদ্, মন্ত্রের অন্বয়, বাংলা অর্থ, ও শঙ্করভাষ্য সানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। 'ভাষ্যবিবৃতি'তে মূল উপনিষদ্ ও শঙ্করভাষ্যের যে বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে উপনিষদের প্রকৃত তাৎপর্য পরিস্ফুট। নিঃসন্দেহে বলা যায় কঠোপনিষদের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে এই 'ভাষ্যবিবৃতি' বিশেষ সহায়ক।

আশ্রম (১৩৭২)—প্রকাশক : স্বামী পুণ্যানন্দ, কর্মসচিব, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া, ২৪ পরগনা ; পৃষ্ঠা ৭৬।

এবারের রহড়া বালকাশ্রমের সচিত্র বার্ষিক পত্রিকাখানি নানা দিক হইতে পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। সংখ্যাটির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য 'শৈশবে মাধবানন্দ' ছবিখানি এবং 'হে মহাজীবন' রচনাটি--প্রবন্ধটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবম অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের পুণ্যস্মৃতি সার্থকভাবে পরিবেশিত। শিক্ষক ও ছাত্রগণের প্রতিটি লেখাই সুলিখিত। 'আশ্রম-সংবাদে' বিভিন্ন বিভাগের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

একতারা (১৩৭২)—সম্পাদক শ্রীপ্রতুল দত্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষাপীঠ, মুকুন্দপল্লী, বীরভূম। পৃষ্ঠা ৬২।

'একতারা' পত্রিকাটি শিক্ষাপীঠের নব পর্যায়ে প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা। বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে শিক্ষক ও বিদ্যার্থিগণের রচনাবলীতে পত্রিকাটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয়। 'আমাদের মাষ্টার মশাই' প্রবন্ধটি শিক্ষাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা আজীবন শিক্ষাব্রতী মুকুন্দবিহারী সাহার জীবনপরিক্রমা ও সার্থক শ্রদ্ধাঞ্জলি। 'একদিনের স্বাধীনতা' একটি মনোজ্ঞ রচনা। চিত্রগুলি শিক্ষাপীঠের কর্মধারার পরিচিতি-জ্ঞাপক। প্রচ্ছদপটটি পত্রিকার নামটিকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে।

কল্যাণ (হিন্দী): ৪০তম বর্ষের প্রথম সংখ্যা—ধর্মাঙ্ক। সম্পাদক—শ্রীহনুমানপ্রসাদ পোদ্দার ও শ্রীচিম্মনলাল গোস্বামী। গীতা প্রেস, গোরখপুর হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭০০; মূল্য ৭·৫০ টাকা।

বহুল-প্রচারিত ও হিন্দী ভাষার বিখ্যাত ধর্মপত্রিকা 'কল্যাণ'-পত্রিকার সুযোগ্য পরিচালকমণ্ডলী প্রতি বৎসর একখানি করিয়া সুন্দর ও মূল্যবান সচিত্র বিশেষাঙ্ক প্রকাশ করিয়া থাকেন; এই বৎসর 'ধর্মাঙ্ক' নামে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই বিশেষাঙ্কখানি প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মহীনতার ভাব প্রকট, সেইজন্য প্রকৃত ধর্মাদর্শ সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও সন্দিহানতা জনসাধারণকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে; এই অবস্থায় 'ধর্মাঙ্ক'-প্রকাশ অভিনন্দনযোগ্য।

আলোচ্য 'বিশেষাঙ্ক'টিতে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও ধর্মপ্রবক্তাগণের লেখনীমুখে বিভিন্ন সুচিন্তিত প্রবন্ধের মাধ্যমে ধর্মের স্বরূপ, মহিমা, অনুশাসন, আদর্শ প্রভৃতি যুগোপযোগী করিয়া পরিবেশিত। বহুচিত্রসমন্বিত পত্রিকাটি সংরক্ষণযোগ্য।

স্মরণিকা (১৯৬৬)—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরিষদ, কার্যালয়: ১, ডালিমতলা লেন, কলিকাতা ৬। পৃষ্ঠা ৪৩।

সুচিন্তিত রচনাসমৃদ্ধ স্মরণিকাটি স্বামীজী-নেতাজী সংখ্যা। উল্লেখযোগ্য রচনা: 'শিক্ষার আদর্শ ও স্বামী বিবেকানন্দ', স্বামী বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক', 'বিবেক-মনীষা', 'জয়তু স্বামী বিবেকানন্দ', 'মহাসূর্য' (কবিতা), 'গুরুবাদ ও পুরোহিততন্ত্র', সুভাষচন্দ্রের 'রাজনৈতিক দর্শন ও মতবাদ', 'নেতাজী সুভাষ' (কবিতা)।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরিষদের কর্মিবৃন্দ যে উদ্দেশ্যে 'স্মরণিকা' প্রকাশ করিয়াছেন, পত্রিকার প্রবন্ধ-নির্বাচন দেখিয়া মনে হয় সে প্রচেষ্টা ফলবতী হইবে। ছাত্রসমাজের মধ্যে পত্রিকাটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

ছোট ছোট ঢেউ—সঞ্জয়। প্রকাশক: শ্রীঅমিয়কান্ত দেবসিংহ, সম্বোধি প্রকাশ, টেম্পল স্ট্রীট, জলপাইগুড়ি। পৃষ্ঠা ৯৭; মূল্য ২৲।

ছোটদের জন্য লেখা বইটিতে প্রাকৃতিক বর্ণনার সঙ্গে কিশোরচরিত্র সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বইটি শিশুসাহিত্যে আদরণীয় হইবে

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠান : এপ্রিল, ১৯৬৪ হইতে মার্চ, ১৯৬৫ পর্যন্ত সেবাপ্রতিষ্ঠানের ৩৩তম কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পূর্বনাম ছিল 'শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান'। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে ইহাকে একটি সাধারণ হাসপাতালে পরিণত করা হয়। বর্তমানে ৩৫০ জন রোগী থাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী রোগীকে বিনা-খরচে রাখা হয়।

এই হাসপাতালে সর্বপ্রকার আধুনিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম আছে। বিভিন্ন বিভাগে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তত্ত্বাবধান করেন।

নার্সের কাজ ও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা সেবাপ্রতিষ্ঠানের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কার্য। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে শিক্ষার্থিনী পরিষেবিকার সংখ্যা ছিল ১৩৩।

বাহিরের সকল রোগী এবং হাসপাতালের শতকরা ৫০ জন রোগী বিনা-ব্যয়ে চিকিৎসিত হয়। আলোচ্য বর্ষে বহির্বিভাগে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ৮৮,৫৮৯ (নূতন ৩১,৯৯৩); তন্মধ্যে অস্ত্রচিকিৎসা ১১,৫২৯টি। অন্তর্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৯,২৩৪; অস্ত্রচিকিৎসা ৬৯৯টি।

আলোচ্য বর্ষে চর্মচিকিৎসার জন্য নূতন বিভাগ খোলা হইয়াছে। ক্যান্সার-চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাদি করা হইতেছে।

সেবাপ্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য 'বিবেকানন্দ ইনষ্টিট্যুট' খোলা হইয়াছে; ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কলেজ অব মেডিসিন'-এর অঙ্গীভূত।

পেরিয়ানায়কেনপালয়ম (কোয়েম্বাতুর) রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের কার্যবিবরণী (১৯৬৪-'৬৫) প্রকাশিত হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের এই শাখাটি দাক্ষিণাত্যে একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র। কোয়েম্বাতুর হইতে ১১ মাইল দূরে উতাকামণ্ড রোডের পার্শ্বে ৪০০ একর ভূমির উপর নিম্নলিখিত শিক্ষায়তনগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে :

বহুমুখী বিদ্যালয়, বেসিক ট্রেনিং স্কুল, স্বামী শিবানন্দ স্কুল, সিনিয়র বেসিক স্কুল, বি. টি. কলেজ, শারীর শিক্ষা কলেজ, প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় আর্টস কলেজ, সমাজ-শিক্ষা সংগঠক-শিক্ষণ কেন্দ্র, গ্রামীণ শিক্ষা কলেজ, কৃষি শিক্ষা বিদ্যালয়, কলানিলয়ম্, ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল, শিল্প বিদ্যালয়।

গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ২৭,০০০; ১১০ খানি পত্র-পত্রিকা লওয়া হয়।

ডিসপেনসারীতে ১৬,৭৪১ জন রোগী পরীক্ষিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৯,৯৫৮ জন পুরুষ, ২,১২৭ জন স্ত্রীলোক এবং ৪,৬৫৬টি শিশু।

আলোচ্য বর্ষে সাময়িক উৎসবগুলি যথাযথ মর্যাদাসহকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবে ১০,০০০ নারায়ণের সেবা করা হয়; উৎসবে ৩০,০০০ লোকের সমাগম হইয়াছিল।

আমেরিকায় বেদান্ত

উত্তর ক্যালিফর্ণিয়া

স্যানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটি : অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ; সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। নূতন মন্দিরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা দেওয়া হয়।

ডিসেম্বর, ১৯৬৫ : সৎসঙ্গ; চরম আত্মোন্নতি; বিশ্বশান্তি; 'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ'; বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধিকা শ্রীসারদাদেবী; আধ্যাত্মিকতার মাপকাঠি; পারমার্থিক সত্যের প্রতিবন্ধক—শব্দ; মানুষের পথপ্রদর্শক সেই জীবন (খৃষ্টমাস উপলক্ষে)।

জানুআরি, ১৯৬৬ : যোগ আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের তুলাদণ্ড; যুদ্ধ না শান্তি? নৈতিক মূল্যমানের প্রয়োজনীয়তা; স্বামী বিবেকানন্দ ও বিশ্বের প্রতি তাঁহার বাণী; ঈশ্বরই আমার শক্তি ও সঙ্গীত; কাল, মন ও নিত্যতা; সর্বজনীন ধর্মের অর্থ কি? ঈশ্বরকে খুঁজিও না, তাঁহাকে দর্শন কর।

মার্চ, '৬৬ : অন্ধকার নয়, জীবনের আলো; মৃত্যুর পূর্বেই যাহা আমাদের করণীয়; ঈশ্বরানুভূতির পরাকাষ্ঠা লাভের উপায়; শরীর ও মনকে কিরূপে আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ করা যায়? চিন্তার সীমার পারে; অতীন্দ্রিয় জীবন; স্ফোটবাদ-রহস্য; উন্নত মনের জাগরণ; আমেরিকাকে স্বামী বিবেকানন্দ কি ধর্ম দিয়াছিলেন?

স্যাক্রামেণ্টো কেন্দ্র : অধ্যক্ষ—স্বামী অশোকানন্দ, সহকারী—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।

বিভিন্ন সময়ে আলোচ্য বিষয় :

জানুআরি, ১৯৬৬ : পুরাতনের বিদায় ও নূতনের অভিনন্দন; অন্তরের শান্তি বৃদ্ধি করিবার উপায়; স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী; বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধক; মনের দুঃসহ যাতনা।

ফেব্রুআরি : নীতিপরায়ণতার তাৎপর্য কি? যোগ—মন স্থির করিবার বিজ্ঞান; ঈশ্বর আমার শক্তি ও সঙ্গীত; শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী।

মার্চ : জাগতিক ঐশ্বর্য ও ঐশ্বরিক সম্পদ; যোগ—ইহার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ; পৃথিবীতে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানোন্মেষ, ঈশ্বরদর্শনের জন্য জীবাত্মার ব্যাকুলতা।

এতদ্ব্যতীত স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কঠোপনিষদের ক্লাস লইয়াছিলেন।

উৎসব-সংবাদ

রহড়া : ৪ঠা এপ্রিল সোমবার প্রাতে মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, উষাকীর্তন প্রভৃতি দ্বারা রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবের সপ্তাহব্যাপী কার্যসূচী আরম্ভ হয়। অপরাহ্ণে শিক্ষা ও কুটীরশিল্প প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু। অধ্যাপক বসু তাঁহার সুচিন্তিত ভাষণে শিশুদের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় পরিচয় এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। বিজ্ঞানাচার্যকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া আশ্রমের কর্মসচিব স্বামী পুণ্যানন্দ বলেন যে, আশ্রমের ছেলেদের এই প্রদর্শনীটি শিশুর সৃজনশীল মনের পরিচয় বহন করিতেছে।

শিক্ষা ও কুটীরশিল্প প্রদর্শনীতে বালকাশ্রমের সতরটি সংস্থা যোগদান করিয়াছিল। তাছাড়া নরেন্দ্রপুর আশ্রম, ভারত সরকারের পুনর্বাসন শিল্প সংস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। স্নাতকোত্তর বুনিয়াদি শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান এবং ইতিহাস বিভাগ ইউ. এস. আই. এস., ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং আশুতোষ মিউজিয়মের সহযোগিতায় একটি চমৎকার শিক্ষামূলক গ্যালারি পরিচালনা করিয়াছিলেন।

বিবেকানন্দ সেন্টিনারী কলেজ, কারিগরি বিদ্যালয় এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানশাখার বিদ্যার্থীরা তাহাদের কক্ষগুলিতে নানাবিধ আধুনিক বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম ও

যন্ত্রপাতি সহ বিজ্ঞান ও শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছিল।

প্রাক্-বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের শিশুদের হাতের কাজ, নিম্ন ও উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়গুলির বিভাগ পরিকল্পনা ও পরিচালনা, নিম্ন ও স্নাতকোত্তর বুনিয়াদি শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের বিবিধ শিক্ষামূলক মডেল, হস্তশিল্প, কুটীরশিল্প ও কারুশিল্প এবং জেলা গ্রন্থাগারের রহড়া শাখা কর্তৃক পরিকল্পিত আদর্শ গ্রন্থাগারের পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রদর্শনীটি সমগ্রভাবে খুবই আকর্ষণীয় হইয়াছিল।

উৎসবে কীর্তন, ভজন, নাট্যাভিনয়, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন বিভাগের তরজা এবং শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ ও সম্প্রদায়ের ব্যায়াম প্রদর্শন দর্শকগণের মনে বিপুল আনন্দ সঞ্চার করিয়াছে। বিভিন্ন দিনে যাঁহাদের বক্তৃতা ও ভাষণ সুধীজনকে নূতন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

দুই লক্ষাধিক দর্শক উৎসব ও প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছেন। ১০ই এপ্রিল রবিবার সকালে রহড়া পল্লীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমার পর সপ্তাহব্যাপী উৎসব শেষ হয়।

আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২৯শে এপ্রিল হইতে ১লা মে পর্যন্ত তিন দিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দের বাৎসরিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

উৎসবের প্রথম দিন সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ এক বিরাট শোভাযাত্রা আশ্রমপ্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া সহরের প্রধান রাস্তাগুলি প্রদক্ষিণ করে। পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদি এবং আশ্রমের ছাত্রাবাসের বিদ্যার্থীদের বিদ্যার্থী-হোম এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে সম্পন্ন হয়। বিকালে জনসভায় স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ (সভাপতি) ও শ্রীরাধেশ্যাম সরকার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোচনা-কালে বলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বধর্মসমন্বয় করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদর্শিত উদার মত ও পথ অবলম্বন করিলে বর্তমান বিশ্বের শান্তির প্রয়াসকে সাফল্যমণ্ডিত করা যাইবে।

দ্বিতীয় দিন কোল মাইনস্ ওয়েলফেয়ার কমিশনার শ্রী এস. কে. সিংহ মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিশাল জনসভা হয়। সভায় স্বামী ধ্যানাত্মানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবন-কাহিনী পরিবেশন প্রসঙ্গে বলেন, শ্রীশ্রীমা নারীজীবনের এক মহিমময় দিক উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, তাঁহার অপার করুণা ও মাতৃস্নেহে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই ধন্য হইয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী তাঁহার ভাষণে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতবর্ষের নব-জাগৃতির ঐতিহাসিক পটভূমিকায় স্বামী বিবেকানন্দের গৌরবময় ভূমিকা বিশ্লেষণ করিয়া বলেন, তাঁহার দেহাবসানের তিন বৎসরের মধ্যেই তাঁহারই প্রদত্ত 'অভীঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত বাংলা তথা ভারতবর্ষের নচিকেতারা মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে এবং দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন।

১লা মে রবিবার তৃতীয় দিনে আশ্রম-বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ সভায় পশ্চিমবঙ্গের সহকারী শিক্ষা-অধিকর্তা শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্ত মহাশয়ের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে—স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়িয়া তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বাৎসরিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন আশ্রমের

কর্মসচিব স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ। সভাপতির মনোজ্ঞ ভাষণের পর শ্রীদত্ত বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। সভার শেষে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সাফল্যের সহিত 'নচিকেতা' নাটক মঞ্চস্থ করিয়া দর্শকমণ্ডলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন।

বাগেরহাট: গত ২৯শে এপ্রিল বাগেরহাট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩১তম জন্ম-মহোৎসব মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, শ্রীশ্রীগীতা ও শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ এবং বিশেষ পূজাহোমাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দুপুরে প্রায় দুই হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ পাইয়াছেন। বিকালে শ্রীযুত বিনোদবিহারী সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় আট-নয়শত বিশিষ্ট শ্রোতার উপস্থিতিতে ডাঃ অরুণচন্দ্র নাগ, মোঃ ইউসুপ আলি সেখ, নিত্যানন্দ বিশ্বাস, শ্রীপরমানন্দ রায় ও প্রফুল্লচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদের সম্পাদক মোবারক আলি শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন।

সভাপতি তাঁহার মনোজ্ঞ ভাষণে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে আনন্দ দান করেন। সভার পর সন্ধ্যায় প্রসিদ্ধ রামায়ণগায়ক শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী লঙ্কাকাণ্ড পালা কীর্তন করেন।

অবৈতনিক বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন

দেওঘর: গত ৭ই এপ্রিল বিহারের শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ সিংহ মহাশয় দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের এক-পার্শ্বে স্থানীয় শ্রমিক-সম্প্রদায়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য বিবেকানন্দ অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই সব শিশু স্থানীয় পাশী (অনুন্নত) সম্প্রদায়-ভুক্ত, অত্যন্ত দরিদ্র। এতদিন ইঁহাদের পড়াশুনার কোনও সুবন্দোবস্ত ছিল না। বিদ্যালয়ের শিশুদের প্রত্যহ বিনামূল্যে দুপুরের আহার দেওয়া হয়; পোষাক, পুস্তক প্রভৃতিও বিনামূল্যে সরবরাহ করা হইয়াছে। উদ্বোধনী বক্তৃতায় মন্ত্রীমহোদয় বলেন যে সমগ্র বিহারে এই ধরনের স্কুল (যেখানে বিনামূল্যে দুপুরের আহার এবং পুস্তকাদি দেওয়া হয়) ইহাই প্রথম। মিশনের এই শুভ প্রচেষ্টাকে তিনি আন্তরিক অভিনন্দন জানান। এইদিন মন্ত্রীমহোদয় বিদ্যাপীঠের নবনির্মিত ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি ও বায়োলজি লেবরেটরী গৃহেরও দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

প্রচারকার্য

গত ১. ৭. ৬৫ হইতে ২৯. ১২. ৬৫ পর্যন্ত স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী মহারাজ নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি দিয়াছেন:

বিষয়	স্থান
সনাতন ধর্ম	খার, বোম্বাই
ধর্মসমন্বয়	,, ,,
আচার্য শঙ্কর; ভগবান বুদ্ধ	বিবেকানন্দ হল
শিক্ষা; স্বামী বিশ্বানন্দের স্মৃতি	বোম্বাই
সনাতন ধর্ম	বরিষা-বেহালা, কলিকাতা
ধর্মজীবন	কলিকাতা
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ	ভট্টাচার্যপাড়া, হাওড়া
শিক্ষার উদ্দেশ্য	থালতল লাইব্রেরী
ভারতের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাণী	বলরাম-মন্দির, কলিকাতা
মহাপুরুষ-স্মৃতি	বালিগঞ্জ ,,
ভক্ত নাগমহাশয়	বকুলবাগান ,,
ধর্ম কি?	সুরক্রিজ ভবন ,,
নারীজাতির আদর্শ	রামকৃষ্ণ সারদা মিশন ,,
কর্মযোগ	ইছাপুর
অতীত ও বর্তমানের উপর বেদান্তের প্রভাব	দুর্গাপুর লায়নস্ ক্লাব
স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন ও সমাজসেবা	দুর্গাপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ
সনাতন ধর্ম	খার আশ্রম, বোম্বাই
সনাতন ধর্ম ও দুর্গাপূজা	,, ,,
বিশ্বজনীন সনাতন ধর্ম	,, ,,
ভগবদ্গীতার বাণী	শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ,,
সনাতন ধর্মের দান	অনঙ্গমোহন হরিসভা
শ্রীরামকৃষ্ণ	পাঠচক্র, টালিগঞ্জ

বিষয়	স্থান
বিভিন্নধর্মে শ্রীরামকৃষ্ণের দান	রাজকোট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
নিষ্কাম কর্ম	মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা
শক্তিপূজা	বরিষা-বেহালা, কলিকাতা
ভারতের মহান সন্ন্যাসী	আঁটপুর, হুগলি
স্বামী প্রেমানন্দ	" "
ক্ষুধা	রঙমহল, কলিকাতা
স্বামী প্রেমানন্দ	তত্ত্বমন্দির, বেলুড়
শ্রীশ্রীমা	শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, দিল্লী
শ্রীশ্রীমা	" সারদা সমিতি
স্বামী প্রেমানন্দ	আঁটপুর, হুগলি
স্বামী বিবেকানন্দ	ভিজাগাপত্তন
স্বামীজীর আহ্বান	রেলওয়ে ইনস্টিট্যুট

স্বামী অন্তরাত্মানন্দের দেহত্যাগ

আমরা দুঃখিতচিত্তে জানাইতেছি যে, গত ২রা মে, বেলা ৫টার সময় কলিকাতা সেবা-প্রতিষ্ঠানে স্বামী অন্তরাত্মানন্দ (কৃষ্ণন্ মহারাজ) ৫৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ডায়াবিটিস্ ও হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিলেন। গত ৩১শে মার্চ তাঁহাকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হইয়াছিল।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। কয়েক বৎসর তিনি রেঙ্গুন সেবাশ্রমের ও পরে ত্রিচুর আশ্রমের কর্মী ছিলেন। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কালাডি আশ্রমের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

তাঁহার মধুর স্বভাব ও সহাস্য মুখমণ্ডল তাঁহার চিত্তপ্রসাদের পরিচয় প্রদান করিত। সকলেরই তিনি বিশেষ প্রীতির পাত্র ছিলেন।

তাঁহার আত্মা ভগবচ্চরণে চির শান্তি লাভ করিয়াছে। ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

আঁটপুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমানন্দ আশ্রমের উদ্যোগে গত ২রা ও ৩রা এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব পূজা ও শাস্ত্রপাঠাদির মাধ্যমে পালিত হইয়াছে। প্রথম দিন সন্ধ্যায় কাসুন্দিয়া 'মায়ের মন্দিরের' সভ্যগণ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাকীর্তন পরিবেশন করেন।

দ্বিতীয় দিন সকালে কলিকাতার 'রামকৃষ্ণ কথামৃত সঙ্ঘ'—'সুরে কথামৃত' পরিবেশন করেন। বৈকালে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহারাজ, স্বামী অচিন্ত্যানন্দ ও শ্রীহেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী প্রেমানন্দের জীবন ও বাণী অবলম্বনে সুললিত ভাষণ দেন।

পরে শিবপুর কল্পনা মজ্লিল কর্তৃক 'হৈমবতী উমা' ও 'বীর অভিমন্যু' যাত্রাগান হয়। উৎসবের দুইদিন অন্ততঃ দশহাজার ভক্ত সমাগম হইয়াছিল। প্রসাদ হাতে হাতে বিতরিত হয়।

নূতনপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৩রা এপ্রিল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩১তম জন্মোৎসব অনাড়ম্বর গ্রাম্য পরিবেশে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে সহস্রাধিক ভক্ত তৃপ্তির সহিত প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজী সভাপতিত্ব করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত জীবন পর্যালোচনা খুবই সময়োপযোগী হইয়াছিল।

বাঁখাটি শ্রীরামকৃষ্ণ জুনিয়ার হাইস্কুলে গত ২০শে চৈত্র রবিবার যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩১তম জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি সহ প্রভাত-ফেরী, পূজার্চনা, শ্রীশ্রীচণ্ডী ও গীতা পাঠ এবং দুপুরে প্রসাদবিতরণ করা হয়। বিকালে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তা কর্তৃক বিবিধ বিষয়ের আলোচনা জনচিত্তে গভীরভাবে রেখাপাত করে।

স্বামী গদাধরানন্দ মহারাজের পৌরোহিত্যে, এবং স্বামী চিদ্‌রসানন্দের সক্রিয় সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হয়। পরদিবস শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম-সংকীর্তন জনগণকে মুগ্ধ করে।

দোমড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ৭ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩১তম জন্মোৎসব পূজাদির মাধ্যমে সুসম্পন্ন হইয়াছে। দুপুরে প্রায় দুই-হাজার ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিকালে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতি স্বামী সুশান্তানন্দ ও প্রধান অতিথি শ্রীরথীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনকথা আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক নাটক অভিনীত হয়।

কল্যাচক শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির উদ্যোগে গত ৩রা বৈশাখ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩১তম জন্মোৎসব, কল্যাচক বিবেকানন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পূজার্চনা, ভোগরাগ, শোভাযাত্রা, খেলাধুলা, বক্তৃতা ও প্রসাদবিতরণের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ঐদিন সন্ধ্যায় গড়বেতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বদেবানন্দজীর পৌরোহিত্যে ও হেঁড়্যাচক্রের অবর পরিদর্শক শ্রীযুত বাণীকণ্ঠ মিশ্র মহাশয়ের প্রধান আতিথ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী আলোচিত হয়। সভান্তে স্বামী নিগমাত্মানন্দ সেবসামিতির কর্মীদের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচালিত সেবাসমিতির দুগ্ধবিতরণ ও শিশু উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করেন।

৪ঠা বৈশাখ, সকালে ঠাকুরনগর নন্দা মহিলা বিদ্যাপীঠের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের নিকট স্বামী বিশ্বদেবানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনকথা ও মাতৃ-সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

ভদ্রেশ্বর রবীন্দ্র-স্মৃতি বিদ্যানিকেতনে গত ১লা মে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পূজা, শাস্ত্রপাঠ ও ভজনের মাধ্যমে সমস্তদিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে খিচুড়ি ও ফলমূল প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্নে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে ও জেলা শারীর শিক্ষণ ও যুব-কল্যাণ পরিদর্শক শ্রীশিশিরকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রধান আতিথ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহারাজ তাঁহার ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন-দর্শনের গূঢ়-মর্মটি অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করেন।

সন্ধ্যায় ভারত সরকারের ফিল্‌ড পাবলিসিটি ডিভিশন কর্তৃক স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-চিত্র এবং অন্যান্য তথ্যমূলক চিত্র প্রদর্শিত হয়।

অভিনব মোটর

স্টুটগার্টের এক মোটরগাড়ির কারখানা নূতন ধরনের একটি বাস নির্মাণ করিয়াছে। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'রোটেল'। এই বাসে আছে ২৭ জন ট্যুরিস্টের শোবার ঘর, স্নানাগার, রান্নাঘর এবং বৈঠকখানা। ট্যুরিস্টরা কোন হোটেলে না উঠিয়া এই বাসে

বাস করিয়া দেশ-বিদেশ ভ্রমণ ও পরিদর্শন করিতে পারিবে, খরচও কম পড়িবে। বর্তমানে এই বাসটি জেরুজালেম অভিমুখে ভ্রমণরত।

বিশ্বের জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান

সম্প্রতি-প্রকাশিত ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের রাষ্ট্র-পুঞ্জের পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত বর্ষপঞ্জীতে বাহির হইয়াছে যে, বিশ্বের জনসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩২০ কোটিরও বেশী এবং এই সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্ষপঞ্জীতে দেখানো হইয়াছে যে, ১৯৬০ হইতে ১৯৬৪—এই চার বৎসরে বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ১'৮ ভাগ।

চীনের জনসংখ্যা হইয়াছে প্রায় ৬৯ কোটি। ইহার পরবর্তী স্থান ভারতের—জনসংখ্যা ৪৭ কোটি ১০ লক্ষ। ইহার পর সোভিয়েট ইউনিয়ন (২২ কোটি ৮০ লক্ষ) এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের (:৯ কোটি ২০ লক্ষ) স্থান।

এশিয়ার জনসংখ্যা ১৭৮ কোটি ৩০ লক্ষ, ইওরোপের ৪৪ কোটি ১০ লক্ষ, আফ্রিকার ৩০ কোটি ৩০ লক্ষ, লাটিন আমেরিকার ২৩ কোটি ৭০ লক্ষ, উত্তর আমেরিকার ২১ কোটি ১০ লক্ষ, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের ১ কোটি ৭৬ লক্ষ। —রয়টার

পরলোকে ক্ষীরোদবালা রায়

শ্রীশ্রীমায়ের চরণাশ্রিতা ক্ষীরোদবালা রায় গত ৭ই মে সকাল ৫॥ টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম করিতে করিতে সজ্ঞানে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭২ বৎসর। গত একবৎসরকাল তিনি কলিকাতায় ৬-এফ্, আনন্দ পালিত রোডে ডাঃ সৌরীন্দ্রনাথ সরকারের ভবনে বাস করিতেছিলেন।

তাঁহার জন্মস্থান সিলেটে। ১০ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয় এবং ১৫ বৎসর বয়সে তিনি বিধবা হন। পরে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। শ্রীশ্রীমায়ের দুর্লভ সঙ্গ ও অসীম কৃপা লাভের সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে "কমলানেবুর দেশের বৌমা" বলিতেন। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পুস্তকে (দ্বিতীয় খণ্ড) তাঁহার লেখা স্মৃতিকথা রহিয়াছে।

তাঁহার আত্মা শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে চির শান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ ! শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

দিব্য বাণী

শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ—কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি॥ তস্মৈ স হোবাচ—দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরা চ॥ তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥

—মুণ্ডকোপনিষদ্—১।১।৩-৫

গৃহস্থের অগ্রগণ্য শৌনক একদা আসি অঙ্গিরা ঋষির কাছে কন,
"কোন্ বস্তু, (কোন্ মুল উপাদান) জ্ঞাত হলে সবই হয় জানা, ভগবন্—
(যাহা কিছু বিশ্বজুড়ে রয়েছে এ সৃষ্টিমাঝে)?" শুনিয়া অঙ্গিরা কন তাঁরে,
"ব্রহ্মবিদ্‌গণ কহে, 'পরা' ও 'অপরা' এই দুটি বিদ্যা হবে জানিবারে।
ঋক্ যজু সাম আর অথর্ব—এ চারি বেদ, শিক্ষা কল্প আর ব্যাকরণ
নিরুক্ত জ্যোতিষ ছন্দ—এসব অপরা বিদ্যা। যে বিদ্যায় হয় ব্রহ্মজ্ঞান,
(শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়) উপলব্ধি করা যায় অবিকারী নিত্য অক্ষরেরে—
সেই বিদ্যা পরা বিদ্যা (—ছাড়ায়ে বুদ্ধির সীমা দেখায় যা চরম সত্যেরে)।

যদা বৈ বিজানাত্যথ সত্যং বদতি নাবিজানন্ সত্যং বদতি বিজানন্নেব সত্যং বদতি।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্—৭।১৭।১

সত্যেরে যে জানে, সেই যাহা বলে সত্য বলে। সত্যেরে না জানি সবিশেষ
সত্য নাহি কহা যায়। বিজ্ঞান—বিশেষজ্ঞান—লাভ করি তবে পারা যায়
সত্য যাহা, যথাযথ রূপে তাহা কহিবারে। (সকল কিছুর মূলদেশে
রয়েছে যে মহাসত্য, নাহি জানি সে সত্যেরে 'সত্য' বলি' যাহা বলা হয়
আপেক্ষিক সত্য মাত্র বলিয়া তাহারে জেনো, সে কভু চরম সত্য নয়।)

আবেদন

রামকৃষ্ণ মিশন আসাম বন্যার্ত সেবাকার্য

সকলেই অবহিত আছেন, আসামের বিধ্বংসী বন্যা হাজার হাজার মানুষকে গৃহহীন ও অনাহারে প্রায় মৃত্যুর সম্মুখীন করিয়াছে। বন্যার প্লাবন আসিয়াছে পর পর তিনবার; এখন পর্যন্ত সর্বাধিক-বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলির অধিকাংশ স্থলেই পৌঁছিবার কোনও উপায় নাই। শিলচর এবং করিমগঞ্জের মত সহরেও খাদ্যভাণ্ডার নিঃশেষিতপ্রায় হওয়ায় সঙ্কট আরো ঘনীভূত হইয়াছে।

যে স্বল্প পরিমাণ খাদ্য এখনো পাওয়া যাইতেছে তাহার মূল্য এত উচ্চ যে তাহা ক্রয় করা দরিদ্র ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকের একেবারে সাধ্যাতীত। তাছাড়া বন্যার ফলে যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে যে কোন সময় মহামারী সুরু হইতে পারে।

বন্যায় সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে কাছাড় জেলা; এই জেলায় অবস্থিত মিশনের করিমগঞ্জ এবং শিলচর কেন্দ্রের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন কয়েকটি গ্রামে বিবিধ আকারে সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছে। বহু গ্রামে এবং শিলচর সহরে প্রয়োজনানুসারে খাদ্যদ্রব্য বা নগদ টাকা ডোল দেওয়া হইতেছে। করিমগঞ্জ কেন্দ্র হইতে কয়েকটি গ্রাম জুড়িয়া সেখানকার অনুন্নত সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক পরিবারের মধ্যে টেষ্ট রিলিফ পরিচালিত হইতেছে। বস্ত্র এবং ঔষধও বিতরিত হইতেছে।

এই সেবাকার্যে বহু অর্থের প্রয়োজন। খরচ করার মত যে অর্থ আমাদের ছিল, তাহা লইয়া কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের সঙ্গতি সীমিত; আরব্ধ সেবাকার্য চালাইয়া যাওয়ার এবং বিস্তৃততর অঞ্চলে উহা প্রসারিত করার জন্য অবিলম্বে অর্থসাহায্যের প্রয়োজন। এরূপ বিষম বিপদের সময় দুস্থ জনগণকে সাহায্যদানের কাজে রামকৃষ্ণ মিশন সর্বদাই সহৃদয় জনগণের সহায়তা পাইয়া আসিতেছে; আমরা আশা করি এই সেবাকার্য সফলতার সহিত পরিচালনার জন্য এবারেও আমরা অবিলম্বে তাঁহাদের নিকট হইতে স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অর্থসাহায্য পাইতে থাকিব।

এই সেবাকার্যের জন্য সর্ববিধ সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানাগুলিতে পাঠাইলে সাদরে গৃহীত হইবে:—

১। সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন,
পোঃ—বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া

২। সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম,
রহড়া, জেলা—২৪পরগনা

৩। সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম,
নরেন্দ্রপুর, জেলা—২৪পরগনা

৪। কার্যাধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ,
১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩

৫। কার্যাধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম,
৫, ডিহি এণ্টালী রোড, কলিকাতা-১৪

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক,
রামকৃষ্ণ মিশন

তারিখ: ১২ই জুলাই,
১৯৬৬

কথাপ্রসঙ্গে

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট

শিক্ষার উন্নয়ন ও পুনর্বিন্যাস বিষয়ে ব্যাপক তদন্ত শেষ করিয়া ডক্টর কোঠারী পরিচালিত শিক্ষা কমিশন নিজ সুচিন্তিত অভিমত সমন্বিত রিপোর্ট বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তরে দিয়াছেন।

সম্প্রতি এই সুদীর্ঘ রিপোর্টটির সারাংশরূপে সামান্য অংশমাত্র পত্রিকাদির মারফত পাওয়া গিয়াছে, বিস্তারিত সব কিছু এখনো জানা যায় নাই। উহাতে জানা যায়, কমিশন জোড়া-তালি দিয়া বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির সামান্য সংস্কারমাত্র করিবার চেষ্টা করেন নাই, শিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া শিক্ষাপদ্ধতিকে ঢালিয়া সাজিতে চাহিয়াছেন, এবং উহা করিতে চাহিয়াছেন একেবারে নিম্নতম প্রাইমারী শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত, সামগ্রিকভাবে।

স্কুল ও কলেজের বর্তমান শ্রেণীবিভাগের পুনর্বিন্যাস, ছাত্রদের আবাসস্থল হইতে শিক্ষায়তনে যাইবার সুবিধা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষাব্যবস্থা, পরিচালনাদির উন্নয়ন, শিক্ষার মাধ্যম, শিক্ষকের বেতন প্রভৃতি বিষয়গুলি ছাড়াও শিক্ষা কমিশন আরও দুইটি বিশেষ দিকে মনোযোগ দিয়াছেন; এমন দুইটি বিষয়কে শিক্ষার অঙ্গীভূত করিতে চাহিয়াছেন, যাহা ছাত্রগণকে শুধু সাহিত্য-গণিত-বিজ্ঞান-শিল্প প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞানে চিন্তা ও কর্মদক্ষতার ক্ষেত্রেই মাত্র উন্নত না করিয়া সেই সঙ্গে তাহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মানকেও উন্নত করিয়া তুলিবার, এবং হৃদয়কে প্রসারিত করিবার পক্ষে সহায়ক হয়। শিক্ষা কমিশন এজন্য দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যে সহায়তার জন্য শিক্ষায় সমাজসেবাকে আবশ্যিক করিতে চাহিয়াছেন, এবং বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার সহিত ভারতীয় সংস্কৃতিকে সমন্বিত করিতে চাহিয়াছেন, ধর্মশিক্ষা ও ধর্মের মূল্যবোধকে সাধারণ-শিক্ষার অঙ্গীভূত করিতে চাহিয়াছেন। ছাত্রগণই কৃতবিদ্য হইবার পর সমাজ- ও রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণের অঙ্গ হইবে; কাজেই শিক্ষার মাধ্যমে তাহাদের বাঞ্ছিত আদর্শের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধনের সঙ্গে তাহাদের মনেরও উৎকর্ষ-সাধনের জন্য শিক্ষা কমিশন এই বিষয়টিতে মনোনিবেশ করিয়াছেন।

এই প্রচেষ্টা খুবই মহান্ এবং অতীব প্রয়োজনীয়। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এইটিরই এতদিন একান্ত অভাব ছিল। আশা করা যায় কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করিবেন এবং শিক্ষাবাবস্থার উন্নয়নকল্পে কমিশন কর্তৃক উপদিষ্ট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সহিত এটিকেও (রিপোর্টের বিস্তারিত অংশে অধিক গুরুত্ব দেওয়া না থাকিলেও) একই শ্রেণীভুক্ত করিয়া ইহাকে কার্যপরিণত করিতে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হইবেন। এবিষয়ে দেশের শিক্ষিত জনগণের সাগ্রহ সমর্থনও একান্ত কাম্য।

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের যে সারাংশটুকু জানা গিয়াছে, তাহার বিবিধ দিকগুলি লইয়া বহু শিক্ষাবিদ্, চিন্তাশীল ব্যক্তি ইতিমধ্যেই নানরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। স্কুল-কলেজের শ্রেণীর

পুনর্বিন্যাস, শিক্ষকের বেতনবৃদ্ধি, এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বিষয়গুলির প্রতি তাঁহাদের মতামতের ন্যায় সাহিত্য-বিজ্ঞানাদি শিক্ষার সহিত ধর্ম, সংস্কৃতি প্রভৃতি শিক্ষার সংযুক্তির প্রতিও তাঁহাদের মতামত বিভিন্ন ধরনের। কেহ কেহ মনে করেন সাহিত্য-বিজ্ঞান-শিল্পাদির যথাযথ শিক্ষা দ্বারা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির যথেষ্ট পরিমাণ উন্নতি ঘটাইতে পারিলে তাহারই ফলে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বাঞ্ছিত রূপ গ্রহণ করিবে; ইহার জন্য সাধারণ শিক্ষার ভিতর জোর করিয়া ধর্ম সংস্কৃতি প্রভৃতি ঢুকাইবার কোন প্রয়োজন নাই। তাহাই যদি সত্য হইত তাহা হইলে বর্তমানে আমাদের দেশের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা যে সব স্বার্থান্ধ দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিগণের জন্য ক্রমশঃ অবাঞ্ছিত পথগামী ও অবনত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে শিক্ষিত একজন ব্যক্তিকেও দেখিতে পাওয়া যাইত না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় অন্যরূপ। আবার দেখা যায়, অকল্যাণকারীদের মধ্যে যাহার বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ যত বেশী সাধিত হইয়াছে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অকল্যাণ ঘটাইবার শক্তি তাহার তত বেশী হওয়ায় লোকের সর্বনাশ ঘটায় সে অনেক অধিক পরিমাণে। তাছাড়া যে-আদর্শকে জাতীয় আদর্শ বলিয়া যে-দেশ গ্রহণ করে, শিক্ষার মাধ্যমে সেই আদর্শের ছাপ দেশবাসীর মনে শৈশব হইতে ফেলিবার প্রচেষ্টা সেদেশে বিপুল ফলপ্রসূ হইবার উদাহরণ বর্তমান জগতে বিরল নহে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোগুলির মধ্যে কোন্‌টি কোন্ দেশের পক্ষে যথার্থ কল্যাণকর, তাহা অবশ্য অন্য প্রশ্ন। আমরা সমাজের যে রূপটিকে নিজেদের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া মনে করিতেছি, শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে (শিশুকাল হইতেই) তাহার অনুকূল চিন্তার অনুপ্রবেশ ও তাহার বিরোধী চিন্তার দূরীকরণ যে ফলপ্রসূ হইবেই, তাহাতে সন্দেহের কি আছে ?

স্কুল-কলেজ হইতে যে শিক্ষা এখন দেওয়া হইতেছে, কেবল তাহারই পরিধি ও গভীরতা বাড়াইয়া আমরা বিদ্যার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তির ও কর্মদক্ষতার অধিকতর উৎকর্ষ-সাধন ছাড়া অন্য কিছু করিতে পারি না। বুদ্ধিবৃত্তি চলার পথটি দেখাইতে পারে মাত্র, ইচ্ছাশক্তি পথে চলিবার শক্তি যোগায়। কিন্তু ইহাও সব নহে। পথনির্ণয়ের ব্যাপারে মানসিক প্রবণতার প্রভাব প্রধান—বুদ্ধিকে (তা যতই শাণিত ও তথ্যসমৃদ্ধই হউক না কেন) অগ্রাহ্য করে সে পদে পদে, ইচ্ছা-শক্তিকে চালিত করে নিজের নির্ণীত পথে। কাজেই, যে-বিদ্যার্থীরা লব্ধবিদ্য হইবার পর সমাজাদির নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবে, সমাজের কল্যাণার্থে তাহাদের বুদ্ধি-বৃত্তির উৎকর্ষসাধনের সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির এবং মানসিক উৎকর্ষসাধনেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়লব্ধ সাধারণ শিক্ষা বুদ্ধি-বৃত্তির উৎকর্ষসাধন যতখানি সম্ভব করুক, যত বেশী সম্ভব উহাকে তথ্যসমৃদ্ধ করুক, জগতের সর্ববিধ চিন্তার সহিত ছাত্রদের পরিচিত করাইয়া দিক, জাগতিক প্রয়োজনীয় কর্মসাধনের দক্ষতা বাড়াইয়া দিক; আর সেই সঙ্গে যথার্থ কল্যাণের পথটিকে চিনিবার জন্য এবং মানুষের স্বাভাবিক স্বার্থ- ও দুর্বলতা-জনিত বাধা ঠেলিয়া সেই কল্যাণের পথে জীবনকে অগ্রসর করাইবার জন্য ইচ্ছাশক্তিকে এবং হৃদয়ের শুভ মঙ্গলময় বৃত্তিগুলিকে জাগাইয়া বাড়াইয়া তুলুক ধর্ম ও সংস্কৃতিগত শিক্ষা।

এই সমন্বয় ছাড়া আমাদের জাতীয় শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে না। বহুপূর্বেই আমাদের ইহা করা উচিত ছিল। বর্তমানে ইহার সম্ভাবনার ক্ষীণ একটু শিখা দেখা দিয়াছে (শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের সারাংশে বিষয়টিকে স্পর্শমাত্র করা হইয়াছে মনে হইল, মূল রিপোর্টে বিস্তারিত অংশে ইহার রূপদানের ব্যবস্থা কতখানি এবং কিরূপ করা হইয়াছে এখনো তাহা জানা যায় নাই), উহাকে নির্বাপিত করিবার প্রয়াস না করিয়া আমরা সকলে মিলিয়া উহাকে যেন বর্ধিত-দীপ্তি ও কার্য-পরিণত করিতে প্রয়াসী হই।

শিক্ষায় ধর্মের স্থান প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "মানুষের অন্তরে পূর্ব হইতে নিহিত পূর্ণত্বের বিকাশের নামই শিক্ষা।" অন্যত্র আবার বলিয়াছেন, "শিক্ষা অর্থে মানবের মধ্যে পূর্ব হইতেই যে ঈশ্বরত্ব রহিয়াছে তাহাই প্রকাশ করা।" ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়াও তিনি এই অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশসাধনের কথাই বলিয়াছেন। আমরা সকলেই স্বরূপতঃ পূর্ণ—অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত প্রেম স্বরূপ। সর্ববিধ জ্ঞান ও প্রেম এবং সর্ববিধ অস্তিত্ব যে মহাপূর্ণতায় একীভূত হইয়াছে, তাহাই আমাদের স্বরূপ; বাধা সরাইয়া আমাদের এই স্বরূপের প্রকাশের পথ অবারিত করাই শিক্ষা এবং ধর্ম উভয়েরই লক্ষ্য। যে দিক হইতেই হউক না কেন, মানুষের সত্যান্বেষণ-স্পৃহা এই পূর্ণত্বের লক্ষ্যেই পৌছিতে চায়—"কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি?"

এই পূর্ণত্বের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই স্বামীজী বলিয়াছেন যে, ধর্মকে বাদ দিলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। মানুষের স্বরূপের আবরণ অপসারণে অন্যান্য প্রয়াস অপেক্ষা ধর্ম অধিকতর সাফল্যের সহিত অগ্রসর হইতে সমর্থ বলিয়া তিনি বলিয়াছেন, "ধর্মই শিক্ষার অন্তরতম অঙ্গ। ইহা যেন অন্ন এবং শিক্ষাসংক্রান্ত অপর সবই ব্যঞ্জনস্থানীয়। শুধু ব্যঞ্জন খাইলে অজীর্ণতা জন্মায়; আর শুধু অন্ন আহারেও তাহাই।"

সাধারণতঃ জ্ঞানের অংশ-বিশেষের দিকেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে বলিয়াই, শিক্ষা বলিতে আমাদের স্বরূপের আংশিক প্রকাশের কথা ভাবি বলিয়াই, শিক্ষা ও ধর্মের মধ্যে আমরা এত পার্থক্য দেখি এবং শিক্ষায় ধর্মের স্থানের কথা ভাবিতে বেগ পাই। ইহার অপর কারণ, ধর্ম বলিতে আমরা সাধারণতঃ ধর্মলাভের উপায়স্বরূপ অনুষ্ঠানগুলির কথাই ভাবি। শিক্ষা-প্রসঙ্গে স্বামীজী তাই বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন, "প্রথম আত্মবিদ্যা—ঐ কথা বললেই যে জটাজূট, দণ্ড, কমণ্ডলু ও গিরিগুহা মনে আসে, আমার বক্তব্য তা নয়। তবে কি? যে জ্ঞানে ভববন্ধন হতে মুক্তি পর্যন্ত পাওয়া যায়, তার দ্বারা কি আর সামান্য বৈষয়িক উন্নতি হয় না?"—ধর্ম বলিতে এই জ্ঞানের উদ্বোধনই তাঁহার লক্ষ্য।

যতটুকুর জন্য, যে দিক হইতেই অগ্রসর হওয়া যাউক না কেন, "এই জ্ঞান আহরণের একটি মাত্র উপায় আছে। প্রাকৃত ব্যক্তি হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগীকে পর্যন্ত ঐ একই উপায় অবলম্বন করিতে হয়। একাগ্রতাই সেই উপায়।" ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা বা আত্মবিশ্বাস এবং ইচ্ছাশক্তির বর্ধন এই একাগ্রতাকে এবং ধারণাশক্তিকে বর্ধিত করিয়া তোলার সহায়ক বলিয়া ধর্মলাভে এবং শিক্ষালাভেও এগুলি অনিবার্য।

এই জন্যই তিনি শিক্ষায় ধর্মের স্থান এত

উচ্চে দিয়া গিয়াছেন এবং বিশেষ করিয়া এদেশের আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলিতে গিয়া বারে বারে জোর দিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, ধর্মকে সেখানে রাখিতেই হইবে—"চাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত বেদান্তের সমন্বয়—ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা এবং আত্মবিশ্বাস হইবে যাহার মূলমন্ত্র।"

যাহারা বিজ্ঞান পড়িতে যায়, তাহারা সকলেই আর নিউটন বা আইনষ্টাইন হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া বিজ্ঞানশিক্ষা কেহ ছাড়িয়া দেয় না—যে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করিতে পারে, তাহার ততটুকু ফলই সে লাভ করে। ধর্ম বিষয়েও স্বামীজী তাহাই বলিয়াছেন, শিক্ষা-ব্যবস্থায় জাগতিক বিদ্যার সঙ্গে ধর্ম শিক্ষা করার অর্থ, অন্তরস্থ সদ্‌বৃত্তিগুলির বিকাশ-সাধনের পথে যে যতটুকু পারে অগ্রসর হউক—সে তাহার শুভ ফল পাইবেই; ইহার ফলে তাহার অন্তরস্থ শক্তির বিকাশ যতটুকু ঘটিবে, তাহাতে যে কার্যই সে করুক না কেন, তাহা আরও ভালভাবে করিতে পারিবে—"মুক্তি, বৈরাগ্য, ত্যাগ, এ সকল তো মহাশ্রেষ্ঠ আদর্শ; কিন্তু 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'—এই আত্মবিদ্যার সামান্য অনুষ্ঠানেও মানুষ মহাভয়ের হাত হইতে বাঁচিয়া যায়। মানুষের অন্তরে যে শক্তি রহিয়াছে, তাহা উদ্বুদ্ধ হইলে মানুষ অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইতে সুরু করিয়া সব কিছুই অনায়াসে করিতে পারে।" "অতি অল্প কর্মও যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইলে অদ্ভুত ফল লাভ হয়; অতএব বেদান্তের আলোচনা যে যতটুকু পারে করুক। মৎস্য-জীবী যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন শ্রেষ্ঠ মৎস্যজীবী হইবে; বিদ্যার্থী যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্যার্থী হইবে।" স্বামীজী তাই চাহিয়াছিলেন, ধর্মের ভাবগুলির সহিত বিদ্যার্থীরা পরিচিত হউক এবং প্রথম হইতেই হউক—"রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ্ প্রভৃতি হইতে সহজ এবং সরল ভাষায় কতকগুলি গল্পের বই সঙ্কলন করিয়া আমাদের ছেলেদের পড়িতে দিতে হইবে।"

স্বাধীন চিন্তায় নিজেকে গঠন করিবার জন্য বিদ্যার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন—"গাধাকে পিটাইয়া ঘোড়া করা যায় শুনিয়া একব্যক্তি তাহার গাধাটিকে প্রহার করিতে করিতে ঘায়েল করিয়াছিল। ঠিক এইভাবে পিটাইয়া ছাত্রদের মানুষ করার পদ্ধতিটি তুলিয়া দিতে হইবে।...চারা গাছকে যেমন বাড়ানো যায় না, শিশুকেও সেরূপ জোর করিয়া শিক্ষিত করা যায় না।" কাজটি হইল, বুদ্ধিবৃত্তির ও হৃদয়ের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপযোগী পরম কল্যাণকর যে সব চিন্তা এদেশের এবং বিদেশের মানুষ করিয়াছে, তাহা সবই বিদ্যার্থীদের নিকট পরিবেশন করিতে এবং তাহাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করা শিখাইতে হইবে। আমাদের জাতির (সমগ্র মানব-জাতিরই) শ্রেষ্ঠ চিন্তাগুলি রহিয়াছে ভারতীয় ধর্মের মূল ভিত্তি বেদান্তের মধ্যে। অন্যান্য বহুবিধ চিন্তার সহিত বিদ্যার্থিগণ সেই উদার সর্বজনীন চিন্তাগুলির সহিতও যেন পরিচিত হইবার সুযোগ পায়। আর তাহারা সেগুলির মধ্যে কোন্‌টি কল্যাণকর তাহা বুঝিয়া সেভাবে নিজেদের গড়িয়া তুলুক—"আমার জীবনের একমাত্র সাধ প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট কতগুলি মহনীয় ভাব পরিবেশনযোগ্য একটি যন্ত্র চালু করা; তাহার পর ভারতের নরনারী নিজে-দের ভবিষ্যৎ নিজেরাই গড়িয়া তুলুক। মানব-জীবনের দুরূহ প্রশ্নাবলী লইয়া আমাদের

পূর্বপুরুষগণ এবং অন্যান্য জাতি কত কি ভাবিয়াছেন, তাহা জানা দরকার।···রাসায়নিক দ্রব্যগুলির সমাবেশ করিয়া দেওয়াই আমাদের কাজ—উহার মিশ্রণজনিত দানাবাঁধা প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী ঘটিবে।"

এই জন্যই বিশেষ করিয়া শিক্ষার সহিত ধর্মের সমন্বয় একান্ত প্রয়োজন। নতুবা, স্বামীজীর সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থার ফলে যাহা ঘটিত (এখনো বহুলাংশে যাহা ঘটিতেছে), শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মের স্থান শুধু নামে মাত্র নয় স্বামীজীর নির্দেশমত বেশ ভালভাবে না দিলে ভবিষ্যতেও তাহাই ঘটিতে থাকিবে—ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বিরোধী কতকগুলি বিদেশাগত চিন্তার সহিতই শুধু আমাদের ছাত্রদের পরিচয় ঘটিবে, আমাদের দেশের সচ্চিন্তাগুলির সহিত পরিচিত হইয়া সবগুলি তুলনা করিয়া দেখার সুযোগ তাহারা পাইবে না, এবং তাহার ফলে 'ষোল বছরে পদাপর্ণের পূর্বেই কতকগুলি নেতিবাচক ভাবের সমষ্টিমাত্র' হইয়া তাহারা মেরুদণ্ডহীন হইয়া পড়িবে—'ভালমন্দ নির্ণয় নিজের বিচার-বিবেক সহায়ে' হইবে না, 'পাশ্চাত্য যাহা ভাল বলে তাহাই ভাল বলিয়া এবং যাহা মন্দ বলে তাহাই মন্দ বলিয়া বিবেচিত' হইবে।

যে চিন্তা প্রবলতম হইয়া আজ মনুষ্যজাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, পৃথিবীর অধিকাংশ মানবমনে প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহা জড়াত্মক ; যাহাকে আমরা মানুষের 'স্বভাব' বা 'প্রকৃতি' বলি তাহার উর্ধ্বে সে চিন্তা উঠিতে চায় না। ইহার পরিণাম অতি ভয়াবহ। স্বভাবের স্রোতে গা ভাসাইয়া চলা আয়াসহীন ও আপাতমনোরম, কিন্তু উহা অনিবার্যভাবে মৃত্যুর পথেই টানিয়া লইয়া যায়। আজ বহিঃপ্রকৃতির বিজয়লব্ধ সমস্ত শক্তিসম্পদ আমরা নিয়োজিত করিতেছি অন্তঃপ্রকৃতির, 'স্বভাবের' প্রবাহের অভিমুখে নিজেদের দ্রুততর বেগে ভাসাইয়া লইয়া চলিতে। আমাদের বহিঃপ্রকৃতির বিজয়লব্ধ সমস্ত শিক্ষাই ব্যর্থ হইবে, আমাদের উন্নতির না হইয়া অবনতিরই সহায়ক হইবে, যদি এখনো আমরা আমাদের চিন্তাকে দেহেন্দ্রিয়-সীমিত 'স্বভাবের' উর্ধ্বে প্রসারিত না করি। এরূপ করিবার একমাত্র উপায় ধর্ম-শিক্ষা। অতি-আধুনিক যুক্তিজালকেও হেলায় ছিন্ন করিয়া, চিন্তাকে দেহেন্দ্রিয়সীমিত স্বভাবের বহু উর্ধ্বে লইয়া গিয়া এখনো মানুষকে তাহার অতি-আকাঙ্ক্ষিত শান্তিধামে পৌঁছাইয়া দিতে পারে আমাদের ধর্ম-চিন্তাগুলি।

এই চিন্তাগুলি আমাদের মধ্যে অতি সহজেই অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে। স্বামীজী বলিয়াছেন, সংস্কৃত ভাষা আমাদের জাতির 'সংস্কারে' পরিণত হইয়াছে—সংস্কৃত মন্ত্রের উচ্চারণমাত্রে মন চিন্তার উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়। আমরা খুবই আশা করিয়াছিলাম, শিক্ষার উন্নয়ন ও পুনর্বিন্যাসের পরিকল্পনায় সর্বভারতে সংস্কৃত-শিক্ষাও বহুদূর পর্যন্ত আবশ্যিক হইবে, অন্ততঃ পূর্বে যেরূপ ছিল, ততদূর (১০ম শ্রেণী) পর্যন্ত। তাছাড়া সংস্কৃত শিক্ষা শুধু আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির বাহকই নয়, জাতীয় সংহতিসাধনেও একটি অচ্ছেদ্য বন্ধন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

(১)

গুরুপাদপদ্ম ভরসা

৮ই জুন, ১৮৯৭
আলমবাজার মঠ

ভাই গঙ্গাধর,

তোমার ৪ঠা জুনের পত্রে তুমি টাকাগুলি পাইয়াছ জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। ঐ দশ টাকা বিপিন জামাই দিয়াছে। নামধাম সহ টাকা কাগজে acknowledge করিবে। তোমাদের কার্যের কথা তোমরা না লিখিয়া গ্রামের লোক অথবা Govt. Officerগণ যদি লিখিয়া পাঠান, তাহা হইলে অধিক কাজ হইবে। তোমরা এই বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিবে। Mirror ও বসুমতীতে তোমাদের কার্য-বিবরণ কিছু বাহির হইয়াছে। সেই বসুমতীখানি তোমাদের পাঠান হইয়াছে। তোমরা যে হারে চাউল দিতেছ, সেই হারে মাসে কত খরচ হয়, তাহা শীঘ্র লিখিয়া পাঠাইবে। আমরা প্রতিদিন এক মণ করিয়া চাউলের বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত আছি। টাকা ফুরাইবার ৮।১০ দিন পূর্বে এখানে খবর দিবে। টাকার জন্য কিছু ভাবিওনা। গুরুদেবের উপর নির্ভর করিয়া খুব উৎসাহের সহিত কার্য কর। এখানকার সকলের কুশল। তোমাদের কুশল সমাচার দিবে। সকলে আমাদের নমস্কার ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—

দাস
ব্রহ্মানন্দ

(২)

গুরবে নমঃ

২৩।৬।৯৭
আলমবাজার মঠ

ভাই গঙ্গাধর,

অদ্য তোমার এক পত্র পাইয়া সকল জ্ঞাত হইলাম। কল্য ১০০৲ টাকার মণি-অর্ডার করিব। প্রাপ্তিমাত্রে সংবাদ দিবে। আর আমার কাছে বিশেষ কিছু টাকা নাই। তবে Brahmavadin Office হইতে শীঘ্র কিছু টাকা আসিবার সম্ভাবনা আছে। উহা আসিলে জুলাই মাস নাগাদ পাঠাইয়া দিব। তোমরা আর একটি Centre খুলিবার কি করিতেছ? ওখান হইতে কি একটি লোক যোগাড় হয় না? নেহাত না হয়, আমাদের লিখিবে। এখান হইতেই কাহাকেও পাঠাইয়া দিব। আমি এখন এক রকম ভাল আছি। মঠের আর সকলেও ভাল আছে। তোমরা আমার ও এখানকার সকলের প্রণাম ও ভালবাসা জানিবে। ইতি

দাস
Brahmananda

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর্ত জনগণ সঙ্গে*

স্বামী নির্বেদানন্দ

আমরা দেখেছি, শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মীয়গণ তাঁর আন্তরিক নিঃস্বার্থ ভালবাসার ন্যায্য অংশ সকলেই পেয়েছিলেন; তার বেশী আর কিছু তাঁদের চাইবার ছিল না। তবু তাঁর ভালবাসা কেবল আত্মীয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সে ভালবাসা উদার আকাশের মত সারা জগৎ ছেয়ে ফেলেছিল, আত্মীয়-অনাত্মীয়ের, ধনী-নির্ধনের মধ্যে কোন পার্থক্য বিচার করে নাই। তাঁর প্রেম অফুরন্ত ধারায় ঝরে পড়ত; সে প্রবাহ হতে প্রেম-সলিল পান করার দ্বার তৃষ্ণার্ত সকলের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। প্রাণীমাত্রেরই মধ্যে তিনি জগন্মাতার প্রকাশ দেখতে পেতেন, এবং জীব ও ঈশ্বর উভয়ের জন্যই তাঁর ভালবাসা ও শ্রদ্ধার তীব্রতা ছিল সমান। কারো কষ্ট দেখলে তাঁর বুক ফেটে যেত। আসলে তিনি আর্ত জনগণের সঙ্গে নিজেকে এক করে ফেলতেন, আর্তজনের আকুলতাকে তিনি নিজেরই আকুলতা বলে অনুভব করতেন এবং সেই আকুলতা নিয়েই তার দুঃখের প্রতিকার খুঁজতে সচেষ্ট হতেন। নিজের খাওয়ার প্রয়োজনবোধ যতক্ষণ থাকত, ততক্ষণ তাঁকে দেখতে হত মা-কালীর খাওয়া হল কি না, এবং চোখের সামনে ক্ষুধার্ত যারা রয়েছে, তারাও খেয়েছে কি না

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময় শ্রীরামকৃষ্ণ একবার মথুরবাবুর সঙ্গে তীর্থভ্রমণে বের হয়ে কাশী, এলাহাবাদ, বৃন্দাবন প্রভৃতি বহু তীর্থ পর্যটন করেন; প্রতি তীর্থেই সেখানকার দেবতা বা দেবীর প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করে তিনি তীর্থের মহিমার সত্যতা প্রমাণিত করেছিলেন। এই তীর্থযাত্রায় পথে তিনি দেওঘর বা বৈদ্যনাথধামে যান। দেওঘর ও তার চারিদিকে তখন দারুণ দুর্ভিক্ষ চলেছে। সেখানকার অধিবাসী সাঁওতালরা তখন দিনের পর দিন খেতে পাচ্ছিল না; তাদের দেহ অস্থিচর্মসার, পরনে কাপড় ছিল না বললেই চলে; অনাহারে বহুলোক মারাও যাচ্ছিল। এ দৃশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে অসহ্য! হতভাগ্য দুর্ভিক্ষ-কবলিতদের পাশে গিয়ে তিনি বসে পড়লেন, নিজেকে তাদেরই মত একজন দুস্থ ভেবে অজস্রধারায় তাদের সঙ্গে কাঁদতে লাগলেন এবং তাদের এ দুর্দশার কিছু প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত তাদেরই মত অনশনে প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প হলেন। মথুরবাবু সঙ্কটে পড়লেন; প্রচুর অর্থব্যয়ে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের মধ্যে খাদ্য-বস্ত্র বিতরণ করে তবে এ সঙ্কটের হাত থেকে তিনি উদ্ধার পেয়েছিলেন।

আর একটি ঘটনাও বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখের উপযোগী। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কোন সময় মথুর বাবু তাঁর একটি তালুকে খাজনা আদায় করতে গিয়েছিলেন; সে সময় শ্রীরামকৃষ্ণকেও তিনি সঙ্গে নিয়ে যান। বৈষয়িক দৃষ্টিতে দেখলে বলতে হয়, মথুরবাবু তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বোকামি করেছিলেন, এ বোকামির জন্য তাঁকে যথেষ্ট খেসারতও দিতে হয়েছিল। প্রজাদের তখন দুঃসময় চলেছে। পর পর দুবছর ফসল হয়নি, ফলে স্থানীয় লোকদের প্রায় অনশনের অবস্থা এসে গিয়েছিল। চারিদিকের এই ভয়াবহ দারিদ্র্য দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ মর্মাহত হলেন, এবং তক্ষুনি মথুরবাবুকে তাদের খাওয়ানোর

* লেখকের মূল গ্রন্থ 'Sri Ramkrishna & Spiritual Renaissance' হইতে অনূদিত।

ব্যবস্থা করতে এবং খাজনা আদায় না করে উল্টে তাদের অর্থ সাহায্য করতে বললেন। মথুরবাবুকে তিনি বোঝালেন যে, আসলে মা-কালী-ই তাঁর সম্পত্তির মালিক, তিনি তাঁর দেওয়ান মাত্র; কাজেই মায়ের প্রজাদের দুঃখ-নিবারণকল্পে মথুরের অর্থব্যয় করা উচিত; মথুরবাবুকে শ্রীরামকৃষ্ণের কথামতই চলতে হল। প্রজাদের প্রতি জমিদারের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত, নিঃসন্দিগ্ধরূপে তার একটা দৃষ্টান্ত তিনি তখন এভাবে স্থাপন করেছিলেন।

কখনো কখনো চোখের সামনে কোন হতভাগ্যকে শারীরিক যন্ত্রণায় কাতর দেখলে তাঁর সমবেদনায় অতি-কাতর হৃদয়ে ও সমভাবে স্পর্শসচেতন শরীরে সে যাতনার স্পন্দন উঠতো। একবার নৌকার ওপর একটি মাঝিকে একজন লোক প্রহার করেছে দেখে সত্যিই তিনি চীৎকার করে উঠেছিলেন, "আমায় মেরে ফেললো, রক্ষা কর!" এবং আশ্চর্যের কথা, প্রহৃত মাঝির পিঠে যেমন কালশিরা পড়েছিল, দেখা গেল, তাঁর পিঠেও ঠিক তারই অনুরূপ দাগ পড়েছে—মাঝিকে যে মারছিল তার পাঁচটা আঙুলের মাপে। সর্বদা মহিমময় একত্বের সাক্ষাৎ অনুভূতি বহির্জগতে কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তার পরিমাপ করবে কে? বাস্তবিকই এই ঘটনায় সেই জ্ঞানগর্ভ বাক্যটিই মনে পড়ে, 'স্বর্গে ও মর্ত্যে এমন বহু জিনিস রয়েছে, দর্শনশাস্ত্র স্বপ্নেও যার কল্পনা করতে পারে না।'

শোকার্তদের দেখামাত্র তাঁর হৃদয় গলে যেত, তিনি নিজেই যেন তাঁদের একজন হয়ে যেতেন। এভাবে দুঃখের অংশগ্রহণের ফলেই তাঁদের হৃদয়ের ভার লাঘব হত অনেকখানি। তারপর তিনি স্নিগ্ধবাক্যে তাঁদের সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিয়ে চলতেন; সে বাক্যের শক্তিতে ব্যথিত চিত্তের ক্ষত যতক্ষণ না একেবারে নিরাময় হয়ে উঠত, ততক্ষণ তিনি থামতেন না।

সৃষ্টির মধ্যে সর্বত্র ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার ফলে একটা নতুন দৃশ্যসম্ভারের দিকে তাঁর দৃষ্টি অবারিত হয়েছিল, সেখানে তাঁর মা-কালীকে, তাঁর আত্মীয়গণকে, দুর্গত জনগণকে, এককথায় সকলকেই তিনি সত্যের একই ভূমিতে, তার বিকাশের একই পর্যায়ে দেখতে পেতেন। বিদ্যামায়ার এইসব বিভিন্ন বিকাশগুলির প্রতি, দেব-মানব, ছোট-বড় সবকিছুর প্রতি একই অসীম প্রেম ও ভক্তির ভাব হৃদয়ে পোষণ করতেন তিনি। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে জ্ঞানযোগীদের তফাৎ অনেকখানি, কারণ মায়াময় জগতের প্রতি জ্ঞানীদের বিন্দুমাত্র দরদ থাকে না; মন থেকে জগৎকে মুছে ফেলতে তাঁরা উঠে-পড়ে লেগে যান। মায়ার স্বপ্নরাজ্যে শূন্যময় ছায়ার মত যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেইসব অবাস্তব জীবের দুঃখমোচন-কল্পে মায়াকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলে তাকে তাঁরা সমর্থন করবেন কিরূপে? ব্যথিতের জন্য সহানুভূতি দেখাতে গেলেই ভ্রমজ দৃশ্যের সত্যতা স্বীকার করতে হয়, তাতে অদ্বৈত সাধনায় ব্যাঘাত ঘটবে নিশ্চিত; কারণ সে সাধনার শিক্ষাই হচ্ছে, "পরব্রহ্মই একমাত্র সত্যবস্তু, আর যা কিছু সবই মিথ্যা।" অদ্বৈতবাদিগণকে এ ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল করে তুলতে হবে। এ পথের নব-দীক্ষিতেরা সেজন্য দুস্থ জনগণের দিক থেকে জোর করে চোখ ফিরিয়ে রাখেন; আর মুক্ত পুরুষরা এদের অস্তিত্বই হেসে উড়িয়ে দেন, যেমন তাঁরা উড়িয়ে দেন সাকার ঈশ্বরকে, তাঁকে বালসুলভ সোনার স্বপ্ন মাত্র জ্ঞান করে। আমরা জানি শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে এ পথের মুক্তপুরুষ তোতাপুরীর হৃদয়ে জগন্মাতা সম্বন্ধে জ্ঞানের আলোকসম্পাত করে

তাঁর চোখ খুলে দিয়েছিলেন। ঠিক এই ভাবেই দুর্দশাগ্রস্ত মানবজাতি সম্বন্ধে অভূতপূর্ব শিক্ষার জ্ঞানালোক বর্ষণ করে পরবর্তী কালে তিনি তাঁর তীক্ষ্ণধী যুবকশিষ্য নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। তাঁকে তিনি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, জীব ও শিব অভেদ; বিশেষ নাম ও রূপের আবরণ জড়িয়ে প্রতিটি প্রাণীর ভিতরে ঈশ্বর স্বয়ং অবস্থান করছেন। নরেন্দ্রনাথ (পরজীবনে যিনি স্বামী বিবেকানন্দ নামে লোকসমাজে পরিচিত হন) গুরুকৃপায় এভাবে ভগবানের আপেক্ষিক প্রকাশের মধ্যে নিহিত এই মহাসত্যের সন্ধান লাভ করেছিলেন।

দুর্গত মানবের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী আবার ভক্তদের আদর্শ দৃষ্টিভঙ্গীকেও ছাড়িয়ে যায়। দ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী উভয়বিধ ভক্তেরাই জগৎ ও তদন্তর্গত সব কিছুকেই হয় ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট, আর না হয় তৎকর্তৃক অভিক্ষিপ্ত বলে গ্রহণ করেন। কাজেই এরূপ জগতের দুঃখ দেখে তাঁদের মনে ব্যথা জাগাই স্বাভাবিক। কিন্তু দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য করুণা-বর্ষণই হচ্ছে তাঁদের হৃদয়ের সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি। ভক্তিযোগের মহান প্রচারক শ্রীচৈতন্য সর্বজীবের প্রতি দয়ার ভাবকে প্রকৃত ভক্তের হৃদয়গঠনের জন্য প্রধান প্রয়োজনগুলির অন্যতম বলে প্রচার করে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তৃপ্তি লাভ করতে পারেন নি। একদা নরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য শিষ্যদের তিনি বলেছিলেন, 'জীবে দয়া করার কথা বলে সবাই! জীবই শিব; কাজেই তার প্রতি দয়া প্রদর্শনের চিন্তায় দুঃসাহসিকতা আসে কোথা থেকে? মনে কৃপা করার ভাব না রেখে জীবকে শিবজ্ঞানে ভক্তি করে শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে তার সেবায় অগ্রসর হতে হয়।' শ্রীরামকৃষ্ণ জগৎকে ঈশ্বরময় দেখতেন; তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে দয়ার ভাব সত্যিই খাপ খায় না। দুস্থ ব্যক্তির চেয়ে নিজেকে উঁচু আসনে বসিয়ে তাকে অনুগ্রহ করার জন্য হস্তপ্রসারণ করা দেবত্বের অবমাননার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। দাতার অহমিকা ত্যাগ করে ভাগ্যহীন দুস্থের বেশধারী ভগবানের সম্মুখে নতজানু হয়ে বসে, প্রয়োজন হলে হৃদয়ের রক্ত দিয়েও তাঁর পূজা করতে হবে

এ যে রহস্যের এক নব দ্বারোদ্ঘাটন! আধ্যাত্মিকতা-লিপ্সুদের চিত্তশুদ্ধির জন্য এবং ঈশ্বরকে সর্বভূতস্বরূপে প্রত্যক্ষ করার স্তর পর্যন্ত তাদের এগিয়ে দেবার জন্য ভগবৎ-উপাসনায় একেবারে নতুন একটি পথ আবিষ্কৃত হয়েছে এতে; আধ্যাত্মিকতার যে ধাপে উঠলে সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শন হয়, তার ঠিক পরের ধাপই হচ্ছে পরব্রহ্মরূপ ভাবাতীত ভূমি। অভূতপূর্ব এবং সম্ভাবনার প্রাচুর্যে ভরা শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণী ধর্ম-বীণার জ্ঞান ও ভক্তি রূপ দুটি তারকেই এক মোচড়ে গতানুগতিক সুরের পর্দার চেয়ে অনেক উঁচু পর্দায় বেঁধে দিয়েছে। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে একথা যেদিন শোনেন, সেইদিনই নরেন্দ্রনাথ তাঁর এক গুরুভাইকে বলেছিলেন, 'আজ যা শুনলাম, সে কথার তাৎপর্যের কোন তুলনাই হয় না। যদি দিন আসে, এই অদ্ভুত বাণীর গভীর রহস্য একদিন সারা জগৎকে শোনাবো।' আর, এ প্রতিজ্ঞা-পালন করার জন্য বেঁচে থেকে তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞানে দুর্গত মানবকে সেবা করা রূপ নতুন অধ্যাত্ম-সাধনার প্রবর্তন জগতে করে গেছেন, এবং এই সাধন-পদ্ধতির আধ্যাত্মিক মূল্য চোখের সামনে কার্যকরী করে হাতে হাতে দেখিয়ে দিতে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন রামকৃষ্ণ মিশন।

খৃষ্টানদের দানধর্মের ও বৌদ্ধদের মানবসেবাধর্মের ভাবের সঙ্গে এই ঈশ্বরের পূজাজ্ঞানে সেবার ভাবের মূলগত পার্থক্য অনেক। বস্তুগত দিক থেকে অবশ্য সবগুলিরই সাদৃশ্য রয়েছে। এ তিনটির মধ্যেই মানুষের দুঃখ নিবারণকল্পে সেবাকার্যের অনুষ্ঠান পরিলক্ষিত হয়; এ-পর্যন্ত এগুলির ভেতর পার্থক্য আমার মত কিছুই নজরে পড়ে না। এই জন্যই বোধ হয় শ্রীরামকৃষ্ণের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র সঙ্গে, দুস্থ মানবের সেবার মাধ্যমে ভগবদর্চনার সঙ্গে, অনেকেই বৌদ্ধ ও খৃষ্টানদের দয়াব্রতকে গুলিয়ে ফেলেন। বৌদ্ধ ও খৃষ্টানদের এই দয়াব্রত আধ্যাত্মিকতালিপ্সুদের সম্যক্-আচরণের একটা দিক মাত্র, নৈতিক শিক্ষার সহায়ক পদ্ধতির একটা অংশমাত্র। বৌদ্ধধর্ম তো কোনও রূপ ঈশ্বরারাধনায় বিশ্বাসই করে না, আর খৃষ্টধর্মে বলা হয়েছে, "প্রতিবেশীকে আত্মবৎ ভালবাসো"। খৃষ্টধর্মে 'আত্মা' বলতে কখনো ঈশ্বরকে বোঝায় না, কারণ খৃষ্টধর্ম অদ্বৈতবাদীদের মত জীবাত্মা ও পরব্রহ্মের অভেদত্বে বিশ্বাসী নয়। কাজেই অপরকে গভীরভাবে ভালবাসতে শেখানোর জন্য খৃষ্টধর্মের এই নির্দেশ শুধু জোর দেয় অপরের দুঃখকষ্টকে নিজেরই দুঃখকষ্ট বলে ভাবার ওপর। যে দিক দিয়েই ধরা যাক না কেন, এই উভয় ধর্মের মতেই মানবসেবারূপ কার্য আধ্যাত্মিক সাধনার পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতির একটি অংশমাত্র; সেখানে শুধু নৈতিক মূল্যই দেওয়া হয়েছে একে। শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। নিজ শিষ্য বিবেকানন্দকে যন্ত্রস্বরূপ করে তিনি ঈশ্বরারাধনার নতুন নিয়ম ও পদ্ধতির প্রবর্তন করে গেছেন। ঈশ্বরেরই পূজা করা হচ্ছে—এই দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব নিয়ে দুস্থ মানবের সেবা করাটা আধ্যাত্মিক সাধনার একটা পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি, এবং দেখা গেছে এ পদ্ধতি আর কোনকিছুর অপেক্ষা না রেখেই সাধককে ঈশ্বর-উপলব্ধির লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। এটি যে একটি নতুন পন্থার প্রবর্তন, এবং জগতের ধর্মসাধনার ভাণ্ডারে একটি মহামূল্য নতুন সঞ্চয়, তাতে কোন সন্দেহ নাই।

মানুষের মধ্যে দেবত্বের উপলব্ধিই শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণীর ভিত্তিভূমি। প্রতিমা অবলম্বনে ঈশ্বরের পূজার মত মানবরূপ বিগ্রহ অবলম্বনে তাঁর সেবার মাধ্যমে মানুষ যে নিশ্চিতই ঈশ্বরলাভ করতে পারে, সে বিষয়ে তাঁর বিশ্বাস ছিল দৃঢ়। স্বতন্ত্র আধ্যাত্মিক সাধনা হিসাবে একবার তাঁর একজন ভক্তকে তিনি এভাবে সাধন করতে বলেছিলেন, এবং স্বল্পকালের মধ্যেই এই অভূতপূর্ব সাধনা অপূর্ব ফলপ্রসূ হয়েছে বলে জানতে পেরেছিলেন। ভক্তটি স্ত্রীলোক, মণিলাল মল্লিক নামক শ্রীরামকৃষ্ণের অতীব শ্রদ্ধাবান একজন ব্রাহ্ম ভক্তের কন্যা। ধ্যানকালে বাজে চিন্তা এসে স্ত্রীলোকটির মনের বিক্ষেপ ঘটাতো। তাঁর অসুবিধার কথা শ্রীরামকৃষ্ণকে জানালে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, কাকে তিনি সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। স্ত্রীলোকটি প্রশ্ন শুনে বিস্মিত হলেন, বল্লেন যে একটি ভাইপো তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আরো বেশী করে ভালবাসতে বল্লেন, যত গভীরভাবে পারা যায় ততটা; তবে ছেলেটিকে নিজের ভাইপো না ভেবে গোপাল (বালক শ্রীকৃষ্ণ) বলে ভাবতে বল্লেন। স্ত্রীলোকটি সশ্রদ্ধ আন্তরিকতা নিয়ে এই অদ্ভুত আধ্যাত্মিক উপদেশ মেনে চলতে লাগলেন; অচিরে তাঁর মন খুব উঁচু আধ্যাত্মিক ভাবে সমাহিত হল, চোখের সামনে ভাইপোকে জ্যোতির্ময় বাল-কৃষ্ণ মূর্তিতে রূপায়িত হয়ে যেতে প্রত্যক্ষ করলেন তিনি। ভাইপোর প্রতি মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী

পরিবর্তনের ফলে তিনি বহু দিব্যদর্শনের অধিকারী হয়ে ধন্য হয়েছিলেন।

ঘটনাটি গূঢ়ার্থব্যঞ্জক। এতে দেখা যায়, দৃষ্টিকোণ সামান্য একটু পাল্‌টে নেবার ফলে কিভাবে মহিলাটির আত্মীয়ের প্রতি ভালবাসাটুকু আধ্যাত্মিক সাধনার শক্তিতে রূপায়িত হয়ে তাঁকে ঈশ্বরানুভূতির রাজ্যে দ্রুত উন্নীত করেছিল। ক্লিষ্ট মানবের প্রতি পরহিতৈষীদের ভালবাসাও ঠিক এই ভাবেই শক্তিশালী আধ্যাত্মিক সাধনার রূপ নিতে পারে, একথা সহজেই বোঝা যায়। প্রিয়পাত্রকে ঈশ্বর জ্ঞান করলে, এবং তাকে সেবা করার সময় 'ঈশ্বরের পূজা করছি'—এই ভাব বজায় রাখলে আত্মীয়ের প্রতি সাধারণ ভালবাসার বা পরকল্যাণ-চিকীর্ষুদের অপরের প্রতি ভালবাসার ভিতর একটা আধ্যাত্মিক মূল্য এসে যায়। শুধু মানবিকতার দিক থেকে মনে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভালবাসার পুষ্টিসাধন করা বড় দুরূহ ব্যাপার। বিশেষ করে এই জন্যই 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'য় ঈশ্বরজ্ঞানে মানুষকে ভালবাসাকে আলাদা করে দেখতে হবে আত্মীয়ের প্রতি মানুষের সাধারণ ভালবাসা থেকে, এমন কি পরহিতৈষীদের ভালবাসা থেকেও; কারণ সে সব ভালবাসায় প্রায় সর্বক্ষেত্রে স্বার্থের একটু গন্ধ থেকেই যায়। তাৎপর্য ও মূল্যের দিক থেকে এই দ্বিবিধ সেবার ভেতর আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণও জনহিতকর কার্যের দুটি ভাগ করেছিলেন—নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। তাঁর পরিচিত একজন ধনী ব্যক্তি, শ্রীশম্ভুচন্দ্র মল্লিক, একদিন তাঁকে বললেন যে, কয়েকটি দাতব্য কর্মানুষ্ঠানে বেশ কিছু টাকা তিনি খরচ করবেন বলে ভেবেছেন। তাঁর এই শুভ ইচ্ছায় উৎসাহ দেওয়া তো দূরের কথা, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বিস্ময় বাড়িয়ে একটু কড়াসুরেই বললেন, 'প্রতিদানের কোনরূপ আশা মনে না রেখে এ জাতীয় কাজ যদি করা যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে তা মহৎ কর্ম। কিন্তু এ ভাবে করা খুব কঠিন। যাই হোক, ক্ষণেকের জন্যও যেন ভুলো না, এসব কাজ মানুষের পূর্ণতালাভের উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য নয়। ভগবানকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসা ও তাঁকে লাভ করাই হল মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। আচ্ছা, বল তো, ভগবান যদি এখন তোমায় দেখা দেন, তাহলে তাঁর কাছে কি চাইবে? কয়েকটা হাসপাতাল আর ডিস্পেন্সারী চাইবে, না সর্বক্ষণ তাঁর দর্শন আর কৃপালাভ যাতে হয়, তাই চাইবে? ভুলে যেও না, ভগবানই সত্য, আর সব অনিত্য। মৃত্যুর পূর্বেই তাঁকে লাভ করার জন্য সাধনায় ডুবে যাও। ভগবানকে ভুলে গিয়ে কতকগুলো দাতব্য কর্মানুষ্ঠানে জড়িয়ে যাওয়া তোমার মত লোকের শোভা পায় না।' এ কথার বিকৃত অর্থ করে প্রমাণ করা চলে না যে জনহিতকর কার্যের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের কোন দরদ ছিল না। দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের ব্যথা তাঁর প্রাণে যতখানি সাড়া জাগিয়েছিল, বিনা-চিকিৎসায় যারা অসুখে ভুগছে তাদের জন্যও নিশ্চয়ই তিনি ব্যথিত হতেন ততখানিই। হাসপাতাল ও ডিস্পেন্সারীর প্রয়োজনীয়তাকে তিনি কখনই ছোট করে দেখতে পারেন না। দেওঘরের দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবার জন্য এবং তালুকের প্রজাদের দুঃখ মোচনের জন্য মথুরবাবুর কাছে তাঁর কাতর প্রার্থনা, এবং কোন গ্রামের পানীয় জলের কষ্ট নিবারণের জন্য অপর একজন ভদ্রলোকের কাছে তাঁর আবেদন হতেই বোঝা যায় দুস্থ মানবের জন্য তাঁর অন্তরের বেদনা কত গভীর ছিল। বোঝাই যাচ্ছে, শম্ভুবাবুর প্রতি তাঁর উপদেশ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ধরনের এবং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে শম্ভুবাবুর অন্তরে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের

মন্দীভূত স্পৃহাকে সতেজ করে তোলা। স্পষ্টই বোঝা যায়, শম্ভুবাবুর অন্তরে ভগবানলাভের চেয়ে দান করার আগ্রহই তীব্রতর হয়েছিল; এবং একথা নিশ্চিত যে, সাধারণ লোকে যে ভাব নিয়ে দান করে, শম্ভুবাবুর মনে এ বিষয়ে তার চেয়ে উঁচু ভাব ছিল না। কাজেই এ ধরনের সমাজসেবা নিয়ে খুব বেশী মাথা না ঘামিয়ে জীবনের চরম লক্ষ্য ভগবানলাভের দিকে তাঁকে দৃষ্টি ফেরাতে বলে শ্রীরামকৃষ্ণ খুব সঙ্গত কাজই করেছিলেন। শম্ভুবাবুর অন্তরে আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে দেখেই বোধ হয় জনহিতকর কাজ থেকে ধর্মসাধনার দিকে তাঁর মতি ফিরিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রয়োজন-বোধে তাঁকে নৈতিক স্তর থেকে আধ্যাত্মিক স্তরে তুলে দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন। মণিলাল মল্লিকের কন্যাকে ভগবান লাভের জন্য মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করার যে বিধান তিনি দিয়েছিলেন তার সঙ্গে শম্ভুবাবুর ভাবানুরূপ জনহিতকর কার্যের পার্থক্য শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে নির্ণয় করতেন, তার নিশ্চিত মীমাংসা পাওয়া যায় পূর্বোক্ত ঘটনাটিতে। দুস্থ মানবের সেবার মাধ্যমে ঈশ্বরকে পূজা করার—শিবজ্ঞানে জীবসেবা করার—যে বাণী তিনি রেখে গেছেন, জনহিতকর কাজের সাধারণ লোকপ্রিয় ভাবের সঙ্গে তাকে গুলিয়ে ফেলার কোন কারণ তো খুঁজে পাওয়া যায় না।

অধিকার-ও লভি নাই

শ্রীশৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি ঘুরিয়াছি তীর্থে তীর্থে,
পূত-নীরে করি স্নান
দেহ ও মনের ঘুচাইতে মল
ছিল মোর অভিযান!
শাস্ত্রপাঠ-ও করিয়াছি বহু,
যাগ-যজ্ঞ কি কম!
সাধুসঙ্গেও শুনিয়াছি কত
সৎকথা—দম, যম।
মনে ছিল মোর তাই—
ধর্মজগতে লভিয়াছি স্থিতি,
সংশয় কিছু নাই!

আজি দেখি হায়, তীর্থভ্রমণ
সকলি আমার ফাঁকি,
শাশ্বত, সর্বাশ্রয় যেথা
সেই তীর্থই বাকি!
মানস-তীর্থে হয় নি যে যাওয়া
ফেলে রেখে অভিমান!
অহংকারই বাড়িয়ে তুলেছি,
ভেবেছি লভিনু জ্ঞান।
আজ বুঝি মনে তাই—
ধর্মজগতে উত্তরণের
অধিকার-ও লভি নাই।

শক্তির বিভিন্ন রূপ

ডক্টর শ্রীবিশ্বরঞ্জন নাগ

(৩) তাপ

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কান দিয়ে আমরা শব্দ অনুভব করি, চক্ষু দিয়ে আলো অনুভব করি, আর তাপ অনুভব করি ত্বক্‌ দিয়ে। তাপ কি ?—এই প্রশ্নের উত্তরে সোজাসুজি বলা যেতে পারে, যা আমাদের ত্বকে স্পর্শানুভূতি ছাড়া অন্য ধরনের অনুভূতি আনে তাই তাপ। সূর্যকিরণে বা আগুনের ধারে বসলে আমরা এই তাপের অনুভূতি পাই। আগুনে গরম-করা কোন জিনিসকে স্পর্শ করলে বা আমাদের গায়ে গরম হাওয়া লাগলে আমরা তাপের অনুভূতি পাই। তাই বলা হয় যে, সূর্যকিরণে বা অগ্নিশিখায় তাপ আছে। আবার আগুনে গরম-করা কঠিন পদার্থে বা গরম হাওয়াতেও তাপ আছে। এ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, তাপ দু-ভাবে অবস্থান করতে পারে—বস্তুকে আশ্রয় না করে, যেমন সূর্যকিরণে; বা বস্তুকে আশ্রয় করে, যেমন গরম পদার্থে। তাপ যে একধরনের শক্তি, তাও সহজেই বোঝা যায়। যেমন, আমাদের দুটো হাত ঘষলে গরম হয়ে ওঠে; ঘষার সময়ে যান্ত্রিক শক্তি ব্যয় করা হচ্ছে এবং ব্যয়িত শক্তি হারিয়ে গিয়ে গরম হাতে তাপরূপে দেখা দিচ্ছে। আবার তাপ ব্যবহার করেও যান্ত্রিক শক্তি পাওয়া যেতে পারে—যেমন পাওয়া যায় বাষ্পীয় বা তৈলচালিত যন্ত্রে। খুব সহজ যন্ত্রও তৈরী করা যায়, যার উপরে তাপরশ্মি পড়লে যন্ত্রটির চাকা ঘুরতে থাকবে। তাপ শক্তি; আবার শব্দ এবং আলোও শক্তি। একভাবে বলা যেতে পারে—তাপ হচ্ছে শব্দ ও আলোর মাঝামাঝি একধরনের শক্তি। শব্দ বস্তু-আশ্রয়ী শক্তি; বস্তুর মাধ্যম ছাড়া শব্দের প্রকাশ নেই। আলো বস্তু-নিরালম্ব শক্তি—আলো বস্তুকে আশ্রয় না করেই প্রকাশিত হয়। বস্তুর শক্তির কোন অংশ আলোতে রূপান্তরিত হলেই সেই আলো বস্তুকে ছেড়ে বেরিয়ে আসে। আলো-কে কখনই সীমিত জায়গায় বস্তুর মাধ্যমে ধরে রাখা যায় না। কিন্তু তাপ শব্দের মত বস্তুকে আশ্রয় করেও থাকতে পারে, আবার আলোর মত বস্তুর আশ্রয় ছেড়েও শূন্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাপের দুই অবস্থা—বস্তু-আশ্রয়ী ও বস্তু-নিরালম্ব; তাই দুটি দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তাপশক্তিকে দেখা দরকার।

তাপশক্তি বস্তুতে সঞ্চারিত হলে প্রথমে দেখা যায় যে, বস্তুটির উষ্ণতার পরিবর্তন হয়। ত্বকের সাহায্যে এই উষ্ণতার তারতম্য সহজেই অনুভব করা যায়। যদি উষ্ণতা বাড়ে তাহলে পদার্থটি গরম বলে মনে হয়, আবার উষ্ণতা কমলে ঠাণ্ডা বলে মনে হয়। এই গরম ও ঠাণ্ডা অনুভূতির আসল স্বরূপ হল এই যে, গরম জিনিস থেকে তাপশক্তি আমাদের শরীরে চলে আসতে পারে এবং ঠাণ্ডা জিনিসে আমাদের শরীর থেকে তাপশক্তি চলে যেতে পারে। যে বস্তু থেকে বেশী করে তাপ আমাদের শরীরে আসে সেই বস্তু বেশী গরম মনে হয়, আবার যে বস্তুতে আমাদের শরীর থেকে বেশী করে তাপ চলে যায় সেই বস্তু বেশী ঠাণ্ডা মনে হয়। তাই বলা যেতে পারে, কোন বস্তুতে তাপশক্তি জমা করলে অন্যবস্তুতে তাপ সঞ্চারিত করবার ক্ষমতা তার বাড়ে—বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় তাপমাত্রা বাড়ে।

কোন বস্তুর তাপশক্তির পরিবর্তন সামান্য পরিমাণে তার মধ্যে হলে শুধুমাত্র তাপমাত্রার পরিবর্তনই দেখা যায়। কিন্তু যদি কোন জিনিসে ক্রমান্বয়ে তাপ দেওয়া যায় তাহলে বস্তুর মধ্যে আরও বিশেষ পরিবর্তন আসে—জিনিসটির অবস্থার পরিবর্তন হয়। খুব কম তাপমাত্রায় সব বস্তুই কঠিন অবস্থায় থাকে। কঠিন অবস্থার লক্ষণ হল এই যে, কোন বলপ্রয়োগ না করলে বস্তুটির আকার ও আয়তন অপরিবর্তিত থাকে। যখন কোন কঠিন জিনিসের তাপমাত্রা বাড়ানো হয় তখন দেখা যায়, প্রথমে জিনিসটির আয়তন অল্প অল্প পরিবর্তিত হতে থাকে কিন্তু তার আকার অপরিবর্তিত থাকে। একটি বিশেষ তাপমাত্রায় এলে বস্তুটির আকারও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়—এবং বস্তুটি তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তরল জিনিসের কোন নির্দিষ্ট আকার নেই কিন্তু তাপমাত্রার পরিবর্তন না হলে নির্দিষ্ট আয়তন আছে। তরল জিনিসের যখন আবার তাপমাত্রা বাড়ানো যায় তখন তার আয়তন সামান্যভাবে পাল্টাতে থাকে এবং একটি দ্বিতীয় তাপমাত্রায় জিনিসটির আয়তন অনির্দিষ্ট হয়ে যায়—জিনিসটি যে পাত্রে থাকে তার আয়তনই গ্রহণ করে। এই অবস্থাকে বলা হয় বায়বীয় অবস্থা। বায়বীয় অবস্থার বস্তুতে যদি আবার তাপ দেওয়া হয় তাহলে ক্রমান্বয়ে বস্তুটির তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং খুব উচ্চ তাপমাত্রায় বস্তুটি অন্য একটি অবস্থায়, চতুর্থ অবস্থায় আসে—যার নাম দেওয়া হয়েছে প্লাজমা। প্লাজমায় অণুগত সাম্য বিনিষ্ট হয় এবং অণুর কেন্দ্রীনগুলি ও ইলেকট্রনগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীনগুলিও নিজের স্বরূপ পাল্টাতে থাকে। বস্তুর এই চতুর্থ অবস্থা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার বাইরে; কিন্তু সূর্যে বা অন্যান্য গ্রহে এই চতুর্থ অবস্থাই বস্তুর সাধারণ অবস্থা।

তাপশক্তি আহরণ করলে বস্তুর এই যে অবস্থার পরিবর্তন হয় তা বিশ্লেষণ করে বস্তু-আশ্রয়ী তাপশক্তির স্বরূপ বোঝা যেতে পারে। পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবস্থা হল পরমাণু। পরমাণুতে কেন্দ্রীন ও ইলেকট্রন নিজেদের তড়িৎজনিত আকর্ষণের জন্য পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। দুটি পরমাণুকে কাছাকাছি নিয়ে এলে ইলেকট্রনের মাধ্যমে কেন্দ্রীনদুটির মধ্যেও বন্ধনের সৃষ্টি হয়; ঠিক যেমন টেনিস বলের মাধ্যমে দুজন টেনিস খেলোয়াড়ের মধ্যে বন্ধন থাকে, যার ফলে তারা খেলার মাঠে আবদ্ধ থাকে। এই ধরনের বন্ধনের ফলেই এক বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের পরমাণু মিলে অণু তৈরী করে; আবার এই বন্ধনই অণুগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে বেঁধে রেখে পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা সৃষ্টি করে। পদার্থে যখন কোন তাপশক্তি থাকে না তখন অণুগুলির মধ্যে শুধুমাত্র তড়িৎজনিত বন্ধনই থাকে এবং সব পদার্থই কঠিন অবস্থায় থাকে। তাপশক্তি-বিহীন তাপমাত্রাকে বলা যায় শূন্য তাপমাত্রা—বায়বীয় পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এই শূন্য তাপমাত্রা সেন্টিগ্রেড স্কেলে —২৭৩° ডিগ্রী। শূন্য তাপমাত্রার বস্তুতে অণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে বন্ধনযুক্ত কিন্তু স্থির থাকে। যখন এরূপ বস্তুতে তাপশক্তি সঞ্চারিত করা হয় তখন অণুগুলি কাঁপতে থাকে। অণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা থাকে বলে সবগুলিই কাঁপতে থাকে। কিন্তু পদার্থে শব্দশক্তি যে ধরনের শৃঙ্খলাপূর্ণ কম্পনের সৃষ্টি করে, তাপের কম্পন সে ধরনের নয়। তাপশক্তির কম্পন বিশৃঙ্খল এবং অণুগুলি খেয়াল-খুশিমত বিভিন্ন দিকে কাঁপতে

থাকে। তাপশক্তির প্রভাবে পদার্থের এই কম্পন কোন সহজ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায় না; কিন্তু পদার্থের তাপশক্তির প্রভাবে বিভিন্ন গুণাগুণের পরিবর্তন এবং অন্যপদার্থে তাপ সঞ্চারিত করবার ক্ষমতার পর্যালোচনা থেকে তাপজনিত কম্পনের সত্যতা প্রমাণিত হয়। কাজেই বলা যেতে পারে পদার্থের শৃঙ্খলিত কম্পন যেমন শব্দশক্তির প্রকাশ, তেমনি কঠিন পদার্থে তাপের প্রকাশ হল অণুগুলির বিভিন্ন দিকে বিশৃঙ্খল ভাবে কম্পন। প্রতিটি অণুর কম্পনের ফলে গতি-জনিত শক্তি হয় এবং দেখা যায়, সব অণুগুলির মোট কম্পন-জনিত শক্তি এবং বস্তুটির মোট তাপশক্তি সমান। যতই বস্তুর তাপশক্তি বাড়ে ততই কম্পনের বিস্তার বাড়ে। আবার যখন কোন বস্তুকে তাপশক্তিযুক্ত বস্তুর সংস্পর্শে রাখা যায় তখন দ্বিতীয় বস্তুটির কম্পন প্রথম বস্তুতে সঞ্চারিত হয়। মোটামুটি বলা যেতে পারে— যে বস্তুতে কম্পনের বিস্তার বেশী, অন্য বস্তুতে তাপ সঞ্চারিত করবার ক্ষমতা বা তাপমাত্রাও তার বেশী। তাপশক্তি বাড়ালে বস্তুর অণুগুলির কম্পনের বিস্তার বাড়তে থাকে, অন্য বস্তুতে তাপশক্তি সঞ্চারিত করার ক্ষমতাও বাড়ে এবং বস্তুটিকে আমরা গরম বলে অনুভব করি।

তাপশক্তির পরিমাণ বাড়িয়ে গেলে কোন বস্তুর অণুর কম্পনের বিস্তার বাড়তে বাড়তে এমন একটা অবস্থা আসে যখন অণুগুলি তাদের নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইতস্ততঃ চলতে আরম্ভ করে—কিন্তু সমষ্টিগতভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। পদার্থের এরূপ অবস্থার নামই তরল অবস্থা। তরল পদার্থের অণুগুলির বিচরণ খুব সহজ পরীক্ষাতেই ধরা পড়ে। তরল পদার্থে খুব ছোট বস্তুকণিকা ছড়িয়ে দিলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এই কণাগুলির ইতস্ততঃ বিচরণ দেখা যায়। বিজ্ঞানী ব্রাউন প্রথমে এই বিচরণ আবিষ্কার করেন; সেজন্য অণুর ইতস্ততঃ বিচরণের নাম হল 'ব্রাউনীয় বিচরণ'। তরল পদার্থে তাপ দিলে অণুগুলির ইতস্ততঃ বিচরণের গতিবেগ বেড়ে যায়; যতই তাপ-মাত্রা বাড়ে ততই গতিবেগ বাড়তে থাকে। এজন্য একসঙ্গে রাখা দুটি তরলপদার্থের উপরে বাইরের কোন বল কাজ না করলে পদার্থদুটি পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়; আবার যদি তরল পদার্থটির এক অংশ গরম করা যায় তাহলে অণুগুলির ইতস্ততঃ বিচরণের জন্যই তাপশক্তি ছড়িয়ে পড়ে। তাই বলা যেতে পারে, তরল পদার্থে তাপশক্তি প্রকাশিত হয় অণুগুলির ইতস্ততঃ বিচরণরূপে। এই বিচরণও কঠিন পদার্থের অণুর তাপজনিত কম্পনের মতই বিশৃঙ্খল।

তরল পদার্থের তাপমাত্রা বাড়িয়ে গেলে ইতস্ততঃ বিচরণশীল অণুগুলি একসময় এমন অবস্থায় এসে পৌঁছায় যে তাদের সমষ্টিগত বন্ধনও আর থাকে না। এই অবস্থাই হল বায়বীয় অবস্থা। বায়বীয় অবস্থায় তাপশক্তির প্রকাশ তরল অবস্থার অণুগুলির ইতস্ততঃ বিচরণের মতই। তবে এক্ষেত্রে অণুগুলি পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে বিচরণ করে। যে শক্তি অণুগুলিকে পরস্পর বন্ধন করে রাখে, সে শক্তি অণুগুলির বিচরণ-জনিত শক্তির তুলনায় নগণ্য।

পদার্থের চতুর্থ অবস্থায় বা প্লাজমাতে অণু-গুলির আভ্যন্তরীণ কেন্দ্রীন ও ইলেকট্রনের বন্ধনও ভেঙ্গে যায় এবং অণুর কিছু ইলেকট্রন কেন্দ্রীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মুক্ত ইলেকট্রনগুলি এবং কিছু ইলেকট্রনবিহীন অণু যার নাম দেওয়া হয়েছে আয়ন— প্লাজমায় ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়। চতুর্থ অবস্থার বস্তুতে

তাপের প্রকাশ তরল ও বায়বীয় অবস্থার মতই—বিচ্ছিন্ন ইলেকট্রন ও আয়নের ইতস্ততঃ বিচরণরূপে।

কাজেই তাপশক্তির প্রভাবে বস্তুর বিভিন্ন অবস্থার পর্যালোচনা থেকে বলা যেতে পারে, বস্তু-আশ্রয়ী তাপের প্রকাশ হল বস্তুর অণুগুলির গতিজনিত শক্তিরূপে। কঠিন পদার্থে এই গতি হল অণুগুলির বিভিন্ন দিকে কম্পন এবং তরল ও বায়বীয় পদার্থে বা প্লাজমায় গতি হল অণুগুলির বা মুক্ত ইলেকট্রন ও আয়নের ইতস্ততঃ বিচরণ।

বস্তু-নিরালম্ব বা বিকীর্ণ তাপের প্রকাশ কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ধরনের; সূর্যকিরণে এই বিকীর্ণ তাপ আছে, আবার গরম জিনিস থেকেও বিকীর্ণ তাপ পাওয়া যায়। এই তাপের গুণাগুণ সব দিক দিয়েই আলোর অনুরূপ। অ-স্বচ্ছ পদার্থ বিকীর্ণ তাপকে আটকে দেয়। আলোর মতই এই তাপ প্রতিফলিত ও প্রতিসৃত হয়। শোনা যায় বহুযুগ আগেই আর্কিমিডিস অবতল দর্পণ ব্যবহার করে সূর্য-কিরণের তাপ দূরবর্তী জায়গায় কেন্দ্রীভূত করে শত্রুপক্ষের জাহাজে আগুন ধরিয়ে নিজের দেশকে রক্ষা করেছিলেন। লেন্স ব্যবহার করে যেমন আলো-কে কেন্দ্রীভূত করা যায়, তেমনি বিকীর্ণ তাপকেও কেন্দ্রীভূত করা যায়। লেন্স ব্যবহার করে এমনি কেন্দ্রীভূত তাপ দিয়ে আগুন জালানো তো আমাদের খুবই সাধারণ অভিজ্ঞতা। মোটামুটিভাবে বলা যায়, আলো ও বিকীর্ণ তাপের মধ্যে কোন মৌলিক প্রভেদ নেই। আলোর মতই তাই এই তাপকেও তরঙ্গ বলা যেতে পারে। তাপ-তরঙ্গের দৈর্ঘ্যও মাপা যায় এবং মাপলে দেখা যায়, তাপ-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য থেকে সাধারণতঃ বেশী। আলোর রং পাল্টালে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যও পরিবর্তিত হতে থাকে। বেগুনী থেকে যতই লালের দিকে যাওয়া যায় ততই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বাড়তে থাকে। যখন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য লাল আলোর চেয়েও বড় হয় তখন আলো আর দেখা যায় না—ঐ আলোই তাপ বলে অনুভূত হয়। লাল বা হলুদ রং-এর আলো দেখা যায়, আবার তাপের অনুভূতিও এনে দেয়। এরা ঠিক যেন আলো ও তাপের প্রত্যন্ত সীমায় দাঁড়িয়ে। আমাদের অনুভূতির দিক দিয়ে এদের আলোও বলা যেতে পারে আবার তাপও বলা যেতে পারে। তাই বিকীর্ণ তাপকে আলোক-তরঙ্গেরই অন্য রূপ বলে ভাবা যেতে পারে। বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখা যায়—বিকীর্ণ তাপ, আলো ও বেতারতরঙ্গ একই ধরনের শক্তি এবং বিদ্যুৎ-চুম্বক-তরঙ্গেরই বিভিন্ন রূপ। তাই বিকীর্ণ তাপকে ভাবা যেতে পারে এক ধরনের বিদ্যুৎ-চুম্বক-তরঙ্গ যার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আলোকতরঙ্গের দৈর্ঘ্যের চেয়ে বেশী, কিন্তু বেতারতরঙ্গের দৈর্ঘ্যের চেয়ে ছোট।

প্রত্যেক পদার্থকেই গরম করলে এই বিকীর্ণ তাপ সৃষ্টি হয়। পদার্থে অণুগুলির গতিজনিত শক্তিরূপে যে তাপশক্তির প্রকাশ তারই কিছু অংশ এই বিকীর্ণ তাপ হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। পদার্থের তাপমাত্রা যতই বাড়তে থাকে ততই বিকীর্ণ তাপের পরিমাণও বাড়ে। এভাবে বিকীর্ণ তাপে সব-রকমের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তাপই থাকে। কিন্তু পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এক বিশেষ তাপমাত্রায় কোন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে যে পরিমাণ তাপ বিকীর্ণ হয় তার একটি বিশেষ নিয়ম আছে। এই নিয়ম বুঝতে গিয়েই বিজ্ঞানীরা তাপ-তরঙ্গের আর একটি বৈজ্ঞানিক গুণের পরিচয় পেলেন। দেখা গেল, তরঙ্গের মতই তাপ প্রতিনিয়ত বিকীর্ণ হচ্ছে—একথা ধরে নিলে ঐ নিয়মটির

ব্যাখ্যা করা যায় না। বিজ্ঞানী প্ল্যাঙ্ক এক যুগান্তকারী অনুমান থেকে নিয়মটির এক সুষ্ঠু ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেন। তিনি অনুমান করেন যে, তাপ যখন বিকীর্ণ হয় তখন ঠিক যেন কণার মত বিক্ষিপ্ত হয়। কণাগুলির শক্তি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উপরে নির্ভর করে। প্ল্যাঙ্কের এই মতবাদ পরীক্ষার দ্বারা পুরোপুরি প্রমাণিত হয়েছে। তাই বর্তমানে বিকীর্ণ তাপের এক দ্বৈত-সত্তা স্বীকৃত হয়েছে। এক সত্তা হল এর তরঙ্গ-স্বরূপ এবং দ্বিতীয় সত্তা হল কণা-স্বরূপ। তাপ বিকীর্ণ হয় কণা-রূপে কিন্তু ছড়িয়ে পড়ে তরঙ্গ-রূপে। এই আপাতবিরোধী দুই সত্তা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না—কিন্তু এই অসঙ্গতিই প্রকৃতির এক খেয়াল। আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা এই অসঙ্গতির মধ্যে কোন সঙ্গতি খুঁজে পান নি এবং অসঙ্গতিকে স্বাভাবিক বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

তাপ নিয়ে পর্যালোচনা করে তাপের স্বরূপ সম্পর্কে যা জানা গেছে তা একসঙ্গে করলে দাঁড়ায় অনেকটা এ-রকমের: তাপ এক ধরনের শক্তি—যখন বস্তুকে আশ্রয় করে তখন বস্তুকণাগুলির বিশৃঙ্খল গতিজনিত শক্তিরূপেই প্রকাশিত হয়, আবার যখন বস্তুর বাইরে থাকে তখন আলোকতরঙ্গের অনুরূপ তরঙ্গ ও কণার দ্বৈতসত্তা নিয়ে প্রকাশিত হয়। আবার এও বলা যায়, তাপশক্তি বস্তুর সদা-বিদ্যমান অংশ—শুধুমাত্র শূন্য তাপমাত্রায় বস্তু থাকলেই বস্তুর সঙ্গে কোন তাপশক্তি থাকে না। কিন্তু শূন্য তাপমাত্রায় কোন বস্তুকে এখনও নেওয়া সম্ভব হয়নি; তাই বলা যেতে পারে, তাপশক্তিবিহীন বস্তুর কোন অবস্থান নেই। আবার সব শক্তির মতই তাপশক্তিও অন্যান্য শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে।

সূর্য

শ্রীনবকুমার চৌধুরী

নিবিড় তিমিরে পথ হারাইয়া
অন্ধ আজিকে যাত্রী,
কোথা রে আলোক-উজ্জ্বল পথ,
এ যে ঘোর অমারাত্রি।
হৃদয়-তটিনী সাগরের সনে
ছুটিয়া মিশিতে চায়,
কেহ কি দিবে না বাধা সরাইয়া,
ডাকিবে না ইসারায়!
তুমি কি আসিয়া এ মন-মুকুরে
উদিবে না, সুন্দর,
আঁধার কুটীর আলোকে পূরিতে,
আসিবে না, মনোহর!

সীমার মাঝারে ধরা দাও আসি
তুমি যে গো সীমাহীন,
রূপের মাঝারে রূপাতীত তুমি
জাগিছ রাত্রিদিন!
বিশ্বে আজিও ধ্বনিছে তোমার
বজ্রকণ্ঠ-বাণী,
উড়িছে ত্যাগ ও সেবার প্রতীক
গেরুয়া বসনখানি।
ক্লৈব্য ঘুচায়ে দৈন্য মুছায়ে
জাগায়ে দৃপ্ত ছন্দ,
এস মোর হৃদিপদ্মে দেবতা,
সূর্য বিবেকানন্দ!

রাজস্থানের মেলা উৎসব ও ব্রত পার্বণ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

রাখী পূর্ণিমার আগের শ্রাবণী শুক্লা তৃতীয়ায় একটি খুব বড় মেলা হয়। এটির নাম হল 'তীজের' মেলা বা 'তীজগঙ্গোর' মেলা। এটিকে 'হরিয়ালীকী তীজ' বলা হয়। অন্য 'তীজ' মেলাটি হল 'বাসন্তী তীজ'। এই তৃতীয়া বা তীজটি শ্রাবণ মাসের সবুজ শস্যময় দিনে হয় বলেই 'হরিয়ালীকী' তৃতীয়া বা 'তীজ' নামে অভিহিত। এই তৃতীয়াটি 'পুণ্যাহ' হিসেবেও ওদেশে প্রচলিত আছে নতুনখাতা, গৃহপ্রবেশ, হলকর্ষণ প্রভৃতিতে

এর কাহিনী হল : সত্যযুগে সতী দক্ষালয়ে দেহত্যাগ করার পর আবার জন্মান্তরে শিবকে লাভ করার জন্য অনেক তপস্যা করেন। তপস্যাশেষে হিমালয়ের কন্যা উমারূপে জন্ম নেন। আর এই তৃতীয়ার দিন তাঁদের পুনর্মিলন হয়। সেই হিসাবে এটি ভারি একটি পুণ্যতিথি রাজস্থানী মেয়েদের কাছে। কুমারী বিবাহিতা সকলেই গঙ্গোর পূজা ও ব্রত করেন। রাজাদেরও এই গণগৌরী বা গৌরী-দেবী বিশেষ উপাস্য। উদয়পুরে ও অন্যান্য রাজ্যেও এই মেলা ও পূজা হয় বটে কিন্তু জয়পুরের এই গঙ্গোর মেলায় যেমন গণগৌরী মূর্তি গঠিত হয় আর মণিমুক্তা সোনাদানায় সাজানো হয়, তেমন বড় অন্যত্র হয় না, লোকে বলে।

মেলাটির নাম হল 'তীজগঙ্গোর' মেলা। ঘরে ঘরে, বড় ঘরে, দেবালয়ে প্রায় সর্বত্রই গৌরীমূর্তি গড়ানো আর চমৎকার করে সাজানো হয়। তাঁরা ঘরেই থাকেন। শোভাযাত্রায় বেরোন না।

কিন্তু রাজার প্রাসাদের পূজিতা গঙ্গোর বা গৌরীদেবী এই মেলায় শোভাযাত্রায় স্বর্ণ-খচিত তাঞ্জামে চড়ে বেরোন। সেদিন রাজাও রেরোন আর একটি তাঞ্জামে (পালকি-জাতীয় যান)।

এই দিনের মেলায় খুব বড় শোভাযাত্রা বেরোয়—রাজকীয় চতুরঙ্গ বাহিনীর হাতি, ঘোড়া, রথ, গাড়ী, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য। রাজার নিজস্ব ও প্রিয় ঘোড়া, হাতি, উট, রথ—আলাদা সাজে বেরুত

শোভাযাত্রা সুরু হয় (গণগৌরী) 'গঙ্গোর দরওয়াজা' থেকে। একেবারে পুরোনো আমলের বিশেষ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের যাতায়াতের নির্দিষ্ট তোরণদ্বার সেটি। বরযাত্রা বিয়ে উৎসব—রাজপ্রাসাদের সব মেলার শোভা-যাত্রার ঐটিই শুভযাত্রা-তোরণপথ। পাশেই ঐতিহাসিক প্রাসাদ 'হাওয়া মহল'।

তার বাঁদিকে চলে গেছে অম্বর প্রাসাদের পথ।

ডানদিকে শোভাযাত্রা আসবে কিষণপোল বাজারের দিকে।

চারদিকের প্রশস্ত পথ, ফুটপাথ, বাড়ী, বাড়ীর ছাত, সিঁড়ি, মন্দির, দেবালয়ের সিঁড়ি, প্রাঙ্গণ নানা রংয়ের নানা সাজে সজ্জিত নরনারীতে, শিশু-বালক-বালিকাতে ঝলমল করত। তার মাঝে দোকান-পসারে মাটি-পাথর-কাঠের পিতলের চন্দনকাঠের খেলনা-পুতুলের সমারোহময় সমাবেশ হত

আকণ্ঠ অবগুণ্ঠনের মাঝ থেকে মেয়েদের কণ্ঠের গ্রাম্যসঙ্গীতে পথ মুখর। বাঁশী,

মালা, আলো, ফুল, খাবার, বরফ, কুল্পী বরফ, জল, সুখাদ্য-কুখাদ্য খাবারের দোকানে; ফেরীওয়ালা চারদিকের জনতার মাঝে। বেশীর ভাগই গ্রামের জনতা। গান গাইবে, জিনিস কিনবে। দেখাসাক্ষাৎ করবে। রাতে ফিরবে কাছে গ্রাম হলে। নইলে পথের ধারেই রকে রাত কাটবে।

প্রতি মেলাতেই পুতুলের বিশেষত্ব থাকে। এ মেলায় পুতুলের বিশেষত্ব হল গৌরী মূর্তি অর্থাৎ 'গঙ্গোর' মূর্তি। ছোট বড় মাঝারি দেবী-মূর্তি, মাটিতে রংয়ের বসনে ভূষণে সজ্জিত হাত-দুখানি প্রসারিত; লাল রংয়ের মাটির ঘাগরা জামা ওড়নায়, মাটির নানা অলঙ্কারে সাজানো গড়ানো মূর্তিগুলি।

লোকে সকলেই একটি দুটি কিনত। আমাদের সরস্বতী লক্ষ্মী প্রতিমা কেনার মত। এর সঙ্গে থাকত শেঠ-শেঠানী মূর্তি! এটি যেন 'ভাঁড়ামি' বা কৌতুকের পুতুলবিশেষ। শোভাযাত্রার সঙ্গে প্রকাণ্ড, প্রমাণের চেয়ে বড় শেঠ-শেঠানী মূর্তি বেরুনোর রেওয়াজ ছিল। পায়ের তলায় চাকাওয়ালা কাঠের পাটাতনের ওপর দাঁড়ানো মূর্তিগুলি।

মেলার প্রাঙ্গণ হল বড় বড় রাজপথ। শ্রীজীর (মহারাজা) প্রাসাদ-নগরীর (দুর্গের মত) ভিতর থেকে বেলা ৪টা নাগাদ ভোঁ ভোঁ শব্দে ভেঁপু বেজে উঠত। আর দেখা যেত গণগোরী-তোরণদ্বার থেকে লাল জামা উর্দী পরা, পেতলের মোটা বাঁশী ঝকঝকে ভেঁপু হাতে নকীব, দৌবারিক, চোপদারদের দল বেরিয়ে আসছে লাঠিসোঁটা বাজনাসহ। অর্থাৎ মেলার শোভা-যাত্রা সুরু হচ্ছে।

ঠিক প্রথমে যে কোন্ বাহিনী—চতুরঙ্গ (চার অঙ্গ) বাহিনীর কারা বেরুত ঠিক মনে নেই আর। ৬০ বছরেরও আগের কথা সে।

মনে হয় প্রথমে রাজ-গোশালার সুসজ্জিত বলীবর্দ ও গরুর দল বেরুত। লাল নীল রংয়ের শিং, গলায় রঙীন পাহাড়ী 'কটেলা'-পাথরের মালা দোলানো, গায়ে লাল নীল কারু-কাজ করা বনাতের আবরণী ঝোলানো রথের গরু বলদ, 'শনগড়' (শকটের)·বাহী বলদও গাড়ীতে জোতা। আবার শুধু সুসজ্জিত গোধনও বেরুত—সারি সারি প্রায় পাঁচ-সাতশো জোড়ায় জোড়ায় করে।

এর পরে রাজকীয় অশ্ব। রাজার বিশেষ প্রিয় 'পেয়ারের' ঘোড়া, কালো সাদা লাল উৎকৃষ্ট আরবী ঘোড়া, নানা দেশের বিখ্যাত অশ্বশ্রেণী। নানা নামধারী—বাজিরাজ, সুন্দর, পিয়ারা, রাজা, রানী, বীরবর প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত তারা।

তাদেরও গলায় কটেলা-পাথরের মালা। চোখে ঝকঝকে পিতলের ঠুলি। মাথায় পালকের সাজ। গায়ে সুদৃশ্য চকচকে চামড়ার জিন, ঝকঝকে পিতলের রেকাব দুপাশে। পায়ে পিতলের নূপুর। রাজার নিজস্ব ঘোড়া, কাজেই পিঠখানি আরো সুসজ্জিত—অহঙ্কৃত সহিসের সারি নিয়ে তারাও গর্বিত ছন্দে মদমত্ত চালে কদমে কদমে চলত। ছোটরা, আমরা, বারে বারে তাদের গুনেও কখনো শেষ করতে পারি নি। পাঁচশোর বেশী তো কম নয়।

তার পরে উষ্ট্রবাহিনীর আগমন। মরু-পর্বতের দেশের কষ্টসহিষ্ণু যানবাহন-সম্পদ তারা। তাদেরও কম আদর নয় রাজোয়াড়ার রাজ্য-সমূহে। ধূ-ধূ বালির মরুসমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ জনহীন মরুপথ; সেখানে তাদের মত মাথায় রোদ্দুর পায়ে উত্তপ্ত বালি নিয়ে পথ চলার সাধ্য হাতি ঘোড়া রথ গরুর গাড়ীর কারুর নেই। পা গরমে পুড়বে। অন্য জন্তু তৃষ্ণায় আকুল হয়ে উঠবে। চলতে চলতে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অবসন্ন

হয়ে মারা যাবে অন্য জন্তুরা। উটের তা হয় না। সেইজন্য মরুদেশে, গরম দেশে উটের ভারি সমাদর। আরব, মিশর, কাবুল, রাজস্থান সর্বত্র উটের ভারি সম্মান ও কদর। উটের কুঁজের উপরে হাওদাও থাকে হাতির হাওদার মত। তবে হাতির মত স্নিগ্ধ মাংসল স্থূল শরীর তো উটের নয়, কাজেই তার পিঠে যাত্রীদের বসার আরাম নেই; কিন্তু দীর্ঘ মরুপথ অতিক্রমের নিশ্চয়তা আছে।

এই উষ্ট্রবাহিনীও সংখ্যায় কম নয়। এরাও পাথরের মালার আভরণ, রঙীন বনাতের আবরণে সজ্জিত। প্রায় ৬০০-৭০০। বেশীও হয়ত ছিল।

অতঃপর বেরুত হাতির দল। প্রায় তিন-চার শো তো বটেই। ছোট-বড় কালো-কালো, গয়ার দিকের পাহাড়ের মত, শ্রাবণের আকাশের ঘন কালো মেঘের মত, ছোট বড় নানা আকারের হাতি সারি সারি বেরুত। কারুর নাম গজরাজ, গজরানী, গজমোহর, গজবীর। যত গহনা তত আদর। কুলোর মত কানদুটি। নানা রংয়ে চিত্রিত। কপালে পিতলের কপাল-পাটী পরা, গায়ে ঝলমলে লাল নীল রংয়ের কিংখাবের উত্তরীয়, আবরণী, গলায় মালা, দাঁতে সোনার বা পিতলের বালা পরানো পিঠের ওপর বড়সড় সুন্দর হাওদা। তাতে বিশেষ আরোহী—রাজ-বংশের হলে—বসে থাকতে দেখা যেত। রাজার হাতি হলে হাওদা খালি থাকত, শুধু 'অঙ্কুশ' হাতে মাহুতই বসে থাকত মাথার পিছনে ঘাড়ের ওপর। সোনার বালা পরা দাঁতের মাঝখানে কালো শুঁড়টি দোলাতে দোলাতে, শরীরের তুলনায় ছোট্ট ছোট্ট দুটি সন্দিগ্ধ চোখে জনতার দিকে আড়চোখে চাইতে চাইতে তারা চলে যেতে থাকত।

কখনো কখনো একটি দুটি হস্তিশাবকও দেখা যেত গজজননীর পাশে। সেদিন দর্শকদের কি উল্লাস! শাবকটি ঠিক মায়ের পাশে পাশে তার জননীর কোমর অবধি উঁচু শরীরটি আর দেড়হাত লম্বা কালো নতুন কচি স্নিগ্ধ শুঁড়টি দুলিয়ে দুলিয়ে দৌড়ত। কিন্তু মাকে ছেড়ে এক পা এগিয়ে যেতনা।

শুনেছিলাম, সেই সময়ের কিছু দিন আগে লর্ড কার্জনের আমলে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে যে দিল্লী দরবার হয়, তাতে জয়পুরের রাজার প্রায় সব হাতিগুলিই দরবারের শোভা আর আড়ম্বর বাড়ানোর জন্য চেয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তাতে নাকি পথের কষ্টে ও অযত্নে রাজার পিলখানার (হস্তিশালার) ৫০।৬০টি উৎকৃষ্ট হাতির মৃত্যু হয়। নইলে নাকি আরো বেশী গজ-সম্পদ জয়পুর রাজার ছিল। রাজার মনেমনে খুব রাগ হয়, কিন্তু প্রকাশ করার উপায় ছিলনা। লাট সাহেব চেয়েছেন—দিল্লী দরবারের রাজভক্তির সমারোহের ব্যাপারের কাল সেটা। ক্ষতির ক্ষোভটা মন্ত্রী ও সর্দারদের মধ্যেই সঙ্গোপন রইল! আমরা ছোট ছিলাম, বাড়ীর গুরুজনদের কাছে গল্প শুনি তখন।

দেখতাম, ঘোড়াদের গরুদের এই সব মানুষিক জাঁকজমক আড়ম্বরে যেন কোন বিরাগ বা আপত্তি থাকত না। ঘোড়ারা গর্বিত চালে চলত খুশী মনেই, কাপড়-গহনাপরা শিশুর মত। গরুদের ওসব বালাই নেই। তারা নিরীহ শোভাযাত্রী মাত্র। কিন্তু হাতিদের যেন ঐ লোকজন আলো বাঁশীর সমারোহ পছন্দ হতনা। তারা ছোট্ট ছোট্ট চোখে কেবলি সন্দিগ্ধ হয়ে চারিদিকে চাইত।

এরপরে পদাতিক সৈন্যের দল খাকির পোষাক, কালো নীল পোষাক—কুর্তা পাজামা সৈনিক-শিরস্ত্রাণ, টুপী পাগড়ী শোভিত; পায়ে

পট্টী খাকির ও চামড়ার, হাতে বন্দুক ও সঙ্গীন। বর্শাধারী। নানা নাম নানা বেশ ধারী সেনানীর শোভাযাত্রা। কিছু অশ্বারোহীও দেখা যেত আগে পরে।

এ-দলও শেষ হয়ে যায়। তখন আসত বিশেষ পর্বদিনে কিংবা উৎসবে ব্যবহৃত স্বুবর্ণময় একটি চার ঘোড়ার গাড়ী; স্বুবর্ণময় মীনাকরা সোনার পাত-মোড়া তাঞ্জাম দু-একটি। লাল রংয়ের ঘেরাটোপঢাকা বলীবর্দবাহিত মহা-ভারতের ছবির মত দেখতে কয়েকটি রথ। বলদে-টানা গাড়ী 'বইলী'—একাসন গদীপাতা ছোট্ট এক্কা গাড়ীর মত গরুর গাড়ী। ('বয়েলী' বলদে-টানা)

এর পর সহসা আলো, ব্যাণ্ডের বাজনা, বাঁশী-সানাইয়ের মাঝে এসে পড়ে 'গঙ্গোর' বা 'গৌরী' দেবীর চতুর্দোলা, বাহক মানুষদের কাঁধে। ইনি রাজার 'নাল্ গৌরী'। প্রাসাদ-বাসিনী দেবী গৌরী। অপূর্ব স্বুন্দরী প্রমাণ-আকার গৌরী প্রতিমা। রং-এ বসনে ভূষণে সমুজ্জ্বল দেবী-মূর্তি। অঙ্গের সব গহনাই সোনা-হীরা-মুক্তার। গহনার যেন সীমা নেই। সব ওদেশী অলঙ্কার—কঙ্কণ, পৈঁছা, তাড়, রতনচুড়, তাবিজ, বাজুবন্দ, জশম, সাতলহরী, সরস্বতী হার, কণ্ঠশ্রী, মুকুট; কর্ণভূষণ বা সিঁথি, কপালপাটী, বোরলা, ছোট কুণ্ডল সিঁথির (সধবার গহনা); কোমরের চন্দ্রহার, গোঠ, মেখলা; চরণে চরণপদ্ম, মল, পাইজোর, মুরাটা, আরো অসংখ্য নাম-না-জানা গহনায় ঝলমল, ঘাগরা-লুগড়ী (ওড়না)-কাঁচুলী শোভিত দেবীমূর্তি। অনেকটা আমাদের সরস্বতী প্রতিমার মত ধরন। শুভ্র গৌরবর্ণা। দুর্গা বা লক্ষ্মী প্রতিমার মত হরিতাল-বর্ণা নন। প্রমাণ আকারের প্রতিমার দুপাশে চমৎকার স্বুন্দরী মানবী দুই সখী চামর দোলাত। তাদেরও রূপের, বসন-ভূষণের শোভায় সীমা নেই যেন।

মেলাভরে নারীকণ্ঠের সমবেত মঙ্গল সঙ্গীত, গ্রাম-সঙ্গীত শোনা যেত। আর পুরুষের জয়ধ্বনি মাঝে মাঝে।

তার পরই পিছনে পিছনে আসত রাজার সোনার তাঞ্জাম।

সঙ্গেসঙ্গে রাজ-স্তুতিগান ও হুজুরসাহেবের জয়ধ্বনিতে মেলা মুখর হয়ে উঠত। গরম কাল। রাজার পরিধানে পাতলা হালকা রঙীন জামা ধুতি, মাথায় পাগড়ী হীরা মুক্তা সোনা খচিত। গলায় মতির মালা, কানে সোনার ফুল বা কুণ্ডল, হাতে হীরার বালা, পায়ে সোনার মল (কড়া)। পিছনে নানা সম্ভ্রান্ত ঠাকুর-সামন্তসর্দারদের গাড়ীঘোড়া যান-বাহন এসে শোভাযাত্রা সম্পূর্ণ হত। সেপাই-শান্ত্রী সহ গঙ্গোর ও রাজা বেরিয়ে যাবার পরই মেলার পিছন ভাঙতে স্বুরু হত।

মেলা এবার সচল হয়ে উঠত 'ত্রিপোলিয়ার' রাজপথে। সেখানে অন্য তোরণ 'কিষণপোল', বাজারের তোরণ দিয়ে অফিসপথে প্রতিমা-শোভাযাত্রা সহ রাজা প্রাসাদে ফিরে যাবেন। শোভাযাত্রার চতুরঙ্গবাহিনী, মানুষ, উৎসবের অঙ্গ আলো পুতুল বাজনা নাগরদোলা, খাদ্য-বাজার বেরিয়ে এসে ফিরে যেতে ৪।৫ ঘণ্টার বেশী সময় লাগত। রাত্রি ৯টার পর তবে পথ হালকা হত। রাত্রে সেদিন গঙ্গোর দরবার। সকল সর্দার সামন্ত ঠাকুর (জমিদার), লোকরা লাল পোষাক পরবেন; চোগা চাপকান পাগড়ী জুতা মোজা সব রক্তবর্ণ পরতে হবে। রাত্রে 'নজর' সভা। তারপর উৎসব সমাপ্ত। আমরা মেয়েরা কিন্তু এই রাজসভাটা কখনো দেখিনি। জানিও না কেমন বা কোথায়। রক্তবস্ত্র-পরা শত শত রাজপুরুষ—তাঁদের

পদানুসারে নজর। সভা দেখার সৌভাগ্য যে সেকালের মেয়েদের ছিল না।

এখন ঘরোয়া গৌরী বা গঙ্গোর দেবীর কথা একটু বলি। শেঠ বণিক বড় ঠাকুর জমিদারের ঘরে, লোকদের ঘরে ঘরে, গোবিন্দজীর গোস্বামী-দের ঘরেও এই গৌরী প্রতিমা আসতেন এবং পূজিত হতেন। মেলাতেও ছোট বড় নানা আকারের প্রতিমা দেখতে পাওয়া যেত, আগেই বলেছি। আমাদের রথযাত্রার মেলায় জগন্নাথের মত, সরস্বতীপূজার সময়ের প্রতিমার মত প্রতিমা সাধারণ লোকেরাও পূজা করতেন।

গোবিন্দজীর গোস্বামীদের বাড়ীতে গঙ্গোর প্রতিমা আছেন। চমৎকার উজ্জ্বলবসনা গৌরীদেবী। ওদেশের প্রথা হল সন্ধ্যার পূজার পর রাত্রে একলা ঘরে কুমারী মেয়েরা সকলে গৌরীদেবীর কাছে নানা কামনা জানিয়ে বর চেয়ে আসবেন। গোঁসাইবাড়ীর মেয়েদের, বিবাহিতা এবং কুমারীদের তো নিশ্চয়ই, বর্ষীয়সী-দের অন্তরালে, অবশ্য তাঁদের উপদেশ-নির্দেশ অনুসারেই—মেলার অবসানে রাত্রে গঙ্গোর মাতা পার্বতীদেবীর ঘরে তাঁর কানে কানে 'মনের কথা'র মানসিক জানানো নিয়ম, কখনো একা, কখনো সখী-সহচরী-জন সহ। কৌতুকে আনন্দে সেই বরপ্রার্থনা শেষ হত অনেক রাত্রে। যাদের ঘরে 'গঙ্গোর' দেবী আসেন না বা থাকেন না, তারাও প্রতিবেশীর ঘরে এসে 'অঞ্জলি' দেবার মত, বরকামনা প্রার্থনা জানিয়ে যেত।

প্রজাদের দেবতাদর্শন, রাজদর্শন, পুণ্যসঞ্চয়, হাটবাজার করা, আমোদ-প্রমোদ করা; শিশু ও ছোটদের মেলা দেখা, পুতুল খেলনা বাঁশী কেনা, 'বুড়ীর চুল' মালাই বরফ খাওয়া, গুলাবী রেউড়ী ভক্ষণ; এই দিনের বিশেষ খাদ্য 'ঘিয়োর' বা অন্য বড়দের 'খেয়োর' কেনা এইসব হয়ে গেলে এক গাদা মাটির কাঠের পুতুল পরমযত্নে বুকে করে নিয়ে মেলা দেখা শেষ হত। গাড়ীভরা সম্পন্ন ঘরের বালকবালিকা আর হাঁটা পথের গ্রামের শিশুসংঘ পিতামাতার হাত ধরে কাঁধে চড়ে খিদেয় ক্লান্ত, ঘুমে অবসন্ন চোখে ঢুলতে ঢুলতে বাড়ী ফিরত। গাড়ীর আরোহীদের ভাবনা—পুতুলগুলি যেন না ভাঙে ঘুম-চোখের ঠেলাঠেলিতে—ফানুস পাখা যেন না ছেঁড়ে; তবু ভাঙত, ছিঁড়তও। মাটির পশুপাখীর অঙ্গহানি ঘটত। তখন ঘুমভাঙা চোখে তুমুল কলরব কোলাহল কলহ অশ্রুপাত, দাদা-দিদিদের ধমক ও সান্ত্বনা, 'আবার পরের মেলায় পুতুল কেনা যাবে' আশ্বাস ও দুঃখ নিয়ে বাড়ী ফিরতে রাত ৮।৯টা হয়ে যেত। যদিও আবার পরবর্তী গঙ্গোর মেলা পরের বছর, এবং সব মেলায় সব পুতুল গড়ানোর রেওয়াজও সে দেশে ছিল না। আর পথভরে মেলা-শেষের পথিক নরনারীর গান-গল্প চলত পথে কত রাত অবধি। 'গঙ্গোর' গৌরী পুতুল বছরে একবারই গঠিত হয়।

এই হল রাজা-রানীর যুগের তীজ গঙ্গোর মেলার উৎসব। 'হরিয়ালীকী তীজ' নামে। এই গঙ্গোর মেলা কিন্তু আর একবার হয় বৎশেষ চৈত্রমাসে বাসন্তীপূজার অষ্টমী তিথিতে। জয়পুরে দেখেছি কি না মনে পড়ছে না। কিন্তু উদয়পুরে মহা সমারোহে হয়। হয়ত জয়পুরে একটু কম সমারোহে হত।

এই খেলনা-পুতুলের আবার স্তর ও শ্রেণী ছিল। 'অভিজাত' পুতুল হলেন শ্বেত পাথরের নানা দেবমূর্তি জীবজন্তু হাতি ঘোড়া হরিণ গরু মানুষ ময়ূর পাখী; নানারকম ফুলের কাজ করা শ্বেত পাথরের থালাবাসন রেকাবী গেলাস বাটি তাজমহল; সাদা জালিকাজের বাক্স কত রকমের তার ঠিক নেই। পিতলের খেলনা

ফুলদানী বাসনপত্র ও গহনার বাক্স, দেবতা মানুষ পশুপাখীও এই অভিজন-শ্রেণীতে পড়ে। এ ছাড়া আর এক অভিজাত খেলনা ছিল চন্দন কাঠের নানা দেবমূর্তি জীবজন্তু। কাঠের বাক্স সেলফ বইয়ের র‍্যাক বাতিদান এরাও দোকানের অভিজন পুতুল খেলনা।

আর একটি খেলনা ছিল। সেটিও চমৎকার নতুন উপাদানে রচিত, সেটিও সব জায়গায় ফুটপাতের নিম্নাসনের শ্রেণীভুক্ত নয়। সে জিনিস আর কোথাও দেখিনি। সে হল ছেঁড়া পুরোনো কাগজের মণ্ডের তৈরী হালকা পুতুল খেলনা। ভাঙে না সহজে, মাটিতে পড়লেও। কাগজ ভিজিয়ে ঢেঁকিতে কুটে ('উদুখলে'), তাতে ওদেশী একটি খনিজ বস্তু—মুলতানী আঠার মত এঁটেলা একটি জিনিস—মিশিয়ে, ঐ খেলনা ও অনেক রকম ছোটবড় বাসনপত্র তৈরী হয়। বাসনগুলি আমাদের দেশের ধামার মত ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সেই খেলনাগুলি অপূর্ব-সুন্দর দেখতে; কাগজের তৈরী বলে হালকাও হত। পাখী পশু নানারকমের খেলনা হত।

এগুলি সবই বিপণী- বা দোকানবাসী-অভিজাত পুতুলসম্প্রদায়। এছাড়া থাকত কাঠের খেলনা; তারা দোকানেরও, মাটির পথেরও খেলনা। কাঠের খেলনাও উৎকৃষ্ট শিল্পকাজ। তবে ছোটদের আমাদের ওদিকে খদ্দেরের হাত পৌছত না, বলাই বাহুল্য। আমাদের ক্রয়-ক্ষমতার সীমানা বা দৌড়, ঠাকুমার কাছে পাওয়া 'রেস্ত', মেলার পার্বণী; তাও বয়স অনুসারে দু-আনা, এক আনা, চার আনা পয়সা। তাতে উপরে লেখা ঐ সব মূল্যবান 'অবিনশ্বর' পুতুলের দিকে হাত বাড়ানো চলে না।

আমাদের খেলনা মাটির রংচং-এ পুতুল। তার রূপ যতই থাক আয়ু স্বল্প। গাড়ীতে বাড়ীতে পৌছবার পথটুকুও বাঁচিয়ে রাখা শক্ত ছিল, আগেই বলেছি। যদি 'জীব' বলা চলে তো তারা ফুটপাথের জীব! এক পয়সায় কখনো দুটো, কখনো একটা, কখনো চারটেও ছোট ছোট পাওয়া যেত। ঐ পয়সা বাঁচিয়ে মালাইবরফ খাওয়া, চিনেবাদাম খাওয়াও চাই ছোটদের। সেকালে মালাইবরফই ছিল। একটি কাঠের বাক্সে চামড়ার খোলে জমানো মালাইবরফ। বরফওয়ালাদের সঙ্গে একরাশ 'ফল্‌সা' পাতা আর একটি চাকু বা ছুরী থাকত। তারা ছুরী করে চেঁচে পাতায় রেখে সেই বরফ ওজন করে বা মেপে দিত এক-পয়সা দু-পয়সার মাপে!

রাজোয়াড়ার মেলার অঙ্গ হল (১) দেবদর্শন (২) রাজদর্শন (৩) আমোদ-প্রমোদ (৪) শিশুদের আনন্দ এবং গ্রামের নরনারীর আত্মীয়-জনের বাড়ী আসার আনন্দ, দেখাসাক্ষাতের আনন্দ (৫) হাটবাজার জিনিস কেনা সব দেশের মেলার মতই।

এর পরে শ্রাবণের শেষে অথবা ভাদ্রে জন্মাষ্টমী। এতে মেলা নেই! দেবালয়ের উৎসব ব্রত উপবাস ভক্ত বৈষ্ণব নরনারীর, মধ্যরাত্রি অবধি।

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন

অধ্যাপক শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য

জীব ও জগতের মূলতত্ত্ব নির্ধারণ করাই ভারতীয় দর্শনসমূহের প্রধান লক্ষ্য। সৃষ্টির মূল রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার অভিপ্রায় লইয়া নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে উপযুক্ত যুক্তিতর্ক-সহকারেই ভারতীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ মূল সিদ্ধান্ত নিরূপণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত একরকম হয় নাই, নানারূপ মতবিরোধই ঘটিয়াছে। বিভিন্ন স্বভাবের নানাপ্রকার বস্তুই বিচিত্র জগতের মূল কারণ, অথবা এক অখণ্ড বস্তুই বিভিন্ন আকারে পরিণত হইয়াছে—এই বিষয়ে দার্শনিকগণ একমত নহেন। ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শন মৌলিক রহস্যের সন্ধান করিতে যাইয়া নানাস্বভাবের অসংখ্য পরমাণুকেই জগতের কারণরূপে নির্ধারণ করিয়াছেন। সাংখ্য পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনে ত্রিগুণাত্মিকা এক প্রকৃতিকেই জগতের মূল কারণ বলা হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতি জড়-স্বভাব বলিয়া চেতন পুরুষের প্রয়োজনীয়তাও জগৎসৃষ্টির জন্য স্বীকার করা হইয়াছে। অদ্বৈত-বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনে নিত্য শুদ্ধ চেতন এক অখণ্ড ব্রহ্মকেই জগতের কারণরূপে নির্ধারণ করা হইয়াছে। সুতরাং জগতের মূল কারণ সম্বন্ধে প্রধানতঃ তিনটি মতবাদ পরিলক্ষিত হয়। অনেক-কারণবাদ, চেতন-সাপেক্ষ অচেতন এক-কারণবাদ এবং চেতন এক-কারণবাদ। এক বা অদ্বৈত বস্তুকে জগতের কারণ বলিয়া যাঁহারা স্বীকার করেন তাঁহাদের মধ্যেও মতভেদ আছে। কারণ ও কার্যের স্বরূপ, তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি সম্বন্ধে অদ্বৈত-কারণবাদিগণ বিভিন্নমত পোষণ করেন। ইহাদের মধ্যে শৈব দর্শনের মতবাদ আলোচনা করাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অষ্টাবিংশতি শৈবাগমই প্রধানতঃ শৈবশাস্ত্র-সমূহের প্রমাণ এবং উপজীব্য গ্রন্থ। সমস্ত শৈবাগম শাস্ত্রেই যে অদ্বৈততত্ত্ব পারমার্থিকরূপে স্বীকৃত হইয়াছে এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু অভিনব গুপ্ত প্রমুখ শৈবাচার্যগণ শঙ্করের অদ্বৈত-বাদের অনুরূপ একপ্রকার অদ্বৈত মতই প্রচার করিয়াছেন। বসুগুপ্ত, সোমানন্দ, কল্লট, ক্ষেম-রাজ প্রভৃতি শৈবাচার্যগণও শৈবাদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন বটে, কিন্তু অভিনব গুপ্তের শৈবাদ্বৈতবাদ একটু স্বতন্ত্র প্রকার। কেবল-মাত্র একেশ্বরবাদ স্বীকারের মধ্যেই শৈবমত-সমূহের সামঞ্জস্য বিদ্যমান, তাহা ভিন্ন অন্যান্য অংশে অবান্তর ভেদও সুস্পষ্ট। যাহা হউক এই প্রবন্ধে অভিনব গুপ্তের কাশ্মীর শৈবাদ্বৈতবাদ বা প্রত্যভিজ্ঞাবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করাই অভিপ্রায়।[১]

'প্রত্যভিজ্ঞাবাদ' শব্দের মধ্যেই এই মত-বাদের পরিচয় বা মূলরহস্য নিহিত আছে। পূর্বদৃষ্ট বস্তুর পরবর্তীকালে 'এই সেই' বলিয়া যে প্রত্যক্ষ হয় তাহাই প্রত্যভিজ্ঞা নামে প্রসিদ্ধ। সুতরাং 'সোহহমস্মি'—আমিই সেই পরশিব—এইরূপে নিজেকে পরশিব-স্বরূপ বলিয়া জানাই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের বিবক্ষিত বিষয়। এই

১। ঐতিহাসিকগণের মতে অভিনব গুপ্ত ১০০০ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শৈবশাস্ত্রের বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহার মধ্যে প্রত্যভিজ্ঞাবৃত্তি, শিবদৃষ্টিবৃত্তি, পরা-ত্রিংশিকাবিবরণ, তন্ত্রসার, তন্ত্রালোক ও পরমার্থসার বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

দার্শনিকগণের মতে আগম অর্থাৎ পুরাণ শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্র এবং অনুমান প্রভৃতির সাহায্যে পূর্ণস্বভাব ও সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর দৃঢ়রূপে নিশ্চিত হইলে মন ভগবানকে লাভ করিবার জন্য উন্মুখ হয়, তখন ধ্যান ধারণা প্রভৃতির সাহায্যে পরমেশ্বরের অপরোক্ষ উপলব্ধি হওয়ার শক্তি উদ্ভূত হইলেই যথার্থ তত্ত্বসাক্ষাৎকার ঘটে, 'আমিই সেই পরমেশ্বর'—এইরূপ উপলব্ধি জন্মে।[২] অভিপ্রায় এই যে, পরশিব বা পরমেশ্বরই জীব নামে অভিহিত হয়। যদিও পরশিব চৈতন্য-স্বরূপ এবং সর্বদাই প্রকাশশীল, তথাপি মায়া-প্রভাবে অন্তঃকরণাদি উপাধি দ্বারা আবৃত হইয়া তাঁহার স্বরূপ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় না, অংশমাত্র প্রকাশিত হয়। সুতরাং জীব চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া প্রকাশশীল হইলেও পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না। ধ্যানধারণা সমাধি প্রভৃতির সাহায্যে পূর্ণরূপে প্রকাশের পরিপন্থী মায়া অপসারিত হইলে 'আমিই সেই পরমেশ্বর' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে এবং তাঁহার স্বরূপ পূর্ণরূপেই প্রকাশিত হয়। প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা পরমেশ্বরের পূর্ণরূপের অবভাস ঘটিলেই পরমেশ্বরের অভিন্নতা জীবে অভিব্যক্ত হওয়ায় পরমেশ্বর ও জীব অপৃথক পদার্থরূপে উদ্ভাসিত হয়। ইহাই জীবের মোক্ষ বা পরনির্বাণ। সুতরাং জীবের একান্তকাম্য ও পরমপ্রয়োজনীয় মোক্ষলাভের জন্যই প্রত্যভিজ্ঞা বা জীব-শিবের অভেদজ্ঞাপক প্রত্যক্ষের আবশ্যকতা রহিয়াছে।

'আমি'-নামক বস্তুর সহিত পরশিবের অভেদ উপলব্ধির মূল আমি ও পরশিবের সম্বন্ধের দ্যোতনা-সাপেক্ষ। জগৎকে কেন্দ্র করিয়াই আমার অস্তিত্ব অনুভূত হয়। সুতরাং জগতের অন্তর্গত আমার স্বরূপ বুঝিতে হইলে জগতের মূল রহস্য জানা একান্তভাবেই প্রয়োজন। অতএব জগতের সামগ্রিক তত্ত্ব যথার্থভাবেই জানিতে হইবে। প্রত্যেক বস্তুর মৌলিক তত্ত্ব একান্তভাবেই তাহার উৎপত্তিপ্রণালী-জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল বলিয়া প্রথমতঃ জগৎসৃষ্টির পরিচয় আবশ্যক। অতএব অন্যান্য দর্শনের মত প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনেও প্রথমতঃ জগৎসৃষ্টির আলোচনাই করা হইয়াছে।

বিশ্বসৃষ্টির মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রধানতঃ তিনটি মতভেদের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কেবলমাত্র জড়বস্তু জগৎসৃষ্টি করিতে পারে না, ইহাই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের বক্তব্য। এই দার্শনিক-গণের অভিপ্রায় এইরূপ : 'ঘট' প্রভৃতি লৌকিক-অনুভবসিদ্ধ বস্তুর উৎপত্তিপ্রণালী পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র মাটি, জল, দণ্ড, চক্র প্রভৃতি জড়বস্তুই অন্যনিরপেক্ষভাবে ঘট নির্মাণ করিতে পারে না। কারণ কেবল-মাত্র মাটি বা জল প্রভৃতি কোন একটি বস্তু এককভাবে ঘট নির্মাণ করে না বলিয়া মাটি প্রভৃতির পারস্পরিক মিলনকেই ঘটের উৎপাদক বলিতে হয়। কিন্তু মাটি প্রভৃতি অচেতন এবং সাধারণতঃ বিভিন্ন স্থানেই থাকে, সুতরাং উহারা নিজেরাই মিলিত হইতে পারে না। 'ঘট'-নামক বস্তু উৎপাদন করিবার জন্য ইহাদের মিলনের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়াই ইহাদের মিলন ঘটে, অতএব মিলনের পূর্বে প্রয়োজনীয়তা-বোধ একান্তই প্রয়োজন। চেতন ভিন্ন অপরের উক্ত প্রয়োজনীয়তা-জ্ঞান সম্ভব নহে। সুতরাং স্বীকার করিতেই হয় যে, কোন একজন চেতন (কুম্ভকার প্রভৃতি) অভিলষিত ঘট নির্মাণের জন্যই প্রয়োজনীয় মাটি প্রভৃতি একত্রিত করে। সুতরাং ইহা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, চেতন না

২। ইহাপি প্রসিদ্ধপুরাণসিদ্ধাগমানুমানাদিজ্ঞাতপরিপূর্ণ-শক্তিকে পরমেশ্বরে সতি স্বাত্মন্যভিমুখীভূতে তচ্ছক্তিপ্রতি-সন্ধানেন জ্ঞানমুদেতি নূনং স এবেশ্বরোঽহমিতি।
(সর্বদর্শনসংগ্রহ, প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন, ১৯৩ পৃঃ)

হইলে কোন কার্যই সম্পন্ন হয় না। আরও একটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাহা এই যে—কার্যসম্পাদনের পূর্বে অভিলষিত কার্য-বস্তু নির্মাণের কৌশল জানা না থাকিলে কেহই ঈপ্সিত কার্য সম্পাদন করিতে পারে না। পাক করিবার উপযোগী যাবতীয় বস্তু থাকিলেও পাক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও পাক করিতে পারে না। একটি মোটরগাড়ী বা রেডিও নির্মাণের উপযোগী যাবতীয় সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি থাকিলেও অনভিজ্ঞ ব্যক্তি উহার সাহায্যে মোটরগাড়ী প্রভৃতি নির্মাণ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে সেই সেই কাজের কৌশল যাহার জানা আছে, কেবলমাত্র সে-ই ঐ সমস্ত কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারে। সুতরাং যে কোন ভাবেই বিচার করা হউক না কেন, চেতন না হইলে কার্যের নিষ্পত্তি হয় না বলিয়া কার্যের উৎপত্তি চেতনসাপেক্ষ ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সমগ্র জগতের বিন্যাসকৌশল, নির্মাণপদ্ধতি ও প্রয়োজনীয়তা যাহার জানা আছে, তাহাকে সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ না বলিয়াও উপায় নাই। যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান তিনিই ঈশ্বর বা পরশিব। সুতরাং পরমেশ্বরই জগৎকর্তা ইহা মানিতেই হইবে।

ঈশ্বর জগৎকর্তা—ইহা অন্যান্য দর্শনেও স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু জীবের অদৃষ্ট বা শুভাশুভ কর্ম অবলম্বন করিয়াই ঈশ্বর জগৎ-নির্মাণ করেন—ইহাই ঈশ্বর-স্বীকারকারী সমস্ত দর্শনের সিদ্ধান্ত। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন ঐরূপ সিদ্ধান্তের বিরোধী। এই দর্শনের মত এই যে, কর্মসাপেক্ষ ঈশ্বরকে জগৎকর্তা বলিলে ফলতঃ ঈশ্বরের কর্তৃত্বই ব্যাহত হইবে। কারণ স্বতন্ত্রতাই কর্তৃত্বের বীজ। কর্মের অধীন হইয়া জগৎ নির্মাণ করিলে ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্যেরই হানি হওয়ায় কর্তৃত্বও সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং ঈশ্বর কর্মের সাহায্যে বিশ্বসৃষ্টি করেন—ইহা ঠিক নহে। সুতরাং অন্যনিরপেক্ষভাবেই ঈশ্বর জগৎ নির্মাণ করেন, ইহাই স্বীকার করা সমীচীন। পরিপূর্ণ-শক্তিশালী স্বয়ংসম্পূর্ণ ঈশ্বর কেবল নিজের ইচ্ছানুসারেই নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ বিরাট বিশ্ব সৃষ্টি করেন।

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত যুক্তি-তর্ক সহকারে পরিষ্কারভাবে বুঝিতে হইলে এই দর্শনোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন যে প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত সংক্ষেপে তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সূত্র, বৃত্তি, বিবৃতি, প্রকরণ ও বিবরণ—এই পঞ্চবিধ প্রমাণই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের উপজীব্য।[৩] সংক্ষেপে প্রতিপাদ্য-বিষয়প্রতি-পাদক বাক্যই সূত্র। সূত্রের তাৎপর্যব্যাখ্যার নাম বিবৃতি। বিবৃতি দুই-প্রকার লঘু ও বৃহৎ। পৌর্বাপর্য-নির্ধারণকে প্রকরণ বলা হয়। সমস্ত বক্তব্য বিষয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ উপসংহারের নাম বিবরণ। এই পঞ্চবিধ উপায়েই সমস্ত সিদ্ধান্ত নির্ধারিত হয়।

প্রথমতঃ সূত্র উল্লেখ করিতে হইবে। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের প্রথম সূত্র বা শাস্ত্রোক্ত বিষয়ের সংক্ষেপে-কথন এইরূপ—

কথঞ্চিদাসাদ্য মহেশ্বরস্য
দাস্যং জনস্যাপ্যুপকারমিচ্ছন্।
সমস্তসম্পৎসমবাপ্তিহেতুং
তৎপ্রত্যভিজ্ঞামুপপাদয়ামি ॥

(সর্ব দঃ সঃ, প্রত্যভিজ্ঞা দঃ)

পরম কৃপাময় গুরুর অনুগ্রহলাভে ধন্য হইয়া মহেশ্বরের দাসত্ব লাভ করিতে হয়। পরিপূর্ণভাবে নিজেকে পরমেশ্বরের অপার করুণা লাভের

৩। সূত্রং বৃত্তির্বিবৃতির্লঘ্বী বৃহতীত্যুভে বিমর্শিন্যৌ।
প্রকরণবিবরণপঞ্চকমিতি শাস্ত্রং প্রত্যভিজ্ঞায়াঃ ॥
(সর্বদর্শনসংগ্রহ, প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন)

অধিকারী-রূপে সংগঠিত করাই দাসত্বলাভ। বিশ্বপতি পরমেশ্বরের দাসত্বলাভ হইলেই নিখিল ঐশ্বর্যের কারণস্বরূপ মহেশ্বরের প্রত্যভিজ্ঞাসম্পন্ন হয়। সুতরাং নিজের আত্মোন্নতি এবং সাধারণ সংসারী জীবের কল্যাণসাধনের জন্যই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন প্রতিপাদন করা হইতেছে।

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের এই আদিম সূত্রটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুতঃ এই সূত্রের মধ্যেই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের যাবতীয় গূঢ়তত্ত্ব নিহিত আছে। অতএব ইহার প্রত্যেক শব্দ বিশেষভাবে আলোচনা করিলেই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের মূল্যরহস্য অনেকাংশে পরিস্ফুট হইবে।

প্রথমেই 'কথঞ্চিদাসাদ্য' এই অংশ উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার সাধারণ অর্থ—'কোনরকমে লাভ করিয়া'; পরবর্তী 'মহেশ্বরস্য দাস্যং'—এই অংশের সহিত উক্ত প্রথম অংশের অন্বয় করিতে হইবে। সুতরাং 'কোনপ্রকারে মহেশ্বরের দাসত্ব লাভ করিয়া' ইহাই প্রথম অংশের বিবক্ষিত অর্থ।

অনাদিকাল হইতে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ জীব সংসারের অনন্ত দুঃখে পীড়িত হইলেও স্বীয় দৃষ্টি অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকায় দুঃখনিবারণের পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না। সুতরাং মস্তকে অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তি যেমন জলের অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, সংসারের দুঃখক্লিষ্ট মানবও তেমনিই শান্তির অমৃতবারি অন্বেষণ করিবার জন্য ব্যাকুলচিত্তে ভ্রমণ করিতে থাকে। এই অবস্থায় জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যফলে কাহারও কদাচিৎ সদ্‌গুরু লাভ ঘটে। নিষ্ঠা সহকারে গুরুর সেবা-শুশ্রূষা প্রভৃতি দ্বারা গুরুর আনুকূল্য লাভ করিতে পারিলেই গুরুর উপদেশ অনুসারে যথাযথ অনুষ্ঠান-আচরণের দ্বারা চিত্তের মলিনতা দূর হইয়া যায়, প্রকৃত কল্যাণের পথ নির্ধারণ করিয়া ঐ পথে অগ্রসর হইতে হইতে ঈপ্সিত লক্ষ্যে সে উপনীত হইতে পারে। সুতরাং গুরুর করুণালাভই সর্বাগ্রে একান্ত প্রয়োজন। গুরুর পরিচর্যা পরমেশ্বরলাভের প্রথম সোপান, অতএব বুঝিতে হইবে পরমেশ্বরের ইচ্ছাই গুরুসেবার প্রেরণা দেয়। গুরুর সাহায্য ব্যতীত আধ্যাত্মিক জগতে পদমাত্রও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং ইহাই বুঝিতে হইবে যে জীবের অন্তরে ব্যাকুলতা জাগ্রত হইলে সর্বান্তর্যামী ভগবান জীবের দুঃখমোচনের উদ্দেশ্যেই সদ্‌গুরুরূপে ব্যাকুলচেতা ভক্তের সম্মুখীন হন। অতএব গুরুকে সাধারণ মানবমূর্তিতে প্রত্যক্ষ করিলেও প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই জীবন্ত বিগ্রহরূপে বুঝিতে হইবে। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের ইহাই মর্মকথা। এই বিষয়ে মাধবাচার্য সর্বদর্শন-সংগ্রহে পূর্বোক্ত সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—পরমেশ্বরের সহিত অভেদবুদ্ধিতে স্বকীয় গুরুর চরণযুগল বন্দনা করিলে উহা পরমেশ্বরের বন্দনাই হয়।[৪] সুতরাং গুরুচরণ-বন্দনা দ্বারাই পরমেশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিবার অধিকারী হওয়া যায়। এই অভিপ্রায়েই সূত্রে 'কথঞ্চিৎ' শব্দটি উল্লিখিত হইয়াছে। মহেশ্বরের দাসত্ব লাভ করিয়া—ইহাই পরবর্তী অংশ। যিনি মায়ার অধীশ্বর, দেশ বা কালের দ্বারা যাঁহাকে সীমাবদ্ধ করা চলে না, যিনি স্বপ্রকাশ চৈতন্য- ও আনন্দ-স্বরূপ তিনিই মহা ঈশ্বর বা মহেশ্বর। ব্রহ্মাদি অন্যান্য অনন্ত ঐশ্বর্যমণ্ডিত দেবগণ সাধারণ মায়াকে অতিক্রম করায় ঈশ্বর নামে

৪। পরমেশ্বরাভিন্নগুরুচরণারবিন্দযুগলসমারাধনেন পরমেশ্বরঘটিতৈনৈব ইত্যর্থঃ। (সর্ব দঃ সঃ, প্রত্যভিঃ) বস্তুতঃ গুরুর সাহায্য ব্যতীত শাস্ত্রবাক্যের গূঢ় তাৎপর্যও জানা যায় না। ছান্দোগ্য-উপনিষদেও আছে, 'আচার্যবান্ পুরুষো বেদ'।

অভিহিত হইলেও তাঁহারা মহামায়ার অধীন। পরমেশ্বরের অনুগ্রহে মহামায়ার প্রভাবও দূর হইয়া যায়, আত্মশক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া জীব নিত্যশুদ্ধ চৈতন্য- ও আনন্দ-স্বরূপ হয়। সুতরাং ব্রহ্মাদি দেববৃন্দও যাঁহার করুণাকণা লাভ করিয়া ঈশ্বর হইয়াছেন এবং সততই যাঁহার ধ্যান করেন তিনিই মহেশ্বর। এই মহেশ্বরের দাসত্ব লাভ করিতে হইবে। প্রভু যাহাকে সমস্ত অভিলষিত বস্তু দান করেন, প্রভুর অনুগ্রহভাগী সফলমনোরথ তাদৃশ ব্যক্তি দাস নামে অভিহিত হয়। সুতরাং দাসত্ব লাভ করা খুব সহজ নহে। নিত্যপ্রকাশ-মানতা, আনন্দ এবং সর্ববিধ স্বাতন্ত্র্যই প্রকৃত পক্ষে পরমেশ্বরের স্বরূপ। এই স্বরূপত্রয়ের পরিপূর্ণ উপলব্ধির যোগ্যতাই এখানে দাসত্ব। মায়ার বন্ধন ছিন্ন না হইলে উক্ত স্বরূপ উপলব্ধি করিবার যোগ্যতাই সম্ভব হয় না। সুতরাং মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিবার উপযোগী চিত্তশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়জয় প্রভৃতিই এখানে পরমেশ্বরের দাসত্ব শব্দের মূল লক্ষ্য। ঐরূপ দাসত্ব লাভ হইলে চিত্ত সর্ববিধ বাসনাকামনা-শূন্য হয়, সুতরাং তখন নিষ্কলুষহৃদয়ে জগতের প্রকৃত কল্যাণসাধনের উপযোগী শাস্ত্র প্রভৃতিও রচনা করা সম্ভব। হৃদয়ের সমস্ত কালুষ্য বিদূরিত না হইলে স্বীয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অযথার্থ তত্ত্বও বাক্যের ছটায় এবং যুক্তির চাতুর্যে যথার্থরূপে প্রতিপাদন করা যায় এবং এইপ্রকার শাস্ত্রপাঠ বা উপদেশ অনুসরণ করিলে প্রকৃত কল্যাণ সম্ভব নহে। সুতরাং মহেশ্বরের দাসত্ব লাভ করিয়া শাস্ত্র-প্রণেতা প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন রচনা করিয়াছেন —ইহা বলায় এই শাস্ত্রের জীবকল্যাণ-সামর্থ্যই সূচিত হইয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ এই দর্শনের অধিকারী অর্থাৎ এই দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিবার যোগ্যতাশালী কে হইবে তাহাও বলা হইয়াছে। মুমুক্ষু ব্যক্তিই এই দর্শন-শাস্ত্রপাঠে অধিকারী হইবে। সর্ববিধ ফলকামনা পরিত্যক্ত না হইলে মুমুক্ষু হওয়া যায় না। সুতরাং যাহারা বিশেষ কোনও ফলকামনা করিয়া ব্রত, দান, যজ্ঞ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করে তাহারা এই দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিবার অধিকারী নহে। অনধিকারীর নিকট শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য প্রকাশিত হয় না, তাহার ফলে শাস্ত্রবাক্যের যথার্থ রহস্য বুঝিতে না পারিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান শাস্ত্রার্থই পরম সত্য মনে হওয়ায় বহুস্থলে ভ্রমে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং শাস্ত্রনির্দিষ্ট যথার্থ ফল-লাভে অসমর্থ হওয়ায় শাস্ত্রের প্রতি অবিশ্বাস জন্মে। অতএব অধিকারী হইয়াই শাস্ত্রালোচনা কর্তব্য, ইহাই এখানে অভিপ্রায়। এই শাস্ত্র-পাঠ করিলে অধিকারীর পরম জ্ঞান জন্মে। বস্তুতঃ 'আমিই সেই মহেশ্বর' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাই এখানে পরমজ্ঞান শব্দের অর্থ।

আচার্য সোমনাথ বলেন—

একবারং প্রমাণেন শাস্ত্রাদ্ বা গুরুবাক্যতঃ।
জ্ঞাতে শিবত্বে সর্বস্থে প্রতিপত্ত্যা দৃঢ়াত্মনা ॥
করণেন নাস্তি কৃত্যং ক্বাপি ভাবনয়াপি বা।
জ্ঞাতে সুবর্ণে করণং ভাবনাং বা পরিত্যজেৎ ॥

(সর্বদঃ সঃ, দঃ প্রত্যভিঃ)

ইহার তাৎপর্য এই যে, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের সাহায্যেই হউক অথবা শাস্ত্রোপদেশ বা গুরুর উপদেশ অনুসরণ করিয়াই হউক সর্ববস্তুতে একবার শিবত্বজ্ঞান দৃঢ়ভাবে জন্মিলে বাহ্যিক করণ অর্থাৎ প্রমাণ বা শাস্ত্রপাঠাদির কোনও প্রয়োজন নাই। রোগমুক্ত ব্যক্তির ঔষধের যেমন প্রয়োজন হয় না, তত্ত্বসাক্ষাৎকারের দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলেও তেমনই চিত্তশুদ্ধির উপায়স্বরূপ বাহ্যিক অনুষ্ঠানাদির কোন

প্রয়োজন হয় না। সুবর্ণের বিশুদ্ধি নির্ধারণের জন্যই কষ্টিপাথরের আবশ্যকতা। পরীক্ষিত সুবর্ণের জন্য ঐ প্রস্তর নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং নিজের পরিপূর্ণ মহেশ্বরস্বরূপতা উপলব্ধি হইলে অন্য কিছুরই প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ঐ অবস্থায়ও তত্ত্বদর্শী পরমহংসলক্ষণাক্রান্ত মহাপুরুষেরা দুঃখনিপীড়িত মানবগণের কল্যাণ-সাধনের জন্য বাহ্যিক অনুষ্ঠান ও আচরণ করেন। শাস্ত্রপাঠের ফল বস্তুর তত্ত্বজ্ঞান লাভ। একমাত্র পরমশিব বা মহেশ্বরই প্রকৃত বস্তু, অন্যান্য সমস্তই অবস্তু—এই জ্ঞান হইলেই সমস্ত জাগতিক বস্তু বিষয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং বাসনাকলুষ চিত্ত নির্মল হয়। তখনই ধ্যান-ধারণা-সমাধির সাহায্যে 'আমিই সেই নিত্যশুদ্ধ কূটস্থ মহেশ্বর' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে মহেশ্বর চৈতন্য-স্বরূপ, সুতরাং নিত্যপ্রকাশশীল। জীবাত্মাও স্বরূপতঃ মহেশ্বর, জীব ও শিবের কোনরকম ভেদ নাই—ইহাই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের মূল প্রতিপাদ্য। সুতরাং জীব বা মহেশ্বর সর্বদাই প্রকাশিত হইলে 'জীবই মহেশ্বর' ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের আবশ্যকতা কি? যাহা স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশশীল তাহা নিজ মহিমাবলেই সর্বদা প্রকাশিত থাকে, সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন ব্যতীতও সকলে সর্বদা নিজেকে চৈতন্যরূপী মহেশ্বর বলিয়াই জানিতে পারিবে। অতএব নিজের মহেশ্বরত্ব অসন্দিগ্ধ হওয়ায় উহার প্রতিপাদন নিষ্ফল প্রয়াসমাত্র। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে—যদিও জীব ও মহেশ্বর স্বরূপতঃ অভিন্ন, তথাপি অনাদি অবিদ্যা বা মায়ার প্রভাবে জীব পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না। মহেশ্বর সর্বব্যাপক, কিন্তু জীব সর্বব্যাপকরূপে প্রকাশিত হয় না। নিত্যচৈতন্যরূপী সর্বব্যাপক মহেশ্বর নিজের স্বাতন্ত্র্যশক্তির মহিমায় লীলাবশতঃ স্বকীয় বোধগগনে সবকিছুকে প্রতিবিম্বের মতই প্রকাশিত করিয়াছেন।[৫] লীলাবিনোদনার্থ তিনি নিজেকে সঙ্কুচিত করিয়া ক্ষুদ্ররূপে অবভাসিত হইতেছেন এবং অণু বা ক্ষুদ্রতর অংশস্বরূপ জীবের ভোগসিদ্ধির জন্য চরাচর বিশ্ব প্রকটিত করিয়াছেন। সুতরাং স্বপ্রকাশতা-নিবন্ধন পরশিব সর্বদা প্রকাশমান হইলেও মায়াবশতঃ অংশতঃ প্রকাশিত অবস্থায় জীব নামে অভিহিত হন। অতএব জীব স্বরূপতঃ পরশিব হওয়া সত্ত্বেও মায়ার প্রভাবে সাধারণতঃ স্বকীয় মহেশ্বরত্ব উপলব্ধি হয় না বলিয়াই দৃক্‌শক্তি এবং ক্রিয়াশক্তির অনুভবের সাহায্যে তাহাকে স্বকীয় মহেশ্বরত্ব বুঝিতে হয়।[৬] ইহার অভিপ্রায় এই যে, চৈতন্য বা দৃক্‌শক্তি এবং স্পন্দন বা ক্রিয়াশক্তি একমাত্র পরমেশ্বরেরই আছে। সুতরাং জীব জ্ঞাতা বা কর্তারূপে প্রতীয়মান হওয়ায় জীবকে স্বরূপতঃ পরমেশ্বরই বলিতে হইবে। পারমার্থিক বিচারে জ্ঞাতৃত্ব ও কর্তৃত্ব একমাত্র পরমেশ্বরেরই সিদ্ধ হইবে। অতএব বস্তুতান্ত্রিক বুদ্ধিতে জ্ঞাতা ও কর্তা রূপে প্রতীয়মান জীব ফলতঃ মহেশ্বর—ইহাই বস্তুতত্ত্ব। এই অবস্থায় বিচারশীল ব্যক্তি 'জীব ঈশ্বর নহে' ইহা কখনও বলিতে পারে না। পক্ষান্তরে জীবই ঈশ্বর বলিয়া জীব ও মহেশ্বরের ঐক্য প্রতিপাদনকারীও প্রকৃতপক্ষে কেহই হইতে পারে না। কারণ জীব এবং মহেশ্বরের অভেদদর্শী অপর কেহ থাকিলেই সেই তৃতীয় দ্রষ্টা ব্যক্তি জীব ও ঈশ্বরের ঐক্য প্রতি-পাদন করিতে পারে। কিন্তু মহেশ্বর ও জীব

৫। সর্বমিদং ভাবজাতং বোধগগনে প্রতিবিম্বমাত্রম্।
(তন্ত্রসার, ৩য় আঃ)

৬। স্বপ্রকাশতয়া সততমবভাসমানেঽপ্যাত্মনি মায়া-বশাদ্ ভাগেন প্রকাশমানে পূর্ণতাবভাসসিদ্ধয়ে দৃক্‌ক্রিয়াত্মক-শক্ত্যাবিষ্করণেন প্রত্যভিজ্ঞা প্রদর্শ্যতে।
(সর্বদঃ সঃ, প্রত্যভিঃ দঃ)

অভিন্ন বলিয়া সেই সম্ভাবনাও নাই। বস্তুস্থিতির দিক হইতে ঐরূপ হইলেও মায়ার প্রভাবে জীব পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত না হওয়ায় নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া বুঝিতে পারে না। সুতরাং শাস্ত্রানুশীলনের দ্বারা নিজস্ব চৈতন্য এবং ক্রিয়াশক্তির মূল উৎস অনুসন্ধান করিলেই জীব নিজের মহেশ্বরত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে।[৭] নিজের জ্ঞাতৃত্ব কিভাবে স্বকীয় মহেশ্বরত্বের বোধ জন্মাইবে তাহাও আচার্য সোমানন্দ নাথ বলিয়াছেন। তিনি বলেন: চৈতন্যই প্রাণিবর্গের জীবন। উক্ত চৈতন্য জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি বা স্পন্দনশক্তি—এই দুইভাবে অভিব্যক্ত হয়। জীবের জ্ঞানশক্তি স্বতঃসিদ্ধ। অর্থাৎ জীব আর কিছু না জানিলেও নিজেকে স্বাভাবিক ভাবেই জানে। 'আমি' এই বোধ বা জ্ঞানস্ফুরণ সমস্ত প্রাণীর সর্বদাই বিদ্যমান; প্রত্যেক জীবিত প্রাণীই কিছু-না-কিছু কর্মানুষ্ঠান করে। অন্ততঃ শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ ক্রিয়ানুষ্ঠান সমস্ত প্রাণীরই রহিয়াছে। সুতরাং জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি জীবিত প্রাণীর অবশ্যম্ভাবীরূপেই থাকিবে! কিন্তু জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি সকল প্রাণীর স্বাভাবিক হইলেও উহার তারতম্য বিদ্যমান। কেহ অল্প জানে, কেহ তদপেক্ষা বেশী জানে। কাহারও জ্ঞান দশ বা বিশটি বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কাহারও বা দশসহস্র বা বিশসহস্র বিষয়ের জ্ঞান আছে। সুতরাং বুঝা যায় জ্ঞানশক্তি কোথায়ও অধিক সঙ্কুচিত, আবার কোথায়ও বা তদপেক্ষা অধিক বিকশিত। এইভাবে বিচার করিলে শেষ পর্যন্ত এমন একটা স্থানে পৌছাইতে হইবে যেখানে জ্ঞানশক্তি সম্পূর্ণ নিরাবরণ অর্থাৎ পূর্ণরূপে বিকশিত। জ্ঞানশক্তির এই পরিপূর্ণবিকাশ যেখানে ঘটিয়াছে তাহাকেই মহেশ্বর বলা হয়। দেশ কাল প্রভৃতি উপাধির দ্বারা প্রতিহত হইয়াই জ্ঞানশক্তি সঙ্কুচিত হয়। সুতরাং অসঙ্কুচিত অবস্থাও উহার আছে—ইহা অবশ্য স্বীকরণীয়। এবং ঐ অসঙ্কুচিত বা পরিপূর্ণ জ্ঞানশক্তি পূর্ণরূপে অবভাসিত মহেশ্বর ভিন্ন আর কাহারও মধ্যে থাকা সম্ভব নহে। সঙ্কুচিত এবং অসঙ্কুচিত—এই অবস্থাগত তারতম্য যাহার ঘটে তাহা মূলতঃ অভিন্ন বা এক। সুতরাং সঙ্কুচিত জ্ঞানশক্তি ফলতঃ অসঙ্কুচিত জ্ঞানশক্তি হইতে অভিন্ন। অতএব জীবের জ্ঞানশক্তি মহেশ্বরের জ্ঞানশক্তি হইতে অভিন্নরূপে প্রতিপন্ন হওয়ায় 'জীবই মহেশ্বর' ইহাই সিদ্ধ হয়। এইরূপ ক্রিয়াশক্তির তারতম্য অনুসন্ধান করিলেও জীবের মহেশ্বরত্ব সিদ্ধ হইবে।[৮]

আচার্যপ্রবর অভিনব গুপ্ত বলেন—"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি (কঠঃ ২।২) অর্থাৎ দীপ্যমান সৎস্বরূপ মহেশ্বরের প্রভায় প্রভান্বিত হইয়াই সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী দীপ্তিশালী হইয়াছে। সুতরাং শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারাও মহাজ্যোতির্ময় নিত্যপ্রকাশীল মহেশ্বরের চৈতন্য বা প্রকাশশীলতাই ভাব-পদার্থসমূহের প্রকাশের কারণ বলিয়া সিদ্ধ হয়। প্রকাশ বা চৈতন্য এক অখণ্ড হইলেও বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়ায় ভিন্নরূপে প্রতীয়-

৭। সর্বেষামিহ ভূতানাং প্রবিষ্টা জীবদাশ্রয়া।
জ্ঞানং ক্রিয়া চ ভূতানাং জীবতাং জীবনং মতম্॥
তত্র জ্ঞানং স্বতঃসিদ্ধং ক্রিয়াকার্যাশ্রিতা সতী।
পরৈরপ্যুপলক্ষ্যেত তথান্যজ্জ্ঞানমুচ্যতে।
যা চৈষাং প্রতিভা তত্তৎপদার্থক্রমরূপিতা।
অক্রমানন্দচিদ্রূপঃ প্রমাতা স মহেশ্বরঃ॥
(সর্বদঃ সঃ প্রত্যভিঃ দঃ)

৮। তদৈক্যেন বিনা নাস্তি সংবিদাং লোকপদ্ধতিঃ।
প্রকাশৈক্যাৎ তদেকত্বং মাতৈকঃ স ইতি স্থিতঃ॥
(সর্বদর্শনসংগ্রহ, প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন)

মান হয়। একই বৈদ্যুতিক আলোক মূলতঃ অভিন্ন হইলেও নীল রক্ত প্রভৃতি নানা বর্ণের কাচের আবরণীর ভিতর দিয়া প্রকাশিত হওয়ায় বিভিন্ন নামে ব্যবহৃত হয়। সেইরূপ ঘট, নদী প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুর সহিত সংশ্লেষের ফলে এক অখণ্ড চৈতন্যও বিভিন্নরূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রকৃত দৃষ্টি অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে যে দেশকাল প্রভৃতির দ্বারা সঙ্কুচিত স্ফুরণই বিভিন্নভাবে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু মূলতঃ উহা অভিন্ন। এই চৈতন্য বা প্রকাশই অন্তঃকরণাদিসম্পৃক্ত হইয়া প্রমাতা নামেও ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যই আত্মা। দেশকাল প্রভৃতি কোন উপাধির দ্বারা প্রতিহত না হইয়া নিত্য সর্বব্যাপী-রূপে যে চৈতন্য প্রকাশিত হয়—উহাই মহেশ্বর। মহেশ্বর আনন্দ-স্বরূপ, বিজ্ঞানঘন এবং স্বতন্ত্র। মহেশ্বরের স্বাতন্ত্র্য থাকার ফলেই তিনি কাহারও ইচ্ছা বা প্রভাবের বশীভূত না হইয়াই কেবলমাত্র লীলা-বিনোদনের জন্যই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়াছেন। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে জড় বস্তুই জগতের কারণ হইতে পারে না, এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির অভাব থাকায় ঈশ্বর ভিন্ন অপর কেহই জগৎ নির্মাণ করিতে পারে না। মহেশ্বরের নিজ ইচ্ছানুসারে সমগ্র বিশ্বনির্মাণসামর্থ্যই তাঁহার ক্রিয়াশক্তি। সুতরাং যিনি জগৎ রচনা করেন, অর্থাৎ বিশ্বপ্রপঞ্চ যাহা হইতে সমুদ্ভূত হইয়া, যাহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, প্রলয়কালেও উহা স্বাভাবিকভাবেই তাহাতেই বিলীন হইবে। অতএব জগতের জন্ম, স্থিতি ও সংহারের কারণই—মহেশ্বর।[৯] বেদান্তমতে এই মহেশ্বরই ব্রহ্মনামে অভিহিত।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে জীব ও মহেশ্বর স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলে নিত্যমুক্তশুদ্ধবুদ্ধস্বভাব মহেশ্বরের মত জীবও নিত্য মুক্ত হইবে, সুতরাং জীবের সংসারবন্ধন কি করিয়া সম্ভব? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে—অনাদি অবিদ্যা বা মায়ার প্রভাবে জীব নিজের নিত্যমুক্তস্বরূপ অবগত হইতে পারে না, সুতরাং মায়াদ্বারা অন্ধ হইয়া স্বকীয় ঈশ্বরস্বরূপতা জানিতে অসামর্থ্যরূপ অজ্ঞানজনিত কর্মের ফলেই সংসারে বদ্ধ হয়। অতএব যথাযথভাবে প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন অনুশীলনের ফলে 'আমিই সেই ঈশ্বর' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা জন্মিলে মহেশ্বরের সাক্ষাৎকার ঘটিবার ফলে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির পরিপূর্ণতা সাধিত হওয়ায় জীব মুক্ত হয়।[১০]

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে জানা যায় যে জীব নিজেকে মহেশ্বররূপে জানিবে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে মহেশ্বর ও জীব অভিন্ন হওয়ায় মহেশ্বরই জ্ঞাতা হইবেন, অথচ জ্ঞেয় বিষয়রূপেও মহেশ্বরই নির্দিষ্ট হইয়াছে। কারণ জানিবার বিষয়ও মহেশ্বর। সুতরাং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক বা অভিন্নই হইয়া পড়িয়াছে। অথচ ইহা অসঙ্গত; যে জ্ঞাতা সে নিজের জ্ঞানক্রিয়ার কর্ম বা বিষয় হইতেই পারে না। কারণ কর্তা ও কর্ম অত্যন্ত ভিন্ন। আরও কথা এই যে—"অহং বহু স্যাম্"—আমি বহু হইব—সৃষ্টির মূলীভূত এই সঙ্কল্পের ফলেই এক মহেশ্বর বিবিধ বস্তুরূপে রূপায়িত হইয়াছেন। সুতরাং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাহা কিছু বস্তু—তাহা জ্ঞাতা বা জ্ঞেয়—যাহাই হউক না কেন সমস্তই মহেশ্বর। অতএব একই মহেশ্বর প্রমাতা, প্রমেয় প্রভৃতি বিবিধভাবে অবস্থিত। সুতরাং প্রমেয় পৃথিবী জল প্রভৃতি পদার্থ-নিচয় এবং প্রমাতা জীব

৯ জন্মাদ্যস্য যতঃ। (ব্রহ্মসূত্র—১।১।২)

১০ এষ প্রমাতা মায়ান্ধঃ সংসারী কর্মবন্ধনঃ।
বিদ্যাদিজ্ঞাপিতৈশ্বর্যশ্চিদ্ঘনো মুক্ত উচ্যতে॥
(সর্বদঃ সঃ, প্রত্যভিঃ দঃ)

একই মহেশ্বর-স্বরূপ হওয়ায় বদ্ধ ও মুক্ত উভয়ের নিকট জাগতিকপদার্থের তাত্ত্বিকস্বরূপের কোনই তারতম্য থাকিবে না। অতএব বদ্ধ ও মুক্ত জীবের পার্থক্যও সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে—যদিও প্রমেয় প্রমাতা প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থই মূলতঃ এক মহেশ্বরেরই স্বরূপ বলিয়া অভিন্ন, তথাপি মৌলিক এই অভেদ যিনি অপরোক্ষরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন একমাত্র তিনিই প্রমাতা ও প্রমেয়ের অভেদ বুঝিতে পারেন—এবং তিনি মুক্ত। মায়ার প্রভাবে যাহার পক্ষে নিখিল বস্তুর স্বরূপ হিসাবে মহেশ্বরকে বুঝিবার সামর্থ্য নাই—তাহার নিকট প্রমাতা ও প্রমেয়ের ভেদ বাস্তব বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। ফলে তাহার ভোগাসক্তি প্রভৃতি হ্রাস না পাওয়ায় সে বদ্ধই থাকিয়া যায়। অতএব বদ্ধ ও মুক্তের পার্থক্য অতি পরিস্ফুট।

পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে যে, জীব স্বভাবতঃ মহেশ্বর-স্বরূপ হইলে উক্ত স্বরূপের উপলব্ধির জন্য প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের কোনই আবশ্যকতা নাই। কারণ—যাহা স্বরূপতঃ মহেশ্বর হইতে অভিন্ন, উপলব্ধি না হইলেও তাহা অভিন্নই থাকিবে এবং প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের যে ফল তাহাও স্বতঃসিদ্ধভাবেই ঘটিবে। বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি স্বাভাবিকভাবেই ঘটে, কোনও প্রত্যভিজ্ঞার আবশ্যকতা হয় না। সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন নিষ্প্রয়োজন—ইহাই বলা চলে। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে—অর্থক্রিয়া বা ফলসিদ্ধি দুইরকম, বাহ্য ও আন্তরিক। বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি প্রভৃতি বাহ্য অর্থক্রিয়া প্রত্যভিজ্ঞা-সাপেক্ষ নহে। কিন্তু কোন কিছু অনুভব করিবার ফলে প্রীতি শোক দুঃখ প্রভৃতি আন্তরিক অর্থক্রিয়া একান্তভাবেই প্রত্যভিজ্ঞার উপর নির্ভরশীল। লটারির অর্থপ্রাপ্তি বা বিদেশস্থ ঘনিষ্ঠ প্রিয়জনের মৃত্যু প্রভৃতি একান্তভাবেই উপলব্ধির সাহায্যে আনন্দ- বা দুঃখ-দায়ক হয়। ঐ সমস্ত ঘটনা বাস্তবে সংঘটিত হইলেও না জানা পর্যন্ত মানসিক ভাবান্তর উপস্থিত হয় না। আরও বলা যায়—দৈববিড়ম্বনায় অতি শিশুকালেই যে পুত্রের সহিত পিতার বিচ্ছেদ ঘটে, ঘটনাপ্রবাহের সংঘাতে দীর্ঘদিনের পর সেই পুত্র ও পিতা পরস্পরের অত্যন্ত সন্নিহিত হইলেও উভয়ের প্রকৃত সম্পর্ক না জানা পর্যন্ত তাহাদের পিতা পুত্র-সুলভ ভালবাসা জন্মে না। সুতরাং আন্তরিক অর্থক্রিয়া জ্ঞানসাপেক্ষ। জীব স্বভাবতঃ মহেশ্বর হইলেও মায়ার প্রভাবে ঐ অভিন্নতা অজ্ঞাতই থাকে। অতএব যথাবিহিত শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতির সাহায্যে মায়ার প্রভাব মুক্ত হইলেই জীব নিজেকে মহেশ্বর বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে। সুতরাং ঐরূপ প্রত্যভিজ্ঞতার সাধনের জন্য দর্শনাদির আবশ্যকতা রহিয়াছে।

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায়, শিবই পশুভাব অর্থাৎ জীবভাব গ্রহণ করিয়াছেন। 'শিব এব গৃহীতপশুভাবঃ'- আবার সেই পশু নিজেকে শিব বলিয়া জানিবে—ইহাই প্রত্যভিজ্ঞা। অনন্ত, চিৎস্বরূপ, স্বতন্ত্র শিবই চরাচর সমগ্র বিশ্বের কারণ। তিনি সর্বাকার অথচ নিরাকার-স্বভাব। তিনি স্বপ্রকাশ, ব্যাপক ও নিত্য। শিবই দ্রষ্টা, শিবই দৃশ্য। এক অদ্বিতীয় শিবই 'নর্মরভসে' (ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাসূত্র—৫।৬)—অর্থাৎ লীলার জন্য নিজেকে সঙ্কুচিত করিয়া অবভাসিত হন এবং সঙ্কুচিতস্বরূপ জীবের ভোগসিদ্ধির জন্য বিশ্বকে বিকশিত করেন। তাহার স্বতঃস্ফূর্ত স্পন্দন বা অহংভাব হইতেই বিচিত্র বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে।

শিব চিৎস্বভাব, পূর্ণ, অবিকারী ও নিরাশংস অর্থাৎ পরমবৈরাগ্যশালী হইলেও তাঁহার শক্তি

অনন্তভাবে প্রস্ফুরিত হয়। তাঁহার মধ্যে চিৎ, আনন্দ, জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া—এই পাঁচটি প্রধান শক্তি।[১১]

শিব ও শক্তি পরমার্থতঃ অভিন্ন। চিৎশক্তির প্রাধান্য অবস্থায় শিব, আবার স্বাতন্ত্র্যমহিমায় বহিঃপ্রকাশের ইচ্ছায় যখন প্রথম আত্মবিমর্শ বা ক্রিয়াশক্তির আবির্ভাব ঘটে, সেই আনন্দপ্রধান অবস্থায় শিবই শক্তি। ইহাই অহংভাব বা প্রকাশের দ্বিতীয় স্বরূপ। তাহার পর 'অহং ইদং'—আমি ইহা হইব ইত্যাদি পরামর্শ বা সঙ্কল্পের উদয় হয়, ইহাই তৃতীয় প্রকাশ। ইহারই নাম সদাশিবতত্ত্ব বা শিবশক্তির মিলিত-রূপ। এই সদাশিবতত্ত্বও সৃষ্টির পূর্বরূপ বা সূক্ষ্ম অবস্থা, ইহা উন্মীলিতমাত্র-চিত্রকল্প-ভাবরাশির ন্যায় অস্ফুট। এই ভাবরাশি পরিস্ফুট হইলেই জ্ঞানশক্তিপ্রধান হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বরের আবির্ভাব ঘটে। হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বরের ক্রিয়াশক্তির প্রাধান্য ঘটে, তখন 'অহং' বা 'ইদং'-এর অর্থাৎ শিব ও শক্তিতত্ত্বের তুল্যরূপে বিকাশ ঘটায় সৃষ্টি-প্রবাহ আরম্ভ হয়।

চৈতন্যরূপী পরশিব এই জগতের একমাত্র মূল কারণ, কিন্তু তিনি শিব, পশু বা জীব এবং মায়া—এই ত্রিবিধরূপে অভিব্যক্ত হন সুতরাং শিব, জীব ও মায়া বা বিচিত্রকার্য—এই ত্রিধা পরিদৃষ্ট হইলেও সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চ এক পরশিবেরই সত্তায় প্রতিষ্ঠিত।[১২]

স্বাতন্ত্র্যশক্তিবলে নিজেকে সঙ্কুচিত করিয়া পরশিবই জীবরূপে অবভাসিত হন। অতএব জীব চিৎ-অচিৎ-রূপাবভাসমাত্র। ইহার মধ্যে চিদ্‌রূপতাই জীবের ঐশ্বর্য, আবার অচিৎ-রূপতাই মল। মলের জন্যই জীব স্ব-স্বরূপের উপলব্ধি করিতে পারে না। এই মল অপগত হইলেই জীব নিজকে পরশিবরূপে উপলব্ধি করে, ইহাই মোক্ষ।

জীব বা অনুগত দুষ্টভাবই 'মল' বা পাশ অর্থাৎ বন্ধন। এই মল বা বন্ধন পঞ্চবিধ—অজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান, অধর্ম, ভোগাসক্তি ও তৎকারণরূপ ভোগ্যবিষয়ের সান্নিধ্য, চ্যুতি অর্থাৎ সদাচরণ হইতে স্খলন এবং জীবত্ব-প্রাপক অনাদি সংস্কার।[১৩] এই মলযুক্ত পশু বা জীব আবার তিনরকম; বিজ্ঞানাকল, প্রলয়াকল এবং সকল। তত্ত্বজ্ঞান, যোগ, সন্ন্যাস প্রভৃতির সাহায্যে কর্মক্ষয় এবং অনাগতভোগসংস্কার দগ্ধ বীজের মত হইলে জীবন্মুক্ত পুরুষই 'বিজ্ঞানাকল' নামে অভিহিত হয়। 'কলা' শব্দের অর্থ বন্ধের কারণ ভোগ্যবস্তু। যাহার 'কলা' নাই তাহাকে 'অকল' বলে। বিজ্ঞানের দ্বারা যে 'অকল' হইয়াছে তাহার নাম 'বিজ্ঞানাকল'। জীবভাবের মূলীভূত 'মল' ব্যতীত অন্য সমস্ত 'মল' বিজ্ঞানাকল পুরুষের বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রলয়কালে সমস্ত ভোগ্যবস্তুর অভাব ঘটায় কেবলমাত্র মায়া বা অবিদ্যারূপ মলযুক্ত জীব প্রলয়াকল অভিহিত হয়। আর সাধারণ সংসারাসক্ত জীব 'সকল' নামে নির্ধারিত হইয়াছে। যাহা সঙ্কোচনকারী তাহাই মায়া। এই মায়া পরশিবের লীলার উপযোগী আত্ম-সঙ্কোচনের ইচ্ছা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব পৃথিব্যাদি পদার্থসমূহের মতই পরশিবের সঙ্কোচশালী পরিণামের মত মায়াও তত্ত্ব বা বস্তু। এই মায়াই কলা, বিদ্যা, রাগ, কাল ও নিয়তিরূপ ষট্‌কঞ্চুকের সাহায্যে জীবের ভোগ-

১১ পরমেশ্বরঃ পঞ্চভিঃ শক্তিভির্নির্ভরঃ।
স স্বাতন্ত্র্যাৎ শক্তিং তাং তাং মুখ্যতয়া প্রকটয়ন্ তিষ্ঠতি॥
(তন্ত্রসার)

১২ ত্রিকমতে নর-শক্তি-শিবাত্মকং বিশ্বমুক্তম্। পরমার্থতো হি পর-পরাপরা-পরাত্মক নরশক্তিশিবাত্মকং বিশ্বমুক্তম্। (তন্ত্রসার আঃ ৯, টীকা)

১৩ আত্মাশ্রিতো দুষ্টভাবো মলঃ। স মিথ্যাজ্ঞানাদি-ভেদাৎ পঞ্চবিধঃ। (সর্বদঃ সঃ, শৈবদর্শন)

সাধন সম্পন্ন করে, আবার সমগ্র জগতেরও কারণ এই মায়া। এই মতে সৃষ্টি প্রক্রম এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

'মায়া' বা পরমেশ্বরের ইচ্ছাই সমস্ত ভূত-ভৌতিক ও জীব সৃষ্টির মূল কারণ। প্রলয়-কালে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এই মায়াতে সূক্ষ্মরূপে লীন হয় এবং মায়া পরমেশ্বরেই লীন হয়। সৃষ্টির আরম্ভে পরমেশ্বরের স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা বা মায়ার উদ্ভব হয় এবং ক্রমশঃ তাহার পরিণাম ঘটে। এই মায়ার প্রথম পরিণামের নাম 'কলা' বা সমগ্র পদার্থের মূলীভূত সূক্ষ্মতম বস্তু। প্রলয়কালে এই কলার বিনাশ ঘটে। কলার পরিণাম কাল। কাল হইতে নিয়তি বা অদৃষ্ট এবং অদৃষ্ট হইতে বিদ্যার উৎপত্তি হয়। এই বিদ্যাই চিত্তনামে অভিহিত হয়। বিদ্যা হইতে রাগের জন্ম। যাহা বিষয়াসক্তির মূল এবং বিদ্বেষের প্রতিদ্বন্দ্বী তাহাই রাগ। বিদ্যা এবং রাগ—প্রতি জীবের ভিন্ন। ইহাই আন্তর সৃষ্টি।

সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা মায়াই প্রকৃতি। এই প্রকৃতি হইতেই প্রথমে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম অন্তঃকরণ (মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার) এবং স্থূল পঞ্চভূতের সূক্ষ্মরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ তন্মাত্র এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। পঞ্চ তন্মাত্রের স্থূল পরিণামই পঞ্চ স্থূল মহাভূত।

সৃষ্টিতত্ত্বের প্রথম পরশিবের ইচ্ছার বিকাশ ও শক্তি বা আনন্দস্বরূপের অভিব্যক্তি পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। শিবশক্তি হইতে ঈশ্বরের উৎপত্তি এবং ঈশ্বর সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের জনক। মায়াই প্রকৃতিতত্ত্বের মূল। 'কলা' মায়ার প্রথম পরিণাম। সুতরাং উপসংহারে ইহাই বলা হইয়াছে যে—(১) শিবশক্তিতত্ত্ব আনন্দপ্রধান। (২) সদাশিবতত্ত্ব ইচ্ছা-প্রধান। (৩) ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানপ্রধান। (৪) শুদ্ধবিদ্যা ক্রিয়াপ্রধান। এই চতুর্বিধ পরিণাম সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির মূল। এই তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইলেই 'মল' বিনষ্ট হয় এবং জীব নিজেকে পরশিব স্বরূপে জানিতে পারে।

প্রণাম করি

শ্রীঅটলচন্দ্র দাশ

প্রণাম করি তাহার পায়ে সবারে যে স্নেহ করে,
সবারে যে দিবস-রাতি বাঁচাতে চায় বক্ষে ধ'রে।
যে জন সদা মিষ্ট কথায় বক্ষ সবার ভরে সুধায়,
অমৃতলোক দেখায় সে যে, মানবতায় রক্ষা করে।

আকাশ-বাতাস-গ্রহে সূর্যে আছ তুমি মাটির গায়ে,
তবু যেথায় প্রকাশ বেশী—প্রণমি সেই দেবালয়ে।
ভালবাসে সবারে যে বিশ্বপিতার দেউল সে যে,
প্রণমি সেই দেবালয়ে, দেউলবাসীর রাঙা পায়ে।

সাবিত্রী ও সীতা

শ্রীমতী ইন্দুবালা মিত্র

আমাদের ভারতভূমি পুণ্যভূমি, পুণ্যতীর্থ প্রভৃতি নামে বা বিশেষণে ভূষিত ও পরিচিত। এই পবিত্র দেশ যেমন শতসহস্র সাধক ভক্ত ও মহামানব বা অবতারপুরুষের জন্মভূমি, সেইরূপ অসংখ্য সতীরমণীরও জন্মস্থান। এই দেশের পুরাণ ইতিহাস আলোচনা করলে তার বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

পুরাণকীর্তিতা মহীয়সী যাঁরা সাধ্বী পতিব্রতা রূপে সর্বভারতে আজও বন্দিতা, পূজিতা, তাঁদের মধ্যে রামায়ণের জনকদুহিতা জানকী এবং মহাভারতের অশ্বপতিসুতা সাবিত্রী, এঁরাই শ্রেষ্ঠা এবং আদর্শস্থানীয়া হয়ে আছেন। তাছাড়া এদেশে মহাভারতে মহীয়সী মহারানী গান্ধারী প্রভৃতি আরও যে সব নারী চরিত্র দেখতে পাওয়া যায়, তাঁরাও অতুলনীয়া।

ভারতাত্মার বাণীবিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'হে ভারত! ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী'।

নারীর আদর্শরূপে সীতাসাবিত্রীর নামই একসঙ্গে সাধারণতঃ উল্লিখিত হয়। স্বামীজী দময়ন্তীকে উঁহাদেরই সমপর্যায়ভুক্তা করিয়াছেন। এ তিনজনের কেহই সাধারণ গৃহস্থের কন্যা বা বধূ নন, প্রত্যেকেই রাজদুহিতা ও রাজবধূ। সর্বোপরি সেই বহুপত্নীকের যুগেও প্রত্যেকেই একপত্নীনিষ্ঠ রাজার মহিষী, স্বামীর অতীব আদরিণী। আবার ইঁহারা তিনজনেই অরণ্যবাসিনী হয়েছিলেন; আবার নিজ নিজ জীবনযুদ্ধে বা সংসারক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই ভূমিকা ভিন্ন। সাদৃশ্য অনেক, আবার বৈসাদৃশ্যও কম নয়। আমরা এখানে প্রথমোক্তা দুজনের কথাই বলতে চাই। 'সীতা' 'সাবিত্রী' নাম পাশাপাশি বা পরপর উচ্চারিত হলেও, দুজনের জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন। শুধু ভিন্নই নয়—সীতা যেন আমাদের মানবলোকের, সাবিত্রী দেবলোকের। সাবিত্রীচরিত্রে আমরা অলৌকিকত্বই দেখতে পাই। সাবিত্রীর কার্যকলাপ অমানুষিক।

সাবিত্রীকে বিশেষভাবে দেখতে পাওয়া যায় বিবাহের কিছু পূর্ব হতে। বিবাহের পর এক বৎসর পতিগৃহবাসকালে আমরা তাঁর দেখা ভালভাবে পাই। তাঁর চিন্তাধারা বা কার্যপ্রণালীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় এই সময়টুকুর মধ্যেই। সাবিত্রীর জীবনের দুশ্চর তপস্যা, সাধনা এবং অপূর্ব আত্মপ্রত্যয়, নিজ শক্তির প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস—সবই ঐ সময়ের মধ্যে পূর্ণবিকশিত হয়। তাঁর জীবনের দুঃখকষ্ট, দুশ্চিন্তা ঐ স্বল্প সময়ে অতি প্রবল, আবার তার সমাপ্তিও ঐ সময়ের মধ্যেই। এবং এই জন্যই সাবিত্রীচরিত্র অলৌকিক, অমানুষিক। এদিক থেকে এই পুণ্যভূমি ভারতেও তাঁহার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত মেলা ভার।

অপ্রত্যাশিত অতর্কিত বিপদ, যা কত অজ্ঞাত, তা-ও মানবজীবনে অভাবিতরূপেই এসে পড়ে; নিরুপায় মানব নির্বিবাদে মাথা পেতেই নিতে বাধ্য হয় তাকে। শোক, দুঃখ, ব্যথা, যন্ত্রণা, যা পূর্বে অসহ মনে হয়েছে, বা কল্পনাতেও আসে নাই।

তাকেও সহ্য করে থাকতে বাধ্য হয় মানুষ এবং থাকেও। এই দৃষ্টান্ত আমরা নিজেদের জীবনেই দেখতে পাই। এ যুগে তো কথাই নাই। আগে হতে জানা এক নির্দিষ্ট দিনে এক অনিবার্য চরম বিপদ—তার দুশ্চিন্তার কোন তুলনাই নাই। এক বালিকার নববিবাহিত জীবন, স্বামী স্বনির্বাচিত; সেই স্বামীরই আয়ু মাত্র এক বৎসর। সতীত্বের, অমল ধবল মানসিক পবিত্রতার চরম দৃষ্টান্ত সাবিত্রীর সঙ্কল্প; সত্যবানকে মনে মনে স্বামী-রূপে বরণ করার পর সব কথা জেনেও, পিতার নিষেধ সত্ত্বেও তিনি সত্যবানকেই বিবাহ করতে কৃতনিশ্চয়া—একবার যখন মনে মনে একজনকে স্বামী-রূপে বরণ করা হয়েছে তখন তার ব্যত্যয় আর কখনো কিছুতেই হতে পারে না!

রাজ্যহারা চক্ষুহীন দ্যুমৎসেন পত্নী ও পুত্র সত্যবান সহ বনবাসী। সত্যবান তাপস-কুমাররূপেই দৃষ্ট হন সাবিত্রীর চক্ষের সম্মুখে। তপস্যা-তেজদীপ্ত, বলিষ্ঠ, রূপবান সত্যবানই রাজতনয়াকে মুগ্ধ করেন। সাবিত্রী তাঁকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করলেন এবং তাঁর নাম ও পিতৃপরিচয় জ্ঞাত হয়ে, গৃহে ফিরে এসে তা জনকের গোচর করলেন। দেবর্ষি নারদ তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখনই জানালেন যে, সত্যবান সর্ববিষয়ে সাবিত্রীর উপযুক্ত সন্দেহ নাই, কিন্তু তার পরমায়ু যে মাত্র আর এক বৎসরকাল! একথা জানিয়ে বারবার তিনি সাবিত্রীকে নিষেধ করলেন সত্যবানকে বিবাহ করতে; অন্য পতি নির্বাচন করতে বললেন। সাবিত্রীর পিতাও বহু প্রকারে চেষ্টা করলেন কন্যাকে তার পূর্বসঙ্কল্প ত্যাগ করাতে। কিন্তু সাবিত্রী নিজ সঙ্কল্পে অটল।

এই সময় হতেই আমরা প্রকৃতরূপে সাবিত্রীর পরিচয় পেতে আরম্ভ করি। তাঁর ধর্মনিষ্ঠা, নির্ভীকতা, তেজস্বিতা, অনুপম পবিত্রতা এবং অলৌকিক মনোবলের পরিচয় পাই আমরা এই মুহূর্তেই।

সাবিত্রীর জীবনে চরমবিপদ অতর্কিত মোটেই নয়, ধর্মনিষ্ঠার জন্য স্বেচ্ছাবৃত। অপূর্ব সাহসিকতার সঙ্গে সাবিত্রী এ বিপদ বরণ করে নিয়েছিলেন নবজীবনে। আরও বিষম কাজ এই যে, জীবনের এতবড় সর্বনাশের বিষয় কারও সঙ্গে আলোচনা করে মনের ভার একটু লাঘব করারও উপায় নাই। সম্পূর্ণরূপে নিজের অন্তরে তা লুক্কায়িত রেখে প্রকাশ্যে অন্যভাব দেখিয়ে দিনযাপন করে যেতে হবে, যাতে বিবাহিত জীবনের স্বল্প একবৎসর কালটিতে স্বামীর মন কিছুমাত্র নিরানন্দ বা দুশ্চিন্তার ভরিয়ে তোলার কারণ না হয় সাবিত্রী! কত অসীম ধৈর্য এবং অ-পরিমিত সাহসের অধিকারী হলে এই কার্য সম্ভব! যার কল্পনাও নারী-মনে অতি ভয়ানক বিভীষিকার সঞ্চার করে সেই দুশ্চিন্তা এবং প্রতিকারহীন দণ্ডাদেশ-তুল্য অমোঘ বিধিলিপির প্রতীক্ষায় থেকে দিনের প্রতি পল, দণ্ড, প্রহর, সহজ সাধারণ ভাবে প্রকাশ্যে অতিবাহিত করা দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়। রাজকুমারী স্বেচ্ছায় বনবাসী তাপসকে বিবাহ করে বনবাসিনী হলেন, এ দৃষ্টান্ত প্রাচীন ভারতে বিরল নয়, গৌরবেরই। কন্যার আগ্রহ দেখে সাবিত্রীর পিতারও আপত্তি সেদিক থেকে ছিল না; সত্যবান বনবাসী হলেও উচ্চ রাজকুলোদ্ভব। পিতা আপত্তি করেছিলেন, ভাবতেও তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছিল বলে আপত্তি করেছিলেন মাত্র এই কারণে—স্বল্পায়ু যুবক সাবিত্রীর পতি হবে?

সাবিত্রীর মনোভাব বিশ্লেষণ করা অতীব

দুরূহ। সাবিত্রী অতুলনীয়া— একথা অলঙ্করণের শব্দমাত্র নয়, প্রখর সূর্যালোকের ন্যায় সত্য। সাবিত্রীর জীবনের ঘটনার সমতুল্য ঘটনা অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। একথা নিশ্চিত, সাবিত্রী ছিলেন দৃঢ়আত্মপ্রত্যয়সঞ্জাত অসীম সাহসের অধিকারিণী। এরই বলে তিনি সত্যবান আয়ুহীন জেনেও তাঁকে স্বামী-রূপে গ্রহণ করেন, আর এই আত্মপ্রত্যয় ও সাহসের বলেই তিনি ধর্মরাজের নিকট হতে মৃতপতির জীবন প্রাপ্ত হন। এর ধারণাও সাধারণের কল্পনার বহির্ভূত। বাল্যের ব্রত-তপস্যা, বিশেষ করে বিবাহের পর এক বৎসরের কঠিন সাধনা, এবং অপূর্ব সংযম ও নিষ্ঠার সহিত আদর্শ বধূর কর্তব্য-পালনই, তাঁকে অলৌকিক শক্তির আধার-রূপে পরিণত করে। তাঁর সেই দণ্ড-পল-বিপলের প্রতীক্ষাকালের তপস্যাই দুশ্চর সাধনার ফলদান করে। সাবিত্রী-চরিত্র অপরিমেয় মহিমায় সমুজ্জ্বল। আমরা যতটুকু তাঁর সাক্ষাৎ পাই, তার মধ্যে কোথাও নারী-জনসুলভ কৌতূহল বা চাপল্য বিন্দুমাত্র নাই। অসীম গাম্ভীর্যময় অথচ মধুরিমামণ্ডিত চরিত্র। দুঃখ, কষ্ট, বিপদ, বেদনা—এসব স্বেচ্ছাবৃত বা স্বয়মাগত যাই-ই হোক না কেন, তা আমাদের অন্তরে সমভাবে পীড়াদায়ক। নিঃশব্দে তা সহ্য করা যে কত স্থিরতা ও ধৈর্যশীলতার পরিচায়ক, তাহা সাধারণের ধারণার অতীত।

সীতা প্রায় আজীবনই দুঃখিনী, বনবাসিনী। দময়ন্তী ও শ্রীবৎস-পত্নী চিন্তাদেবী দীর্ঘকাল বনবাসিনী ছিলেন। দ্রৌপদীও বার বৎসর বনবাসিনী ছিলেন এবং অশেষ দুঃখ, কষ্ট, অপমান সহ্য করেছিলেন। সাবিত্রী মাত্র এক বৎসরকাল বনবাসে যাপন করেন; সেই এক বৎসর কোন বিপদ, অপমানাদির সম্মুখীন তাঁহাকে হইতে হয় নাই। কিন্তু সেই এক বৎসরের অতি কঠোর দৈহিক ও মানসিক তপস্যা ও ভয়াবহতা অসাধারণ এবং অপরিমেয় রূপেই গণিত হয়ে আসছে।

বৎসর-শেষের সাধনার পূর্ণসিদ্ধির সেই ঘোর কৃষ্ণাচতুর্দশীর নিশায় সাবিত্রীর বাহ্য-ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত অবস্থা। কাহারও সাধনা জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী। আবার কাহারও বা দিন, ক্ষণ, মুহূর্তব্যাপী। সাবিত্রী এই ভীষণ ক্ষণের সাধনায় অসীম একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতার বলে, তপস্যার পুণ্যে ধর্মরাজ যমের সাক্ষাৎ লাভ করলেন। তাঁর আত্মপ্রত্যয় দৃঢ়নিষ্ঠা এবং সঙ্কল্পে অটলতা ফলপ্রসূ হল, ধর্মরাজ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর মৃত পতিকে পুনর্জীবন দান করলেন।

ধর্মরাজের প্রসন্নতা অর্জন করে সাবিত্রী তাঁর অন্ধ শ্বশুরের চক্ষু ও হৃতরাজ্য লাভের এবং নিজ অপুত্রক পিতার পুত্র-লাভের বরও পেলেন। এসব কি সাবিত্রীর জীবনের যে স্বল্পকালটুকুর পরিচয় আমরা পাই, সেই কালের সাধনার ফল? না তাঁর আবাল্য অথবা জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার ফল? সে যাহাই হউক, একটু নিশ্চিত যে সাবিত্রী সাধনাবলে, সতীত্ববলে দেবতাদের দর্শন লাভ করার মত ধর্মজীবনের উন্নত স্তরে সেই বয়সেই নিজেকে উন্নীত করেছিলেন। দেবতাদের সাক্ষাৎদর্শন লাভ করে, দৃঢ়নিষ্ঠা ও আত্মপ্রত্যয়বলে নিজ মৃত পতিকে ফিরিয়ে এনেছিলেন আরও একজন ভারতীয় নারী – বেহুলা। তবে সে পটভূমি অন্যরূপ এবং প্রসিদ্ধ মহাকাব্যে সে ঘটনার উল্লেখ নাই।

সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতি যাঁরা ভারতীয় নারীত্বের আদর্শের উত্তুঙ্গ শিখরে আসীন রয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই জীবনে ভীষণ দুঃখদুর্যোগের দিন এসে প্রচণ্ড

আলোড়নের সৃষ্টি করেছে এবং তখন অচঞ্চল নিষ্ঠার আদর্শে স্থির থেকে তাঁরা সকলেই সে অগ্নি-পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়েছেন সত্য, কিন্তু সে দুঃখ-বিপদের নিবিড় নিশার অবসানে তাঁদের জীবনে এসেছে সুখ-সম্পদের একটানা আলোকোল্লাস। মহীয়সী জানকীদেবীর জীবন এর ব্যতিক্রম—তাঁর জীবনের দুঃখদুর্যোগের কোন শেষ নাই, সমুদ্রের ঢেউএর মত একটা কাটতে না কাটতেই আর একটা এসে হাজির হয়েছে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। সীতার চরিত্র তাই মহিমায় সর্বাধিক উজ্জ্বল, সীতা তাই ভারতীয় নারীত্বের অদ্বিতীয় আদর্শ।

মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের একমাত্র দুহিতা সীতাদেবী। আবার অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ। অতুলনীয় বীরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের প্রিয়তমা পত্নী। লক্ষ্মণ তাঁর দেবর। রমণীমাত্রেরই যা কাম্য, তা পেয়ে তিনি সুখসৌভাগ্যের শীর্ষদেশে আসীনা। কিন্তু তাঁর মত অতি দুঃখের জীবনও আবার জগতে বিরল।

হিন্দুবালিকা বাল্যকালে সীতার ন্যায় সতী হবার প্রার্থনা ক'রে ব্রত করে। রামের ন্যায় পতি, দশরথের ন্যায় শ্বশুর, কৌশল্যার মত শাশুড়ী, লক্ষ্মণের মত দেবর—এ সবই সাগ্রহে প্রার্থনা করে। কেবল সীতার মত দুঃখের জীবন চায় না। তাই হিন্দু বাঙ্গালী মায়েরা কন্যার নাম "সীতা" রাখেন না।

বিবাহের পর যে কয় বৎসর সীতা অযোধ্যা-বাস করেন, সেই সময়টিই তাঁর বিবাহিত জীবনের একমাত্র একটানা সুখসৌভাগ্যের সময়। তারপরই তাঁর জীবনের চরম দুর্ভাগ্যের সূচনা—রামচন্দ্রের সঙ্গে বনগমন। অশেষ ক্লেশময় বনবাস—তবু স্বামীর সহিত একত্রে থাকবার সৌভাগ্যে প্রাচীন কালের সতী নারীরা সে ক্লেশকে ক্লেশ বা দুঃখ বলে বোধ করতেন না; শেষজীবনেও রাজর্ষিরা অনেকেই অরণ্যবাসী হতেন; রানীরা সঙ্গেই থাকতেন। সীতা তাই অশেষ ক্লেশকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন বনবাসকালে। রামচন্দ্র সঙ্গে আছেন—এই আনন্দে বনকে তিনি রাজপুরী বলেই মনে করেছেন। মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী: সাধ্বী পতিব্রতা নারী তাঁর স্বামীকে যত ভালবাসেন, নিজ সন্তানকে তার শতাংশের একাংশও নয়।

নারীজীবনের পরম সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েও সীতা 'জনমদুখিনী' আখ্যাতেই আখ্যায়িতা। রাজরানী প্রাসাদবাসিনী সীতার ছবি মনে যেন জাগেই না। তাপসী, বনবাসিনী সীতার শান্ত ধীর পবিত্র কমনীয় মূর্তিই চোখের সামনে ভেসে উঠে।

সুদূর অতীত হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত এবং অদূর ভবিষ্যতেও কত কবি, ঐতিহাসিক লেখকরা সীতার অতুলনীয় পবিত্র মহিমময় চরিত্র কীর্তন করে লেখনীকে ধন্য করেছেন ও করবেন। আমাদের সমাজের সর্ব স্তরে ও ক্ষেত্রে সীতা চিরপূজিতা। শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত, সমস্ত লোকের কাছেই সীতা পরিচিতা। সীতার কাহিনী পাঠকালে বা আলোচনা-প্রসঙ্গে আজও কল্পনায় চিরদুঃখিনী সীতাকে স্মরণ করে অশ্রুবিসর্জন করে কত শত জন। আবার সে পবিত্রতার মূর্তিকে অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করে ধন্য হয়, শুদ্ধ হয় বহুজন।

'ভারতীয় নারীর একমাত্র আদর্শ সীতার চরিত্রের অনুকরণেই সব পাবে। অন্য কিছুই প্রয়োজন হবে না। ওরূপ পবিত্রতা, শুদ্ধ পাতিব্রত্য, শান্ত ধীর কমনীয়তা, সরলতা, কুত্রাপি আর নাই।'

সীতার চরিত্রই হিন্দু নারীর সর্বোচ্চ আদর্শ—এ বাণী সীতাদেবীর উদ্দেশে স্বামী বিবেকানন্দের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন। হিন্দু নারীর চরিত্র, মহত্ত্ব, সেবার ভাব প্রভৃতিকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন। তিনি নিজে ছিলেন অতি পবিত্র। সে কারণেই তিনি পবিত্রতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন। সীতাদেবীর জীবনে এইটিই দেখা যায় যে, যখনই তাঁর সৌভাগ্যের উদয় হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে চরম দুর্ভোগ। প্রথম, রঘুনাথ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবেন—কী আনন্দের কথা! কিন্তু এল, রাজসিংহাসন নয়, অরণ্যবাস।

আবার অসহ দুঃখকষ্ট ভোগের পর, যখন দীর্ঘ ত্রয়োদশ বর্ষ শেষ হয়ে গেল, সামান্য এক বৎসর মাত্র অবশিষ্ট, দৈবের ঘটনে সেই সৌভাগ্য-আগমনের মুখেই জনকনন্দিনী দশানন কর্তৃক অপহৃতা হয়ে সাগরপারে লঙ্কায় বন্দিনী হলেন!

তারপর সে দুঃখের অবসানে পবিত্রতা-স্বরূপিণী সীতাদেবী যখন পতিসন্নিধানে এলেন—তখন সানন্দ অভ্যর্থনার পরিবর্তে এল কঠোর বাক্য, এল অগ্নিপরীক্ষা। অগ্নিপরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণা জানকীর গভীর আনন্দের মাঝে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের এবং রাজরানী হয়ে কিছুদিন পরমানন্দে থাকার পর নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ কামনা—মাতৃত্বের সূচনার মুখেই আবার দুঃখের দারুণ কশাঘাত! অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তিনি বনে নির্বাসিতা হলেন।

সর্বংসহা ধরাদেবীর তনয়া সীতা। এ জন্যই ধরিত্রীর ন্যায়ই তাঁহার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। যার তুলনা কোথাও নাই। স্বামীর প্রতি দোষারোপ ভুলেও কখন সীতাদেবী করেন নাই। সাগরতীরে অগ্নিপরীক্ষার পূর্বে যে রূঢ়বাক্য পতির মুখ হতে সীতাকে শুনতে হয়েছিল, তা অত্যন্ত অসম্মানসূচক—আর অতি হৃদয়বিদারক। দেবী জানকী চিরদিন নিজ ভাগ্যের প্রতিই দোষারোপ করেছেন। স্বামীর কোন দোষ সীতা কখনও দেখেন নাই। কোন অনুযোগ, অভিযোগ, কিছুই না; ভাবতেন, সবই তাঁর হতভাগ্যের দোষ। স্বামীর প্রতি এত বিশ্বাস, এত নির্ভরতা, আর সর্বোপরি অসীম, নিঃস্বার্থ ভালবাসা, যার তুলনা সর্বযুগে সর্বকালে জগতে আর দেখা যায় নাই। এ কারণেই সীতা সর্বজনপূজিতা, সর্ব হৃদয়ে ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্ভ্রমের আসনে সমাসীনা।

বনবাসে নিজের অসহ ক্লেশ, যাতনা, অসম্মানকে সীতা একবারও মনে স্থান দেন নাই। নিরন্তর মনোবেদনা পেয়েছেন এই ভেবে যে, তাঁর জন্য, তাঁর কথা মনে করে স্বামী দুঃখ পাচ্ছেন। অভাগিনী তিনি স্বামীর সেবায় বঞ্চিতা ত হয়েছেনই, অধিকন্তু, স্বামীর মনঃকষ্টের কারণ হয়েছেন—তাঁকে ছেড়ে, তাঁর বিরহে, স্বামীর যে কত কষ্টে দিন যাচ্ছে! ইহাই তাঁর দিনরাত্রির যাতনা ও চিন্তার কারণ। এ প্রেম, এ ভালবাসা শুধু স্বর্গীয় নয়, আরও অনেক উচ্চস্তরের, যার উপমা নাই! রাজকুমার-যুগলের জন্মের পরও তাঁর প্রধান দুঃখের কারণ, স্বামী এদের দর্শন করে কত আনন্দিত হতেন, তাঁকে সে আনন্দ দেওয়া অভাগিনী সীতার ভাগ্যে ঘটল না। রামচন্দ্রের কোন দোষ কোন অবস্থায় কখনো তিনি দেখেন নাই। সর্বাবস্থায় রামচন্দ্রের আসন তাঁর হৃদয়ে সমভাবে প্রতিষ্ঠিত—'রামময়-জীবিতা' তিনি। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তাঁর ভালবাসা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ।

আবার একথাও নিঃসন্দেহ যে, সীতাকে বনবাসে পাঠান রঘুনাথের ন্যায়-অন্যায় যা-ই হোক না কেন, তাঁর একনিষ্ঠ পত্নীপ্রেম তুলনাহীন। স্বর্ণসীতা নির্মাণ করে তিনি পত্নীর

স্থান পূর্ণ করেছিলেন—অন্য পত্নী গ্রহণের কল্পনাও তাঁর মনে স্থান পায় নাই। রামচন্দ্র হতে দূরে থেকে সীতা বনে যে অপরিসীম বেদনা পেয়েছেন, অযোধ্যায় থেকেও রামচন্দ্রের মনোবেদনার পরিমাণ তার চেয়ে কম নয়। তাই তো হিন্দু বালিকা সীতার পতি-ভাগ্যের কামনা করে ব্রতানুষ্ঠান করে—'রঘুনাথের মত স্বামী পাই যেন!'

সীতা অভাগিনী—চিরদুঃখিনী। আবার সীতা পরম সৌভাগ্যশালিনী—রামচন্দ্রের অতুলনীয় অপার্থিব প্রেম-ভালবাসার অধিকারিণী। অপূর্ব এই দুই চরিত্রই।

তারপর আবার আনন্দের দিনের অরুণ-রাগ দেখা দিল। অশ্বমেধ যজ্ঞশালায় লবকুশের রামায়ণগানের পর বাল্মীকি লবকুশের পরিচয় দিয়েছেন সভাস্থলে, সীতাদেবীর কথা জানিয়েছেন এবং সীতাদেবীকে রামচন্দ্র আহ্বান জানিয়েছেন। জীবনব্যাপী একের পর এক আসা দুঃখের দুর্যোগরাত্রিগুলি অতিক্রম করে এসে শেষ জীবনটুকু বোধ হয় একটানা পরমানন্দে কাটবে পতি ও পুত্রদের নিয়ে একত্র বাস করে। কিন্তু 'জনমদুখিনী' সীতার ভাগ্য এই পরম মুহূর্তেই চরম আঘাত হানল—শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে সর্বজনসমক্ষে দ্বিতীয় বার অগ্নিপরীক্ষা দিতে বললেন।

এই গভীরতম তমসাময় নিশার অগ্রদূত গোধূলিকেই কি সীতা তাহলে আলোকোজ্জ্বল দিবার অগ্রদূত অরুণরাগ বলে ভুল করেছিলেন? এই কি তাঁর আজকের অভ্যর্থনা, প্রজাগণের নিকট তাঁর নিষ্কলুষ চরিত্রের মূল্য কি এই—এখনো তাঁকে পরীক্ষা দিতে হবে পতি, পুত্র, রাজন্যবর্গ ও প্রজাকুলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে!

আজীবন দুঃখ কষ্ট দুর্দশা লাঞ্ছনা যাঁর অঙ্গের আভরণস্বরূপ হয়েছিল, জীবনে শত বিপদেও যিনি অধৈর্য হন নাই বা কোন অধীরতা প্রকাশ করেন নাই, সেই সহিষ্ণুতার অনবদ্য প্রতিমা সীতার এবার ধৈর্যচ্যুতি হল, আর সহ্য করা যায় না! দারুণ লজ্জা, অসহ অসম্মান ও অভিমানে অধীরা হয়ে সীতা সেই প্রকাশ্য রাজসভাতেই তাঁর জননী ধরিত্রীদেবীকে আহ্বান করলেন। জানকীর পবিত্রতা, দেবীত্ব ও অপূর্ব পাতিব্রত্যের নিদর্শনরূপেই ধরিত্রীদেবী সেই প্রকাশ্য রাজসভায় আবির্ভূতা হয়ে সীতাকে অঙ্কে ধারণ করলেন। গ্লানি ও লজ্জার হাত হতে অভিমানিনী কন্যাকে নিয়ে তিনি ভূগর্ভে অদৃশ্যা হলেন। এই করুণ বেদনার মধ্যেই সীতার নশ্বর দেহের অবসান হল। ধরিত্রীর মতই সহনশীলা ধরিত্রীকন্যা ধরাধাম হতে চির বিদায় নিলেন।

কিন্তু ভারতের মনে তিনি রইলেন চিরজীবী হয়েই। তাঁর অতুলনীয় চরিত্র অসামান্য পাতিব্রত্য ও সতীত্ব বিপুল গৌরবময়, এক চিরপুণ্যময় কাহিনীরূপে অমরত্ব লাভ করল। তাঁর জীবনাদর্শ প্রাসাদ থেকে কুটির পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র ছেয়ে আছে ও থাকবে। কোন সুদূর অতীত হতে আজও, ভবিষ্যতেও যতদিন মানব ও মানবসমাজের অস্তিত্ব বর্তমান থাকবে, সীতার নাম চির উজ্জ্বল দীপ্তিমান থাকবে আদর্শ ও পূজনীয়া রূপে। সীতার পুণ্যময় পবিত্র জীবনকাহিনী কীর্তন করে ভারতীয় নারীগণ চিরদিন নিজেদের পবিত্র বোধ করবেন আর এই গৌরব-গাথায় নিজেদেরও গৌরবান্বিত মনে করবেন। আর নারীত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ রূপে তাঁকে গ্রহণ করে নিজের হৃদয়-মনের অকপট ভক্তিশ্রদ্ধার অর্ঘ্য সানন্দে অর্পণ করবেন দেবী জানকীর চরণোদ্দেশে।

অভিনব সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ

অধ্যাপক শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকাল সকলেই জানেন, যে দিব্য শিশু একদা বাংলার এক নিভৃত ও নগণ্য পল্লী কামারপুকুরে দ্বিজ ক্ষুদিরাম ও দেবী চন্দ্রমণির কনিষ্ঠ পুত্ররূপে ভূমিষ্ঠ হইয়া গদাধর নামে খ্যাত হইয়াছিলেন এবং সেখানে অপূর্ব বাল্য ও কৈশোর লীলা সাঙ্গ করিয়া অলঙ্ঘ্য দৈব বিধানে অগ্রজ রামকুমারের সহিত মহানগরী কলিকাতায় আগমন পূর্বক প্রথমে ঝামাপুকুরে স্বল্পকাল এবং পরে দক্ষিণেশ্বরে পুণ্যশ্লোকা রানী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ের সুসন্নিহিত কোন কক্ষে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন, তিনিই পরবর্তিকালে সর্বধর্ম-সমন্বয়কারী যুগাবতার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নামে জগদ্বরেণ্য হইয়াছেন!

অবশ্য সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইতেন। নানাজনে তাঁহাকে নানারূপে, যথা—বদ্ধোন্মাদ, বিকৃতমস্তিষ্ক, স্নায়বিক রোগগ্রস্ত, বায়ু-রোগাক্রান্ত, 'দক্ষিণেশ্বরের পাগলা বামুন', এবং ভাষায় অপ্রকাশ্য আরও কত-কিছু রূপে দেখিতেন। আবার অনেকে তাঁহাকে নারায়ণ, শিব, কালী, শিব-কালী, রাম, কৃষ্ণ, যীশু, শ্রীগৌরাঙ্গ, বালগোপাল, সখা, জননী, পিতা, মহাজ্ঞানী, মহাপ্রেমিক, ভক্ত-চূড়ামণি, আদর্শ গৃহী, আদর্শ সন্ন্যাসী, গৃহস্থ অথচ সন্ন্যাসী, ত্যাগিসম্রাট্, সর্বজ্ঞ, লোকগুরু, রসিকচূড়ামণি, সিদ্ধ মহাপুরুষ, যুগাবতার, অবতারবরিষ্ঠ, শ্রীভগবান, সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন প্রভৃতিরূপে মনে করিতেন।

অনেকেরই সম্ভবতঃ সেই কারণে মনে হইতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণ কি তবে বহুরূপী ছিলেন! তিনি যে কি ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা সত্যই সুকঠিন। একই ব্যক্তিত্বের এইরূপ বিচিত্র বিপরীতমুখী অভিব্যক্তি বিস্ময়াবহ! মনে হয়, কোন সুনিপুণ অভিনেতা যেন যুগপৎ সকল ভূমিকায় একাই অবতীর্ণ হইয়াছেন, অথবা কোন সুদক্ষ ঐন্দ্রজালিক অনির্বচনীয় মায়াপ্রভাবে দর্শকবৃন্দের নিকট আপনাকে যেন একই কালে নানারূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন!

বস্তুতঃ এইরূপ ধারণা করিলে হয়ত অসঙ্গত হইবে না যে, যাঁহারা নানা কারণে শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণাদি সম্বন্ধে যাথার্থ্য নিরূপণে একান্ত অসমর্থ, কেবল তাঁহাদেরই মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে বদ্ধোন্মাদ, বিকৃতমস্তিষ্ক প্রভৃতি রূপে ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। বর্তমানেও এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা বিরল নহে।

পক্ষান্তরে যাঁহারা পারত্রিক কল্যাণলাভের জন্য ব্যাকুল, পুণ্যের পরিণামবশে যাঁহাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, যাঁহারা স্বভাবতই বিবেক-বৈরাগ্যবান্ এবং তিতিক্ষাপরায়ণ, নানা ঘাত-প্রতিঘাতে চৈতন্যোদয়ে যাঁহারা ঐহিক স্থূল বিষয়ভোগে বীতরাগ, নানা বাসনাসক্ত এবং দুষ্কৃতকারী হইয়াও যাঁহারা সরল বিশ্বাসী, যাঁহারা আজন্ম পবিত্রহৃদয় ও উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবসকল ধারণা করিতে সমর্থ, অথবা যাঁহারা ঈশ্বরীয় সগুণ বা নিগুণ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া সুতীব্র সাধনভজনশীল, এইরূপ অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ লীলাপার্ষদ এবং সাধু-ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে নানা দেবদেবীরূপে, শ্রীভগবানের অবতাররূপে, যথার্থ জ্ঞানী, প্রেমিক, ভক্ত, সিদ্ধ প্রভৃতি রূপে, অথবা

পিতা, মাতা, সখা, পুত্রাদি রূপে ভাবিতে ও বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং বর্তমানেও কোন কোন ভাগ্যবান্ তদ্রূপই ভাবিতে ও বুঝিতে পারিতেছেন।

প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণেশ্বরে দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষব্যাপী অদৃষ্টপূর্ব সুকঠিন নানা ধর্মমত-সাধনার হোমানলে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ সুবলিত, সুঠাম, নয়নাভিরাম তনুখানি তিলে তিলে আহুতি দিয়া প্রায় নিঃশেষ করিয়াছিলেন! সাধন-সময়ে তিনি এইরূপ তন্ময় হইয়া ঈশ্বরীয় ভাব-সমুদ্রে অবগাহন করিতেন যে, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান এককালে তিরোহিত হইয়া যাইত! সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া যখন তিনি অর্ধবাহ্য ও বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইতেন, তখন তিনি এইরূপ কথাবার্তা বলিতেন ও আচরণ করিতেন যে, সাধনরাজ্যে প্রবেশাধিকারবর্জিত ঐহিক-ভোগবাদিগণ তাহা অনেক সময় অসম্বদ্ধ প্রলাপ বা অস্বাভাবিক বিকৃতি বলিয়া ধারণা করিয়া বসিত। এইরূপে দুরধিগম্য ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিবার প্রাক্কালে তাঁহার যে ভাবতন্ময়তা উপস্থিত হইত, তাহা দেখিয়া বা তদ্বিষয়ে শুনিয়াও পূর্বোক্ত হীনবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক, স্নায়বিক রোগগ্রস্ত ইত্যাদিরূপে মনে করিয়াছিলেন। এই কথা আজ অনেকেই বুঝিতে সমর্থ।

বেদ-পুরাণ- ও তন্ত্র-সমন্বিত হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখার প্রসিদ্ধ সাম্প্রদায়িক মতসমূহের তথা ইসলাম ও খৃষ্টীয় ধর্মমতদ্বয়ের সাধনায় একই ঈশ্বর সাক্ষাৎকাররূপ চরমসিদ্ধি অত্যল্পকালের মধ্যে করামলকবৎ প্রাপ্ত হইতে ইতঃপূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ ভিন্ন অপর কেহই সমর্থ হন নাই। অধিকন্তু এককজীবনে বহুধা বিচিত্র বিভিন্ন ধর্মমতের সাধনায় সিদ্ধিলাভ যে কার্যতঃ সম্ভব তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কেহই আজ পর্যন্ত প্রমাণ করিতে সমর্থ হন নাই! অনেকের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে এতগুলি ধর্মমতের সাধন করিবার কিই বা প্রয়োজন ছিল? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, সন্দেহ, অবিশ্বাস ও তর্কসঙ্কুল বৈজ্ঞানিকযুগে আবির্ভূত হইয়া প্রায় নিরক্ষর হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল! সেই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই তিনি প্রসিদ্ধ প্রায় তাবৎ ধর্মমতগুলির সত্যতা 'হাতে-কলমে' পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন এবং পরিশেষে 'যত মত, তত পথ'-রূপ সিদ্ধান্তে উপ-নীত হইয়াছিলেন। এইভাবেই তিনি বিবদমান ধর্মমতসমূহের আপাতবিরোধ পরিহারের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধান আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিকের প্রচারিত তত্ত্ব বা মতবাদ বহু বাস্তব সমীক্ষা, পরীক্ষা ও নিরীক্ষার দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে সর্বসাধারণগ্রাহ্য হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখোচ্চারিত 'যত মত, তত পথ'-রূপ ক্রিয়াসিদ্ধ অতএব অভিনব মতবাদটি এইজন্যই নানা ধর্মসম্প্রদায়ের পরস্পর বিদ্বেষ ও বিভেদ-সমূহ বস্তুতঃ দূরীভূত করিতে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়রূপে স্বীকার্য।

সাধনার তিনটি প্রসিদ্ধ স্তর, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত, আপাতবিরুদ্ধ হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন আচরণের দ্বারা অদ্ভুতভাবে সমর্থিত ও সমন্বিত হইয়াছে। রুচি ও অধিকার ভেদে জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণার পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। চরম সত্য লাভের জন্য একান্ত ব্যাকুলতা থাকিলে সোপান-আরোহণ-ক্রমন্যায়ে সাধক যে দ্বৈত হইতে বিশিষ্টাদ্বৈতে এবং বিশিষ্টাদ্বৈত হইতে অদ্বৈত ভূমিতে আরূঢ় হইতে পারেন, শ্রীরাম-কৃষ্ণের দিব্য জীবন তাহার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ

বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার অলৌকিক অনুভূতি ও আচরণসমূহ উক্ত ভূমিগুলির প্রত্যেকটির সার্থকতা ও সত্যতা প্রমাণিত করিয়াছে। একই সূর্যের বা যে কোন পদার্থের বিভিন্ন দূরত্বে গৃহীত বিভিন্ন চিত্রগুলি প্রত্যেকটিই যেমন আপেক্ষিকরূপে সত্য, তেমনি একই ঈশ্বর-তত্ত্ব বিভিন্ন অধিকারীর নিকট বিভিন্নভূমিতে অবস্থানকালে জীব, জগৎ ও ঈশ্বররূপে, জীব-জগদ্‌বিশিষ্ট ঈশ্বররূপে এবং সর্বপ্রপঞ্চোপশম—শান্ত, শিব, অদ্বৈত, কূটস্থ, সচ্চিদানন্দ, নিত্য-শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব পরব্রহ্মরূপে অনুভূত হইলেও তাদৃশ অনুভূতিসমূহের প্রত্যেকটিই অবস্থাভেদে সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ভূমিতে স্থিত হইয়া ঈশ্বরের সগুণ ও নির্গুণ, সাকার ও নিরাকার এবং আরও কতপ্রকার ভাবই না অনুভব করিয়াছিলেন! তাঁহার অনুভূতির প্রগাঢ়তা ও বিচিত্রতা সত্যই মানববুদ্ধির অগম্য!

প্রত্যেক ধর্মমতের সাধনায় কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও যোগপদ্ধতি অল্পাধিক পরিমাণে অনুসৃত হইয়া থাকে। উক্ত চারিটি পদ্ধতির প্রত্যেকটিই প্রকৃষ্টভাবে ঈশ্বরলাভের উপযোগী—ইহা শ্রীমদ্‌-ভগবদ্‌গীতায় উক্ত হইয়াছে। পূর্বকালে বিবদমান উক্ত চতুর্বিধ পদ্ধতির অনুশীলনকারীরা একে অন্যকে সমর্থন করিতেন না। গীতায় শ্রীভগবান্‌ অর্জুনকে বুঝাইলেন যে, উক্ত যে কোন একটি পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলন করিতে পারিলে সাধক চরমতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে গীতোক্ত উক্ত সকল পদ্ধতিগুলি সমন্বিতরূপে অনুসৃত হইতে দেখা গিয়াছে। তাঁহার মর্ত্য জীবনের ঘটনাবলী নিঃসন্দিগ্ধরূপে এই কথাই সপ্রমাণ করিয়াছে যে, তিনি ছিলেন নিষ্কামকর্ম, অহৈতুকী ভগবদ্‌ভক্তি, অদ্বৈতজ্ঞান এবং সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত যোগের সমন্বয়ঘনমূর্তি! তাঁহার অপূর্বসাধনপূত, ক্রিয়াসিদ্ধ, দিব্য জীবন চিরকালের জন্য কর্মী, ভক্ত, জ্ঞানী ও যোগীদিগের সাম্প্রদায়িক ভেদবিদ্বেষ প্রকৃতপক্ষে দূর করিয়া দিবার সবিশেষ সহায়ক হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের তপঃপূত ভাবৈশ্বর্যময় অনবদ্য জীবনে সংসার এবং সন্ন্যাস আশ্রমেরও অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। দাম্পত্য জীবনেও যে সম্পূর্ণ দেহভাববর্জিত, কামগন্ধহীন বিশুদ্ধ প্রেমের প্রতিষ্ঠা সম্ভব, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের অপার্থিব জীবনের ঘটনাবলীর সহিত পরিচিত না হইলে হয়ত অকল্পনীয়ই থাকিয়া যাইত! দেহাতীত বিশুদ্ধ প্রেম শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার সহধর্মিণী সারদামণি দেবীর জীবনে যেইরূপ অদ্ভুতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিতে যাইলে বিস্ময়বিমূঢ় হইতে হয়! তাঁহারা উভয়ে যে দিব্যভাবে আরূঢ় হইয়া পরস্পর দীর্ঘদিন একত্র বাস করিয়াছিলেন, তাহা এককালে সকল জৈব প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ না হইলে যে সম্পূর্ণ অসম্ভব তাহা বুঝিতে কোন কষ্টকল্পনার আবশ্যকতা নাই!

শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় সহধর্মিণী সারদামণি দেবীকে সাক্ষাৎ শ্রীশ্রী৺জগদম্বার মূর্ত বিগ্রহ-রূপে সত্যসত্যই দেখিতে পান—এই কথা তিনি নিজ শ্রীমুখে বলিয়াছেন! তিনি কখন কখন নিজ সহধর্মিণীর প্রতি লৌকিকভাবে স্বামী ও গুরুর ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হইয়াছেন। সারদাদেবীও শ্রীরাম-কৃষ্ণকে সত্যসত্যই শ্রীশ্রী৺জগদম্বার মূর্ত বিগ্রহ-রূপে দর্শন করিয়াও লৌকিকভাবে স্ত্রী ও শিষ্যার ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হইয়াছেন! ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গীর যে অপূর্ব সমন্বয় শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর যুগল ও ব্যক্তিগত জীবনে লক্ষ্যগোচর হয়,

তাহার দৃষ্টান্ত এই দিব্য দম্পতী ভিন্ন আর কেহই আজ পর্যন্ত স্থাপন করিতে পারেন নাই! শ্রীসারদাদেবীকে পারমার্থিকভাবে শ্রীশ্রী৺জগদম্বার মূর্ত বিগ্রহরূপে দর্শনের চরম দৃষ্টান্ত শ্রীরামকৃষ্ণ সংস্থাপন করিলেন এক মহা শুভলগ্নে, এক ৺ফলহারিণী কালিকা-পূজার রাত্রিতে দক্ষিণেশ্বরের শ্রীঅঙ্গস্পর্শপূত সেই কক্ষে! তাঁহার সম্মুখে সমাসীনা বাহ্য-সংজ্ঞাহীনা সেই অনির্বচনীয়া দেবীর দেহ ও মনকে আশ্রয় করিয়া দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীকে আবির্ভূত হইবার ও সর্বসিদ্ধির দ্বার উন্মোচন করিবার আকুল প্রার্থনা জানাইলেন সেই দিব্যোন্মাদ সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ! সেই দেবীর শ্রীপাদপদ্মে তিনি তাঁহার সকল সাধনার ফলের সহিত নিজ জপমালাও সমর্পণ করিলেন। অনির্বচনীয়া হইয়াও শ্রীসারদাদেবী এই যুগের মানব-মানবীর মনে এই জিজ্ঞাসাই বারংবার জাগাইয়া তুলেন, তিনি কোন মহাশক্তি যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী হইয়াও তাঁহার মত সাধকের পূজা তত্ত্বতঃ গ্রহণ করিবার অধিকারিণী হইয়াছিলেন! তিনি যে প্রকৃতপক্ষে ৺জগদম্বা, ৺দুর্গা বা ৺সরস্বতী, শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়, শিববোধে জীবসেবা ও রমণীমাত্রেই মাতৃভাবরূপ নবযুগ-ধর্মচক্রপ্রবর্তনে সহায়িকা ও লীলানায়িকা হইয়া সংসারজ্বালা নিবারণপূর্বক অভয় মাতৃ-ক্রোড়ে আশ্রয় দান করিয়া বহু ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবের প্রজ্ঞাচক্ষুর উন্মীলন করিবার জন্য নর-দেহ ধারণ করিয়াছিলেন—ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত বাণীসমূহ হইতে সুস্পষ্ট ভাবে বোধগম্য হয়! শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে দুরবগাহ ঘনীভূত মাতৃভাব লুক্কায়িত ছিল। উপযুক্ত আধার, তাঁহার দিব্য লীলা-সঙ্গিনী শ্রীসারদাদেবীতেও সেই মাতৃভাব মহালগ্নে মাতৃপূজার মধ্য দিয়া পরিপূর্ণ মাত্রায় উদ্বোধিত করিয়া তাঁহাকে জগন্মাতৃত্বের আসনে লৌকিকদৃষ্টিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন! সেই শুভক্ষণ হইতে শ্রীসারদাদেবী হইলেন বিশ্বের সকল জীবের ইহকালের ও পরকালের মা! সারদাদেবীর মাতা শ্যামাসুন্দরী একবার দুঃখ করিয়াছিলেন যে কন্যার 'মা' বলিয়া ডাকার মত একটি সন্তানও হইল না। শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন যে, সারদাদেবীকে পরে 'মা' ডাকে অস্থির হইয়া উঠিতে হইবে। তাই তাঁহার স্থূল শরীরে অবস্থান কালেই এবং অন্তর্ধানের পর আজ সারা বিশ্বে তিনি শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী এবং "The Holy Mother" রূপে বন্দিত ও পূজিত হইয়াছেন ও হইতেছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য বহুবিধ আচরণেও আদর্শ সংসারীর জীবন কত উচ্চ, পবিত্র ও মধুময় হইতে পারে তাহা বুঝা যায়। পিতা-মাতা ও অন্যান্য গুরুজনের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য, সামাজিক জীবনের কোন স্তরের মানুষের প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে ও কথাবার্তা বলিতে হইবে, সংসারের প্রতিটি খুঁটিনাটি কর্তব্য কিভাবে সম্পাদন করিতে হইবে, নিয়মানুবর্তিতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি কিরূপে রক্ষা করিতে হইবে, গার্হস্থ্য-জীবনে কোন্ কোন্ শাস্ত্র ও লোকাচার কি ভাবে মান্য করিয়া চলিতে হইবে—এই সকল বিষয়ে স্বাভাবিক বাহ্যভূমিতে অবস্থানকালে তাঁহার সতর্ক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি থাকিত! তবে ইহা পরম আশ্চর্যের বিষয় যে তাঁহার সাংসারিক বিষয় ও ব্যাপারে আঁট ও আসক্তি ঠিক যেন পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর মতই ছিল! সাধারণ ভূমিতে রঙ্গরসাদিতে নিযুক্ত থাকিতে থাকিতেই মুহূর্তের মধ্যে তিনি কি করিয়া যে দিব্যভাব-

ভূমিতে সমাহিত হইয়া যাইতেন, আবার সমাধিভঙ্গের কিছুক্ষণ পরে পুনরায় মানবীয় ভাবে অবতরণ করিয়া সহজ মানুষ হইয়া যাইতেন, তাহা ধারণা করা মানবের দুঃসাধ্য!

বিবাহ করিলেও শ্রীরামকৃষ্ণের অনাসক্তি, ত্যাগ, সংযম, পবিত্রতা, সত্যনিষ্ঠা, সরলতা প্রভৃতি দৈবী সম্পদ্ কখনও বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই! আবার আজন্ম পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা হইতে ব্যুত্থিত হওয়ায় এবং সব-অবস্থায় সকল প্রকার প্রলোভন-মুক্ত থাকায় এবং শ্রীমৎ তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া মাত্র তিনদিনের মধ্যে নির্বিকল্প সমাধিভূমিতে আরূঢ় হইয়া ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিয়াও পুনরায় শ্রীশ্রী৺জগদম্বার আদেশে "ভাবমুখে" অবস্থান করিতে থাকায় তিনি জগদ্‌গুরু পরমহংস সন্ন্যাসীদিগেরও অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন! সংযম, ত্যাগ ও পূর্ণ-অনাসক্তি-তেই সন্ন্যাসের প্রতিষ্ঠা! শ্রীরামকৃষ্ণ তাই আজন্ম সন্ন্যাসপ্রতিষ্ঠই ছিলেন! তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বৈদিক সন্ন্যাসও গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। অথচ নিজ সহধর্মিণী সারদামণিকে তিনি চিরাচরিত সন্ন্যাসবিধিমতে কখনও পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক-বেশে ভিক্ষাটনাদ বা আকাশবৃত্তিতে লিপ্ত হ'ন নাই। মনে হইতে পারে তিনি কি তবে চিরাচরিত শাস্ত্রীয় সন্ন্যাসবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারিতামূলক আচরণ করিয়াছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর অবশ্য কথঞ্চিৎ নেতিবাচকই ইহাতে বাধ্য! তাঁহার আচরণসমূহ সর্বাংশে পরিপূর্ণ মাত্রায় শাস্ত্র ও সনাতনধর্মের মূল লক্ষ্যকে অনুসরণ করিয়াছে—ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না! জীবকোটী সাধক এবং বিষয়বাসনামলিন সাধারণ মানবকুলের চিত্তশুদ্ধি পূর্বক উন্নততর অবস্থা লাভের উদ্দেশ্যেই ধর্ম ও মোক্ষ শাস্ত্রে সংস্কারমূলক নানা বিধি ও নিষেধ ব্যবস্থিত হইয়াছে। আজন্ম শুদ্ধ ও পবিত্রহৃদয় অবতার, ঈশ্বর-কোটী ও আধিকারিক মহাপুরুষদিগের জন্য বস্তুতঃ কোনও বিধিনিষেধ প্রবর্তিত হইতে পারে না! "নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচারতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ"—অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট পথে বিচরণশীল মহাত্মাদিগের পক্ষে বিধিই বা কি, নিষেধই বা কি? শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের প্রতিপালন ব্যাপারে তাঁহারা কখনই পরতন্ত্র নহেন। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ ও স্বর্গাদি ইষ্টপ্রাপ্তি এবং দুঃখ ও নরকাদি অনিষ্ট পরিহারের ইচ্ছা তাদৃশ ব্যাপারে কখনই তাঁহাদিগের নিয়ামক হয় না। ইচ্ছা হইলে তাঁহারা বিধিনিষেধ মানিতেও পারেন, আবার না মানিতেও পারেন!

যিনি মুহুর্মুহুঃ দেহবোধরহিত হইয়া কখন ভাবসমাধি কখন বা নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হইতেন, যিনি এককালে ধাতুদ্রব্যের স্পর্শমাত্র বৃশ্চিক-যন্ত্রণায় ছটফট করিতেন, যিনি অনুক্ষণ রমণীমাত্রেই আদ্যাশক্তি ৺জগজ্জননীর মূর্ত বিকাশ ভিন্ন অন্য কিছু চিন্তা করিতে পারিতেন না, যিনি ৺জগদম্বার ক্রোড়ে মাতৃগতপ্রাণ, পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর ন্যায় আপনাকে বাহ্য দশায় ন্যস্ত করিয়াছিলেন, সেই পূর্ণ কামকাঞ্চনত্যাগী, অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য-পরায়ণ শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে বিধিই বা কি, নিষেধই বা কি?

ঈশ্বরানুভূতিলাভই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া সনাতন ধর্মশাস্ত্র ঘোষণা করিয়াছেন। বিবিধ ধর্মানুবর্তীদের ভেকাদি বিবিধ সংস্কার ও অনুষ্ঠান যথার্থতঃ ধর্মনিষ্ঠ হইয়া থাকিবার পক্ষে উদ্দীপক ও স্মারক

মাত্র! ঈশ্বরলাভের পর সংস্কার ও অনুষ্ঠান পদ্ধতির কোন আবশ্যকতা থাকে না। তথাপি যে ঈশ্বরানুভূতিবান্, জগদ্‌বরেণ্য মহাপুরুষগণ সন্ন্যাসীর চিহ্ন ধারণ ও আচার প্রতিপালন করেন, তাহা কেবল শিষ্যশিক্ষা ও লোককল্যাণার্থই হইয়া থাকে! সেই জন্যই পুনরায় প্রশ্ন উঠিতে পারে, "যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে"— এই শ্রীভগবদ্‌বচন অনুসারে সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে ও পরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিজ সহধর্মিণীকে কি বিধিমতে ত্যাগ করা উচিত ছিল না? শ্রীভগবান বুদ্ধ ও শ্রীভগবান গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তো সন্ন্যাস বিধিমতে নিজ নিজ স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, তবে শ্রীরামকৃষ্ণ কেন তাহা করিলেন না? আরও প্রশ্ন উঠে, শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শী এবং সর্বদা ঈশ্বরে তন্ময়ীভাবাপন্ন লোকগুরু মহাপুরুষ আদৌ বিবাহ করিলেন কেন?

উক্ত প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর এইরূপ হইতে পারে যে, পূর্ণ পবিত্রতা ও সংযম রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই সন্ন্যাসিগণ আদৌ বিবাহ করেন না অথবা তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ পূর্বে গৃহস্থ থাকিলেও সন্ন্যাসগ্রহণান্তর নিজ নিজ স্ত্রীর সহিত ঐহিক মায়িক সম্পর্ক চিরকালের জন্য ত্যাগ করেন। পূর্ণ পবিত্রতা দীর্ঘকাল নিরন্তর রক্ষিত না হইলে শরীর ও মন সর্বোচ্চস্তরের অনুভূতিসমূহ ধারণা করিবার উপযুক্ত হয় না; এই জন্যই সন্ন্যাসিগণ সর্বপ্রকার এষণা, বিশেষতঃ পুত্র, বিত্ত ও লোকৈষণা পরিহার করিয়া সেই সেই এষণার বিষয় ও উত্তেজক কারণ হইতে বহু দূরে অবস্থান করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে যত্নশীল হন। শ্রীরামকৃষ্ণের মন সর্বদাই এত উচ্চগ্রামে বাঁধা থাকিত যে তাহাকে অতিকষ্টে তিনি কয়েক গ্রাম নীচে নামাইয়া আনিতেন কেবলমাত্র জীবকল্যাণকামনায়, ব্যক্তিগত কোন প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নহে। স্বভাবসিদ্ধ কামকাঞ্চনত্যাগী, ত্যাগ ও পবিত্রতার ঘনীভূত মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস, নিজ পত্নীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে দীর্ঘকাল একত্র বাস এবং তাহা হইতে পৃথক হইয়া দীর্ঘদিন একাকী অবস্থান—উভয়ই ফলতঃ সমানার্থক ছিল। এই ব্যাপারে তথাপি যে শাস্ত্রীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া আপত্তি উঠিয়াছে, তাহা আমাদিগের নিকট ইষ্টাপত্তি বলিয়াই মনে হয়। সাধারণ মানবমানবীর নিয়ামক বিধিনিষেধসমূহ অবতার, ঈশ্বরকোটী, আধিকারিক এবং লোকোত্তর চরিত্র মহাপুরুষদিগের জন্য ব্যবস্থিত নহে! পুনশ্চ শ্রীরামকৃষ্ণ যদি বিবাহ না করিতেন, তাহা হইলে কি আমরা বিশ্বমাতৃত্বের অমৃতপ্রস্রবণস্বরূপিণী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদামণি দেবীকে পাইতাম, যিনি জঠরে একটিমাত্র সন্তান ধারণ না করিয়াও আজ কোটী কোটী সন্তানের আকুল 'মা, মা'-ধ্বনিতে সাড়া দিতেছেন? শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদারূপী দিব্যদম্পতী কি অসংশয়ে প্রমাণ করিলেন না যে, জৈব প্রবৃত্তির অধীন না হইলেও বিশুদ্ধ সন্তান-স্নেহ বিশ্বপ্লাবী হইতে পারে এবং তাঁহাদের উভয়নিষ্ঠ সন্তানবাৎসল্য যে কোন মানবদম্পতীর বাৎসল্য অপেক্ষা সহস্র-সহস্রগুণ মধুর ও স্বার্থশূন্য?

বলিতে কি, শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার দেহভাববর্জিত, অতিপবিত্র সাত্ত্বিক সম্পর্ক কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, উভয়ের সম্মুখেই এক জ্বলন্ত ত্যাগ ও সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিকতার আদর্শ সংস্থাপিত করিয়াছে! তাঁহাদের যুগ্মজীবন গৃহিমাত্রকেই জৈবস্তরের ঊর্ধ্বে আরোহণ করিয়া দেহাতীত বিশুদ্ধ প্রেমের লক্ষ্যে অগ্রসর হইবার এবং

সন্ন্যাসিমাত্রকেই আচারমূলক ত্যাগ হইতে পূর্ণ অনাসক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রেরণা চিরকালের জন্য যোগাইতে থাকিবে। তাঁহাদের দিব্য দাম্পত্যজীবন সর্বস্তরের মানবমানবীর নিকট আদর্শ জীবন গঠনের এক নূতন দিগন্ত উন্মোচন করিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের অনুপম ও অননুকরণীয় আচরণসমূহে ঈশ্বরীয় নিত্য- এবং লীলা-বাদেরও অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং ব্রহ্মই সমস্ত কিছু হইয়াছেন—এই দ্বিবিধ উপনিষদুক্ত অনুভূতিই যে যথার্থ, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্রুব অনুভূতিমূলক নানা উক্তির দ্বারাই সমর্থিত হয়। 'অহং'-বোধ যতক্ষণ বর্তমান থাকে, ততক্ষণ বুঝিবার সাধ্য নাই যে, বৈচিত্র্যময় এই নিখিল প্রপঞ্চ মিথ্যা। 'অহং'-বোধ সম্পূর্ণ তিরোহিত হইলেই কেবল ব্রহ্মাতিরিক্ত প্রতীয়মান পদার্থ মিথ্যাত্বে পর্যবসিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত একমাত্র বিজ্ঞানীই ঈশ্বরের নিত্য ও লীলাভাব অনুভব ও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। জীবকোটী সাধক ভাগ্যক্রমে নিত্যভাব প্রাপ্ত হইলে পুনরায় ব্যুত্থিত হইয়া লীলাভাব প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন না। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে অনুলোম-বিলোমক্রমে, 'নেতি-নেতি' ও 'ইতি-ইতি' অর্থাৎ স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদবর্জিত নির্গুণ নিরুপাধিক ব্রহ্ম এবং চিদাচিদ্বিশিষ্ট অশেষকল্যাণগুণগণ সোপাধিক সগুণ ব্রহ্ম তত্ত্বতঃ অভিন্ন এবং দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্যে তত্তদ্ভাবে গৃহীত হন মাত্র! ব্যাবহারিক দশায় জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ব্যাপারসমূহ অহরহঃ সর্ব প্রাণীর প্রত্যক্ষসিদ্ধ! সুতরাং লীলাবাদে জগতের প্রাতিভাসিকত্ব বা শূন্যত্ব স্বীকৃত হয় না। নিত্যবাদে জগতে জগদ্দৃষ্টি তুচ্ছ বা মায়িক। সর্বত্র সর্বকালে একমাত্র অখণ্ডৈকরস চৈতন্যের স্ফুরণমাত্র থাকে। উহা জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞানরূপ ত্রিপুটীর বিলীনাবস্থা বলিয়া কথিত হয়। লীলাবাদে মায়োপাধিক ব্রহ্ম মায়াবিশিষ্ট হইয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টি রূপে আপনাকে বিলসিত করিয়া নানা জীব ও জগদ্-রূপে প্রতিভাত হন। তিনি তাঁহার অঘটন-ঘটনপটীয়সী অনির্বচনীয়া মায়াশক্তির প্রভাবে সংসার-রঙ্গমঞ্চে যেন কোন অদ্ভুত প্রতিভাশালী নটের ন্যায় একাই বিবিধ ভূমিকায় অভিনয় করেন! নিত্যবাদে এক অদ্বিতীয় নির্গুণ চৈতন্যই সদা বিদ্যমান। লীলাবাদে সেই চৈতন্য সগুণরূপে অবধারিত হইয়া ভূতে ভূতে অনুস্যূত, ওতপ্রোত এবং চিদ্জড়বিশিষ্ট নিখিল প্রপঞ্চান্তর্গত সকল মূর্ত ও অমূর্ত পদার্থরূপ ধারণ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞাত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণোক্ত বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে নিত্য ও লীলা উভয় বাদই সামঞ্জস্যপূর্ণ! উক্ত নিত্য ও লীলাদৃষ্টি শ্রীরামকৃষ্ণের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসবৎ এতই সহজ ছিল, এতই অবলীলাক্রমে তিনি লীলা হইতে নিত্যে এবং নিত্য হইতে লীলায় আরোহণ ও অবরোহণ করিতে পারিতেন যে, তাহা পৃথিবীর অধ্যাত্ম-ইতিহাসে বিরল!

শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখকথিত দিব্য অনুভূতি-মূলক বাণীসমূহে (যাহার কিয়দংশ শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য পরম পূজ্যপাদ ৺মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত [শ্রীম.] কর্তৃক "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" নামক যুগান্তকারী গ্রন্থের খণ্ডগুলিতে বিধৃত হইয়াছে), তাঁহার লীলাপার্ষদ বিবেকানন্দপ্রমুখ ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষবৃন্দের উক্তিসমূহে, বিশেষতঃ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ লিখিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ" নামক প্রামাণিক শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনচরিতে ও প্রাতঃস্মরণীয় ৺অক্ষয়-কুমার সেন প্রণীত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি" নামক সুললিত কবিতা-গ্রন্থে এবং মোক্ষমূলার, রমাঁ রলাঁ প্রমুখ প্রতীচ্যের মনীষিবৃন্দের শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের শ্রদ্ধাপ্লুত তাত্ত্বিক আলোচনায় বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত সমন্বয়বার্তাসমূহ সার্থকভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

সমালোচনা

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন ঃ প্রকাশক—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা ৩১২ ; মূল্য ৩'২৫ টাকা।

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা সমুদ্রের মতোই বিপুল ও বিরাট। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার অভিমত হাতের কাছে পাওয়া সহজসাধ্য নয়। স্বামীজীর মৌলিক রচনা, পত্র, কথোপকথন, বক্তৃতা প্রভৃতিতে বহু তথ্য-পূর্ণ জনকল্যাণকর উক্তিসমূহ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। তাঁহার প্রসিদ্ধ প্রামাণ্য উক্তিগুলি একত্র সংগৃহীত হইলে-সর্বসাধারণের প্রভূত কল্যাণ হইবে—এই উদ্দেশ্যে কয়েক বৎসর পূর্বে 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী' প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমানে তাহাই নব কলেবরে 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন' নামে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে।

নবপ্রকাশিত আলোচ্য গ্রন্থখানির উল্লেখ-যোগ্য বৈশিষ্ট্য পাঠকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। স্বামীজীর অমূল্য বাণীগুলি এমনভাবে সাজানো হইয়াছে যে, প্রত্যেকটি বিষয় সহজেই সকলের বোধগম্য হইবে। ২৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত গ্রন্থখানির কয়েকটি অধ্যায়ের পরিচিতি: 'ভারতের বৈশিষ্ট্য', 'ভারতের অবনতির কারণ', 'ভারতের পুনরুত্থানের উপায়', 'শিক্ষা', 'সমাজ', 'ধর্ম', 'ঈশ্বর', 'উপনিষদ্ বা বেদান্ত' 'ত্যাগ ও বৈরাগ্য' 'সেবা ও পরোপকার', 'বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা', 'চরিত্র,' 'নেতা'। স্বামীজীর জন্মশতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' এবং 'উদ্বোধন গ্রন্থাবলী'র কোথায় উদ্ধৃতিগুলি পাওয়া যাইবে, তাহা নির্দেশ করিয়া পাদটীকা প্রদত্ত হওয়ায় পুস্তকখানির মর্যাদা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই গ্রন্থখানি একদিকে বিভিন্ন বিষয়ে স্বামীজীর প্রামাণ্য উক্তিগুলির সহিত পরিচয় ঘটাইবে, অপর দিকে তাঁহার মহাজীবন অনুধ্যানে ও তাঁহার সঞ্জীবনী বাণীর অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করিবে বলিতে পারা যায়।

পাতঞ্জল-দর্শনম্—শ্রীঅমূলপদ চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক: শ্রীকেশবলাল মেহতা, ৩৬।এইচ, গিরীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা ২৫। পৃষ্ঠা ২০৮ ; মূল্য ২'২৫ টাকা।

পাতঞ্জল দর্শন ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-শাস্ত্র-সমূহের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে, ইহা প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় ও আদরণীয় গ্রন্থ। ভারতীয় সাধনার বহু বিচিত্র ধারার মধ্যে এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য অপরিহার্যরূপে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে দেখা যায়, কারণ চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনই সাধনার অর্থ। চিত্ত-বিশ্লেষণ এবং চিত্তের একাগ্রতা ও নৈর্মল্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে পাতঞ্জল দর্শন অদ্বিতীয় ও অনন্য।

আলোচ্য গ্রন্থে পাতঞ্জল দর্শনের সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ এবং কৈবল্যপাদের সমস্ত সংস্কৃত সূত্র, সূত্রগত শব্দার্থের বাংলা অর্থ, সূত্রের বঙ্গানুবাদ ও সরল ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। সর্বজনবোধ্য ব্যাখ্যাটি যোগসম্বন্ধে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা-দূরীকরণে সমর্থ হইবে। গ্রন্থখানি বাংলা ভাষায় অধ্যাত্ম-শাস্ত্রে একটি মূল্যবান সংযোজন।

আগমনী—প্রকাশক স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, সম্পাদক রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পো: নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ৩২ ; মূল্য ১৲।

'আগমনী' পুস্তিকাটিকে শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবীর দিব্য জীবনকাহিনী অবলম্বনে একটি গীতি-কথিকা বলা চলে। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী 'কন্যা উমা'-রূপে এবং শ্রীসারদাদেবীর জননী শ্যামাসুন্দরী দেবী 'মা-মেনকা'-রূপে চিত্রিত হইয়াছেন এই গ্রন্থে। জননীর নিকট কন্যার দৈব স্বরূপ অনবদ্য ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। আগমনী-বিষয়ক ও শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে কয়েকটি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত ব্যতীত অনেকগুলি নূতন গান সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুর-তাল লয়ে সঙ্গীতগুলি গীত হইলে গীতি-কথিকাটি ভক্তচিত্তে অনাবিল আনন্দ সঞ্চার করিতে পারিবে। শ্রীশ্রীসারদা-রামকৃষ্ণের যুগললীলার নবনৈবেদ্য 'আগমনী' নূতন চিন্তাধারা রূপায়ণের একটি সার্থক প্রচেষ্টা সন্দেহ নাই।

লীলাকথা—শ্রীব্রজভূষণ চক্রবর্তী। ৩৪ কিউ, সুরেন সরকার রোড, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২৩৬ ; মূল্য ৩৲।

শ্রীভগবানের লীলাকথা ত্রিতাপদগ্ধ জীবের নিকট শান্তিবারিস্বরূপ। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লীলা সরল ভাষায় বর্ণিত। 'দধিমন্থন', 'মৃদ্ভক্ষণ', 'দাম-বন্ধন', 'বকাসুর বধ', 'কালিয়দমন', 'গোষ্ঠবিহার' 'গোবর্ধনধারণ', 'রাসতত্ত্ব' প্রভৃতি বর্ণনায় লেখকের ভক্তিভাব পরিস্ফুট। শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটি সুন্দর ছবি পুস্তকটিকে অলংকৃত করিয়াছে। ছোট বড় সকলের নিকটই পুস্তকখানি আদরণীয় হইবে বলিয়া বিশ্বাস।

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান—গ্রন্থকার ও প্রকাশক—শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৪৭ প্রতাপাদিত্য প্লেস, কলিকাতা ২৬। পৃষ্ঠা ৬৮+১৭ ; মূল্য ২৲।

ছাত্রসমাজ ও জনসাধারণ যাহাতে হিন্দু ধর্মের তত্ত্বগত তাৎপর্য ধারণা করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে ব্রহ্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, ভূততত্ত্ব কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি আলোচনা করা হইয়াছে। দুরধিগম্য বিষয়-বস্তু সহজবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করিবার প্রয়াস দেখিয়া মনে হয় গ্রন্থকারের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবে। গ্রন্থখানির 'আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান' নামকরণও তাৎপর্যবোধক।

বিবেকানন্দ ইন্স্টিটিউশন পত্রিকা (১৩৭২): প্রকাশক -শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য, ৭৫ ও ৭৭, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, হাওড়া ৪। পৃষ্ঠা ৫৪।

পত্রিকাটিতে প্রকাশিত পঞ্চম হইতে একাদশ শ্রেণীর ছাত্রগণের পদ্য ও গদ্য রচনাবলীর সহিত পরিচিত হইয়া পাঠকের মনে বিদ্যালয়ের সাহিত্যচর্চা সম্বন্ধে একটি সুন্দর ধারণা হইবে। কয়েকটি লেখা দৃষ্টি আকর্ষণ করে: মহামানব বিবেকানন্দ, রবীন্দ্র-নাথ ও বিজ্ঞান, কবি রজনীকান্ত, মোহন-বাগান, সেপ্‌টিক ট্যাঙ্ক। 'আমাদের কথা'য় বিদ্যালয়ের সারা বৎসরের কর্মপরিচিতি বিবৃত।

Vivekananda—Bhupendranath Roy. Published by Sraban Mahato, Golamara High School, P.O. Golamara, Dist. Purulia. Pp 28 ; price 37 p.

পুস্তিকাটি যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবনানুধ্যানের তৃতীয় পর্যায়রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। স্বামীজীর বলিষ্ঠ ভাবধারা ও জীবনদর্শনের সার্থক আলোচনা ছাত্রসমাজকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের বন্যার্ত-সেবাকার্য

আসামে সম্প্রতি প্রলয়ঙ্কর বন্যায় অগণিত নরনারী দুঃস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের করিমগঞ্জ কেন্দ্র হইতে গভর্নমেন্টের সহযোগিতায় করিমগঞ্জ মহকুমার বন্যা-পীড়িতদের জন্য সেবাকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে। মিশন কর্তৃক করিমগঞ্জ শহরে বন্যার্তদের একটি ক্যাম্প পরিচালন-ব্যবস্থার ভার লওয়া হইয়াছে। এই ক্যাম্পে প্রতিদিন ১,২০০ লোককে রান্না-করা খাদ্য দেওয়া হইতেছে। এতদ্ব্যতীত শিশুদিগকে নিয়মিতভাবে দুগ্ধ এবং বার্লি দেওয়া হইতেছে। মিশনের শিলচর কেন্দ্র হইতেও সেবাকার্য আরম্ভ করিবার উদ্যোগ চলিতেছে।

আমেরিকায় বেদান্ত

নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বেদান্ত কেন্দ্র—অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ। এই কেন্দ্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছিল:

জানুআরি, ১৯৬৬: মৌনাভ্যাসের সৃজনক্ষম শক্তি; পুনর্জন্ম ও মুক্তি; স্বামী বিবেকানন্দ: ভারত ও আমেরিকা; পঞ্চ জ্ঞানভূমি; অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের পথ।

ফেব্রুআরি, '৬৬: প্রার্থনার শক্তি; ধ্যানপরায়ণ জীবনের সোপান; ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করিও না, তাঁহাকে দর্শন কর; শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিভিন্ন ধর্মের সম্বন্ধ (শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব উপলক্ষে)।

মার্চ, '৬৬: অবতার-রহস্য; পবিত্র শব্দ ওঁ; অহংকার জয় করিবার উপায়; সহজাত বৃত্তি, যুক্তি ও অনুভূতি।

এপ্রিল, '৬৬: পবিত্রতার শক্তি; মৃত্যুই কি শেষ পরিণতি? (গুড্ ফ্রাইডে উপলক্ষে); অমৃতত্বের সন্ধানে মানুষ (খৃষ্টজন্মদিন উপলক্ষে); 'অহং'কে কিভাবে জয় করা যায়? অভ্যুদয় কি মায়িক, না বাস্তবিক?

এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ও কঠোপনিষৎ অবলম্বনে ক্লাস করা হইয়াছিল।

উৎসব সংবাদ

বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাঙ্গণে গত ২০শে মে হইতে ২৫শে মে পর্যন্ত স্বামীজীর জন্মবার্ষিকী এবং আশ্রমের বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

কলিকাতা অদ্বৈত আশ্রমের সন্ন্যাসিগণের বৈদিকমন্ত্রে ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে যুগাচার্য স্বামীজীর প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করিয়া স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। পরে তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় স্বামীজীর আদর্শ এবং ভাবধারা বিশ্লেষণ করিয়া সকলকে স্বামীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে আহ্বান জানান। তাঁহার ভাষণের পর অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী মহাভারতের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আলোচনাটি বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়াছিল। প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমহাদেব পাল ও তাহার সম্প্রদায়ের গীটার-বাদনের পর এইদিন-কার সভা সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় দিনে আশ্রমস্থ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পুরস্কারবিতরণী সভার আয়োজন করা

হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গের সহকারী শিক্ষা অধিকর্তা শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়ের সভাপতিত্বে শ্রীমতী রায় এই অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু।

তৃতীয় দিন স্বামী পুণ্যানন্দজী মহারাজ ধর্মসভার উদ্বোধন করেন। স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী মহারাজ ও স্বামী জীবানন্দ মহারাজ যুগাচার্য স্বামীজীর আদর্শ ও জীবনী বিশ্লেষণ করিয়া বক্তৃতা দেন। সভার শেষে হাওড়া কাসুন্দিয়া মায়ের মন্দির কর্তৃক 'বিবেকানন্দ লীলাকীর্তন' দর্শকগণকে প্রভূত আনন্দ দান করে।

চতুর্থ দিন 'ছাত্রদিবস'। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান নিখিলেশ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে স্বামীজীর জীবন লইয়া আলোচনা-চক্রের অনুষ্ঠান হয়। যুগান্তরের সহ-বার্তা-সম্পাদক শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া সময়োপযোগী ভাষণ দেন। তাঁহার ভাষণ সকলের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। সবশেষে রবীন্দ্রনাথের দুইটি নাটিকা আশ্রমিকগণ সাফল্যের সহিত মঞ্চস্থ করে।

পঞ্চম দিনে রবীন্দ্র-জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় অধ্যাপক ত্রিপুরাশংকর সেন শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। তাঁহার ভাষণটি খুবই মনোজ্ঞ হয়। সমস্ত অনুষ্ঠানটি ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। সবশেষে রবীন্দ্রনাথের দুইটি নাটিকা অভিনীত হয়।

শেষ দিনে আশ্রমস্থ ছাত্রগণ কর্তৃক 'মহারাষ্ট্র-গৌরব' নাটকের সফল অভিনয়ের সঙ্গে উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন আশ্রমের বার্ষিক উৎসব গত ৯ই জুন হইতে ১২ই জুন পর্যন্ত চারিদিন ধরিয়া সুচারুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে চারিদিনই সন্ধ্যার পর সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথম দিবস স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী আলোকচিত্র সহযোগে তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এবং বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে দীর্ঘ তিন ঘণ্টা বক্তৃতা করেন। ইহার পর তিন দিন বেলুড়মঠাগত স্বামী ধ্যানাত্মানন্দজী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, যুগাচার্য বিবেকানন্দ ও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভাবির্ভাবের প্রয়োজন ও তাঁহাদের পবিত্র জীবনে মানবকল্যাণোপযোগী আদর্শের বিকাশ ও অমৃতোপম বাণী সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ইঁহাদের আদর্শ অবলম্বনে জীবনগঠন করা বর্তমান ভারতে বিশেষ প্রয়োজন। আমরা যেন আমাদের জীবন প্রেম, মৈত্রী, ভালবাসা ও নিঃস্বার্থ সেবাব্রতের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া নিজে ধন্য হইতে ও অপরকেও ঐ পবিত্র ত্যাগ ও সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে পারি।

১০ই ও ১২ই জুন বক্তৃতার পর মালদহের প্রেমানন্দ সম্প্রদায় রামায়ণ কীর্তন করেন। ১১ই জুন স্বামী প্রত্যয়ানন্দ ও স্থানীয় সঙ্গীতজ্ঞ-গণ ভক্তিমূলক ভজনাদির দ্বারা বহু নরনারীকে আনন্দদান করেন। সমাপ্তি-দিবসে (রবিবার) বিশেষ পূজাদির ব্যবস্থা ছিল। অপরাহ্ণে প্রায় দুই সহস্র নরনারায়ণকে প্রসাদ দেওয়া হয়। এই উৎসবে মালদহ ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের শহর ও গ্রাম হইতে বহু নরনারী যোগদান করিয়া উৎসবের কয়দিন আশ্রমকে আনন্দ-মুখরিত করিয়া রাখেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে স্বামী চিদাত্মানন্দজীর বক্তৃতা-সফর

সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম কর্তৃক আহূত হইয়া অদ্বৈত আশ্রমের প্রেসিডেণ্ট স্বামী চিদাত্মানন্দ গত ১৩ই এপ্রিল হইতে ৩রা জুন পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর, ম্যালেশিয়া, থাইল্যাণ্ড, হংকং, জাপান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, ক্যাম্বোডিয়া প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী এবং বিবিধ ধর্মপ্রসঙ্গ অবলম্বনে হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় মোট ৪৬টি বক্তৃতা ও আলোচনা করিয়াছেন। সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দজীও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন; তিনিও কয়েকটি স্থানে ভাষণ দিয়াছেন।

স্বামী প্রণবাত্মানন্দজীর আলোকচিত্রযোগে প্রচার

গত ফেব্রুআরি, এপ্রিল ও মে এই তিন মাসে স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী ইউনিয়ান হাই স্কুল—কোলাঘাট, বাধাস্থি, আদিবাসী জুনিয়ার হাইস্কুল—লছিপুর, ভদ্রকালী, হাইস্কুল—শ্যাম-সুন্দরপুর পাটনা, উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়—তেঘরি, রামকৃষ্ণ মঠ—কামারপুকুর, রামকৃষ্ণ মঠ—কোয়ালপাড়া, রামকৃষ্ণ আশ্রম—ধুবড়ী, রামকৃষ্ণ আশ্রম—কুচবিহার, রামকৃষ্ণ আশ্রম—আলিপুরদুয়ার জং, খাগরাবাড়ী, চ্যাংড়াবাঁধা, ভোটবাড়ী, রামকৃষ্ণ আশ্রম—মেখলীগঞ্জ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, দোমোহনী রেলওয়ে ক্লাব, ফারাক্কা, গাজোল, মারনাই ইত্যাদি স্থানে 'সর্বধর্মসমন্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ', 'ভারতীয় নারী ও মাতা সারদা-দেবী', 'শিক্ষাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ', 'জাতীয় জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও যুগাচার্য বিবেকানন্দ,' 'ভারতীয় সংস্কৃতি' ইত্যাদি সম্বন্ধে মোট ৪২টি বক্তৃতা দিয়াছেন। তন্মধ্যে ৩৪টি ছায়াচিত্রে প্রদত্ত হইয়াছে।

পরলোকে স্বামী যোগাত্মানন্দ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ১৬ই জুন, ১৯৬৬ বিকাল ৪টা ৩৭ মিনিটের সময় স্বামী যোগাত্মানন্দ (দেবেন মহারাজ) কলিকাতা রামকৃষ্ণ-মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ৬৬ বৎসর বয়সে হৃদ্‌রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এক বৎসর পূর্বে তিনি একবার হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এবারে হাসপাতালের পরীক্ষায় তাঁহার প্রস্টেট-গ্রাণ্ডে ক্যান্সার পড়ে; উহার দ্রুত সংক্রমণ নিবারণার্থে ৯ই জুন অস্ত্রোপচার করা হইয়াছিল। অস্ত্রোপচারের পর উন্নতি ভালোই হইতেছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৬ই জুন বিকাল ৪-১৫ মিঃ সময় হৃদ্‌রোগের আক্রমণ হয় এবং উহাতেই তাঁহার দেহাবসান ঘটে।

স্বামী যোগাত্মানন্দ ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। ঢাকা আশ্রম, অদ্বৈতআশ্রমের কলিকাতা ও মায়াবতী কেন্দ্র, কনখল ও বারাণসী সেবাশ্রম প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে তিনি বহু বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। অনলস, উদ্যোগী কর্মী ছিলেন তিনি। তাঁহার অমায়িক প্রকৃতি সাধু ভক্ত সকলকেই সমভাবে আকর্ষণ করিত। তাঁহার আত্মা চির শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

খড়্গপুরঃ গত ১৫ই মে রবিবার স্থানীয় ভক্তদের উদ্যোগে খড়্গপুর ইন্‌স্টিটিউট অব টেকনোলজীর ক্লাবগৃহে মহাসমারোহে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩১তম জন্মতিথি উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

ঐ উপলক্ষে ১৫ই প্রত্যূষে মঙ্গলারতি ও ভজনের পর প্রভাতফেরী বাহির করা হয়। পূর্বাহ্নে শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচার পূজা, হোম ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ করা হয়।

অপরাহ্ন ৪॥ ঘটিকায় সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সভায় শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের প্রাক্কালে তদানীন্তন বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক দৈন্যের কথা বিশ্লেষণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের সার্থকতা সম্বন্ধে বাংলায় মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করিবার পর স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী এবং বর্তমান সময়ে তাহার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ইংরেজীতে সুচিন্তিত বক্তৃতা দেন। সভান্তে উৎসবকমিটির সভাপতি বক্তাদের ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভার কার্য শেষ হয়।

সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর স্থানীয় সারদা সঙ্ঘের মহিলাবৃন্দ শ্রীশ্রীরামনাম সংকীর্তন করেন। অতঃপর স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও আলোচনা করেন। উৎসবান্তে সমবেত ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। মেদিনীপুর, গড়বেতা ও তমলুক হইতে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসিগণ এই উৎসবে যোগদান করিয়া উদ্যোক্তাদের উৎসাহ ও আনন্দ বর্ধন করেন।

কাটোয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ১২ই জুন, রবিবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একত্রিংশদধিক-শততম জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রাতে পূজা-হোম-পাঠাদি এবং বৈকালে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সেবাশ্রম-কর্মিবৃন্দ কর্তৃক রামনাম সংকীর্তনের পর সভার কার্য আরম্ভ হয়। পানুহাট আদর্শপল্লীর শ্রীহরিনারায়ণ ভাওয়াল ও শ্রীপ্রদীপকুমার ঘোষ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী সম্বন্ধে সুন্দর সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। প্রধান বক্তা বেলুড় মঠের স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ মহারাজ তাঁহার প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেন। রাত্রে শ্যামাসংগীত ও কীর্তনাদির পর উৎসবের কার্য শেষ হয়।

কার্যবিবরণী

বিবেকনন্দ আশ্রম (৪নং নস্করপাড়া লেন, কাসুন্দিয়া, হাওড়া): এই আশ্রমের এপ্রিল, ১৯৫৯ হইতে মার্চ, ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের মুদ্রিত কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বল্পসংখ্যক পুস্তক-সম্বলিত ক্ষুদ্র একটি লাইব্রেরীর আকারে আরব্ধ হইয়া আশ্রমের কর্মধারা বর্তমানে বিভিন্নমুখে সম্প্রসারিত ও সংবর্ধিত রূপ ধারণ করিয়াছে।

আশ্রমে নিয়মিত পূজা পাঠ ও ভজনাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষগুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব এবং শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও শ্রীশ্রীকালীপূজা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতি শনিবার

নিয়মিতভাবে ধর্মসভার ব্যবস্থা করা হয়; বিবিধ ধর্মগ্রন্থ অবলম্বনে ধর্মপ্রসঙ্গ শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ আকর্ষণের বস্তুরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

গ্রন্থাগারে ৪,৩১৮ খানি সুনির্বাচিত পুস্তক আছে। গ্রন্থাগার-সংলগ্ন পাঠকক্ষে ১০ খানি পত্র-পত্রিকা লওয়া হয়, প্রতিদিন গড়ে পাঠক-সংখ্যা ৩০।

বিবেকানন্দ ইন্স্টিটিউশন—সর্বার্থসাধক এই বিদ্যালয়টি আশ্রম কর্তৃক সুপরিচালিত হইতেছে, প্রতি বৎসর বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল বিশেষ সন্তোষজনক হয়। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের পরীক্ষায় 'টেকনিক্যাল' বিভাগে বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র প্রথম ও আর একজন তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। পরীক্ষায় পাস করিবার হার গত ছয় বৎসরে গড়ে শতকরা ৯৬'৩ জন করিয়া।

এতদ্ব্যতীত অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয়, হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় ব্যায়ামাগার প্রভৃতি পরিচালনা এবং দুঃস্থগণকে সাহায্যদান আশ্রমের উল্লেখযোগ্য কার্য।

গ্যাস হইতে খাদ্য

ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা গ্যাস হইতে খাদ্য প্রস্তুতের পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া দাবি জানাইয়াছেন।

কোল ইণ্টারন্যাশনাল গ্রুপ রিসার্চের ডিরেক্টর লর্ড রথচাইল্ড সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানাইয়াছেন যে, কোল রিসার্চ ল্যাবরেটরির দুইজন বৃটিশ ডাক্তার মিথেন গ্যাসকে খাঁটি প্রোটিনে পরিণত করিবার এক পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন।

এই বিজ্ঞানী দুইজন হইতেছেন ৩৩ বৎসর বয়স্ক ডঃ জন মরিস ও ২৯ বৎসর বয়স্ক ডঃ যোগলাস রিবনস।

৪০ কোটি বৎসর পূর্বের মাছের জীবাশ্ম

'তাস'-এর একটি সংবাদে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে যে, উত্তর কিরঘিজিয়ার কারবালটা নদীতটে ৩৫ হইতে ৪০ কোটি বৎসর পূর্বের এক ধরনের মাছের বহু জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে।

শিক্ষা কমিশন সম্বন্ধে তথ্য

সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ভারত সরকার শিক্ষা কমিশনের কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর হইতে প্রায় ২১ মাসের মধ্যে কমিশনের কাজ নির্ধারিত সময়সূচী অনুসারেই শেষ হইয়াছে। কমিশন সর্বশ্রেণীর ৯ সহস্রেরও অধিক লোকের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করেন এবং মোট ১০০টি বৈঠকে মিলিত হইয়াছিলেন। কাজ সম্পূর্ণ করিবার জন্য ১২টি দল এবং ৭টি কার্যনির্বাহকমণ্ডলী গঠন করা হইয়াছিল। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের প্রধান খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা দেড় হাজারেরও বেশি। বিভিন্ন অধ্যায়ের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের জন্য প্রধান খণ্ডের সহিত যে-সব অতিরিক্ত খণ্ড সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাদের পৃষ্ঠাসংখ্যা তিন সহস্রাধিক।

দিব্য বাণী

যদা বৈ মনুতেঽথ বিজানাতি, নামত্বা বিজানাতি, মত্বৈব বিজানাতি।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৭।১৮।১

যদা বৈ শ্রদ্দধাত্যথ মনুতে, নাশ্রদ্দধন্মনুতে, শ্রদ্দধদেব মনুতে।

৭।১৯।১

যদা বৈ নিস্তিষ্ঠত্যথ শ্রদ্দধাতি, নানিস্তিষ্ঠং শ্রদ্দধাতি, নিস্তিষ্ঠন্নেব শ্রদ্দধাতি।

৭।২০।১

যদা বৈ করোত্যথ নিস্তিষ্ঠতি, নাকৃত্বা নিস্তিষ্ঠতি, কৃত্বৈব নিস্তিষ্ঠতি।

৭।২১।১

মনন যে করে সদা, বিজ্ঞান সে জন লভে ; বিজ্ঞানী হয় না কোন জন
মনন না করি কভু ; বিজ্ঞান লাভের পথ (স্থির চিত্তে গভীর) মনন।
জ্ঞানের বিষয় 'পরে শ্রদ্ধান্বিত হলে তবে করে লোকে মনন-প্রয়াস ;
শ্রদ্ধা না জাগিলে চিতে মনন করে না কেহ ; শ্রদ্ধা আনে মননাভিলাষ।
নিষ্ঠাবান হয় যেবা, শ্রদ্ধা জাগে তারি চিতে ; নিষ্ঠা বিনা শ্রদ্ধা নাহি আসে ;
নিষ্ঠাই শ্রদ্ধার হেতু। (যে বিদ্যার্থী জ্ঞান লভিবার তরে আসি গুরু পাশে)
সদাই নিরত থাকে ইন্দ্রিয়-সংযম করি একাগ্র করিতে নিজ মন
সেই হয় নিষ্ঠাবান ; সংযম ও একাগ্রতা বিনা নিষ্ঠা আসেনা কখন।
সংযম ও একাগ্রতা আনে নিষ্ঠা, (নিষ্ঠা শ্রদ্ধা ; শ্রদ্ধা খোলে মননের দ্বার,
মনন লইয়া যায় চরম সত্যের পাশে, বিজ্ঞান তখন হয় তার—
হয় পরাবিদ্যালাভ, সত্যলাভ, নিঃশেষে ঘুচিয়া যায় অজ্ঞান-আঁধার।)

কথাপ্রসঙ্গে

অমৃতধাম

জগতের সব কিছুই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ইহা রূঢ় বাস্তব। আমরা যা কিছু দেখি, একদিন না একদিন তাহা সবই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। আমাদের দেহ বিনষ্ট হইবে, এই পৃথিবী চন্দ্র সূর্য তারা—ইহারাও একদিন বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ইহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু কবে কোন্ কালে সূর্য নিভিয়া যাইবে, তাহার কত পূর্বে পৃথিবী জীবশূন্য হইবে তাহা লইয়া আমরা মাথা ঘামাইলেও উহাতে আমাদের মাথাব্যথা নাই মোটেই। যে চিন্তা আমাদের উদ্বিগ্ন করে, তাহা হইল আমাদের দেহের নাশ; বিশেষ করিয়া যখন কোন আপনজনের মৃত্যু ঘটে বা কোন কারণে নিজেকে মৃত্যুর অনতিদূরবর্তী বলিয়া মনে হয়, তখন। অন্য সময় অবশ্য আমরা সে কথা ভুলিয়াই থাকি, বা সে দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া রাখি।

আর একটি বিষয়ের চিন্তা জীবনে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী উদ্বেগ আনে, জীবনে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ঘন ঘন ওলটপালট-করা ঝড় তোলে; সেটি হইল দুঃখকষ্ট—শারীরিক ও মানসিক।

মানুষ, শুধু মানুষ কেন সমস্ত প্রাণীই আপ্রাণ চেষ্টা করে মৃত্যুকে এড়াইয়া চলিতে এবং দুঃখকষ্টকে দূরে রাখিতে। কিন্তু জগতের গঠনই এমন যে উহার সহিত নিজেকে জড়াইয়া রাখিয়া নিজের মনের মত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া লইয়া মৃত্যুহীন দুঃখহীন জীবন সেখানে অতিবাহিত করার চেষ্টা বৃথা। আদিম অবস্থা হইতে শুরু করিয়া বর্তমান উন্নত অবস্থা পর্যন্ত মানবজীবনের প্রগতিপথের সবটুকু জুড়িয়াই—মৃত্যুর সর্বত্রব্যাপ্ত জাল বিস্তৃত রহিয়াছে, উহার সবটুকুই দুঃখের কণ্টকে আকীর্ণ।

মৃত্যু এবং দুঃখকে জয় করার প্রচেষ্টা আর এক পথে মানুষ স্মরণাতীত কাল হইতে করিয়া আসিতেছে এবং বহুজন উহাতে সফলকামও হইয়াছেন। একটি মৃত্যুহীন নিত্যানন্দময় ধাম তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন, যেখানে পৌঁছিতে পারিলে মানুষ মৃত্যু ও দুঃখকে জয় করিতে পারে। এই আবিষ্কর্তাগণ ধর্মগুরু নামে, এবং সে ধামে পৌঁছবার পথ ধর্মপথ নামে পরিচিত।

বিনাশশীল জগতে এমন একটি বস্তুর সন্ধান এই ধর্মগুরুগণ দিয়াছেন যাহা "সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি" (গীতা, ৮।২০)—জগতের সব কিছুই বিনষ্ট হয় সত্য, কিন্তু এমন একটি বস্তু আছে, যাহা স্থূলভূত দ্বারা (বস্তুর স্থূল উপাদান) গঠিত আমাদের শরীর, পৃথিবী, সূর্য, নীহারিকা প্রভৃতি, এমন কি সূক্ষ্মভূত দ্বারা গঠিত মন বুদ্ধি প্রভৃতি এবং উহাদের উপাদান স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতগুলি পর্যন্ত বিনষ্ট হইলেও বিনষ্ট হয় না; আর পরম আশ্বাসবাণী শুনাইয়াছেন যে, সেই অবিনাশী বস্তুই আমাদের স্বরূপ, আমাদের মৃত্যু বলিয়া সত্যই কিছু নাই—"দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত" (গীতা, ২।৩০)। 'আমি আছি' এ বোধ যাঁহার হইতেছে, তিনিই দেহী, দেহের বিনাশে তিনি বিনষ্ট হন না; সমগ্র বিশ্বজগৎ বিনষ্ট হইলেও আমাদের ভিতর যাহা যথার্থতঃ চেতন সত্তা, তাহা থাকিয়াই যায়।

দেহের বিনাশের সঙ্গে আমিও চিরদিনের জন্য মুছিয়া যাইব—এই ভীতিই মানুষকে সর্বাধিক চঞ্চল করিয়া তোলে। মৃত্যুর পরে আমার সত্তা থাকে কি না, এবং থাকিলে তাহার স্বরূপ কি—এ প্রশ্ন যেদিন মানবমনে প্রথম জাগিয়াছিল, মানুষের ইতিহাসে তাহা একটি পরম শুভক্ষণ। কঠোপনিষদে আত্মতত্ত্ব আরম্ভ হইয়াছে এই প্রশ্নের উত্তররূপেই। দেহাভ্যন্তরস্থ দেহীর, আসল মানুষটির স্বরূপ সম্বন্ধে যে সত্য কঠোপনিষদে নিহিত রহিয়াছে, তাহা সবই যমরাজ বলিয়াছেন সত্যান্বেষী নচিকেতার এই প্রশ্নের উত্তরে, 'কেহ বলেন, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সব কিছু শেষ হইয়া যায়; আবার কেহ বলেন, না তাহা নয়, দেহের মৃত্যুতে আসল মানুষটির কিছুই হয় না, সে থাকিয়াই যায়—এ বিষয়ে যাহা সত্য তাহাই আপনার নিকট জানিতে চাই।' ধর্মের তত্ত্ব জানিবার প্রারম্ভে এ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। কারণ, সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা যাহা দেখি, দেহের বিনাশের সঙ্গেই মানুষটির সব কিছুই শেষ হইয়া গেল, তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে জীবনে ধর্মের কোন স্থান থাকে না। এ প্রশ্ন সর্বযুগের মানুষের চিরন্তন প্রশ্ন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রাণীর আসল সত্তার, 'আত্মার' অবিনাশিত্ব গীতামুখে কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন যুদ্ধে আত্মীয় ও গুরু বধের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন, তাঁহাদের মৃত্যুকল্পনায় মোহাচ্ছন্নহৃদয় অর্জুনকে মৃত্যুর লীলাক্ষেত্র রণাঙ্গনে দাঁড়াইয়া শুধু মৃত্যুকে নয়, সর্ববিধ দুঃখকষ্টকেও জয় করিবার, তাহার অতীত প্রদেশে যাইবার পথের নির্দেশ দিতেছেন। বলিতেছেন, আমরা আসলে দেহও নই, মনবুদ্ধিও নই, এসব কিছুর পারে অবস্থিত সেই সত্তা—যাহা "সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি", আর আমাদের এই স্বরূপের উপলব্ধিই মৃত্যু ও দুঃখকে জয় করার একমাত্র পথ।

শুকদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনকথা সম্বলিত ভাগবত প্রথম শুনাইলেন আসন্ন মৃত্যু-ভয়ে উদ্বিগ্ন রাজা পরীক্ষিৎকে। এই প্রসঙ্গে তিনি পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন, "তুমি তো মানুষ, মৃত্যুকে তুমি একেবারে অস্বীকার কর রাজা! পশুদের জ্ঞান নাই, তাহারা দেহের মৃত্যুকে নিজের মৃত্যু বলিয়া ভাবে; কিন্তু যে 'মানুষ', সে নিজের অবিনাশী স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া মৃত্যুকে ভয় করিবে কোন্ দুঃখে? পরীক্ষিৎ! 'আমার মৃত্যু হইতে পারে' এই পশুবুদ্ধির পারে যাও"—"ত্বন্তু রাজন্ মরিষ্যেতি পশুবুদ্ধিমিমাং জহি।" (ভাগবত ১২।৫।২)। বলিতেছেন, মানুষের আসল সত্তা যে দেহাতীত এবং অমর—ইহা কথার কথা মাত্র নহে, ইহা বহুজনের প্রত্যক্ষ করা সত্য। দেহ থেকে আসল মানুষ আলাদা, ইহা সাক্ষাৎ দেখা যায়—"স্বপ্নে যথা শিরশ্ছেদং পঞ্চত্বাদ্যাত্মনঃ স্বয়ং। যস্মাৎ পশ্যতি দেহস্য তত আত্মা হ্যজোমরঃ।" 'যেমন স্বপ্নাবস্থায় নিজেই নিজের শিরচ্ছেদ দেখা যায়, তেমনি জাগ্রদবস্থায় দেহের পঞ্চত্বাদি নিজেই দেখিতে পায়। মানুষের দেহাতীত সত্তা আছেই আছে—তাহা অজ ও অমর।' [শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম লীলা-সহচর স্বামী তুরীয়ানন্দ একবার অসুস্থ অবস্থায় প্রায় দেহত্যাগের সম্মুখীন হন, দেহত্যাগের বাহ্য পূর্বলক্ষণ সবই দেখা দেয়। পরে সহসা অবস্থার পরিবর্তন হয়। এই প্রসঙ্গে পরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'দেখলাম প্রাণ উৎক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে……।' তিনিই অন্য সময় জনৈক সন্ন্যাসীকে বলিয়াছিলেন, 'প্রাণ দেখেছ? মন দেখেছ? প্রাণ দেখা যায়, মন দেখা যায়।']

নিজের এই স্বরূপ-উপলব্ধির পথের কথা সত্যদ্রষ্টাগণ, আচার্যগণ, অবতারগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, অধিকারীভেদ ও রুচিভেদের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্নভাবে উক্ত হইলেও মূলতঃ তাহা একই; যাহা "সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি"—তাহাই হইল বিশ্বজগতের চরম সত্য, তাহা একটিই, এবং আমাদের স্বরূপও তাহাই। ভগবান বলিতে যাহা বোঝায়, অবতার বলিতে যাহা বোঝায়, তাহার স্বরূপও তাহাই—"তদ্ধাম পরমং মম।" (গীতা—৮।২১) মৃত্যুর, দুঃখকষ্টের পারে যাইতে হইলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর এই মহামিলনভূমিতে আমাদের পৌছাইতে হইবেই। আসন্ন তক্ষক-দংশনজনিত মৃত্যুকে হেলায় তুচ্ছ জ্ঞান করিবার জন্য শুকদেব পরীক্ষিৎকে সেই কথাই বলিতেছেন, "অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদং। এবং সমীক্ষ্য চাত্মানমাত্মন্যাধায় নিষ্কলে॥ দশন্তং তক্ষকং পাদে লেলিহানং বিষাননৈঃ। ন দ্রক্ষ্যসি শরীরঞ্চ বিশ্বঞ্চ পৃথগাত্মনঃ॥ (ভাগবত ১২।৫।১২-১৩)" 'যাহাকে পরমধাম পরমপদ ব্রহ্ম বলা হয়, আমি ও তাহা অভেদ—আমিই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই আমি—ইহা নিশ্চয় করিয়া নিরুপাধি নিষ্কল ব্রহ্ম বলিয়া নিজেকে জান; তাহা হইলে পদতলে লেলিহান দংশনকারী তক্ষককে, নিজের শরীরকে, সমগ্র বিশ্বকেই নিজেরই স্বরূপ, একই সত্তা ব্রহ্ম বলিয়া বোধ হইবে, এগুলিকে পৃথক পৃথক বস্তু বলিয়া বোধ হইবে না।' এই একত্ববোধে পৌছান ছাড়া মৃত্যুকে জয় করার দ্বিতীয় আর কোন পথ নাই —"মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি। (কঠোপনিষদ্—২।১।১১।" দৃঢ় মনন দ্বারা ইহা উপলব্ধি করিতেই হইবে যে বিশ্বে 'নানাবিধ বস্তু' বলিয়া যথার্থতঃ কিছুই নাই—একই সত্তা সর্বত্র ওতপ্রোত। সেই এক অদ্বয় সত্তাকে যে নানা বস্তু রূপে দেখে, সে মৃত্যুকে জয় করিতে পারে না, বারে বারে সে মৃত্যুর অধীন হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মোহগ্রস্ত অর্জুনকে বলিতেছেন, "যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব। যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি। (গীতা ৪।৩৫)"—হে পাণ্ডব! এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে মোহ আর তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, এই জ্ঞান সহায়ে বিশ্বের স্থূলসূক্ষ্ম সব কিছুকে তুমি তোমার নিজের মধ্যে এবং আমারও মধ্যে দেখিতে পাইবে—দেখিবে স্বরূপতঃ তুমি আমি এবং এই সমগ্র বিশ্ব এক। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী, "ঈশ্বর শুদ্ধ বোধস্বরূপ এবং তিনি আমাদের সকলেরই স্বরূপ।" "তিনি অন্তরে বাহিরে আছেন। অন্তরে তিনিই আছেন। তাই বেদ বলে 'তত্ত্বমসি'। আর বাহিরেও তিনি। মায়াতে দেখাচ্ছে নানা রূপ; কিন্তু বস্তুতঃ তিনিই রয়েছেন।"

নিজের এই পরমানন্দময় অবিনাশী নিত্য সত্তার উপলব্ধির পথ প্রধানতঃ দুটি, জ্ঞান ও ভক্তি। দুটি প্রধান পথই—সব পথই—অবশেষে এই চরম একত্বে আসিয়াই শেষ হয়। সাধারণ অবস্থায় এই সত্যকে যতই 'নানা' বলিয়া, বহুবিচিত্র বলিয়া আমাদের বোধ হউক না কেন, জ্ঞান ও ভক্তি উভয় পথে চলিতেই আমাদের 'মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'—এক ছাড়া দুই বলিয়া কিছুই নাই, একথা মনে দৃঢ় করিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ সহজ ভাষায় বলিয়াছেন: বিশ্বজগতে একটি বই দুটি সত্তা নাই; হয় বল সবই 'আমি' (জ্ঞানপথ), আর না হয় বল সবই 'তুমি' (ভক্তিপথ)। জ্ঞানপথে প্রথম হইতেই

এই সত্যটি মাথায় রাখিয়া অগ্রসর হইতে হয় ইহার বিরোধী সর্ববিধ চিন্তাকে, অস্তিত্বকে অস্বীকার করিয়া। আর ভক্তিপথে আমি তুমি ও বিশ্বজগৎ সব কিছুর অস্তিত্বের মধ্য দিয়াই যাত্রা সুরু হয় কিন্তু লক্ষ্য হইল 'সবই তুমি', জগৎও তুমি, 'আমি'-ও তুমি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যাহা বারে বারে বলিতেন, 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু'। যেভাবেই হউক, 'নানা'-বোধের পারে যাইতেই হইবে। হয় বলিতে হইবে, "ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতং। ময়ি সর্বং লয়ং যাতি তদ্ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্॥ (কৈবল্যোপনিষদ্—১৯)" 'আমা হইতেই সব কিছুর উৎপত্তি স্থিতি ও লয় হয়—আমিই অদ্বয় ব্রহ্ম।' অথবা বলিতে হইবে, "তমক্ষরং সদসৎ তৎপরং যৎ।" 'ব্যক্ত জগৎরূপে যাহা দেখিতেছি তাহা তুমিই, যাহা অব্যক্ত জগৎকারণ তাহাও তুমি, এবং এই দুয়ের অতীত অক্ষর ব্রহ্মও তুমি।' উভয় পথই—মানুষকে জন্ম-মৃত্যুর পারে, সুখ-দুঃখের অতীত প্রদেশে লইয়া যায়। ভগবানের সাকার রূপের দর্শনলাভ, আর তাঁর নিরাকার সত্তায় বিলীন হওয়ার মধ্যে যে ক্ষীণ পার্থক্য, তাহা লইয়া আমাদের মাথা না ঘামাইলেও চলিবে; দুটি অবস্থাই আমাদের দেহাত্মবুদ্ধির পারে, মৃত্যুর পারে, দুঃখের পারে পরমানন্দময় ধামে লইয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, জ্ঞানপথ দিয়া ভক্তিতে পৌছান যায়, আবার ভক্তিপথ দিয়া জ্ঞানে পৌছান যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীভগবানকে শ্রীরামচন্দ্র, সীতাদেবী, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা, যীশু প্রভৃতি বহুবিধ সাকাররূপে দর্শন করিয়াছিলেন এবং এই সব দর্শনের পরই দেখিয়াছিলেন, শ্রীভগবানের এই সাকার রূপগুলি তাঁহার নিজের সত্তার সঙ্গে মিশিয়া সবই অদ্বয় সত্তায় লীন হইতেছে। শ্রীভগবানের বিবিধ সাকাররূপের সমন্বয় এই অদ্বয় সত্তাতেই। এই সত্তাই মা-কালী, মা-দুর্গা, শিব, নারায়ণ প্রভৃতি রূপে ভক্তের হৃদয়কমল আলো করিয়া দেখা দেন, এই অদ্বয় সত্তাই যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি নররূপ পরিগ্রহ করেন মানুষকে সেই অমৃতলোকের পথ দেখাইতে, মানবমনের সংশয় কাটাইবার জন্য অতি সূক্ষ্ম প্রত্যক্ষানুভূতির অমোঘ শক্তি নিজ বাণীর মধ্যে নিহিত করিয়া যাইতে, এবং ভীত অসহায় মানুষকে অভয়বাণী শুনাইয়া আশ্বস্ত করিতে, "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মো ক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" "হে জীব, শরণাগত হও।" অতিঘৃণ্য, পতিত, অস্পৃশ্য ভাবিয়া যাহাদের সঙ্গ আমরা সর্বথা পরিহার করিতে চাই, অসীম স্নেহভরে ইহারা তাহাদের বুকে টানিয়া লইয়াছেন, অভয়পদে আশ্রয় দিয়া মৃত্যুহীন পরমধামে লইয়া গিয়াছেন।

ইহাদের অহেতুককরুণাঘন প্রাণারাম সাকার রূপ সূক্ষ্মজগতে চির বিদ্যমান, ইহাদের সেই করুণাধারা চিরনিস্যন্দী

নরনারায়ণস্তোত্রম্

শ্রীওট্টূর্ উন্নি নম্পূতিরিপ্পাদ্-বিরচিতম্

কোঽয়ং পুমান্ সঞ্চিতপূর্বপুণ্যো
যো জৃম্ভমাণে নবযৌবনেঽপি।
নির্বিদ্য ভোগেষ্বখিলেষু সম্য-
গুৎকণ্ঠতে দ্রষ্টুমুমাপদাব্জম্ ॥১॥

কাত্যায়ন্যাশ্চরণযুগলং মানসে স্থাপয়িত্বা
বাষ্পাসারৈঃ প্রণয়মস্থণৈস্তৎ সদা ক্ষালয়িত্বা।
অম্বাম্বেতি স্তবনকুসুমৈস্তন্মুহুঃ পূজয়িত্বা
কোঽয়ং ধন্যো লুঠতি তরুণঃ
পুণ্যহুগলীপ্রতীরে ॥২॥

কারুণ্যসিন্ধুর্জগদুজ্জিহীর্ষু-
রাশ্চর্যকেলীনিকরাংশ্চিকীর্ষুঃ।
স্বৈরং ভুবি ব্রাহ্মণবালরূপে-
ণাভ্যাবতীর্ণঃ পরমেশ্বরোঽয়ম্ ॥৩॥

গদাধরাকারমুপাদদানো
নরেন্দ্ররূপেণ নরেণ সার্ধম্।
ইহান্তনারায়ণ আদিদেবো
বসুন্ধরায়াং কৃপয়াবতীর্ণঃ ॥৪॥

শ্রীমদ্গদাধরনরেন্দ্রবপুর্ধরঃ সন্
নারায়ণো নরসখো দয়য়া যুগেঽস্মিন্।
বঙ্গেষু সর্বজগতাং সুকৃতাতিরেকা-
দ্ধর্মাবনার্থমবতীর্য তনোতি লীলাম্ ॥৫॥

নিত্যং প্রবুদ্ধোঽপি সদাবিমুক্তোঽ-
প্যেকান্তশুদ্ধোঽপ্যখিলস্য নাথঃ।
লোকস্য শান্ত্যৈ কুরুতে সলীলং
নানাবিধা দুষ্করযোগচর্যাঃ ॥৬॥

অধ্যাত্মবিদ্যাময়জীবনাড়ী
　　যদা যদা গ্লায়তি ভারতোর্ব্যাঃ।
তদা তদা কোঽপি সুধাভিবর্ষ-
　　স্তাং জীবয়ন্নারভতেঽত্র সত্ত্বঃ ॥৭॥

পূর্বাবতারানখিলান্ স্বমূর্তৌ
　　সংগৃহ্য জাতঃ ক্ষুদিরামসূনুঃ।
তস্মিন্ যতঃ স্বং স্বমুপাস্যদেবং
　　পশ্যত্যশেষোঽপি মতাবলম্বী ॥৮॥

ঈদৃগ্‌বিধস্সর্বতমো গ্রহীক্ষু-
　　র্নিশ্‌শেষকল্যাণগুণোর্মিঘূর্ণঃ।
পূর্ণপ্রকাশার্ণব ঐশ্বরঃ কোঽ-
　　প্যুর্বীতলেঽদ্যাবধি নাবিরাসীৎ ॥৯॥

আভাত্যয়ং সাধকসার্বভৌম-
　　সিদ্ধাগ্রণীস্সাধ্যতমশ্চ নূনম্।
এতাদৃশঃ পূর্ণতমাবতারো
　　ন শ্রূয়তে ন প্রসমীক্ষ্যতে চ ॥১০॥

শ্রীশঙ্করাচার্যসমন্তভদ্র-
　　গৌরাঙ্গদেবেষু বিরাজিতানাম্।
সংবিৎকৃপাভক্তিতরঙ্গিণীনাং
　　ভাতি ত্রিবেণীব নবাবতারঃ ॥১১॥

ন কেবলং ভারতভূতলস্য
　　পরন্তু সর্বস্য চ বিষ্টপস্য।
গুরুত্বমাপন্ন বিদেদ্ব্যতীতি
　　নবাবতারোঽয়মমেয়তেজাঃ ॥১২॥

(ক্রমশঃ)

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে লিখিত]

Darjeeling
20th March, 1897

ভাই শশী,

তুমি আমার ভালবাসা জানিবে এবং গুপ্তকে জানাইবে। তুমি সেখানে কেমন থাক সর্বদা লিখিবে। স্বামীজী এখানে অনেক ভাল আছেন। প্রস্রাবের দোষ অনেক কমিয়াছে। এই উপকার স্থায়ী হইলে আরোগ্য হইয়া যাইবেন। গুপ্তকে কুকুরে কামড়াইয়াছে শুনিয়া আমরা অত্যন্ত ভাবিত আছি। সে কেমন আছে লিখিবে। তাহাকে সর্বদা আমোদে রাখিবে এবং সকল আবদার সহ্য করিবে। যেমত আমাদের উপর তোমার ভালবাসা সেইরূপ তাহাকে বাসিবে। ইতি—

দাস
Rakhal

[স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে লিখিত]

(১)

(ইংরেজী হইতে অনূদিত)

Darjeeling
26.4.97

My Dear Gangadhar,

আমরা বাবুরামের পত্রে জানিতে পারিলাম যে, তুমি এখনও বাইরে আছ। নরেন তোমাকে সত্বর মঠে ফিরিয়া আসিতে বলিতেছে, কারণ সে কি যেন একটা বিষয় তোমাকে বলিতে চায়। সে বর্তমানে অনেকটা সুস্থ। আমরা আগামী পরশু এখান হইতে কলিকাতায় রওনা হইব, কলিকাতায় অল্পকিছুদিন থাকিয়া নরেন মাসখানেকের জন্য আলমোড়া রওনা হইবে। বর্তমানে সে ইংলণ্ডে যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করিয়াছে। মঠ হইতে সত্বরই সে একখানি বাংলা খবরের কাগজ বাহির করিবার ইচ্ছা করিয়াছে। আশা করি, তুমি অবশ্য তাহার অনুরোধ রক্ষা করিবে। কলিকাতায় ফিরিবার পর তোমাকে সেখানে উপস্থিত দেখিলে আমি খুবই আনন্দিত হইব, আশা করি তুমি কুশলে আছ।

Yours afftly.
Brahmananda.

(২)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ভরসা

আলমবাজার মঠ
১২ই জুন, ১৮৯৭

ভাই গঙ্গাধর,

তোমার ৮ই তারিখের পত্রে সমস্ত সমাচার অবগত হইলাম। আমার প্রেরিত ১০৲ টাকা পাইয়াছ শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। মুর্শিদাবাদ হিতৈষী পৌঁছিয়াছে। যিনি যিনি তোমাদের ফণ্ডে টাকা দিবেন, এইবার হইতে তাঁহাদিগের নাম ও কত টাকা দিলেন, তাহা লিখিয়া পাঠাইবে। তোমার অসুস্থতা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। আমাদের সকলে একরকম ভাল আছে। আমার প্রণাম ও ভালবাসাদি জানিবে ও সকলকে দিবে। ইতি—

দাস ব্রহ্মানন্দ

ভগবৎপ্রসঙ্গ

স্বামী মাধবানন্দ

(বেলুড় মঠ, বুধবার, ১৬ই জানুআরি, ১৯৬৩)

শ্রীভগবানের কৃপাতেই সদ্‌গুরু লাভ হয়। তাঁর কাছে ভগবানের প্রিয় নামরূপ মহামন্ত্র লাভ করে সাধন করতে হয়। তাঁর দর্শনের জন্য চেষ্টা করতে হয়। Purity, Patience and Perseverance (পবিত্রতা, ধৈর্য এবং অধ্যবসায়)—আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করতে হলে এই তিনটি জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন, মনে রেখ।

একটু চেষ্টা করে কিছু হল না বলে ছেড়ে দিওনা। সাধন করে যাও। ধৈর্য হারিও না। উপযুক্ত হলে এক মিনিটও দেরী হবে না। সব মনটি দিয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। নামের মধ্যে সব শক্তি রয়েছে। চলতে ফিরতে তাঁর নাম করবে। জলে চুবিয়ে ধরলে যেমন প্রাণ আটুবাটু করে একটু বাতাসের জন্য, তেমনি ব্যাকুলতা ঈশ্বরদর্শনের জন্য প্রয়োজন।

ভগবান একজনই। বহু তাঁর নাম। যে নামেই ডাক—তাঁকে পাওয়া যাবে। ঠাকুর সকল মতে সাধনা করে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলে গেলেন, যে পথেই যাও, তাঁকে অবশ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু কজন তাঁকে ঠিক ঠিক চায়! তিনি প্রত্যক্ষ অনুভবের ফলে কোন্‌টি সত্যবস্তু, কোন্‌টি অসত্য—তা বলেছেন। কিভাবে সাধনা করলে শীঘ্র ফললাভ হয়—আবার কেনই বা দেরী হয়—সব যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে গেছেন।

মানুষ তো একেবারে পরমহংস হয়ে আসেনি। ভুল দোষ ত্রুটি অল্পবিস্তর হবেই। কিন্তু মানুষ তাতে হীন হয়ে যায় না! স্বামীজী বলেছেন, নিজেকে কখনও ছোট মনে করতে নাই। ভাবতে হয়, আমার কাছে অসম্ভব বলে কিছু নাই—আমি তাঁর কৃপায় সব করতে পারি। আবার তিনি বলেছেন, জগতে ভগবান ছাড়া আর কিছুই নাই। যোগী সর্বত্র ভগবানকেই দেখে। সাধারণ মানুষ সংসার দেখে। যার যেমন সংস্কার, যার যেমন দৃষ্টিভঙ্গী। পূর্ব পূর্ব কর্মফল অনুযায়ী আমাদের বর্তমান সংস্কার। আবার বর্তমানের কর্মের ফলে ভবিষ্যৎ সংস্কার তৈরী হবে। কাজেই হতাশ হবার কিছু নাই। তিনি ভেতরে বাইরে সর্বত্র রয়েছেন। যেন লুকিয়ে খেলা দেখছেন, ম্যাজিক করছেন।

তাই ছোট শিশুর মত পরিষ্কার বলবে, তুমি আমার হাত ধরে টেনে তোল। আমি কিছুই জানি না।

(বেলুড় মঠ, সোমবার, ২১শে জানুআরি, ১৯৬৩)

ভক্তির পথই সহজ, যুগের উপযোগী। তাঁকে ভালবাসতে হবে। তাঁর উপর কোনরকমে ভালবাসা হলে—সব সহজ হয়ে যায়।

বিভিন্ন নাম হলেও ভগবান একজনই, দশজন নয়। কেউ তাঁকে বাবা বলে, কেউ বলে মা। ঠাকুর বলতেন—একই পুকুর, অনেক তার ঘাট। বিভিন্ন ঘাট থেকে সকলে জল নিচ্ছে। আবার নিজের ভাষা অনুযায়ী জলের বিভিন্ন নাম বলছে। মা জানেন, কার পেটে কি সয়—তাই মাছের সেই রকম রান্নার ব্যবস্থা করেন।

'ইষ্ট' কথার মানেই হচ্ছে 'প্রিয়'। তিনি সকলের চেয়ে প্রিয়তম। তাই অনুরাগের সঙ্গে ডাকতে হয়। মন্ত্রে খুব বিশ্বাস রাখবে। নাম ও নামী অভেদ। ভগবান কৃপা করে তাঁর প্রিয় নামের মধ্যে সব শক্তি দিয়েছেন। বটগাছের বীজ দেখতে কত ছোট। কিন্তু ঐটুকু বীজ থেকে কত বড় গাছ হয়। তবে বীজ পুঁতলেই তো গাছ হয় না। রোজ রোজ খুঁড়ে কেউ দেখে না, গাছ হচ্ছে কিনা। যত্ন করতে হয়, ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে হয় তেমনি মন্ত্রে সন্দেহ বা অবিশ্বাস আনবে না বীজমন্ত্র সত্য, পরীক্ষিত সত্য।

আর চাই আত্মবিশ্বাস। নিজের ওপরে খুব বিশ্বাস চাই, নিজেকে কখনও হীন ভাবতে নাই। মনে কোন রকম হতাশার ভাব আসতে দিও না। শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে খুব বিশ্বাস রাখবে। পরে পরে তাঁর দয়ায় কত হবে। দেরী হতে পারে তাতে ভাববে না

(বেলুড় মঠ, শুক্রবার, ২৫শে জানুআরি, ১৯৬৩)

ঠাকুর এবার জগদ্‌গুরু হয়ে এসেছিলেন। মা তাঁর দ্বিতীয় মূর্তি। দেখনা, আমাদের জন্য কত খেটেই না গেলেন। তাঁদের স্থুল-শরীর চলে গেলেও সূক্ষ্ম-শরীরে এখনও রয়েছেন—স্বামীজী স্বয়ং বলেছেন। এখনও তিনি দর্শন দেন।

তাহলে আমরা তাঁর দর্শন পাচ্ছি না কেন? পাচ্ছি না আমরা তৈরী নই বলে। তিনি তো সব সময়ে প্রস্তুত কৃপা করার জন্য। কিন্তু ছুঁচে ময়লা থাকলে তো চুম্বক টানে না। তেমনি আর কি।

তিনি আমাদের তিন টানের কথা বলেছেন, সতীর পতির ওপর টান, বিষয়ীর বিষয়ের ওপর আর মায়ের সন্তানের ওপর। এই তিন টান এক হলে তবে তাঁকে পাওয়া যায়।

সমুদ্রে স্নান করা শক্ত। অনেকে ঢেউ কাটিয়ে দিব্যি স্নান করতে পারে। তেমনি এই সংসারে শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তাঁকে দর্শন করতে পারা যায়। অন্নপূর্ণার মন্দিরে কেউ অভুক্ত থাকে না। তবে বিকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার কি প্রয়োজন? আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দ্বারা আগেই তাঁকে পেতে হবে।

(বেলুড় মঠ, বৃহস্পতিবার, ৩১শে জানুআরি, ১৯৬৩)

সূর্য মেঘে ঢাকা থাকে। তাই দেখে ছোট ছেলে বলে, মা আজ সূর্য ওঠেনি। তেমনি মন আমাদের পাঁচটা বাজে জিনিস নিয়ে থাকায় অজ্ঞানে মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে বলে আমরা ভগবানকে দেখতে পাই না। তাই বলে ভগবান নাই বলতে পারি না।

সংসারের খেলা যাতে চলে তাই তিনি সকলকে একেবারে বুঝিয়ে দেন না। এ তাঁর খেলা—লীলা। বড় খেলা হল অবতার হয়ে মানুষের রূপ ধরে আসা। ঠাকুর হলেন এ যুগের যুগদেবতা। তাঁর ইচ্ছামাত্রে মহাপুরুষ তৈরী হয়ে যায়। 'কথামৃত'তে তিনি ভক্তির কথাই বেশী বলেছেন। স্বামীজী বা অন্যান্য ত্যাগী সন্তানেরা এসেছেন, তাঁদের কাছে ঠাকুর জ্ঞানের কথা বলছেন; এমন সময় হয়ত মাষ্টারমশাই এলেন, অমনি কথার মোড় বদলে দিয়ে নারদীয় ভক্তির কথা আরম্ভ করলেন। এইজন্য ত্যাগী সন্তানদের কাছে ভক্তি ছাড়াও অন্য যে-সব কথা তিনি বলেছেন তা আমরা কথমৃততে পাই না।

তাঁর কথার মধ্যে শক্তি রয়েছে, পড়লে উদ্দীপন হয়, ভেতরে শক্তি পাওয়া যায় তাঁর কাছ থেকে। তিনি বলেছেন, তীর্থ-দর্শন, ব্রত পালপার্বণ ইত্যাদির চেয়ে আসল জিনিস হল তাঁকে ভালবাসা। এই ভালবাসা, যা আমরা সংসারে ছড়িয়ে রেখেছি তা ভগবানের উপরে আনতে হবে। ছোট শিশুর মত তাঁকে ভালবাসতে হবে, তাঁর কাছে আবদার করতে হবে।

আর বলেছেন, আন্তরিকতার কথা। আন্তরিক না হলে কিছুই হবে না। আর একটি কথার উপরে জোর দিয়ে বলেছেন, সেটি হল ভগবানের কাছে সবাই সমান। বললেন, চাঁদা মামা সকলেরই মামা। তাঁকে ডাকলে পাওয়া যায়। কত বড় আশার কথা!

(বেলুড় মঠ, রবিবার, ৩রা ফেব্রুআরি, ১৯৬৩)

দাঁড় টেনে যেতে হয় কষ্ট করে যতক্ষণ না পালে হাওয়া লাগে। কৃপা-বাতাস উঠলে পাল তুললেই হল, আর দাঁড় টানতে হয় না। খানদানী ভক্ত, সে কিছুতেই ছাড়ে না। বৃষ্টি বাদলা হোক বা না হোক, যে খানদানী চাষা সে নিত্য হাল নিয়ে মাঠে যাবেই। আমাদেরও তেমনি তাঁর দয়া কিছু বুঝতে পারি বা না পারি নিত্য ডেকে যেতে হবে।

জপ করলেই তাঁকে টেনে আনা যায় না, মন্ত্রবশীভূত সাপের মত। তাঁর প্রতি ভালবাসাই আসল। ভালবাসা না এলে তাঁর কাছেই বলতে হবে—তুমি আমাদের মধ্যে একটু ভালবাসা দাও।

মা কাউকে কাউকে বলতেন, তোমাদের বয়সে আমি কত জপ করেছি। আবার কাউকে বলেছেন, তোমাকে বেশী করতে হবে না। কিছু না করলে কি কিছু পাওয়া যায়? তবে মনে রাখতে হবে, ভগবানের শক্তিতেই আমরা যা কিছু করতে পারি। রান্নার সময় দেখেছ না, নিচে আগুন আছে বলেই ওপরে আলু-পটল লাফায়!

তাঁর ভালবাসার কি তুলনা হয়? সংসারের কোন কিছুর সঙ্গে মেলে না। অন্য কিছু মাপ-কাঠি নাই বলেই একটা কিছু তুলনা দিয়ে বলতে হয়।

বিশ্বাস ও আন্তরিকতা থাকলে ভগবানের আসন টলে উঠবে।

ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরচিন্তা

অধ্যাপক শ্রীমৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতীয় দার্শনিকগণ ঈশ্বরস্বীকারের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু জটিল যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন। তবে ভারতীয় দর্শনের সকল সম্প্রদায়ই যে একবাক্যে ঈশ্বরকে মানিয়া লইয়াছেন এমন নহে। নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরকে প্রমাণসিদ্ধ পদার্থ মনে করিলেও জৈন সম্প্রদায় ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন এবং সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করিয়াছেন। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সাধারণভাবে ভারতীয় দর্শনে কাহারা ঈশ্বরবাদী এবং কাহারা নিরীশ্বর-বাদী তাহাই চিহ্নিত করিয়া লইতে প্রয়াসী হইব।

প্রখ্যাত দার্শনিক মাধবাচার্য 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' মোট ষোলটি বিভিন্ন দর্শনের আলোচনা করিয়াছেন। উহাদের প্রত্যেকটি দর্শনই ভারতীয় হইলেও বর্তমান আলোচনায় আমরা 'ভারতীয় দর্শন' কথাটির অত ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিব না এবং সেরূপ প্রয়োজনও নাই। কারণ উক্ত গ্রন্থে আলোচিত দর্শনগুলির মধ্যে অধিকাংশগুলিকেই পূর্ণাঙ্গ দর্শন বলিয়া গণ্য করা যায় না। উক্ত সংজ্ঞাটির সাধারণ ও প্রসিদ্ধ অর্থই আমরা গ্রহণ করিব এবং ভারতীয় দর্শন বলিতে তিনটি অবৈদিক (অর্থাৎ বেদ-প্রামাণ্যে আস্থাহীন) ও ছয়টি বৈদিক[১] (অর্থাৎ বেদপ্রামাণ্যে বিশ্বাসী) দর্শন-সম্প্রদায়কে বুঝিব।

চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন—এই তিনটি দর্শন প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভূত। চার্বাক সম্প্রদায় নাস্তিকগণের শিরোমণি। প্রত্যক্ষ ব্যতীত আর কোন প্রকার প্রমাণ তাঁহারা মানেন না। একমাত্র প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বস্তুরই অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। কিন্তু ঈশ্বর কখনো কাহারো লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হন না। সুতরাং তাঁহাদের মতে দেহাতিরিক্ত আত্মা, ধর্মাধর্ম প্রভৃতি অন্যান্য বহু অনুমানগম্য পদার্থের ন্যায় নিত্য সর্বজ্ঞ জগৎকর্তা ঈশ্বরও সম্পূর্ণ অলীক। বরং তাঁহারা বলেন—লোকসিদ্ধো ভবেদ্ রাজা পরেশো নাপরঃ স্মৃতঃ।[২] প্রজাদের সর্বময় প্রভু লোকপ্রসিদ্ধ রাজাই ঈশ্বর, তদতিরিক্ত পরমেশ্বর আবার কে?

বৌদ্ধগণ চারিটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত—মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। মাধ্যমিকগণ শূন্যবাদী। তাঁহাদের মতে শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব। কোন বস্তুই কেবল সৎ বা কেবল অসৎ হইতে পারে না এবং সৎ ও অসৎ পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া উভয়াত্মকও হইতে পারে না। সুতরাং সদসদুভয়ানুভয়াত্মকচতুষ্কোটি-বিনির্মুক্ত শূন্যই হইতেছে তত্ত্ব। যোগাচারগণ অতখানি উগ্র নন। তাঁহারা বিজ্ঞানবাদী। আন্তর ক্ষণিক বিজ্ঞানপ্রবাহই একমাত্র সত্য। বাহ্য ঘটপটাদি বস্তুসমূহ ঐ আন্তর চেতনারই আকারবিশেষ। সৌত্রান্তিকগণ বাহ্যার্থানুমেয়-ত্ববাদী। তাঁহারা জ্ঞান ও বাহ্য বস্তু উভয়েরই বাস্তব সত্তা স্বীকার করেন। কিন্তু বলেন, বাহ্য বস্তুগুলি কেবলমাত্র অনুমান প্রমাণের সাহায্যে জানা যায়, উহাদের সাক্ষাৎ প্রতীতি বা প্রত্যক্ষ

১ অবৈদিক ও বৈদিক শব্দ দুইটির স্থলে নাস্তিক ও আস্তিক শব্দ দুইটি ব্যবহার অধিকতর প্রচলিত হইলেও এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয় নাই। কারণ আস্তিক শব্দের অর্থ পরলোকে বিশ্বাসী এবং নাস্তিক শব্দের অর্থ তাহার বিপরীত (পাণিনিসূত্র ৪।৪।৬০ দ্রষ্টব্য)। ফলে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও আস্তিক হইয়া পড়ে। বৈদিক অর্থ বেদমূলক, বেদাশ্রিত অর্থাৎ বেদের প্রামাণ্যে আস্থাশীল।

২ 'সর্বদর্শনসংগ্রহ'। চার্বাকদর্শন দ্রষ্টব্য।

হয় না। বৈভাষিকগণ বাহ্যার্থপ্রত্যক্ষত্ববাদী। তাঁহারা বলেন, জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত বাহ্য বস্তু তো আছেই, পরন্তু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উহাদের যথার্থ প্রত্যক্ষও হইয়া থাকে। বৌদ্ধদের নিজেদের মধ্যে এইরূপ নানা মুনির নানা মত থাকিলেও ঈশ্বরপ্রত্যাখ্যান-বিষয়ে কিন্তু সকলেই একমত। নিত্য জগৎকর্তা ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজন তাঁহারা কেহই অনুভব করেন নাই।[৩]

জৈন দার্শনিকগণের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সর্বজ্ঞ জিতরাগ ত্রৈলোক্যপূজিত অর্হদ্‌গণই একমাত্র অর্হণীয়। অর্হৎই পরমেশ্বর। তাই তাঁহারা নৈয়ায়িকের অতিপ্রসিদ্ধ ঈশ্বরানুমানটিকে তীক্ষ্ণ যুক্তিজালে ছিন্নভিন্ন করিয়া বলিয়াছেন—

কর্তাস্তি কশ্চিজ্জগতঃ স চৈকঃ
　　স সর্বগঃ স স্ববশঃ স নিত্যঃ।
ইমাঃ কুহেয়াঃ কুবিড়ম্বনাঃ স্যু-
　　স্তেষাং ন যেষামনুশাসকস্ত্বম্‌॥[৪]

এই বিশ্বের একজন কর্তা আছেন, তিনি অদ্বিতীয়, সর্বগ, স্বতন্ত্র ও নিত্য—এইরূপ কুৎসিত আগ্রহের দ্বারা তাহারাই (অর্থাৎ নৈয়ায়িক প্রভৃতি) বিড়ম্বিত হয়, হে জিন, তুমি যাহাদের অনুশাসক হও নাই। যাঁহারা বেদ মানেন না, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে ঈশ্বরকে নাকচ করিবেন, ইহাই হয়ত স্বাভাবিক। তবে বৈদিক দর্শনগুলির মধ্যেও সকলেই ঈশ্বরাস্তিক নহেন। বৈদিক দর্শনগুলি সংখ্যায় ছয়টি—মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক। মীমাংসাদর্শনের আস্থা বেদের কর্মকাণ্ডের প্রতিই সমধিক। কর্ম করিলে অদৃষ্ট উৎপন্ন হয় এবং অদৃষ্টরূপ ব্যাপারের দ্বারা শুভ বা অশুভ ফল উৎপন্ন হয়। সর্বসুখমণ্ডিত স্বর্গই মানুষের চরম কাম্য এবং যাগযজ্ঞাদির দ্বারাই উহা লাভ করা যায়। কর্ম ও কর্মফলের দ্বারাই সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং ঈশ্বর নামে অতিরিক্ত কোন কর্তা স্বীকারের প্রয়োজন না থাকায় ইহা লইয়া তাঁহারা মাথা ঘামান নাই।

বেদান্তদর্শনে মূলতঃ দুইটি সম্প্রদায়—অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত। উক্ত দুই সম্প্রদায়ের প্রবক্তা যথাক্রমে শঙ্করাচার্য ও রামানুজ। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের মতে নির্বিশেষ, নির্লেপ, নির্গুণ, এক পরমাত্মারই কেবল পারমার্থিক সত্তা আছে। এই পরমাত্মা সত্তাস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ। পরমাত্মা জগতের নিমিত্ত-কারণও নহেন, উপাদানকারণও নহেন। জগতের পারমার্থিক সত্তাই নাই, তাহার কারণ সম্পর্কে গবেষণা কাকদন্তপরীক্ষার ন্যায় নিষ্ফল। তবে কি জগতের সত্তাই নাই? জগতের সত্তা আছে, কিন্তু তাহা ব্যবহারিক মাত্র। এই ব্যবহারগ্রাহ্য জগতের কর্তা মায়োপাধিক পরমাত্মা (অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম)। ঐন্দ্রজালিক যেমন মন্ত্রবলে অসদ্‌ বস্তুকেও সৎ করিয়া তোলে ব্রহ্মও তেমনি অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার বলে অলীক জগৎপ্রপঞ্চকে সত্যবৎ প্রতিভাত করিয়া তোলেন। এই মায়োপাধিক ব্রহ্মই লৌকিক-ভাবে ঈশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। রামানুজের মত অন্যরূপ। ঈশ্বর জীবগণের নিয়ন্তা, জীবগণের অন্তর্যামী, কিন্তু জীব (অর্থাৎ জীবাত্মা) হইতে অতিরিক্ত। তবে ঈশ্বরের দুইটি অংশ—চিৎ বা জ্ঞানস্বরূপ এবং অচিৎ বা জড়স্বরূপ। জ্ঞানাদিগুণের আশ্রয়ও ঈশ্বরই। তিনি একদিকে জগতের নিমিত্তকারণ এবং

৩ পরবর্তীকালে অবশ্য বুদ্ধকে ঈশ্বররূপে কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা বিশুদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক মত বলিয়া মানিয়া লওয়া কষ্টকর।

৪ এ বিষয়ে বিচার 'প্রমেয়কমলমার্তণ্ড' ও 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ' (জৈনদর্শন) গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। শ্লোকটি 'বীতরাগস্তুতি' গ্রন্থের অন্তর্গত, সর্বদর্শনসংগ্রহে উদ্ধৃত।

অপরদিকে জগতের উপাদানকারণ। মাকড়সা স্বশরীর-নির্গত রসের দ্বারা তন্তুজাল রচনা করে। তাই মাকড়সা তন্তুজালের প্রতি নিমিত্তকারণও বটে, উপাদানকারণও বটে। 'বহু স্যাম্' (বহু হইব)—এই সঙ্কল্পবিশিষ্ট হইয়া সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ। আবার স্বান্তর্গত জড় বা অচিৎ অংশের দ্বারা পদার্থপ্রপঞ্চের সৃষ্টি করায় তিনি জগতের উপাদানকারণও হইয়া থাকেন। ইহা ছাড়া, তিনি জগতের সহকারিকারণও হন।[৫] ঈশ্বরই সকল জীবের (অর্থাৎ জীবাত্মার) অন্তর্যামী। শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত হইয়া অতিসূক্ষ্ম জীব যেমন শরীরকে নিয়ন্ত্রিত করে, ঈশ্বরও তেমনি সেই জীবের অন্তঃস্থলে অনুস্যূত থাকিয়া জীবকে নিয়মিত করেন। যদৃচ্ছভাবে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকিলেও কিন্তু ঈশ্বর জীবকে তদনুষ্ঠিত কর্মানুসারেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন।

বৈদিক দর্শনগুলির অন্যতম সাংখ্যদর্শনের সূত্রকার মহর্ষি কপিল অতি স্পষ্ট ভাষায় ঈশ্বর অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ।[৬] তৎসিদ্ধি অর্থাৎ ঈশ্বরসিদ্ধি। পরে পঞ্চমাধ্যায়েও মহর্ষি আলোচনার দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, নিত্য জগৎকর্তা ঈশ্বরবিষয়ে প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণ সম্ভব না হওয়ায় তাঁহার অস্তিত্ব সিদ্ধ করা যায় না। বস্তুতঃ সাংখ্যমতে জগৎসৃষ্টির কারণ হিসাবে ঈশ্বরস্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। প্রকৃতিই প্রপঞ্চাত্মক জগতের মূল কারণ, প্রকৃতির বিপরিণামের ফলেই ক্রমে ক্রমে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। নিত্য অপরিবর্তনশীল ঈশ্বর জগতের কারণ হইতে পারেন না। কারণ (সাংখ্যমতে) কার্য ও কারণ বস্তুতঃ অভিন্ন পদার্থ, কারণই কার্যাকারে পরিণত হয়, যেমন মৃত্তিকা ঘটে। ঈশ্বরকে কারণ বলিলে তাঁহারও পরিণাম স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু পরিণামী বস্তুমাত্রই অনিত্য। সুতরাং জগতের হেতুভূত নিত্য ঈশ্বরের কল্পনা কল্পনামাত্রই

সাংখ্যদর্শনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হইলেও যোগদর্শনে কিন্তু ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন। এজন্য যোগদর্শনকে সেশ্বর সাংখ্য নামও দেওয়া হয়। তবে 'পতঞ্জলি প্রভৃতি সেশ্বর সাংখ্য ঈশ্বরের সদ্ভাবপক্ষে কোন প্রকার আশঙ্কা করেন নাই এবং সদ্ভাবসমর্থনার্থ তর্কপ্রণালীও অবলম্বন করেন নাই। তাঁহার অস্তিত্ব যেন স্বতঃসিদ্ধ, তিনি যেন সকল প্রকার জ্ঞানে নিশ্চিত ও বিরাজিত আছেন, পরন্তু জীবেরা যেন তাঁহার স্বরূপ জানিয়াও জানে না, অথচ তাহা তাহাদের জানা আবশ্যক। মাত্র এইটুকু বুঝাইবার নিমিত্ত পতঞ্জলি একটি সূত্রে ঈশ্বরলক্ষণ বলিয়াছেন। সূত্রটি এই —ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। সূত্রের অর্থ এই যে, ক্লেশ, কর্ম, জাতি ও আয়ুর্ভোগ প্রভৃতি জীবধর্ম যাঁহাতে নাই, ঐ সকল যাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারে না, মানবাত্মার নেতা সেই অমানবাত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা নামক পুরুষ ঈশ্বরপদের অভিধেয়। যে সকল দোষ মানবাত্মায় আছে সে সকল যদি বর্জিত হয়, তাহা হইলে সেই মানবাত্মা ঈশ্বরাত্মা বুঝিবার দৃষ্টান্তস্থল হইতে পারে।'[৭]

তবে ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব লইয়া সর্বাধিক আলোচনা করিয়াছেন নৈয়ায়িকগণ। যদিও গৌতমমুনির

৫ রামানুজের মতে ঈশ্বর জগতের ত্রিবিধ কারণ। লোকাচার্যকৃত 'তত্ত্বত্রয়' গ্রন্থের ভাষ্য দ্রষ্টব্য (পৃঃ ১০৯)।

৬ প্রথম অধ্যায়। সূত্র ৯৩। পঞ্চম অধ্যায়। সূত্র ২-১০।

৭ কালীবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত 'সাংখ্যদর্শনে'র অবতরণিকা (পৃঃ ২২৪-২২৫) দ্রষ্টব্য। কিন্তু পরে ব্যাসভাষ্য ও ভোজবৃত্তিতে ঈশ্বরবিষয়ে প্রমাণ আলোচিত হইয়াছে।

সূত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রমাণ প্রভৃতির প্রসঙ্গ বিশেষ আলোচিত হয় নাই এবং যে তিনটি সূত্রে[৮] তিনি ঈশ্বরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন তাহাদের তাৎপর্য সম্পর্কে নৈয়ায়িকগণের নিজেদের মধ্যেই পরস্পরবিরুদ্ধ বিতর্কের অন্ত নাই, তথাপি পরবর্তী ন্যায়াচার্যগণ—উদ্যোতকর হইতে আরম্ভ করিয়া নব্য গঙ্গেশোপাধ্যায় পর্যন্ত —সকলেই যথাসাধ্য দীর্ঘবিস্তৃত আলোচনার দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সকল কার্যেরই একজন বুদ্ধিমান সচেতন কর্তা থাকে। এই জগতেরও একজন পরিচালক আছেন, তিনি জীবের শুভাশুভ কর্ম অনুসারে অহরহ ফল প্রদান করেন, তিনি এই জগতের নিমিত্তকারণ (কুম্ভকার যেমন ঘটের), তিনি প্রলয়ান্তে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ ঘটাইয়া সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সূত্রপাত করেন—এই সকল অনুভবকে যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে আপ্রাণ চেষ্টা নৈয়ায়িকেরাই করিয়াছেন।

বৈশেষিক দর্শন ন্যায়ের সমানতন্ত্র দর্শন। কাজেই ন্যায়দর্শনের সিদ্ধান্ত বৈশেষিকগণের বিরুদ্ধ নয়। কিন্তু মহর্ষি কণাদের সূত্রে দ্রব্যাদি পদার্থ ও তাহাদের সাধর্ম্যবৈধর্ম্য প্রভৃতির উল্লেখ থাকিলেও ঈশ্বরের কোন উল্লেখ নাই। তবে কি কণাদ ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই? উত্তরে বলিতে হয়, কণাদ জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভেদে দ্বিবিধ আত্মা স্বীকার করিলেও ঈশ্বর স্বীকার করিতেন কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত কোন প্রমাণ সূত্র হইতে উপস্থাপিত করা যায় না। তবে বৈশেষিক মতের পরবর্তী ব্যাখ্যাতৃগণ (যেমন শ্রীধরাচার্য, শঙ্কর মিশ্র প্রভৃতি) কণাদমতেও যে ঈশ্বর স্বীকৃত, এইরূপ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং ন্যায়দর্শনের সমানতন্ত্র দর্শনহিসাবে এবং পরবর্তী টীকাকারগণের সাক্ষ্যে বৈশেষিক দর্শনকেও ঈশ্বরাস্তিক গোষ্ঠীতেই অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।[৯]

নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য ন্যায়কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে ঈশ্বরবিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করিতে গিয়া একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। উপসংহারে তাহার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি বলিতেছেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ববিষয়ে কাহারো সংশয় নাই। গোত্র, প্রবর, কুলধর্ম প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার অনুভবও আবহমান কাল হইতে প্রসিদ্ধ। যাঁহারাই মোক্ষাদি পুরুষার্থ লাভে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তাঁহারাই পরমাত্মা বা ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছেন। বেদান্তী বলেন, তিনি অদ্বিতীয় ও জ্ঞানস্বরূপ। কপিল বলেন, তিনি আদিবিদ্বান্ ও যোগর্দ্ধিসম্পাদিত অষ্টবিধ ঐশ্বর্যের আধার। পতঞ্জলি বলেন, তিনি অবিদ্যারাগদ্বেষাদিজীবধর্মলেশবিবর্জিত। পাশুপত সম্প্রদায়ের মতে তিনি লোকবিরুদ্ধ অগ্নিধারণাদি বা বেদবিরুদ্ধ ব্রহ্মহত্যাদি আচারের ফলেও দুঃখরহিত এবং জগৎকর্তা। শৈবমতে তিনি ত্রিগুণাতীত মহাদেব। পৌরাণিকগণ তাঁহাকেই জগতের পিতামহ বলেন। বৈষ্ণবগণের নিকট তিনি পুরুষোত্তম, যাজ্ঞিকগণের নিকট যজ্ঞপুরুষ, বৌদ্ধগণের নিকট সর্বজ্ঞ শাক্যমুনি, দিগম্বর জৈনগণের নিকট নিরাবরণ। মীমাংসকগণ তাঁহাকেই উপাস্যরূপে প্রসিদ্ধ বলেন, চার্বাকগণ তাঁহাকেই লোকব্যবহারসিদ্ধ বলেন। নৈয়ায়িকগণের মতে তিনি নিত্যসর্বজ্ঞ ও জগতের নিমিত্ত-কারণ। অধিক কি? সাধারণ শিল্পি-

৮ 'ন্যায়দর্শন'। সূত্র ৪।১।১৯ হইতে ৪।১।২১।

৯ উৎসাহী পাঠক এবিষয়ে টীকাকারগণের জটিল কষ্টকল্পিত আলোচনার জন্য ফণিভূষণ তর্কবাগীশকৃত 'ন্যায়পরিচয়' (পৃঃ ১৩৫) দেখিতে পারেন।

গণ পর্যন্ত তাঁহাকে বিশ্বকর্মারূপে উপাসনা করিয়া থাকে।[১০]

সত্যই বিচিত্ররূপে বিরাজমান বিচিত্রশক্তি-ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতে কে সাহসী হইবে?

১০ 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি'। প্রথম স্তবকে দ্বিতীয় শ্লোকের উদয়নকৃত গদ্য ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। এখানে উক্ত সন্দর্ভের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

অবতার

শ্রীরমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

নরদেহধারী নারায়ণ, অবতার,
তুমি না আসিলে ঘুচিবেনা কভু
বসুধার দুখভার!
ধরণীর বুকে উঠিয়াছে ঝড়
গরজে অশনি, হানে কড় কড়
প্রলয়ের শিখা ঝলিছে গগনে
চারিদিকে হাহাকার,
তুমি না আসিলে ঘুচিবেনা কভু
ধরণীর দুখভার।

যুগে যুগে তুমি মানবের দ্বারে
কত রূপ ধরে এলে বারে বারে
চূর্ণ করিতে বলীর দর্প
কংসের কারাগার,
অভয়ের বাণী শোনালে গীতায়—
সে সিংহনাদ আজো শোনা যায়,
এসো নারায়ণ, পতিতপাবন
এস হে কর্ণধার,
তুমি না আসিলে ঘুচিবেনা কভু
ধরণীর দুখভার!

রামায়ণের মহাকবি

শ্রীঅমূল্যকুমার মণ্ডল

কালের চাকা অমোঘ নিয়মে ঘুরেই চলেছে। তার বিরাম নেই, কে গেল আর কে এল তারও কোন হিসাব নেই। সে শুধুই ঘুরছে। কেউ বা বেড়ে চলেছে, কেউ বা ক্ষয় পাচ্ছে। কেউ বা জন্ম নিচ্ছে, আবার কেউ বা বিদায় নিচ্ছে। এই যাওয়া-আসা, ভাঙ্গা-গড়ার মাঝখানে কত কি ঘটে যায়—তার কতটুকুরই আমরা খোঁজ রাখি। তবে এটাও ঠিক এই আসা-যাওয়ারও একটা ছন্দ আছে, একটা সঙ্গীত আছে, হয়ত একটা প্রাণও আছে। ধ্বংস ও সৃষ্টি ক্রমাগত হয়েই চলেছে। ব্যাধ বেরিয়েছে তার বাঁচার তাগিদে—আপন খাদ্যসন্ধানে। তার শর আকাশ ভেদ করে ছুটে চললো, তীক্ষ্ণ ফলকটা বিঁধে দিল পাখীটির বুকে। পাখীটির কাছে তার এই মহাবিপদের সন্ধান আকাশে বাতাসে কোনওক্রমে এসে পৌছায় নি। তারা আপন মনে খেলা করছিল। হয়ত প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদই উপভোগ করছিল। মাটি রক্তমাখা হয়ে উঠলো। উদাসীন পৃথিবী তাকেও স্থান দিল, যেমন সে স্থান দিয়েছে সেই ব্যাধটিকেও।

একটি হৃদয়ে কিন্তু মহাপ্রলয় বয়ে গেল। এ যেন মহাদেব হঠাৎ তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করে প্রলয়-নাচনে মেতে গেলেন। তাঁর হৃদয়ের শিরা-উপশিরা ছিঁড়ে যেতে লাগলো। যুগের তপস্যায় যে মন ধীর স্থির হয়েছে, সে আজ প্রলয়-নাচনে ফেটে পড়বার উপক্রম করলো। অনেক ভাঙ্গলো কিন্তু যা গড়লো তাও যে অদ্ভুত সৃষ্টি। এ যে খেলাঘরের মাটির পুতুল সব ভেঙ্গে গিয়ে স্বর্গ-মন্দিরের সৃষ্টি হল, যার চুড়ায় দ্যুতি ছড়াতে লাগলো যেন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মণিমুক্তা। এই দ্যুতির ছটা যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষকে আলো দিয়েছে, পথ দেখিয়েছে। মানুষকে আশা দিয়েছে, প্রেরণা দিয়েছে, উন্মাদনা দিয়েছে। জাগিয়েছে মানুষের উপর অনন্ত বিশ্বাস—আর ফুটিয়েছে শাশ্বত প্রেম। মহাকবি বাল্মীকির সারা জীবনের সাধনার ধন বরফ হয়ে জমে না গিয়ে বিগলিত করুণার মত বয়ে চলেছে। পাহাড়-পর্বত মরু-প্রান্তর দেশ-কাল কোনও কিছুই তার ধারাকে রোধ করতে পারছে না। সে যেমন সমুদ্রে মিলবার জন্য আকুল তেমনি সেখান থেকে দেশ-দেশান্তরে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়বার জন্যও ব্যাকুল। কি অলৌকিক আনন্দের ভারই না আজ মহা-কবির উপর—যার জন্ম হয়েছে এক নিষ্ঠুর পরিবেশের মধ্যে। কি বেদনাই আজ আনন্দঘন রূপ নিয়ে ঋষির মন প্রাণ পাগল করে তুলেছে। এই মন যে আজ নতুন সৃষ্টি করতে চায়, এই সৃষ্টিই রামায়ণ। এ শুধু ভারতের মহাকাব্য বা ইতিহাস নয়—সমস্ত মানবজাতির অমূল্য সম্পদ। আকাশ বাতাস, নদী পাহাড় সমুদ্র, পশু পাখী মানুষ, অণু পরমাণু যে একই তন্ত্রীতে গাঁথা। তারা যে এক সুরে গাইছে, নাচছে, ভাঙ্গছে, গড়ছে। রামায়ণ তাই সর্ব যুগের, সর্ব দেশের, সকল মানুষের মহাকাব্য।

মহাকবি আস্বাদ পেয়েছিলেন সৃষ্টির মূল ধারার। মানুষ প্রকৃতি জীবজন্তু—ভূচর খেচর, সভ্য অসভ্য সকলেই জুটেছে।

সবাই তাদের আসন করে নিয়েছে, সবাই মিলেছে একই তীর্থে। আবার সবাই এই নাট্যশালার খেলা সাঙ্গ করে নতুন খেলার

যাত্রায় চলেছে, এইটাই রামায়ণের মূলধারা, সেখানে গতি আছে, জীবন আছে, আনন্দ আছে, সুখশান্তি দুঃখযন্ত্রণা সবই আছে। মিলন বিরহ দুই-ই তার প্রকৃষ্ট রূপ নিয়ে বিরাজ করছে। জন্ম-মৃত্যু-ব্যাধি সবই রয়েছে। সকলেই যেন পরম আত্মীয়ের মত পাশাপাশি তার স্বরূপ নিয়ে ফুটে রয়েছে ; কেউ কারুর বিদায় কামনা করছে না। অথচ প্রাকৃতিক নিয়মেই সকলে একই ছন্দে ঘুরে চলেছে। সেখানে রয়েছে সকলের সঙ্গে বিরাট আত্মীয়তা। যা আজকের বিজ্ঞানও অস্বীকার করতে পারে নি। এই ভাঙ্গাগড়া—অণুপরমাণু সবার সঙ্গে আত্মীয়তা যা চিরন্তন সত্য, যা ঋষির দিব্য দৃষ্টির কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তাই-ই রামায়ণ।

এই মূলধারা ছাড়াও রামায়ণের উপধারাগুলিও চিরন্তন সত্যের শাশ্বত বাণী বয়ে এনেছে। তার রাজনীতি, শাসনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র —সবকিছুই তার মূলধারাকে বজায় রেখেছে। সেখানে মহাকবি নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের আস্বাদ পেয়েছেন। মানুষের স্বেচ্ছাচারিতা প্রজাকুল তথা ভ্রাতা-পুত্র সকলই জলাঞ্জলি দিয়েছে। রাবণের জ্ঞানবুদ্ধি আধুনিক কালের কোনও ডিক্টেটরের চেয়ে কম ছিল না। কিন্তু আজকের ডিক্টেটর যেমন ক্ষমতার চরম সীমায় উঠে, ক্ষমতাগর্বেই হোক অথবা পারিপার্শ্বিক সংঘাতেই হোক মুহূর্তেই বিদায় নিচ্ছে, রাবণও তাই নিয়েছে। সেকাল আর একালে কোনও প্রভেদ নেই।

আবার অযোধ্যায় দশরথ ভরত এবং রামও রাজত্ব করেছেন। যাঁরা অমাত্য ও প্রজাদের শুধু সুবিধাই দেখেছেন, তাদের ইচ্ছাতেই চরম ব্যক্তিগত ত্যাগও করেছেন। উত্তরাধিকার-প্রথা বাদ দিলে রামরাজত্ব আজকের গণতন্ত্র থেকে বহুদূরে নয়। অযোধ্যাধিপতি আবার পর-রাজ্যকে গ্রাস করে বিরাট সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন নি। যা হয়ত ছিল তাঁর অনায়াস-সাধ্য! লঙ্কার রাবণ গেল বটে, কিন্তু বিভীষণ রইলেন তাঁর সার্বভৌমত্ব নিয়ে। আর কিষ্কিন্ধ্যায় সুগ্রীবও, যেমন আধুনিক কালে রয়েছে ভারতবর্ষ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, জাপান, ইংলণ্ড সার্বভৌম রাষ্ট্র পরস্পরের পরিপূরক রূপে।

বাল্মীকির মহাকাব্যের নরনারী—মাতা-পিতা-ভ্রাতা-ভগ্নী-স্বামী-স্ত্রী-প্রভু-ভৃত্য-রাজপুরুষ-সাধারণমানুষ তাদের নিজ নিজ সুখ-দুঃখ নিয়ে আপন অধিকার অনুসারে তাদের জীবন তথা শ্যামল পৃথিবীকে সুন্দরতর করে গড়ে তুলবার প্রয়াস করছে, যেমন আজকের মানুষও করে চলেছে। সেখানে মানুষের স্বার্থপরতা দুর্বুদ্ধি হয়ত কখনো কখনো এই আদি ব্যবস্থায় ফাটল ধরাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আসলে এই ধারা আজও পৃথিবীর সব দেশেই অব্যাহত রয়েছে। এই ধারা বন্ধ হলে হয়ত পৃথিবী থেকে মানুষ বিদায় নেবে!

প্রকৃতি তার বিরাট রহস্যের দ্বার কখনো সম্পূর্ণ করে খুলে দেয় নি। মানুষ অদম্য প্রয়াসে কিছু কিছু জয় করলেও সম্পূর্ণ বিজয়ী হয় নি। অজানাকে জানবার অদেখাকে দেখবার অনুভূতিতে যারা ধরা দেয় না, তাদের ধরবার কামনা মানুষের চিরকালের। মহাকবির মানুষ আকাশে উড়েছে, সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে, তার গলায় পাথরের মালা লাগিয়েছে ; আজও যেমন আমরা পৃথিবীর দীর্ঘ পরিধিকে ছোট করে আনছি আমাদের নানাবিধ বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের ফলে। মহাকবি যেন ভবিষ্যৎ জ্ঞানরাজ্যের আরও বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত করে গেছেন। তাঁর যোদ্ধাগণ চরম

আঘাত পেয়েছে। তবে তা নিবারণের রাস্তাও তাদের অজানা ছিল না। প্রতিপক্ষের বাণে আগুন জ্বললে, বারি বর্ষণ করে তারা নেভাতে পেরেছে। শুধু একমুখী ধ্বংসের লীলা-খেলায় শেষ নয়, তার প্রতিকারের সন্ধানও মিলেছে। আজকের বিজ্ঞান যার জন্য আকুলি-বিকুলি করছে। আধুনিক যুগে গ্রহান্তরের প্রাণী এখনও শুধু হাতছানিই দিচ্ছে। কিন্তু মহাকবির মানুষ গ্রহান্তরে বিচরণ করেছে, যেন সকলেই এক ঘরের মানুষ। মহাকবি তাঁর শাশ্বত অমর সৃষ্টি রামায়ণের মধ্য দিয়ে তাই সমাজ, ধর্ম, মৈত্রী ও সমন্বয়ের এক চরমতম বিকাশের পথ দেখিয়েছেন।

সত্য ও সুন্দরকে লাভ করতে চাই মানুষের বহু সাধনা। মাটি-পাথর, গাছপালা, আলো-হাওয়ার মত সত্যও সর্বত্র আছে। কিন্তু কয়জন ভাগ্যবান তার সঠিক সন্ধান পেয়ে নিজের জীবন পুরোপুরি সার্থক করে তুলেছেন! প্রভাতের সূর্য থেকে সুরু করে কত কি সুন্দরের খেলাই না আমাদের সামনে চলেছে। কিন্তু কয়জন তার রূপের ছটায় আপনার মন রাঙ্গাতে পারে! যা সত্য তাই-ই সুন্দর ও মঙ্গলময়। এই সত্যসুন্দর প্রতিনিয়তই আমাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সকলে তাকে অনুভব করতে পারছি না। তার আঘাতে আমাদের মনের দ্বার খোলে না বলেই তো আজ সারা বিশ্বে এতো অসামঞ্জস্য—এতো সংঘর্ষ—এতো অনর্থ। যে মানব-শিশু বিশ্বে অমৃতের বাণীই নিয়ে আসে, সেও মাতার জন্য কিছু কালের জন্য আনে দুঃসহ বেদনা। এই বেদনাজাত শিশু যে মাতৃহৃদয়ে জাগায় পবিত্রতম প্রেম, নির্মলতম আনন্দ, আর জাগায় মঙ্গলের দীপশিখা! তার কলকাকলি ভুলিয়ে দেয় মানুষের যত দুঃখযন্ত্রণা। তাই বুঝি মানুষের পরম শান্তি, জ্ঞান ও আনন্দ এসেছে চরম বেদনার মধ্য দিয়ে, যখন তাঁরা আপনাকে কৃচ্ছ্রতার কঠোর আগুনে সঁপে দিয়েছেন। আর এ কালের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তথা চারুকলার চরম বিকাশ হয়েছে বহু মানুষের কঠোর সাধনায়। কত মানুষই হয়ত এই সাধনায় হারিয়ে গেছে।

এই জ্ঞানের পথ বড় বেদনা-মধুর। তাই মহাকবির রামায়ণ শুধু ক্রৌঞ্চমিথুনের ক্রন্দন নয়—সেই সুর এমন একটি হৃদয়ে আঘাত করেছিল যে বহুদিন ধরে সন্ধান করছিল সত্যের। তার বিরাম ছিল না। সে নিজের ব্যথাতে ছিল ব্যাকুল। তাঁর নিজেরই মুক্তির পথ খুঁজছিল। কিন্তু আজ ব্যাধের মাধ্যমে এসে গেল বিরাট বিশ্বের ক্রন্দন। বিশ্বের সকল মানুষের ব্যথা-বেদনা, আজ তাঁর বেদনা। এই বেদনাই দিল তাঁকে চিরসত্যের সন্ধান। যা চিরসত্য তাই সামান্য রূপ নেবার চেষ্টা করল মানুষের ভাষায়; তাঁর বেদনা ও আনন্দ স্বভাবতই ছিল গভীরতর। কেননা চরম বেদনা ও পরম আনন্দ শুধু অনুভূতির বিষয়। তাই রামায়ণ মহাকবির সেই অপরিসীম ও অলৌকিক আনন্দের কিছুটা আস্বাদ আমাদের কাছে বয়ে এনেছে।

যুগ যুগ ধরে রামায়ণ আমাদের অমৃতরসে মুগ্ধ করেছে, আলো দিয়েছে। তার মানুষের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, হাসি-কান্না আমাদের জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই মিশে গিয়ে আমাদের দিয়েছে মানুষের প্রতি অনন্ত বিশ্বাস, বিশ্ব-চরাচরের সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা এবং বৈচিত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের অমৃতবাণী আর মানুষের সভ্যতার বিরাট সম্ভাব্যতা যা সে চরিত্রবলে ও অধ্যবসায়ের লাভ করতে পারে। এই সমন্বয় ও

সামঞ্জস্য এবং আশার বাণী আইনস্টাইন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক এবং ধর্মাচার্যগণ মানুষকে আজও শুনিয়েছেন—বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাধনার অনুভূতি দিয়ে।

তাই রামায়ণ বিশ্বের অন্যতম মহাকাব্য। তার নায়ক-নায়িকা শ্রেষ্ঠ মানব-মানবী। তার সব কিছুই সত্য ও সুন্দরের উপাসনায় মঙ্গলময়। সে যেন ভগীরথের আনা গঙ্গা, যে গঙ্গা কঠিন পাথরে আঘাত খেতে খেতে জন্ম নিয়ে আপন পথ করে নানা শস্যশ্যামল প্রান্তরের সৃষ্টি করে সমুদ্রে এসে মিলে গেছে।

এ হেন পূতধারা যাঁর সৃষ্টি তাঁর বেদনা, তাঁর আনন্দের কি কোনও মাপকাঠি থাকতে পারে?

অপরূপ

শ্রীশিবশম্ভু সরকার

সে যে খুঁজে ফেরে শুধু মনের মানুষ-
মাঝে মাঝে চেয়ে রয়
বাতাসে কি কথা কয়
থাকে নাকো হুঁস!

পথ তার লাগে ভালো
ফেলে সে প্রাণের আলো
পথিকের মনে মুখে
চাহে সে বে-হুঁস—
আশা বুঝি—মিলে যাবে
মনের মানুষ!

দেখে সব ফাঁকা, হায়
খোঁজে যারে নাহি পায়
চন্দনে চেয়ে ফেরে
মেলে আবলুস!
এক কণা ব্রীহি চায়—
পায় বুঝি তুষ।

সহসা ভিতরে চায়
কি যেন দেখিতে পায়—
এতদিন উড়াল কি
মেঘের ফানুষ?—
হৃদয়ে যে বসে আছে
মনের মানুষ!

শক্তির বিভিন্ন রূপ

ডক্টর শ্রীবিশ্বরঞ্জন নাগ

(৪) আলো

আলো আমাদের বিশেষ পরিচিত। কিন্তু আমরা যদি ভাবতে বসি 'আলো কি?' তাহলে কঠিন সমস্যায় পড়ে যেতে হয়। বহু বৎসর ধরে বিজ্ঞানীরা এই সহজ প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে বেড়িয়েছেন, কখনও মনে হয়েছে ঠিক উত্তরটি খুঁজে পাওয়া গেছে, কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই আবার দেখা গেছে—না, ঠিক উত্তর এখনও পাওয়া যায় নি। বছরের পর বছর আলোর স্বরূপ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা করা হয়েছে, পরীক্ষার ফলাফল বুঝবার জন্য নূতন নূতন অনুমানের জন্ম হয়েছে, কিন্তু সঠিক ভাবে আলো-কে যেন আজ পর্যন্তও জানা সম্ভব হয় নি। অবশ্য কিছু কিছু অস্পষ্ট ধারণা হয়েছে, যা থেকে আলোর আজ এক ধরনের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

খুব সহজভাবে যদি 'আলো কি?' এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই তাহলে বলা যেতে পারে, যা আমাদের চোখে অনুভূতি আনে তাই আলো। বিশ্বে বিভিন্ন জিনিস ছড়িয়ে আছে, যেমন সূর্য, তারা, অগ্নিশিখা, গাছ, পাহাড়, জল ইত্যাদি। এদের মধ্যে কতগুলি জিনিস নিজেরাই আমাদের চোখে ধরা দেয়। অন্য কিছু না থাকলেও সূর্যকে, তারাকে বা অগ্নিশিখাকে আমরা দেখতে পাই। আবার অন্য ধরনের জিনিস আছে, যাদের এই প্রথম পর্যায়ের জিনিসগুলির অনুপস্থিতিতে দেখতে পাই না। গাছ বা পাহাড়কে সূর্য না উঠলে বা কোন অগ্নিশিখার কাছে না নিয়ে এলে আমরা দেখতে পাই না। তাই ভাবা যেতে পারে, প্রথম পর্যায়ের জিনিসগুলি থেকে কিছু একটা বেরিয়ে আসে, যা আমাদের চোখকে প্রভাবান্বিত করে বা যার দ্বারা আমরা এদের বা এদের উপস্থিতিতে অন্যান্য সব জিনিসকে দেখতে পাই। এই 'কিছু একটা'ই হল আলো। স্বয়ং আলো-কে আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু আলোর সাহায্যেই আমরা বিশ্বের সব কিছু দেখতে পাই। আলোর বিশেষ কয়েকটি গুণও আমরা সহজভাবে বুঝতে পারি। আমরা বুঝতে পারি যে, আলো তার উৎস থেকে কোন মাধ্যমের সহায়তা না নিয়েই ছড়িয়ে পড়তে পারে। আমাদের পৃথিবীতে সূর্য এবং আরো দূরবর্তী বহু গ্রহ, নক্ষত্র ও নীহারিকা থেকে আলো এসে পৌছায়। পৃথিবী ও গ্রহ-নক্ষত্রের অন্তর্বর্তী জায়গা মহাশূন্য, কোন বস্তু এখানে নেই, কিছু থাকলেও আছে খুব সামান্য পরিমাণে, যা না থাকারই সামিল। এই বস্তুহীন রাজ্য পেরিয়ে সহজেই আলো আমাদের কাছে এসে হাজির হয়।

উৎস থেকে আলো যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন একটা বিশেষ গতিবেগ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় আলোর যে সীমিত গতিবেগ আছে, তা অবশ্য ধরা পড়ে না। কিন্তু পরীক্ষাগারে বিশেষ ব্যবস্থা করে বা কোন কোন গ্রহের ও উপগ্রহের অবস্থান থেকে প্রমাণ করা যায় যে, উৎস থেকে কোন দূরবর্তী জায়গায় পৌছাতে আলো কিছু সময় নেয়। মহাশূন্যে আলোর গতিবেগ সর্বাবস্থায় সমান, প্রতি সেকেণ্ডে ৩×১০^৮ মিটার।

পরীক্ষা দ্বারা দেখান যায় যে, আলো এক ধরনের শক্তি। এমন যন্ত্র তৈরী করা সম্ভব যার উপরে আলো পড়লে যন্ত্রের চাকা ঘুরবে। আজকাল অবশ্য আলো যে শক্তির এক রূপ, তা আরও সহজে প্রমাণ করা যায় সৌরকোষ (Solar Cell) ব্যবহার করে। সৌরকোষ জার্মানিয়াম বা সিলিকন দিয়ে তৈরী, এর উপরে আলো পড়লে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়। এই বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করে যে কোন যন্ত্র চালানো যায় এবং এর বহুল ব্যবহার বর্তমানে কৃত্রিম উপগ্রহের যন্ত্রপাতি চালানোয়। এই বৈদ্যুতিক শক্তি আসে আলো থেকে, কাজেই আলোও শক্তি। তাই বলা যেতে পারে আলো হল এক ধরনের শক্তি, যা তার উৎস থেকে নির্দিষ্ট গতিবেগ নিয়ে উৎসের চার পাশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু যখনই বলা হল আলো এক ধরনের শক্তি তখনই প্রশ্ন জাগে, কি করে এই আলোর শক্তি বস্তুহীন জায়গায় প্রকাশিত হয়? কেননা শক্তির যে রূপ আমরা সহজে বুঝি, তা হল শক্তির বস্তু-আশ্রয়ী রূপ যেমন গতিজনিত যান্ত্রিক শক্তি বা শব্দের শক্তি বা উত্তপ্ত বস্তুর শক্তি। বস্তুর গতিজনিত বা অবস্থানগত পরিবর্তিত স্বরূপই হল শক্তির সহজ অনুভব-যোগ্য রূপ। তাই প্রশ্ন জাগে, আলো প্রকৃত পক্ষে কি? বুঝলাম আলো শক্তি, কিন্তু কি এই শক্তির অন্তর্নিহিত রূপ? বিজ্ঞানীরা এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আলো ও বস্তুর পরস্পরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখে।

আলোর কতকগুলি গুণাগুণ আমরা আমাদের রোজকার কাজকর্মে সব সময়ে দেখতে পাই। প্রথম হল আলো সরলরেখায় ছড়িয়ে পড়ে। কোন সূক্ষ্ম আলোর উৎসের সামনে যদি একটি পয়সা রাখা যায়, তাহলে দেখা যায় যে, পয়সাটির পেছনের অংশ অন্ধকার থাকে। উৎসটি থেকে পয়সার কিনারা পর্যন্ত যদি কয়েকটি সরলরেখা টেনে পেছনে বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে এদের মধ্যবর্তী অংশই অন্ধকার থাকে। আলোর রেখা বেঁকে এসে পয়সার পেছনে পৌছাতে পারে না। আলোর দ্বিতীয় গুণরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে প্রতি-ফলনের কথা। আলো যখন কোন মসৃণ অনচ্ছ তলের উপরে পড়ে তখন আলোর রেখাগুলি ফিরে আসে। প্রতিফলনে আলোর রশ্মির গতিপথ অনেকটা কোন মসৃণ কঠিন তলের উপরে রবারের বল ছুড়ে দিলে তার যে পতিপথ হয় তার মত। বলটা যেমন সরলরেখায় ছুটে গিয়ে কঠিন তলে ধাক্কা খেয়ে নূতন সরলরেখায় ছুটে চলে, আলোর রশ্মিও ঠিক তেমনি দিক পরিবর্তন করে। আলোর সরলরেখায় ছুটে চলা ও প্রতিফলন থেকে স্বভাবতই মনে হয় যে, আলো নিশ্চয়ই কতকগুলি কণার সমষ্টি—এই আলোর কণাগুলি আলোর উৎস থেকে নির্দিষ্ট গতিবেগে ঠিক বস্তুকণার মত ছুটে চলে, কিন্তু আলোর কণাগুলি হল শক্তির কণা। নিউটন তাঁর কণা-আশ্রয়ী মতবাদে আলোকে এমনি শক্তির কণারূপেই কল্পনা করেছিলেন। অনেক বিজ্ঞানীও তার মতে সায় দিয়েছেন। কিন্তু অনেক বিজ্ঞানী আবার তাঁর মতে সায় দিতে পারেন নি। যদিও আলোর সরলরেখায় ছুটে চলা ও প্রতিফলন আলোকে কণা ভেবে নিলে ব্যাখ্যা চলে, কিন্তু আলোর অন্য ধরনের কতগুলি গুণ আছে যা কণার মতবাদে ব্যাখ্যা করা যায় না। সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে বিজ্ঞানী গ্রীমাল্ডি চুলের ছায়া বিশেষভাবে লক্ষ্য করে দেখতে পান যে, সেই ছায়ার কিনারা পরিষ্কার-ভাবে নির্দিষ্ট নয়। ছায়ার কিনারায় কতগুলি অন্ধকার ও আলোকিত রেখা পরপর দেখা

যায়। আলো সরলরেখায় গেলে যে ছায়া হত, কতকগুলি আলোকিত রেখা সেই ছায়ার মধ্যেও থাকে। এ থেকে বলা যেতে পারে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় আলো সরলরেখায় চলে, কিন্তু সত্যি সত্যি আলো সরলরেখায় চলে না। কোন অনচ্ছ বস্তুর কিনারায় এলে আলো সামান্য বেঁকে যায়। বড় আকারের বস্তুর ক্ষেত্রে এই বেঁকে যাওয়া ধরা পড়ে না, কিন্তু খুব ছোট আকারের বস্তু হলে বেঁকে যাওয়াটা ধরা পড়ে। আলো এই যে ছোট বস্তুর ছায়ার কিনারায় বেঁকে যায়, একে বলা হয় Diffraction বা বাঁকন। আলো-কে যদি সরলরেখায় গতিশীল শক্তিকণা বলা হয়, তাহলে স্পষ্টতই বাঁকনের ব্যাখ্যা করা যায় না।

এমনি ধরনের দ্বিতীয় ঘটনা হল Interference বা প্রভাবন। কোন পর্দায় যদি সূক্ষ্ম কোন উৎস থেকে আলো সোজাসুজি বা কোন দর্পণে প্রতিফলিত করে ফেলা যায়, তাহলে পর্দাটির ছোট একটা অংশ সমভাবে আলোকিত হয়। কিন্তু যদি একই সঙ্গে ঐ সূক্ষ্ম উৎসের আলোর কিছু অংশকে সোজাসুজি এবং কিছু অংশকে প্রতিফলিত করে ফেলা যায়, তাহলে দেখা যায় আগেকার সমভাবে আলোকিত অংশে এক আলো-আঁধারের নকশা তৈরী হয়। এক্ষেত্রে আলোর যে দু-অংশ দু-পথে এসে পর্দায় পৌঁছায় তারা পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে— পর্দার কোন অংশে এরা পরস্পরকে বিলুপ্ত করে, আবার কোন অংশে পরস্পরকে সাহায্য ক'রে মোট আলোর জোর বাড়িয়ে দেয়। এই প্রভাবনও আলো শক্তির কণা হলে সম্ভব হয় না; হয়ত দুটি শক্তির কণা এক জায়গায় পড়লে সেখানকার আলোর জোর বাড়বে, কিন্তু শক্তির কণাদুটি পরস্পরকে বিলুপ্ত ক'রে অন্ধকারের সৃষ্টি করে, একথা কোনও ভাবেই বোঝা যায় না।

বিশেষভাবে বাঁকন ও প্রভাবনের কথা মনে রেখেই অনেক বিজ্ঞানী আলোকে কণার সমষ্টি বলে স্বীকার করতে পারেন নি। তাদের মতে আলো হল এক ধরনের তরঙ্গ। আলোকে যদি তরঙ্গ মনে করা হয়, তাহলে বাঁকন ও প্রভাবন সহজেই বোঝা যায়। তরঙ্গের ক্ষেত্রে এই দুটি ঘটনা সব সময়ে ঘটতে দেখা যায়। কোন জলাধারে যদি ঢিল ছুড়ে তরঙ্গ সৃষ্টি করে কোন বড় কাঠের টুকরা ডুবিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে দেখা যায় জলের তরঙ্গ সহজেই কাঠের টুকরাটির কিনারায় বেঁকে গিয়ে একদিক থেকে অপরদিকে হাজির হয়। আবার কোন ছোট জলপাত্রে যদি নির্দিষ্টভাবে আন্দোলিত করে জলের তরঙ্গ সৃষ্টি করা যায়, তাহলেও দেখা যায় পাত্রটির কোন কোন জায়গার জলকণাগুলি খুব ওঠানামা করে, কিন্তু কোন কোন জায়গার জলকণা একেবারেই ওঠা-নামা করে না। এই দুটি ঘটনাই আলোর বাঁকন ও প্রভাবনের মতই। আবার আমরা জানি শব্দ এক ধরনের তরঙ্গ, হাওয়ার বস্তুকণা-গুলির কাঁপনই শব্দের প্রকাশ। শব্দের ক্ষেত্রেও বাঁকন ও প্রভাবন সব সময়েই ঘটতে দেখা যায়। দুটো পাশাপাশি ঘরে কথা বললে ঘরদুটির মাঝখানে দরজা-জানালা না থাকলেও একঘরের কথা অন্য ঘরে শোনা যায়। শব্দ এক্ষেত্রে এক ঘর থেকে বের হয়ে বেঁকে এসে অন্য ঘরে ঢুকে পড়ে। আবার খুব বড় হল-ঘরে অনেক সময়েই দেখা যায় এক প্রান্তে শব্দ করলে ঘরটির বিভিন্ন অংশে শব্দের জোরের প্রচুর ওঠানামা হয়। কোন জায়গায় হয়ত শব্দ একেবারেই শোনা যায় না আবার তার থেকে দূরের জায়গাতেও শব্দ শোনা যায়। কাজেই আলোর বাঁকন ও প্রভাবনের ব্যাখ্যা করতে হলে ধরে নিতে হয় যে, আলো কোন এক ধরনের তরঙ্গ।

আলো-কে তরঙ্গ ধরে নেওয়ার আরেকটি সুবিধা হল, যে ঘটনাগুলির ভিত্তিতে আলোকে শক্তির কণা ধরা হয়েছিল সেই ঘটনাগুলিরও ব্যাখ্যা এতে করা চলে। তরঙ্গের বিস্তার নিয়ে অঙ্ক কষে সহজেই প্রমাণ করা যায়, আলো তরঙ্গ হলেও প্রতিফলনের নিয়ম মেনে প্রতিফলিত হবে। আবার যদিও ছোট আকৃতির অনচ্ছ বস্তুর ক্ষেত্রে বাঁকন হবে, কিন্তু বস্তুটির আকৃতি বড় হলে বাঁকন হবে না—মনে হবে আলো সরলরেখায় প্রসারিত হয়। কাজেই যে বিজ্ঞানীরা আলোকে তরঙ্গ বলে অনুমান করেছিলেন—বাঁকন ও প্রভাবনের কথা জানার পড়ে তাঁদের অনুমানই সত্য বলে প্রমাণিত হয়। নিউটনের কণাশ্রয়ী মতবাদ বিজ্ঞানী মহলে অনাদৃত হয়ে পড়ে। আলোর স্বরূপ সম্পর্কে যে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় তা হল এই যে, আলো হল এক ধরনের তরঙ্গ—কিন্তু এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব ছোট ৫×১০^{-৫} সেন্টিমিটারের কাছাকাছি। ফলে বড় আকৃতির বস্তু নিয়ে পরীক্ষায় আলো সরলরেখায় প্রসারিত হয় মনে হয়, কিন্তু এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের কাছাকাছি আকারের বস্তু নিয়ে পরীক্ষায় এর তরঙ্গ-স্বরূপ বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। আলোর তরঙ্গ-মতবাদে আলোর বিভিন্ন রং-এরও সহজ ব্যাখ্যা হয়। দেখা যায় আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বিভিন্ন হতে পারে এবং এই বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো আমাদের চোখে বিভিন্ন রং-এর অনুভূতি আনে। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যতই বাড়ে ততই আলোর রং বেগুনী থেকে লালের দিকে এগিয়ে যায়।

তরঙ্গ-মতবাদে আলোর সব গুণাগুণের ব্যাখ্যা হলেও বহুদিন পর্যন্ত একটা সমস্যার সমাধান হয় নি। তরঙ্গ সব সময়েই কোন মাধ্যমকে আশ্রয় করেই প্রকাশিত হয়। জানা কোন বস্তুই আলোক-তরঙ্গের আশ্রয় হতে পারে না—কেননা বস্তুহীন জায়গাতেও আলো প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞানীরা তাই এক কল্পনার বস্তুর আশ্রয় নেন। বস্তুটি হল ইথার। এ হল এমন জিনিস যার ভর নেই, যাকে কোনভাবেই অনুভব করা যায় না, যা সব জিনিসে ছড়িয়ে থাকতে পারে। এই কল্পনার ইথারের স্বরূপ মানুষের অভিজ্ঞতার সব রকমের বস্তু থেকেই আলাদা। কিন্তু যেহেতু আলোর তরঙ্গ-স্বরূপ সুপ্রমাণিত তাই বিজ্ঞানীরা এই ইথারের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়ে বলেন—আলোক-তরঙ্গ ইথারেই কাঁপন সৃষ্টি করে প্রকাশিত হয়, যেমন শব্দ প্রকাশিত হয় বায়ুতে। এই ইথারের অস্তিত্ব ধরে নেওয়া—একভাবে বলা যেতে পারে এটা তরঙ্গ-মতবাদের গোঁজামিল। সব রকমের অবিশ্বাস্য গুণ ইথারের থাকলেও ভরহীন ইথারে কি করে যে আলোর শক্তি প্রকাশিত হতে পারে, তা কোনক্রমেই বোঝা যায় না। বহু কাল পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা তাই আলোর ব্যাপারে একটা অস্বস্তি নিয়ে কাটিয়েছেন—তরঙ্গ-মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু মতবাদটি প্রতিষ্ঠিত শূন্যের উপরে। শূন্যকে আশ্রয় করেই আছে আলোর তরঙ্গ। কিন্তু সাধারণ অভিজ্ঞতার বিরোধী হলেও এই শূন্যের তরঙ্গের সঙ্গেই শক্তি জড়িত আছে।

বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েলের গাণিতিক অনুসন্ধানের ফলে বিজ্ঞানীদের এই অস্বস্তির অবসান হয়। ম্যাক্সওয়েল বিদ্যুৎ ও চুম্বকের বলক্ষেত্রের পরস্পরের উপর প্রভাব নিয়ে অনুসন্ধান করে দেখতে পান যে, এই বলক্ষেত্র কোন কোন অবস্থায় মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। সে ক্ষেত্রে চুম্বক বা বিদ্যুতের বলের জোর দূরত্বের সঙ্গে তরঙ্গের ন্যায়ই পরিবর্তিত হবে। বিদ্যুৎ-চুম্বক ক্ষেত্র শূন্যে প্রতিষ্ঠিত হলেও এর বলক্ষেত্রের সঙ্গে শক্তি জড়িয়ে থাকে। এই তরঙ্গের নাম

দেওয়া হয় বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ। এর অস্তিত্ব পরবর্তীকালে হার্জের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়। এও দেখা যায় যে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের গতি-বেগ আলোর গতিবেগের সমান। তাই আলো-কে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ ধরে নিলে সব সমস্যারই সমাধান হয়। ম্যাক্সওয়েলের পরে বিজ্ঞানে আলোর যে স্বরূপ বিশেষভাবে স্বীকৃতি পায় তা হল এই যে—আলো এক ধরনের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ। সাধারণ বেতার-তরঙ্গের তুলনায় আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য খুব কম। এক বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যানুসারে বিভিন্ন ঘটনার সূত্রপাত করে। এর দৈর্ঘ্য খুব বেশী হলে বিশেষ যন্ত্রপাতির সাহায্যেই একে ধরা যায় এবং একে বলা হয় বেতার-তরঙ্গ। মাঝামাঝি দৈর্ঘ্যের হলে একে আমরা তাপ বলে অনুভব করি। বিকীরিত তাপ স্বল্প দৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আরও ছোট হলে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ আলো হয়ে দেখা দেয়। রঞ্জন-রশ্মি এবং গামা-রশ্মি ও বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ, কিন্তু এদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আলোর চেয়েও ছোট। ম্যাক্সওয়েলের পরে আলো সম্পর্কে বিজ্ঞানী-মহলে একটি নিশ্চিত ধারণা জন্মে যে, আলোর স্বরূপ সম্পূর্ণ জানা গেছে। বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ-গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত একটি বিশিষ্ট সীমার মধ্যের তরঙ্গই হল আলোক। বিজ্ঞানীদের খুশী হওয়ার বিশেষ কারণও ছিল—কেননা আলোর জানা সব গুণই বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের স্বরূপ থেকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

এই নিশ্চিন্ততা কিন্তু খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। অল্পদিনের মধ্যেই আলোর দুটি নূতন প্রকৃতি আবিষ্কৃত হয়, যা এই সুপ্রতিষ্ঠিত তরঙ্গ-মতবাদকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। প্রথম হল গরম পদার্থ থেকে বিকীরিত তাপ বা আলোর পরিমাণের সঙ্গে কম্পাঙ্কের সম্পর্ক। কোন পদার্থকে গরম করলে তা থেকে তাপ বিকীরিত হয়—তাপ-মাত্রা বাড়লে ক্রমান্বয়ে লাল এবং আরো পরে সাদা আলো বেরোতে থাকে। কোন তাপ-মাত্রায় গরম পদার্থ থেকে একই সঙ্গে তাপ, লাল আলো বা আরও ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো বেরোতে থাকে। বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বা রং-এর যে আলো বিকীর্ণ হয় তাদের পরিমাণের সঙ্গে তাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিশেষ সম্পর্ক আছে। যদি অঙ্ক কষে এই সম্পর্ক হিসাব করা যায় তাহলে দেখা যায় যে, আলো তরঙ্গের ন্যায় সুষমভাবে পদার্থ থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে—এটা ধরে নিলে পরীক্ষায় পাওয়া হিসাবের সঙ্গে মেলে না। কাজেই এই বিকীর্ণ তাপ বা আলোর প্রকৃতি তরঙ্গ-মতবাদ থেকে পরিষ্কার হয় না।

দ্বিতীয় যে ঘটনা তরঙ্গ-মতবাদ ব্যাখ্যা করতে পারে না, সেটি হল আলোক-তড়িতের স্বরূপ। কোন ধাতুর উপরে আলো পড়লে, বিশেষভাবে সোডিয়াম বা পটাসিয়ামের উপরে পড়লে, ধাতুটি থেকে কিছু ইলেকট্রন বাইরে বেরিয়ে আসে। এই ঘটনার নাম দেওয়া হয়েছে আলোক-তড়িৎ (Photo-electricity)। ইলেকট্রনগুলি আপতিত আলোর শক্তি আত্মসাৎ করেই কেন্দ্রীনের বন্ধন ছাড়িয়ে বাইরে আসে। এক্ষেত্রেও পরীক্ষায় কতগুলি নিয়ম আবিষ্কৃত হয়—তার মধ্যে প্রধান হল যে, বিশেষ কম্পাঙ্কের কম কম্পাঙ্কের আলো পড়লে আর ইলেকট্রন বার হয় না। এই ঘটনাটিও তরঙ্গ-মতবাদ থেকে ব্যাখ্যা করা যায় না—কেননা সব কম্পাঙ্কের তরঙ্গের শক্তিই ইলেকট্রনের আত্মসাৎ করা উচিত।

উপরে উল্লেখ করা দুটি ঘটনা কোনভাবেই তরঙ্গ-মতবাদে ব্যাখ্যা হয় না, কিন্তু আলো-কে যদি শক্তির কণা মনে করা হয় তাহলে ব্যাখ্যা

করা যায়। গরম পদার্থ থেকে আলো একটি একটি করে শক্তির কণারূপে আত্মপ্রকাশ করে; কম্পাঙ্ক *f* হলে কণার শক্তি হবে *hf*, *h* হল একটি ধ্রুবক যার নাম দেওয়া হয়েছে প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক। প্ল্যাঙ্ক অঙ্ক কষে প্রমাণ করেন যে, আলো এমনি শক্তির কণা হলে বিকীর্ণ বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোর পরিমাণ ও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সঙ্গে যে সম্পর্ক পরীক্ষায় পাওয়া যায়, তা হিসাবের সঙ্গে মেলে। আবার আইনষ্টাইন দেখান যে, আলো এমনি শক্তির কণা হলে আলোক-তড়িতের গুণও বোধগম্য হয়। এক ভাবে দেখতে গেলে বিজ্ঞানী-মহলে আবার নিউটনের কণা-আশ্রয়ী মতবাদ ফিরে এলো—প্ল্যাঙ্ক ও আইনষ্টাইনের অঙ্কের সাফল্যের পরে।

বর্তমানে আলো সম্পর্কে তাই এক দোটানা মতবাদ চালু হয়েছে। আলো যখন পদার্থ থেকে বেরিয়ে আসে বা পদার্থে বিলুপ্ত হয় তখন আলো হল কণার সমষ্টি। এই কণাগুলি শক্তির কণা। বস্তুর কণার সঙ্গে এদের বিশেষ পার্থক্য যে, এরা সব সময়েই আলোর গতিবেগ নিয়ে ছুটে চলেছে। এদের গতিবেগের কখনও পরিবর্তন হয় না বা এরা কখনও স্থির থাকতে পারে না। গতি আছে বলেই এদের শক্তি আছে এবং আইনষ্টাইনের সূত্রানুসারে এদের শক্তির সমপরিমাণ ভরও আছে। কিন্তু সাধারণ বস্তুর কণার মত এদের ভর নয়। যদি এদের কখনও গতিশূন্য করা যেত তাহলে এদের ভর থাকত না।

আলো যখন উৎস থেকে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে তখন কিন্তু আলো পুরোপুরি তরঙ্গের মত। এই তরঙ্গ বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ—সব দিক থেকে বেতার-তরঙ্গের সমগোত্রীয়—কিন্তু কম্পাঙ্ক বেশী।

উৎস থেকে শক্তির কণারূপে আত্মপ্রকাশ করে আলো বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গরূপে ছড়িয়ে পড়ে—আবার শক্তির কণা হয়েই পদার্থে মিলিয়ে যায়; 'আলো কি ?'—এই প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানীরা আজ একথাই বলছেন। যতদূর মনে হয়, আলোর এই অবোধ্য দ্বৈতরূপই সম্ভবতঃ মানুষকে চিরকালের জন্য স্বীকার করে নিতে হবে।

ক্লান্ত নটের প্রার্থনা

শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী

পাদ-প্রদীপের আলোক নেভাও
পালা ক'রে দাও শেষ,
মুখ হ'তে রঙ ঘ'ষে তুলে ফেলি
খুলে ফেলি এই বেশ।
যে ভূমিকা দিয়ে এতদিন ধ'রে
রেখেছো ভুলায়ে মোরে
আর নয়, তার হোক অবসান
যবনিকা যাক প'ড়ে।

হাসি-কান্নায়, দুঃখ ও সুখে
কতো রসে, কতো সুরে
দৃশ্যের পর দৃশ্যে নামালে
এ মায়া-মঞ্চ জুড়ে!
বাহবা দিয়েছো, কখনো আবার
দিয়েছো তো উপহাস,
এবারে আপন সত্তারে দাও
চিনিবার অবকাশ।

বঙ্গহৃদয় শ্রীচৈতন্য

অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

কবি কর্ণপূর পরমানন্দ সেন তাঁর চৈতন্য-লীলাবিষয়ক নাটকটির নাম দিয়েছেন 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়'। চতুর্দশ-পঞ্চদশ-শতকের বাঙালীজীবনের ঘনান্ধকারের পটভূমিতে এই চৈতন্যচন্দ্রোদয় যে কী পরম সার্থকতার বাণী বহন করে এনেছিল, আজ পাঁচশো বছর পরের বাঙালী আমরা, বারংবার কৃতজ্ঞচিত্তে সেকথা স্মরণ করে ধন্য হই। বহুবিচিত্র জাতির মিলনভূমি এই ভারতবর্ষে বাংলার সংস্কৃতি-স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেও আমরা সমগ্র ভারতীয় চেতনারই অঙ্গরূপে নিজেদের অনুভব করি। এই ভারতের অজস্র সাধনপন্থার বৈচিত্র্যে বাংলার সাধনা তার স্বাতন্ত্র্যের পথেই সর্বভারতীয় হয়ে উঠেছে। শ্রীচৈতন্য, শ্রীরাম-কৃষ্ণের সাধনা তার সাক্ষী।

প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য আছে। সেই আত্মোপলব্ধির পরম প্রকাশ এক একটি ব্যক্তিত্ব-অবলম্বনে বিশ্বময় বিচ্ছুরিত হয়। শ্রীচৈতন্যজীবনে বাঙালীর সেই নিজস্ব জাতীয় প্রতিভার বিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাস। যে পরমসত্যোপলব্ধির আহ্বানে ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যের মাধ্যমে এই তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছিল, সমগ্র মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে সেই উপলব্ধির সুরময় ছন্দময় আত্মপ্রকাশ আজ অবধি নিখিলরসিকচিত্তকে মুগ্ধ বিস্মিত প্লাবিত করে রেখেছে।

বস্তুতঃ যে কবিসত্তা ও আবেগধর্ম বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের প্রধানতম প্রেরণা, শ্রীচৈতন্যের রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ সত্তার আবির্ভাবে সেই প্রেরণার পূর্ণপ্রকাশ। পৃথিবীর ইতিহাসে ভগবৎপ্রেমে আত্মহারা সাধকের কাহিনী অনেক শোনা যায়। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-জীবনের শেষার্ধে ভগবৎপ্রেমের যে শরীরীবিগ্রহ বিশ্বচেতনার সিন্ধুতীরে প্রতিষ্ঠিত হল, তার অতুলনীয় মহিমা এক হিসাবে বাংলার জাতীয় প্রতিভার অনন্ত প্রকাশরূপেই স্বীকার্য।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আবেগ-নির্ভর ভক্তি-তন্ময় জীবনাদর্শের জয়গান আমাদের বস্তুসমৃদ্ধ যন্ত্রযুগের প্রগতিপথে কতখানি সহায়ক? আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এই নাম-প্রেমময় অশ্রুবিহ্বল আকুলতা কতখানি কাম্য ও সংগত? অন্ততঃ চৈতন্যজীবনাদর্শ সম্বন্ধে প্রচলিত সমালোচনার মূল্যবিচার করে আধুনিক বাঙালী-মানসে এই দেবমানবের আবির্ভাবের সার্থকতা অনুধ্যান আজকের দিনে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কারণ, মহামানবের আবির্ভাব শুধু যুগপ্রয়োজনে সীমাবদ্ধ নয়, একহিসাবে যুগোত্তীর্ণতাই মহৎ আদর্শের মাপকাঠি। শ্রীচৈতন্যের ভক্তিধর্ম যদি মধ্যযুগের মানব-জীবনে অমৃতবার্তা এনে থাকে, তবে আধুনিক জীবনেও সে-আদর্শের কোন সার্থকতা নিশ্চয়ই নিহিত। প্রয়োজন শুধু সমাহিত চিত্তে অনুধ্যান।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে সভ্যতার রকেটগতি অভিযান আপাততঃ আমাদের বিস্মিতদৃষ্টির সামনে সবচেয়ে বড়ো সত্য। মারণাস্ত্রমহিমার জয়গানের পাশাপাশি মহা-কাশযাত্রীর সগৌরব পক্ষবিস্তার বিজ্ঞানের অভাবিত সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে এনে পৌঁছে

দিয়েছে এ যুগের মানুষকে। তবু কি মনে করা যায় না, আধুনিক যুগের রায় রামানন্দকে মহাপ্রভু প্রশ্ন করে চলেছেন, 'এহ বাহ্য, আগে কহ আর'? অন্তরের যে পূর্ণতায় পৌঁছুতে না পারলে কোন বহিরঙ্গ কীর্তিই সমাজ ও সভ্যতার ধ্বংসরোধ করতে পারে না, সে সম্বন্ধে আধুনিকতম বিজ্ঞানও খুব নতুন কিছু বলতে পেরেছে কি? আধুনিক সাহিত্যে শিল্পে যে সংশয়যন্ত্রণামথিত নৈরাজ্যপ্রবণতা, তার মূলে কি তথাকথিত বিজ্ঞানভিত্তিক সভ্যতার অন্তঃসারহীনতাই অনেক পরিমাণে দায়ী নয়? বিজ্ঞানের বস্তুমূল্য মানুষের অন্তরের মূল্যকে কোনদিনই মুছে ফেলতে পারবে না। তাই, বহির্বিজ্ঞানের সঙ্গে অন্তর্বিজ্ঞানের মিলনেই পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার সৃষ্টি সম্ভব—একথা মনে না রাখলে আধুনিক ভারতবর্ষেরও সমূহ বিনষ্টি অনিবার্য।

বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাসে গভীর আবেগ ও প্রখর মনন—হৃদয় ও বুদ্ধির আপাত-বিপরীত প্রবণতা বহুকাল থেকেই সঞ্চারিত। বাঙালীর সাংস্কৃতিক রাজধানী নবদ্বীপে নব্য-ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনেরও সূচনা। বেদস্বীকৃত মানবজীবনের চতুবর্গ-ফললাভের আদর্শের সঙ্গে পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমের সংযোজন ভারতীয় দার্শনিকচিন্তা-ধারায় বাঙালী মনীষারই দান। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমের মহত্ত্বঘোষণার দ্বারা হৃদয় ও মনীষার এক অভূতপূর্ব যোগ-সাধন বাঙালী সংস্কৃতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। যা বুদ্ধির দ্বারা পরিশীলিত, তাকে হৃদয়ের দ্বারা আত্মস্থ করাই বাঙালী-মানসের স্বধর্ম। শ্রীচৈতন্যজীবনে ও চৈতন্য-কেন্দ্রিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধনায় মানবাত্মার অন্তর্লোকের এই অপূর্ব সমন্বয়প্রচেষ্টা—আধুনিক জড়সর্বস্ব একান্তবুদ্ধিবাদী ও আত্মযন্ত্রণায় পীড়িত মানবসমাজের জীবনজিজ্ঞাসার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাধান। অধ্যাত্মসাধনার বিভিন্ন স্তরের সার্থকতার কথা মনে রেখেই 'অন্যতম' শব্দটি ব্যবহৃত; বস্তুতঃ সব সাধনাই অনন্ত প্রেমে আপন সার্থকতা খুঁজে পায়। শ্রীচৈতন্য সেই অনন্ত প্রেমেরই প্রতীক।

শ্রীচৈতন্যজীবনের প্রথম চব্বিশবৎসরের ইতিহাসে একটি জ্ঞানদৃপ্ত প্রখরবুদ্ধিশালী যুবকের নবদ্বীপ পণ্ডিতসমাজে প্রবল আত্ম-প্রতিষ্ঠার কাহিনী। বাইরের এই প্রবল বিতর্ক-পরায়ণতার অন্তরালে ভক্তির নিঃশব্দ ফল্গুস্রোত তখনো আত্মপ্রকাশ করে নি। অথচ জগতের ইতিহাসে এমনি ঘটেছে বারম্বার। বিশুষ্ক বৈশাখের শেষে অশ্রান্ত শ্রাবণের মতো সব বিচার-বিতর্ক একদিন হৃদয়ের উত্তালতরঙ্গে বিপুল বন্যার পলিমাটি রেখে যায় মানবহৃদয়-প্রান্তে। বুদ্ধের নির্বাণসাধনার কঠোর জ্ঞানমার্গ কখন মানবকরুণায় বিগলিত হয়ে সাহিত্যে, শিল্পে, সেবাধর্মে শতধারে উৎসারিত। ফরাসী-বিপ্লবের শাণিত ব্যঙ্গ ও প্রখর যুক্তির পরে দেখা দিল রোমান্টিসিজ্‌মের উধাও স্বপ্নচারণ—য়ুরোপের সমস্ত আকাশে তার মুক্তিবার্তা ছড়িয়ে পড়লো। ফল্গুতীরে গয়াধামে বিষ্ণু-পাদপদ্ম-মন্দিরে পণ্ডিত বিশ্বম্ভর রূপান্তরিত হলেন প্রেমিক বিশ্বম্ভরে। তারও দু'হাজার বছর আগে এই ফল্গুতীরেই ধ্যানমগ্ন শাক্যসিংহ নির্বাণের সত্য-লাভ করেছিলেন। ভারত-সংস্কৃতির দুটি দিগন্ত এই গয়াধামে সম্মিলিত।

চৈতন্যজীবনের দ্বিতীয়ার্ধে পরমসত্যের অন্বেষণে চরম আত্মত্যাগের আদর্শস্থাপনের অমৃতকাহিনী। অধ্যাপক বিশ্বম্ভর কেবল মৌখিক সিদ্ধান্তে তুষ্ট না থেকে সত্যলাভের জন্য প্রথমে অধ্যাপনা, পরে পত্নী ও জননীর

সান্নিধ্য ত্যাগ করে পরিপূর্ণ সন্ন্যাসের পথে যাত্রা করলেন। হয়তো তাঁর অধ্যাপকজীবনও এইভাবেই সম্পূর্ণতা লাভ করলো। সাধারণ পুথিবদ্ধ পাণ্ডিত্যের দাস না হয়ে তিনি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণনির্দেশক হয়ে উঠলেন। নবদ্বীপের সীমাবদ্ধ পণ্ডিতসমাজ থেকে দীন-দুঃখী, পাপীতাপী, হিন্দুমুসলমান—সর্বশ্রেণীর মানবের হৃদয়পদ্ম-উন্মোচনই তাঁর ব্রত হল। সীমায়িত সংসার-ত্যাগ আসলে সমগ্র মানব-সমাজের বিশ্বরূপে পরমসত্যদর্শনের সহায়ক হয়ে উঠল। সবচেয়ে বড়ো ভালোবাসা সব-চেয়ে বড়ো আত্মদানের দাবীতে তাঁকে নীলাচলে প্রতিষ্ঠিত করল

চৈতন্যজীবনের এই শেষার্ধের প্রথম দিকটি কেটেছে গৌড়, দাক্ষিণাত্য আর কাশী-বৃন্দাবন-অঞ্চলে পরিক্রমায়। শেষ বারো বৎসরে তাঁর দিব্যোন্মাদ-অবস্থা—কবি বিদ্যা-পতির ভাষায় "অনুখন মাধব মাধব সুমরই সুন্দরী ভেলী মাধাই"—অনুক্ষণ রাধাভাবে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণতন্ময়া শ্রীরাধিকায় পরিণত। মহাকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতা-মৃতে'র অমৃত অংশ এই শেষ বারো বৎসরের বর্ণনায়

সন্ন্যাসের পরেও তাঁর বিচার-প্রবণতার নিদর্শন মেলে বাসুদেব সার্বভৌম, রায় রামানন্দ, প্রকাশানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে আলোচনায়। কিন্তু ক্রমে সব বাইরের কলরব স্তব্ধ হয়ে অন্তরময় পরমানুভবের অমৃত-আস্বাদনে তিনি ডুবে যেতে লাগলেন। ভক্তিসাধনার পরম গভীরে কখন এই কৃষ্ণতন্ময় সাধক দেহসত্তা অতিক্রম করে মহাভাবে বিলীন হয়ে গেছেন, তার ঘটনাগত বিবরণ একান্ত অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানেই শ্রেষ্ঠ চৈতন্যজীবনীকারেরা বর্জন করে গেছেন। বাস্তবিক সমগ্র চৈতন্যজীবনের ক্রমবিকাশ ভাব-কল্পনাময় একটি দিব্যব্যক্তিত্বের অনন্তলীলাসমুদ্রে আত্মনিমজ্জনের কাহিনী। পরমসত্যের সঙ্গে এই একাত্ম হওয়ার সাধনাই ভারতবর্ষের অন্তরতম সাধনা।

বস্তুবিজ্ঞানের লক্ষ্য 'পাওয়া', অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের সার্থকতা 'হওয়া'। শ্রীচৈতন্য, তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ভারতের অগণনসাধকেরা সেই 'হওয়া'র আদর্শের চিরপথিক। তাঁদের মধ্যেও শ্রীচৈতন্যের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, যে প্রেম মানবচৈতন্যের মধ্যবিন্দু, সে প্রেমকে তিনিই সবচেয়ে বেশী রূপান্তরিত করেছেন তাঁর রাধা-ভাবের নিত্যবৃন্দাবনে। কবির কল্পনা, যোগীর ধ্যান, জ্ঞানীর জিজ্ঞাসা শ্রীচৈতন্যের ব্যাকুলতা, বেদনা ও মহাভাবে ভগবৎপ্রেমের যে পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়েছে, তার যথার্থ উপমা পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রোদয়ে। কবি কর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নামকরণটি ইতিহাস ও কবিকল্পনার বিচারে সম্পূর্ণ সার্থক।

তবু যাঁরা শুধুমাত্র ভাবতন্ময় মাধুর্যরসের উপাসক শ্রীচৈতন্যকেই অনুধ্যান করে থাকেন, তাঁরা এই মহামানবের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় থেকে বঞ্চিত থাকেন সন্দেহ নেই। এই মাধুর্য-তন্ময়তায় তাঁর অনন্য-সিদ্ধির কথা মনে রেখেও বলা চলে ওই দীর্ঘ গৌরকান্তি অখিলরসামৃত-মূর্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আর একটি রূপ ছিল—যেখানে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন রুদ্র-তেজে দীপ্ত, যে বৈরাগ্যের নির্মায়া সাধনায় সামান্যতম স্খলনেরও মার্জনা অভাবিত, ভক্তি-ধর্মপ্রচারে আন্তরিক ব্যাকুলতায় যেখানে তিনি শাস্ত্রদর্শী বিচারধর্মী প্রচারক। তিনি মহাযোগী, মহাজ্ঞানী, মহাপ্রেমিক—সেইসঙ্গে মহাকর্মী। তাঁর দাক্ষিণাত্য, বারাণসী, বৃন্দাবন-পরিক্রমা এই কর্মযোগেরই বহিঃপ্রকাশ। নীলাচলে অনুক্ষণ ভাব-তন্ময়তার মধ্যে থেকেও স্বরূপ-

দামোদর, রূপ গোস্বামী, রঘুনাথ দাস—এমনি আরো অসংখ্য ভক্তমণ্ডলীর জীবনাদর্শ তিনি যেভাবে গড়ে তুলছিলেন, মানবকল্যাণের জন্য তাই তো শ্রেষ্ঠ কর্ম-সাধনা।

সুলতান আমলের বাংলাদেশে যে অধ্যাপক রাজশক্তির ভ্রূকুটিকে অনায়াসে উপেক্ষা করে নবদ্বীপের রাজপথে মানুষের ধর্মাচরণের স্বাধীন অধিকার ঘোষণা করেছিলেন, যিনি জগাই-মাধাইয়ের ঔদ্ধত্যে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে কঠোর শাস্তিবিধানের অভিজ্ঞতাকে হৃদয়-রূপান্তরের করুণাধারায় বিগলিত করেছিলেন, সংসারসুখের সহস্র সম্ভাবনাকে অনায়াসে তুচ্ছ করে যিনি বিশ্ববাসীর কল্যাণে 'আপনি আচরি ধর্ম' জীবকে শিখিয়েছিলেন, অনন্তকরুণাময় হয়েও যিনি পরমস্নেহভাজন ভক্ত ছোট হরিদাসের স্ত্রী-সম্ভাষণকে মুহূর্তের জন্যও ক্ষমা করেন নি, স্বয়ং নিঃসম্বল সন্ন্যাসী হয়েও যিনি রাজচক্রবর্তীর দর্শনপ্রার্থনাকে অনায়াসে অস্বীকার করেছেন—সেই বজ্রাদপি কঠোর পুরুষসিংহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে কেবল মধুর রসের কোমলমূর্তি মনে করার কোন কারণই নেই।

চৈতন্যচরিত্রের অন্তরালে এই বজ্রদৃঢ় নিরাসক্তির আদর্শ ছিল বলেই তাঁর গোপী-প্রেমতন্ময়তা ভাববিলাসের উপকরণ না হয়ে, শ্রীরাধার বিরহতন্ময় প্রেমের অনন্ত সত্যকে আমাদের চিরকালের উত্তরাধিকাররূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জীবনের পরম আদর্শের সঙ্গে একাত্ম-তন্ময়তা এবং সমস্ত অন্যায় ও দুর্বলতার সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম—চৈতন্যচরিত্রের দুটি মূল উপাদান। সে আদর্শ আমাদের জাতীয়-জীবনকে পবিত্রতায়, বৈরাগ্যে, অটুট সঙ্কল্পে ও অনন্ত প্রেমের সংরাগে ধারণ করে আছে এবং থাকবে।

"ঈশ্বর অনন্ত হউন আর যত বড় হউন,—তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ভিতরের সারবস্তু মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে ও আসে। তিনি অবতার হয়ে থাকেন, এটি উপমা দিয়ে বুঝান যায় না। অনুভব হওয়া চাই।…প্রেম ভক্তি শিখাবার জন্য ঈশ্বর মানুষ দেহ ধারণ করে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

মহাত্মা কবীর ও ধর্মসমন্বয়

স্বামী অমৃতত্বানন্দ

পুণ্যভূমি ভারতের ইতিহাসে একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যে, যখনই ভারতের ধর্ম এক প্রবল প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইয়া সমূহ বিপদের আবর্তে পতিত হয়, তখনই ভারতের প্রান্তে প্রান্তে ক্ষণজন্মা এমন কয়েকজনের আবির্ভাব ঘটে যাঁহাদের জীবন-সাধনার পবিত্র প্রভাবে সমস্যাপরিবৃত ভারতের ধর্মসাধনা শুধু যে কেবল বিপদ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয় তাহা নহে, অধিকন্তু প্রতিবার প্রত্যেক বাধাকে অতিক্রম করিয়া ভারতীয় ধর্মসাধনা অধিকতর পূর্ণরূপ ধারণ করিয়া থাকে ও প্রতিপক্ষী ধর্ম-দেশনার সারটুকু গ্রহণ করিয়া আপনার ধর্মচেতনাকে আরো যুগোপযোগী, আরো সুদৃঢ় মহান করিয়া তোলে। কখনও বিদেশাগত জাতিকে আত্মসাৎ করিয়া স্বাঙ্গীভূত করিয়া লয়—কখনও বা জাতি-বিশেষের পণ্ডিতগণকে আপনার জ্ঞান-ধর্ম-দর্শন-সম্পদে পূর্ণ শ্রদ্ধাবান করিয়া তাহাদের দেশের ভাবধারার উপর আপনার প্রবল অপ্রতিরোধ্য প্রভাব অলক্ষ্যে বিস্তার করিবার যন্ত্রস্বরূপ করিয়া লয়। বস্তুতঃ ভারত একটি ভৌগোলিক অবস্থান নহে—ভারত সমগ্র মানবজাতির ধর্মীয় চেতনার বাস্তবায়িত প্রতিমূর্তি। তাই এই পুণ্যক্ষেত্রে সমগ্র মানবজাতির আচরিত ধর্মের অতি প্রাগৈতিহাসিক বিশ্বাসসমূহ হইতে আরম্ভ করিয়া অত্যাধুনিক নবতম রূপটির পর্যন্ত বিবর্তনের সকল স্তরের চিহ্ন পাওয়া যাইবে।

মধ্যযুগে যখন দীন্ দীন্ গর্জনে তুর্ক-আরব-পাঠান-মোগলের আক্রমণ বন্যাধারার মত ভারতকে প্লাবিত মজ্জিত করিতেছিল—ইসলামের প্রবল বিধর্ম-বিদ্বেষ সমগ্র দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি-ধর্মকে নিষ্পিষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল তখন ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দক্ষিণের রামানুজ-রামদাস, পাঞ্জাবের নানক প্রমুখ গুরুগণ, উত্তরপ্রদেশের কবীর-দাদূ, বাংলার শ্রীচৈতন্যদেব-নিত্যানন্দ আগে-পিছে আবির্ভূত হইয়া জাতিকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। নতুবা অধ্যাত্ম-ভারতের চিহ্নমাত্র থাকিত কিনা সন্দেহ! এই সকল ভক্তি-ধর্মান্দোলনের একটি ফলিতরূপ এই যে, উহা আরব-তুর্ক-পাঠান-মোগল-বাহিত ধর্মকে ও সভ্যতাকে প্রতিহত করিয়া সনাতন ধর্ম ও চরিতধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে—নবাগত ধর্মের মধ্যে আপনার ধর্ম-নিহিত ভাবরাশি অজ্ঞাতে প্রবিষ্ট করাইয়া সংমিশ্রিত নবীন ধারার প্রবর্তনও করিয়াছে—আবার সনাতন ধর্মের অন্তর্গত পরস্পর পার্থক্যদর্শী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যেও এক যোগসূত্র স্থাপিত করিয়াছে। একই ঈশ্বর বিভিন্ন তাঁহার নাম। যিনি রাম তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই আবার অলখ নিরঞ্জন—নির্গুণ। কবীরের রাম দ্বন্দ্বাতীত, দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণ, ত্রিগুণরহিত ও অপরংপারপুরুষোত্তম—দাশরথি নন।

মধ্যযুগীয় এই ভক্তিপ্রেমধর্মের ফলে শাস্ত্রীয় আচারনিষ্ঠ ধর্মদ্বয় আপনাদের বৈধী অংশ পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরকে প্রেমের দ্বারা পাইতে চাহিল। তাহারই ফলশ্রুতি সূফী ধর্ম, কালান্দার সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় ও কবীর দাদূ-রুইদাসের ভক্তিধর্ম। দ্বিতীয়তঃ, ইহার দ্বারা মুসলমান ও হিন্দু সন্তদিগের দৃষ্টান্তে ধর্মদ্বয়ের মধ্যে একটি সমন্বয়ের আন্তরিক অনুপ্রেরণা সেই যুগকে সংস্কৃতিবান ও সমৃদ্ধ করিয়াছে। এই

প্রচেষ্টার বলিষ্ঠ প্রবক্তা সন্ত কবীর ও শিখধর্ম-স্রষ্টা গুরু নানক। অবশ্য মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনেও ভক্তের জাতিভেদ মানা হয় নাই এবং 'আচণ্ডালে কোল' দিবার কথা আছে। কিন্তু কবীর দাদূ প্রভৃতি সন্তগণ যেইভাবে জাতিপাঁতি, শাস্ত্র অধ্যয়ন, তীর্থযাত্রা, মূর্তিপূজা ইত্যাদি বর্জন করিয়া ইসলামের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইয়াছিল রামানন্দ বা শ্রীচৈতন্যদেব ততখানি অগ্রসর হইতে পারে নাই। মনে হয়, মধ্যযুগের কবীর যেন ধর্মসংস্কারে এই যুগের রামমোহনের ভূমিকা লইয়াছিলেন এবং তিনি যেন নবাগত ভাববন্যার বাঁধ-স্বরূপ হইলেন—আর মহাপ্রভু তাঁহারই সমসাময়িক কালে বিশ্বজনীন প্রেমধর্মের অনাবিল সৌন্দর্য ঈশ্বরপ্রেম-প্রবাহে সমুন্নীত করিয়া ধরিলেন।

মহাত্মা কবীর যতখানি উদারতার সহিত দুই পরস্পর আচারে বিপরীত ও প্রতিস্পর্ধী ভাবধারাকে সমন্বিত করিতে চাহিয়াছিলেন সেইযুগে ততখানি উদারতা কেবল যে আশা করা যায় না, তাহা নহে সেই যুগের ধর্মীয় বিদ্বেষের পটভূমিকায় তাহা একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কারণ মুসলমান বাদশাহ্-গণের ইসলাম ধর্মপ্রসারের অত্যধিক উদগ্র সক্রিয় বাসনা হিন্দুদিগকে নিপীড়িত করিয়া প্রতিনিয়তই হিন্দুমানসকে দূরে ঠেলিয়া দিতেছিল; হিন্দুও বিজিত বিপিষ্ট ও হৃতমান হইয়া বহিরাগত জাতির সহিত ধর্মকে এক করিয়া উভয়কেই ঘৃণিত ও অস্পৃশ্য করিয়া রাখিল। দুই ধর্মের বাহিক আচার-অর্চার এত অধিক পার্থক্য যে কেহই আচারের আবেষ্টনী অতিক্রম করিয়া অন্তর্নিহিত সত্যকে দেখিবার ধৈর্যটুকুও ধরিতে চাহিল না। সামান্য যে কয়জন দুইটি ধর্মের আন্তরিক মৌল সত্তার মিল পাইলেন, মূর্খসাধারণ ও রাজন্যবর্গ তাঁহাদের নিপীড়িত ও নিহত করিতে অগ্রসর হইলেন। ঈশ্বর-দত্ত বিশেষ শক্তিসম্পন্ন যাঁহারা তাঁহারা পূজিত হইলেন; কিন্তু তৎপ্রদর্শিত সাধন মার্গ জাতি বরণ করিল না।

মুসলমানগণ তখন রাজা—হিন্দুগণ প্রজা; বিধানানুসারে মুসলমান রাষ্ট্রে বিধর্মীগণ সাধারণ মুসলমান প্রজা অপেক্ষা নিম্নস্তরের প্রজা। কারণ তাহারা জিম্মি।[১] কোন কোন ধার্মিক মৌলবী, যেহেতু মুসলমান রাজগণ সমগ্র দেশকে মুসলমান করিতে সচেষ্ট হইয়া মৃত্যু অথবা জিজিয়া কর প্রদান এতদুভয়ের মধ্যে একতরকে গ্রহণ করিবার আইন জারি করিয়াছেন, সেই হেতু এই বলিয়া খেদ প্রকাশ করিয়াছেন যে 'মৃত্যু অথবা ইসলাম গ্রহণ' এতদুভয়ের মধ্যে একটিকে গ্রহণ করিবার আইন প্রচলিত না করিয়া মুসলমান রাজগণ ন্যায়কার্য করেন নাই। মুসলমান রাজগণও হিন্দুমন্দির ধ্বংস, বিগ্রহ ভঙ্গ, ব্রাহ্মণের উপবীত ছিঁড়িয়া দেওয়া, বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা ইত্যাদি ইত্যাদি নিপীড়ন করিতে ক্লান্তি বোধ করেন নাই।[২] এইরূপ সময়েই মুসলমান জোলার ঘরে কবীরের মতন সন্তের আবির্ভাব ঈশ্বর-প্রকল্পিত বলিয়াই বোধ হয়।

মহাত্মা কবীরের জন্ম সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত। জন্ম যেইখানে যেইভাবেই হউক না কেন তাঁহার যে জীবন-সাধনা উত্তরকালে হিন্দু ও মুসলমানকে দক্ষিণে ও বামে ধারণ করিয়া দুইএর মধ্যে মিলনসূত্র বন্ধন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল, তাহাই অনুধ্যানের। গরীব জোলা পিতামাতা—নিরু ও নিমা; জাতিতে মুসলমান হইলেও তাহারা কয়েক পুরুষ পূর্বে নাথপন্থী যোগী ছিলেন। সুতরাং কবীর যেই পরিবেশের মাধ্যমে সংসারকে, ধর্মকে জানিয়া-

---

১. The Delhi Sultanate, page 617-18.
২. Ibid page 620.

ছিলেন সেই পরিবেশেই উভয় ধর্মের মিলনসূত্রের তুলাটুকু তিনি পাইয়াছিলেন—তাহাই তাঁহাকে উভয় ধর্মের প্রতি সমশ্রদ্ধ হইতে সাহায্য করিয়াছিল।

নাথযোগিগণ বেদ-ব্রাহ্মণ মানিতেন না জাতিভেদ, মূর্তিপূজা, বাহ্যিক আচার-বিচার তাঁহারা হেয় জ্ঞান করিতেন। স্মরণ রাখিতে হইবে ভারতে মুসলমান আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে নাথসম্প্রদায়ের আদিগুরু মীননাথের আবির্ভাব। মনে হয়, বেদ, ব্রাহ্মণ ও জাতি-ধর্মে অশ্রদ্ধাসম্পন্ন সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের ও তন্ত্রের সংমিশ্রণে ভারতের সুপ্রাচীন যোগমার্গই এক ভাবে নাথসম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল। নাথ-মতে মোক্ষলাভ জীবের উদ্দেশ্য হইলেও, সিদ্ধি বা বিভূতি লাভ করিয়া এই মরণশীল দেহকেই সাধনদ্বারা দীর্ঘজীবী করিয়া জীবন্মুক্তি লাভ করা অধিকতর স্পৃহণীয়। নাথযোগীরা হঠযোগী—কায়াসাধনের দ্বারাই তাঁহারা মহাজ্ঞান লাভ করিতে প্রয়াসী হইতেন। [৩]সূর্য—প্রাণবায়ু, চন্দ্র—অপানবায়ু; এই দুইয়ের যোগ অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা বায়ুনিরোধই হঠযোগ। আবার সূর্য অর্থাৎ ঈড়া, চন্দ্র—পিঙ্গলা এই উভয়কে রুদ্ধ করিয়া সুষুম্নার মধ্য দিয়া প্রাণবায়ু-প্রবাহই এই সাধনার মূল।

হকারঃ কথিতঃ সূর্যষ্ঠকারশ্চন্দ্র উচ্যতে।
সূর্যশ্চন্দ্রমসোর্যোগাৎ হঠযোগো নিগদ্যতে॥
—সিদ্ধসিদ্ধান্ত।

তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান বা মহাজ্ঞান লাভ করিতে 'খেচরী' মুদ্রার সাহায্য লইতেন। জিহ্বাকে কণ্ঠ-কূপে প্রসারিত করিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা রহিত হইয়া অমৃতের আস্বাদকেই শিবশক্তির মিলন বলিতেন। পিণ্ডতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, কায়াসাধন, উন্মনীভাব, বিমনসাভাব প্রভৃতি নাথদের বিশেষ সংজ্ঞা। নাথস্বরূপ অর্থে তাঁহারা সগুণনির্গুণাতীত দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিত অবস্থাকে বুঝাইয়া থাকেন। এই অবস্থাকে বুঝান যায় না বলিয়া তাঁহারা এই অবস্থাকে 'নির্ণাম', 'অনাম' প্রভৃতি সংজ্ঞা দিয়াছেন। কবীরের বহু দোঁহায় এই সকল সংজ্ঞা ব্যবহৃত হইয়াছে এবং যোগিগণের বাঞ্ছিত ভাবধারাই তাঁহার সরল গ্রাম্য ভাষায় অপূর্ব ভাবগম্ভীরতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। হঠযোগে অভিজ্ঞ গুরুর সান্নিধ্য ও কুশল নির্দেশ একান্ত প্রয়োজন—এই জন্য গুরুবাদের উপর যোগপন্থীদের মধ্যে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। মহাত্মা কবীরও গুরুবাদের উপর সমধিক জোর দিয়াছেন।

যাহাই হউক, কবীর আপন পারিবারিক পরি-বেশের মধ্যে সহজভাবে আপনার মনের অনুকূল ভাবধারা পাইয়াছিলেন। ইহার সহিত দাক্ষিণ ভারতের ভক্তিবাদ শ্রীরামানুজ-শিষ্য রামানন্দের মাধ্যমে তাঁহাতে আসিয়া এক অভিনব রূপলাভ করিল। মহাত্মা রামানুজাচার্য হইতে ও গোঁড়া শাস্ত্রীয় কৌলিন্য হইতে শ্রীরামানন্দ যতখানি দূরে সরিয়া আসিলেন—কবীর রামানন্দ হইতে আরো অধিক দূরে সরিয়া আসিয়া ভক্তিধারাকে বিশ্বজনীন করিতে চাহিলেন। রামানুজাচার্য যে প্রেমসম্পদে বলীয়ান হইয়া আপনার গুরুর নির্দেশ লঙ্ঘন করিয়া গূঢ়মন্ত্র সাধারণ্যে প্রচার করিলেন, সেই প্রেম-সম্পদে আত্মহারা রামানন্দ জাতিপাতির গণ্ডী অস্বীকার করিয়া ভক্তিধর্মের আঙ্গিনায় অচণ্ডালে স্থান দিলেন—কিন্তু বিধর্মী যবনকেও তিনি আপনার ক্ষেমংকর নামধর্মে বরণ করিতে চাহিতেন কিনা সন্দেহ। এই জন্যই যবন কবীরকে ছলনার আশ্রয়ে রামানন্দের নিকট হইতে মন্ত্রলাভ করিতে হইয়াছে। তাহাকে দীক্ষাদাম বলা যায় কি-না তাহা তর্কের বিষয়—কিন্তু রামানন্দে

৩ তুলনীয় প্রশ্নোপনিষৎ।

যাহার সূচনা কবীরে তাহারই প্রবল প্রকাশ। কবীর যেন বিশ্বম্ভর মূর্তি ধরিয়া সকল মানবকে বিশ্বপ্রভুর প্রাঙ্গণে মিলাইয়া মিশাইয়া এক করিতে চাহিলেন। কবীরের পারিবারিক বিশ্বাস, মুসলমান সংস্কৃতি ও ভক্তিধর্মে স্বীয় জীবনানুভূতি এই তিনটি কারণেই তাঁহাকে তাঁহার গুরু অপেক্ষা অধিক সার্বজনীন ও উদার হইতে সাহায্য করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

সেই সময়ের ভারতীয় ধর্মসাধনায় যে কয়টি বিশেষত্ব যুগধারাকে বিশেষিত করিয়াছিল তাহা কবীরের সাধনায় সম্যকরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। যথা, (১) সম্প্রদায়-হীনতা, (২) ভক্তিই মুক্তির একমাত্র সাধন, (৩) চিন্তায় অর্চনায় অবাধ স্বাধীনতা, (৪) প্রচলিত শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের গণ্ডীবদ্ধ জীবনের প্রতি প্রচণ্ড অনীহা, (৫) গুরুবাদ; সর্বশেষে (৬) ঈশ্বরের একত্ব উপলব্ধিতে বহুদেববাদ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। অদ্বয় চরম সত্য ব্রহ্মকেই রাম, কৃষ্ণ, শিব, আল্লা ইত্যাদ নামে বিভিন্ন সম্প্রদায় পূজা উপাসনা স্তুতি করিতে শিখিয়াছিল। তাই দেখি কবীরের ঈশ্বর অমূর্ত অদ্বৈত ব্রহ্ম। রাম তাঁহার নাম। তাঁহার নাম লওয়া উচিত নয় কেননা তাহাতে তাঁহাকে ভিন্ন মনে হইতে পারে। তিনি নির্গুণ—আবার সগুণ-নির্গুণাতীত সত্যস্বরূপ। তিনি শিব, 'পরমাত্মা জীবমহলে অতিথি'। তিনি 'অলখ নিরঞ্জন—অবিগত অকল অনুপম'—দ্বন্দ্বাতীত, পক্ষাতীত, দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণ, ত্রিগুণরহিত, অপরংপার পুরুষোত্তম। তিনি প্রভু সাহেব সাঁই; তিনি প্রিয়, ননদের ভাই—তিনি 'অবিনাশী দুল্‌হা'; কত নাম, কত সোহাগ-বিগলিত বর্ণনা কবীরের দোঁহাবলীকে সরস মধুর করিয়াছে। আবার অপর দিকে এই সৃষ্টিউত্তীর্ণ সত্তাই বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত—আধার সত্তা। তিনি আছেন অন্তরে বাহিরে। যত নরনারী তাঁহারই রূপ।...ভাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড · ঘটে ঘটে প্রভু বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাকেই ব্যক্তিভাব আরোপ করিয়া কবীরের সাধনা, তথাপি ঈশ্বরের সাকার মূর্তির প্রতি কবীর অনুরক্ত নন। এইখানেই কবীরের যোগীজনোচিত দৃষ্টিভঙ্গিমার সম্যক্ পরিচয়। তাঁহার সাধনা 'অহং'-লোপের সাধনা।

মুরলীর ধ্বনি শুনিয়া তাই তাঁহার প্রাণ জীবন্ত থাকিয়াই মরিয়া যায়। প্রেমাভক্তির সহায়ে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলনই কবীরের কাম্য। কিন্তু যে দিব্যভাব সহায়ে সাধক পরমাত্মাকে চিন্ময়রূপে দর্শন-স্পর্শন ও লীলা-আস্বাদন করিয়া বিভোর হইয়া থাকিতে চাহেন, কবীরের প্রেম তাহা নহে। যদিও সাকারকে তিনি স্বীকার করিয়াছেন—বলিয়াছেন—'সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ'। সাকার বলিতে তিনি আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত বিরাট মূর্তিকেই বুঝাইয়াছেন—কারণ মূর্তিপূজায় ঘোরতর আপত্তি তাঁহার ছিল। যদি ঈশ্বরের চিন্ময় বিগ্রহ দর্শনাকাঙ্ক্ষা তাঁহার থাকিত তবে প্রতিমা গড়িয়া পূজাকে, দেবস্থানকে তিনি এত নির্মমভাবে শ্লেষবিদ্ধ করিতেন না।

'যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা; যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য; যিনি ঈশ্বর ব'লে গোচর হন তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন। যে জেনেছে সে দেখে যে, তিনিই সব হয়েছেন—বাপ, মা, ছেলে, প্রতিবেশী, জীবজন্তু ভালমন্দ শুচি-অশুচি সমস্ত।' শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্য-লীলার এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দৃষ্টি কবীরের দোঁহাতে পরিস্ফুট। তিনি বলিতেছেন—

• Ibid page 547.

সন্তো, ধোখা কাসূঁ কহিয়ে।
গুণমেঁ নিরগুন, নিরগুণমেঁ গুন, বাট ছাড়ি
কুঁ্য বহিয়ে।
অজরা-অমর কথৈ সব কোঈ অলখ ন
কথনা জাঈ।
জাতি-স্বরূপ-বরণ নহি জাকে ঘাটি ঘাটি
রহ্যো সমাঈ।
প্যণ্ড ব্রহ্মণ্ড কথৈ সব কোঈ বাঁকৈ আদি
অরু অন্ত ন হোঈ।
প্যণ্ড-ব্রহ্মণ্ড ছাঁড়িজে কহিয়ে কহৈ কবীর
হরি সোঈ॥

'সন্ত কাকে বলব ধোঁকার কথা। গুণের মধ্যে নির্গুণ, নির্গুণের মধ্যে গুন এই পথ ছেড়ে লোকে কেন বাইরে যায়। সবাই বলে তিনি অজর অমর। কিন্তু তিনি যে অলখ এবং অবর্ণনীয়। তাঁর জাতি নেই, স্বরূপ সেই, বর্ণ নেই কিন্তু ঘটে ঘটে তিনি প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছেন। সবাই বলে পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডের কথা। কিন্তু তাঁর আদিও নেই অন্তও নেই। যিনি পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড ছড়িয়ে রয়েছেন, কবীর বলছে তিনিই হরি।'

আজন্ম যোগী পরিবেশ ও ঐস্লামিক চিন্তার প্রভাবেই যে কবীরকে চিন্ময় বিগ্রহে অনন্তরক্ত ও পূজাদিতে বীতশ্রদ্ধ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কবীর যাহা পারেন নাই, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে তাহাই পূর্ণ মহিমায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহারা যুগোপযোগী ধর্মসাধনার পথনির্দেশ রাখিলেন—কিন্তু ঈশ্বরোপলব্ধির যুগযুগবাহিত বহুতর পথনির্দেশকে সমশ্রদ্ধায় বরণ করিলেন না। প্রয়োজন ছিল এমন একটি পূর্ণ আবির্ভাবের যাঁহার মাধ্যমে সকল ভাবধারার সকল পথের পূর্ণ স্বীকৃতি আপনার সাধনা ও উপলব্ধিতে ঘটিবে। শ্রীরামকৃষ্ণই সেই বহু-বাঞ্ছিত পূর্ণ আবির্ভাব। উত্তরোত্তর কালের আবির্ভাব পূর্ব পূর্ব কালের ভাবধারার সহিত যুক্ত হইতে হইতে ক্রমশঃ পূর্ণ পূর্ণতর হইতে থাকে। কোন ভাবধারার প্রবল প্রকাশ আকস্মিক হয় না। উক্ত ভাবধারার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু প্রকাশ কিছুকাল ধরিয়া বিভিন্ন স্থানে হইতে থাকে, পরে একসময় তাহার আর অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু উহা তখন মনের গভীরে ক্রিয়াশীল হইতে থাকে। অবশেষে বহিরাগত কোন বাধার সম্মুখীন হইলে জাতির চৈতন্য সঙ্কুচিত হইয়া একান্ত অজ্ঞাতসারে অবচেতনে বর্ধিত সেই ভাবধারাই প্রবল বেগ প্রাপ্ত হইয়া উচ্ছ্বাসে উদ্দামে দশদিক ধাবিত করিয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে। ঠিক এইভাবে মধ্যযুগব্যাপী ধর্মসংস্কারের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা জাতির অন্তরের গভীরে একটা মহা উত্থানের গতিবেগ সঞ্চয় করিতেছিল। কিন্তু আধুনিক যুগপ্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বকালে তাহা অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে বণিকসভ্যতা ও খৃষ্টধর্মের প্রভাবে অবচেতনে চালিত সেই শক্তি অপূর্ব আবির্ভাবে ফাটিয়া পড়িল। তাই বর্তমান কালের এই আবির্ভাব এত পূর্ণ ও বহু ভাবধারার মূর্ত বিগ্রহস্বরূপ। মধ্যযুগের ধর্মসমন্বয়-প্রচেষ্টাই যে বর্তমান প্রকাশের কারণ তাহা অনস্বীকার্য। তাই কবীর যে পূর্ণতার প্রচেষ্টা-স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ তাহারই পূর্ণ বিগ্রহস্বরূপ।

মহাপুরুষগণ যুগচিন্তার অসামঞ্জস্য ও অপূর্ণতাকে দূর করিতে আবির্ভূত হন। মনে হয়, মধ্যযুগের পরস্পর-প্রতিস্পর্ধী ধর্মদ্বয়ের বিরোধের কারণ তাহাদের আচার-অর্চার একান্ত বৈপরীত্য। এই বিপরীত অংশগুলি ত্যাগ করিলে ধর্মের মূলগত চিরন্তন সত্তা যে একই, তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইবে, ফলে পরস্পরের বিদ্বেষবুদ্ধি তিরোহিত হইবে—এই বিশ্বাস ও অনুভূতি তৎকালীন মহামনা সাধকদের অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। কার্যতঃ তাহা

আংশিক সফলতা লাভ করিলেও ধর্মদ্বয়ের সমগ্র স্তরকে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। কারণ এই ধর্মান্দোলনের ফলে ধর্মভীরু সাধারণ মানব পরস্পরের ধর্মকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছিল এবং মুসলমান রাজশাসকদের কাফের নিধনকল্পে উদ্যত শাণিত করবাল সংযত করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। তাহারই ফলে, আওরঙ্গজীব ব্যতীত সকল মোগল বাদশাহ্‌গণ ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতে বিরত ছিলেন এবং সম্রাট আকবর এই আদর্শকেই হিন্দু-মুসলমান-সংহতির জন্য তাঁহার রাষ্ট্রনীতির মূল উপাদান হিসাবে গ্রহণ করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু উভয় ধর্মের গোঁড়াপন্থীগণ এই ধারাকে স্বাগত ত জানানই নাই উপরন্তু ইহাকে তাঁহাদের অভীষ্টলাভের একান্ত অন্তরায় বিবেচনা করিয়া এই ধারায় বিশ্বাসী জনগণকে সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় করিয়া রাখিলেন। এই কারণে এই সকল সন্তগণ সম্প্রদায়গঠনের একান্ত বিরোধী হইলেও ইহাদের অনুবর্তী ভক্তগণ দৃঢ়সংবদ্ধ সম্প্রদায় গঠন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আবার কালক্রমে গোঁড়াপন্থীগণ তাহাদের অতি উদার মত গ্রহণ করিলেও ঐ সকল সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য-সূচক কতকগুলি মতবাদ বর্জন করিতে হইল। এই কারণে মহাত্মা শ্রীচৈতন্য যে উদারতা লইয়া আচণ্ডাল-যবনকে আপনার ধর্মভুক্ত করিলেন —সেই উদারতা বহুকাল পূর্বেই বিসর্জিত হইয়াছিল।[৫]

মধ্যযুগের সমন্বয়প্রচেষ্টা যে সর্বাংশে সার্থক ছিল না—তাহা বর্তমান যুগ-প্রচেষ্টার নিরিখে বুঝিতে পারা যায়। এই কারণেও মধ্যযুগের মিলন-প্রয়াস সম্যক্ সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও সাধনালোকে ঐ প্রচেষ্টার অসম্পূর্ণতা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। আত্মার প্রকাশ যেমন শরীরে ও মনে, কোন ধর্মের ভাববিশেষের প্রকাশও তেমনি কতকগুলি আচারে ও রীতিনীতিতে নির্ভরশীল। আচার-বিচারের কঠিন নির্দেশের অন্তরালে ধর্মবিশেষের কোমল ভাবধারা কূর্মের কঠিন আবরণের অন্তরালে অবস্থিত কোমল প্রত্যঙ্গাদির ন্যায় রক্ষিত হয়। বস্তুতঃপক্ষে ভাববিশেষের বিকাশ ও কল্যাণকর প্রভাব জন-মানসে দৃঢ়-মুদ্রিত করিবার জন্যই ধর্মীয় পূজা-উৎসব, দেব-মন্দির ইত্যাদির ও বিশেষ বিশেষ আচার-পদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছে। ঐগুলিকে অনাবশ্যক বোধে বাদ দিলে এককালে দেখা যাইবে, জাতি-বিশেষের বিশিষ্ট ভাবধারারও বিলোপ ঘটিতেছে। মুসলমানদিগের আপন গোষ্ঠীর মধ্যে যে সৌভ্রাতৃত্ব তাহা সম্মিলিত নামাজ পাঠের মাধ্যমে বহুপরিমাণে পরিপুষ্ট। এই প্রথা রহিত করিয়া দিলে এই ভ্রাতৃত্ববন্ধনও হ্রাস পাইবে। সুতরাং কোন ভাবধারাকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে হইলে আঙ্গিকটুকুকেও বরণ করিতে হইবে। কাটিয়া ছাঁটিয়া মিলিত করিলে তাহা আপন আপন ক্ষেত্রবাহিত বৃহত্তর ভাব-পরিমণ্ডলের চিরন্তন প্রাণস্পন্দ হইতে বিচ্যুত হইয়া চীনামাটির ভাসে শোভিত পুষ্পস্তবকের ন্যায় কৃত্রিম হইয়া পড়িবে। New dispensationএ এইরূপ প্রচেষ্টাই হইয়াছিল। উহা কেবল সাহিত্যিক বাক্যবিন্যাস মাত্র। কিন্তু মহাত্মা কবীরে তাহা অনুভূতির প্রগাঢ় গভীরতায় প্রাণময়। তথাপি, আঙ্গিক বর্জনের ফলে তাহা আপামর সাধারণের প্রাণের বস্তু হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাই যে শুভেচ্ছার পারস্পরিক মিলনের প্রথম প্রয়াস কবীর করিয়া-ছিলেন তাহারই সার্থক পরিণতি শ্রীরামকৃষ্ণে। পথ কেবল স্বতন্ত্র।

---

৫ Ibid—page 549.

কবীর একটু বাছিয়া লইতে চাহেন। ভগবান মন্দিরে মসজিদে নাই—জীবের অন্তরে শিব অতিথি।

জো খোদায় মসজিদ্ বসতু হৈ
　　ঔর মুলুক কহিকেরা।
তীরথ মূরত রাম নিবাসী
　　বাহর করে কো হেরা॥[৬]

'খোদা যদি মসজিদেই বাস করেন, তবে বাহিরের মুলুক কাহার? তীর্থে মূর্তিতেই যদি রাম বাস করেন তবে বাহিরকে দেখে কে?'

মন না রঁগায়ে রঁগায়ে জোগী কপড়া।
আসন মারি মন্দিরমেঁ বৈঠে
ব্রহ্ম-ছাড়ি পূজন লাগে পথরা॥[৭] ইত্যাদি

'যোগী, মন না রাঙ্গিয়ে রাঙ্গালি কাপড়। আসন করে বসলি মন্দিরে, ব্রহ্মকে ছেড়ে পুজো করতে লাগলি পাথর। ওরে যোগী, কান ফুটো করলি, জটা রাখলি, আর দাড়ি রেখে হয়ে গেলি ছাগল। জঙ্গলে গিয়ে ধুনি জ্বাললি, যোগীরে, মাথা মুড়ালি রাঙ্গালি কাপড়। কবীর বলছে সাধুরে ভাই শোন্, তোকে ধরে নিয়ে গিয়ে রাখবে যমদরজায়।'

অথবা

　　ন জানে সাহেব কৈসা হৈ!
মুল্লা হোকর বাংগ জো দেবৈ,
　　ক্যা তেরা সাহেব বহরা হৈ।
কীড়ীকে পগ নেবর বাজে
　　সো ভি সাহেব সুনতা হৈ।
মালা ফেরী তিলক লগায়া,
　　লম্বী জটা বঢ়াতা হৈ।
অন্তর তেরে কুফর-কাটারী
　　যোঁ নহিঁ সাহেব মিলতা হৈ॥[৮]

৬, ৭, ৮, ভক্তকবীর—অধ্যাপক উপেন্দ্রকুমার দাস।

'জানি না তোর প্রভু কি রকম। মোল্লা হয়ে যে আজান দিস, তোর প্রভু কি কালা! ক্ষুদ্র কীটের পায়ে নূপুর বাজে তাও প্রভু শুনতে পান। মালা ফিরাচ্ছিস, তিলক কেটেছিস, রেখেছিস লম্বা জটা, ওরে তোর ভেতরে যে রয়েছে অবিশ্বাসের ছুরি, এতে করে প্রভুকে পাওয়া যায় না।'

এই সকল সঙ্গীতের মধ্য দিয়া কবীর সাধককে বাহিরের আচার-অনুষ্ঠান, পরিচ্ছদ-আভরণ, মসজিদ-দেবালয় যে ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে অবাস্তর তাহা বলিয়া সাবধান করিয়া দিতেছেন। বাহিরে ঈশ্বর অন্বেষণা হইতে বিরত থাকিয়া সাধককে অন্তরে আহ্বান করিয়াছেন। ধর্মশাস্ত্রে বারংবার বাহ্যপূজার প্রয়োজনীতা যে কতটুকু ও কি তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। ধর্মের নামে ভণ্ডামিকে সকল মহাপুরুষই তীব্র ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু কবীর প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানকে অবাস্তর বলিয়া বর্জন করিতে সকলকেই নির্দেশ দিয়াছেন– এখানেই তাঁহার আপসহীন যোগীচিত্ত 'অধিকারী-ভেদে ব্যবস্থা-ভেদ'রূপ সত্যটুকু মানিয়া লয় নাই। তিনি হিন্দু পণ্ডিত ও পাড়েজীকে ও মুসলমান মোল্লা-মৌলবীকে কঠিন ভাষায় সমালোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের গোঁড়ামির জন্য। কিন্তু যে প্রথমাধিকারী উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের নামগুণগান করিয়া সদা সহস্রকামনাতাড়িত চিত্তকে সংযত করিতে চেষ্টা করিতেছে, যে নিরাকার প্রেম-স্বরূপকে ধারণা না করিতে পারিয়া মনোমত প্রতিমাতে জগৎকারণকে চিন্তা করিতে চেষ্টিত, তাহার সহজ সরল ধারণোপযোগী অবলম্বনটুকু কাড়িয়া লইলে সে কোন পথ অবলম্বনে কবীরের ন্যায় মহান্ হইতে পারিবে? কবীরের নির্দেশিত পন্থা সকলের উপযোগী হইতে পারে না। সুতরাং এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে

মনে হয়, যুগপ্রয়োজনেই মহাত্মা কবীর ঐরূপ কাটিয়া ছাঁটিয়া দুইটি ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যের ঐক্য দেখাইয়া ধর্মদ্বয়ের অনুসরণকারীদের বিদ্বেষ প্রশমিত করিতে সাহায্য করিয়াছেন।

কবীর যাহা বর্জনকামী, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা শ্রদ্ধার সহিত বরণ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শুধুমাত্র একটি ধর্মমত সাধনের দ্বারা এই সত্য-লাভ করিলেন না—বহু সাধনার দ্বারা গবেষকের দৃষ্টি লইয়া স্বীয় জীবনে তাহাদের প্রয়োগ ও ফলাফল হইতে এই সত্যে উপনীত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্মসমন্বয়ের অর্থ এই নয় যে, ধর্মসকলের অন্তর্গূঢ় সত্যকে লইয়া বাকী অংশ পরিত্যাগ করা বা দার্শনিক বিচারের দ্বারা বহুতর মত বিশেষের সার সংকলন করিয়া মত-বিশেষের প্রতিষ্ঠা করা। সমন্বয় জীবন-সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। উহা কোন মতবাদ নয়, পরন্তু মানব চরিত্র-ধারাকে শ্রদ্ধার সহিত মানিয়া লইয়া মানুষের ব্যক্তিগত সংস্কার ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সাধনমার্গে চলিতে চলিতে এককালে মানুষ সত্যলাভ করিবেই—এই দৃঢ় বিশ্বাসই সমন্বয়ের প্রাণ। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ কোন সাধন-ধারাকে হেয়জ্ঞান করেন নাই, তাহা সংস্কৃত মনের নিকট যতই বিকৃত রুচির পরিচায়ক বলিয়া বোধ হউক না কেন—কেবল ঐ সকল সাধনানুষ্ঠানের মূল প্রেরণা অকৃত্রিম ঈশ্বরানুরাগ-প্রসূত হওয়া চাই। সকল ধর্মমত পরমেশ্বরের ইচ্ছাসৃষ্ট বলিয়া তিনি সকল মতাবলম্বীকে শ্রদ্ধা করিতেন ও উৎসাহ দিতেন। মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ যেন সহস্র মণিদীপ্ত সহস্র প্রকোষ্ঠ-বিশিষ্ট ভাবময় অট্টালিকা আর কবীর তাহারই একখানি প্রকোষ্ঠ। বস্তুতঃ সমগ্র পৃথিবীর ভাবরাশিকে একটি আধারে প্রকাশিত করিবার জন্যই যেন মহামায়া স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ-শরীরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

কবীর যে বেদনা লইয়া তৎকালীন মানবকে পারস্পরিক ধর্মে শ্রদ্ধালু হইতে আহ্বান জানাইলেন—তাহা যুগান্তরের জন্য সঞ্চিত হইয়া রহিল। যখনই ধর্মান্ধ মানব অপরের ধর্মের উপর অবিচার, বিদ্বেষ, আপনার সত্যধর্মের নামে করিতে উদ্যত হয় তখনই এই মহামানবের সকল ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠানের প্রতি কঠিন শ্লেষবাণী সকল সম্প্রদায়ের উপর কুলিশ-কঠোরতা ধ্বনিত হইয়া ওঠে। যে সম্প্রদায়হীন ধর্মের বীজ তিনি বপন করিয়া গিয়াছেন তাহা ধীরে ধীরে কাজ করিতেছে। পৃথিবীতে এমন দিন আসিবে কিনা জানি না, যেদিন সত্য ন্যায় প্রীতি ঈশ্বর-প্রেম সকল জীবনের আচরিত সত্য হইবে—ধর্ম-সম্প্রদায় সেদিন থাকিবে না। যদি কোন দিন সেই দিন আসে, তবে কবীরই সেইদিনের প্রথম না হইলেও অন্যতম আহ্বায়ক। কবীরের সম্প্রদায়হীন ধর্মমত মানবজীবনের পূর্ণাদর্শ। তাই যে দিন বাদশাহ্ সিকান্দর লোদীর সামনে উভয় ধর্মের প্রধানগণ কবীরের বিরুদ্ধে নালিশ লইয়া উপস্থিত সেইদিন ঈশ্বরপ্রেমিক সাধক মিলনের পূজারী আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—'হায়, ঈশ্বরের মহান সিংহাসনে তোমাদের মিলিবার স্থান হইল না—প্রেমে তোমরা মিলিত হইলে না। আর মানুষের ক্ষুদ্র সিংহাসনের নীচে বিদ্বেষে তোমরা মিলিত হইলে?—কবীর ত মিলনই চাহিয়াছিল।'

(ক্রমশঃ)

কেদার-বদ্রী দর্শন

স্বামী অমলানন্দ

জয় কেদার!

উত্তরাখণ্ডের মহাতীর্থ কেদারনাথের দুর্গম যাত্রাপথে যাত্রীদের দেখা হলে বাবা কেদারনাথের জয়ধ্বনি করেই তারা পরস্পরকে অভিবাদন করে। ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, এই পথে সকলে সমান। কেউ হয়ত লক্ষপতি, কেউ পথের ভিখারী; কেউ বিদ্বান, কেউ মূর্খ; কেউ জ্ঞান-ভক্তির অধিকারী শান্ত, দান্ত, উপরত ও তিতিক্ষাবান সন্ন্যাসী—কেউ আবার জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন—সাধারণ মানুষ—তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না। এ পথে সকলেই পরম আত্মীয়—সকলেই বাবা কেদারনাথের কৃপাপ্রার্থী। "মাতা মে পার্বতীদেবী, পিতা দেবো মহেশ্বরঃ" —আর "বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ"—সকলের অন্তরে এই চিন্তা, এই ভাবনা। একের দুঃখে অপরে দুঃখী—একের আনন্দে অন্যে আনন্দিত। কেউ এসেছেন গুজরাট বা রাজপুতানা থেকে, কেউ বা দক্ষিণ ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে —কেউ বা বাংলা থেকে, আবার কেউ বা পাঞ্জাব, হিমাচলপ্রদেশ বা উত্তরপ্রদেশ থেকে; একজনের ভাষা আর একজন বোঝেন না; কিন্তু মুখের ভাষা ছাড়াও মানুষের আর একটি ভাষা আছে, তারই পরিচয় বেশী মেলে এই পথে। এ পথে যখন পরস্পরের দেখা হয় তখন একজন পিপাসার্ত হলে অন্যে বুঝতে পারে, তার কমণ্ডলু বা ওয়াটার-পটের মুখ খুলে যায়। একজন অসুস্থ হলে অন্যজন এগিয়ে আসে—একান্ত আপনজনের মত তার সহানুভূতিভরা মন নিয়ে; ঔষধ, পথ্য, সেবা যতটুকু তার সামর্থ্য আছে তা দিয়ে নিরাময় করে তোলার জন্য।

কেদারের তীর্থপথে ভারতবর্ষকে নূতন করে দেখার সুযোগ মেলে। খণ্ড, ছিন্ন, শতসমস্যা-জর্জরিত ভারতবর্ষ এখানে অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন, আনন্দোজ্জ্বল। এখানে প্রাদেশিকতা নেই, ভাষাসমস্যা নেই—হিমালয়ের পথে মনের উদারতা ও বিশালতা যেন স্বতই এসে হাজির হয়। উচ্চ পর্বতচূড়া ও তার চির-শুভ্রবরফরাশির উজ্জ্বল ছটায় মনের সকল সংকীর্ণতা, সকল মালিন্য ধীরে ধীরে দূর হয়ে যায়। অল্পপরিসর পার্বত্যপথে যাত্রীরা যখন ধীরে ধীরে উঠতে থাকে তখন একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষই একসঙ্গে সারিবদ্ধ হয়ে চলেছে! নগাধিরাজ হিমালয়কে পটভূমি করে বাংলা ও গুজরাট, হিমাচল ও অন্ধ্র, পাঞ্জাব ও উড়িষ্যা, কেরল ও আসাম এক অঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সাধনা ভারতবর্ষের জীবনধারার বৈশিষ্ট্য। এখানে এলে তার আভাস স্বতই এসে যায়, আর মনে হয় সে ঐক্যের ভিত্তিভূমি হল ভারতের ধর্ম-জীবন, ভারতের আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিক ভারতের সনাতন শাশ্বত রূপ যা যুগযুগান্ত ধরে চিরভাস্বর হয়ে আছে তা যদি দেখতে হয়—তবে চলে আসুন হিমালয়ের পরমতীর্থ কেদার-নাথ ও বদ্রীনাথে।

কিন্তু কেদারযাত্রার পথে কিছু পরিশ্রম কিছু অসুবিধা আছে। ভারতবর্ষের সমতলভূমির অন্যান্য তীর্থপথে তীর্থযাত্রীর আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য যে সকল ব্যবস্থা সম্ভব তা এখানে

সম্ভব নয়। পথ অনেকক্ষেত্রে বন্ধুর ও বিপজ্জনক —পাহাড়ের গায়ে মাত্র চার-পাঁচ ফুট চওড়া পথ—নীচে হাজার ফুট গর্ত। এছাড়া আছে চড়াই ও উৎরাই—আগের থেকে যদিও তা অনেক কম। অবশ্য ঘোড়া, কাণ্ডি বা ডাণ্ডি নিতে পারেন। কিন্তু হাঁটার চেয়ে এগুলি স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। খাওয়া-দাওয়ারও কষ্ট কিছু আছে। দুর্গম পার্বত্যপ্রদেশে সমতলভূমির খাদ্যসম্ভার পাওয়া দুর্লভ। বিশেষ করে বাঙ্গালীরা, পঞ্চাশ না হলেও পঞ্চব্যঞ্জনে যাদের আবাল্য অভ্যাস—তাঁরা এখানে একটি ব্যঞ্জন যদি পান তবে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতে পারেন ডাল ও রুটি পাওয়া যাবে। ভাতও পাওয়া যাবে—কিন্তু যে পরিমাণে এরা সবজি বা ডালে মীরচা (লঙ্কা) প্রয়োগ করে তা সমতলের অধিবাসীদের হজমশক্তির বাইরে।

কিন্তু সব অসুবিধাই আপনার সহ্য হয়ে যাবে যদি শুধু একটা কথা মনে থাকে, সেটি হল আপনি তীর্থযাত্রী আপনি শুধু দেশ-পর্যটক নন।

কেদার ও বদ্রীদর্শনের যাঁরা অভিলাষী তাঁরা প্রথমে যান কেদারনাথে, পরে বদ্রীনাথে। হিমালয়ের দুটি গিরিশৃঙ্গে এই দুটি মহাতীর্থ। সঙ্গে রয়েছেন সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গার দুটি উৎস-ধারা—মন্দাকিনী ও অলকানন্দা। গঙ্গা শুধু নদী বা জলধারা নয়—ভারতবর্ষের প্রাণধারা, ভারতবর্ষের জীবনের সঙ্গে গঙ্গা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ভারতের সভ্যতা, ভারতের ধর্ম, ভারতের ঐহিক সম্পদ সকলই পুষ্ট হয়েছে এই ভগবতী গঙ্গার কল্যাণধারায়। জীবনে-মরণে তাই গঙ্গা ভারতবাসীর অন্তরের নিধি ভারতের মহাতীর্থগুলি একে একে আলো করে আছে গঙ্গার তীর। গঙ্গার তীরেই কাশী, গঙ্গার তীরেই প্রয়াগ। গঙ্গার তীরে সাধকের সাধনপীঠ, অবতারের লীলাস্থান। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী বাজে, নবদ্বীপে নিমাইয়ের লীলাখেলা; বর্তমান যুগেও দেখি অবতার-বরিষ্ঠের সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বর আর স্বামীজীর যুগধর্ম প্রবর্তনের প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠ গঙ্গারই তীরে। মহাদেবের জটাজাল হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরগুলির মধ্য থেকে ভারতবর্ষের এই প্রাণ-ধারা বিভিন্ন উৎসমুখে সমতলবাসী মানুষের কাছে ধরা দিয়েছে; আর সেই উৎসমুখে সৃষ্ট হয়েছে হিমালয়ের মহাতীর্থগুলি। তাই দেখতে পাই মন্দাকিনীর উৎসমুখে কেদারনাথ আর অলকানন্দার উৎসমুখে বদ্রীনারায়ণ।

হৃষীকেশ থেকেই উত্তরাখণ্ডের তীর্থযাত্রা আরম্ভ হয়। হৃষীকেশের একটু আগে কনখল ও হরিদ্বার। কনখল-হরিদ্বার-হৃষীকেশ হিমালয় ও সমতলের মিলনকেন্দ্র; স্বর্গ ও মর্ত্যভূমির মিলনকেন্দ্র। কত পবিত্র আখ্যায়িকা শুনেছি এই কয়েকটি স্থান সম্বন্ধে। হরিদ্বার স্টেশনের দক্ষিণে অদূরে সতীতীর্থ কনখল। দক্ষ প্রজাপতির ব্যাকুল প্রার্থনা পূর্ণ করতে মহামায়া সতীর এইখানে জন্ম। আবার দক্ষরাজার অবহেলায়—শিবহীন যজ্ঞে পতিনিন্দা শ্রবণে সতীর দেহত্যাগ এই কনখলে। হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান সর্বভারতীয় নরনারীর একটি পরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। বার বছর অন্তর এখানে পূর্ণ কুম্ভ অনুষ্ঠিত হয়; ভারতের সমস্ত সাধুসমাজ এখানে বার বছর অন্তর সমবেত হন। যুগা-বতারের যুগধর্ম নরনারায়ণ-সেবার মহাকেন্দ্র কনখল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, মায়াক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী মায়াদেবী, বিল্বকেশর মহাদেব, মনসা-পাহাড় ও চণ্ডীর পাহাড় প্রভৃতি দর্শনের জন্য ভক্তজনের ভীড় লেগেই আছে। মাত্র চৌদ্দ মাইল উত্তরে হৃষীকেশ—পবিত্র আবহাওয়া

চারিদিকে। সাধু-সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশ—হর-হর-মহাদেব-ধ্বনি, ছত্র আর গঙ্গা মনকে আপনা-আপনি শান্ত করে আনে। নীলধারা গঙ্গা আর হিমালয় এখানে যে শোভা বিস্তার করে আছে তা সত্যিই অপূর্ব—সমতলের মানুষ এখানে এলে এক স্বর্গীয় আনন্দের আভাস পায়, তাইত এ-স্থানের নাম স্বর্গদ্বার।

কনখল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের গুরু-জনদের আশীর্বাদ নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু। উনিশে মে (১৯৬০) বাবা বদ্রীবিশাল ও কেদারনাথের জয়ধ্বনি দিয়ে হৃষীকেশ থেকে আমাদের বাস ছাড়লো ভোর রাতের আঁধারের মধ্যে। প্রায় দু'মাইল পরে বাস থামলো লছমন ঝোলায়;—ফার্ষ্ট গেট অর্থাৎ সকালবেলার যত বাস সব এখানে একত্র হবে। এদিকে সূর্যের প্রথম রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়। নগাধিরাজের মাথায় সোনার মুকুট। একটু আগে যে পৃথিবীতে ছিলাম তা থেকে অন্য পৃথিবীতে আমরা চলে এসেছি। আঁধার থেকে আলোতে। মৃত্যুলোক থেকে অমৃত-লোকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সরকারী অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণাদি যা যা করণীয় তা সব সমাধা করে বাস ছাড়লো। আমাদের আগে ও পিছনে কিছু কমবেশী কুড়িখানা বাস। এদের কিছু যাবে কেদারনাথের পথে গুপ্তকাশী পর্যন্ত—যেমন আমাদেরটি, আর কিছু যাবে যোশীমঠ—বদ্রীনাথের পথে। প্রতি বাসে প্রায় পঁয়ত্রিশ জন করে যাত্রী। পাহাড়ের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে গঙ্গার তীরে তীরে আঁকাবাঁকা সরু পথে সারিবদ্ধ বাসগুলি ছুটেছে। একদিকে পাহাড়ের গায়ে শাল-পাইনের বন চলে গেছে অনেক দূর; কোথাও বা পটে আঁকা ছবির মত দু'চারটা কুটীর ও মন্দির। মুহূর্তে মুহূর্তে দৃশ্য পরিবর্তিত হচ্ছে—বাসগুলি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে—সীমিত সময়ে নির্ধারিত দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে। তার আগে কারুর থামার সময় নেই এবং উপায়ও নেই। থামতে হলে সবাইকে একসঙ্গে থামতে হবে, ছুটতে হলে সকলকে একসঙ্গে ছুটতে হবে।

গঙ্গার অপর তীর দিয়ে দু'চারজন পথিক পায়ে হেঁটে চলেছেন। এই পায়ে-হাঁটা পথে কয়েক বছর আগেও সকল তীর্থযাত্রী দলে দলে হেঁটে চলতেন। সেদিনকার পথশ্রম, ব্যাধির প্রকোপ, বন্যজন্তু বা বিষধর সর্পের আক্রমণ, খাওয়া-থাকার শত-অসুবিধা সবকিছু তুচ্ছ করে তীর্থযাত্রী এগিয়ে চলতেন পরম ঈপ্সিতের সন্ধানে। এ যাত্রা কবে আরম্ভ হয়েছিল ইতিহাস সে কথা বলতে অক্ষম। দ্বাপর ও ত্রেতার পদধ্বনি এই পথে একসঙ্গে মিশে আছে—দ্বাপরের মহাভারত ও ত্রেতার রামায়ণ হিমালয়ের পথে পথে তার স্মৃতিচিহ্ন রেখে গেছে প্রভূত পরিমাণে। হরিদ্বারের ভীমগোড়া, বদ্রীনাথের পথে বিষ্ণুপ্রয়াগ, পাণ্ডুকেশ্বর, কর্ণপ্রয়াগ নামগুলি মহাভারতীয় যুগের অমর স্বাক্ষর—আর হৃষীকেশে ভরতজীর মন্দির, মুনিকী রেতীর শত্রুঘ্নজীর মন্দির, লছমন-ঝোলার লক্ষ্মণমন্দির, কেদারের পথে রামপুর, রামওয়াড়া, বদ্রীনাথের নিকটবর্তী হনুমানচটি—ত্রেতাযুগের কথা আমাদের মনে পড়িয়ে দেয়। আর সকল যুগের সকল মতের সাধক এসেছেন এই মহাতীর্থে। আচার্য শঙ্কর, রামানুজ, গুরু নানক, কবীর, মহাবীর, দীপঙ্কর, তুকারাম; কত মহামানবের পাদস্পর্শে এ পথের প্রতি ধূলিকণা পবিত্র হয়ে আছে।

এই সকল ভাবতে ভাবতে আমরা প্রায় ৪৪ মাইল দূরে দেবপ্রয়াগে এসে গেছি। অলকানন্দা এখানে মিলিত হয়েছেন গঙ্গার সঙ্গে।

পথে এরকম আরও চারটি সঙ্গম বা প্রয়াগ পাব—রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ ও বিষ্ণু-প্রয়াগ। কথিত আছে, দেবপ্রয়াগে শ্রীরামচন্দ্র পিতৃতর্পণ করেছিলেন। গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থলে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির-সহ ঘরবাড়ীগুলি অপূর্ব শোভা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে বাসগুলি বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না। তাই যাত্রীদের এই সঙ্গমস্থলে যাওয়ার সুযোগ নেই। সামান্য কিছুক্ষণ বিরতির পর আবার বাসগুলি যাত্রা শুরু করে। এবার আমাদের গন্তব্যস্থল শ্রীনগর। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বুঝতে পারলাম শ্রীনগর সত্যিই শ্রীসম্পন্ন। কত রকমের তরি-তরকারি—বাগান, গমের ক্ষেত, আমের বাগান, রাস্তার ধারে ধারে সাজানো রয়েছে। ইংরেজরা আসার পূর্বে শ্রীনগর গাড়োয়াল রাজ্যের রাজধানী ও অতি সমৃদ্ধিশালী শহর ছিল। এখনও ব্যবসা-বাণিজ্যে শহরটির খুব প্রাধান্য রয়েছে। এখানকার কমলেশ্বর মহা-দেবের মন্দির ও তৎসংলগ্ন কমলেশ্বর মঠ অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ।

শ্রীনগর থেকে আঠারো মাইল দূরে রুদ্র-প্রয়াগ। রুদ্রপ্রয়াগ শুধু দুটি নদী অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম নয়, দুটি পথেরও সঙ্গম। একটি গেছে কেদার, মন্দাকিনীর তীরে তীরে—আর একটি বদ্রীনাথ, অলকানন্দার তীরে তীরে। এখানে বাস থামলো অনেকক্ষণ, যাত্রীরা মধ্যাহ্নের স্নান ও আহার করবেন। আমরা উভয় নদীর মিলনস্থলে স্বচ্ছ ও শীতল জলধারায় স্নান করলাম। স্নানের পর আহার। ধীরে ধীরে আমরা যে সমতল থেকে দূরে চলে যাচ্ছি তার পরিচয় পেলাম আহার্যবস্তুর স্বল্পতায় আর দামের দিক দিয়ে তো বটেই। 'চাওল' (ভাত), ডাল, একপ্রস্থ সবজি দিয়ে আমরা মধ্যাহ্ন আহার সমাপন করলাম। তারপর বাস ছাড়লো ছুটোয়। একটি বড় সেতু পার হয়ে কেদারের বাসগুলি গুপ্তকাশীর পথ ধরে এবং অন্যান্যগুলি চলে যায় বদ্রীনাথের পথে যোশীমঠ। আমরা যে সেতুটি পার হলাম তার গঠনকৌশল অনেকটা লছমনঝোলার মতো। এতক্ষণ আমরা চলছিলাম পূর্বমুখে—এখন চলেছি উত্তরমুখে। ঐ পথে অনেকগুলি সম্পন্ন চটি আছে—তার মধ্যে অগস্ত্যমুনি ও কুণ্ডা চটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে চব্বিশ মাইল এসে আমাদের গাড়ী গুপ্তকাশীতে যখন থামলো তখন ঘড়িতে চারটা বেজে গেছে।

আমরা মালপত্র নামাতে ব্যস্ত। এমন সময় কেদারনাথের পাণ্ডা মহাদেবপ্রসাদের এক ভ্রাতা এসে আমাদের কুশল প্রশ্ন করলেন—বাংলায়। তাঁর একজন চেনা কুলি রামলাল মালগুলি নিয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চললো বাবা কালীকম্বলীর ছত্রে। মনে মনে সেই মহান-হৃদয় মহাপুরুষকে প্রণতি জানালাম—যিনি কপর্দক-শূন্য সন্ন্যাসী হয়েও তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য হিমালয়ের দুর্গমতর তীর্থে তীর্থে ধর্মশালা স্থাপন করে গেছেন। যাত্রীর অসম্ভব ভীড়—তা সত্ত্বেও আমরা দোতলায় একটি হলবারান্দায়—স্থান পেয়ে গেলাম। একটু পরেই ঘর বারান্দা ভর্তি হয়ে গেল—ছত্র যেন উপছিয়ে পড়ছে—ঘর থেকে বারান্দা, বারান্দা থেকে প্রাঙ্গণে। ছত্রের প্রাঙ্গণে উন্মুক্ত আকাশ, আকাশের তলায় শতাধিক যাত্রী।

পরের দিন সূর্যগ্রহণ। আমরা গুপ্তকাশীতে এই দিনটি থেকে গেলাম। এখানে বিশ্বনাথের ও অর্ধনারীশ্বরের মন্দির বিশেষ দ্রষ্টব্য। কালীকম্বলীর ছত্রের কাছেই এই মন্দির। মন্দিরের চত্বরের মধ্যে একটি কুণ্ড আছে—দুটি জলধারা তাতে অবিরাম পড়ছে। পাণ্ডাজী বললেন এই জল আসছে গঙ্গোত্রী এবং

যমুনোত্রী থেকে। কুণ্ডে স্নান করে যাত্রীরা বিশ্বনাথ দর্শন করেন। মন্দিরের পরিবেশটি অতি সুন্দর। প্রবাদ আছে, পাণ্ডবেরা এখানে এসে বিশ্বনাথের পূজা অর্চনা করেছিলেন।

কেদারের পথে গুপ্তকাশী অতি প্রাচীন কাল থেকে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বাস আসার পর সে প্রাধান্য আরও বেড়ে গেছে। এখন হাঁটাপথ এইখানেই শুরু। কাজেই যাত্রীদের বিশ্রাম ও প্রস্তুতির জন্য যা যা প্রয়োজন তার ব্যবস্থা এখানে সবই করতে হয়। কুলির ব্যবস্থা আগে হ'ত হৃষীকেশে বা দেবপ্রয়াগে; এখন গুপ্তকাশীতেই সে ব্যবস্থা। কুলির এজেন্টস্ আছে—তারাই ব্যবস্থা করে দেয়। কেজি হিসাবে মজুরি—প্রতি কেজিতে সওয়া টাকা। এছাড়া যাদের কাণ্ডি, ডাণ্ডি বা ঘোড়ার দরকার তাদেরও ঐগুলি সংগ্রহ করতে হয় এইখানে। অবশ্য মাঝপথে বিশেষতঃ গৌরীকুণ্ড বা রামবাড়াতেও পাওয়া যায়। তবে সেখানে দাম একটু বেশী। যাঁদের হাঁটার অসুবিধে আছে তাঁরাই কাণ্ডি ইত্যাদি করেন। কাণ্ডি এক রকম বেতের চেয়ার—একজন নিয়ে যায়। আর ডাণ্ডি হল এক রকম খোলা হাল্কা পাল্কীর মত; সাধারণতঃ ৪ জন কুলি লাগে। কিন্তু যাত্রী বা যাত্রিণী যদি একটু স্থুলবপু হন এবং সাধারণতঃ হয়েই থাকেন—তখন ৬ জন কুলি অবশ্যই লাগে।

মন্দাকিনীর অপর পারে অন্য একটি গিরি-চূড়ায় উখীমঠ। গুপ্তকাশী থেকে ছবির মত দেখায়। বাণ রাজার কন্যা উষার নামানুসারে উখীমঠের নাম। এখানে কেদারের পূজারী (রাওল) বাস করেন। এখান থেকেই শীতকালে কেদারনাথের উদ্দেশ্যে পূজা হয়।

শুক্রবার ২০শে মে গেল সূর্যগ্রহণ। আমরা ২১শে শনিবার হাঁটাপথে রওনা হলাম। আমরা দলে ছিলাম ৫ জন; রেঙ্গুন সোসাইটির স্বামী স্বানন্দ, স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ, কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমের স্বামী স্কন্দানন্দ ও লেখক এবং কোয়েম্বাটুর রামকৃষ্ণমিশন রুর‍্যাল কলেজের অধ্যাপক পি. রঙ্গস্বামী। অধ্যাপক রঙ্গস্বামী কিছুদিন আগে আমেরিকা ঘুরে এসেছেন। খুব ভোর ভোর আমরা রওনা হলাম। ভোরের হিমেল বাতাস বেশ লাগছে; রাস্তাও ভাল। দু-মাইল দূরে নালা-চটি পার হয়ে গেলাম। অদূরে একটি ছোট মন্দির ও তাকে কেন্দ্র করে একটি ছোট গ্রাম—কিন্তু কি সুন্দর! আমরা নারায়ণকোটি চটি পার হলাম। তারপর উৎরাই—অনেকটা নামার পর ভিয়াঙ্গ চটি; দোকানের সামনে শতরঞ্জি পাতা। না, কোন উৎসব বা কোন সভার ব্যাপার নয়। যাত্রীরা চা খাবেন। শতরঞ্জিগুলি আমাদের সাদর আহ্বান জানাল; আমরা এখানে চা খেয়ে নিলাম। কিন্তু তারপর চড়াই। যতটা নেমে-ছিলাম ততটা উঠতেই হবে। কিন্তু মনে হল তার থেকে অনেক বেশী উঠছি। উঠছি ত উঠছিই—পাহাড়ী পথে চড়াই-এর এই প্রথম অভিজ্ঞতা একটু অপ্রত্যাশিত। গাইড বুক বা ভ্রমণকাহিনী কোথাও এই ভিয়াঙ্গের চড়াইয়ের কথা লেখেনি। মনে মনে তখনই ভাবলাম যদি সুযোগ পাই তবে এই ভিয়াঙ্গের চড়াইএর কথা সকলকে সবিস্তারে জানাব। ফিরতি মুখে কয়েকজন বৃদ্ধা এই ভিয়াঙ্গেই জিজ্ঞাসা কর-ছিলেন—কেদারের যে খাড়া চড়াইএর কথা-শুনেছি, সে কি বাবা এইখানে? না, এর থেকেও খাড়া চড়াই আছে? উত্তর দিয়েছিলাম, বুড়ীমা ভয় পাবেন না—ধীরে ধীরে যান। বাবা কেদারনাথের নামে সব ভয় দূর হয়ে যাবে। ভিয়াঙ্গের পর এলাম মৈখণ্ডাতে। মহামায়া

এখানে মহিষাসুরকে খণ্ডিত করেছিলেন—তাই এ স্থানের নাম মৈখণ্ডা। ছোট্ট মন্দিরে মহিষমর্দিনীর মূর্তি। স্থানটি অপেক্ষাকৃত উঁচু। নীচের চাষের খেত ও গ্রামের কুটিরগুলি অতি সুন্দর দেখাচ্ছে। আমরা এগিয়ে চলেছি উঁচু-নীচু রাস্তা দিয়ে কখনও গ্রামের কুটিরের পাশ দিয়ে কখনও গ্রামের ক্ষেতের পাশ দিয়ে। হঠাৎ কয়েকটি ছোট ছেলে ও মেয়ে ঘিরে দাঁড়াল—এ শেঠজি, সুই দে, তাগা দে। সুচ ও সুতো চাই। প্রস্তুত ছিলাম। সুচ ও সুতো পকেটেই ছিল, সেগুলি তাদের একে একে দিয়ে দিলাম। কী তৃপ্তি তাদের চোখে মুখে! অবাক হলাম তাদের সুশ্রী চেহারা দেখে। মহামায়ার লীলানিকেতন এই হিমালয়ের সবই আশ্চর্য! কালো ছেঁড়া কম্বলের জামাকাপড়ের বদলে উপযুক্ত কাপড়জামা যদি পরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে ঐ গরীব ছেলেমেয়েদের মধ্য থেকে দু-হাতওয়ালা মা-দুর্গা অনেকগুলি বেরিয়ে পড়বে।

[ক্রমশঃ]

শ্রীরামকৃষ্ণের বৈষ্ণব সাধনা*

স্বামী নির্বেদানন্দ

তন্ত্রমতের সব সাধনা শেষ করতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রায় তিন বৎসর সময় লাগে। আমরা দেখেছি, এই সাধনার ফলে বহুবিধ ঈশ্বরীয় দর্শন ও উপলব্ধির সম্পদ তিনি লাভ করেছিলেন, যার সামান্য অংশমাত্র পেলেও সাধারণ লোকের মন পরিতৃপ্তিতে ভরে যায়। ভগবদ্-উপলব্ধিলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তবু একবিন্দুও কমল না তাঁর। আধ্যাত্মিক সত্য ও দিব্যানন্দের লক্ষ্যে পৌঁছে তা করায়ত্ত করার জন্য ছোট বড় যত রকমের পথ আছে, তার সবগুলি দিয়েই চলে সেখানে পৌঁছুবার জন্য এই নির্ভীক, অক্লান্ত সত্যান্বেষীটি অস্থির হয়ে উঠলেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হিন্দু ভক্তেরা ভগবানকে যে সব বিভিন্ন রূপের ও ভাবের মাধ্যমে পূজা ও ধ্যান করে থাকে, তার সব-গুলিই উপলব্ধি করে পরিতৃপ্ত হবার জন্য হৃদয়ের অতৃপ্ত ক্ষুধা তাঁকে উত্তেজিত করে চলেছিল।

তন্ত্রমতে সাধনা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব মতের রাজপথ দিয়ে ভগবানের কাছে পৌঁছুবার বাসনা তাঁর মনে প্রবল হয়ে দেখা দিল। যে পরিবারে তাঁর জন্ম, সেখানে রঘুবীরের (বিষ্ণুর এক অবতার) নিত্যসেবা ছিল; সেজন্য ভগবদারাধনার এই পদ্ধতিটির প্রতি শৈশবেই তাঁর অনুরাগ জন্মে। তাছাড়া তান্ত্রিক সাধিকা ও তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সুপ্র-তিষ্ঠিত হলেও তাঁর গুরু ভৈরবী অন্তরে অন্তরে বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। ভৈরবীর ইষ্টও ছিলেন রঘুবীর। রঘুবীরশিলা তাঁর সঙ্গেই থাকত, প্রতিদিন প্রগাঢ় ভক্তিভরে তাঁর পূজা করতেন তিনি। আর, যে মাতৃভাব নিয়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে গোপাল জ্ঞান করে তাঁর প্রতি তদনুরূপ আচরণ করতেন, তা-ও যথার্থ বৈষ্ণব

* লেখকের মূল গ্রন্থ 'Sri Ramakrishna and Spiritual Renaissance' হইতে অনূদিত।

ভাবের অন্তর্ভুক্ত। মনে হয়, এই সব নানা কারণে শ্রীরামকৃষ্ণ বৈষ্ণবমত অবলম্বনে সাধন-পথে চলতে চেয়েছিলেন।

বৈষ্ণবমত হল শুধু ভক্তি বা ভালবাসা নিয়ে সাধন করার পথ। এ পথে ভক্তিশাস্ত্রের বিধানমত ভগবানের প্রতি অতি গভীর ভালবাসার পুষ্টিসাধনের মাধ্যমে ভক্তকে চিত্ত শুদ্ধ করতে শিক্ষা দেওয়া হয়; তারপর এ পথের লক্ষ্যে, শুদ্ধ পরমানন্দময় ঈশ্বরদর্শনে ও ঈশ্বরপ্রেমে মগ্ন হয়ে থাকতে বলা হয় তাকে। এ পথের সাধকরা ব্যক্তিগত অহং-বোধের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসতে চান না; জ্ঞানমার্গীরা যাকে মুক্তি বলেন এবং যাকে সর্ববিধ অধ্যাত্ম-সাধনার পরিপূর্ণতা বলে ভাবেন, ব্যক্তিগত অহং-বোধকে নিঃশেষে মুছে ফেলে সেই নিরাকার স্বরূপের সঙ্গে একেবারে মিশে যেতে চান না তাঁরা।

বৈষ্ণবমতে পরাভক্তির বা ভগবানের প্রতি চরম ভালবাসার পরিসমাপ্তি হল পরাভক্তিতেই। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে এই ভালবাসার উৎস বিদ্যমান; সাধনা মানে হল চিত্তশুদ্ধি সহায়ে এই উৎস-মুখটি শুধু খুলে দেওয়া, আর ইন্দ্রিয়-রাজ্যের বিষয় থেকে ফিরিয়ে এনে সে প্রেম-ধারার মোড় ভগবানের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া। শিক্ষানবীশকে সেজন্য নিয়মিতভাবে বিধিমত পূজা, স্তব, প্রার্থনা, মন্ত্রজপ ও সাকার ঈশ্বরের নিরন্তর ধ্যান সহায়ে ভগবানলাভের জন্য মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলে চিত্ত শুদ্ধ করতে হয়। বৈষ্ণবদের দুটি প্রধান শাখার জনপ্রিয় আদর্শ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্র।

ভগবৎপ্রেমের পরিপুষ্টির জন্য ভগবানের ভেতর কিছুটা মানুষভাব আরোপ করে, এবং ভক্তকে দৈবী-ভাবাপন্ন করে তুলে বৈষ্ণবধর্ম সম্পূর্ণ স্বাভাবিক একটি সাধনপদ্ধতি গড়ে তুলেছে। বৈষ্ণবধর্মমতে ইষ্টকে নিজের মাতা বা পিতা, প্রভু, সখা, সন্তান বা প্রেমাস্পদ বলে ভাবতে হয়; এই ভাবগুলি যথাক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব নামে পরিচিত। আন্তরিকতার সহিত অনুষ্ঠিত হলে এগুলির প্রত্যেকটিই ভক্তকে শান্তিধামে পৌঁছে দিতে সক্ষম।

আমরা দেখে এসেছি, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-শিক্ষা-বিহীন মন মা-কালীকে মাতৃজ্ঞানে ও শ্রীরামচন্দ্রকে নিজ প্রভুজ্ঞানে উপাসনা করে ইতি-পূর্বেই প্রথম দুটি ভাব অবলম্বনে বৈষ্ণবধর্মোক্ত উচ্চাবস্থা লাভ করেছিল। পরবর্তীকালে সখ্য-ভাব সাধনেও তিনি পূর্ণতা লাভ করেন। এখন বৈষ্ণবভাবসাধনার দুটিমাত্র অঙ্গের সাধন তাঁর বাকী ছিল—বাৎসল্যভাবের ও মধুরভাবের। তান্ত্রিক সাধনা শেষ হবার অব্যবহিত পরেই এদুটি ভাবের প্রথমটি অবলম্বনে সাধন করার জন্য আগ্রহান্বিত হলেন তিনি। তাঁর প্রতি ভৈরবীর মাতৃবৎ আচরণই বোধ হয় এর কারণ।

প্রায় এই সময়েই বাৎসল্যভাবে সিদ্ধ জটাধারী নামে একজন পরিব্রাজক সাধু দক্ষিণেশ্বরে আসেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক, নিজ সন্তানজ্ঞানে তাঁর সেবা করতেন। জটাধারীর সঙ্গে রামলালার (বালক রামচন্দ্রের) ধাতুনির্মিত একটি মূর্তি থাকত; মূর্তিটিকে তিনি প্রাণ দিয়ে আদর করতেন, স্নেহভরে খাওয়াতেন, তার সঙ্গে খেলা করতেন, এমনকি রাত্রে তাকে সঙ্গে নিয়ে শয়ন করতেন। দীর্ঘদিন এভাবে সেবা-অভ্যাসের ফলে নিজ অধ্যাত্মসাধনপথের শেষে এসে পৌঁছেছিলেন তিনি; এখন খালি চোখেই সর্বক্ষণ এই দেবশিশুর দর্শন পেয়ে পরমানন্দে বিভোর হয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। জীবন্ত

রামলালা আতুরে ছেলের মত কখনো তাঁর কাছ ছাড়া হত না। তাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ভারতের পবিত্র তীর্থে তীর্থে পর্যটন করে বেড়াচ্ছিলেন; এই পর্যটনের মুখেই দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে থেমে কিছুকাল সেখানে কাটিয়ে যান। জটাধারী তাঁর এই অতীন্দ্রিয় অনুভবের কথা কখনো কাউকে বলেন নাই, এবং জীবনের অতি মহার্ঘ গোপন সম্পদজ্ঞানে হৃদয়ের মণি-কোঠায় তা সঞ্চয় করে রেখেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু অতি স্পষ্টভাবে তাঁর হৃদয়-কন্দর দেখতে পেলেন। তাঁর চোখের সামনে রামলালা ও তার ভক্তপিতার দিব্য লীলার অভিনয় চলতে লাগল, আর সে অভিনয়ের ভাগ্যবান দর্শক হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। রাম-লালার কথাবার্তা, চালচলন, জটাধারীর সঙ্গে তার বালকের মত দুষ্টুমি, এ সবই তিনি প্রতি-দিন লক্ষ্য করতে লাগলেন গভীর মনোযোগ দিয়ে। ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ টের পেলেন, দেব-শিশুটি তাঁর প্রতি দিনে দিনে অধিকতর আকৃষ্ট হচ্ছে, এমনকি জটাধারীর সঙ্গে থাকার চেয়েও তাঁর কাছে থাকতেই তার ভাল লাগছে বেশী।

ফলে রামলালার ওপর তাঁর পিতৃস্নেহ বাঁধনহারা বন্যার মত ভেঙ্গে পড়ল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনিও তাকে আদর করতে, স্নান করাতে, খাওয়াতে ও তার সঙ্গে খেলা করতে শুরু করে দিলেন। এসব এত সহজ হয়ে গিয়েছিল যে, দুষ্টুমি করলে তাকে শাসন করতেও বাধত না তাঁর। অবশ্য এরূপ কঠোর আচরণের পরক্ষণেই অনুতাপে তাঁর বুক ফেটে যেত, আর হৃদয় ভরে উঠত স্নেহের দুলালের প্রতি অনুকম্পায়।

এভাবে, বৈষ্ণব সাধনার যে উচ্চভূমিতে ক্বচিৎ কখনো কেউ উঠতে পারে, শ্রীরামচন্দ্রকে পুত্ররূপে পেয়ে সেই উচ্চভূমিতে অবস্থান করে তিনি আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন। ভগবানের সমস্ত ঐশ্বর্য ভুলে গিয়ে তাঁকে নিজের আদর-যত্ন ও তত্ত্বাবধানের সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী, অসহায় বালক বলে ভাবতে পারেন, এমন লোকের সংখ্যা বাস্তবিকই অতি বিরল। তাঁদের ভেতর আবার হাজারে একজন পারেন এধরনের উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতির অধিকারী হতে। শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয় পূর্ব হতেই ঈশ্বরের প্রতি পরাপ্রেমে পূর্ণ হয়ে ছিল; বাৎসল্যভাবের চরমে উঠতে এখন শুধু তাঁকে পথটা একটু বদলে নিতে হয়েছিল। রামলালা তাঁর এত প্রিয় হয়ে উঠেছিল যে তার মুহূর্তের বিচ্ছেদও অসহ্য হয়ে উঠত তাঁর কাছে। আবার রামলালাও তাঁকে এত ভালবাসত যে কখন তাঁর সঙ্গ ছেড়ে থাকতেই চাইত না। কিছুকাল পরে জটাধারী দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে মনস্থ করলেন। চলে যাবার মুখে রামলালা বায়না ধরে বসল, সে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে থেকে যাবে। জটাধারী ইতিমধ্যে দিব্যানন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন, এবং প্রাণে প্রাণে বুঝেছিলেন যে বাহ্যপূজার প্রয়োজন তাঁর মিটে গেছে। সেজন্য রামলালার এই ইচ্ছা পূরণ করতে একটুও কষ্ট হল না তাঁর। এতদিন ধরে যাঁর জীবন্ত বিগ্রহকে তিনি বুকে ধরে ফিরেছেন, বিদায়কালে সেই রামলালার ধাতুমূর্তিটি শ্রীরামকৃষ্ণকে হাসিমুখে দিয়ে গেলেন তিনি।

কিছুকাল পরে অবশ্য মধুরভাব প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে তাঁর সারা মন দখল করে বসল। প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বিরহের দুর্বিষহ জ্বালায় বিদীর্ণহৃদয়া পুরাণবর্ণিতা গোপীদেরই একজন বলে নিজেকে ভাবতে লাগলেন তিনি। তাঁর হাবভাব সব গোপীদের মতই হয়ে উঠল। কথাবার্তা, বেশভূষা, আচরণ ও চলাফেরায় প্রিয়তমের ঔদাসীন্যে অতিবিধুরা সতী যুবতীর মতই হয়ে উঠলেন তিনি; দিব্যধামবিহারী

প্রেমাস্পদের জন্য উত্তাল প্রেমে প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠলেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু গোপীদের সঙ্গে যেভাবে খেলতেন, তাঁর সঙ্গেও সেই চিরন্তন খেলাই খেলতে লাগলেন—তাঁর মন হরণ করে নিয়ে তাঁকে পাগল করে তুলে, আর নিজে সব সময় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে দূরে দূরে থেকে এই সর্বগ্রাসী ভাবোচ্ছ্বাসের আগুনে ইন্ধন যোগাতে লাগলেন। কৃষ্ণের নিষ্ঠুরতা তাঁকে মর্মাহত করল, গোপীদের মতই হৃদয়ের দুঃসহ ব্যথায় তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। বিরহের জ্বালা অসহ্য হয়ে উঠল, এবং বঞ্চিত প্রেমিকের উন্মাদনায় দিশেহারা হয়ে পড়লেন তিনি; আহারনিদ্রা ত্যাগ করলেন, বহির্জগতের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করলেন, আকুল আবেগে অধীর হয়ে অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে উন্মাদের মত খুঁজে বেড়াতে লাগলেন তাঁর চতুর প্রেমিককে। তীব্র মানসিক বেদনায় ও অত্যধিক দৈহিক কৃচ্ছ্রতায় আবার তাঁর শারীরিক যন্ত্রণাগুলি ফিরে এল। এই নিয়ে তিনবার এরকম হল। সারা শরীর জ্বলে যাওয়া, রোমকূপ দিয়ে রক্ত নির্গত হওয়া, এবং ভাবসমাধিকালে দেহের প্রায় সমস্ত ক্রিয়াই বন্ধ হয়ে যাওয়া, সবই আবার দেখা দিল এবং শরীরের সহ্যশক্তির শেষ সীমায় এনে ফেলল তাঁকে। গোপীদের মধ্যে শ্রীরাধাই মহাভাবের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণের রক্তমাংসের শরীরে এই সময় সেই প্রেমোন্মাদিনী রাধিকার শাস্ত্রবর্ণিত পরিপূর্ণ রূপটি ফুটে উঠেছিল এভাবে।

কৃষ্ণপ্রেমের ব্যর্থতার এই নিদারুণ অগ্নি-পরীক্ষার ভেতর দিয়ে কয়েকমাস চলার পর অবশ্য একদিন তিনি ধন্য হলেন মধুরভাবের অনুপম আদর্শ এবং বৃন্দাবনের গোপীগণশ্রেষ্ঠা যথার্থই ব্রজেশ্বরী শ্রীরাধার দর্শনলাভে। দেহের স্বর্ণকান্তি এবং রূপলাবণ্যের বিভা ছড়িয়ে শ্রীরাধা একদিন তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন, এগিয়ে এসে তাঁর শরীরে মিশে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন তৎক্ষণাৎ। এই দর্শনের পর বহুদিন যাবৎ শ্রীরাধার সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ রয়ে গিয়েছিল। মহাভাবের শারীরিক ও মানসিক সব লক্ষণগুলিই তাঁর ভেতর ফুটে উঠত এই সময়; দেখে ভৈরবী, বৈষ্ণবচরণ ও অন্যান্য পণ্ডিতেরা বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে পড়লেন।

কিছুদিন পরে তাঁর প্রেমের এই মর্মন্তুদ কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটল। একটা পর্দা যেন হঠাৎ সরে গেল, আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মনোহারী মাধুর্য নিয়ে দেখা দিলেন, কাছে এসে শ্রীরাম-কৃষ্ণের শরীরে মিশে গেলেন। তাঁর উন্মত্ত ব্যাকুলতা এতে শান্ত হল, দিব্য আনন্দে হৃদয় ভরপুর হয়ে গেল। এই দর্শনের আনন্দ-শিহরণ তিন মাসকাল তাঁকে বিহ্বল করে রেখেছিল। এ তিনমাস বাহ্যজ্ঞান থাকা বা না থাকা উভয় অবস্থাতেই অন্তরে-বাহিরে সর্বত্র সর্বক্ষণ তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন।

রাধাকান্তের মন্দিরের দালানে বসে ভাগবত-পাঠ শ্রবণকালে একদিন তাঁর বিশেষ অর্থপূর্ণ একটি দর্শন লাভ হয়; ভাবাবস্থায় দেখেন, জ্যোতির্ময়বপু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, আর তাঁর পাদপদ্ম হতে একটি জ্যোতির রেখা নির্গত হয়ে প্রথমে ভাগবত স্পর্শ করল, পরে তাঁর বক্ষ স্পর্শ করে ভাগবত-ভক্ত-ভগবান—এই ত্রয়ীকে কিছুকাল সংযুক্ত করে রেখে দিল। এই দর্শনের ফলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, ভগবান ভক্ত ও ভাগবত এ তিনটি আপাতদৃষ্টিতে পৃথক বলে মনে হলেও মূলতঃ এক—তিনে এক, একে তিন।

যেখানে পৌঁছুলে ভক্ত ভগবানকে প্রেমাস্পদ রূপে পেয়ে তাঁর সঙ্গে চিরতরে মিলিত হবার অপূর্ব উল্লাসের অনুভূতিতে আপ্লুত হয়ে যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ এভাবে বৈষ্ণবশাস্ত্রের সেই শেষ ও দুরধিগম্য শিখরে গিয়ে উঠেছিলেন।

সমালোচনা

যুগনায়ক বিবেকানন্দ [প্রথম খণ্ড: প্রস্তুতি]: স্বামী গম্ভীরানন্দ। প্রকাশক: স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা ৪৬৬+৮; মূল্য সাত টাকা।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে মনুষ্যত্বের নবজাগরণ ঘটেছিল। তাই সে যুগের মহামানবদের নিয়ে সেকালে ও একালে জীবনীসাহিত্যের শাখাটি পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। সাহিত্য, সংগীত বা শিল্পের মূল উৎস মানব-জীবনরহস্য। সে রহস্যের অনুসন্ধানে একাধারে তথ্যসংগ্রহ ও তথ্যবিশ্লেষণ—উভয়ক্ষেত্রেই সমান পারদর্শী, শ্রদ্ধাবান অথচ নিরপেক্ষ একটি মনের প্রয়োজন। অবশ্য, মহত্ত্বের অনুধ্যানই জীবনী-সাহিত্যের আদিপ্রেরণা। তবু, নির্বিশেষ আত্মসমর্পণের চেয়ে বিচারমূলক ভক্তিই জীবনীর আদর্শ।

রামমোহন, মধুসূদন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি দিকপালদের জীবনীরচনায় বিশেষ গোষ্ঠী বা মতবাদের প্রভাবে অতিরঞ্জন এবং ভ্রান্তিবিলাস—দু'য়েরই উদাহরণ মেলে। অনেক ক্ষেত্রেই জীবনীলেখক তাঁর ব্যক্তিগত আদর্শের সীমায় মহিমান্বিতদের আবদ্ধ করতে গিয়ে আলোচ্য জীবনের মূল তাৎপর্যই হারিয়ে ফেলেন—এমন ঘটনাও বিরল নয়। তাছাড়া কুম্ভীলকবৃত্তির প্রেরণায় অপরাপর লেখকের উপাদান ও মননের অননুমোদিত ব্যবহারের দ্বারা নিছক ব্যবসায়গত কারণে সুলভ জীবনীলেখার ঝোঁকও ইদানীং যথেষ্টই চোখে পড়ে। হয়তো, বর্তমান জাতীয় জীবনে বিগত শতাব্দীর মতো সূর্যসঙ্কাশ ব্যক্তিত্বের অভাবই আমাদের জীবনীসাহিত্যের সাম্প্রতিক দুর্দশার কারণ।

তবু মাঝে মাঝে ব্যতিক্রমধর্মী দু'একটি জীবনীগ্রন্থ যথার্থ জীবনীসাহিত্যের আদর্শ নিয়ে আমাদের কাছে আবির্ভূত হয়। প্রেরণা ও পরিশ্রম, শ্রদ্ধা ও সাহিত্যবোধ, আরাধ্য ও আরাধকের মিলিত তন্ময়তায় সে জাতীয় জীবনী পাঠককে আদ্যন্ত নিবিষ্ট রেখেও এক মহত্তর অতৃপ্তির আস্বাদ রেখে যায়, বিপুল বিশ্ব-জীবনের সিংহদুয়ারে দাঁড়িয়ে অনন্তের আহ্বান নিমেষে অন্তর্লোকে সঞ্চারিত হয়। বিবেকানন্দ-জীবনের প্রস্তুতিপর্ব-অবলম্বনে স্বামী গম্ভীরা-নন্দজীর যুগনায়ক বিবেকানন্দ (প্রথম খণ্ড) তেমনি এক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। এই খণ্ডে স্বামীজীর প্রথমবার আমেরিকায় পদার্পণ (২৫শে জুলাই, মঙ্গলবার, ১৮৯৩) অবধি জীবনকাহিনী বিধৃত।

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে এদেশে ও বিদেশে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার যে পুনর্মূল্যায়ন শুরু হয়েছে, তার প্রথম পর্যায়ে রয়েছে বিবেকানন্দ-জীবনের উপাদান-সংগ্রহ। এখনও বিবেকানন্দ-জীবনের অনেক উপাদানই অনাবিষ্কৃত। শ্রীমতী লুই বার্কের Swami Vivekananda in America: New Discoveries গ্রন্থটির প্রেরণায় দেশবিদেশের পুরানো সংবাদপত্রে ছড়ানো বিবেকানন্দ-জীবনের নানা উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে। আশা করা যায়, আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে আরো তথ্য আবিষ্কৃত হবে।

স্বামী গম্ভীরানন্দজী এ পর্যন্ত প্রকাশিত যাবতীয় নূতন ও পুরাতন তথ্যের সমন্বয়ে বিবেকানন্দ-জীবনের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ পরিচয়টি সামগ্রিকভাবে পাঠকদের কাছে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ প্রয়াসের শুভারম্ভ

দেখে পরিণতির নিঃসংশয় সার্থকতার কথা স্বাভাবিকভাবেই মনে জাগে। তবু এই প্রথম খণ্ডটি এককভাবেই সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের উল্লেখ্যতম গ্রন্থ।

ইংরেজী ও বাংলায় বিবেকানন্দের বেশ কয়েকটি জীবনী থাকা সত্ত্বেও ইতস্তত ছড়ানো বিবেকানন্দ-চিন্তার সব কয়টি উপাদানকে সংহত করে তাঁর মধ্যে যুগচিত্তের অভিপ্রায়কে উপলব্ধির প্রচেষ্টায় 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' বিবেকানন্দ-সাহিত্যে পথিকৃৎ। ব্যাপ্তি ও গভীরতার আশ্চর্য সমাবেশে এবং স্বচ্ছ ঋজু ওজোদীপ্ত ভাষাভঙ্গীর অমোঘ আকর্ষণে বিবেকানন্দের বৈদ্যুতিক ব্যক্তিত্বের স্পর্শ এ গ্রন্থের সর্বত্র সঞ্চারিত।

'যুগনায়ক বিবেকানন্দে'র প্রস্তুতিপর্ব আমাদের প্রত্যাশাকে অপরিমিতভাবে বাড়িয়ে তুলেছে বলেই পরবর্তী খণ্ড দু'টি সম্বন্ধে পূজনীয় লেখকের কাছে আমরা পাঠকসমাজের পক্ষ থেকে এ-পর্যন্ত সাধারণ আলোচনায় উপেক্ষিত কয়েকটি দিক সম্বন্ধে আলোকপাত আশা করি—(ক) ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে, বিশেষভাবে বেদান্তচিন্তার ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মৌলিক দান; (খ) ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে, বিশেষভাবে স্বদেশী আন্দোলনের বিপ্লববাদীদের জীবনে ও চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব; (গ) বর্তমান পৃথিবীর জড়বাদী ও সাম্যবাদী জীবনজিজ্ঞাসার সমাধানে যুগনায়ক বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর আলোকে ভবিষ্যতের পথনির্দেশ।

হয়তো এ সবই গ্রন্থটির সামগ্রিক পরিকল্পনায় নিহিত। তবু আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের সংশয় ও জিজ্ঞাসার সমাধানে উপরি-উক্ত তিনটি বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আলোচ্য জীবনীর অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করবে- এই ধারণায় আমাদের বিনীত নিবেদন উপস্থাপিত।

এমন একটি মনীষাদীপ্ত শ্রদ্ধাসমুজ্জ্বল প্রেরণার উৎসস্বরূপ জীবনীগ্রন্থ প্রকাশের জন্য 'যুগনায়ক বিবেকানন্দে'র প্রকাশক আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাভাজন।　　　　—**প্রণবরঞ্জন ঘোষ**

সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (দ্বিতীয় সংস্করণ): স্বামী অপূর্বানন্দ সঙ্কলিত। প্রকাশক: অধ্যক্ষ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ রোড, মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ। পৃষ্ঠা ১৬৩+৬; মূল্য ৩৲।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্থ অধ্যক্ষ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের জীবনী এবং ভগবৎ-প্রসঙ্গে যে-সব কথা তিনি বলিয়াছেন তাহা লইয়াই পুস্তকটি রচিত। তাঁহার সম্বন্ধে স্বামী মাধবানন্দজী একস্থানে লিখিয়াছেন—'তীব্র বৈরাগ্য ছিল তাঁহার চরিত্রের শ্রেষ্ঠ ভূষণ। এই বিষয়ে তিনি তাঁহার গুরুবাক্যকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন। তিনি ছিলেন জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্য। তাঁহার অমূল্য উপদেশ ও দেবজীবন আমাদের স্বর্গীয় সম্পদ। এক অপার্থিবভাবে তিনি সর্বদা অভিভূত থাকিতেন, ঐহিক কোন বিষয়েই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সাংসারিকতা তাঁহার অলৌকিক জীবনকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।' এইসব মহাপুরুষদের কথা সাধক-জীবনের বিশেষ অবলম্বন।

আধ্যাত্মিক জীবনে যথার্থ উন্নতি করিতে হইলে যাহা যাহা প্রয়োজন, সে-সকল বিষয় আলোচ্য পুস্তকে এমন সুন্দরভাবে পরিবেশিত হইয়াছে যে, সাধকমাত্রেই উপলব্ধি করিবেন গ্রন্থখানি নিত্যসঙ্গী করা প্রয়োজন। পুস্তকের অধিকাংশ উপাদান পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

মহারাজের সেবকগণের ও কয়েকজন ভক্তের অনুলিপি হইতে সংগৃহীত।

গ্রন্থারম্ভে স্বামী শঙ্করানন্দজী-লিখিত ভূমিকাটি পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের জীবনের উপর বিমল আলোকসম্পাত করিয়াছে। গ্রন্থখানির সুমুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ—অধ্যাপক কালিদাস চক্রবর্তী। প্রকাশক : সি. ভট্টাচার্য, ২০৬ বিধান সরণি, কলিকাতা ৬, পৃষ্ঠা ১৩৮ ; মূল্য ৪৲।

অধ্যাপক চক্রবর্তীর উপরোক্ত পুস্তকটি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিবার্ষিক স্নাতক শ্রেণীর রাষ্ট্রবিজ্ঞান শাস্ত্রের তৃতীয় পত্রের পাঠ্য তালিকা অনুযায়ী রচিত। অধ্যাপক চক্রবর্তী এই পুস্তকের স্বল্প পরিসরে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সম্পর্কে ছাত্রদের জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহের একটি মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিশ্বশান্তি রক্ষায় আন্তর্জাতিক সঙ্ঘসৃষ্টির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, রাষ্ট্রসঙ্ঘের গঠন, ইহার উদ্দেশ্য, ইহার বিভিন্ন বিভাগের পরিচয়, নানা আন্তর্জাতিক সমস্যার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলির সুষ্ঠু আলোচনা ছাত্রগণকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সম্পর্কে জ্ঞানলাভে যাহাতে সহায়তা করে সেই উদ্দেশ্যেই এই পুস্তকটি রচিত। লেখক তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। পুস্তকটি প্রাঞ্জল এবং সহজবোধ্যভাবে লিখিত। বিষয়গত জটিলতা বা technicality-র বাধা কোথাও ছাত্রদিগের অসুবিধার সৃষ্টি করে না। পরিশিষ্ট অংশে কাশ্মীর সমস্যা, বার্লিন অবরোধ, কোরিয়া যুদ্ধ ইত্যাদির পর্যালোচনা পুস্তকটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করিয়াছে। সরল ভাষা ও ভঙ্গীতে বক্তব্যকে উপস্থাপিত করিবার গুণে পুস্তকটি কেবল ছাত্র-ছাত্রীদের নহে, সাধারণ পাঠকের নিকটও সমাদরলাভের যোগ্য। **—প্রেমবল্লভ সেন**

গীতার আলোকে শঙ্কর-দর্শন—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—শ্রীরণজিৎ সেন, রামকৃষ্ণ পুস্তক ভাণ্ডার, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ১২৮ ; মূল্য ২.৫০ টাকা।

পুস্তকখানি পাঠ করিলে বুঝা যায়, গ্রন্থকার আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবেদান্ত যথেষ্ট অনুশীলন করিয়াছেন। গীতাই উপনিষদের ও ব্রহ্মসূত্রের মর্মবাণী, গ্রন্থকারের এই মত সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্যের গীতা-ভাষ্যের উপক্রমণিকার 'তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমস্তবেদার্থ-সারসংগ্রহভূতম্' বাক্যটি গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য। আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি : অদ্বয়জ্ঞান, প্রস্থানত্রয়, স্মৃতিপ্রস্থান গীতা, কর্মপ্রবৃত্তির হেতু, জন্মান্তর, অমৃতত্ব। গ্রন্থখানি সুধীসমাজে আদরণীয় হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

উপাসনা—ব্রহ্মচারী হরিপদ চক্রবর্তী (গীতারত্ন)। প্রকাশক—কালিকানন্দ বেদান্ত আশ্রম, ১২১ নিউ টালিগঞ্জ, কলিকাতা ৩৩। পৃষ্ঠা ১০০ ; মূল্য ১৲।

সাধক-মনের ভাবের বিভিন্নতার জন্য উপাসনা-পদ্ধতিও বিভিন্ন। উপাসনা বিভিন্ন হইলেও উপাস্য যে একই ঈশ্বর, ইহা আলোচ্য গ্রন্থখানিতে দেখানো হইয়াছে। 'ওঁকার অবলম্বনে আত্মদর্শন' পরিচ্ছেদটিতে বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। কতকগুলি সুন্দর স্তোত্র ও সঙ্গীত পুস্তকখানির অলঙ্কারস্বরূপ।

ধর্মরহস্য—ব্রহ্মচারী হরিপদ চক্রবর্তী (গীতারত্ন)। প্রকাশক—কালিকানন্দ আশ্রম, ১২১ নিউ টালিগঞ্জ, কলিকাতা ৩৩। পৃষ্ঠা—১৯৪ ; মূল্য ২৲।

ধর্মের রহস্য অতি গূঢ়, তাহার প্রতিপাদনও সুকঠিন। আলোচ্য গ্রন্থে সরল ভাষায় ধর্মতত্ত্ব-বিশ্লেষণ প্রশংসার দাবি রাখে। ব্রহ্মতত্ত্ব, ভগবানের সাকার-নিরাকারত্ব, দেবতা-মূর্তির স্বরূপ, গীতায় অবতারবাদ প্রভৃতি আলোচনায় পাণ্ডিত্যের সহিত উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে। পুস্তকখানি যোগ্যস্থানে উপযুক্ত সমাদর লাভ করিবে।

আবেদন

রামকৃষ্ণ মিশন আসাম বন্যার্ত সেবাকার্য

সকলেই অবহিত আছেন, আসামের বিধ্বংসী বন্যা হাজার হাজার মানুষকে গৃহহীন ও অনাহারে প্রায় মৃত্যুর সম্মুখীন করিয়াছে। বন্যার প্লাবন আসিয়াছে পর পর তিনবার; এখন পর্যন্ত সর্বাধিক-বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলির অধিকাংশ স্থলেই পৌছিবার কোনও উপায় নাই। শিলচর এবং করিমগঞ্জের মত সহরেও খাদ্যভাণ্ডার নিঃশেষিতপ্রায় হওয়ায় সঙ্কট আরো ঘনীভূত হইয়াছে।

যে স্বল্পপরিমাণ খাদ্য এখনো পাওয়া যাইতেছে তাহার মূল্য এত উচ্চ যে তাহা ক্রয় করা দরিদ্র ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকের একেবারে সাধ্যাতীত। তাছাড়া বন্যার ফলে যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে যে-কোন সময় মহামারী সুরু হইতে পারে।

বন্যায় সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে কাছাড় জেলা; এই জেলায় অবস্থিত মিশনের করিমগঞ্জ এবং শিলচর কেন্দ্রের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন কয়েকটি গ্রামে বিবিধ আকারে সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছে। বহু গ্রামে এবং শিলচর সহরে প্রয়োজনানুসারে খাদ্যদ্রব্য বা নগদ টাকা ডোল দেওয়া হইতেছে। করিমগঞ্জ কেন্দ্র হইতে কয়েকটি গ্রাম জুড়িয়া সেখানকার অনুন্নত সম্প্রদায়ের বহু-সংখ্যক পরিবারের মধ্যে টেষ্ট রিলিফ পরিচালিত হইতেছে। বস্ত্র এবং ঔষধও বিতরিত হইতেছে।

এই সেবাকার্যে বহু অর্থের প্রয়োজন। খরচ করার মত যে অর্থ আমাদের ছিল, তাহা লইয়া কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের সঙ্গতি সীমিত; আরব্ধ সেবাকার্য চালাইয়া যাওয়ার এবং বিস্তৃততর অঞ্চলে উহা প্রসারিত করার জন্য অবিলম্বে অর্থসাহায্যের প্রয়োজন। এরূপ বিষম বিপদের সময় দুস্থ জনগণকে সাহায্যদানের কাজে রামকৃষ্ণ মিশন সর্বদাই সহৃদয় জনগণের সহায়তা পাইয়া আসিতেছে; আমরা আশা করি এই সেবাকার্য সফলতার সহিত পরিচালনার জন্য এবারেও আমরা অবিলম্বে তাঁহাদের নিকট হইতে স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অর্থসাহায্য পাইতে থাকিব।

এই সেবাকার্যের জন্য সর্ববিধ সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানাগুলিতে পাঠাইলে সাদরে গৃহীত হইবে:—

১। সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন.
পোঃ—বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া

২। সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম,
রহড়া, জেলা—২৪পরগনা

৩। সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম,
নরেন্দ্রপুর, জেলা ২৪পরগনা

৪। কার্যাধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ,
১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩

৫। কার্যাধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম,
৫, ডিহি এণ্টালী রোড, কলিকাতা-১৪

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক,
রামকৃষ্ণ মিশন

তারিখ: ১২ই জুলাই,
১৯৬৬

গোলপার্কে স্বামী বিবেকানন্দের মর্মরমূর্তি স্থাপন

গত ১৪ই আগষ্ট রবিবার সকাল ৯টার সময় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিট্যুট অব কালচারের সম্মুখবর্তী গোল পার্কে স্বামী বিবেকানন্দের মর্মরমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। সুরম্য পরিবেশে আয়োজিত গাম্ভীর্যময় এই অনুষ্ঠানটি সকলেরই চিত্তে গভীর রেখাপাত করে। স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী ভূতেশানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ প্রমুখ রামকৃষ্ণ মিশনের বহু সন্ন্যাসী এবং ডক্টর সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কলিকাতার বহু বিশিষ্ট নাগরিক এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

বৈদিক মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। পরে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ স্বামীজীর মর্মরমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। ইহার পর তিনি এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ভাষণ দান করেন। অর্থমন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পর সভার কার্য শেষ হয়।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ বলেন: স্বামীজী শুধু স্বদেশপ্রেমিক নয়, ব্রহ্মজ্ঞানীও ছিলেন। ভারতের আধ্যাত্মিকতার মূর্ত প্রতীক তিনি। তিনি চাহিয়াছিলেন ভারতের জাতীয় জীবন আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত হউক। আমাদের জাতির সংহতি এই আধ্যাত্মিকতা-তেই; অন্যান্য আদর্শকে এই আধ্যাত্মিকতার সহিত সংযুক্ত রাখিয়াই আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি দেশ-বাসী সকলকেই ভারত সম্মিলিত করিতে পারে এই আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহাই আমাদের আদর্শ; কোন বিশেষ ধর্মমত নয়, আধ্যাত্মিকতাই আমাদের সমন্বয়ভূমি। 'নিজে দেবত্বে উন্নীত হও, এবং অপরকে দেবত্বে উন্নীত হইতে সহায়তা কর'—স্বামীজীর এই বাণীই আমাদের জাতীয় জীবনের দিশারী হউক।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সভাপতির ভাষণে বলেন: ভারত যখন পরাধীন, লাঞ্ছিত, বিদেশীর চোখে ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত—সেই যুগে স্বামীজী ভারতের দূত হইয়া বিদেশে গিয়াছিলেন—ভারত যে আদর্শকে অবলম্বন করিয়া হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া বাঁচিয়া আছে, সেই আদর্শের প্রতিনিধিরূপে। সেই গৌরবে আজ আমরা ধন্য। স্বামীজীর আদর্শ অবলম্বন করিয়াই আমাদের চলিতে হইবে; কিভাবে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক জীবনে এমনকি রাষ্ট্রজীবনেও সে আদর্শকে রূপায়িত করিতে হইবে, তাহার নির্দেশ পাওয়া যাইবে তাঁহার বাণীর মধ্যে। তিনি বলিয়াছেন, আমাদের বলিষ্ঠ মানুষ হইতে হইবে। তাঁহার কথামত চলিলে দরিদ্র-ধনবানে বৈষম্য, মানুষে-মানুষে ভেদ দূরীকরণ, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যাহা আমরা চাই, দৈন্য দুর্বলতা কাটাইয়া তাহা সবই করিতে পারিব।

রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিট্যুট অব কালচারের পক্ষ হইতে সভান্তে জলযোগ ও প্রীতিসম্মেলন আয়োজিত হইয়াছিল।

চিকাগো-ধর্ম-মহাসভায় দণ্ডায়মান ভঙ্গিতে নির্মিত স্বামীজীর মর্মরমূর্তিটি উচ্চতায় সাতফুট; সাতফুট উচ্চ বেদীর উপর উহা স্থাপিত। মূর্তিটি নির্মাণ করিয়াছেন প্রসিদ্ধ ভাস্কর শ্রীমণি পাল। মূর্তি নির্মাণ, স্থাপন প্রভৃতির সমস্ত ব্যয়ভার (প্রায় ২৫,০০০ টাকা) বহন করিয়াছেন রাজ্যসরকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের বন্যার্ত-সেবাকার্য

আসামের সাম্প্রতিক প্রলয়ঙ্কর বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে কাছাড় জেলায় গত ২৯.৬.৬৬ রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক যে সেবাকার্য আরম্ভ করা হইয়াছিল, তাহা চালাইয়া যাওয়া হইতেছে।

শিলচর কেন্দ্র হইতে ১০ কুইণ্টাল চাল, ৪০ কুইণ্টাল আটা, ১৩ কুইণ্টাল ডাল এবং ২৬ খানি শাড়ি, ২৫ খানি ধুতি, ১০টি লুঙ্গি ও ১১০৲ টাকা মূল্যের ঔষধ বিতরিত হইয়াছে।

করিমগঞ্জ কেন্দ্রে গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতায় প্রতিদিন ১,২০০ লোককে রান্না-করা খাদ্য এবং শিশুদের জন্য দুগ্ধ বার্লি ইত্যাদি দেওয়া হইতেছিল, এখন রামকৃষ্ণ মিশনের ব্যয়ে কতকগুলি গ্রামে অনুন্নত সম্প্রদায়ের ৫২টি পরিবারের মধ্যে টেষ্ট রিলিফ পরিচালিত হইতেছে, উহা ১০০টি পরিবারে সম্প্রসারিত করা হইবে।

বন্যার্ত-সেবাকার্য আরও কয়েক মাস চালানো হইতে পারে। এ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র বেলুড় হইতে ৩০,০০০৲ টাকা অগ্রিম পাঠানো হইয়াছে।

কার্যবিবরণী

পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের কার্যবিবরণী (এপ্রিল ১৯৬৫—মার্চ ১৯৬৬) প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আশ্রমটি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই কেন্দ্রে অনুসৃত কার্যধারা প্রধানতঃ শিক্ষা ও সংস্কৃতি, চিকিৎসা এবং ধর্মবিষয়ক।

আলোচ্য বর্ষে আশ্রমের ছাত্রাবাসে (কেবলমাত্র কলেজের ছাত্রদের জন্য) ২৪ জন বিদ্যার্থী ছিল, তন্মধ্যে ১২ জন বিনা-খরচে ও ৩ জন আংশিক খরচে থাকিবার সুযোগ লাভ করে। আশ্রমের ১০ জন পরীক্ষার্থীই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতকার্যতার সহিত উত্তীর্ণ হয়।

স্বামী তুরীয়ানন্দ গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। গ্রন্থাগারের সুনির্বাচিত পুস্তকসংখ্যা ৭,৬৯৯; আলোচ্য বর্ষে ৩৬১ খানি পুস্তক সংযোজিত হইয়াছে। পাঠাগারে ৮টি দৈনিক ও ৬২ খানি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগার হইতে পঠনার্থে প্রদত্ত পুস্তকসংখ্যা ১০,০৭৬; গড়ে পাঠকগণের দৈনিক উপস্থিতি ৫০।

আশ্রম কর্তৃক হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক উভয়বিধ চিকিৎসা-ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৫৮,০৩০ (নূতন ৬,২৫৫) রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। এলোপ্যাথিক বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৪৬,৪৭৮; তন্মধ্যে নূতন রোগী ৬,৫৫৬।

আলোচ্য বর্ষে নানাস্থানে ও আশ্রমে ধর্মালোচনার জন্য মোট ২৪২টি ক্লাস অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্লাসে মার্কণ্ডেয় পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, বিবেকচূড়ামণি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা অবলম্বনে আলোচনা করা হয়। আশ্রমে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্র

কমানওয়েল্‌থ সোসাইটি কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া গত ১১ই জুন, '৬৬ লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ঘনানন্দজী মহারাজ সেণ্ট মার্টিন-ইন-দি-ফিল্ডস্‌-এ বিভিন্ন ধর্মের আলোচনানুষ্ঠানে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই সভায় ব্রিটেনের মাননীয়া রানী এবং ডিইক-অব-এডিনবার্গ যোগদান করিয়াছিলেন। সম্মেলনে এক সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। বিবিধ ধর্মবিষয়ক আলোচনার এই অনুষ্ঠান শেষ হইবার পর রানী স্বামী ঘনানন্দজীর সহিত আলাপ করেন।

মার্লবোরো ভবনে যে সম্বর্ধনাসভা হইয়াছিল স্বামী ঘনানন্দজী তাহাতেও যোগদান করেন। এই সভাতেও রাজপরিবার উপস্থিত ছিলেন।

আমেরিকায় বেদান্ত

চিকাগো বিবেকানন্দ বেদান্ত-সোসাইটি ঃ অধ্যক্ষ—স্বামী ভাষ্যানন্দ। রবিবারের সভায় নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি প্রদত্ত হইয়াছিল :

ফেব্রুআরি, ১৯৬৬ : মানুষের আপাত-প্রতীয়মান রূপ ও প্রকৃত সত্তা; ভগবদ্গীতার তাৎপর্য; জীবনের অপরিহার্য প্রশ্নসমূহ; জগদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে)।

মার্চ, '৬৬ : হিন্দুর দৃষ্টিতে পাপ ও মুক্তি; ঈশ্বরই অনন্তজীবন; অহংকারকে জয় করিবার উপায়; ঈশ্বরকে সত্যই কে চায়?

এপ্রিল, '৬৬ : মুক্তির জন্য আধ্যাত্মিক শিক্ষারূপে কর্ম; অমরত্বের অর্থ ও উহা লাভ করিবার উপায় (খৃষ্টজন্মদিন উপলক্ষে); প্রার্থনার প্রয়োগকৌশল; মনের অধিপতি হও।

মে, '৬৬ : আচার্য শ্রীশঙ্করের জীবনী ও উপদেশ; শ্রীবুদ্ধের জ্ঞান ও শান্তির বাণী; যোগের সারকথা; পথনির্দেশ; জীবন্মুক্তেরা কিভাবে জগতে অবস্থান করেন।

এতদ্ব্যতীত প্রতি মঙ্গলবারে কঠোপনিষৎ আলোচনা হইয়াছিল।

স্যানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত-সোসাইটি ঃ অধ্যক্ষ - স্বামী অশোকানন্দ; সহকারী—স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। নূতন মন্দিরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা দেওয়া হয়।

ফেব্রুআরি, ১৯৬৬ : যোগ—ইহার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ; নূতন মানুষ, নূতন ঈশ্বর, নূতন ধর্ম; ঈশ্বর জ্ঞান-ও আনন্দ-স্বরূপ; শক্তির জাগরণ; ঈশ্বরদর্শনের জন্য ব্যাকুলতা; ঈশ্বর-রূপে মানব ও মানবরূপে ঈশ্বর; যীশুখৃষ্ট ও শ্রীরামকৃষ্ণ; ভবিষ্য পাশ্চাত্য জগতে শ্রীরামকৃষ্ণের স্থান।

এপ্রিল, '৬৬ : নিম্নস্তরের মন ও কর্মফল; বিশ্বাতীত ও বিশ্বানুস্যূত সত্তা; যীশুর পুনরুত্থান; জিজ্ঞাসু, অনুসন্ধিৎসু ও যত্নশীল হও; অবচেতন মনের সংযম; কালেরও অবসান ঘটিবে; কুলকুণ্ডলিনী শক্তি; যোগের পথে শান্তি।

জুন, '৬৬ : ব্যক্তিত্বের প্রহেলিকা; দৈনন্দিন জীবনে আধ্যাত্মিকতা; ভারতে তীর্থযাত্রা; শ্রীবুদ্ধ ও বর্তমান সমস্যা; অজানার সন্ধানে তীর্থাভিযান; ঈশ্বরানন্দে জীবনানন্দ; মন, ধ্যান ও মূলসত্তা; শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের অন্তর্দেশ।

এতদ্ব্যতীত পুরাতন মন্দিরে স্বামী অশোকানন্দ 'অবধূতগীতা' আলোচনা করেন।

স্যাক্রামেণ্টো কেন্দ্র ঃ অধ্যক্ষ—স্বামী অশোকানন্দ, সহকারী—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। বিভিন্ন সময়ে আলোচ্য বিষয় :

এপ্রিল, ১৯৬৬ : ধ্যান সম্বন্ধে সহজ কথা;

অমৃতত্বের সন্ধানে ; বিশ্বজনীন ধর্ম ; সাধুদের জীবন হইতে শিক্ষা।

মে, '৬৬ : পরিপ্রশ্ন, অনুসন্ধান ও সাধনা কর ; মাতৃভাবে ঈশ্বরোপাসনা ; পূর্ণতা-প্রাপ্তিতে শ্রীবুদ্ধের পথনির্দেশ ; ঈশ্বর চিৎস্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপ ; প্রাণের ডাকে ভগবানের সাড়া।

বিদ্যামন্দিরের রজত-জয়ন্তী উৎসব

যুগাচার্য ক্রান্তদর্শী স্বামী বিবেকানন্দ অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে যে ভবিষ্যৎ-বাণীতে বলিয়াছিলেন—"ঐ যে দেখছিস, ঐ দক্ষিণ দিককার জমিটা ওখানে এক বিরাট শিক্ষায়তন গড়ে উঠবে"—সেই ভবিষ্যৎ-বাণীর বাস্তব-রূপায়ণ হয় ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখে বিদ্যামন্দিরের জন্মক্ষণে। বিদ্যামন্দির তাই স্বামীজীর 'স্বপ্নশিশু'। প্রাচ্য অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের, জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের এবং পূর্ণ মনুষ্যত্ব-বিকাশের শিক্ষাদর্শে বিদ্যামন্দির পরিচালিত হয়।

বর্তমান বৎসরে বিদ্যামন্দিরের পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইল। সেই উপলক্ষে ৪ঠা জুলাই তারিখে বিদ্যামন্দিরে ভাবগম্ভীর পরিবেশে এক শুচিস্নিগ্ধ ও মনোমুগ্ধকর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

প্রত্যুষে মঙ্গলারাত্রিক হয়। পরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের শুভাগমন হয় বিদ্যা-মন্দিরে। প্রভাতের শান্ত-পবিত্র পরিবেশে পঞ্চবিংশতি শঙ্খধ্বনির মধ্যে পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজ বিদ্যামন্দিরের পতাকা উত্তোলন করেন ; পরে বিদ্যামন্দিরের প্রার্থনাগৃহে পদার্পণ করিয়া তিনি পঞ্চবিংশতি প্রদীপশিখা প্রজ্বলিত করেন। অতঃপর তিনি বিদ্যামন্দিরের শ্রী-ভবনের 'কমন-রুমে' আসন গ্রহণ করিলে বিদ্যামন্দিরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী তেজসানন্দজী মহারাজ তাঁহাকে মাল্যদান করেন। তাঁহার আশীর্বাদলাভে বিদ্যামন্দিরের এই উৎসব সার্থক হইয়া উঠে। এই উৎসবে পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী শান্তানন্দজী মহারাজ, স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ, স্বামী অভয়া-নন্দজী মহারাজ, স্বামী সন্তোষানন্দজী মহারাজ, সারদাপীঠের সম্পাদক স্বামী অজজানন্দজী মহারাজ, বিদ্যামন্দিরের উপাধ্যক্ষ স্বামী গোকুলানন্দজী মহারাজ এবং বেলুড় মঠের অন্যান্য অনেক প্রবীণ ও নবীন সাধু ও ব্রহ্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর বিশেষ পূজান্তে বেলুড় মঠের ট্রেনিং সেণ্টারের অধ্যক্ষ স্বামী বোধাত্মানন্দজী মহারাজের সঙ্গে পবিত্র বেদ-মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক বিদ্যামন্দিরের ছাত্রবৃন্দ প্রজ্বলিত হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান করে।

সন্ধ্যায় সারদাপীঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ বিদ্যামন্দিরের প্রার্থনাগৃহে রামনাম সঙ্কীর্তন করিয়া উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলেন।

বিদ্যামন্দিরের রজত-জয়ন্তী উৎসব আগামী ডিসেম্বর মাসে আরো ব্যাপক এবং বিস্তৃতভাবে অনুষ্ঠিত হইবে। বিদ্যামন্দিরের ভবিষ্যৎ সাফল্যময় এবং গৌরবোজ্জ্বল হোক—শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর কাছে এই প্রার্থনাই করি।

বিবিধ সংবাদ

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব

গত রবিবার ১০ই জুলাই সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় ১৫১, বিবেকানন্দ রোডস্থিত 'স্বামী বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দির'-এ বিবেকানন্দ সোসাইটি কর্তৃক স্বামীজীর ১০৪ তম জন্ম-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ সভায় পৌরোহিত্য করেন এবং নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ এবং অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার বক্তৃতা করেন। স্বামী রঙ্গনাথানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং ১০৪টি প্রদীপ জ্বালিয়া সভার উদ্বোধন করেন।

সোসাইটির অন্যতম সহ-সভাপতি স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ সমাগত সকলকে স্বাগত জানাইবার এবং সোসাইটির সম্পাদক শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সোসাইটির বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করিবার পর স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সমাজের সব রকম ব্যাধির মহৌষধই যে শিক্ষা—স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণী সকলকে স্মরণ করাইয়া দিয়া প্রকৃত শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে স্বামীজী যে অমূল্য কথাগুলি বলিয়া গিয়াছেন. তাহার বিস্তৃত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, কয়েকটি পরীক্ষায় পাস করাই শিক্ষার মূল পরিচয় নয় এবং শিক্ষার অর্থ শুধু সংবাদ-সংগ্রহও নয়, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও আত্ম-বিশ্বাসের জাগরণই শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য।

পরিশেষে তিনি এই বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করেন যে, শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে আমরা বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনাইতেছি, কিন্তু স্বামীজী শিক্ষা সম্বন্ধে যে অমূল্য ও বাস্তবানুগ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছি না; তাহা কার্যে রূপায়িত করিতে পারিলে আমাদের দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইত।

অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার 'স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম' প্রসঙ্গে তাঁহার জ্ঞানগর্ভ ভাষণে বলেন যে, স্বামীজীর বিভিন্ন বাণী ও রচনার মধ্যে তাঁহার গভীর স্বদেশপ্রেমের পরিচয় রহিয়াছে। নিরন্ন ও অশিক্ষিত ভারতবাসীর প্রতি তাঁহার সমবেদনা ও প্রেম এত গভীর ও এত আন্তরিক ছিল যে তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞাকে তিনি 'জাতীয় পাপ' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশের কল্যাণচিন্তা এবং দেশের আপামর জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণের চেষ্টাকেই বর্তমানে যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া মনে করিতেন।

তিনি বলেন, আমাদের দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতিও স্বামীজী যে কতখানি সজাগ ছিলেন তাহার পরিচয়ও আমরা পাই তাঁহার সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার মধ্য দিয়া। বস্তুতঃ আধুনিক ভারতবর্ষ সমাজতন্ত্রের কথা প্রথম শুনিয়াছে স্বামীজীর মুখ হইতেই। স্বামীজীর সমাজতন্ত্রবাদ অবশ্য বৈদান্তিক একত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, জড়বাদের উপর নয়।

সভাপতির ভাষণে স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ বলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথের সন্ধান যে ভারতবর্ষ পাইয়াছে তাহা এক বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়। স্বামীজী তাঁহার শিক্ষা-পরিকল্পনায় পরা ও অপরা বিদ্যার সমন্বয়ে

বাস্তবাশ্রয়ী ও যুগোপযোগী পন্থাই অনুসরণ করিয়াছেন। স্বামীজীর এই শিক্ষাপদ্ধতিকে তিনি 'ব্যবহারিক শিক্ষার মধ্য দিয়া ব্যবহারিক অধ্যাত্মবোধ'—এই আখ্যা দিয়া বলেন যে, শিক্ষার্থীর সার্বিক যোগ্যতা একমাত্র এই ধরনের শিক্ষার মাধ্যমেই অর্জিত হইতে পারে।

বর্তমান সময়ে স্বামীজীর জন্মস্থান ও লীলাভূমি কলিকাতার ছাত্রসমাজে শ্রদ্ধার যে অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া তিনি বলেন যে, শ্রদ্ধা ব্যতীত জীবনে কোন উন্নতিই করা সম্ভব হয় না।

তিনি কলিকাতাবাসী তরুণ ও যুবক সমাজের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানাইয়া বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব ও কর্মকেন্দ্র এই কলিকাতা নগরী, তাই কলিকাতাবাসী তরুণ ও যুবক সম্প্রদায় স্বামীজীর উপদেশ ও বাণীতে সর্বাধিক অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া তাঁহার বিপুল সম্ভবনাময় চিন্তাধারাকে কার্যে রূপায়িত করিতে সবার আগে যেন আগাইয়া যায়। পরে সোসাইটির অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীহেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান।

সভায় উদ্বোধন-সঙ্গীত ও সমাপ্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীধূর্জটি মুখোপাধ্যায়। সভার শেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিক জন্ম-জয়ন্তী ও হিমালয়দর্শন শীর্ষক দুইখানি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করেন।

চুঁচুড়া : ২২.৫.৬৬ রবিবার প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ, চুঁচুড়া শাখায় শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব পালিত হয়।

প্রভাতে মঙ্গলারতি ও ভজনাদির পর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতিসহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাদের এক শোভাযাত্রা বাহির হইয়া শহরের প্রধান পথগুলি পরিক্রমা করে। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোমাদির পর দুপুর বেলা প্রায় চারিশত বালক-বালিকা বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করে। বৈকাল তিন ঘটিকায় নৈহাটীনিবাসী শ্রীদেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচালনায় ভক্তিমূলক সঙ্গীতের এক অনুষ্ঠান হয়। বৈকাল ৫টার সময় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক ধর্মসভায় সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় সম্পাদক শ্রীপ্রতুলচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ আলোচনা করেন। সভাপতি মহারাজ তাঁহার ভাষণে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন দিক আলোচনা প্রসঙ্গে বর্তমান সময়ে শিক্ষায় নৈতিক মান উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

সভান্তে সঙ্ঘপরিচালিত স্বরাজ সঙ্ঘ ব্যায়ামাগারের ও বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের কৃতী ছাত্রদের সঙ্ঘের পক্ষ হইতে সম্বর্ধিত ও পুরস্কৃত করা হয়।

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিঃ স্বামী নিরুদ্ধানন্দজী মহারাজের পরিচালনায় রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দির কর্তৃক চলচ্চিত্রে মীরাবাঈ প্রদর্শিত হয়। উক্ত প্রদর্শনীতে প্রায় দুই সহস্রাধিক জনসমাগম হইয়াছিল।

পরলোকে অধ্যাপক গৌরগোবিন্দ গুপ্ত

আমরা দুঃখিত চিত্তে জানাইতেছি যে, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য অধ্যাপক গৌরগোবিন্দ গুপ্ত গত ১লা জুলাই (১৯৬৬) সিস্কি হাসপাতালে শোথরোগে ৭৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী শিষ্য মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের (খোকা) তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র এবং কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিনি প্রদৌহিত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন

শ্রীশ্রীদুর্গা

(বেলুড় মঠ)

বিশ্বেশ্বরি ত্বং পরিপাসি বিশ্বং বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ॥

দিব্য বাণী

সর্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ॥
—শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১।৭

সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ৮
কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ৯

তোমারে বলে সবে—সর্বব্যাপিনী মা,
স্বর্গদায়িনী মা, মুক্তিপ্রদায়িনী ;
আর কি কথা, মাগো, রচিতে সুমহান
তোমার স্তবগান, আছে বা নারায়ণি !
বুদ্ধি-রূপে তুমি সবার হৃদিমাঝে
আছ মা নানা সাজে, প্রকাশস্বরূপিণি !
স্বর্গ মুক্তি-বা যে-জন যাহা চায়
দাও মা তারে তাই ! প্রণমি নারায়ণি !
কলা ও কাষ্ঠাদি কালের পরিমাণ
হয়ে মা, পরিণাম ঘটা'ছ প্রতিক্ষণ !
বিশ্ব-সংহার-শকতি-স্বরূপিণি !
প্রণমি নারায়ণি, দাও মা শ্রীচরণ !

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১০
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১১
শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১২

সকল মঙ্গলে শুভরূপা, আদি-
জননি, ধর্মাদি-বর্গ-প্রদায়িনি!
অভয় পদ তব শরণযোগ্য মা,
শিবানি, ত্রিনয়না, গৌরি, নারায়ণি!
সনাতনী তুমি, সৃজন-সংহার-
পালন করিবার শক্তিস্বরূপিণী,
ত্রিগুণময়ী তুমি, ত্রিগুণ-ধারিণী মা;
চরণে প্রণমি মা, প্রণমি নারায়ণি!
আর্ত-দীন-জন শরণ যেবা লয়
ও-দুটি রাঙা পায়, কর মা তারে ত্রাণ!
সবার দুঃখরাশি অচিরে বিনাশিনি,
নমি মা নারায়ণি, সঁপিয়া মন-প্রাণ!

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥ ৩৫

সদয়া হও দেবি, বিশ্ব-চরাচর-
নিবাসী সবাকার আর্তি-বিমোচনি!
প্রণত সন্তানে বরদা হও মাতা!
ত্রিলোক-আরাধিতা! প্রণমি নারায়ণি!

কথাপ্রসঙ্গে

মহামায়া

"দুয়ার খুলিয়া দাও মাতঃ!
হেরি পথ আলোক ছটায়
খেলা মোর হইয়াছে শেষ—
অতিশ্রান্ত পুত্র তব মাগো,
আকুল আকাঙ্ক্ষা হৃদে
গৃহে আজি করিবে প্রবেশ।"*

অদ্বৈতবাদী স্বামী বিবেকানন্দের এ প্রার্থনা মহামায়ার কাছে—শক্তিসমন্বিত অদ্বয়তত্ত্বের কাছে, শিব-শক্তির কাছে; বলা যায় স-শক্তিক শ্রীরামকৃষ্ণেরই কাছে—স্বামীজীর কাশীপুরে নির্বিকল্পসমাধিলাভের পরই যিনি বলিয়াছিলেন, 'মা তো আজ তোকে সব দেখিয়ে দিলেন? চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল। এখন তোকে কাজ করতে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হবে তখন আবার চাবি খুলব।'

এই মা, মহামায়াই "মোক্ষদ্বারকপাট-পাটনকরী", "বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী" - নামরূপের সীমার পারে ভাবাতীত রাজ্যে, অরূপের ঘরে, 'অখণ্ডের ঘরে' প্রবেশ করিতে দিবার কর্ত্রী। তিনি যে সব সন্তানদের মুক্তির দ্বার খুলিয়া সেখানে লইয়া যান, তাঁহাদের কাহাকেও কাহাকেও আবার এই নামরূপের রাজ্যে ফিরাইয়া আনেন, তাঁহাদের অতি শুদ্ধ পবিত্র দেহমনকে ব্যবহার করেন লোকশিক্ষার কাজে। তাঁহাদের ফিরাইয়া না আনিলে এখানে সে রাজ্যের খবর দিবে কে? কাজ শেষ হইবার পর তাঁহাদের পুনরায় ভাবাতীত রাজ্যে ফিরাইয়া লইবার কর্ত্রীও এই মহামায়া।

* My Play is Done—অনুবাদ

তবে এই নামরূপের রাজ্যে মা আমাদের যেভাবে আবদ্ধ রাখেন আর ইঁহাদের যেভাবে রাখেন, সে দুই-এর মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ভাবাতীত রাজ্যে লইয়া যাইবার পর মা যাঁহাদের আবার ফিরাইয়া আনেন, তাঁহারাও কিন্তু এই নামরূপের রাজ্যকে এবং এরাজ্যের 'সৃষ্টিস্থিতিবিনাশাং শক্তিভূতা সনাতনী' মহামায়াকে সব সময় একই দৃষ্টিতে দেখেন না; মা দেখান না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু আর সব অবস্তু।" একমাত্র অদ্বয় সত্তা ব্রহ্মবস্তুই একমাত্র বস্তু, বস্তু বলিতে বিশ্বচরাচরে আর কিছুই নাই। মহামায়া সেই বস্তু বা বাস্তব সত্তাকেই আমাদের কাছে অবস্তুরূপে দেখান। নামরূপের সীমায় আবদ্ধ করিয়া মহামায়া এই একমাত্র বস্তুকেই যেন নামরূপের আবরণে জড়াইয়া আমাদের কাছে জগৎরূপে এবং সেই জগতের দ্রষ্টারূপেও দেখাইতেছেন। যতক্ষণ তিনি এরূপ দেখাইতেছেন, ততক্ষণ এই সব অবস্তুকেই বস্তুরূপে, কঠিন বাস্তবরূপে আমরা দেখি; এরূপ দেখা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর থাকে না।

আমরা এই জগৎকে, অবস্তুকে, বস্তু বলিয়াই ভাবি; কিন্তু মহামায়া যাঁহাদের একবার এ রাজ্যের বাহিরে লইয়া গিয়া অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুকেই একমাত্র বস্তু বলিয়া প্রত্যক্ষ করাইয়া আবার এখানে ফিরাইয়া আনেন, তাঁহারা অবস্তুকে দেখিলেও উহাকে আমাদের মত "বস্তু" বলিয়া কখনও আর ভুল করেন না, উহাকে অবস্তু রূপেই দেখেন। স্বামীজীর কথায়, মরীচিকা দেখিয়া প্রথম প্রথম যে উহাকে সত্যই জলাশয় বা উদ্যান বলিয়া ভুল করিয়াছে, তাহার সে ভুল

ভাঙ্গিয়া যাইবার পরে মরীচিকা সে দেখিতে পায়, কিন্তু উহাকে সত্য জলাশয় বলিয়া বোধ তাহার কখনও আর হয় না, উহাকে মরীচিকা বলিয়া জানিয়াই দেখে। মা যাঁহাদের বস্তু ও অবস্তুর এই স্বরূপটি দেখাইয়া নামরূপের রাজ্যে ফিরাইয়া আনেন, তাঁহাদেরও সবসময় কিন্তু তাঁহার নিজের স্বরূপটি—তিনি ও ব্রহ্মবস্তু যে অভেদ, এই স্বরূপটি—দেখান না, তাঁহাদের কাছে তাই তখন ব্রহ্মবস্তু ছাড়া আর সবই অবস্তু, মহামায়াও—"মায়া মায়াকার্যং সর্বং"—অবস্তু বলিয়া বোধ হয়। ব্রহ্ম যে সৎ বস্তু, একমাত্র বস্তু, এবং জগৎরূপে যাহা দেখি তাহার সব কিছুই অবস্তু—ইহা তখন প্রত্যক্ষীভূত। তাঁহারা দেখেন, যতক্ষণ জগৎ আছে, ততক্ষণ অবিদ্যারূপে মহামায়াও আছেন, আবার যখন জগৎ নাই, তখন তিনিও নাই সেজন্য জগজ্জননী মহামায়া যে কি, সৎ না অসৎ, বস্তু না অবস্তু, তাহা তখন সঠিকভাবে বলা যায় না। তাঁহাকে তাই তখন বলিতে হয়, "অনির্বচনীয়রূপা", "সন্নাপি অসন্নাপি উভয়াত্মিকা ন"।

কিন্তু বস্তুর স্বরূপদর্শীদের মধ্যে কাহারও কাহারও কাছে মহামায়া তাঁহার নিজের স্বরূপও, তিনি যে কি তাহাও, দেখাইয়া থাকেন। তাঁহারা দেখেন, যিনি ব্রহ্মবস্তুরূপে প্রত্যক্ষ হন তিনিই মহামায়া, তিনি এবং ব্রহ্মবস্তু অভেদ। অধ্যাত্ম-অনুভূতির রাজরাজেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। বলিয়াছেন: যখন তাঁহাতে শক্তির প্রকাশ থাকে—যখন তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ করেন বলিয়া ভাবি—তখন তাঁহাকে মা বলি; আর যখন তাঁহার শক্তির বিকাশ থাকে না, তখন তাঁহাকেই নিষ্ক্রিয় নির্গুণ ব্রহ্ম বলি। মা যে ব্রহ্মবস্তুর সহিত অভেদ, যিনি ব্রহ্মবস্তুরূপে প্রত্যক্ষীভূত হন তিনিও মা, 'তুরীয়া নির্গুণা মা'—নিজের এই স্বরূপ মা যাঁহাদের নিকট প্রকাশ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানলাভান্তে নামরূপের রাজ্যে ফিরিয়া আসিবার পর জগতের বিভিন্ন বস্তুকে আমাদের মত বিভিন্ন সত্তাবান বস্তু বলিয়া তো দেখেনই না, জগৎকে এবং মহামায়াকেও অবস্তুরূপে দেখেন না, সবকিছুকেই দেখেন—শক্তি ও শক্তিমানের মিলিত রূপে। কারণ প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত যে অবস্থাতেই হউক শক্তি কখনো শক্তিমানকে ছাড়িয়া আলাদা থাকিতে পারেন না। অবস্তুকে বাস্তবরূপেই দেখি, বা অবস্তুরূপেই দেখি বা মহামায়ারূপেই দেখি, তাহার প্রকাশ কোন অবস্থাতেই বস্তুর সহিত সংযুক্ত না হইয়া ঘটিতেই পারে না।

মহামায়া ইচ্ছাময়ী। তিনি কখন কাহাকে কিভাবে কতটুকু নিজের স্বরূপ দেখাইবেন, তাহা তিনিই জানেন। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদেরও যে তিনি সব সময় নিজস্বরূপের সবটুকু দেখান না, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে বর্ণিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্বৈতসাধনার গুরু তোতাপুরীর জীবনের একটি ঘটনা হইতেই তাহা বোঝা যায়।

তোতাপুরী শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন তিনি। তিনি মায়ার নিত্যসত্তা স্বীকার করিতেন না—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মত 'মা'কে মানিতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন হাততালি দিয়া মায়ের নাম করিতেন, তিনি উপহাস করিয়া বলিতেন, 'আরে, কেঁও রোটি ঠোকৃতে হো?' মা প্রসন্না হইয়া নামরূপের কারাগারের দুয়ার খুলিয়া না দিলে যে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, ইহাও তিনি মানিতেন না। মা যে প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে সবল শরীর ও অমিত ইচ্ছাশক্তির অধিকারী করিয়া নিজহস্তে পথের সব বাধা

সরাইয়া জ্ঞানের রাজ্যে লইয়া গিয়াছিলেন, তোতাপুরী তাহা জানিতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সঙ্গে তিনি দীর্ঘ এগারো মাস দক্ষিণেশ্বরে কাটাইবার পর "সে বিষয়ে পুরী স্বামীজীকে বুঝাইবার জগদম্বার ইচ্ছা হইল। এতদিনে তিনি মনের ঐ ভ্রম বুঝিবার অবসর পাইলেন।" দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার অব্যবহিত পূর্বে পুরীজী কয়েকদিন কঠিন আমাশয় রোগাক্রান্ত হইলেন। পেটের দারুণ যন্ত্রণা। কিন্তু পুরুষের তাহাতে কি? পুর "চিরনিয়মিত মনকে ইচ্ছামাত্রেই সমাধিমগ্ন করিয়া দেহের সকল যন্ত্রণার কথা এককালে ভুলিয়া শান্তিলাভ করিতেছিলেন।" কিন্তু মায়ের ইচ্ছা ছাড়া তাহাও যে সম্ভব নয়, মা তাহা একদিন দেখাইলেন। সেদিন পেটের যন্ত্রণা খুব বাড়িয়াছে, পুরীজী বহু চেষ্টা করিয়াও দেহ হইতে মন সরাইয়া সমাধিতে স্থির হইতে পারিলেন না, "যেখানে শরীর ভুল হইয়া যায়, সেই সমাধিভূমিতে মন উঠিতে না উঠিতে যন্ত্রণায় নামিয়া পড়িল।" ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কাছে দেহত্যাগ জামা-কাপড় ছাড়িয়া ফেলার বেশী আর কিছুই নয়। দেহের উপর বিরক্ত হইয়া পুরীজী স্থির করিলেন গঙ্গাগর্ভে দেহ বিসর্জন দিবেন। পুরীজী তখনো জানিতেন না, মায়ের ইচ্ছা ছাড়া ইহাও করা যায় না। গঙ্গার প্রায় অপর তীরে পৌঁছিয়াও সেদিন তিনি গঙ্গায় ডুবিয়া দেহত্যাগ করিবার মত গভীর জল পাইলেন না; অবাক হইয়া যখন ভাবিতেছেন, "একি দৈবী মায়া!", ঠিক সেই মুহূর্তে মা তাঁহার নিকট নিজের স্বরূপ দেখাইলেন, "তোতার মন উজ্জ্বল আলোকে ধাঁধিয়া যাইয়া দেখিল—মা, মা, মা, বিশ্বজননী মা, অচিন্ত্য শক্তিরূপিণী মা; জলে মা, স্থলে মা; শরীর মা, মন মা; যন্ত্রণা মা, সুস্থতা মা; জ্ঞান মা, অজ্ঞান মা; জীবন মা, মৃত্যু মা; যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, ভাবিতেছি, কল্পনা করিতেছি—সব মা!……আবার শরীর-মন-বুদ্ধির পারেও সেই মা—তুরীয়া নির্গুণা মা!—এতদিন যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া তোতা প্রাণের ভক্তি-ভালবাসা দিয়া আসিয়াছেন, সেই মা শিব-শক্তি একাধারে হর-গৌরী মূর্তিতে অবস্থিত!—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ!"

মহামায়াই আমাদের বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই আবার প্রসন্না হইয়া আমাদের মুক্তির দ্বার অপাবৃত করেন। তিনিই আমাদের অন্তরে শুভ ও অশুভবুদ্ধিরূপে, উৎসাহ-নিরুৎসাহরূপে আছেন। শুভবুদ্ধি ও উদ্যম কমবেশী সকলকেই তিনি দিয়াছেন। শুভবুদ্ধি-প্রদর্শিত পথে উদ্যমসহায়ে চলিবার শক্তিও সকলকে অল্পাধিক দিয়াছেন। যতটুকু উদ্যম, যতটুকু শক্তি তিনি দিয়াছেন তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-যোগ যে কোন পথ ধরিয়া তাঁহার কোলে ফিরিয়া যাইতে, তাঁহার স্বরূপ জানিতে চাহিলে, তিনি প্রসন্না হন, আরো অধিক উদ্যম, অধিক শক্তি দিয়া তাঁহার গতি দ্রুততর করিয়া দেন।

মহামায়ার শারদীয়া পূজা আসন্ন। এই সব শুভ ক্ষণগুলি তাঁহাকে প্রসন্না করার, তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক। আমরা যেন উহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে পারি, মাকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া শুধু বাহ্য আনন্দানুষ্ঠানে মত্ত না থাকিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে যথাসাধ্য মনোনিবেশ করিতে ও আন্তরিক প্রার্থনা জানাইতে পারি—"দুয়ার খুলিয়া দাও মাতঃ, হেরি পথ আলোক ছটায়।"

শারদীয়া

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর

দেখার মত চোখ না করে হৃদয় মাঝে মনের পাতায়,
যজ্ঞ-হোমের ভস্মধূমে, বেদ-পুরাণে তন্ত্রে গাথায়,
অনুষ্ঠানের অন্ধকারে কোথায় তাঁরে খুঁজতে যাবি?
খোঁজ পাবিনে, মিছেই শুধু তেপান্তরে পথ হারাবি।

বিশ্বরূপার রূপমাধুরী চোখ থাকে তো দেখনা তোরা—
চোখ মেলে দেখ ভুবনমোহন রূপটি তাঁহার বিশ্বজোড়া।
জোছনা-মাখা বসন প'রে, তারার মালা গলায় দিয়ে
হাসছে যে মা শারদীয়া শরৎ-রথে সওয়ার হয়ে।
আকাশে তাঁর শির ঠেকেছে, পা ছুঁয়েছে মাটির তলা,
মেঘের সাদা মুকুট মাথায় সুশোভিতা মা মঙ্গলা।

সাগর তাঁহার চরণ ধোয়ায়, আলতা পরায় কমলকলি,
রাঙা উষার আঙিনাতে শিউলী ঢালে প্রেমাঞ্জলি।
সন্ধ্যা-তারা ঝিকমিকিয়ে টিপ দিয়ে দেয় দীপ্তভালে,
বিহঙ্গেরা বন্দনা গায়, দিগঙ্গনা প্রদীপ জ্বালে।

চিন্ময় রূপ দেখনা মায়ের বাহির হতে গুটিয়ে এনে
দৃষ্টিখানি ঘুরিয়ে দিয়ে আপন অতল গহন মনে।
দেখবি সেথায় রূপের বিভায় হৃদয়কমল আলো করে
দাঁড়িয়ে আছেন মা যে আমার স্নেহ প্রীতি চিন্তা হয়ে।
আরো গভীরতার পানে ব্রহ্মময়ীর চরণতলে
দৃষ্টি গেলে দেখবি তখন আছেন যিনি জলে স্থলে
মনে প্রাণে, তিনিই আবার রূপের পারে গুণের পারে,
ভিতর বাহির জুড়ে তাঁরই নিত্যানন্দ-সুধা ঝরে।
নিরাকারা যিনি, সারা বিশ্ব তাঁরই পুণ্য ছবি
ভক্তসাধক আয় কে আছিস, পূজে তাঁরে ধন্য হবি।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

আলমবাজার মঠ,
২মে, ১৮৯৭

My Dear Gangadhar,

মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তোমার যথাসাধ্য সাহায্যের প্রয়োজন জানিয়া আমরা অতিশয় প্রীত ও আনন্দিত হইয়াছি।...স্বামীজী তোমাকে সাহায্য-কার্যে অধিকতর উৎসাহিত করিবার জন্য আমাদিগকে বিশেষভাবে লিখিয়াছেন। যদ্যপি আবশ্যক বোধ কর তাহা হইলে তোমার সাহায্যকারী-স্বরূপ মঠ হইতে ২।১ জন ব্রহ্মচারীও প্রেরিত হইতে পারে। মহাবোধিসভা হইতে যাহাতে শীঘ্র দুইশত টাকা তোমাকে অবিলম্বে পাঠায় তাহারও যত্ন করা হইতেছে।

এখানকার মঠের সংবাদ ভাল। স্বামীজী শীঘ্রই আলমোড়া যাত্রা করিবেন। তুমি তাঁহার ও আমাদের ভালবাসা জানিবে, কিমধিকমিতি।

তোমার
শ্রীব্রহ্মানন্দ

(২)

Alambazar Math,
Baranagar P. O.
12th May, 1897

My Dear Swami Akhandananda,

গতকল্য তোমাকে এক পত্র দিয়াছি, বোধহয় ইতিপূর্বে পাইয়া থাকিবে। Advarce বলে Rs. 150/- লইয়া স্বামী নিত্যানন্দ ও ... সুরেশ্বরানন্দ তোমার নিকট যাইতেছেন। তোমাকে ইতিপূর্বে report পাঠাইতে লিখিয়াছি, অদ্য একশত টাকা পাঠান হইল, প্রাপ্তি-সংবাদদানে সুখী করিবে।

সর্বদা তিনজনে পরামর্শ করিয়া কার্য করিবে। ইহাদের নিকট অনেক বলিয়া দিয়াছি, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবে। সকল সংবাদ লিখিয়া সুখী করিবে, আমি নানাকাজে ব্যস্ত থাকি, সেজন্য পত্রের উত্তর পাইতে দেরী হইলে মনে কিছু করিবে না। ইতি

তোমাদেরই সেবক
Brahmananda

পুনশ্চ: ঔষধ চাহিয়াছিলে, পাঠান গেল এবং একখানি নোটপুস্তক পাঠান গেল, যদ্যপি উহাতে চিকিৎসার সুবিধা হয় তাহা হইলে লিখিবে।...

স্বামী তুরীয়ানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মল্লিককে লিখিত]

শ্রীহরিঃ

শরণম্

C/o The Postmaster,
Garhmukteshwar P. O.
Dt. Meerut
The 3rd Dec/'07

প্রিয় নিকুঞ্জলাল,

তোমার ৪ঠা অগ্রহায়ণের পোঃ কাঃ গতকল্য পাইয়াছি। বোধ হয় এতদিন কর্ণবাস পোষ্টাপিসে উহা পড়িয়াছিল। বৃন্দাবনের পোষ্ট ছাপ ২২ নভেম্বরের, কর্ণবাসের ২৯শের। যাই হ'ক আমি ত ৺পূজার পূর্বেই কর্ণবাস ছাড়িয়া অবন্তিকাদেবীতে নবরাত্রি যাপন করি। পরে ক্রমে আহার, মাণ্ডু, পুষ্পাবতী প্রভৃতি আরও দুইচার স্থানে অল্পবিস্তর বাস করিয়া কার্ত্তিকী পূর্ণিমার সাত আট দিন পূর্বে এখানে আসি। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় এখানে প্রকাণ্ড মেলা হয়। এরা বলে ৪০ লক্ষ লোকের সমাগম। আমার বোধ হয় ৪।৫ লক্ষ হইবে। যাই হ'ক মেলা খুব ভারি বটে। চার পাঁচ দিন ভারি জমজমাট, এখন সব ফুরিয়ে গেছে, আবার ভোঁ ভাঁ। ৺গঙ্গার ধারে ২ প্রাচীন তীর্থ অনেক। তবে সবই ভগ্নাবশেষ। অতীতের সাক্ষীমাত্র। মহাভারতে লিখিত অনেক স্থানই এখনও দেখিতেছি মনে হইলে যুগপৎ হর্ষবিষাদ ও অনেক ভাবের উদয় হইয়া থাকে। তবে এখানকার অবস্থা সকল প্রকারেই অতীব শোচনীয়। বিদ্যাহীন, বুদ্ধিহীন, ধনহীন, নীতিহীন, সম্প্রতি প্রায় অন্নহীন গ্রামসমুদয়ই অনেক দেখিলাম। দেব ভারতের উপর বড়ই বিরূপ। রাজার ত কথাই নাই। শোষণ ভিন্ন অন্য চিন্তারই তাঁহাদের আর অবসর নাই। ধনী ও বিদ্বান যৎকিঞ্চিৎ যাঁহারা আছেন, সব স্বার্থসাধনে তৎপর। প্রকৃত দয়া বা লোকহিতৈষণা দেশ হইতে বিদায় লইয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। এ দুর্দিনে কে যে ভারতের নানারূপে পীড়িত অনশনক্লিষ্ট লোকসমষ্টিকে রক্ষা করিবে, ভাবিয়া স্থির করা যায় না। মার মনে যা আছে হইবে। তবে দেশের অবস্থা যে অতীব দুঃস্থ তাহা খুব অনুভব করিতেছি। আমি এখন এইখানেই আছি, পরে মা যেরূপ করিবেন হইবে। সকলে আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি

শ্রীতুরীয়ানন্দ

ভগবৎপ্রসঙ্গ

স্বামী মাধবানন্দ

(বেলুড় মঠ, শনিবার, ৯ই ফেব্রুআরি, ১৯৬৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের সব দেখতে পাচ্ছেন। তিনি সব বুঝতে পারেন।

শাস্ত্রের বা ধর্মের আসল জিনিস হল তাঁর প্রতি টান। এটি একান্ত দরকার। আর, সত্যকথা কলির তপস্যা

ঠাকুর আড়ৎদারের কথা বলতেন। রাত্রে দোকান বন্ধ করলে ইঁদুরগুলো বেরিয়ে এসে সব কেটে নষ্ট করে দেয়। এই দেখে দোকানদার একটা ঝুড়িতে কিছু মুড়িমুড়কি সামনে রেখে দিয়ে চলে যায়। ইঁদুরগুলো বেরিয়েই ঐ মুড়িমুড়কি খাবার দেখতে পায়। আর খুব খুশী হয়ে খেতে লেগে যায়। এই খাবার পেয়ে অন্য দিকে আর নজর দিতে সময় পায় না।

আমরাও তাঁর মায়ার ছোটখাটো জিনিস নিয়ে বেশ ভুলে আছি। এও তাঁর খেলা।

ছোট ছেলের মত তাঁর কাছে যদি আবদার করতে পার, দেখবে এই জীবনেই কিছু না কিছু উপলব্ধি করতে পারবে। কিন্তু আগ্রহটুকু যেন ঠিক থাকে

যারা একটু বড় হয়েছ, বুঝতেই পারছ সংসারে কত দুঃখকষ্ট। ভগবানকে আশ্রয় করলে তবেই শান্তি। তিনি আমাদের অত্যন্ত আপনার; আপনার হতেও আপনার। আমরা কেউই perfect নই; তবে perfect হবার সম্ভাবনা সকলেরই আছে। তাঁকেই বলতে হবে, তুমি আমাদের হাত ধরে নিয়ে যাও। মনে হতাশা কিছুতেই আসতে দেবে না। নিজের উপর খুব বিশ্বাস রাখবে। তিনি আমাদের বিন্দুতে সিন্ধু দেখেন। পূবদিকে যত এগোবে পশ্চিম তত পিছনে পড়বে।

(বেলুড় মঠ, বুধবার, ১৪ই ফেব্রুআরি, ১৯৬৩)

'জপাৎ সিদ্ধি', 'জপাৎ সিদ্ধি'। মন বিক্ষিপ্ত চঞ্চল হলেও তাঁর কাছেই বার বার বলবে। বার বার বলতে বলতেই উপকার হবে। আমরা জন্মজন্মান্তরে কত কামনা-বাসনা করে এসেছি; সেসব কিছু পূরণ না হলে কেমন করে দর্শন হবে? বিশ্বাস রেখ, নিশ্চয়ই দর্শন হবে। ঠাকুর বলতেন, মাইরি বলছি আন্তরিক হলে দর্শন হবেই।

যাদের মন স্থির হয় তাদের ধ্যান হয়। ধ্যান ঠিক ঠিক হলে খুব আনন্দ হয়। সে খুব শক্ত। তবে চেষ্টা করে যেতে হয়। ধ্যান হৃদয়েই করতে হয়। ঠাকুরকে একজন প্রশ্ন করেছিল, ধ্যান কোথায় করব? ঠাকুর বললেন, যেখানে খুশি ধ্যান করতে পার। তিনি সব জায়গাতেই আছেন। তবে হৃদয় হল ডঙ্কামারা জায়গা।

ভালবাসাই আসল। তাঁর উপর ভালবাসা যত বাড়বে সংসারচিন্তাও তত কমবে। তখন ধ্যানজপও ভাল হবে। মন না বসলে তাঁর কাছেই প্রার্থনা করবে।

জানবে সচ্চিদানন্দই আসল গুরু।

ভগবান ভেতরে বাহিরে সর্বত্র রয়েছেন। কিছু সাধন কর তখন বুঝতে পারবে একমাত্র সত্তা তিনিই আছেন, জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

ধীরে ধীরে এগিয়ে যাও। বুড়ো বয়সে করব বললে হবে না। অল্প বয়স থাকতে থাকতেই কিছু করে নিতে হয়। তাঁকে পেলাম না বলি; কিন্তু পেলাম না, না চাইলাম না? কোন মা কি এমন আছেন যিনি ছেলে-মেয়ের ডাক শুনে না আসেন? তবে আন্তরিক

হওয়া চাই। আমরা সংসারের প্রলোভনে মত্ত হয়ে আছি—তাই সেদিকে হুঁস নাই।

আবার মনে হয় তাঁকে জানিনা শুনিনা, ডেকে লাভ কি? তা নয়; তিনি অতি আপনার জন। তাঁরই জমাট ভালবাসার কিছু অংশ মা বাবা প্রভৃতির মধ্যে দিয়েছেন। মৃগনাভির মত আমরা বাইরে খুঁজে বেড়াচ্ছি কিন্তু সাধন-ভজন করলে বুঝতে পারব, যাকে এতদিন বাইরে খুঁজছিলাম তিনি ভেতরেই রয়েছেন।

দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে—তাঁকে পাওয়া যাবেই যাবে। দড়িকে অন্ধকারে সাপ মনে করি। ভগবান জগতে নানারূপে রয়েছেন। আমরা অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আছি বলে তা বুঝতে পারি না। আমরা শুনি বা না শুনি, দেখতে পাই বা না পাই তিনি কিন্তু সব শুনতে পাচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছেন। ধৈর্য হারাতে নেই, হতাশ হতে নেই; যথাসময়ে তিনি নিশ্চয়ই আসবেন।

(বেলুড় মঠ, শুক্রবার, ১৯শে মার্চ, ১৯৬৩)

সংসার করা দোষের নয়। তবে বিচারের সঙ্গে ভোগ করতে হয়। ভগবান সকলের জন্য। তিনি গৃহীরও ভগবান, সন্ন্যাসীরও ভগবান। গার্হস্থ্য জীবনও ঈশ্বরলাভের একটি পথ। কথামৃতে ঠাকুর গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে কত কথা বলেছেন! সেইভাবে চলার চেষ্টা করতে হয়। অবশ্য ideal উভয় পথেই দুঃসাধ্য। পূজ্যপাদ নাগ মহাশয় ঠাকুরের আশ্রিত ছিলেন। কত বড় আদর্শ! পূর্ণচন্দ্র গৃহী হলেও—ঠাকুর তাঁকে ঈশ্বরকোটি বলেছেন। আসল কথা, তাঁকে ধরে জীবনপথে অগ্রসর হতে হয়, খুঁটি ধরে ঘোরার মত।

আমাদের মনে হয় তিনি অনেক দূরে। তা নয়। তিনি প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছেন। তাঁকে কেউ বাবা বলে, কেউ বলে মা। তিনি আবার মানুষের রূপ ধরে অবতার হয়ে আসেন। ঠাকুর একজন অবতার। স্বামীজী তাঁকে অবতারবরিষ্ঠ বলেছেন। মা কালীই তাঁর মুখ দিয়ে সব কথা বলেছেন; তিনি তাঁর চলন্ত-বিগ্রহ।

তিনি আমাদের অপরাধ নেন না। সংসারে কত প্রলোভন রয়েছে, সেদিকে নজর না দিয়ে তাঁর দিকে একটুও এগিয়ে গেলে তিনি খুশীই হবেন। ছোট ছেলেমেয়ের মত তাঁর কাছে সব কথা বলবে। সাংসারিক কথাও বলতে পার। কিন্তু তোমার যাতে ভাল হয়—তিনি তাই দেবেন। যেমন ছেলে বিষ চাইলে মা তো আর তা দেন না! ঠিক তেমনি। তাঁর কাছে বড় জিনিসই চাইতে হয়। ভক্তি বিশ্বাস প্রার্থনাই আসল প্রার্থনা।

ম্যালেরিয়া হলে ডাক্তার প্রথমেই কুইনাইন দেন না। প্রথমে অন্যান্য উপসর্গ সব দূর করে তারপর দেন। তেমনি ভগবান আমাদের কামনা-বাসনা কিছুটা মিটিয়ে তারপর দর্শন দেন।

পূজা

স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ

বৎসরান্তে আবার শারদীয়া মা-দুর্গা আসিতেছেন। তাঁহাকে বরণ করিবার জন্য অসংখ্য ভক্তহৃদয় উন্মুখ হইয়া আছে। মা আসিবেন, তাঁহার পূজা হইবে, পূজান্তে তিনি স্বধামে ফিরিয়া যাইবেন। কোথা হইতে আসেন তিনি, কোথায় ফিরিয়া যান? 'কৈলাসশিখরাৎ'? সে কৈলাস-শিখর কোথায়? পূজারই বা আসল তত্ত্ব কি?—এসব বিষয়ে সংক্ষেপে একটু আলোচনা নিশ্চিতই অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

জগতের যাহা চরম সত্য, তাহা মনবুদ্ধির অতীত। যুগে যুগে ভারতের সত্যদ্রষ্টাগণ মনবুদ্ধির সীমা ছাড়াইয়া পরমধামে পৌছাইয়া সে সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এবং ফিরিয়া আসিয়া আমাদের নিকট তাহার সন্ধান দিয়াছেন, তাহা লাভ করিবার পথও বলিয়া দিয়াছেন। মরজগতে অমৃতের সন্ধান আনিয়া দিয়াছেন ইঁহারাই।

অতি প্রাচীন কালে যাঁহারা এই সত্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আমরা বলি ঋষি। বেদ-উপনিষদে ইঁহাদেরই উপলব্ধ সত্য নিহিত। ঋষিরা সাকার ও নিরাকার উপাসনা—উভয়বিধ পথেই এই সত্য লাভ করার কথা বলিয়াছেন। সাকার উপাসনার পথ বেশীর ভাগ লোকের পক্ষে চলার উপযোগী। জগতের যাহা চরম সত্য, তাহাকে কোন বিশেষ মূর্তিরূপে কল্পনা করিয়া সেই মূর্তির উপাসনার মাধ্যমে আমরা সত্য লাভ করিতে পারি। কিন্তু নিরাকার উপাসনার পথ সকলের পক্ষে সহজ নয়। মনবুদ্ধির অতীত প্রদেশে যে সত্য রহিয়াছে, সেই সত্যের সঙ্গে আমি অভেদ—মনবুদ্ধির ভিতর দিয়া যে 'আমি'-বোধ ফুটিতেছে তাহা আমার স্বরূপ নয়—ইহা উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য। ভাষা মনবুদ্ধির এলাকার জিনিস, তাই ভাষায় উহার বর্ণনা দেওয়া যায় না—"যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" সকলের পক্ষে এই পথ ধরিয়া সত্য লাভ করা সম্ভব নয় বলিয়াই সেই "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" অরূপ, নির্গুণ সত্য—ব্রহ্ম—স্থির বিদ্যুতের ন্যায় অনন্তরূপ, অনন্তমাধুর্য ও অনন্ত করুণাময় বিবিধ সাকার মূর্তি পরিগ্রহ করেন। আবার 'অসীমের লীলাপথে' নররূপে আবির্ভূত হন। ভক্ত কবির ভাষায় "অরূপ-সায়রে লীলা-লহরী উঠিল মৃদুল করুণা-বায়। আদি-অন্ত-হীন, অখণ্ডে বিলীন, মায়ায় ধরিলে মানব-কায়॥" ইহা ধারণা করা দুষ্কর—"বোঝে প্রাণ বোঝে যার!" অবতাররূপে এই আবির্ভাব একবার দুইবার নয়, বার বার -"সম্ভবামি যুগে যুগে।" এই ভাবেই সেই অসীম, অনন্ত, বিরাট মানুষের কাছে ধরা দিয়া বলেন, "মামেকং শরণং ব্রজ।" তাঁহাকে সেই সাকার রূপে উপাসনা করিয়া, হৃদয়ে তাঁহার সেই সাকার রূপের ধ্যান করিয়া বহু সাধক ধন্য হইয়াছেন হৃদয়কমলে আবির্ভূত সেই অপরূপ রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া। হৃদয় ধ্যানের একটি প্রশস্ত স্থান। কোন মহাপুরুষ জিজ্ঞাসু ভক্তকে উপদেশ করিতেন, "ধ্যান করবার ডঙ্কামারা জায়গা হচ্ছে হৃদয়।" অসীম, অনন্ত, নিরাকার ব্রহ্মই যে সসীম, শান্ত, সাকার রূপে আবির্ভূত হইয়া ভক্তের হৃদয়-কন্দর আলোকিত করেন, এই মহাসত্যটি বুঝাইবার

জন্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ জল ও বরফের উপমা দিতেন। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সাধকের ধ্যান-নেত্রে সেই পরব্রহ্ম কখনো রাম, কখনো কৃষ্ণ, কখনো বা শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি রূপে প্রকট হইয়াছেন। চরম সত্য বা শ্রীভগবানই যে সাকার ও নিরাকার দুই-ই, এই চরম সত্যটি ঘোষিত হইয়াছে শ্রুতির ভাষায়, "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি", আর ভক্ত কবি রামপ্রসাদের ভাষায়, "আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।" শ্রীভগবানের সাকার রূপের উপলব্ধিরূপ পরমধনে বুক ভরাইবার জন্য সকলকে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যেই মূর্তিপূজার বিধান। শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি সাকার বিগ্রহগুলি বুদ্ধিকল্পিত নয়—ভাগ্যবান সাধকগণ শ্রীভগবানকে এই সব রূপে দর্শন করিবার পর ধ্যানদৃষ্ট সেই মূর্তিগুলির বর্ণনা দিয়াছেন এবং সেই বর্ণনানুসারে শিল্পীরা সে রূপ-গুলিকে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন প্রস্তরে অথবা মৃত্তিকায়। এইভাবে ভারতে বহু দেবদেবীর মূর্তি ও মন্দির গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সব মন্দিরে যুগ যুগ ধরিয়া ভক্ত সাধকেরা আগমন করিয়াছেন, সেখানে প্রতিষ্ঠিত মূর্তির মাধ্যমে শ্রীভগবানের পূজা ও ধ্যান করিয়াছেন। বহুকালের পুঞ্জীভূত সেই ভাবরাশি দেবদেউলকে মহাতীর্থে পরিণত করিয়াছে; এই পুঞ্জীভূত ভাবরাশির জন্যই তীর্থাদিতে শ্রীভগবানের বিশেষ প্রকাশ। যাঁহার হৃদয় যত বেশি পবিত্র হইবে, এই সব তীর্থে তিনি তত অধিক পরিমাণে সেই ঘনীভূত আনন্দের অনুভূতি লাভ করিয়া ধন্য হইবেন। পবিত্র না হইলে এ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের অধিকার নাই।

পূজাকালেও তাই পবিত্রতাসম্পন্ন হইয়া পূজা করিবার বিধি—"দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ।" অন্তরে বাহিরে শুচি হইবার জন্য শাস্ত্রে বিধান আছে; ইহার নাম পূজাক্রম। বাহিরের শুচিতা সম্পাদনের জন্য নির্মল সলিলে অবগাহন করিয়া ধৌত বস্ত্র পরিধান করিতে হয়। পরে শ্রীভগবানের পবিত্র নাম স্মরণপূর্বক অন্তরের শুচিতা সম্পাদন করিয়া পুষ্পাদি পূজোপকরণ সংগ্রহ করিতে হয়। পরে স্তবপাঠ, ইষ্টমন্ত্র জপ অথবা ইষ্টমূর্তি চিন্তা করিতে করিতে পূজাগৃহে প্রবেশ করিয়া বিগ্রহে শ্রীভগবান সাক্ষাৎ আবির্ভূত রহিয়াছেন, এরূপ চিন্তা করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে হয়। পূজা-কালে বৃথা শক্তিক্ষয় ও চিত্তবিক্ষেপ নিবারণের জন্য আচমন, আসনশুদ্ধি, জল- ও পুষ্প-শুদ্ধি প্রভৃতির ব্যবস্থা। যাহাতে অন্য কোন চিন্তা বা বিরুদ্ধ চিন্তা আসিয়া মনের একাগ্রতা নষ্ট করিতে না পারে এবং মনে একটি পবিত্র ভাব সৃষ্ট হয়, তাহার জন্য নিজের চারিদিকে একটি বহ্নিপ্রাকার অর্থাৎ পবিত্রতার আবেষ্টনী কল্পনা করিয়া অধ্যাত্মশক্তি অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণের জন্য বীজমন্ত্রে প্রাণায়াম এবং ভূত-শুদ্ধির বিধান। ভূতশুদ্ধিকালে সাধককে চিন্তা করিতে হইবে যে, অন্তর্নিহিত যাবতীয় কুভাব (কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষ) ভস্মীভূত হইয়া নিঃশেষ হইল। এভাবে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের পূর্ণ পবিত্রতা সম্পাদনের পর নিজ হৃদয়ে ইষ্টদেবতা-কে স্থাপন করিতে হয়। ইহারই নাম জীবন্যাস। এই ন্যাসকালে পূজককে চিন্তা করিতে হয়—ইষ্টদেবতার প্রাণ, জীব, চক্ষু ইত্যাদি যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমারই হৃদি-মন্দিরে বিরাজমান। ইহা যিনি প্রত্যক্ষ করেন, একমাত্র তিনিই বলিতে পারেন, "হৃদয়কমল-মধ্যে রাজিতং নির্বিকল্পম্……", অথবা, "অন্তরে জাগিছ গো মা অন্তরযামিনী!" এই

অনুভূতিই অপার্থিব আনন্দের আস্বাদ দানে সক্ষম। এভাবে নিজ হৃদয়েই শ্রীভগবানের অস্তিত্ব গভীরভাবে চিন্তা করিবার অভ্যাসের ফলে নিজ স্বরূপ উপলব্ধির বিদ্যুচ্চমক হৃদয়ে খেলিয়া যায়। তখন 'কাঁচা আমি'টা মরিয়া যায়, জন্ম নেয় 'পাকা আমি'। মাতৃকান্যাসের অর্থ, ইষ্টের ন্যায় পূজকের শরীরও পঞ্চাশৎ বর্ণময়—"কালী আমার পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে ভাব তারে।"

ইহার পর নিজ হৃদয়ে পুনরায় ইষ্টের ধ্যান করিয়া চিন্তা করিতে হয়—আমার ইষ্টদেবতা, আমার ধ্যানের ধন আমার হৃদয় হইতে বাহির হইয়া সম্মুখস্থ প্রতিমাতে অধিষ্ঠিত হইলেন। তখন সে প্রতিমা আর প্রতিমা থাকে না, তখন সে প্রতিমাই সাকার ভগবান—"আমার হৃদয়ে আছিল বাহির হইল বেকত হইল সে। ও তার চরণকমলে ভ্রমরা দোলায় চৌদিকে বেড়িয়া ঝাঁক।" পরে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ইত্যাদি উপচার নিবেদন করিয়া শেষে দেবতার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হয়—"মাং মদীয়ঞ্চ সকলম্ ইষ্টচরণে সমর্পয়ে।"

তারপর আরতি। প্রদীপ, জল, পুষ্প, বস্ত্র, চামর ইত্যাদি দ্বারা দেবতার আরাত্রিকের বিধান। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম নামক যে পঞ্চভূতে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্ট, পুষ্প, জল, দীপ প্রভৃতি সেই পঞ্চভূতেরই প্রতীক। যিনি আমার হৃদয়ে রহিয়াছেন, তিনিই প্রতিমাতে অধিষ্ঠিত; তিনিই আবার চরাচর জুড়িয়া রহিয়াছেন, বিশ্বের সব কিছুই তিনি—প্রদীপ জল প্রভৃতির দ্বারা তাঁহার আরতি এই সত্যকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। আরতির সময় দেবতার মহিমাসূচক স্তবস্তুতি পূজক ও দর্শক সকলেরই হৃদয় অপার্থিব আনন্দে ভরিয়া দেয়।

পূজান্তে বিহিত অগ্নি স্থাপনান্তে উহাতে ঘৃত প্রভৃতি আহুতি প্রদান করিয়া হোম করিবার বিধান আছে। আমার ইষ্টদেবতাই অগ্নিরূপে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎভাবে আমার প্রদত্ত উপচার গ্রহণ করিতেছেন—হোম করিবার সময় এই চিন্তা সাধকের মনকে অধিকতর আনন্দে আপ্লুত করে।

নৈমিত্তিক পূজাদিতে পূজা- ও হোম-শেষে দেবতা বিসর্জন করিতে হয়। বিসর্জনের কথা ভাবিলেই মন বিষাদে ভরিয়া উঠে। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, বিসর্জন মানে দেবতাকে সরাইয়া দেওয়া নয়; যে দেবতাকে আমি আমার হৃদয় হইতে বাহিরের মূর্তিতে আনিয়া পূজা করিলাম, পূজান্তে আবার তাঁহাকে সূক্ষ্মরূপে আমার হৃদয়কমলে ফিরাইয়া আনিতেছি—ইহাই বিসর্জন।

"তিষ্ঠ তিষ্ঠ পরে স্থানে স্বস্থানে পরমেশ্বরি।
যত্র ব্রহ্মাদয়ঃ সর্বে সুরাস্তিষ্ঠন্তি মে হৃদি॥"

—বিসর্জনের এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সাধককে নিজেকে দেবতাময় বলিয়া চিন্তা করিতে হয়। যাহাকে প্রাণভরিয়া অতি আপনার ভাবিয়া সাদরে আহ্বান করিলাম, আসনে বসাইলাম, মাল্যচন্দনে সাজাইলাম, খাওয়াইলাম, তাহাকে আবার চলিয়া যাইতে বলা যায় নাকি? বিসর্জনের সময় যাহা বলা হয়, সেই কথাই বলা চলে তাহাকে—তুমি আমার হৃদের ধন, হৃদয়ে ফিরিয়া এসো; আবার যখন তোমাকে বাহিরে আনিয়া বাহ্যপূজার প্রয়োজন হইবে, তখন আবার আমার হৃদয় হইতে বাহির হইয়া প্রসন্ন হাস্যে আমার অন্তর ভরাইয়া দিও। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরমভক্ত মথুরনাথ নিজ জানবাজারস্থ বাটীতে মহাসমারোহে দুর্গোৎসব করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকেও পূজার কয়দিন বাটীতে আনিয়া রাখিয়াছেন। প্রতিমাতে যাঁহার পূজা হইতেছে, তিনিই নরদেহ ধারণ

করিয়া উপস্থিত রহিয়াছেন! কাজেই মথুরবাবু প্রতিমাতে মায়ের সাক্ষাৎ আবির্ভাব যে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া পূজার কয়দিন মহানন্দে কাটাইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ কি? বিজয়ার দিনও সেই আনন্দেই তিনি মগ্ন আছেন, এমন সময় খবর আসিল, বিসর্জন হইবে, মথুরবাবুকে মণ্ডপে একবার যাইতে হইবে। শুনিয়া মথুরবাবুর হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল। 'তা কি কথনো হয়? মাকে বিসর্জন দিব কি? বাবার ও মার কৃপায় আমার সামর্থ্যের অভাব নাই, মার নিত্যপূজা করিব'--ইহা চিন্তা করিয়া তিনি বিসর্জন দিতে কিছুতেই রাজী হইলেন না, কাহারো কথা শুনিলেন না। শেষে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আসিয়া বলিলেন, 'মা কি ছেলেকে ছেড়ে থাকতে পারে? বিসর্জন দিলেই তিনি যাবেন কোথায়? এই তিন দিন বাইরের মণ্ডপে বসে তোমার পূজা গ্রহণ করেছেন, এখন থেকে তোমার আরও কাছে, অন্তরে বসেই পূজা গ্রহণ করবেন।' এই বলিয়া মথুরের বুকে হাত বুলাইয়া দিলেন। সেই দিব্য স্পর্শের ফলে মথুরের হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া গেল, যেন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর সহসা দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; তিনি দেখিলেন, হৃদয় জুড়িয়া "সৌম্যাসৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যোস্তুতি-সুন্দরী" মা চির বিরাজমানা! তখন আর প্রতিমাবিসর্জনে আপত্তি থাকিল না।

ইহাই সাকারোপাসনার সার কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, যিনি সাকার তিনিই নিরাকার; সাকারের ভিতর দিয়া নিরাকারে যাওয়া যায়, আবার নিরাকারের ভিতর দিয়া সাকারে আসা যায়।

আবদার

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মাগো তোমার বুড়ো খোকা
ফিরবে যখন ঘরে,
পাঠায়ো না তারে নেহাৎ
'জবু থবু' করে।
'বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা'
বলো তুমি দিবে কিনা?
রবে কিনা অফুরন্ত
আনন্দ অন্তরে?

মোর মাধবী-কুঞ্জে যেন
গুঞ্জরে ভ্রমর।
অজয়ে পাই 'সপ্তডিঙার'
দাঁড়-পতনের স্বর!
সে রূপের কি আছে সীমা!
হাসেন 'কমল-কামিনী' মা,
'কালীদহ' রয় যেন মোর
পদ্মফুলে ভ'রে।

গ্রাস করতে আসবে যখন
মরণসাগর-জল
ভাববো কোথায় 'খুল্লনা' মা?
কোথায় বা সিংহল?
'চাঁদর' 'মধুকরের' সনে
রইনা যেন নিরঞ্জনে
শঙ্খচিলের কণ্ঠে মাভৈঃ
শুনি নীলাম্বরে।

'নীলকণ্ঠে' হেরবো শিবের
মন্দির-চূড়ায়।
সে সাগর-মন্থনের ঘটায়
প্রাণ যেন জুড়ায়।
পূজার ধূপের সৌরভেতে,
যাই যেন মা গৌরবেতে,
মৃত্যুসাথে মিলতে আমি
অমৃত গান করে।

বালিকার স্মৃতি

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

আচার্য শঙ্কর তাঁহার 'গৌরীদশকম্' স্তোত্রের প্রথম নয়টি শ্লোকে মহামায়ার নানা ঐশ্বর্য, শক্তি ও বিভূতির বর্ণনা করিয়া দশম এবং পরিশিষ্ট শ্লোকে বড় মিষ্ট ভাষায় হৃদয়ের একটি স্নিগ্ধ নির্মল অনুভূতির কথা বলিতেছেন ; উহার নিষ্কর্ষ : "বেশী আর কি বলিব, মহাশক্তির আকার ও প্রভাবের কি অন্ত আছে ? বলিতে যত চেষ্টা করি, বাক্য ততই জটিল হইয়া পড়ে, ভাবিতে যত চেষ্টা করি বুদ্ধি ততই গুলাইয়া যায়। অবশেষে সার এই বুঝিয়াছি, মহামায়া স্বয়ং একটি ক্রীড়াময়ী বালিকা মাত্র। বিশ্বভুবনের যত কিছু অভিব্যক্তি সবই সেই সরলা নিরাভরণা চপলা বালিকার লীলাভঙ্গী মাত্র। হৃদয় বিশুদ্ধ করিয়া যদি তাঁহাকে স্মরণ করিতে পার তাহা হইলে সেই সর্বকল্যাণী পদ্মনয়না পর্বতপুত্রী জগন্মাতা কল্পলতা হইয়া সকল কামনা পূর্ণ করিয়া দিবেন। সকল সিদ্ধি, সকল সম্পদ, পরা ভক্তি পর্যন্ত তাঁহার একটি স্মিত হাস্য হইতে ফুটিয়া উঠিতে পারে।"*

ঐশ্বর্য, বিভূতি এবং গুণের ভাবনাকে অতিক্রম করিয়া শ্রীভগবানের ত্রিগুণমুক্ত শিশু-ভাবকে হৃদয়ে ধারণা করিতে হয়। খ্রীষ্টধর্মে শিশু যীশুকে অবলম্বন করিয়া কত গীত, কত কাব্য, কত সাধনদৃষ্টি সৃষ্ট হইয়াছে। আমাদের দেশে ভগবানকে যেমন পিতা ও মাতা দুই ভাবেই আমরা উপাসনা করিতে অভ্যস্ত সেইরূপ ভগবানের শিশুভাবও কখনও বালক, কখনও বা বালিকা মূর্তির মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত। অবশ্য বালক রাম ও বালক কৃষ্ণ যত বেশী পূজা ও সমাদর পাইয়া আসিতেছেন, বালিকা জানকী ও বালিকা রাধার কথা তত শোনা যায় না। রঙ্গমঞ্চে তাঁহাদের আবির্ভাব যখন ঘটিল তখন তাঁহারা সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়া কিশোরী বধূ সাজিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের বালিকা-কাল কি ছিল না ? বালক-ভগবানের কত অলৌকিক লীলাবিলাসের কথা পুরাণকারেরা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বালিকা-ভগবতী জনকনন্দিনী ও বৃষভানুদুলালীর ইতিবৃত্ত কাহারাও বিশদ বর্ণনা করেন নাই কেন ? তাঁহাদের বালিকা-চরিত কি আমাদের অনুধ্যানের যোগ্য নয় ? রাজর্ষি জনক যখন স্বহস্তে লাঙ্গল দিয়া ভূমি কর্ষণ করিতেন তখন একটি ঘাগরা-পরা ক্ষুদ্র বালিকা কি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুর ঘুর করিয়া ফিরিত না ? হয়তো সে আপন মনে গুন গুন করিয়া গান গাহিত। হয়তো সেই গুঞ্জন হইতে ধ্বনিত হইত—'রাম' 'রাম'। রাজর্ষি যখন লাঙ্গল চষিয়া ক্লান্ত হইতেন হয়তো সেই বালিকা তখন ছুটিয়া আসিয়া তাহার ছোট উড়ানীটি দিয়া তাঁহার মুখের ঘাম মুছাইয়া দিত। গ্রন্থ-বিস্তারের ভয়েই বোধকরি পুরাণকারেরা এই সব কথা লিপিবদ্ধ করেন নাই। যাহা হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না। ভাবুক ভক্তের হৃদয়ে এই সব ছবি অনন্ত কালের জন্য আঁকা হইয়া আছে।

উত্তর বিহারে জনকপুর নামে একটি ক্ষুদ্র

---

* নানাকারৈঃ শক্তিকদম্বৈর্ভুবনানি,
ব্যাপ্য স্বৈরং ক্রীড়তি যেয়ং স্বয়মেকা।
কল্যাণীং তাং কল্পলতামানতিভাজাং
গৌরীমম্বামম্বুরুহাক্ষীমহমীড়ে ॥
প্রাতঃকালে ভাববিশুদ্ধঃ প্রণিধানাৎ,
ভক্ত্যা নিত্যং জল্পতি গৌরীদশকং যঃ।
বাচাং সিদ্ধিং সম্পদমগ্র্যাং শিবভক্তিং
তস্যাবশ্যং পর্বতপুত্রী বিদধাতি ॥

গ্রাম এখনও বিদ্যমান। কিম্বদন্তী এই যে, এখানেই জনকরাজার রাজধানী ছিল। বালিকা সীতার কিছু কিছু কথা-কাহিনী গ্রামবাসীরা পুরুষানুক্রমে এখনও জীয়াইয়া রাখিয়াছে। কয়েকবৎসর আগে বেলুড় মঠের জনৈক পরিব্রাজক সন্ন্যাসী ঐ স্থানে উপস্থিত হন। বড় বড় গাছের নীচে কয়েকটি ভগ্ন দেউল আছে। সন্ধ্যাকালে গ্রামবাসীরা তথায় সমবেত হইয়া জনকরাজা এবং রামসীতার গান ও কথকতা করে। অনাড়ম্বর, সরল এমন একটি স্নিগ্ধ ভাব স্থানটিতে ছাইয়া আছে যে সন্ন্যাসী মুগ্ধ হইলেন। সাতদিন রহিলেন, প্রাণ ভরিয়া জনকদুলালীর স্মৃতি হৃদয়ে সঞ্চয় করিলেন।

নন্দনন্দন কৃষ্ণ যখন তাঁহার অনোখা দৌরাত্ম্যসমূহ দ্বারা ব্রজভূমিতে ইতিহাস সৃষ্টি করিতেছেন এবং মুনিঋষিরা যখন ধ্যানধারণা ভুলিয়া শিশুর এই নানা রঙ্গের মধ্যে বেদ-বেদান্তের সিদ্ধান্ত দেখিতে তৎপর তখন কিছু দূরের একটি গ্রামে আর একটি শিশুর—একটি গোপবালিকার দিন কি ভাবে কাটিতেছিল? বালিকা রাধারাণী কি পুতুলখেলা করিতেন? উত্তরকালে যাঁহাকে আমরা পরমেশ্বরের হ্লাদিনী অর্থাৎ আনন্দদায়িনী শক্তিরূপে আরাধনা করি সেই ব্রজেশ্বরী শ্রীরাধা যখন বৃষভানুদুহিতা সাজিয়াছেন তখনও কি তাঁহার আনন্দভাণ্ড হইতে তিনি মধু বিকীরণ করিতেছিলেন না? নাই বা করিলেন তিনি গোবর্ধন ধারণ, নাই বা করিলেন দমন তিনি শকটাসুর, নাই বা বাজাইলেন তিনি ভুবনভুলানো বাঁশের বাঁশী—কিন্তু মিষ্ট হাসিটি তো ছিল, সঙ্গিনীদের সহিত খেলাধুলা দৌড়ঝাঁপ তো ছিল, মায়ের কাছে নানা আবদার, ছোট ছোট মান অভিমান তো ছিল—সেগুলিতে কি বিশ্বানন্দদায়িনীর আনন্দ-ব্যঞ্জনা সঞ্চারিত হয় নাই? পুতুলখেলারত বালিকা রাধা কি ভক্তহৃদয়ে অপার্থিব চৈতন্য-স্ফূর্তি জাগাইয়া সংসারবন্ধন শিথিল করিতে পারেন না?

শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে একটি বালিকার সংবাদ আছে। শুম্ভ ও নিশুম্ভের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া দেবতারা বিপদুদ্ধারের অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া আদ্যাশক্তি জগন্মাতার প্রসাদ ভিক্ষা করিবার জন্য হিমালয়ের পাদদেশে গিয়া তাঁহার স্তব আরম্ভ করিয়াছেন। ছন্দ-অলঙ্কারসমৃদ্ধ লম্বা স্তব। বেদ-বেদান্তের তত্ত্ব প্রতি শ্লোকে গম গম করিতেছে, শব্দরাশির মধ্য দিয়া চিত্ত-চমৎকারী কাব্যসৌরভ নির্গত হইতেছে। দেবতারা আত্ম-বিভোর হইয়া স্তুতিগান করিয়া চলিয়াছেন। বিপদে পড়িলে ভিতর হইতে এমন সুন্দর কবিতাও যে আপনা আপনি বাহির হইতে পারে—দেখিয়া তাঁহারা নিজেদের কীর্তিতে নিজেরাই মুগ্ধ হইয়াছেন। বাহিরের হুঁস হারাইয়াছেন। এদিকে তাঁহাদের অলক্ষ্যে একটি বালিকার খেলা শুরু হইয়াছে। জগজ্জননী দেবতাদের লইয়া একটু মজা করিবার জন্য স্নানার্থিনী বালিকার বেশে হিমালয়ের পাদদেশপ্রবাহিতা জাহ্নবীতটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ত্রিগুণমুক্তা বালিকা না সাজিলে কি বেপরোয়া খেলা খেলা চলে? দেবতাদের কত বিভিন্ন সুরত, কত বিচিত্র বেশভূষা, সেই দেব-জমায়তের পরিবেশ কী গম্ভীর! কিন্তু বালিকাটির কি কোনও সঙ্কোচ আছে, ভয় আছে? সিদা প্রশ্ন,—হ্যাঁ গা, তোমরা কে?

দেবতারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাহি করিতেছেন। হঠাৎ কোথা হইতে এই বালিকার আবির্ভাব হইল? বালিকার মুখে মৃদু মৃদু হাসি। ঠিক হইয়াছে। দেবতারা

ধোকা খাইয়াছেন। তখন বীণা-নিন্দিত কণ্ঠে আবার প্রশ্ন, এবার একটু বড় প্রশ্ন, হ্যাঁ গা, তোমরা কার উদ্দেশ্যে স্তব গান কোরছ?

দেবতারা এবার একেবারেই হতভম্ব। মুখে কোনও কথা যোগাইতেছে না। তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া বালিকার বড় মজা লাগিতেছে; আরও খানিকক্ষণ খেলা করিতে ইচ্ছা হইতেছে; —কিন্তু এদিকে করুণাও জাগিয়াছে; আহা বেচারীরা বড় সঙ্কটাপন্ন, মনে উহাদের বিষম উৎকণ্ঠা। উহাদের দুর্ভাবনার আগে শান্তি করি। তখন আবার মধু-নিস্যন্দী স্বরে বালিকা বলিতেছেন,—পারলে না তো বলতে কার স্তব কোরছ? শোন তবে মশায়রা, যাঁর স্তব তোমরা কোরছ, আমিই সেই মহাশক্তি। দশটা হাতে দশটা অস্ত্র না দেখলে তোমাদের বুঝি শক্তিকে বিশ্বাস হয় না? আমি যে বিনা অস্ত্রে, বিনা অলঙ্কারে, বিনা বাহনে, বিনা আড়ম্বরে, শুধু একটু চোখের ইসারায় বিশ্বভুবনকে নাচাইতে পারি তা বুঝি তোমরা জান না? দেখ, দেখ, তবে দেখ।

তখন সেই বালিকার মূর্তি হইতে দেবী অম্বিকা মূর্তির আবির্ভাব, সিংহের উপর বসিয়া চণ্ড-মুণ্ডের চোখঝলসানো ইত্যাদি ইত্যাদি চণ্ডীর উত্তরগ্রন্থের যাবতীয় ঘটনা পর পর ঘটিয়া যাওয়া। কিন্তু ত্রিভুবন-কাঁপানো এত বড় তাণ্ডবযুদ্ধের মধ্যে মাঝে মাঝে বালিকার কণ্ঠস্বর কি আমরা শুনিতে পাই না?

দূত সুগ্রীবের লম্বা বক্তৃতার উত্তরে—

"তা কি করি বলতো? একবার যে প্রতিজ্ঞা করে বসেছি তা কি মিছে করা চলে?"

(চণ্ডী, ৫।১২৮)

ভ্রাতা নিশুম্ভের মৃত্যুর পর ক্রুদ্ধ শুম্ভের অভিযোগের উত্তরে—"খুব বুদ্ধিমানের মতো কথা বলছো দেখছি। এই সব নানা দেবীদের সংহারমূর্তি কি আমা থেকে আলাদা? আমি ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ আছে কি জগতে? বেশ, যদি বিশ্বাস না হয় আমার কথায় তো দেখ। আমার বুকে সবাইকে মিশিয়ে দিচ্ছি।"

(চণ্ডী, ১০।৫)

হ্যাঁ, এই বচনভঙ্গিমা কেবল একটি কৌতুক-ময়ী বালিকারই মুখ হইতে বাহির হইতে পারে। চণ্ডীগ্রন্থের ঋষি ঠিকই বলিয়াছেন,—ভগবতী দুর্গা গম্ভীরান্তঃস্মিতা (চণ্ডী, ৫।১১৬) তিনি একাধারে গম্ভীর, আবার অন্তঃস্মিতা। সৃষ্টি-স্থিতি-পালন-রূপ বিপুল কার্য যখন করিতেছেন তখন বাহিরের দিক দিয়া তিনি সুগম্ভীর- কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি সর্বদাই হাসিতেছেন। হাস্যময়ী-বালিকাত্বই যেন তাঁহার ত্রিগুণমুক্ত নিত্যস্বরূপ। আচার্য শঙ্কর উপর্যুক্ত গৌরীদশকম্ স্তোত্রের দশম শ্লোকে দেবীর এই বালিকামূর্তিরই পরিচয় দিয়াছেন—স্বৈরং ক্রীড়তি যেয়ং স্বয়মেকা—যিনি আপনা আপনি আপনার খেয়ালমতো বিশ্বসংসারকে লইয়া পুতুলখেলা খেলিতেছেন।

*

পূজ্যপাদ শিবানন্দ (মহাপুরুষ) মহারাজ প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার বেশ কিছুকাল আগে হইতে আগমনীসঙ্গীত শুনিতে চাহিতেন। বলিতেন, বাংলা দেশে যেমন জগজ্জননীকে হৃদয়ের সকল স্নেহ আবেগ ভালবাসা ঢালিয়া কন্যাভাবে আরাধনা করা হয় এমন আর ভারতের অন্য কোথাও দেখা যায় না। জগ-জ্জননী উমা যেন আমাদেরই ঘরের মেয়ে। এই মেয়ের জন্য সারা বৎসর ধরিয়া প্রতীক্ষা, তাহার পর সে আসিলে তাহাকে খাওয়ানো পরানো আদর করা এবং নির্দিষ্ট কালের পরে ঐ মেয়ে চলিয়া গেলে তাহার জন্য বুকভাঙ্গা

বেদনা—আগমনীসঙ্গীতের মাধ্যমে এই ভাবগুলি কী চমৎকারই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সকল ঘরোয়া ভাবের ভিতর দিয়া জগদম্বার চিন্তা অত্যন্ত বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক উপাসনা। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ জগন্মাতার কন্যাভাবের প্রতীক কুমারিকা অন্তরীপের প্রসিদ্ধ কন্যাকুমারী মূর্তি সেই জন্য বড় ভালবাসিতেন।

শক্তিসাধক রামপ্রসাদ ইষ্টদেবী মহাকালিকার নানাভাবের অনুভূতি যে লাভ করিয়াছিলেন তাহার কিছু কিছু পরিচয় আমরা তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলিতে পাই।

জগজ্জননী এক সময়ে তাঁহার মেয়ে সাজিয়া তাঁহার ঘরের বেড়া বাঁধিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, ইহা রামপ্রসাদের জীবনের একটি সুবিদিত ঘটনা। সাধক রামপ্রসাদ তাঁহার কোনও কোনও গানে জগজ্জননীকে কন্যারূপে সম্বোধন করিয়াছেন।

"প্রসাদ বলে কুতূহলে এমন মেয়ে কোথায় ছিল,
যাঁরে) না দেখে নাম শুনে কানে
মন গিয়ে তায় লিপ্ত হল।"

বিষ্ণুপুরের রাজবাড়িতে প্রতিষ্ঠিতা মৃন্ময়ী দেবীর কাহিনী বলিতে বলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে বিভোর হইতেন। জগজ্জননী মহারাজের কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বালিকার আশ্চর্য আকর্ষণ, কিন্তু এই আকর্ষণের মূল কোথায় তাহা কেহ জানিত না। ভক্তকে কৃতার্থ করিতে জগজ্জননী তাঁহার কামনা পূর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু মানবী হইয়া জমিদারগৃহে ছদ্মবেশে বেশীদিন তো থাকা চলে না। মৃন্ময়ী পালাইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। একদিন "পিতা" বিষ্ণুপুর-রাজ খুব কাজে ব্যস্ত। চঞ্চলা বালিকা তাঁহাকে নানাভাবে বিরক্ত করিতে লাগিয়া গেলেন। মহারাজ অবশেষে সত্যই বিরক্ত হইয়া মৃদু তিরস্কার করিয়া বলিলেন, এখন যা।

কৌতুকময়ী আর একবার "পিতার" মুখ হইতে আদেশ কায়েম করাইয়া লইবার মানসে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা, তবে যাই?

হ্যাঁ যাও।

তবে আর কি। নৃত্যময়ী এক ছুটে দেউড়ি পার। হঠাৎ মহারাজের হুঁস হইল, মৃন্ময়ীকে কি বলিলাম। খাতাপত্র ফেলিয়া মহারাজ ছুটিয়া বাহির হইলেন। মৃন্ময়ী, মৃন্ময়ী। কোথায় মৃন্ময়ী? প্রাসাদের দেওয়াল হইতে প্রতিধ্বনি উঠিতে লাগিল নেই, নেই, নেই। তিরোধানের সময়েও ব্রহ্মময়ীর কত রঙ্গ। বাজারে শাঁখার দোকানে গিয়া শাঁখা পরা হইয়াছে; বলা হইয়াছে, দাম বাবা পরে দেবেন। বিরাট পুষ্করিণীর জল তোলপাড় করিয়া অন্বেষণ চলিতেছে বালিকা জলে ডুবিয়াছে কিনা। হঠাৎ শাঁখাপরা হাতটি পদ্মের মৃণালের মতো পুষ্করিণীর বুকে ভাসিয়া উঠিল। কাহারও সন্দেহ রহিল না, কে এতদিন কন্যাবেশে রাজগৃহে সকলের মনোহরণ করিয়াছে, হাসিয়াছে, খেলিয়াছে কত আদর আবদার করিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বঙ্গপল্লীরঙ্গালয়ে রঙ্গিণী বালিকার কণ্ঠস্বর আর একবার শোনা গিয়াছে। "মা, আমি এলাম।" এবার বড়ই গোপনে, বড়ই অনাড়ম্বরে আসা। কিছুতেই ধরিবার উপায় নাই। গ্রামের আরও দশটি বিশটি বালিকার মতো পল্লীগৃহে গৃহস্থের সংসারের খুঁটিনাটি কত কাজ করিতেছেন। পিতামাতার মাঝে মাঝে চমক লাগিতেছে, কে এই অপূর্ব মমতাময়ী কন্যা। কিন্তু তাঁহাদের ভুল ভাঙ্গিয়া দিতেছেন না। অসামান্যা সামান্যারূপেই চলিতেছেন, ফিরিতেছেন। ভক্তের ভাবচক্ষুতে জননী সারদাদেবীর বালিকাকালের এই সকল চিত্র অপরূপ সৌন্দর্য বহিয়া আনে। হৃদয় জুড়াইয়া যায়, প্রাণ অপার্থিব শান্তিতে ভরিয়া উঠে।

*

এমনি করিয়া সর্বৈশ্বর্যশালিনী মহামায়ার ঐশ্বর্য-বিমুক্ত বালিকাচরিত্রের নানা স্মৃতি আমরা চিত্তে সঞ্চয় করিয়া লই। সেই স্মৃতি দুঃখের দিনে আমাদের নিকট আনন্দ সঙ্গীত অনুরণিত করে, জীবনের মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎপ্রভা বিকীর্ণ করে, বিমূঢ়তা, শোক ও ভয়ের মাঝখানে আমাদিগকে দেখায় পথের ইঙ্গিত, দেয় সান্ত্বনা, শুনায় অভয়বাণী।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাব

অধ্যাপক রেজাউল করীম

আজ থেকে একশ' বছরের অধিক হয়ে গেল যুগাবতার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আমাদের এই মরজগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি এদেশের ধর্মচিন্তায় নবযুগ প্রবর্তন করেন। আজ শতাধিক বছর পরে প্রশ্ন উঠেছে, তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য কতটা সার্থক হয়েছে? প্রত্যেক দেশে ও যুগে যখন কোন মহাপুরুষ আবির্ভূত হন, তখন তিনি সঙ্গে নিয়ে আসেন একটা বাণী, একটা আদর্শ, একটা জীবনদর্শন। তাঁর সেই বাণী, সেই জীবনদর্শন তাঁর যুগের নানা সমস্যার সমাধান করে দেয়, নানাভাবে জনগণের কল্যাণ সাধন করে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সেইরূপ একজন মহাপুরুষ যিনি এদেশের উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে একটা যুগান্তর আনয়ন করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর ছিল লোকোত্তর প্রতিভা, অপূর্ব অধ্যাত্মজ্ঞান এবং সুবিশাল মানবপ্রেম। উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশের বহু মানুষের তিনি রূপান্তর ঘটিয়েছেন। তাদেরকে আদর্শ দিয়েছেন। সর্বোপরি তাদের জীবনকে আধ্যাত্মিক-ভাবাপন্ন করেছিলেন। কোনওরূপ সঙ্কীর্ণতা তাঁর মধ্যে ছিল না ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মত ছিল অত্যন্ত উদার। সেই জন্য সকল ধর্মের মূল সত্যকে তিনি ধরতে পেরেছিলেন। তাঁর মত এমন উদার ধর্মবোধ আর কারুর ছিল না। তিনি সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শ স্থাপন করেছেন। ক্রিয়াকাণ্ড- ও আচার-সর্বস্ব সমাজে তিনি সেবাধর্মের আদর্শ স্থাপন করলেন। এবং নিজের আচরণ দ্বারা দেখালেন যে যেখানে মানবপ্রেম নাই, জনসেবা নাই, উদারতা নাই সেখানে সত্য ধর্মও নাই।

ঠাকুরের আগমনের সময়টা বিবেচনা করা দরকার। পাশ্চাত্য সভ্যতা তখন এদেশের উপর প্রভাব বিস্তার করতে উদ্যত। এই জড়বাদী সভ্যতা এদেশের ধর্মবিশ্বাসের উপর আঘাত হানতে লেগেছে। আর্থিক ও বৈষয়িক উন্নতির ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতা তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি কোন্ দিন হারিয়ে ফেলেছে। ইউরোপের যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ আদর্শ ছিল এদেশে তা বেশী আমদানী হতে পারে নাই। শ্রেষ্ঠ অংশের পরিবর্তে এসেছিল সাম্রাজ্যবাদী মতবাদ, বিলাস-ব্যসন, ভোগলালসা। সাম্রাজ্যবিস্তার-কামী ভাগ্যান্বেষী মানুষের দল এদেশে এসে কেবল লুণ্ঠনই করতে চেয়েছিল। রাজ্যবিস্তার আর এদেশের লোকের প্রতি মুরুব্বিয়ানার ভাব, এই দুই কাজ একই সঙ্গে চলতে লাগল। এদেশের বহুলোক, বিশেষ করে ইংরেজীশিক্ষিত লোক পাশ্চাত্য প্রভাবের বন্যায় ভেসে যেতে লাগল। এ বন্যা রোধ করবে কে? বিধাতা ঠিক এই সময় ঠিক মানুষকেই পাঠালেন এই দুঃসাধ্য কাজ সাধনের জন্য। এলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে জাতির জীবনে এক নূতন প্রাণস্পন্দন অনুভূত হতে লাগল। কারলাইল এক স্থানে বলেছেন, "The great man, with his free force, direct out of God's own hand is the lightning. His word is the wise healing word which all can believe in. ......In all epochs of the world's history, we shall find the great Man to have been the indispensable saviour of his epoch – the lightning without which the fuel never would have burnt."

মর্মার্থ—"মহাপুরুষ হচ্ছেন বিধাতার হাতের তৈরী বিদ্যুৎ, তাঁর বাণী বিজ্ঞতায় পূর্ণ, আর তা সকল ক্ষতকে নিরাময় করে। জগতের ইতিহাসের সকল যুগে, সেই যুগের উদ্ধারকারী অপরিহার্য মানুষ আসেন। তিনি বিদ্যুৎ, সেই বিদ্যুৎ ব্যতীত প্রাণহীন ইন্ধন প্রজ্বলিত হয় না।" রামকৃষ্ণদেব হচ্ছেন সেই বিদ্যুৎ যা এদেশের প্রাণহীন ইন্ধনকে নূতন শক্তিতে জ্বালিয়ে দিয়েছেন। দক্ষিণেশ্বরের এই সাধক মানুষটি ছিলেন অত্যন্ত সহজ সরল ও স্বাভাবিক। প্রচলিত ভাষায় যাকে লেখা-পড়া শিক্ষা বলে, তা তাঁর ছিল না। কিন্তু জন্মের শুভলগ্ন থেকে তাঁর ছিল ভগবৎদত্ত কতকগুলি বিশেষগুণ ও বৈশিষ্ট্য, যা প্রত্যেক দেশের মহাপুরুষের থাকে—মন আত্মভোলা, সংসারে অনাসক্তি, দেহমন সর্বদাই ঈশ্বরে সমর্পিত, বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের দিকে ততটা লক্ষ্য নাই যতটা আছে ভিতরের আলোর দিকে। তাঁর অন্তরে ছিল গভীর ঈশ্বর-ভক্তি, মানবের প্রতি ছিল অসীম করুণা। একান্ত ভাবে অধ্যাত্ম-সাধনা করতে করতে তিনি উপলব্ধি করলেন যে লৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের অন্তরালে আছেন আসল সত্তা, আসল ভগবান! তাঁকে পেতে হলে বহু সাধনা করতে হবে। তাঁকে পাওয়াই চরম পাওয়া। তাঁকে না পেলে কোন পাওয়া পাওয়া নয়। দিনের পর দিন চললো তাঁর সাধনা। ক্রমে আঁধার কেটে গেল, সন্দেহ দূর হল। তিনি জ্যোতির ধ্রুব জগতে প্রবেশ করলেন এবং জ্যোতির্ময়ের সাক্ষাৎ লাভ করলেন। সব বাধা ব্যবধান ঘুচে গেল। সন্ধান পেলেন এক নূতন জগতের। যে জগতে সঙ্কীর্ণতা নাই, ভেদ নাই, কলহ নাই—সব একাকার।

যুগে যুগে ধর্মকে কেন্দ্র করে মানবসমাজে চলে আসছে নানা মতদ্বৈধ, গণ্ডগোল ও মারামারি। এ বলে আমার ধর্ম শ্রেষ্ঠ, ও বলে আমার ধর্ম শ্রেষ্ঠ। একজন বলে আমার ধর্ম অবলম্বন না করলে মুক্তি বা পরিত্রাণ নাই, অপর একজন বলে ঠিক তার বিপরীত কথা। ধর্ম যেন বিষয়সম্পত্তি যা নিয়ে বিভিন্ন শরীকদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ অপরিহার্য। এসব দেখে ঠাকুর রামকৃষ্ণের মনে সন্দেহ জাগল। এ আবার কি কথা!—ওরা ঝগড়া বিবাদ করে ধর্মের মীমাংসা করবে! উদার দয়াবান ভগবান কি কেবল কতকগুলি লোককে উদ্ধার করবেন? আর অধিকাংশ লোককে ধ্বংস করে দেবেন, তাদের অনন্ত নরক-ধামের ব্যবস্থা করবেন? এ কোন ধরনের ভগবান? এ তাঁর কোন ধরনের বিচারপ্রণালী? প্রেমময়, প্রীতিময়, মঙ্গলময় ভগবানের এ কেমন বিচার? তাই ঠাকুর পরমহংসদেব স্থির করলেন যে, তিনি সর্ব-ধর্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেখাবেন এই সব বিভিন্ন ধর্মের মূল কথাটা কি। তার পর তাঁর আরম্ভ হল সকল ধর্মের সাধন। বহু সম্প্রদায়-বিশিষ্ট হিন্দু ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, খৃস্টান ধর্ম, বহু ধর্ম সাধনা করলেন। প্রত্যেক ধর্ম সাধনা করবার সময় সেই ধর্মের রীতিনীতি, উপাসনাপদ্ধতি সবই পালন করলেন। দেখলেন, সব ধর্মই মূলতঃ এক ও অভিন্ন। পথ বিভিন্ন কিন্তু লক্ষ্য এক, সকলেই বিভিন্ন পথে একই গন্তব্য স্থানের দিকে চলেছে। তিনি একটি সুন্দর উপমা দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়ে দিলেন। কল্পনা করা যাক, একটি বিরাট সরোবরের চারিদিকে নানা ঘাট এই সরোবরের ঘাটে নানা সম্প্রদায়ের লোক জল ব্যবহার করে। ঘাট বিভিন্ন হলেও একই জল। উত্তর ঘাটের জল দক্ষিণ ঘাটের জলের চেয়ে বেশী মিষ্ট বা বেশী ভাল নয়, সবই এক। তেমনি ভগবানলাভের পথ বিভিন্ন হতে পারে, কিন্তু যে পথেই যাও, সেই একই

ভগবানকে পাওয়া যাবে। তাই ঠাকুর একটি যুগান্তকারী ঘোষণা করলেন, "যত মত তত পথ"। ভগবানকে পাবার পথ একটিমাত্র নয়। তা হতেই পারে না। সব পথই ভক্তকে নিয়ে যাবে তাঁর নিকট। "যত মত তত পথ"—এই যে ঘোষণা, তা এ যুগের একটি যুগান্তকারী ঘোষণা। ঠাকুরের পূর্বে এমনভাবে কেউ এ কথা বলতে পারেন নাই। বর্তমান যুগ যেন এমন একটি মহাবাণীর জন্য অপেক্ষা করছিল। ঠাকুর সেই বাণী জগৎসমক্ষে প্রচার করলেন। ধর্ম সম্বন্ধে এই যে উদার মতবাদ, তার প্রভাব সুদূর-প্রসারী। বহুযুগ থেকে ধর্মকে এরূপ উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখবার অভ্যাস মানুষ ভুলে গিয়েছিল। অবশ্য মধ্যযুগে কবীর, নানক, চৈতন্য, রামানন্দ প্রমুখ সাধক ও মহামানবগণ উদার দৃষ্টি দিয়ে ধর্মকে দেখেছিলেন। তাঁদের যুগে তাঁরা এই উদার মত প্রচারের ব্রতে কিছুটা সফলতাও লাভ করেছিলেন কিন্তু কালক্রমে তাঁদের সে শিক্ষা লোকে ভুলে গেল। তারপর বিদেশী ইংরেজের আগমনের পর নানা কারণে এদেশে ধর্মবিরোধ দেখা দিল। বিদেশী সরকারের ভেদনীতিমূলক আচরণ ও রাজনৈতিক সমস্যা এমনভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে জাগ্রত করে তুললো যে সাধারণ মানুষ ধর্মের উদার দিকটা ভুলে গেল। লোকে মনে করতে লাগল, ধর্ম সম্বন্ধে যত অনুদার, যত সংকীর্ণ হওয়া যাবে, তত সুষ্ঠুভাবে ধর্ম পালিত হবে। শেষে অবস্থা এমন হল যে, ঐক্য ও মিলনের ক্ষেত্র রচনার পরিবর্তে ধর্ম রচনা করল বিভেদ, অনৈক্য। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করল। কোন কোন লোক মনে করল, অপর ধর্মের নিন্দা না করলে নিজের ধর্মের মহিমা কীর্তন করা হয় না।

ঠিক এই সময় ধর্ম সম্বন্ধে উদার মতবাদ ঘোষণা করার জন্য যেন রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব ঘটল। তিনি সম্প্রদায়িক গণ্ডি ভেঙ্গে দিয়ে সংকীর্ণতার আবরণ উন্মোচন করে বললেন, সব ধর্ম সত্য ও সব ধর্মে ঈশ্বরপ্রাপ্তি, মোক্ষলাভ সম্ভব। শুধু তাই নয়, তিনি ধর্মের মূল কথাটা সহজেই ধরে ফেললেন। সেটা এই যে, জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণসাধনই আসল ধর্ম। ক্রিয়াকাণ্ড, আচার-বিচারকে যখন মানবসমাজ একমাত্র সার বস্তু বলে মনে করত তখন রামকৃষ্ণদেব এ সবের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার না করেও দ্বিধাহীন কণ্ঠে বললেন, "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"-ই হল আসল পূজা। জীবকে বাদ দিয়ে শিবপূজা হয় না। তাঁর কণ্ঠ থেকে এই কথা শুনে স্বামী বিবেকানন্দ বলে উঠলেন, ধর্মের এ এক নূতন বাণী আর এ বাণী বৈপ্লবিক বাণী। ঠাকুরের এই বাণীকে তিনি সর্বত্র প্রচার করতে লাগলেন।

বস্তুতঃ রামকৃষ্ণদেবের এই দুইটি বাণীর পর ধর্মীয় গোঁড়ামির কোন স্থান নাই—যথা, "যত মত তত পথ" ও "শিবজ্ঞানে জীবের পূজা।" ঠাকুরের এইসব মহাবাণীর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বামীজী জগৎসভায় ভারতীয় ধর্মের শাশ্বত বাণী কম্বুকণ্ঠে প্রচার করতে লাগলেন।

তিনি ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে এইসব বাণীকে লোকপ্রিয় করে তুললেন এবং সর্বপ্রকার ধর্মান্ধতার মূলে কুঠারা-ঘাত করলেন। তাঁর প্রচারের পর কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল, সর্বত্র ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরম্ভ হল। গোঁড়ামি হ্রাস পেতে লাগল। আজ আর ব্যাপকভাবে পর-ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব দেখাতে কেউ কুণ্ঠিত হয় না। এই উদার মনোভাবকে রামকৃষ্ণদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাব বলে মনে করা নিতান্ত ভুল হবে না।

আজ নানা সমাজে যে ধর্মসমন্বয়ের কথা আলোচিত হচ্ছে তাও ঠাকুরের শিক্ষার প্রভাব। ধর্মের নামে ক্রুসেড্ ও জেহাদের জিগির আর বড় একটা কেউ তোলে না। এটাও ঠাকুরের শিক্ষার প্রভাব। বহু ধর্মপ্রতিষ্ঠান সেবাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তা-ও ঠাকুরের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত। ধর্মধ্বজীগণ ধর্মবিরোধ নিয়ে বিতর্কের বদলে ধর্মসমন্বয়ের সম্ভাবনার কথাই বেশী করে ভাবতে আরম্ভ করছেন। ধর্মের দিক দিয়ে মানুষ বহু পরিমাণে উদার হয়েছে। এই উদার মনোভাবের মধ্যেও ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রভাব অনুভব করি। এদেশের হিন্দু, মুসলমান ও অন্য সম্প্রদায়ের ধর্মসভায় আজ সকল ধর্মের লোককে আহ্বান করা হয়। তাতে প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্মের মহিমা অকপটে ব্যক্ত করেন। অপর ধর্মের গুণাবলীর কথাও আবিষ্কার করতে বিস্মৃত হন না। একশ' বছর পূর্বে এসব জিনিস কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। সারা ভারতবর্ষে রামকৃষ্ণদেবের প্রভাব পরিব্যাপ্ত। সমাজের জীবনে রাজনীতির প্রভাব অস্থায়ী। মুহূর্তে মুহূর্তে তার পরিবর্তন হয়। আজ যিনি রাজনৈতিক নেতা কাল হয়তো তিনি ভূলুণ্ঠিত। কিন্তু সমাজে ধর্ম-নীতির প্রভাব অসীম। মানুষের ধর্মচেতনা যতই বৃদ্ধি পায় ধর্মের প্রভাব ততই গভীর ও প্রাণসঞ্চারী হয়। মানুষকে উদার ধর্মবোধ সকলেই দিতে পারেন না। কিন্তু যিনি দিতে পারেন তিনি সকল মানুষের হিতকারী। রামকৃষ্ণদেব সেই উদার ধর্মবোধ এনে দিয়েছেন, সেইজন্য আজ তাঁর কথা বার বার স্মরণ করি। প্রার্থনা করি ভারতবাসী তাঁর প্রভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে উঠুক, ধর্মান্ধতার দ্বারা যেন সে আর কখনও বিভ্রান্ত না হয়।

মা

(গান : বেহাগ-খাম্বাজ, ঝাঁপতাল)

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
শ্যামা-সুতা হয়ে মা গো, সেজেছ সারদামণি॥
সরস্বতী মহাভাগা. বিদ্যা কমল-নয়নী.
তুমি সীতা, রাধা তুমি, শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গিনী॥

সৃষ্টি স্থিতি বিনাশিনী
সর্ব-জীবার্তি-হারিণী,

অজস্র অশরণ জনে অভয়-পদ-দায়িনী।

তুমি আদ্যাশক্তি শিবা, হরহৃদি-বিহারিণী,
রামকৃষ্ণ-আরাধিতা, নমামি বিশ্বজননি।

রাশিয়ায় বিবেকানন্দ-চর্চা

অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

বিগত ১৯৬৩-৬৪ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী পৃথিবীর বহু বিভিন্ন দেশে নানা উৎসব-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। সোভিয়েট রাশিয়াতেও বিশেষ উদ্দীপনা সহকারে ভারত তথা পৃথিবীর এই মহান নায়কের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হইয়াছিল। মস্কো ও লেনিনগ্রাদে দু'টি অনুষ্ঠানের বিবরণ বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[১] মস্কোতে "Institute of the Peoples of Asia", Institute of Philosophy" এবং "Academy of Science" নামক তিনটি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে অ্যাকাডেমিশিয়ান পি. এন. ফিডোসিয়েভ (Fidosiev)-এর পৌরোহিত্যে এক আলোচনা-সভার অনুষ্ঠান হয়। এতে "মানবতাবাদী ও সমাজ-প্রগতি যুদ্ধের যোদ্ধা বিবেকানন্দ", "বিবেকানন্দের দার্শনিক মতবাদসমূহ, "বিবেকানন্দ ও ভারতীয় সাহিত্য," "বিবেকানন্দের আলোকপ্রদ ধারণাসমূহ" ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা করা হয়। লেনিনগ্রাদে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং "Leningrad Branch of Soviet Indian Cultural Society"-র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত অপর এক আলোচনা-সভায় "ভারতের আন্তর্জাতিক সম্পর্কসমূহ এবং স্বামী বিবেকানন্দের কার্যাবলী", "বিবেকানন্দের মানবতাবাদ" এবং "ভারতের মহান সন্তান বিবেকানন্দ" প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনা করা হয়। এই সকল প্রবন্ধের শিরোনামা হতে একথা সুস্পষ্ট যে, স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা ও অবদানের নানা-বিচিত্র দিক সম্পর্কে আজকের রাশিয়ায় প্রচুর আগ্রহ জন্মেছে এবং চিন্তাশীল শ্রেণীর মধ্যে এ নিয়ে বহুল চর্চা চলেছে।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারার সঙ্গে রাশিয়ার পরিচয় আজ অবশ্য নূতন নয়। এ পরিচয়ের সুরু স্বামী বিবেকানন্দের সমসাময়িক কালে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চিকাগো ধর্মমহাসভায় যখন বিবেকানন্দ যোগদান করতে যান তখন থেকেই এর সুরু। উক্ত ধর্মমহাসভায় রাশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন Prince Wolkonsky। তিনি স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের দ্বারা বিশেষভাবে আকর্ষিত হয়েছিলেন এবং দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে পত্রবিনিময়ও করেছিলেন।[২] অপর একজন প্রখ্যাত রুশদেশীয়ের সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়েছিল—তিনি Prince Kropotkin। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই স্মরণীয় সাক্ষাতের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখতে কেউ বিন্দুমাত্র প্রযত্ন করেনি। আজকের রুশদেশের চিন্তাবিদ্‌দের ধারণা বিবেকানন্দ এই সাক্ষাতের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।[৩] অসম্ভব নয়, কারণ বিবেকানন্দের নূতন ভাব গ্রহণ করবার ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত - বস্তুতঃ বিশ্বের সকল মহান ভাবধারার মহাসমুদ্রতুল্য সঙ্গমস্থল ছিল তাঁর মানস-

---

১ "Worldwide Celebrations of Swami Vivekananda Centenary."—Published by Vivekananda Centenary Committee – p.128.

২ Marie Louise Burke—Swami Vivekananda in America—New Discoveries—p, 66-67

৩ Chelysev—"The Great Humanist, Democrat and Patriot"—Vivekananda Centenary Memorial Vol.—p. 514

ক্ষেত্র। কিন্তু প্রশ্ন এই Prince Kropotkin'ও কি তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হননি? আকর্ষণ বোধ করেননি তিনি বিবেকানন্দের সেই চুম্বকের মত আকর্ষণশীল ব্যক্তিত্বের প্রতি, যাকে রোঁমা রোঁলা বর্ণিত করেছেন অপ্রতিরোধ্য বলে, কোন বিস্ময় কি অনুভব করেননি তিনি তাঁর সেই দুঃসাহসিক দার্শনিক মতবাদের পরিচয় লাভ করে, যাকে টলস্টয়ের মনে হয়েছিল পৃথিবীর মানুষের চরম উৎকর্ষের পরিচয়? সেই অগ্নিময় বাণী যা উক্ত হবার ত্রিশবৎসর পরে শুধু লিপির মাধ্যমে রোঁলাকে বিদ্যুৎস্পর্শের মত চমকিত করেছিল তা স্বয়ং বক্তার মুখ হতে নির্গত হবার কালে এ ক্ষেত্রে কোন প্রতিবেদনই কি সৃষ্টি করেনি? সর্বোপরি সেই অপূর্ব মানবতাবাদ যা আজকের রাশিয়াকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করেছে, তা কি মানবদুঃখে বিদ্রোহী ক্রোপটকিনের অন্তরে কোন রেখাপাত করেনি? এখানেই ত' দুজনের প্রকাণ্ড ঐক্য রয়েছে।

বিভিন্ন দেশের অত্যাচারিত মানুষদের দুঃখ দাবানলের মত বিবেকানন্দের অন্তরকেও প্রতিনিয়ত দগ্ধ করেছে; সেই নিদারুণ দুঃখের তাড়নায় তিনিও বিদ্রোহ ঘোষণা করে বলেছেন—"আমি একজন সমাজতন্ত্রবাদী"। এ সাক্ষাতের ফলে সম্ভবতঃ উভয়তঃ প্রগাঢ় প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। সেজন্যই আমরা মনে করি যে, এ সাক্ষাতের বিবরণ কেউ যে লিখে রাখেননি এ একটি ঐতিহাসিক ভ্রান্তি।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীকারেরা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটি সংবাদ পরিবেশন করে জানান যে, পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণকালে স্বামীজীর একবার রাশিয়ায় যাবার প্রস্তাব হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা কার্যকর হয়ে ওঠেনি। কারা তাঁর কাছে রাশিয়ায় যাবার প্রস্তাব করেছিলেন? রাশিয়ায় তদানীন্তন মনীষিবর্গের মধ্যে কেউ? তাঁদের মধ্যে কারও কারও সঙ্গে কি তাঁর পত্রালাপ হয়েছিল? বিপ্লবীদের মধ্যে আরও কে কে তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন? কেন তাঁর রাশিয়ায় যাওয়া হল না? পাঠকচিত্ত এ বিষয়ে বিবেকানন্দের জীবনীকারদের রূঢ় সংক্ষিপ্ততায় স্বভাবতই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তখনকার অগ্নিগর্ভ রাশিয়ায় বিবেকানন্দের অগ্নিময় বাণী কোন পথে কতদূর পৌঁছেছিল, কোন প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল, কি ঘটেছিল প্রতিক্রিয়া—এ জানবার আগ্রহ অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক।

ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি Prince Wolkonsky-র মাধ্যমেই সম্ভবতঃ রাশিয়ার বিবেকানন্দের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। এবং সম্ভবতঃ তাঁরই মাধ্যমে ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত বক্তৃতাবলী রাশিয়ায় টলস্টয় প্রমুখ মনীষিবৃন্দের নিকট পৌঁছায়। এঁদের মধ্যে টলস্টয় তাঁর ডায়েরীতে বিবেকানন্দের ভাবধারার সম্পর্কে তাঁর মনের প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ করে রেখে গিয়েছেন। ১৮৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দের শীতকালে নিউইয়র্কে প্রদত্ত বিবেকানন্দের কয়েকটি বক্তৃতা পাঠ করে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের কোন তারিখে টলস্টয় তাঁর ডায়েরীতে লেখেন, ভারতীয় প্রজ্ঞার সুন্দর নিদর্শন একখানি পুস্তক তিনি পাঠ করলেন। বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও রচনার আর একখানি সঙ্কলন "Speeches and Articles" টলস্টয় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে পাঠ করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বিবেকানন্দের "Hymn of the People" এবং "God and Man" নামক দুইটি রচনা পাঠ করে টলস্টয় তাঁর ডায়েরীতে লেখেন, "লেখাটি অপূর্ব অদ্ভুত।" পরবর্তীকালে কোন ভারতীয়ের নিকট হতে বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' গ্রন্থখানি উপহার পেয়ে টলস্টয় প্রেরককে গ্রন্থটি সম্বন্ধে

লেখেন —"So far humanity has frequently gone backwards from this true and lofty and clear conception of the principle of life but never surpassed it." টলস্টয়ের দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ জীবনসত্যের শ্রেষ্ঠতম প্রবক্তা।

টলস্টয় শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর সঙ্গেও অল্প-বিস্তর পরিচিত ছিলেন বলে জানা যায়। এ বাণী সর্বসাধারণের কল্যাণ-বাণী বলে টলস্টয় মনে করতেন। দেখা যায় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে গণ-শিক্ষার জন্য তিনি একটি পাঠ্য-তালিকা রচনা করেছিলেন এবং তাতে পোস্রেদ্‌নিক সংস্করণের 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উক্তি' নামক পুস্তিকা-খানি অন্তর্ভুক্ত করেন।

প্রসঙ্গক্রমে লক্ষণীয় বিপ্লবপূর্ব রাশিয়াতে বিবেকানন্দের কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল। জানি না আজ তার একটি তালিকা-সংগ্রহ সম্ভব কি না। সম্ভব হলে রাশিয়ায় বিবেকানন্দ-চর্চা সম্বন্ধে অনেক আলোকপাত ঘটত। যাইহোক, উপরোক্ত পোস্রেদ্‌নিক সংস্করণের পুস্তকখানি ছাড়া আই নাঝিভিন তাঁর প্রকাশিত "Voices of the People" নামক সঙ্কলন-গ্রন্থে বিবেকানন্দের পূর্বোক্ত দু'টি রচনা "Hymn of the People" এবং "God and Man" প্রকাশ করেছিলেন বলে জানা যায়। স্বয়ং টলস্টয়ও বিবেকানন্দের রচনার একটি সংকলন প্রকাশের অভিপ্রায় করেছিলেন জানা যায়।[৪] ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জনৈক বন্ধুকে লিখিত এক পত্রে টলস্টয় উক্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।[৫]

শুধু Prince Wolkonsky বা Leon Tolstoy নয়, সমসাময়িক কালের আরও অনেক সাহিত্যিক, সমাজসেবী ও চিন্তাবিদ্‌দের যে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে নাঝিভিনের নাম পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তিনি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ রুশবিপ্লবের মাত্র নয় বৎসর পূর্বে বিবেকানন্দের বাণীকে জনগণের মর্মবাণী বলে মনে করে তা বহুল প্রচারের প্রয়াস করেছিলেন তাঁর Voices of the People সংকলন-গ্রন্থের মাধ্যমে। অপর এক ব্যক্তি পল বিরুকফের উল্লেখ পাওয়া যায় দিলীপকুমার রায়ের 'তীর্থঙ্কর' গ্রন্থে, যিনি বিবেকানন্দের পরম অনুরাগী বলে বর্ণিত হয়েছেন রোমা রোঁলার দ্বারা। রোমা রোঁলার একটি উক্তি যা তীর্থঙ্করে পাওয়া যায় এখানে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। রোঁলা বলছেন—"আরও অনেক সাহিত্যিক এখনও বিবেকানন্দের নাম জপ করেন"। আসন্ন-বিপ্লব রাশিয়ার সেইকালে সেখানকার মনীষী, চিন্তাবিদ্ প্রমুখদের বিবেকানন্দের ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত হবার এই কাহিনী অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নাই।

আজকের বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায়ও দেখা যাচ্ছে বিবেকানন্দ-চর্চা ক্রমবর্ধমান। এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন মস্কোর Institute of Asian Studies-এর Director ডাঃ ওয়াই শেলিসেভ (Chelysev)। তিনি বলেছেন—"Together with the Indian people, Soviet people who already know some of the works of Vivekananda published

৪ টলস্টয়-সংক্রান্ত এ সকল সংবাদ "বিশ্ববিবেক" গ্রন্থে ১৩৫-১৩৭ পৃঃ পাওয়া যায়। বিশ্ববিবেক উক্ত সংবাদ সংগ্রহ করেছেন আলেকজাণ্ডার শিফম্যান্ নামক জনৈক ব্যক্তির ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে লেখা এক প্রবন্ধ হতে। দুঃখের বিষয় এ মূল্যবান প্রবন্ধটি কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল বিশ্ববিবেক তা উল্লেখ করেননি।

৫ বিশ্ববিবেক—পৃঃ ১৩৭

in the U. S. S. R, highly revere the memory of the great Indian patriot, humanist and democrat, impassioned fighter for his people and all mankind".

আজকের রাশিয়ায় বিবেকানন্দের রচনাবলীর অনেকাংশ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং সেখানকার জনসাধারণ সে-সকলের সঙ্গে সুপরিচিত ; এ একটা সংবাদ বটে। কিন্তু এ সংবাদে জানা যায় আজকের রাশিয়ার বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আগ্রহ। কিন্তু আরও বড় কথা আজকের রাশিয়ার বিবেকানন্দের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। সে শ্রদ্ধার পরিচয় সুন্দরভাবে দিয়েছেন ডাঃ শেলিসেভ তার সাম্প্রতিক লিখিত এক প্রবন্ধে।[৬] কিছুকাল পূর্বে শেলিসেভ ভারতভ্রমণে এসেছিলেন, নানা দর্শনীয় স্থানের মধ্যে তাঁর কাছে স্থান পেয়েছিল ভারত মহাসমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত সেই ক্ষুদ্র শিলাময় দ্বীপটি যার নাম আজ বিবেকানন্দ শিলা। এখানে একদা সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ অন্তে অস্থিরচিত্ত শ্রান্তদেহ বিবেকানন্দ ভারতের ভূত-ভবিষ্যৎ অনুধ্যান করে তাঁর ঐতিহাসিক কার্যক্রম স্থির করেন। কন্যাকুমারী হতে অশান্ত সমুদ্র বিবেকানন্দ সাঁতার কেটে পার হয়েছিলেন। শ্রদ্ধাবান শেলিসেভও অধীর আগ্রহে সাঁতার কেটে এখানে উপনীত হয়ে নিজেকে বলেছিলেন —"Sit down and think of one who indicated to us the road to a new life".

অতএব আজকের রুশদেশের চিন্তাক্ষেত্রের প্রতিনিধির দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ মানব-জীবনে এক নূতন পথের উদ্বোধক। তাঁকে না জেনে ভারতকে জানা যায় না। এ প্রসঙ্গে ডাঃ শেলিসেভ বলেছেন, "Reading and re-reading the works of Vivekananda each time I find in them something new that helps deeper to understand India, its philosophy, the way of the life and customs of the people in the past and the present, their dreams of future." বিবেকানন্দের অনন্য আলোকময় কর্মময় জীবন সম্বন্ধেও শ্রীশেলিসেভ প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন—"Brief but dazzlingly bright, full of indefatigable activity and an inpassioned desire to make his compatriots aware of their greatness and lead them onto the road of a new life".

পূর্বোক্ত শেলিসেভ-রচিত প্রবন্ধটিতে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একটি সুন্দর সমীক্ষা দেবার প্রয়াস করা হয়েছে। এতে আজকের রাশিয়ার দৃষ্টিতে বিবেকানন্দের যে পরিচয় সর্বাপেক্ষা বড়, তার একটি বিশ্বাসযোগ্য চিত্র পাওয়া যায়। সেদিক দিয়ে প্রবন্ধটি অত্যন্ত মূল্যবান।

ডাঃ শেলিসেভ বিবেকানন্দের মাধ্যমে ভারতের সত্য পরিচয় লাভের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর পূর্বোক্ত সমীক্ষায় তিনি বলেছেন যে ভারতের ধর্ম-চিন্তা, দর্শন ও কাব্য-রচনা, তার ভক্তি-সাধনা—সব কিছুর মধ্য দিয়েই এক মহৎ মানবিক ভাবধারা প্রকাশ লাভ করেছে। ভারতের বেদান্ত-দর্শন তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আর এই বেদান্তবাদকে এক নবরূপে মণ্ডিত করলেন বিবেকানন্দ ; তাকে সাধারণ জীবনের প্রয়োজন-সাধনে নিযুক্ত করতে চেয়েছেন। মানবের মহিমাই বিবেকানন্দের নিকট শ্রেষ্ঠ, তার মধ্যে তাই তিনি ঈশ্বরত্ব আরোপ করেছেন ("To elevate man Vivekananda identifies him with God")। সর্বসাধারণের সর্বাঙ্গীণ বিকাশকে, জাগতিক সুখলাভে অধিকারকে বিবেকানন্দ সব চেয়ে বড় স্থান দিয়েছেন ("He called for the all-round

[৬] Chelysev—"Swami .Vivekananda, the Great Indian Humanist, Democrat and Patriot"—Vivekananda Centenary Memorial Volume.

development of human personality and the assertion of man's right to happiness in this world.")। বিবেকানন্দের এই অপূর্ব মানবতাবাদের ভিত্তিতে যে আধ্যাত্মিক দর্শন-মত আছে তা জড়বিজ্ঞান-ভিত্তিক মার্কসবাদের বিপরীত; মার্কসবাদী হিসাবে তা গ্রহণ না করলেও ডাঃ শেলিসেভ বিবেকানন্দের মানবতাবাদকে নিছক ভাববিলাস বা অবাস্তব আদর্শবাদ বলে মনে করেননি, বরঞ্চ তার প্রয়োগধর্মিতাকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছেন: "Though we do not agree with the idealistic basis of Vivekananda's Humanism, we recognise that it possesses many features of active humanism manifested above all in a fervent desire to elevate man, to instil in him a sense of his own dignity."

শ্রীশেলিসেভের সমীক্ষায় বিবেকানন্দ হলেন ভারতের অন্যতম নেতা যিনি প্রথম জনগণের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ধারণে তারাই হবে নায়ক—এ বিষয়ে অভ্রান্ত অভিমত দিয়েছেন বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ সংস্কার চাননি, চেয়েছেন আমূল রূপান্তর। সেজন্য শেলিসেভের অভিমত, বিবেকানন্দ বিপ্লবী, নিছক সংস্কারক নন—"It seems to us when Vivekananda spoke of a radical reform he meant a revolutionary change in the social system, in other words, for his views, Vivekananda was rather a revolutionary than a reformer"। বিবেকানন্দ ধনতান্ত্রিক সমাজের ত্রুটি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন—তার শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদী নীতি যে তার গণতন্ত্রকে মিথ্যা করে তুলেছে তা তিনি সুস্পষ্ট ধরতে পেরেছিলেন। বিবেকানন্দ এর প্রতিবাদ করেছিলেন এবং মাতৃভূমিকে ঔপনিবেশিক দাসত্ব-শৃঙ্খল হতে মুক্ত করবার জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। এ ছাড়া বিবেকানন্দ আসন্ন শূদ্র-বিপ্লব, শ্রমিক-শাসন প্রবর্তন, সমাজতন্ত্রবাদী আন্দোলন এবং রাশিয়া ও চীনে আসন্ন বিপ্লব সম্পর্কে অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন। ডাঃ শেলিসেভ তাঁর সমীক্ষায় এ সকল লক্ষ্য করে তাঁকে মানব-মুক্তির যোদ্ধা, প্রগতিমূলক শান্তিবাদী নায়ক, বাস্তবপন্থী বিপ্লববাদী বলে অভিহিত করেছেন।

রাশিয়ার অপর একজন প্রাচ্যবিত্থাবিদ্ ডাঃ কোমারভ কলকাতায় সম্প্রতি কয়েকটি ভাষণে বিবেকানন্দকে সমীক্ষা করবার প্রয়াস পেয়েছেন। ডাঃ কোমারভের দৃষ্টিভঙ্গী একটু স্বতন্ত্র। এরূপ একটি ভাষণে[১] ডাঃ কোমারভ লেনিনের Scientific Socialism ও Subjective Socialism-এর ধারণা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। তাঁর মতে অবস্থার চাপে আশু প্রতিকার-সাধনের প্রবল বাসনা "Subjective Socialism"-এর মূল কথা। কিন্তু সমাজতন্ত্র-প্রতিষ্ঠাকল্পে বিপ্লবোত্তর যে গঠনমূলক প্রয়াস, তাই হল "Scientific Socialism"-এর মূলধর্ম। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চাপে তার পুরাতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে পরিবর্তন ঘটে তাতে একটি সঙ্কট আসন্ন হয়ে ওঠে। সেজন্যই রাজা রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ চিন্তানায়কেরা জনগণের কথা প্রথম চিন্তা করতে আরম্ভ করেন। বিবেকানন্দও তাঁদের ন্যায় জনগণকে উপেক্ষা করার বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে এঁরা সকলেই সমাজতন্ত্রবাদী, তাঁদের সমাজতন্ত্রবাদ হল "Subjective Socialism"-

১ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে প্রদত্ত ভাষণ।

ধর্মী, "Scientific Socialism"-ধর্মী নয়। ডাঃ কোমারভের মতে বিবেকানন্দ পৌরোহিত্য ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু নিজে কার্যতঃ তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযানে নেতৃত্ব দিয়ে যান নি। এজন্যই তিনি সদিচ্ছাপরায়ণ সমাজ-তন্ত্রবাদী, তাঁর স্বপ্ন ছিল, তাকে কার্যে পরিণত করবার প্রয়াস তিনি করেন নি।

উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান আজকের রাশিয়ার দৃষ্টিতে বিবেকানন্দকে বোঝবার ঐকান্তিক প্রয়াস আছে। কিন্তু এখনও দৃষ্টি কিছু অস্বচ্ছ আছে এবং সেজন্য কিছু পরিমাণ স্ববিরোধিতাও আছে। ডাঃ শেলিসেভ ও ডাঃ কোমারভের মধ্যেও সেজন্য মত-বিরোধিতা দেখা যাচ্ছে। ডাঃ শেলিসেভের মতে বিবেকানন্দ সংস্কারক নন, বিপ্লবী; ডাঃ কোমারভের মতে বিবেকানন্দ বিপ্লবী নন, সদিচ্ছাসম্পন্ন স্বপ্নবিলাসী মাত্র। ডাঃ শেলিসেভের মধ্যেও পরস্পরবিরোধী মত দেখা যায়। তিনি একদিকে বিবেকানন্দকে সংগ্রামী, বাস্তবপন্থী, মুক্তি-যোদ্ধা, কার্যকর মানবতা-বাদের প্রচারক ইত্যাদি বলেছেন, অপরদিকে বলেছেন তাঁর আদর্শবাদের দরুন তাঁর সত্য জীবনদৃষ্টির অভাব ছিল—"His religious idealistic world outlook prevented him from properly understanding and appraising life around him."

এঁদের দৃষ্টির পরিধি প্রধানতঃ একটি কারণে সীমাবদ্ধ। মার্কসবাদীদের মতে মার্কস-বাদই সব কিছু বিচারের শেষ মাপকাঠি; এবং মার্কসবাদ অভ্রান্ত এবং সকল বিচারের উর্ধ্বে। মার্কসবাদ অনুযায়ী ধর্ম-দর্শন অসত্য বা অবাস্তব জীবন-দৃষ্টির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেকারণেই ডাঃ শেলিসেভ এই মত পোষণ করেছেন যে বিবেকানন্দের সত্য-জীবনদৃষ্টির অভাব ছিল। অথচ বিচার করে দেখলে দেখা যায় যে বিবেকানন্দের জীবনদৃষ্টির পিছনে কোন মতবাদ ছিল না, ছিল একমাত্র অভিজ্ঞতা-প্রসূত সত্য-দৃষ্টি। তিনি সত্যতা পরীক্ষা না করে কোন কিছুকেই গ্রহণ করেন নি, এমন কি ধর্মকেও না। ধর্ম তাঁর কাছে মতবাদ মাত্র নয়, তা তাঁর কাছে প্রত্যক্ষীকৃত সত্য। তিনি তাকে 'চ্যালেঞ্জ' করে, পরীক্ষা করে, অনুভব করে তারপর গ্রহণ করেছেন। ডাঃ কোমারভও Lenin-এর Scientific ও Subjective Socialism সম্বন্ধে মতকে বিচারের মাপকাঠি ধরে নিয়ে বিবেকানন্দকে স্বপ্নবিলাসী বলেছেন। এখানেও বিচার করলে দেখা যাবে বিবেকানন্দের গঠনমূলক কার্যসূচী ছিল, তাকে বিচার না করেই ডাঃ কোমারভ তাঁর সিদ্ধান্ত গঠন করেছেন। আর তাঁর এই মাপকাঠি প্রয়োগ করলে দেখা যাবে যে বৈজ্ঞানিক সমাজ-তন্ত্রবাদের আদি প্রবক্তা কার্ল মার্কসও তত্ত্বই দিয়েছেন প্রধানতঃ, কোন বিপ্লবে বিশেষ বাস্তব নেতৃত্ব দিয়ে যান নি। পরবর্তী সময়ে যেমন তাঁর মতবাদ হতে রুশ বিপ্লব জন্ম নেয়, ভারতে বিবেকানন্দের প্রভাবে সাম্রাজ্য-বাদী দাসত্ব ছিন্ন করবার জন্য বিদ্রোহ জন্ম নেয়। বিবেকানন্দকে যদি স্বপ্নবিলাসী বলা যায় তাহলে নিশ্চয়ই মার্কসকেও স্বপ্নবিলাসী বলা চলে।

এঁদের কিছু ভ্রান্তির কারণ অবশ্য ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ ভারতীয় মার্কসবাদীগণ। তাঁদের প্রভাবে এঁরা অনেক ভুল বিচার দিয়েছেন। ভারতীয় সমাজতন্ত্রবাদীদের একটি সাধারণ মত যে, বিবেকানন্দ ইউটোপীয়ান সমাজতন্ত্রবাদী এবং তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর

মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করে একটা সমাধান করতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বিবেকানন্দের ইতিহাস-সমীক্ষার একটি প্রধান কথা শ্রেণীসংগ্রামের অবশ্যম্ভাবিতা। ডাঃ শেলিসেভও এদের প্রভাবে বিবেকানন্দের শ্রেণীসামঞ্জস্য-সাধনের অবাস্তব প্রয়াসের কথা একস্থানে উল্লেখ করেছেন ("his utopian striving to reconcile class contradictions")। কিন্তু তিনি উল্টো কথাটিও অন্যত্র স্বীকার করেছেন—"While at first he thought that British domination would be overthrown through an uprising of the princes, subsequently he arrived at the conclusion that India's only hope was her masses. The higher classes were dead, physically and morally." বস্তুতঃ বিবেকানন্দ উচ্চশ্রেণীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্মোহ ছিলেন। তাঁর মত অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে নিম্নলিখিত উক্তির মধ্যে—"ভারতের উচ্চবর্ণেরা…তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধ'রে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে" ইত্যাদি। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সামঞ্জস্য-সাধনের অবাস্তব স্বপ্ন এর মধ্যে কোথায় ?

শ্রেণীসংগ্রাম সম্বন্ধেও তাঁর দৃষ্টি অভ্রান্ত ছিল। ভারত-ইতিহাস বিশ্লেষণ সহায়ে "বর্তমান ভারত" গ্রন্থে তিনি এই মতই প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস পেয়েছেন যে ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। ডাঃ শেলিসেভ তাঁর প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বিবেকানন্দের অভ্রান্ত দৃষ্টিকে একটি সহজাত-দৃষ্টি বলে অভিহিত করেছেন— "He was able intuitively to arrive at the idea that only the working class, which was just coming into being in India at that time, was the decisive force in social development." প্রকৃতপক্ষে বিবেকানন্দের এ দৃষ্টি সহজাত দৃষ্টি নয়, ঠিক দিব্য দৃষ্টিও নয়, সম্ভবতঃ এ হল ঐতিহাসিক প্রজ্ঞা-প্রসূত দৃষ্টি। ইতিহাসে তাঁর জ্ঞান ছিল অতি গভীর। তাছাড়া ভারত ও ভারতেতর বিভিন্ন দেশের গণ-মানসের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। ভারতে হাজার হাজার মাইল তিনি পদব্রজে ভ্রমণ করেন, দিনের পর দিন দুঃখের সঙ্গে, অত্যাচারের সঙ্গে, অবিচারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন। ভারতের বাইরে, বহির্বিশ্বে ভ্রমণকালেও তিনি শ্রমিকদের সঙ্গে, কৃষকদের সঙ্গে তাদের কর্মক্ষেত্রে পরিচিত হবার সকল সুযোগ গ্রহণ করেছেন। সেজন্য গণমানসের সুস্পষ্ট চিত্রটি তিনি দেখেছিলেন, ঐতিহাসিক বিবর্তনের সূত্রটিও তাঁর সুস্পষ্ট জানা ছিল। ভবিষ্যতের ইতিহাস তাই তাঁর মানসদৃষ্টিতে সুস্পষ্ট ধরা দিয়েছিল। বিবেকানন্দের ভারত-ভ্রমণ সম্বন্ধে ডাঃ শেলিসেভের বর্ণনায় অপূর্ব সুন্দর একটি চিত্র পাওয়া যায়— "This indefatigable sower of the truth and flayer of every injustice walked thousands of kilometres along the roads of India. He beheld tears and grief, the starvation and death of his disinherited brothers and sisters." এর মধ্যে সুস্পষ্ট বিবেকানন্দ জীবনকে, সমাজকে, ইতিহাসকে জীবন্ত প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাঁর দৃষ্টি সত্য দৃষ্টি, তিনি অক্লান্ত অপরাজেয় সত্য-প্রচারক। আশ্চর্য এই, এ সত্ত্বেও ডাঃ শেলিসেভ অন্যত্র বললেন যে বিবেকানন্দের জীবনসম্বন্ধে সত্যদৃষ্টির অভাব ছিল। এরূপ নানা পরস্পর-বিরোধী উক্তি এঁদের মধ্যে আরও আছে, অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা এঁদের বিচারে এরূপ অস্পষ্ট সিদ্ধান্ত যাই দিক না কেন, এঁদের বিবেকানন্দ-সমীক্ষা অন্য নানাদিক দিয়ে প্রশংসনীয়। বহুতথ্যের অবতারণা এঁরা করেছেন যা বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এবং সমসাময়িক ভারত-ইতিহাস সম্বন্ধে এঁদের আগ্রহ, একনিষ্ঠ গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দেয়। এ আগ্রহ কম মূল্যবান বস্তু নয়, এই আগ্রহ, জানবার প্রয়াস এ বিষয়ে সত্য পরিচয় হয়ত কোনদিন এনে দেবে। সবচেয়ে বড় কথা এদের শ্রদ্ধা যা বোধহয় সবকিছুকে ছাপিয়ে অজ্ঞাতে এঁদের কাছে বিবেকানন্দের সত্য পরিচয় এনে দিয়েছে। মুক্তি-যোদ্ধা, প্রগতিবাদী শান্তি-আন্দোলনের প্রবর্তক বিবেকানন্দকে এঁরা শ্রদ্ধায় চিরস্মরণীয় আসন দিতে চেয়েছেন। ডাঃ শেলিসেভের ভাষা এসকল স্থানে আবেগময়ী হয়ে উঠতে চেয়েছে—"We can safely say that many years will pass, many generations will come and go, Vivekananda and his time will become the distant past, but never will these fade the memory of the man, who all his life dreamt of a better future for his people, who did so much to awaken his compatriots and move India forward, to defend his much suffering people from injustice and brutality." বিবেকানন্দ যে ইউরোপীয়ান আদর্শবাদী নন, প্রত্যক্ষ কর্মবীর, তার পরিচয় মেলে ডাঃ শেলিসেভের শেষ আর একটি উক্তিতে :

"Like a rocky cliff protecting a coastal valley from storm and bad weather, from the blows of all winds and waves, Vivekananda fought courageously and selflessly against the enemies of his motherland."

বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ায় বিবেকানন্দের জীবন-দৃষ্টিকে মানবচিন্তার পরাকাষ্ঠা মনে করা হয়েছিল। আজকের বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার দৃষ্টি তাঁর অনুপম সমাজ-চিন্তা ও সক্রিয় মানবতা-বাদের এবং অদ্ভুত সংগ্রামী মনোভাবের উপর নিবদ্ধ। কিন্তু একথা বলে শেষ করলেই হয়ত সম্পূর্ণ সত্য উদ্ঘাটিত করা হবে না। বিপ্লবপূর্ব রাশিয়াতেও বিবেকানন্দের জীবন-দর্শনই শুধু নয়, তাঁর গণচেতনাকারী বাণীসমূহও প্রচার লাভ করেছিল। বিপ্লবোত্তর রাশিয়াতেও শুধু কি তাঁর সমাজভাবনা প্রভাব সৃষ্টি করেছে, তাঁর জীবন-দৃষ্টি অলক্ষ্যে মানবমনের গভীরে কোন জায়গায় অনুপ্রবেশ করে নি? অন্ততপক্ষে একজন লেখকের রচনা দেখে সন্দেহ গভীর হয়ে ওঠে। তিনি বোরিস পাস্তারনেক। তাঁর রচনায় স্থানে স্থানে আলো-ছায়া, সত্য-মিথ্যা, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ মিশ্রিত যে অনস্বীকার্য জগৎ-প্রপঞ্চ সে সম্বন্ধে একটি গভীর অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। আরও আশ্চর্য প্রকাশ পেয়েছে সর্বাবগাহী এক আত্মচৈতন্যের অনুভূতির সুস্পষ্ট আভাস। একটি লেখার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি মাত্র এখানে উদ্ধৃত করছি—

"All round are lights, homeliness,
people getting up
Drinking tea, hurrying to the trams

... ...

I feel for each of them
As if I were in their skin
I melt with the melting snow
I frown with the morning
In me are people without names
Children, stay-at-homes, trees
I am conquered by them all
And this is my only victory."

('Daybreak')

সত্য যা তা সর্বকালে সর্বদেশের মানুষের অনুভূতিতে ধরা পড়ে। এখানে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আজকের রাশিয়ার বিবেকানন্দ-চর্চাটা বড় কথা, আরও বড় কথা তাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, কোন মতবাদ-প্রসূত সমীক্ষান্ত বিচারই এ ক্ষেত্রে শেষ কথা নয়।

ফুলের জন্ম

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

লাখো লাখো যুগ ধরি বিধাতার শ্রম-সাধনার ফলে
যে রূপবীজের জন্ম হ'ল তা পড়ি ধরণীর তলে,
অঙ্কুর লভি হ'ল একদিন তরুরূপে পরিণত।
তাহারে সাজাতে কিশলয়দলে কত যুগ হ'ল গত ;
তরু-রূপে হেরি মুগ্ধ বিধাতা। পূর্ণ হ'ল না ব্রত,
তাই অনলস সাধনা চলিল আরো যুগ কতশত ॥
সহসা একদা কোরক ধরিল, কুসুম ফুটিল তায়,
বিস্মিত হয়ে নিজ সৃষ্টিতে বিধি তার পানে চায়।
সুষমার পরাকাষ্ঠার পানে মুগ্ধ নেত্রে চাহি,
উল্লাসভরে বিধি উঠিলেন গাহি—
"তোমারে সৃজিয়া মোর ব্রত, ফুল, সার্থক করিলাম—
লাখো লাখো যুগ পরে আমি আজ লভিলাম বিশ্রাম।
বনভূমি করো আলো,
তোমারে যে ভালোবাসিবে সেজন মোরেও বাসিবে ভালো ॥
সৃজিলাম আমি সুন্দরতমে ভবে,
তোমারি জন্য আমার এবার মানব সৃজিতে হবে।
দেখে দেখে তোমা শেষ হয় না যে দেখা,
দেখি কত একা একা।
বুঝিবে মানব তুমি ফুল আহা কী যে অমূল্য ধন !
তোমারি অঙ্গে মোর স্বাক্ষর রহিল চিরন্তন।
মুগ্ধ তৃষিত দৃষ্টি আমার তোমাকেই সঁপিলাম।
শুচিসৌরভ হয়ে তা নিত্য স্মরাবে আমার নাম।
চিরসুন্দরে তোমাতেই সে যে পাবে
পশুত্ব তার লুপ্ত হইবে দিব্য সে দেবভাবে ॥

শক্তি-শান্তি-মাতৃরূপা

স্বামী জীবানন্দ

শক্তির কথায় প্রথমে স্থূল শরীরের দিকেই দৃষ্টি পড়ে। ঠিকভাবে দেখলে এই দেহ শক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। এর মধ্যে দেখার শক্তি, শোনার শক্তি, কথা বলার শক্তি, কাজ করার শক্তি, আরও কত রকমের শক্তি রয়েছে। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি, আধ্যাত্মিক শক্তি, তেজ, বীর্য, বল, সাহস, উৎসাহ—সবই শক্তির বিভিন্ন রূপ। এই সব শক্তি পৃথক পৃথক শক্তিরূপে প্রতীয়মান হলেও একই মহাশক্তির বিভিন্ন রূপ। কতকগুলি অণু-পরমাণু এক অজ্ঞেয় শক্তি দ্বারা বিধৃত হয়ে দেহের আকারে প্রতিভাত হচ্ছে। পরমাণু-গুলিও আবার শক্তির সমষ্টি। অতএব স্থূল দেহটা কতকগুলি শক্তির সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়! শক্তিও আবার মূলতঃ চেতনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই শক্তির খেলা যে কেবল প্রত্যেকটি ব্যষ্টি-দেহে, শুধু তাই নয়, অনন্ত বিশ্ব বললে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যে ধারণা হয়, তার মধ্যে যা কিছু আছে, সে-সবকে এক মহাশক্তি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। কী বিশালতা —মন বুদ্ধি স্তব্ধ হয়ে যায়! রূপে রঙে ছন্দে গন্ধে যে বিচিত্র রূপ প্রতিনিয়ত নয়নগোচর হচ্ছে, তা এই শক্তিরই প্রকাশ। সারা বিশ্বে যে আনন্দ সঞ্চারিত, তা-ও এই শক্তিরই। সর্বভূতরূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিতা অদ্বিতীয়া মহাশক্তি! এই সীমাহীন শক্তি-সিন্ধুরই এক একটি তরঙ্গ জীবজগৎরূপে ফুটে উঠছে, আবার ক্ষণকাল পরেই মিলিয়ে যাচ্ছে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপ কার্য ত্রিবিধ স্পন্দন মাত্র বলে পরিলক্ষিত হয়।

'এই দেখি, এই আছে, এই নাই আর,
তোমার অনন্ত লীলা বুঝে সাধ্য কার?'

সম্মুখে ঐ যে গাছটি ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে রয়েছে, ওর জন্ম ক্ষুদ্র একটি বীজ থেকে। কোন্ শক্তিবলে একটি বীজ এই বৃক্ষরূপ ধারণ করল, ভাবলে অবাক হতে হয়। শক্তির বিচিত্র প্রভাবে অতি ক্ষুদ্র বীজে বিশাল বৃক্ষ!

ব্যষ্টি- ও সমষ্টি-শক্তির যা বীজ, তা অব্যক্ত কারণশক্তি; সেখানে শক্তির প্রকাশ নেই। কারণে যা অব্যক্ত, স্থূলে তাই ব্যক্ত। একই শক্তি নামরূপের মাধ্যমে স্থূলে অভিব্যক্ত, সূক্ষ্মে প্রাণশক্তিরূপে বিদ্যমান; আর কারণেও অব্যক্ত বীজাকারে সেই একই চৈতন্যশক্তি। জগদ্ব্যাপিনী স্থিতিশক্তি, আর দ্যোতনশীলা চিৎশক্তি। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিকরূপে একই শক্তির নানাভাবে প্রকাশ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ—যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি, যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা-শক্তি; অগ্নি মানলেই দাহিকা-শক্তি মানতে হয়, দাহিকা-শক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না। সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মি ভাবা যায় না, সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না। দুধকে ছেড়ে ধবলত্ব ভাবা যায় না, আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না। তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে বা শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। একই বস্তু, যখন নিষ্ক্রিয়—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন না—এই কথা যখন ভাবি তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি, যখন এই সব কার্য করেন, তখন তাঁকে শক্তি বলি।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন মহাশক্তির স্বরূপতত্ত্ব অবগত হতে অভিলাষী হয়ে দর্শন করেছিলেন, এক অপূর্বসুন্দরী নারী-মূর্তি গঙ্গাগর্ভ থেকে উঠে পঞ্চবটীতে গিয়ে এক সর্বাঙ্গসুন্দর পুত্র প্রসব করে তাকে সস্নেহে স্তন্যদান করতে লাগলেন, পরক্ষণেই কঠোর করালবদনা হয়ে শিশুটিকে গ্রাস করে পুনরায় গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই দর্শন মহাশক্তির সৃজন-পালন-লয়-কর্তৃত্ব জ্ঞাপক।

শক্তিতত্ত্ব আলোচনা করলে, শক্তি যে একাধারে সৃষ্টি- ও প্রলয়-রূপ বিপরীত গুণধারিণী এ কথা পরম সত্য বলে অনুভূত হয়। সৃষ্টি ও প্রলয় বলতে শক্তির ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থা মাত্র বোঝায়। আধুনিক দার্শনিকগণেরও সিদ্ধান্ত যে, শক্তির বিনাশ বা হ্রাস নেই।

ভাবরাজ্যে, মানুষের সূক্ষ্মমনোরাজ্যে, জাতি সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও শক্তির বিচিত্র লীলা। কোথাও উন্নতি, কোথাও অবনতি। পতন-অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে শক্তিরই খেলা। কোথাও আধ্যাত্মিক উন্নতি, আবার কোথাও জাগতিক শ্রীবৃদ্ধি। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশ থেকে ফিরে এসে বলেছিলেন, 'কি দেখলুম জানিস, সমস্ত পৃথিবীতে এক মহাশক্তিই খেলা কচ্ছে। আমাদের বাপ-দাদারা সেইটিকে religion-এর দিকে manifest করেছিলেন. আর আধুনিক পাশ্চাত্য-দেশীয়েরা সেইটিকেই মহারজোগুণের ক্রিয়া-রূপে manifest কচ্ছে। বাস্তবিক সমগ্র জগতে সেই এক মহাশক্তিরই বিভিন্ন খেলা হচ্ছে মাত্র।'

দেবীভাগবতে আছে যে, শক্তি ছাড়া কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু, কি মহেশ্বর, কি ইন্দ্র, কি অগ্নি, কি সূর্য, কি বরুণ—কেহই স্ব স্ব কার্য করতে সমর্থ হন না। সকল দেবতা সেই আদ্যাশক্তির সহিত যুক্ত হয়ে নিজ নিজ কার্য করেন। সমস্ত কার্যের অভ্যন্তরে কারণরূপে বিদ্যমান থেকে তিনিই যে সমস্ত কার্য নির্বাহ করেন, তা প্রত্যক্ষভাবেই অবগত হওয়া যায়।

'ন বিষ্ণুর্ন হরঃ শক্রো ন ব্রহ্মা ন চ পাবকঃ।
ন সূর্যো বরুণঃ শক্তাঃ স্বে স্বে কার্যে কথঞ্চন ॥
তয়া যুক্তা হি কুর্বন্তি স্বানি কার্যাণি তে সুরাঃ।
সৈব কারণকার্যেষু প্রত্যক্ষেণাবগম্যতে ॥'

১।৮।৩৮-৩৯

সেই ব্রহ্মময়ী শক্তিই সকল কার্যের অন্তর্গূঢ় কারণ। তিনিই সকলের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে আছেন বলে কর্ম সম্ভব।

'বিষ্ণৌ চ সাত্ত্বিকী শক্তিস্তয়া হীনোঽপ্যকর্মকৃৎ।
দ্রুহিণে রাজসী শক্তির্যয়া হীনো হ্যসৃষ্টিকৃৎ ॥
শিবে চ তামসী শক্তিস্তয়া সংহারকারকঃ।
ইত্যূহং মনসা সর্বং বিচার্য চ পুনঃপুনঃ ॥
শক্তিঃ করোতি ব্রহ্মাণ্ডং সা বৈ পালয়তেঽখিলম্
ইচ্ছয়া সংহরত্যেষা জগদেতচ্চরাচরম্ ॥'

১।৮।৩৫-৩৭

বিষ্ণুতে সেই ব্রহ্মময়ী আদ্যাশক্তি সাত্ত্বিকী রূপে আছেন বলেই তিনি পালনকার্যে সমর্থ, অন্যথা তিনি জগৎ পালন করতে পারেন না। সেইরূপ সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি যে শক্তিবিহীন হলে সৃষ্টিকার্যে অশক্ত হন সেই রাজসী শক্তি তাঁতে সর্বদা বিরাজিত বলেই তিনি সৃষ্টিকরণে সমর্থ। সেইরূপ মহেশ্বরে তামসী শক্তি বর্তমান বলেই তিনি সংহার-ক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেন। সেই আদ্যাশক্তি নিজ ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মাদি দেবতার অন্তরে থেকে এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি পালন ও সংহার কার্য সম্পাদন করে থাকেন।

সেই মহাশক্তিই বিশ্বচরাচরে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। এমন কোন স্থান নেই, যেখানে তিনি নেই। একই চিন্ময়ী শক্তি আমাদের

সকলের মধ্যে থেকে সকলকে চালাচ্ছেন, তাঁরই নির্দেশে আমরা যন্ত্রের মতো চলেছি। ভাতের হাঁড়িতে ফুটন্ত জলে আলুপটলের মতো লাফাচ্ছি, অহংকারে বিমূঢ়চিত্ত হয়ে নিজেদের কর্তা ভোক্তা মনে করছি। আমাদের কর্ম-কুশলতার অন্তরালে আছে অচিন্ত্য মহাশক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, ঠিক ঠিক ভক্তি লাভ হলে 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি ঘর, তুমি ঘরনী; আমি রথ, তুমি রথী' এইরূপ বোধ হয়। তখন 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু' ভাব—ক্ষুদ্র 'অহং'-এর বিলোপ!

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে সেই মহাশক্তিকেই দেবতাগণ প্রণাম করেছেন :

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

৫।৩২-৩৪

সর্বভূতে আকারিত সেই মহাশক্তিকে প্রণাম, সূক্ষ্মরূপে অনুভূত সেই মহাশক্তিকে প্রণাম। কারণরূপে অবস্থিত সেই মহাশক্তিকে প্রণাম। তাঁকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম—কায়মনোবাক্যে প্রণাম।

সেই মহাশক্তিকে দেবতারা ত্রয়োবিংশতি-রূপে প্রত্যক্ষ করেছিলেন :

(১) বিষ্ণুমায়া, (২) চেতনা, (৩) বুদ্ধি, (৪) নিদ্রা, (৫) ক্ষুধা, (৬) ছায়া, (৭) শক্তি, (৮) তৃষ্ণা, (৯) ক্ষান্তি, (১০) জাতি, (১১) লজ্জা, (১২) শান্তি, (১৩) শ্রদ্ধা, (১৪) কান্তি, (১৫) লক্ষ্মী, (১৬) বৃত্তি, (১৭) স্মৃতি, (১৮) দয়া, (১৯) তুষ্টি, (২০) মাতা, (২১) ভ্রান্তি, (২২) ব্যাপ্তি এবং (২৩) চিতিরূপে।

আদ্যাশক্তির অংসংখ্য রূপ। মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, নবদুর্গা, দশমহাবিদ্যা—এই সব নামের সহিত আমরা পরিচিত। যখন তিনি দেবগণের কার্যসিদ্ধির জন্য আবির্ভূত হন, স্বরূপতঃ নিত্যা হলেও তিনি উৎপন্না, এইরূপে অভিহিতা হন।

'দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥'

চণ্ডী, ১।৬৫

তিনি প্রসন্না হলে মানুষকে মুক্তিলাভের জন্য বরদান করেন। তাঁর হাতেই মুক্তির চাবিকাঠি। 'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।' চণ্ডী, ১।৫৭

আবার, ভক্তিপূর্বক আরাধিতা হয়ে তিনিই ইহলোকে অভ্যুদয় এবং পরলোকে স্বর্গসুখ ও মুক্তি প্রদান করেন। 'আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা।' (চণ্ডী, ১৩।৫) অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স তাঁর পূজায় লাভ হয়; চণ্ডী-বর্ণিত মহারাজ সুরথ ও সমাধি বৈশ্য তা দেখিয়ে গেছেন। তাঁরা উভয়ে নদীতটে দুর্গাদেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমায় পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি দিয়ে পূজা করেছিলেন; কখন নিরাহার, কখন বা অল্পাহারী ও সমাহিত হয়ে তদ্গতচিত্তে নিজের দেহের রক্তসিঞ্চিত বলি দেবীর চরণে নিবেদন করে তাঁর কৃপালাভ করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রও রাবণবধের জন্য শারদীয়া দুর্গাদেবীর অর্চনা করে তাঁর কৃপালাভে সমর্থ হন। বিভিন্ন মূর্তিতে—মহাশক্তির পূজা হলেও বাংলা দেশে শারদীয়া দুর্গাপূজার আনন্দ সর্বাধিক।

তিনি শান্তি-স্বরূপিণী, সর্বভূতে শান্তিরূপে বিরাজিতা। তিনি আমাদের শোক তাপ জ্বালা যন্ত্রণা দূর করে দিতে পারেন। তাঁর কৃপাকটাক্ষে শরণাগত সন্তানের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক দুঃখ চলে যায়; অনাবিল শান্তি ও পরমানন্দ লাভ হয়।

'যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥'

এই মহাশক্তিই আবার সন্তানকে শান্তির পথ, মুক্তির পথ দেখবার জন্য মাতৃহৃদয়ের অপারকরুণা-মণ্ডিতা হয়ে 'তাপিতের তরে নরদেহ ধরে অশেষ যাতনা সহিতে' আসেন, সীতা, সারদাদেবী প্রভৃতি রূপে। শ্রীভগবান যখন জগৎকল্যাণে নরলীলায় অবতীর্ণ হন তখন আদ্যাশক্তিও আসেন তাঁর লীলা-সহায়িকা হয়ে।

'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥'

গোপালের মা ও ভগিনী নিবেদিতা*

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

গোপালের মার সঙ্গে পরিচয় এবং তাঁর শেষ জীবনে তাঁকে সেবা করতে পাওয়াকে নিবেদিতা নিজ জীবনের পরম সৌভাগ্য বিবেচনা করেছিলেন। গোপালের মা সিদ্ধ তাপসী, বালগোপালের দর্শনে ও লীলায় তিনি মগ্ন থাকতেন, গোপালকে ও শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি অভেদ দেখেছিলেন। বাৎসল্যরসমধুর তাঁর কাহিনী একালের ভক্তিসাহিত্যের মহা সম্পদ, শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক রচনার তুল্য, অথচ সমস্ত ব্যাপারটিই বাস্তব। "গোপালের মা" নামক ক্ষুদ্র জীবনী পুস্তিকাটি নিবেদন করতে গিয়ে ভূমিকায় এর বাস্তবতার পক্ষে স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন—"আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত গোপালের মার অদ্ভুত দর্শনাদির কথা পাঠককে এখানে উপহার দিতেছি। যাঁহারা মনে করিবেন, আমরা উহা অতিরঞ্জিত করিয়াছি, তাঁহাদের নিকট আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা ইহাতে মুন্সিয়ানা কিছুমাত্র ফলাই নাই।...উহা সংগ্রহও করিয়াছি এমন সব লোকের নিকট হইতে, যাঁহারা সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ যথাযথ বলিবার প্রয়াস পান, না পারিলে অনুতপ্তা হন, এবং 'কামারহাটির বামনীর' স্তাবক হওয়া দূরে যাউক কখন কখন তদনুষ্ঠিত কোনো কোনো আচরণের তীব্র সমালোচনাও আমাদের নিকট করিয়াছেন।"

নিবেদিতার সঙ্গে গোপালের মার সংযোগের কথা বলবার আগে তাঁর সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থিত করছি। এক্ষেত্রে স্বামী সারদানন্দকে অনুসরণ করব।

গোপালের মার আসল নাম অঘোরমণি দেবী। বালবিধবা হওয়ার জন্য ভাই নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কামারহাটির বাড়ীতে বাস করতেন। নীলমাধব কলকাতার পটলডাঙ্গার জনৈক সম্পন্ন মুৎসুদ্দি গোবিন্দচন্দ্র দত্তের বাড়ীর পুরোহিত, সেই সূত্রে উক্ত দত্ত মহাশয়ের বিধবা গৃহিণীর সঙ্গে অঘোরমণির পরিচয় ঘটে, এবং তিনি কামারহাটিতে গঙ্গাতীরে গোবিন্দচন্দ্র দত্তের যে বৃহৎ ঠাকুরবাড়ী ছিল, তার একান্তে আশ্রয় নেন, ধর্মজীবন যাপনের সুবিধার জন্য।

অঘোরমণি অত্যন্ত শুচিবায়ুগ্রস্তা এবং অতীব নিষ্ঠাবতী। দিবারাত্র জপে ও পূজায় ব্যাপৃত। এইভাবে তিরিশ বছরের উপর কঠোর তপশ্চর্যার পরে, তাঁর বয়স যখন ষাট, তখন তাঁর জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ এল ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের হেমন্তকালে, যখন কয়েকজন সঙ্গিনীর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনে। প্রথম সাক্ষাতের পরে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভাব-ভক্তির বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন অপর দিকে গোপালের মাও অব্যক্ত টান বোধ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে। তারপর—

"প্রথম দর্শনের অল্পদিন পরে জপ করিতে করিতে ঠাকুরের নিকট আসিবার ইচ্ছা হইবামাত্র দুই-তিন পয়সার দেদো সন্দেশ কিনিয়া লইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত।"

* এই লেখাটির উদ্দেশ্য গোপালের মা ও নিবেদিতার সম্পর্ক বিষয়ে যথাসম্ভব অধিক তথ্যের সমাবেশ করা। সেজন্য এটিকে অখণ্ড ভাব বা বক্তব্যযুক্ত কোনো রচনা বলা সঙ্গত হবে না। বিনীত নিবেদন এই, যদি কেউ উভয়ের সম্পর্ক বিষয়ে অন্য কোন উল্লেখযোগ্য সংবাদ দিতে পারেন, ধন্যবাদের সঙ্গে তা গৃহীত হবে।

তারপর দুই চারি মাস ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত চলতে লাগল। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণও ক্রমশঃ গভীর হতে লাগল।

এই ভাবে কিছুকাল কাটার পরে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে এমন একটি ব্যাপার ঘটল যা গোপালের মার ব্যক্তিজীবনকে অধ্যাত্মরস-পিপাসু সর্বমানবের আকর্ষণের বস্তু করে তুলল (এবং শিল্পীর আকর্ষণের বস্তুও। শিল্পাচার্য নন্দলাল গোপালের মার জীবনের স্কেচ করেছেন)।

"'কামারহাটির ব্রাহ্মণী' একদিন রাত্রি তিনটার সময় জপে বসিয়াছেন। জপ সাঙ্গ হইলে ইষ্টদেবতাকে জপ সমর্পণ করিবার অগ্রে প্রাণায়াম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এমন সময়ে দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিকটে বাম দিকে বসিয়া রহিয়াছেন এবং ঠাকুরের দক্ষিণ হস্তটি মুঠো করার মত দেখা যাইতেছে! দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে যেমন দর্শন করেন, এখনও ঠিক সেইরূপ স্পষ্ট ও জীবন্ত! ভাবিলেন, 'একি! এমন সময় ইনি কোথা থেকে, কেমন করে হেথায় এলেন?' গোপালের মা বলেন, আমি অবাক হয়ে তাঁকে দেখছি, আর ঐ কথা ভাবছি—এদিকে গোপাল (শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তিনি গোপাল বলিতেন) বসে মুচকে মুচকে হাসছে! তারপর সাহসে ভর করে বাঁ হাত দিয়ে যেমন গোপালের (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের) বাঁ হাতখানি ধরেছি, অমনি সে মূর্তি কোথায় গেল, আর তার ভিতর থেকে দশমাসের সত্যকার গোপাল, (হাত দিয়া দেখাইয়া) এত বড় ছেলে, বেরিয়ে হামা দিয়ে এক হাত তুলে আমার মুখপানে চেয়ে (সে কি রূপ! আর কি চাউনি!) বললে, 'মা, ননী দাও।' আমি তো দেখে শুনে একেবারে অজ্ঞান, সে এক চমৎকার কারখানা! চীৎকার করে কেঁদে উঠলুম—সে তো এমন চীৎকার নয়, বাড়িতে জনমানব নেই তাই, নইলে লোক জড় হত! কেঁদে বললুম, 'বাবা আমি দুখিনী, কাঙ্গালিনী, আমি তোমায় কি খাওয়াব, ননী ক্ষীর কোথা পাব, বাবা!' কিন্তু সে অদ্ভুত গোপাল কি তা শোনে—কেবল 'খেতে দাও' বলে! কি করি, কাঁদতে কাঁদতে উঠে শিকে থেকে শুকনো নারকেল-নাড়ু পেড়ে হাতে দিলুম ও বললুম, 'বাবা গোপাল, আমি তোমাকে এই কদর্য জিনিস্ খেতে দিলুম বলে আমাকে যেন ঐরূপ খেতে দিও না।

'তারপর জপ সেদিন আর কে করে! গোপাল এসে কোলে বসে, মালা কেড়ে নেয়, কাঁধে চড়ে, ঘরময় ঘুরে বেড়ায়! যেমনি সকাল হল অমনি পাগলিনীর মত ছুটে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পড়লুম! গোপালও কোলে উঠে চললো—কাঁধে মাথা রেখে। এক হাত গোপালের পাছায় ও এক হাত পিঠে দিয়ে বুকে ধরে সমস্ত পথ চললুম। স্পষ্ট দেখতে লাগলুম গোপালের লাল টুকটুকে পা-দুখানি আমার বুকের উপর ঝুলছে।'...

অঘোরমণি ঐরূপ ভাবে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া ভাবের আধিক্যে অশ্রুজল ফেলিতে ফেলিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সেদিন কত কথাই না বলিলেন! 'এই যে গোপাল আমার কোলে', 'ঐ তোমার (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের) ভেতর ঢুকে গেল', 'ঐ আবার বেরিয়ে এল', 'আয় বাবা, দুখিনী মার কাছে আয়', ইত্যাদি বলিতে বলিতে দেখিলেন চপল গোপাল কখন বা ঠাকুরের অঙ্গে মিশাইয়া গেল, আবার কখন বা উজ্জ্বল বালক-মূর্তিতে তাঁহার নিকট আসিয়া অদৃষ্টপূর্ব বাল্যলীলাতরঙ্গ-তুফান তুলিয়া তাহাকে বাহ্য জগতের কঠোর শাসন, নিয়ম প্রভৃতি সমস্ত ভুলাইয়া দিয়া একেবারে আত্মহারা করিয়া ফেলিল!...

"অত্য হইতে অঘোরমণি বাস্তবিকই 'গোপালের মা' হইলেন, এবং ঠাকুরও তাঁহাকে ঐ নামে ডাকিতে থাকিলেন।...সমস্ত দিন কাছে রাখিয়া, স্নানাহার করাইয়া, কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেব গোপালের মাকে কামারহাটি পাঠাইয়া দিলেন। ফিরিবার সময় ভাবদৃষ্ট বালক গোপালও পূর্বের ন্যায় ব্রাহ্মণীর কোলে চাপিয়া চলিল। ঘরে ফিরিয়া গোপালের মা পূর্বাভ্যাসে জপ করিতে বসিলেন; কিন্তু সেদিন আর কি জপ করা যায়? যাঁহার জন্য জপ, যাঁহাকে এতকাল ধরিয়া ভাবা—সে যে সম্মুখে নানা রঙ্গ, নানা আবদার করিতেছে! ব্রাহ্মণী শেষে উঠিয়া গোপালকে কাছে লইয়া তক্তপোশের উপর বিছানায় শয়ন করিল। ব্রাহ্মণীর যাহাতে তাহাতে শয়ন—মাথায় দিবার একটা বালিশও ছিল না। এখন শয়ন করিয়াও নিষ্কৃতি নাই—গোপাল শুধু মাথায় শুইয়া খুঁত খুঁত করে!...

পূর্বেই বলিয়াছি গোপালের মা নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া গোপালকে উদ্দেশ্যে খাওয়াইয়া পরে নিজে খাইতেন। পূর্বোক্ত ঘটনার পরদিন সকাল সকাল রন্ধন করিয়া সাক্ষাৎ গোপালকে খাওয়াইবার জন্য বাগান হইতে শুষ্ক কাঠ কুড়াইতে গেলেন। দেখেন, গোপালও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া কাঠ কুড়াইতেছে ও রান্নাঘরে আনিয়া জমা করিয়া রাখিতেছে। এইরূপ মায়েপোয়ে কাঠ কুড়ানো হইল—তাহার পর রান্না।"

গোপালের মার সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাতের তারিখ নিবেদিতার জীবনীকার প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা ও মুক্তিপ্রাণার মতে ২৮ ফেব্রুআরি ১৮৯৮, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাঁর ঠাকুর-বাড়িতে, শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবে। মিস্ মুলার ও জনৈক রাখালবাবুর সঙ্গে মিস্ নোবল দক্ষিণেশ্বর পরিদর্শনের পরে পূর্বোক্ত স্থলে যান। মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন: "ঘাটে অবতরণের পূর্বেই উৎসবের কোলাহল শোনা গেল।...শত শত বাঙ্গালী যুবক অপেক্ষা করিতেছে কখন স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিবেন।...মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড প্রভৃতি পূর্বেই আসিয়াছিলেন।... এখানেই সঞ্চরণশীল জনতার মধ্যে তাঁহারা জীর্ণবস্ত্র-পরিহিতা, জপে মগ্ন 'গোপালের মা'র প্রথম সাক্ষাৎ লাভ করেন। গোপালের মার কথা ইঁহারা পূর্বেই অবগত ছিলেন।... গোপালের মা চিবুক স্পর্শ করিয়া বিদেশিনী-গণকে সস্নেহ চুম্বন করিলেন। কেহ কাহারও ভাষা বোঝেন না। সুতরাং আলাপের প্রশ্ন ওঠে না, প্রয়োজনও ছিল না। গোপালের মার স্পর্শে তাঁহারা এক আন্তরিকতা অনুভব করিলেন। কোন কথা না বলিয়া গোপালের মা তাঁহাদের হাত ধরিয়া অন্তঃপুরিকাগণের নিকট লইয়া গেলেন। এখানেও বিস্ময়ের সহিত সাদর অভ্যর্থনা। মার্গারেটের মনে হইল, এইরূপেই ভারতের জনসাধারণের প্রকৃত মনীষার পরিমাপ করা যাইতে পারে।"

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা গোপালের মার বাড়িতে নিবেদিতা, ওলিবুল ও ম্যাকলাউডের এক যাত্রা-বিবরণ দিয়েছেন:

"স্বামীজীর নিকট গোপালের মার কাহিনী শ্রবণ করিয়া নিবেদিতা, মিসেস বুল, ও মিস ম্যাকলাউড এত অভিভূত হইয়াছিলেন যে, এক রাত্রে (১৮৯৮) তাঁহারা তিন জনে বাগ-বাজার হইতে নৌকা করিয়া কামারহাটি যাত্রা করেন।...পাশ্চাত্য মহিলারা তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন—গোপালের মার আনন্দের সীমা রহিল না!" এখানে লেখার ভঙ্গিতে যদিও মনে হয়, এই রাত্রেই গোপালের মার সঙ্গে উক্ত

তিনজন পাশ্চাত্য মহিলার প্রথম সাক্ষাৎ, তথাপি পূর্বোক্ত তথ্য অনুযায়ী একে পরবর্তী এক সাক্ষাৎ বলেই ধরে নেব। এখানে এই সঙ্গে আরও কিছু যোগ করতে চাই—গোপালের মার বাড়ীতে এই নৈশ অভিযানে 'সম্ভবত' নিবেদিতা উপস্থিত ছিলেন না; মিসেস বুল ও ম্যাক-লাউডই গিয়েছিলেন, এবং প্রত্যাবর্তনের পরে তাঁদের অপূর্ব অভিযানের কথা নিবেদিতাকে বলেন। সে বর্ণনা নিবেদিতার মনে এমনই প্রভাব বিস্তার করে যে পরেও অনেক সময়ে চিঠিপত্রে এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। যেমন—

"দক্ষিণেশ্বরে বড়দিনের রাত্রির কথা মনে পড়ে—কিংবা গোপালের মার বাড়িতে তোমার অভিযানের কথা, যাতে আমি না থাকলেও ছিলাম বলেই অনুভব করি।" (ম্যাকলাউডকে —১৮ মে, ১৯০০)

"তোমার কি মনে পড়ে—তুমি এবং ধীরা মাতা চাঁদনি রাতে গোপালের মাকে তাঁর গঙ্গা-তীরের আবাসে দর্শন করতে গিয়েছিলে?" (ম্যাকলাউডকে ১৮ জুলাই ১৯০৬)

নিবেদিতা 'The Master As I Saw Him' গ্রন্থে চাঁদনি রাতে এই ভ্রমণ এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে মনে হয়, তিনি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু তা ঠিক নয়; এখানে ধরে নিতে হবে, ম্যাকলাউড প্রভৃতির মুখ থেকে শুনে ব্যাপারটিকে তিনি কল্পনায় বাস্তববৎ দর্শন করেন, এবং তদনুযায়ী বর্ণনা করেন,—যা করতে তাঁর কোনই অসুবিধা হয়নি, যেহেতু পরবর্তীকালে গোপালের মার বাড়িতে তিনি অনেকবারই গিয়েছেন।

নিবেদিতা, মিসেস বুল ও ম্যাকলাউডের একত্রে একবার গোপালের মার দর্শনে যাত্রার কথা স্বামী সারদানন্দ, জানিয়েছেন, কিন্তু সেটি ঠিক কবে ঘটেছিল তা আমরা জানি না—

"শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজীর বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর সারা (মিসেস বুল), জয়া (ম্যাকলাউড) ও নিবেদিতা যখন ভারতে আসেন, তখন তাঁহারা একদিন গোপালের মাকে কামারহাটিতে দর্শন করিতে যান এবং তাঁহার কথায় ও আদরে বিশেষ আপ্যায়িত হন। আমাদের মনে আছে, গোপালের মা সেদিন তাঁহার গোপালকে তাঁহাদের ভিতরেও অবস্থিত দেখিয়া তাঁহাদের দাড়ি ধরিয়া সস্নেহ চুম্বন করেন, আপনার বিছানায় আদরে বসাইয়া মুড়ি, নারিকেল নাড়ু প্রভৃতি যাহা ঘরে ছিল তাহা খাইতে দেন, ও জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার দর্শনাদির কথা তাঁহাদিগকে কিছু কিছু বলেন। তাঁহারাও উহা আনন্দে ভক্ষণ ও তাঁহার ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া মোহিত হন এবং ঐ মুড়ির কিছু আমেরিকায় লইয়া যাইবেন বলিয়া চাহিয়া লন।"

বর্ণনাভঙ্গীতে মনে হয়, এই সাক্ষাৎকার-কালে স্বামী সারদানন্দ উপস্থিত ছিলেন, এবং তিনি দোভাষীর কাজ করেন।

গোপালের মার বিষয়ে নিজের সমগ্র মনো-ভাবকে নিবেদিতা সংহত আকারে প্রকাশ করেছেন 'The Master As I Saw Him' গ্রন্থের মধ্যে :

"গোপালের মা অতি বৃদ্ধা রমণী। পনের কি কুড়ি বছর আগে, তখনই তিনি প্রাচীনা, সেই সময়ে একদিন দুপুরে তাঁর কামারহাটির গঙ্গাতীরের ছোট ঘরটি থেকে পায়ে হেঁটে ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্রথম দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন।[১] শোনা যায়, ঠাকুর

[১] নিবেদিতার এই বিবরণের সঙ্গে স্বামী সারদানন্দের বিবরণের পার্থক্য আছে। স্বামী সারদানন্দ জানিয়েছেন, গোপালের মা কামারহাটির গোবিন্দচন্দ্র দত্তের ঠাকুরবাড়ি থেকে বিধবা দত্ত গৃহিণী ও কামিনী নাম্নী দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ার সঙ্গে নৌকাযোগে (পায়ে হেঁটে নয়) দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলেন। এখানে আমরা নিবেদিতার চেয়ে স্বামী সারদানন্দের বিবরণকেই নির্ভরযোগ্য মনে করি। প্রথম দর্শনের পরে অবশ্য গোপালের মা একলা পায়ে হেঁটেই শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনে যেতেন।

যেন তাঁরই প্রত্যাশায় দ্বারে অপেক্ষা করছিলেন। অপরদিকে এই ব্রাহ্মণীও—গোপালকৃষ্ণের আরাধনা যিনি এতদিন করে এসেছেন—ঠাকুরের মধ্যে সেই বালগোপালকে দর্শন করে অনিবার্যভাবে আকৃষ্ট হন।[২] ঠাকুরের প্রতি তাঁর এই গোপালভাব এতই গভীর সত্য হয়ে উঠেছিল যে, অতঃপর আর কখনো তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করেননি—কেননা ঠাকুর তাঁকে মা বলে গ্রহণ করেছিলেন। আর তিনি মাতাঠাকুরানীকে কখনো 'বৌমা' ভিন্ন বলেছেন, এমন শুনিনি।

শ্রীশ্রীমা ও তাঁর সঙ্গিনীদের সঙ্গে থাকাকালে আমি গোপালের মাকে কলকাতায় কখনো শ্রীশ্রীমায়ের কাছে বা কয়েক সপ্তাহ একাদিক্রমে কামারহাটিতে কাটাতে দেখেছি। সেখানে, কামারহাটিতে, তাঁর দর্শনে আমাদের মধ্যে কয়েকজন গিয়েছিলেন এক পূর্ণিমা রজনীতে। অপরূপ সুন্দর গঙ্গার মধ্য দিয়ে নৌকা ধীরে ধীরে বয়ে গিয়েছিল। নদীজল থেকে উঁচু চত্বরের দিকে উঠে-যাওয়া দীর্ঘ সার সার সিঁড়িগুলি—তাও কত অপূর্ব!—সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে, ঘাসে-ঢাকা প্রাঙ্গণ পেরিয়ে, দক্ষিণে আবৃত অবরোধতুল্য বারান্দায় ছোট্ট একটি ঘর, হয়তো সেটি বৃহৎ অট্টালিকাপ্রান্তে ভৃত্যদের জন্যই নির্মিত হয়েছিল—সেই ঘরেই গোপালের মার ঠাঁই, সেই ঘরেই বছরের পর বছর ধরে জপ। অট্টালিকা এখন শূন্য। তাঁর ছোট ঘরটিতেও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সামান্য ব্যবস্থা নেই। পাথরের মেঝে, সেই মেঝেতেই শয়ন। অতিথিদের বসবার জন্য যে মাদুর পেতে দিলেন, তা তাকে তোলা ছিল—সেখান থেকে পেড়ে এনে মেঝেয় বিছিয়ে দিলেন। তাঁর সঞ্চয়ের মধ্যে দুটি মুড়ি আর কিছু বাতাসা, একটি মাটির হাঁড়িতে করে শিকেয় ঝোলানো ছিল, শুধু তাই দিয়েই হল অতিথি-সৎকার। জায়গাটি কিন্তু ঝকঝকে পরিষ্কার। গঙ্গাজল কষ্ট করে তুলে এনে অবিরত ধোয়া মোছা করেন। কাছের এক কুলুঙ্গীতে একখণ্ড রামায়ণ, চশমাখানি, জপের মালার সাদা ছোট ঝোলাটি। এই মালা জপ করেই গোপালের মা সিদ্ধ হয়েছেন।* ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর—কত বছর!—দিবারাত্র এই মালা হাতে নিয়ে তন্ময় হয়ে কাটিয়েছেন!

সিত উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে মাথা নাড়িয়ে কানাকানি করছে কৃষ্ণ-ছায়াবৎ বৃক্ষলতাপুষ্পাদি—সে যেন কোন মর্মরশুভ্র স্বপ্নলোকে। কিন্তু সুগভীর শান্তির চিরমন্দিরের মত গোপালের মার ক্ষুদ্র কক্ষটির চেয়ে বড় স্বপ্নলোক আর কী হতে পারে—আমাদের দ্রুতধাবমান জীবনের কাছে! 'আ—হা!—এই হল পুরাতনী ভারতবর্ষ—তোমরা যা দেখে এলে!'—স্বামীজী এই স্থান দর্শনের কথা শুনে বলেছিলেন—'এই হল বেদনা ও প্রার্থনার ভারতবর্ষ। উপবাস ও নিষ্ঠার ভারতবর্ষ! এ ভারত চলে যাচ্ছে—আর ফিরবে না কোনো দিন!'

কলকাতায় এসে জনৈক ইউরোপীয়ের সঙ্গে একই বাড়ীতে অবস্থানের ব্যাপারে গোপালের মার আশী বছরের সংস্কার হয়তো কিছু বেশীই

২ এ দর্শন ও অনুভূতি প্রথম সাক্ষাৎকালে হয়নি, পরে হয়েছিল।

* নিবেদিতার এই উক্তি সম্পূর্ণ ঠিক কি না সন্দেহ। স্বামী সারদানন্দ বলেন, গোপাল-সিদ্ধির পরে গোপালের মার আর বেশী জপের দরকার নেই, শ্রীরামকৃষ্ণ একথা বলায় গোপালের মা 'থলি মালা সব' গঙ্গার জলে ফেলে দেন। পরে পুনশ্চ একটি মালা নেন, কারণ 'একটা কিছু তো করতে হবে! চব্বিশ ঘণ্টা করি কি? তাই গোপালের কল্যাণে মালা ফেরাই।'

আহত হয়েছিল। কিন্তু একবার তা কাটিয়ে ওঠার পরে তিনি উদারতার প্রতিমূর্তি। অবশ্যই তিনি রক্ষণশীল কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু বদ্ধমূল গোঁড়া কদাপি নন। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর পূজার্চনারীতির সঙ্গে তাঁর গঙ্গাতীরের তপস্যা-কুটীরের কোনো পার্থক্যই তাঁর মনে ওঠেনি।…"

গোপালের মার তপস্যায় বাঁধা কঠোর নিষ্ঠার জীবনে বহু তরঙ্গ আছড়ে পড়েছে—তিনি পরিবর্তিত হয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে। 'ভাতের হাঁড়ির' ব্যাপারে একদা যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-স্পর্শকে পর্যন্ত ডরিয়েছেন *১ তিনিই পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে ম্লেচ্ছ বিদেশিনীর সঙ্গে একত্র থেকেছেন এবং আরও পরে উক্ত ম্লেচ্ছ মহিলার বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছেন জীবনসন্ধ্যায়।*২

মুক্তিপ্রাণার জীবনীতে পাই—গোপালের মা অসুস্থ ও বার্ধক্যে অশক্ত হয়ে পড়লে স্বামী সারদানন্দ তাঁকে ৫৭, রামকান্ত বসু স্ট্রীটে বলরাম বসুর বাড়িতে নিয়ে আসেন। তখন পর্যন্ত কলকাতায় শ্রীশ্রীমায়ের নির্দিষ্ট বাসস্থান ঠিক না হওয়ায় নিবেদিতা প্রস্তাব করেন, তাঁর বাড়ীর একটি পৃথক ঘরে গোপালের মা বাস করতে পারেন। তদনুযায়ী ১৯০৩ ডিসেম্বরের গোড়ায় ('মাঝামাঝি' নয়) গোপালের মা নিবেদিতার বাড়িতে আসেন, পৃথক একটি কক্ষে বাস করতে থাকেন এবং কুসুম নামক এক ব্রাহ্মণকন্যা তাঁর পরিচর্যার ভার নেন।

নিবেদিতার কাছে গোপালের মা 'শ্রীশ্রীমায়ের মতই আর একটি আশ্চর্য আত্মা'রূপে প্রতীয়মান—সুতরাং তাঁকে কাছে পেয়ে নিবেদিতার আনন্দের সীমা থাকার কথা নয়। সে আবেগ তিনি অনেকবারই চিঠিতে প্রকাশ করেছেন। ৯ ডিসেম্বর, ১৯০৩, বান্ধবীকে লিখেছেন, "গোপালের মার কাছে থাকলে অন্তরে একটা অদ্ভুত উদ্দীপনা জাগে। সেন্ট এলিজাবেথের কথাগুলো কানে বাজে: 'কী এমন আমি যে আমার ঠাকুরের মা আমায় দেখতে আসবেন!' গোপালের মার যে পরমহংস অবস্থা, এ আমি বিশ্বাস করি। মনে হয়, শুধু ওঁকেই পূজা করতে পারি যদি, তাহলেই যাদের ভালবাসি তাদের'পরে বিধাতার আশীর্বাদ অজস্র হয়ে ঝরে পড়বে। এর বেশী আর কী বলব!" (নারায়ণী দেবী কর্তৃক অনূদিত রে্ম-র নিবেদিতা-জীবনী)। ১৭ ডিসেম্বর মিসেস বুলকে—"গতবার তোমায় লিখে উঠতে পারিনি কারণ গোপালের মা এসে হাজির হয়েছিলেন; তিনি এক সপ্তাহ এখানে আছেন, কী অসাধারণ লাগছে—অনুভব করতে পারো!" ম্যাকলাউডকে—"গোপালের মা এখানে আছেন। আমার কী যে আনন্দ! স্বামী সারদানন্দ বলেছেন তিনি আমাদের কাছেই বরাবর থাকবেন—আমাদের আদরের ছোট্ট ঠাকুরমা।"

---

*১ "অঘোর মণি 'কড়ে রাঁড়ী'—স্বামীর সুখ কোন দিনই জীবনে জানেন নাই। মেয়েরা বলে 'ওরা সব যত্নী রাঁড়ী, নুনটুকু পর্যন্ত ধুয়ে খায়।'……বেজায় আচার বিচার! আমরা জানি, একদিন তিনি রন্ধন করিয়া বোক্‌নো হইতে ভাত তুলিয়া পরমহংসদেবের পাতে পরিবেশন করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কোন প্রকারে ভাতের কাঠিটি ছুঁইয়া ফেলেন। অঘোরমনির সে ভাত আর খাওয়া হইল না এবং ভাতের কাঠিটিও গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। তিনি যখন প্রথম প্রথম ঠাকুরের নিকট আসিতেছেন, ইহা সেই সময়ের কথা।"—স্বামী সারদানন্দ রচিত 'গোপালের মা'।

*২ লেডী অবলা বসু লিখেছেন, নিবেদিতার চরিত্রগুণে অতি রক্ষণশীল সিদ্ধ তাপসীও তাঁর আতিথ্য নিয়ে খুশী হয়েছিলেন। এখানে শ্রীমতী বসু গোপালের মার কথাই বলেছেন।

গোপালের মার নিকট-সান্নিধ্যের সৌভাগ্যে নিবেদিতা নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন। সেবায় শুশ্রূষায় নিজের নিত্য প্রণাম নিবেদন করেছেন এই সিদ্ধ নারীর প্রতি। উভয়ের সম্পর্কের একটি অনবদ্য ছবি এঁকেছেন লিজেল রেঁম—

"ভোরবেলায় নিবেদিতা তাঁর দোরগোড়ায় গিয়ে বসে থাকেন, কখন বুড়ি ইশারায় ঘরে ঢুকতে বলবেন, এই প্রতীক্ষায়। এমনি প্রতিদিন। গোপালের মা হয়তো স্তব পড়ছেন, কি জপ করছেন। নিবেদিতাকে দেখলেই তাঁর বলিকুঞ্চিত মুখ খুশির হাসিতে ঝলমলিয়ে ওঠে, চোখদুটি জ্বল জ্বল করে। নিবেদিতাকে কাছে টেনে এনে একটু ফলমিষ্টি মুখে তুলে দেওয়া চাই-ই রোজ।

গোপালের মার ঘরে ঠাকুরদের আনাগোনা চলে, কিন্তু তাঁদের কথা বুড়ি মুখেও আনবেন না। কথা কইলেই তাঁরা নাকি ভয় পান। ঘরের বাতাস ভরে আছে গোপালের বাঁশির সুরে, সে সুরও যায় থেমে। এ খবর নিবেদিতার অজানা নয়। তাই তিনি চুপ করে থাকেন। রাতে যখন গোপালের মা কষ্ট পান, নিবেদিতা গা-হাত-পা টিপে দেন। মা যেমন রুগ্ন মেয়ের যত্ন করে তেমনি যত্ন করেন তাঁর। জগদীশ্বরী যেন অসহায় দুর্বল সেজে সেবা নিতে এসেছেন, এমনি মনে হয় নিবেদিতার। নিজের মায়ের কোনো সেবাতেই তো লাগেন নি, গোপালের মা যেন নিবেদিতার সেই মা-জননী।"

নিবেদিতার বাড়িতে গোপালের মার আড়াই বছর কাটে। নিবেদিতার চোখের উপর দিয়েই তাঁর জীবনদীপ ক্রমে নিভে আসে। ১৬ই জুলাই ১৯০৪, ম্যাকলাউডকে লিখেছেন—"গোপালের মার স্মরণশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—ছেলেমানুষ হয়ে উঠছেন।" প্রায় এক বছর পরে, ৪ঠা মে ১৯০৫, ম্যাকলাউডকেই—"গোপালের মা আমাদের সঙ্গে আছেন, জানো তো। ভারী মিষ্টি—আবার কখনো কখনো খুব ঝঞ্ঝাট বাধান। কিন্তু তাঁকে আমাদের মধ্যে পাওয়া নিত্য আনন্দের কারণ।" ২৯শে জুন, ১৯০৬, একই মহিলাকে—"আমাদের বাড়ির পিছন দিকে নিজের ঘরে শুয়ে ঘণ্টায় ঘণ্টায় গোপালের মা মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছেন।" এবং ১২ই জুলাই মৃত্যুসংবাদ—"গোপালের মার দেহ গেছে। গত রবিবার উষাকালে গঙ্গাতীরে তাঁর নির্বাণ হয়েছে—অতি পবিত্র এবং শান্ত প্রয়াণ। এখন মুক্ত আত্মা।"

এর পরে ১৮ই জুলাই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সংবাদ—"গোপালের মা রবিবার উষাকালে গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেছেন, আজ তাঁর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। সকাল দশটায় কোনো কোনো আমন্ত্রিত এসেছেন—যাঁরা রাত আটটায় ফিরবেন বলে গাড়িকে বলে দিয়েছেন।…এখন কীর্তনসম্রাজ্ঞী যন্ত্রবাদ্যাদি সহ তলায় অপেক্ষমাণা; হাসিম খাঁ ও তার দলবলকে তোমার মনে আছে?"*[১]

* ১ উদ্বোধন পত্রিকার ১৫ শ্রাবণ ১৩১৩ তে গোপালের মার দেহত্যাগ উপলক্ষে লেখা হয়—

"বিগত ২৪শে আষাঢ়, ৮ই জুলাই রবিবার 'গোপালের মা' নামে পরিচিতা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এক পরম ভক্ত দেহত্যাগ করিয়াছেন। দেহত্যাগের সময় তাঁহার বয়স প্রায় ৯০ বর্ষ হইয়াছিল। ইনি পূর্বে কামারহাটিতে কলুটোলার গোবিন্দ দত্তের ঠাকুরবাড়িতে থাকিতেন। ইনি পরমহংসদেবকে আপন পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন এবং তাঁহাকে গোপাল বলিতেন। এই কারণেই তাঁহার নাম 'গোপালের মা' হইয়াছিল। ইঁহার সাধননিষ্ঠা অদ্ভুত ছিল। শুনা যায়, কলিকাতায় যেবার প্রবল ভূকম্প হয়, সেবার ইনি কামারহাটির নিজ গৃহ দোদুল্যমান হইতে থাকিলেও একমনে জপে নিমগ্ন ছিলেন। ইদানীং শরীর অতিশয় রুগ্ন হওয়ায় কলিকাতা বোসপাড়ায় সিষ্টার নিবেদিতার নিকট থাকিতেন। নিবেদিতাও প্রাণপণে ইঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। বিগত ২রা শ্রাবণ ইঁহার স্মরণার্থ সিষ্টার নিবেদিতা নিজ গৃহে এক মহোৎসব করেন। প্রায় দেড়শত দুইশত মহিলার সমাগম হয়। সিষ্টারের যত্নে ও আতিথ্যে সকলেই তৃপ্ত হইয়াছিলেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি সুবৃহৎ ব্রোমাইড ফটো নানাবিধ ফলফুলে সজ্জিত করা হইয়াছিল এবং নিকটে গোপালের মারও একখানি ফটো রাখা হয়। সুমধুর কীর্তন শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন! অবশেষে প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ বিতরিত হয়।"

৮ই জুলাই, ১৯০৬ গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মমুহূর্তে গোপালের মার প্রয়াণ ঘটে। এর দু'দিন আগে তাঁকে 'গঙ্গাযাত্রা' করানো হয়। যাত্রাকালে নিবেদিতা পুষ্প-চন্দন-মাল্যাদি দিয়ে নিজে তাঁর শয্যা সাজিয়ে দেন ও 'স্বয়ং অনাবৃত পদে সাশ্রুনয়নে' তাঁর সঙ্গে গঙ্গাতীরে গিয়ে মৃত্যু অবধি দুই রাত্রি কাটান। গোপালের মার যথাবিহিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও কীর্তনাদির ব্যবস্থাও নিবেদিতা করেছিলেন।

গোপালের মার প্রসঙ্গ শেষ করছি তাঁর দেহান্তের পর লিখিত একটি রচনার শেষাংশ উদ্ধৃত করে।*১ ঐ রচনার গোড়ার দিকে নিবেদিতা ভারতীয় ভাষার নানা শব্দকে ভাষান্তরিত করা যে অসম্ভব তার আলোচনা প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে 'গোপাল' শব্দটির উল্লেখ করেন। 'গোপাল'-এর আক্ষরিক অর্থ গো-পালক, কিন্তু আসল অর্থ কৃষ্ণ—ইউরোপের ক্ষেত্রে যা Christ-child। গোপালের মা ভারতীয় Christ-child এর মাতা। এর সঙ্গে নিবেদিতা গোপালের মার মহাপ্রয়াণের ব্যঞ্জনাময় বর্ণনা করেছেন তারই অনুবাদ—

"সারারাত্রি ধরে আমরা মুমূর্ষুর ধীর গভীর শ্বাসের ওঠাপড়া লক্ষ্য করছিলাম! গভীরে, আরো গভীরে, আরো আরো গভীরে স্ফীত, পরিস্ফীত শ্বাস প্রবেশ করে যায়, মনে হয় ঐ অতি প্রাচীন দেহ বুঝি সব স্পন্দন হারিয়ে ফেলল—তারপরেই শ্বাসমুক্তি, পরপর কয়েকটি দ্রুত অন্তঃশ্বাস। এ রকম শ্বাসগতি নাকি কদাচিৎ দেখা যায়—বহুবৎসর প্রাণায়ামের ফলেই এ জিনিস হওয়া সম্ভব। জপমালা হাতে এই বৃদ্ধা 'গোপালমন্ত্র' জপ করে গেছেন দিবারাত্র, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে, সেই সময়ে অসচেতনেই নিরন্তর ঘটে গেছে প্রাণায়াম।

কেন না—ইনি যে গোপালের মা। যাঁর পাশে বসেছিলাম আমরা—যাঁকে দেখেছিলাম—ইনি সেই সিদ্ধা তাপসী যাঁকে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের মায়ের মত দেখতেন।

শায়িত তপস্বিনী—অণুমাত্রও আকাঙ্ক্ষা নেই তাঁর, কোনদিনই ছিল না তা। একটি ভাবে মন স্থির—যা তাঁর জীবনসর্বস্ব। সেই ভাবেরই আনন্দে ও পরমা শান্তির শেষ কিরণে উদ্‌ভাসিত আনন। এইভাবেই গঙ্গাতীরে শুয়ে আছেন পূর্ণ একরাত্রি ও একদিন।

পূর্ণিমার চাঁদ যখন আকাশে উঠেছিল, তখন আমরা তাঁকে দুয়ারের বাইরে এনেছিলাম। পার্থিব বন্ধনের প্রথম বেষ্টনী গৃহবন্ধনকে যখন পেরিয়ে গেলেন জয়হর্ষের সঙ্গে—আমরা অনুভব করেছিলাম তাঁর আত্মার নীরব ধীর ঊর্ধ্ব-প্রয়াণ। কিন্তু গঙ্গার ঘাটে যখন এলেন, স্নিগ্ধ শীতল বাতাস যখন বয়ে গেল তাঁর দেহের উপর দিয়ে, তারই মধ্যে, উজ্জ্বল পূর্ণিমালোকের মধ্যে, যখন তিনি রইলেন কিছুক্ষণ, তখন আত্মার পুনঃপ্রত্যাবর্তনের লক্ষণ যেন দেখা গেল তাঁর মধ্যে, মুমূর্ষুর ক্ষেত্রে যা সচরাচর দেখা যায় না। তারপরে, পূর্ণ নির্বাপণের পূর্বে, আরও অনেক ঘণ্টা ধরে জীবনদীপ জ্বলতে লাগল জীর্ণ আধারে।

এই কালে সম্পূর্ণ চৈতন্যহারা কিন্তু হন নি। তাঁর চাহনি যাদের উপর পড়েছে, তাদের মনে হয়েছে তিনি যেন তাদের চিনেছেন। আর শেষ সকালে, পুরোহিত এসে যখন উপনিষদের মন্ত্রপাঠ করছিলেন, তখন তিনি স্পষ্টই সাড়া দিয়েছিলেন, যেন বিশেষ আবেগের সঙ্গেই। সারা জীবন তিনি গোপাল-ভাবের সাধনা করেছেন, তাই নব্বই-উত্তীর্ণ তাঁর প্রাচীন জীর্ণ

---

*১ রচনাটি প্রথমে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়, পরে Studies from an Eastern Home-এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

দেহ যখন বিদায় নিচ্ছে, সেই শেষ ক্ষণে শিশুর নির্ভরতায় ভরে থাকবে, এই তো স্বাভাবিক। শুধু দেহের কাঁপন, কি মাথার একটু নড়াচড়ায় ইচ্ছাশক্তির সামান্য প্রকাশ হয়তো ছিল।

কিন্তু সে অবস্থাও এখন অতীত। আবার রাত্রি ঘনিয়েছে। বহুঘণ্টা ধরে শায়িত, স্থির,—সম্পূর্ণ অন্তর্মুখ। শান্তি! পৃথিবীতে যাঁর কোনো কামনাই নেই তাঁরই যোগ্য শান্তি!

প্রতীক্ষা করে আছি আমরা মেয়ের দল, কানে আসছে ঘাটের তলায় সিঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে গঙ্গার ছল্ ছল্ ছলাৎ শব্দ, কিংবা বর্ষার ঝোড়ো হাওয়ায় চাপা দীর্ঘশ্বাস, যখন তা নদী-তরঙ্গের উপর দিয়ে ঝাপট দিয়ে বয়ে যেতে লাগল। তারই মধ্যে একবার, তখন মধ্য-রাত্রি,—মধ্যরাত্রির ঘণ্টাখানেক পরে কি?—হঠাৎ নীরবতাকে মথিত করে মেঘাবৃত পূর্ণিমাকাশের তলবর্তী নদীতরঙ্গ পাকখেয়ে ছুটল প্রচণ্ড বেগে, নোঙর করা নৌকাগুলি গায়ে গায়ে ধাক্কা খেতে লাগল, রব উঠল 'বান আসছে! বান আসছে!' সেই দেখে বুক ভেঙে দীর্ঘশ্বাস পড়ল কয়েক জনের—এই বিদায়ী আত্মা যাদের কাছে সুহৃদ্ ও গুরু। তারা ভাবল—এই বন্যাই তো সঙ্কেত—ঘনিয়ে আসছে বিদায়ক্ষণ - স্বজন স্বভূমি ছেড়ে এবার তিনি প্রস্থান করবেন অজানালোকে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটলেও এখনো একই প্রকার। বিশ্রাম ছেড়ে কেউ হয়ত উঠে মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে শ্রদ্ধাকোমল হাতে কিছু পরিচর্যা করলেন, অন্য কেউ কিছু বিশ্রামের প্রয়োজনে শুয়ে পড়লেন। অকস্মাৎ কিছু চাঞ্চল্য, নিদ্রিতকে কার ছোট একটি হাত স্পর্শ করে জাগাল: 'বাহকদের ডাক! শেষ হয়ে আসছে!' তারা বসেছিল ঘাটের উপরের চত্বরে; সারারাত্রি বসে তারা পুরনো কথা বলছিল; এই বিদায়ী জীবনের সঙ্গে নানা জনের সম্পর্কের কথা আলোচনা করছিল সারাক্ষণ; - সুতরাং ডাকামাত্র তারা উঠে আসতে পারলো অবিলম্বে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মুমূর্ষুকে খাটিয়ায় তুলে গেরুয়া ও সাদা কাপড়পরা ঐ সব বাহকেরা কাঁধে করে উত্তরের ঘর থেকে দ্রুত বাইরে নিয়ে এল,—কয়েক পা নীচেই গঙ্গাতট, সেখানে পবিত্র বারিতে পাদস্পর্শ করে শায়িত হবেন গোপালের মা—তারপর চলে যাবেন।

শুয়ে আছেন সেখানে—শ্বাসরীতির পরিবর্তন হয়েছে, এখন তার সহজ উত্থান পতন। আবাল্য গোপালের মাকে জানেন, এমন এক সন্ন্যাসী তাঁর উপর ঝুঁকে পড়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিসানির সুরে মৃত্যুকালে হিন্দুর একান্ত ইচ্ছার মন্ত্রটি উচ্চারণ করলেন: 'ওঁ গঙ্গা নারায়ণ! ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম!' তারপরে - শুধু এক মুহূর্ত—তারপরেই সমবেত কণ্ঠে - 'হরিবোল!'—নির্গত হয়ে গেছে প্রাণবায়ু! গোপালের মার আত্মা ঊর্ধ্বপথে—পড়ে আছে দেহযন্ত্র।

'এখন কি ঊষাক্ষণ!' মেঘের পিছনে স্বচ্ছতার আভাস দেখে খাটিয়ার মাথার দিকের একজন জিজ্ঞাসা করলেন। পায়ের দিক থেকে উত্তর এল—'হাঁ তাই বটে—ঊষা!' আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে দেখলাম, যে বারিধারা মুমূর্ষুর চরণস্পর্শ করে বয়ে যাচ্ছিল, তা সরে গেছে, নেমে গেছে কয়েক ইঞ্চি ইতিমধ্যেই। গোপালের মা সত্যই ব্রাহ্মমুহূর্তে দেহত্যাগ করেছেন—নদীর স্রোত ফেরার ঠিক মুখে!"

পরম সাধনা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

১

রাজরাজেন্দ্র মন্দিরে তাঁর গাহিলেন প্রেমবন্দনায় :
নমি বার বার, হে নাথ, তোমার মহিমার পার পায় ধরায় ?
তুমি চিরদিন সাধো অমলিন ছন্দে কত না এ-ধূলিধামে
তৃণে ফুলে ফলে অমরাবতীর রূপামঞ্জীর তোমার নামে !
যেথায় যাহারই অন্তরে জাগে অচিন্ত্য প্রভা অন্ধকারে
তোমারি হে প্রিয়, অনিন্দনীয় দ্যুমণি ঝরায় আলো-আসারে।
আমায় কেবল দাও নির্মল বর : শুনি যেন বীণার তারে
সান্দ্র তোমার মধুঝঙ্কার—ঢালো তুমি যারে সুর-আসারে।
সুরে মিলে দিশা, কাটে অমানিশা, মিটে চিরতৃষা জানি হৃদয়ে :
করি প্রার্থনা সে-সুরসাধনামন্ত্রদীক্ষা আজ প্রণয়ে।

২

পরদিন রাজা মন্দিরে তাঁর বসিতে আসনে গভীর ধ্যানে
দেবতা-বীণার সুরঝঙ্কার উঠিল উছলি' অধীর তানে :
দেখেন নয়ন মেলি' বেদীমূলে অলক্ষ্য দেব গেছে রাখিয়া
দীপ্ত দৈবী বীণা - সম্রাট্ কহেন পুলকে উচ্ছুসিয়া :
"প্রতি পদে পাই, তবু ভুলে যাই—ঝরালে করুণা তুমি কত না !
যাকিছু চেয়েছি বন্ধু, পেয়েছি। দেখেছি—প্রসাদ নয় ছলনা।
শুধাই কেবল—কার সে-অমল করে বীণা তব উঠিবে রণি' ?"
কহে গূঢ় স্বর : "ধরায় রাজন্, আছে অগণন মোহন গুণী,
করো আহ্বান সবারে, কেবল একটি গুণীর পরশে বীণা
উঠিবে কাঁপিয়া প্রেমমূর্ছনে—আরাধনা যার নির্মলিনা।

৩

করিল রাজার চারণ ঘোষণা : "রাজমন্দিরে এসো সকলে,
যে যেখানে আছ সুরেলা, বাজাতে স্বর্গের বীণা আজ ভূতলে।
সে-বীণা উঠিবে যার হাতে বাজি'—দিবেন প্রভু শ্রীকণ্ঠে তার
আপনার গাঁথা বৈজয়ন্তী মালা সুগন্ধি, চমৎকার !"

৪

শুনি' দলে দলে আসে ছুটি' মহানন্দে নিপুণ শিল্পী কত !
শুধু বাজিল না বীণা—বুঝি কেহ নয় দেবতার মনের ম'ত ?
দৃপ্ত বাদক সুরের সাধক—শত শত শ্রোতা উল্লসিয়া
উঠিত যাদের আলাপে—তাদের হাতে ওঠে না তো বীণা বাজিয়া!

কেন বা ? জানি না—এ কি মায়াবীণা ? গুণীর পরশে বাজে না কেন ?
সুরের ঐন্দ্রজালিক যাহারা—হার মানে কেন তারাও হেন !

৫

অবশেষে এক দিব্য কান্ত তরুণ শান্ত মুনিতনয়
আসিয়া কহিল হাসিয়া : "প্রভু, এ দৈবী বীণা, সামান্য নয়।
শুধু তার হাতে উঠিবে সে বাজি' পেয়েছে যে হৃদে তাঁর প্রসাদ :
ধ্যানে আমি তাঁর পেয়েছি করুণা দেখ চেয়ে তাই হে নরনাথ,
কেমনে রণিয়া ওঠে বীণা"—বলি' নিল তারে কোলে তুলিয়া তার,
অঙ্গুলিঘায় গুণীর নিমেষে উঠিল তন্ত্রী কাঁপি' বীণার।

৬

সুরে সুরে ছেয়ে গেল সভাতল···চেয়ে থাকে সবে সবিস্ময়ে
তার পানে—জাগে পরশে যাহার আবেশ অপার প্রতি হৃদয়ে !
সম্রাট্ রাখি' অচিন গুণীর নয়নে মুগ্ধ নয়ন তাঁর
পুছিলেন : "এ কী ! জাগরণে দেখি এ কোন্ স্বপন চমৎকার !
কত মহাগুণী মানিল হার যে-বীণারে জাগাতে ঝংকারিয়া,
কেমনে তোমার মায়াবী পরশে উঠিল হরষে সে উছসিয়া ?
বৈজয়ন্তী মালা বাসন্তী দিই শ্রীকণ্ঠে তোমার ভাই !
হেন অঘটন ঘটালে মোহন, কেমনে বলো না, শুনিতে চাই।"

৭

মুনিনন্দন কহিল : "রাজন্ ! নিরভিমানে যে করেছি আমি
সুরের সাধনা—সুরের চরণে যা আছে আমার দিয়ে প্রণামী।
ভুলিতে যে পারে প্রেমে আপনারে—তন্ময় হ'য়ে তাহার ধ্যানে
যারে আবাহন করিতে সে চায়, ধরে রূপ প্রেমী তাহারি প্রাণে।
পায় না উষার দিশা—মতি যার নিশীথ-বিহারে মানে না লাজ,
নাম এ-নিশার—'স্বেচ্ছা-আঁধার-বরণ-কামনা' হে মহারাজ !
সুরসাধনায় সুরেশের পায় যা আছে প্রাণের দিয়ে প্রণামী
আপনারে তাঁর করি উপচার, দিয়েছেন বর তাই তো স্বামী।
আপনারে পারে ভুলিতে যে ধ্যানে তন্ময় হ'য়ে তাঁহার প্রেমে
যাঁরে সে করিতে চায় আবাহন, ভাবে তার তিনি আসেন নেমে
ওরা বারে বারে চেয়েছে বীণারে বাজাতে তাদের আপন সুরে,
তাই বেদরদী পরশে তাদের ওঠেনি বেজে সে এ-রাজপুরে।
আমি শুধু বলেছিলাম বীণাকে বাজিতে আপন সুরেই তার :
তাই তো তন্ত্রী তাহার মন্দ্রি' উঠিল ঝংকৃ' হাতে আমার।"

মহাশক্তির প্রতীক

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ভারতীয় মন উপলব্ধি করেছে এক সর্বব্যাপিনী চৈতন্যশক্তিকে, যে শক্তির প্রকাশ জগতে বিভিন্ন- ও বিচিত্র-রূপে। অধ্যাত্মশক্তি, মনঃশক্তি, বাহুশক্তি অথবা পদার্থের শক্তি একই মহাশক্তির রূপান্তর মাত্র। বর্তমানে বিজ্ঞানও আর জড়বাদী নয়, কারণ বিজ্ঞানীর মতে মূল পদার্থগুলি জড় নয়, শক্তি (energy) ; যদিও তাকে চৈতন্যাত্মক বলে স্বীকার করা হয় না।

এই জগৎপ্রপঞ্চ যে দুর্জ্ঞেয় চিৎশক্তির প্রকাশ সেই শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সৌম্য ও রুদ্র উভয়রূপে বিরাজিত—সৌম্যাঽসৌম্যতরাশেষ-সৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী ইত্যাদি। স্বামী বিবেকানন্দের 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' নামক কবিতায় শক্তির এই রুদ্র ও মধুর রূপের চিত্রটি সুপরিস্ফুট।

এই চিৎশক্তিকে প্রকৃতি, প্রধান বা মায়া বলে অভিহিত করেছেন বিভিন্ন দার্শনিকগণ। চিৎশক্তি বা আদ্যাশক্তির সাহায্যেই অবতার-লীলা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, সেই আদ্যাশক্তি ব্রহ্মজ্ঞান দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, নচেৎ নয়। বন্ধন আর মুক্তি এই দুই-এর কর্তাই তিনি—ভোগস্বর্গাপবর্গদা। বেদান্তবাদী মায়াকে অস্বীকার করেন, তাঁর মতে দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত সেই নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু এবং তাঁকে লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে ব্রহ্মলাভ যদিও লক্ষ্য, তবু মায়াকেও অস্বীকার করা যায় না। রহস্য করে বলতেন, যতক্ষণ দেহবোধ রয়েছে ততক্ষণ শক্তির এলাকায়। এই শক্তিকে মাতৃভাবে উপাসনা ও তার বিভিন্ন সাধনপ্রণালী বহুকাল ধরে ভারতে প্রচলিত। শ্রীরামকৃষ্ণ যদিও বিভিন্ন ধর্মের অনুষ্ঠান করে প্রমাণ করেছেন 'যত মত তত পথ', আজীবন তিনি ছিলেন মাতৃভাবের পূজারী। অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তির মত অভিন্ন ব্রহ্ম ও তাঁর মায়াশক্তিকে তিনি মাতৃভাবে উপাসনা করেছেন। তাঁর কাছে মায়া বা আদ্যাশক্তি জগন্মাতা অর্থাৎ সৃষ্টির কারণ।

জগতে মায়ার প্রভাব শুভ এবং অশুভ উভয় প্রকার। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া বা বিদ্যাশক্তি ও অবিদ্যাশক্তি। উদগ্র কামনা, বাসনা, লোভ, মোহ, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতির পশ্চাতে রয়েছে অবিদ্যামায়া—যার প্রভাবে ভোগে বদ্ধ মানুষের পুনঃ পুনঃ গতাগতি এই সংসারে। বিদ্যামায়া হল হ্লাদিনী শক্তি যা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আনন্দ, জাগতিক ক্ষেত্রে যার প্রকাশ দয়া, পবিত্রতা, প্রেম, ভক্তি, মাধুর্য, অধ্যাত্মসম্পদ ইত্যাদি। বিদ্যামায়া মানবকে উন্নীত করে আধ্যাত্মিক স্তরে। বিদ্যামায়ার সহায়ে সাধক নিরন্তর সংগ্রামের দ্বারা অবিদ্যামায়ার প্রভাব থেকে মুক্তিলাভ করে অবশেষে মায়াতীত অবস্থা লাভ করেন।

হিন্দুধর্ম প্রত্যেক নারীকে এই মহাশক্তির প্রতীক বলে ঘোষণা করেছে। সমগ্র সৃষ্টির পশ্চাতে যেমন মহাশক্তির লীলা, ব্যবহারিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে তেমন নারীজাতির প্রভাব। একদিকে যেমন অবিদ্যাশক্তি ও তার অশুভ প্রকাশকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে 'নারী নরকস্য দ্বারম্' অপরদিকে তেমনি বিদ্যাশক্তিকে লক্ষ্য করে সাধকগণ নতজানু হয়ে বলেছেন, 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু'। নারীমাত্রেই তাঁদের

কাছে মাতৃজ্ঞানে উপাস্য। সমাজ- ও ব্যক্তি-জীবনে নারীর প্রভাব লক্ষ্য করে ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন,—'The position of women in any society is a true index of its cultural and spiritual level'—অর্থাৎ যে কোন সমাজে নারীজাতির অবস্থা তার সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক স্তরের যথার্থ পরিচয় বহন করে।

কথামৃতকার শ্রীমকে দ্বিতীয় দর্শনের দিন শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, তোমার পরিবার কেমন? বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি?

শ্রীম উত্তর দিলেন—আজ্ঞা ভাল, কিন্তু

শ্রীমর পত্নী আধুনিক অর্থে শিক্ষিতা ছিলেন না, তাই এই উত্তর। পরে অবশ্য তিনি জেনেছিলেন, ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান এবং ঈশ্বরকে না জানার নামই অজ্ঞান।

গৃহস্থ ভক্তদের শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই ঐ প্রশ্নটি করতেন স্ত্রী বিদ্যাশক্তি অথবা অবিদ্যাশক্তি। ঐ প্রশ্নের দ্বারা জেনে নিতেন ভক্তটির অধ্যাত্ম-জীবনের উন্নতির সম্ভাবনা কতদূর। কারণ বিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে বিদ্যারূপিণী স্ত্রীর সাহায্য ব্যতীত আধ্যাত্মিক রাজ্যে অগ্রসর হওয়া কঠিন। আমরা জানি, নারীমাত্রেই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আনন্দময়ী জগদম্বার প্রতীক। আবার কথামৃতের কোন কোন স্থলে নারীজাতি সম্বন্ধে তাঁর কঠোর উক্তিগুলি মর্মবিদ্ধ করে। প্রকৃত-পক্ষে নারীর মধ্যে বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয় শক্তির প্রকাশ। তাই যুবক ভক্তগণকে তিনি সর্বদা নারীজাতি থেকে দূরে থাকতে বলতেন যাতে কোন অবিদ্যাশক্তির প্রভাবে তারা জীবনের পরম উদ্দেশ্য থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়। কিন্তু নিম্নোক্ত ঘটনাটি থেকে নারীজাতি সম্বন্ধে তাঁর প্রকৃত মনোভাব বোঝা যায়। প্রথম জীবনে হরিনাথ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন না। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সামনে বলেই ফেললেন, 'উঃ, আমি তাদের হাওয়া সহ্য করতে পারি না।' শ্রীরামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তিরস্কার করে বললেন, 'তুই বোকার মত কথা বলছিস। নারী-মূর্তিদের অবজ্ঞার চোখে দেখার কারণ কি, তারা জগন্মাতার মানবী মূর্তি। তাদের মায়ের মত দেখবি ও শ্রদ্ধা করবি।' সর্বভূতে নারায়ণ থাকলেও যেমন বাঘ-নারায়ণকে আলিঙ্গন করলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তেমন নারীমাত্রেই মহাশক্তির প্রকাশ হলেও তার অবিদ্যাশক্তির প্রভাবে বিনাশ নিশ্চিত।

অতীতভারতে যে সকল মহীয়সী নারীর আবির্ভাব ঘটেছিল, তাঁরা সকলেই ছিলেন বিদ্যাশক্তির মূর্ত প্রকাশ এবং ভারতীয় নারীর নিকট বহুদিন ধরে তাঁরাই ছিলেন আদর্শ। বর্তমানে আদর্শের রূপ পরিবর্তিত। নারী আর অন্তঃপুরচারিণী নয়। সুতরাং বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য অন্তঃপুরে অবস্থিত নারীর নিকট সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি যে চরিত্রগুলি আদর্শরূপে প্রেরণা জাগাত তাঁদের অনুধাবন ও অনুসরণ বর্তমানে প্রকৃতই কঠিন। সমুদ্রপারের মোহময় সভ্যতার প্রবল তরঙ্গ ভারতের সমাজ ও পারিবারিক জীবনে আঘাতের পর আঘাত হানছে। যুগ-আদর্শ উপেক্ষা করে চলা কি সম্ভব অথবা সঙ্গত! সুতরাং পুরাতনপন্থীরা হায় হায় করছেন—সব গেল। প্রগতিপন্থীরা অবজ্ঞাভরে ভাবছেন, কেবল ভারতীয় ভাবটুকু আঁকড়ে ধরে থাকার প্রচেষ্টা কী নির্বুদ্ধিতার পরিচয়! জগতের সঙ্গে পা ফেলে চলতে হবে না? জগতের সমস্ত নারীর গতি বা লক্ষ্য এক-দিকে—সামনে এগিয়ে চলা—আর কেবল ভারতের নারীই অতীতের জয়ঢাক পিটে পেছনে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকবে! তাতে কোন

সিদ্ধিলাভ। সমাজ ও পারিবারিক জীবনে আজ যথার্থ সঙ্কটকাল। দুই আদর্শের প্রবল সংঘাত। এই সংঘাতে কে জয়ী হবে মহাকালই তা নির্ণয় করবে। তবে প্রশ্ন জাগে প্রাচীন ও নবীন দুই-এর সমন্বয় কী সম্ভব নয়? পাশ্চাত্য সভ্যতার যে ভাবগুলি বিদ্যাশক্তির উদ্বোধনে সহায়ক তার সঙ্গে অতীতের আদর্শচরিত্রের অনুশীলন কি একেবারে অসম্ভব?

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে। অবিদ্যারূপিণী নারীমাত্রেই পুরুষের কামনার উদ্রেক করে, তার ভোগের বস্তুমাত্র। বিদ্যা-রূপিণী নারী পুরুষের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্রী। বর্তমানে সাহিত্যে, কাব্যে, সিনেমায়, বিজ্ঞাপনে সর্বত্র অবিদ্যারূপিণী শক্তির মহিমা বিঘোষিত। ফলে অপরিণতবুদ্ধি বালক থেকে আরম্ভ করে সকলের কাছে নারীর একটি রূপই প্রকট হয়ে উঠছে—সে কেবল ভোগের বস্তু। সহধর্মিণী সহকর্মিণী হোক কিন্তু তার মর্যাদা যেন অটুট থাকে। স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি মনে পড়ছে, 'যে মহামায়ার রূপরসাত্মক বাহ্যবিকাশ মানুষকে উন্মাদ করে রেখেছে, তাঁরই জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যাদি আন্তর বিকাশ আবার মানুষকে সর্বজ্ঞ, সিদ্ধসংকল্প, ব্রহ্মজ্ঞ করে দেয়।' শক্তিরূপা মহামায়ার জীবন্ত বিগ্রহ নারী কি কেবল পুরুষের ভোগের বস্তুতে পর্যবসিত হবে, অথবা বহির্বিকাশের পরিবর্তে আন্তর বিকাশের অনুশীলন দ্বারা সমাজ ও পারিবারিক জীবনে যথার্থ মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হবে, একথা চিন্তার বিষয়।

ভগিনী নিবেদিতার একটি বক্তৃতার কথা মনে পড়ছে। তিনি বলতেন, স্বামীজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ভারতের ভবিষ্যৎ ভারতের পুরুষ অপেক্ষা নারীর উপর অধিক নির্ভর করছে। অকুণ্ঠিত চিত্তে তিনি বলেছিলেন, 'সকল দেশেই জাতি তার পবিত্রতা ও শক্তি এই দুই সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব নারীর উপর ন্যস্ত করে এসেছে, পুরুষের উপর নয়। মুষ্টিমেয় পুরুষ হয়তো কোথাও কোথাও আচার্যরূপে পরিগণিত হয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশকেই জীবিকা অর্জনের জন্য পরিশ্রম করতে হয়েছে। গৃহেই তাঁরা অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন; তাঁদের শ্রদ্ধা, অন্তর্দৃষ্টি এবং মহত্ত্বের উৎস যে গৃহ-পরিবেশ তা নারীর তপস্যার মধ্যেই নিহিত।...... অসংখ্য নারী তপস্বিনীর মত নীরব, শান্ত জীবন অতিবাহিত করে গিয়েছেন। বিশ্বস্ত থাকাই ছিল তাদের গৌরব, পূর্ণতা লাভ করাই ছিল তাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ঐ সকল নারীর দ্বারাই ধর্মের সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধি ঘটেছে, বহির্জগতে সংগ্রামের দ্বারা নয়।'

বর্তমানে সারা দেশ জুড়ে চলেছে আদর্শের প্রবল সংঘাত। পুরাতন প্রথাগুলির সঙ্গে চিরন্তন আদর্শগুলি বিসর্জন দেওয়া সঙ্গত হবে কি না, তা বিশেষভাবে বিচার্য। এ কথা ঠিক যে উগ্র কামনা বা বাসনা মানুষকে আনন্দ ও শান্তির পথে প্রবর্তিত করে না। তাই এত প্রগতি সত্ত্বেও চারিদিকে নৈরাশ্য, ক্ষোভ, হাহাকার। সমাজের সর্বস্তরে বিদ্যারূপিণী শক্তির প্রকাশ ব্যতীত যথার্থ কল্যাণ অসম্ভব। স্বাধীন ভারতে নারীর ভূমিকা কী? তা নির্ভর করছে অন্তরের কোন শক্তিকে সে উদ্বুদ্ধ করবে তার উপর। আশার কথা, নবযুগের প্রারম্ভে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পূর্ণযৌবনা পত্নীকে মহাশক্তিরূপে পূজা করেছিলেন, আবাহন করেছিলেন বিদ্যাশক্তিকে ভারতের তথা জগতের কল্যাণের জন্য। সমগ্র নারী-জাতির মধ্যে সেই শক্তির স্ফুরণ হোক, এই প্রার্থনা।

চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

—চিৎশক্তিরূপে যিনি চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত করে অবস্থান করছেন তাঁকে বারবার নমস্কার করি।

স্বামী বিবেকানন্দের বিজ্ঞানচেতনা

ডক্টর শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

উনবিংশ শতাব্দীর অস্থিরচিত্ত বাংলাদেশে তথা ভারতভূমিতে কয়েকজন মনীষী দিব্যদৃষ্টি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাঁরা তাঁদের দিব্য-চেতনার সার্চলাইট দিয়ে মোহাচ্ছন্ন জাতির জড়তার আঁধার নাশ করেছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর থেকেই বাংলাদেশে আসে নব-জাগরণের প্রবল জোয়ার। একথা অনস্বীকার্য যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের জাহ্নবী-ধারায় অবগাহন করে জাতীয়তাবাদের নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল নবারুণে আলোকিত তরুণ বঙ্গ-সন্তানের দল। চপলতা-উচ্ছলতার (বা অনেকের মতে উচ্ছৃঙ্খলতার) মদিরা-পানে মধু-যুগীয় ইয়ং বেঙ্গলের আরক্ত চোখ স্বাজাত্য-বোধের নব অনুভূতিতে স্নিগ্ধ হয়ে এল। বাংলাদেশের শিক্ষিত মানুষের প্রাণে নতুনতর চৈতন্যের সঞ্চার হল।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগেই ভারত হয়ে পড়েছিল জরাগ্রস্ত, দুর্বল, পঙ্গু ও শক্তিবিহীন। চরম বিপর্যয় বা মৃত্যু অথবা পুনরুত্থান ও জীবন—এর যে কোন একটির জন্য সে ছিল অপেক্ষমাণ। এই আসন্ন বিপদের ক্ষণে তার আধ্যাত্মিক শক্তি হল প্রকাশিত এবং উনবিংশ শতকের উষাকালে সে পেল এক নতুন জীবনধারা। যুগের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল ভারত, আর তার মুখোমুখি হতে সচেষ্ট হল সৃজনমূলক ও গঠনমূলক পন্থায়। এই পুনর্নবের কাজে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন রাজা রামমোহন রায় তাঁর দূরদৃষ্টি ও প্রবল ব্যক্তিত্ব দিয়ে। তিনি তাঁর দেশ-বাসীকে জাগরিত করেছিলেন, দেশের সুপ্রাচীন সংস্কৃতিকে তিনি করতে চেয়েছিলেন মলিনতা-বিমুক্ত ও সুদৃঢ়।

রামমোহন থেকে যে জাগরণী গানের সূচনা, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা-মৃতে ফুটে উঠলো তারই এক রক্তকমল। বিবেকানন্দের দৃষ্টির অনুরাগে সিঞ্চিত হয়ে শতদলে তা আত্মপ্রকাশ করলো। পরাধীনতার এবং সহজ বিলাসের আবর্তে মজ্জমান উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মানুষের নির্জীব বিবেকের ঝুঁটি নেড়ে তাদের অস্তমিত চৈতন্যের ম্লানিমা দূর করে তাকে পুনর্জাগরিত করতে চেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

একটা প্রকাণ্ড দেশের স্তিমিত বীর্যকে তিনি বিশাল কর্ম দিয়ে, প্রবল বাক্যের কশাঘাত দিয়ে সজীব করে তুলেছিলেন। কেবল তাই নয়, অধীনতার তমিস্রায় সুপ্তি-মগ্ন জাতিকে তিনি বিশ্বের দরবারে সকলের দৃষ্টির সামনে তুলে ধরেছিলেন। গৈরিক বসনে রঞ্জিত আবরণের আড়ালে যে মানুষটিকে একদিন শিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলনে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করে জগৎ মাতিয়ে দিতে দেখা গিয়েছিল তিনি দার্শনিক ও মানবদরদী তো বটেনই, উপরন্তু তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন আধুনিক। তিনি কেবলমাত্র অধ্যাত্মজগতের বাসিন্দা ছিলেন না, তৎকালীন অন্যান্য সন্ন্যাসীর মতো তিনি বিজ্ঞানের *বিরোধিতা তো করেনই নি, বরং তিনি ছিলেন পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক মেজাজের। এক দুর্লভ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী ছিলেন বলেই তিনি অধ্যাত্মজগতের নানা তত্ত্ব কুসংস্কারের জটাজাল

থেকে বিমুক্ত করে সর্বজনগ্রাহ্য করে তুলতে পেরেছিলেন।

ছেলেবেলার ছোট ছোট ঘটনা থেকে অনুভব করা যায়, তিনি ছিলেন সত্যানুসন্ধানী। বিজ্ঞানীর কর্তব্য ঐ একই। যুক্তিতর্ক দিয়ে সত্যের অনুসন্ধান করা বিজ্ঞানীর একান্ত কর্তব্য। তার জন্য প্রয়োজন পরিশীলিত মনের। স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যের, কৈশোরের, প্রথম যৌবনের অনুশীলন-স্পৃহা, অধ্যয়ন ও অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তি পরবর্তী অধ্যায়ে প্রগাঢ় মননশীলতায় পরিপূর্ণ এক মহৎ জীবনের সুনিপুণ প্রস্তুতি।

স্বামী বিবেকানন্দ সত্যের অনুসন্ধান করেছেন, যাচাই করেছেন যুক্তির কষ্টিপাথরে, অবশেষে তাকে গ্রহণ করেছেন অথবা পরিত্যাগ করেছেন। তাঁর প্রকৃতি যেন সত্যানুসন্ধানের জন্যেই উন্মুখ। বিবেকানন্দ প্রথাগতভাবে বিজ্ঞানী নন, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পাঠ করে ডিগ্রী লাভ করেন নি, তথাপি তিনি বিজ্ঞানীর ধর্মযুক্ত। কুসংস্কারের দাসত্ব থেকে মুক্ত, যুক্তিতে আস্থাশীল স্বামী বিবেকানন্দ বৈজ্ঞানিক মেজাজের অধিকারী। বিজ্ঞানীদের কাছে এইটেই মুখ্য ধর্ম।

বিগত ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশনে সভাপতির ভাষণে সার মাইকেল ফষ্টার প্রশ্ন তুলেছিলেন বিজ্ঞানীর কি কি গুণ থাকা অত্যাবশ্যক। এই মৌল বিষয়ের উত্তরপ্রসঙ্গে বহু তর্কবিতর্কের পর সিদ্ধান্ত হয়, বৈজ্ঞানিক মেজাজের প্রকৃতি প্রধানতঃ তিন প্রকারের। সেগুলি সংক্ষেপে হল[১]—

এক: বিজ্ঞানীর প্রকৃতি এমন হবে যে, যে বিষয় নিয়ে তিনি অনুসন্ধান করছেন সেই বিষয় সম্পর্কে তিনি হবেন অনন্যমনা। যিনি সত্যের সন্ধানী তিনি নিজে সত্যবাদী হবেন। প্রকৃতির সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে একাত্ম হবেন। একাজ খুব বেশী জরুরী, তথাকথিত সত্যবাদিতার চেয়ে একাজ বেশী যথাযথ।

দুই: বিজ্ঞানীর মন হবে অতি সচেতন। প্রকৃতি সর্বদাই আমাদের নানা ইঙ্গিত দিচ্ছে। সে নিয়ত প্রায় অশ্রুত কণ্ঠে বলে চলেছে তার রহস্যের গোড়াকার কথা। বিজ্ঞানীকে এই বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকতে হয়। প্রকৃতির ইঙ্গিত বিজ্ঞানীকে মুহূর্তের মধ্যে ধরতে হবে, তা সে ইঙ্গিত যত সামান্য হোক না কেন; তার ফিসফিসানি যত মৃদু পর্যায়ের হোক না কেন তাকে শুনতে হবে।

তিন: বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও সাহস। বৈজ্ঞানিক মেজাজের অধিকারীদের সত্যকে জানবার উদগ্র বাসনা থাকে। এই প্রবৃত্তিকে সার মাইকেল ফষ্টারের নির্দেশিত সত্যবাদিতার (truthfulness) সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই বাসনা বা প্রবৃত্তি হল পর্যবেক্ষণের নিপুণতা এবং বাহুল্যবর্জিত মূল বক্তব্যকে যথাযথভাবে প্রকাশ করবার অধিকার অর্জন করা। সাধারণ মানুষ বা বৈজ্ঞানিক-মনোবৃত্তি-রহিত মানুষ যে কোন বিষয়ের সম্পর্কে 'প্রায়' বা 'কাছাকাছি' সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হন। কিন্তু প্রকৃতির স্বভাব তা নয়। আপাত-সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া প্রকৃতির ধর্মবিরুদ্ধ। বৈজ্ঞানিক মেজাজের মানুষের কাছেও এইটেই সত্য। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে এ জাতীয় ঘটনার বহু পরিচয় আছে।

বৈজ্ঞানিক মেজাজের অধিকারীদের যেমন থাকে সত্য অনুসন্ধানের প্রবল স্পৃহা, তেমনি থাকে সতর্কতা। যা যুক্তি বা প্রমাণ দিয়ে

---

১ Report, Brit. Association for the Advancement of science, 1899 [লেখক কর্তৃক সারানুবাদ]

বিচার করা সম্ভব নয়, যে সিদ্ধান্তে দ্বিধা উপস্থিত হতে পারে, সন্দেহ হতে পারে, তাকে পরিত্যাগ করতে হবে অথবা আরো যাচাই করে দেখতে হবে।

বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক মন সম্পর্কে অধ্যাপক কার্ল পিয়ারসনের বক্তব্য এ স্থলে প্রাসঙ্গিক ও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন[২]—

'The scientific man has above all things to strive at self-elimination in his judgments, to prove an argument which is as true for each individual mind as for his own. The classification of facts, the recognition of their own sequence and relative significance, is the function of science, and the habit of forming a judgment upon these facts, unbiassed by personal feeling, is characteristic of what may be termed the scientific frame of mind.'

এই আলোকে বিচার করতে হবে স্বামী বিবেকানন্দকে। বিজ্ঞানী পড়েন, শোনেন, অথচ যা পড়েছেন বা শুনেছেন তাকেই অভ্রান্ত বলে স্বীকার করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত গবেষণাগারে তার প্রমাণ না পাচ্ছেন। স্বামী বিবেকানন্দ স্বীয় প্রজ্ঞার আলোকে যাচাই করে নিতেন প্রতিটি তত্ত্ব। তিনি ছিলেন এক ধর্মসংঘের মধ্যমণি, কিন্তু সমস্ত প্রচলিত শাস্ত্রমতকে অন্ধের মত আঁকড়ে থাকেন নি; অবৈজ্ঞানিক মনে হলে তাকে নিরাসক্ত চিত্তে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছেন নির্দ্বিধায়।

স্বামী বিবেকানন্দ স্বতই বৈজ্ঞানিক মেজাজের অধিকারী ছিলেন। তথাপি একথাও সত্য যে বিজ্ঞান তাঁকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে। এর প্রমাণ তাঁর রচনাসমূহের অসংখ্য স্থানে ছড়িয়ে আছে। তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনি প্রাচীন ভারতীয় ঋষি-বিজ্ঞানীদের গবেষণাকে যেমনি পুনরুজ্জীবিত করে প্রাধান্য দিয়েছেন, তেমনি তাঁর জীবিতাবস্থায় বিজ্ঞানের সর্ববিভাগের অগ্রগতিকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। তিনি চেয়েছেন সমন্বয় সাধন করতে। এ প্রয়াস তাঁর রচনার বহুস্থানে পরিলক্ষিত হয়। এর চেয়েও একটা বড় কথা আছে। বিজ্ঞানীর মৌলিক চিন্তাশক্তি থাকে। পাশ্চাত্যখণ্ডে বহু দিগ্বিজয়ী বিজ্ঞানীর নাম করা যায় যাঁরা প্রথাগতভাবে বিজ্ঞানের ডিগ্রী না নিয়েও বিজ্ঞানের রাজ্যে স্থায়ী কীর্তি রেখে গেছেন। তার কারণ তাঁদের মৌলিক চিন্তাশক্তি। বিবেকানন্দ সেই পরমধনের অধিকারী ছিলেন। তা না হলে বিশ্বের বিখ্যাত তড়িৎ-বিজ্ঞানীদের সমাবেশে স্বামীজীর ঐ বিষয়ে আলোচনা শুনে বিজ্ঞানীরা আশ্চর্যান্বিত কেন!

ক্রমবিকাশতত্ত্ব ও ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বে তিনি যুগান্তকারী ধারণার কথা প্রকাশ করে গেছেন, সেই কথার পুনরাবৃত্তি শোনা গেল ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের ডারউইনের 'অরিজিন অব দি স্পেসিস' গ্রন্থের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে শিকাগোতে বৈজ্ঞানিকদের সম্মেলনে। স্বামীজী বলেছিলেন 'উদ্বর্তনের' সঙ্গে জড়িত 'অনুবর্তন'। তিনি বৃত্তাকারে বিবর্তনের কথা বলেছেন। ডারউইনের 'struggle for existence and survival of the fittest' কথাকে প্রতিবাদ করে বলেছেন যে এই তত্ত্ব মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে চললেও মানবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ডারউইনের 'Descent of Man'-কে সমালোচনা করে বলেছিলেন এ হওয়া উচিত 'Ascent of Man', যেহেতু বিবর্তন-প্রক্রিয়ায় মানুষ অনেক উঁচু ধাপে উঠে এসেছে।

২ Pearson, karl—The Grammar of Science, 2nd Edn. (1900)

স্বামীজীর এসব বক্তব্যের সমর্থন মিললো সার্ডিন, জুলিয়ান হাক্সলি প্রভৃতি বিজ্ঞানীর গবেষণায়।

বিজ্ঞানীপ্রবর সার জুলিয়ান হাক্সলি বলেছেন৩—

'......There is, finally, Darwin's failure to recognise explicitly the radical differences between man and animals, especially between the process of evolution in man and in other animals......'

এই জায়গাতেই তিনি বলেছেন, " 'The Ascent of Man' would in fact have been more appropriate.' "

বিখ্যাত বিজ্ঞানী পিয়ের টেলহার্ড দ্য সার্ডিন (অধুনা লোকান্তরিত) তাঁর সুবিখ্যাত গবেষণাগ্রন্থ 'The Phenomenon of Man' গ্রন্থে 'অনুবর্তন' ও 'উদ্বর্তন' স্বীকার করেছেন কি ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির বেলাতে, কি প্রাণিজগতের বিবর্তন-প্রক্রিয়ায়।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন মানুষের ক্ষেত্রে শুধু দৈহিক বিবর্তন হয়নি, মনেরও উদ্বর্তন হয়েছে। বরং তিনি মানসিক উদ্বর্তনের কথা সজোরে বলেছেন। সার জুলিয়ান হাক্সলি ১৯৫৯ শিকাগোতে 'The Evolutionary Vision' বক্তৃতায় যা বলেছেন তার সঙ্গে স্বামীজীর দীর্ঘদিন আগেকার বক্তব্যের আশ্চর্য সমর্থন মেলে। হাক্সলির নিজস্ব কথায়৪—

'Man's evolution is not biological but psychological ; it operates by the mechanism of cultural tradition, which involves the cumulative self-reproduction and self-variation of mental activities, and their products. Accordingly, major steps in the human phase of evolution are achieved by break-through to new dominant patterns of mental organization of knowledge, ideas, and beliefs—ideological instead of physiological or biological organization.'

ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের একটা বিরোধ আছে, একথা দীর্ঘকাল ধরে প্রচারিত হয়ে প্রায় জনশ্রুতিতে দাঁড়িয়ে গেছে। অথচ সত্যিই তেমন কোন বিবাদ নেই—এই বিস্ময়কর বার্তা আমাদের কাছে পৌছে দেন তিনিই। একটি ধর্মসংঘের মধ্যমণি হয়েও কেবলমাত্র ধর্ম অনুশীলনের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠ সরব হয়েছে তা জেনে বিস্মিত হতে হয়। বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'সায়েন্স ইজ নাথিং বাট দি ফাইণ্ডিং অব ইউনিটি' অর্থাৎ 'একত্বের আবিষ্কার ব্যতীত বিজ্ঞান আর কিছুই নয়।' একথা অতীব সত্য যে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য মূল বস্তু অর্থাৎ সেই একত্বকে অন্বেষণ করা। বিজ্ঞান যখন সেই লক্ষ্যে পৌছাবে তখন তার অগ্রগতির চাকাও স্তব্ধ হয়ে যাবে। ধর্মের বিজ্ঞানও তাই বলে। স্বামীজী বলেন, মানুষ যখন ভগবান বা 'একক' সত্তার আবিষ্কারে সক্ষম হবে তখনই সাধনার শেষ।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রতীচ্যের বিজ্ঞান-সাধনার পীঠস্থানসমূহে যে রাজোচিত সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন তার অন্যতম প্রধান কারণ বোধহয় এই যে তিনি ধর্মকে কুসংস্কারের নাগপাশ দিয়ে আঁকড়ে রাখেন নি। বিচার করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন, অধ্যাত্ম-জগতের নানা ধ্যানধারণাকে বিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে অকাট্য বলে উপস্থাপিত করেছেন, যুগোপযোগী করে তুলেছেন হিন্দুধর্মের মূল বক্তব্যকে।

৩ Sir Julian Huxley : The Emergence of Darwinism [Evolution After Darwin, Vol. I, P. 15-17] Ed : Sol. Tax.

৪ Evolution After Darwin, Vol. III, P. 252

বিজ্ঞানের মোহনাশরূপী অসির সাহায্যে ছিন্ন ভিন্ন করেছেন ধর্মের নানা কুসংস্কার। যোগ-সাধনার প্রতিটি অধ্যায়কে বিজ্ঞানের শুভ্র আলোকে বিশ্লেষণ করে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন দেশ ও বিদেশের অগণিত আধুনিক মানুষের কাছে।

স্বামী বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন যে বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান ধর্মে, যেজাজে ও উদ্দেশ্যগত-ভাবে এক। উভয়ই সত্যের অনুশীলন। এমন কি দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্বের বিষয়েও দুয়ের মধ্যে বহু মিল বর্তমান। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে উভয় মতবাদের প্রাথমিক বক্তব্য হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের কথায়: 'আত্মার বিকাশের প্রক্রিয়া'। বেদান্ত এই আত্মাকে বলেছেন 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ বিশ্বের সব কিছুর মূল সত্তা। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ এই ব্রহ্মের যে সগৌরব সংজ্ঞা দিয়েছেন, প্রতিটি বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি তাকে অভিনন্দন জানাবেন—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে
যেন জাতানি জীবন্তি
যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি
তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্মেতি॥ (৩:১)

আধুনিক বিজ্ঞানীদের কাছে এসব হচ্ছে 'বাস্তব সত্য' কিংবা জ্যোতিঃপদার্থবিদ্ ফ্রেড হায়লের কথায় এ হল 'ব্যাকগ্রাউণ্ড মেটিরিয়াল' অথবা সৃজনক্ষম যৌল পদার্থ বা বস্তু। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রাচীন বেদান্তের সঙ্গে এই আধ্যাত্মিক বন্ধনের কথা উল্লেখ করে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে শিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলনে বক্তৃতায় বলেছিলেন[৫]—

'Manifestation, and not creation, is the word of Science to-day, and the Hindu is only glad that what he has been cherishing in his bosom for ages is going to be taught in more forcible language, and with further light, from the latest conclusions of Science.'

যদিও আধুনিক বিজ্ঞানচিন্তায় আধ্যাত্মিক সত্য বা নিয়মের কোন স্থান স্বীকৃত হয়নি, তাহলেও বিংশ শতকের অনেক বিজ্ঞানী, যেমন সার্ডিন, জুলিয়ান হাক্সলি, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জড়বাদকে শিথিল করতে সচেষ্ট হয়েছেন এবং বিজ্ঞানচিন্তার জগতে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা স্থান পেয়েছে। এমনকি বিগত শতকেও ডারউইনের সহযোগী টমাস হাক্সলি বিজ্ঞানের যে কোন নির্দিষ্ট মতবাদ বা গোঁড়ামির (যেমন জড়বাদ) প্রতিবাদ করেছেন এবং জড়বাদকে বলেছেন 'অনাহুত' (Methods and Results, Vol. I, P. 161)। বর্তমান শতকে জড়বাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানীদের তরফ থেকেই এসেছে।

সার জেমস্ জীনস্ উপলব্ধি করেছিলেন, বিংশ শতকের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বিশ্বের যে সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যাচ্ছে তাতে 'বস্তু' একেবারেই লোপ পেয়েছে, 'একক ও সর্বময় কর্তৃত্ব মনের' (The New Background of Science, P. 307)। জ্যোতিঃপদার্থবিদ আর.এ. মিলিকান জড়বাদকে 'বুদ্ধিহীনতার দর্শন' মনে করতেন (An Autobiography, Last chapter)।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে 'ব্রহ্ম ও জগৎ' বিষয়ে বক্তৃতা দেবার সময়ে স্বামীজী বলেছেন[৬]—

'বিজ্ঞানের গতি কোন্ দিকে, তা কি আপনারা বুঝতে পারছেন না? হিন্দুজাতি মেটাফিজিকস্, যুক্তিবাদ এবং মনোবিজ্ঞানের

[৫] The Complete Works, Vol. I, P. 15, 11th edn.

[৬] কমপ্লিট ওয়ার্কস্, ২য় খণ্ড, পৃ ১৩০ (অনূদিত)।

অনুশীলনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। ইয়োরোপের জাতিসমূহ বহিঃপ্রকৃতি থেকে যাত্রা স্থরু করেছিলেন এবং এখন তাঁরাও একই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মনোবিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে আমরা সেই একক সত্তায়, সেই বিশ্বসত্তায়, প্রতিটি পদার্থের অন্তরাত্মায়, সমস্ত বস্তুর সার ও সত্যে পৌঁছাতে পারি। জড় বিজ্ঞানের সাহায্যেও আমরা সেই একক তত্ত্বে হাজির হতে পারি।'

আধুনিক সভ্যতা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে অধিকতর মর্যাদা দিয়েছে, ঠিক যেমনি প্রাচীন সভ্যতা তাকে যোগ্য মর্যাদা দেয় নি। আজ বিজ্ঞানকে তার নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে – অর্থাৎ মানবের সামগ্রিক জ্ঞান ও কল্যাণসাধনের পরিপ্রেক্ষিতে। বর্তমান চিন্তাধারা অনুসারে স্বামী বিবেকানন্দের এইটেই বড় অবদান।

বিজ্ঞানচর্চার দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রখর। ভারতবাসীর কেরানীগিরি বা ডেপুটিগিরি করবার ঝোঁক প্রবল দেখে তিনি তিরস্কার করে বলেছিলেন, 'একবার চোখ খুলে দেখ, স্বর্ণপ্রসূ ভারতভুমিতে অন্নের জন্য কি হাহাকারটা উঠেছে, তোদের ঐ শিক্ষায় সে অভাব পূর্ণ হবে কি?—কখনও নয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা। অন্নের সংস্থান কর—চাকুরী-গুখুরী করে নয়—নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার কর।'

দেশের লোকের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে তিনি তার সমাধানের জন্য যে পথের হদিশ দিয়েছেন তা শুধু ধর্মীয় নয়। তাঁর কথার গুরুত্ব ভারতের নেতারা উপলব্ধি করেছেন স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর। তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের চাই কি জানিস—স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী আর সায়েন্স পড়ান, চাই শিল্পশিক্ষা বা টেকনিক্যাল এডুকেশন, চাই যাতে ইণ্ডাষ্ট্রি বাড়ে, লোকে চাকরি না করে দু'পয়সা করে খেতে পারে।'

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট লিখিত এক পত্রে পূজ্যপাদ শশী মহারাজকে উদ্দেশ করে তিনি লিখেছেন, 'শশী, তোকে একটা নূতন মতলব দিচ্ছি। যদি কার্যে পরিণত করতে পারিস, তবে জানব তোরা মরদ, আর কাজে আসবি। গোটা কতক ক্যামেরা, কতগুলো ম্যাপ, গ্লোব, কিছু কেমিক্যালস্ ইত্যাদি চাই। তারপর একটা মস্ত কুঁড়ে (ঘর) চাই। তারপর কতকগুলো গরীব-গুরবো জুটিয়ে আনা চাই। তারপর তাদের অ্যাষ্ট্রনমি, জিওগ্রাফী প্রভৃতির ছবি দেখাও আর রামকৃষ্ণ পরমহংস উপদেশ কর। কোন্ দেশে কি হয়, কি হচ্ছে, এ দুনিয়াটা কি, তাদের যাতে চোখ খুলে, তাই চেষ্টা কর।'

ভাবতে আশ্চর্য লাগে সত্তর বছর আগে বিবেকানন্দ যা চেয়েছিলেন এখন এই বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ক'টি মানুষ এরকমভাবে চিন্তা করেন? ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন তারিখে আলমোড়া থেকে তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে অনুরূপ আর একখানি চিঠি দেন তাতে স্বামীজীর বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ আরও প্রকটিত হয়: 'এক সেট পদার্থবিদ্যা আর রসায়নের সাধারণ যন্ত্র ও একটা টেলিস্কোপ ও একটা মাইক্রসকোপ ১৫০।২০০ টাকার মধ্যে সব হবে, শশীবাবু সপ্তাহে একদিন এসে কেমেষ্ট্রি প্রাকটিক্যাল-এর উপর লেকচার দিতে পারেন ও হরিপ্রসন্ন ফিজিকস্ ইত্যাদির উপর। আর বাংলা ভাষায় যে সকল উত্তম সায়েন্টিফিক পুস্তক আছে তা সব কিনবে ও পাঠ করাবে।'

জীবনের সর্বক্ষণ তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে

সবকিছুকে বিচার করেছেন। তাই 'আত্মা', 'প্রাণ' প্রভৃতি কথার বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেখতে পাওয়া যায় তাঁর গ্রন্থে। পদার্থবিজ্ঞান এবং রাজযোগের মধ্যে সংযোগ কল্পনা করাই যেত না। স্বামীজী বললেন, 'পদার্থবিজ্ঞান'ও বহিরুপায়ে প্রাণায়াম। 'যে প্রাণায়ামে প্রাণের স্থূলরূপগুলিকে বাহ্য উপায়ের দ্বারা জয় করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহাকে পদার্থবিজ্ঞান বলে। আর যে প্রাণায়ামে প্রাণের আধ্যাত্মিক বিকাশগুলিকে আধ্যাত্মিক উপায়ের দ্বারা সংযমের চেষ্টা করা হয়, তাহাকেই রাজযোগ বলে।'

ধ্যানমার্গে যাঁরা অগ্রসর হয়েছেন তারা অনেকেই অতীন্দ্রিয়জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবী করেন। একথা সত্য অনেকে জ্ঞানাতীত অবস্থায় এসে পড়েন। অনেকে হঠাৎ এই জ্ঞান লাভ করে তাকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। ফলে সেই জ্ঞানের সঙ্গে মিশে থাকে নানা কুসংস্কার। এতএব প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অধ্যয়নের। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন, 'যে সব ব্যক্তি হঠাৎ এই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করিয়াছেন অথচ ইহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বুঝেন নাই, তাঁহারা যতবড়ই হউন না কেন, তাঁহারা সাধারণতঃ অন্ধকারে হাতড়াইয়াছেন এবং তাঁহাদের সেই জ্ঞানের সহিত কিছু না কিছু কিম্ভূতকিমাকার কুসংস্কার মিশ্রিত আছেই আছে। তাঁহারা অনেক আজগুবি খেয়াল দেখিয়াছেন ও উহার প্রশ্রয় দিয়া গিয়াছেন।'

কোন্ পথে অগ্রসর হলে এই জ্ঞানাতীত ভূমিতে বিচরণ করা যায় তার সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তা তাঁর বৈজ্ঞানিক মননশীলতারই পরিচয় বহন করে। তিনি বলেছেন, নিয়মিত সাধনার সাহায্যে ঠিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেখানে পৌছাতে হবে। আর সমস্ত কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলতে হবে। 'অন্য কোন বিজ্ঞান-শিক্ষার সময় আমরা যেরূপ করিয়া থাকি, ইহাতেও ঠিক সেই ধারার অনুসরণ এবং যুক্তিবিচারকেই আমাদের ভিত্তিস্বরূপ করিতে হইবে। অতএব যখন কেহ নিজেকে প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া দাবি করে অথচ যুক্তিবিরুদ্ধ যা-তা বলিতে থাকে, তাহার কথা শুনিও না।'

'প্রাণের আধ্যাত্মিক রূপ' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি যেভাবে নরদেহতত্ত্ব, পদার্থ-বিদ্যা ও শারীর বিধান শাস্ত্রের বিবিধ অংশকে প্রয়োগ করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন, তা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক মেজাজের ব্যক্তির পক্ষে, বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সম্ভব। বিবেকানন্দ বৈজ্ঞানিক ছিলেন না কিন্তু বৈজ্ঞানিক মেজাজ তাঁর ছিল। তাই তাঁর রচনাবলী বিজ্ঞানের উপমায় সমাকীর্ণ।

স্বামী বিবেকানন্দ নিজেকে যুগের রেঁনেসীয় প্রবাহ থেকে সরিয়ে তো নেন-ই নি, বরং কয়েক শতক অতিক্রম করে গেছেন অনায়াসে। বিংশ শতকের উষাকালে যিনি দেহরক্ষা করেছেন, তিনি মনোজগতে বহুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর সুদূরপ্রসারতার মূলে রয়েছে চিন্তার স্বচ্ছতা, কুসংস্কারবিমুক্ত মন এবং বৈজ্ঞানিক মেজাজ। তাঁর সমগ্র জীবন, তাঁর বিচিত্র কর্মধারা, তার জীবনদর্শনের ব্যাখ্যা বিশ্বে যে চিরবন্দিত হয়ে আছে, তারও মূলে বৈজ্ঞানিক ছন্দোবদ্ধতা। এ কারণেই তিনি আজও সমগ্র বিশ্বে বরণীয়, বন্দনীয় ও চিরস্মরণীয়।

প্রার্থনা

বনফুল

অকূল নদীর তীরে ব'সে আমি যখন কাঁদি
তুমি তখন এসে আমায় তরাও ?
সব হারিয়ে ক্ষুণ্ণ-মনে যখন ব'সে থাকি
তুমিই এসে সে শূন্যকে ভরাও ?

ওগো তুমি কোথায় আছ বুঝতে পারি না যে
প্রশ্ন জাগে--তোমার সুরই মনের বীণায় বাজে ?
যাহার স্বর-লিপি আঁকা সারা গগন মাঝে
সূর্য-চন্দ্র-তারায় ভরা অনন্তেরি পাতে
পুষ্পবনে বর্ণ-বীথিকাতে ?
স্নেহে প্রেমে বীর্যে ত্যাগে তুমিই আছ না কি ?
ইন্দ্রধনু-রাখী
তুমিই এসে পরাও না কি মহাকাশের হাতে ?
স্পর্শ তোমার জ্যোৎস্নালোকে ? মূর্ত তুমি অগ্নিশিখাটাতে ?
শিশুর সরল হাসিটিতে তুমিই কি গো অমন মধু ঝরাও ?
তুমিই কি গো সব শূন্য ভরাও ?

বিশ্ব জুড়ে হয়তো আছ তুমিই প্রেমময়
তবু কেন মনে মনে জাগে এ সংশয়
তুমি আছ কি না ?
সমস্ত প্রকাশ-মাঝে তুমি অন্তর্লীনা ?
শুষ্ক তরুর ডালে ডালে ও খেয়ালী কবি
তুমিই কি গো সবুজ পাতা ধরাও ?
তুমিই কি গো সব শূন্য ভরাও ?
এ প্রশ্নের বোঝা নিয়ে পথ চলা যায় কভু ?
সংশয়ের কাঁটাটাকে দাও না তুলে প্রভু।

স্টেশনের নাম মননপুর

অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

টাইমটেবিলে কোথাও ওর নাম আছে। আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না। দিল্লী থেকে কোলকাতায় ফিরছি। পূজোর ছুটি শেষ হয়ে এলো। কার্তিকের শেষ বেলায় তখনো শরতের সোনা কাশের স্তবকে মাখানো থাকে। আর মাঠের চারদিকে সবুজের পর সবুজ। সময়হরণ এক শারদীয়া সংখ্যায় মগ্ন ছিলুম, হঠাৎ কখন ট্রেন থেমেছে। ভাবছি নিতান্ত সাময়িক থামা। আশে পাশে ঘরবাড়ী নেই, একদিকে দিগন্ত অবধি বিছানো খেতের সারি, আর একদিকে সবুজ শস্যের তরঙ্গ পেরিয়ে পাশাপাশি তিনটি পাহাড়—তারা বন্ধুর মতো এ ওর গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মনে হ'লেও, আসলে তা দূরের মায়া। তিনটি পাহাড়ের দূরত্ব আছে, নিজেদের মধ্যে। যেমন এই রিজার্ভ কামরায় পুরো চব্বিশঘণ্টা একসঙ্গে কাটাবার পরও আমরা ক্ষণ-অন্তরঙ্গতার গণ্ডি পেরুলেই আবার হাজার যোজন ছড়িয়ে যাবো যে যার নিজের ঘরে। আর এই মুহূর্তে ট্রেনশুদ্ধু যাত্রীদলের নিরুৎসুক চোখের সামনে আর এক গণ্ডগ্রামের ছবি। তারা কেউ দল বেঁধে তাস খেলছে, সস্তা ডিটেক্টিভ উপন্যাসে আঙুল গেঁথে কেউ ঘুমিয়ে আছে বাঙ্কের উপরে, কোন দম্পতির বিছানাপত্র বাঁধাছাঁদার শশব্যস্ততায় আগামী কোন বড়ো স্টেশনের আভাস। আমার চোখে মেঘমৌলি তিন পাহাড়ের গায়ে নীল, ঘননীল, কৃষ্ণনীল—নানা স্তরের উন্মোচন।

আমি তো জানি দুপুরের রোদে পাহাড়েরা ঘন ঘন রঙ বদলায়—শরতের স্তব্ধ দুপুরে সেই রঙবদলের পালা দেখতে দেখতে দেওঘর বিদ্যাপীঠে আমার কতদিনের মানসপঞ্জী গড়ে উঠেছে। এক নিমেষে দূরের ওই অরণ্য-পর্বত আমার আত্মীয় হয়ে গেল। শুধু ওরা স্থির, আমি চঞ্চল, আমায় যেতে হবে, ওদের কোথাও যাওয়ার দায় নেই। আমি কি চিরকাল থেকে যেতে চাই? অথবা চিরকাল চলে যাওয়া আমার সাধনা?

এ পাশের জানালা থেকে ওপাশের জানালায় মুখ ফেরালুম। এমন নিরাভরণ স্টেশন কখনো চোখে পড়ে না। কোন গ্রাম বা শহরের আভাস নেই আশে পাশে। শুধু একপাশে কাঠের পাটাতনে বড় বড় করে স্টেশনের নাম লেখা আছে 'মননপুর'।

মননপুর—নামটি যেন মন্ত্রের মতো চারপাশের সব জনহীন নিস্তব্ধতাকে অজস্র অর্ঘে, ধ্বনিতরঙ্গে এক নিমেষে পরিপূর্ণ করে দিল। আমি তো ভেবেছিলুম, নিতান্ত যান্ত্রিক কারণে অথবা অভ্যাসবশে ট্রেন দাঁড় করানো হয়েছে মাঠের মাঝে। কিন্তু না—এ এক আনুষ্ঠানিক বিরতি। নিতান্ত অনুল্লেখ্য হলেও রীতিমতো স্টেশন। এখানে আমাদের থামতেই হবে।

থামতেই হবে। কারণ, বিশ শতকের এই সপ্তম দশকে আজ জগতের সবাই থামতে ভুলে গেছে। ট্রেন পুরোনো হয়ে এলো, 'জেট'—সেও এমন কিছু নতুন নয়, এযুগে আমাদের ছুটে চলার প্রতীক 'রকেট'। "আশি দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ"—আজ নিতান্ত বিলম্বিত কল্পনা। তিন দিনে সৌরজগৎ পরিক্রমা—সেও ক্রমে অসহ্য হয়ে আসবে। তারপর বিশ্বশুদ্ধ মানুষ একদিন এক বিরাট পুজোর ছুটিতে সীমাহীন

আকাশের অনির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে যাত্রা করবে—আর কখনো ফিরে আসবে না। অথচ যার সন্ধানে সে দিক দিগন্ত পাড়ি দেবে সে তার 'মনের মধ্যে যে মন আছে' সেইখানে নিভৃতে বাসা বেঁধে আছে। কস্তুরীমৃগের দল আমরা—ছুটে না বেড়ালে নিজেকে পাই না।

এখানে আমাদের থামতে হবে। এই মননপুরে। মানুষ-জন নেই বললেই চলে শুধু সবুজ খেতের মাঝে মাঝে একটি দুটি গাছ আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টা করছে। গাছের সংখ্যাও খুব কম। ফলে এই নির্মল নীল শারদ-আকাশের তলায় প্রকাণ্ড ট্রেনের সরীসৃপ-দেহ যেন কিছুক্ষণের জন্য রোদ পোহাচ্ছে মনে হয়। সবুজ খেত, সুনীল পাহাড়, পাহাড়ের চূড়ায় মেঘের চূর্ণকুন্তল সব কিছুতে মিলে এই মুহূর্তে আমরা সবাই প্রকৃতির অন্তরে এক হয়ে গেছি।

এক একদিন কর্মব্যস্ত ক্লান্ত দিন পার হয়ে অনেক রাতে ঘরে ফিরে যখন জানালা খুলে নিঃশব্দ জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে দেখতে পেয়ে বলেছি, 'এই যে, কতদিন দেখা হয় নি'--(কতদিন আমরা নিজেরা নিজেদের দেখি না এবং দেখিনি)—সেই সব মুহূর্তের কথা মনে পড়ে। আমরা এগিয়ে যেতে চাই, ছাড়িয়ে যেতে চাই, এমন কি মাড়িয়ে যেতেও আমাদের বাধে না—তারপর একদিন সব চলে-যাওয়ার অমোঘ-আকর্ষণে কোন নিরুদ্দেশ শূন্যতায় হারিয়ে-যাওয়া আমাদের ললাট-লিপি! আমাদের পথ আছে, লক্ষ্য কই? 'এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো'—মুসাফিরখানার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। একটু পরেই বাঁশী বাজবে। দূর দিগন্তে লক্ষ্য রেখে ট্রেন ছুটে চলবে, গতির সুরাস্রোতে ডুবে গিয়ে আবার আমরা নিজেদের ভুলে যাবো, অনেক পিছনে আমাদের অন্তরতম সত্তাকে ফেলে রেখে পালিয়ে যাবো।

তাই তো ট্রেন থামে। যেমন থেমেছে এই শরতের উদ্ভাসিত অম্বরতলে ক্ষণিকের 'মননপুরে'।

দেখো, চেয়ে দেখো, পৃথিবী তেমনি আছে। তেমনি চিরনূতন, চিরপুরাতন। কে বলে প্রকৃতি মৌন, প্রকৃতির সব কথা, আসলে শুধু আমাদেরই কথা! হয়তো তা নয়! জেনে বা না জেনে আমরা হয়তো আসলে প্রকৃতির মনের কথাই বলছি! জড়ের অন্তরালে প্রাণ আছে, প্রাণের অন্তরে চেতনা। সে মহা-চৈতন্যের স্পর্শ পেয়েই 'এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি।' ভারতবর্ষের মহাকবি ও সাধকের কল্পনায়—'যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে' — তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম। তুমি তৃষ্ণা, তুমিই শান্তি, তুমি ভ্রান্তি, তুমিই মুক্তি, তুমি ছায়া, আবার জ্যোতি, সর্বভূতে মাতৃরূপা—তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম। বিশ্বপ্রকৃতির হৃদয়পদ্মাসীনা শারদলক্ষ্মীরূপিণী—আজ এই অখ্যাত অজ্ঞাত মননপুরে মূর্তিমতী হয়ে দাঁড়িয়ে আছ। হয়তো খ্যাতি সেখানে স্পর্শ করতে পারে না, পুথিপড়া পাণ্ডিত্যের সব বাচালতা স্তব্ধ হয়ে যায়, কোন এক বিরলতম মুহূর্তে চকিত আভাসের মতো মননপুরের নির্জনতায় জীবনের সব গতি এসে থামে। আর মুগ্ধ পথিকের দুচোখ ভরে শত জন্মের সৌন্দর্য এক নিমেষে উজাড় করে দেয়।

*

ট্রেন আবার কখন চলতে শুরু করেছে। ঘড়িতে তৃতীয় প্রহর প্রায় উত্তীর্ণ। অন্যমনে চেয়ে থাকতে থাকতে যেন কার পরিচিত ইশারার মতো দূর থেকে আর এক পাহাড় আমার সাথে সাথে ছুটে চলেছে মনে হ'লো। একটু পরেই যেন অনিবার্য মিলের মতো

ওপাশের জানালায় আর একটি পাহাড়ের পরিচিত তিনটি চূড়ো ভেসে চললো দিগন্তের বুকে। তারপর কখনো পাশাপাশি, কখনো মুখোমুখি ছুটে চলেছে আমার শৈশব, কৈশোর, সোনালী সকাল, গেরুয়া সূর্যাস্ত, উদয়াচল, অস্তাচল—ত্রিকূট, দীঘারিয়া। এত কাছে, এত দূরে, তারপর ছুটতে ছুটতে একসময় জসিডি জংশনের প্ল্যাটফর্মের ধার ঘেঁষে য়্যুকেলিপ্টাসের চূড়ার আড়ালে সব হারিয়ে গেল।

অনেকদিনের হারানো অতীত আমাকে জাগিয়ে তুলে আবার কোথায় মিলিয়ে গেল। বিদ্যাপীঠ, বিদ্যাপীঠ, দেওঘর, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ। সকালের ত্রিকূট থেকে শিবতীর্থ বৈদ্যনাথধামে ভৈরবরাগের অরুণাভাস ছড়িয়ে পড়েছে। বিকেলের দীঘারিয়ায় যেন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম রেখে অংশুমান অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন আবার। রাত্রির সহস্রদীপ জ্বেলে তাঁর আরাত্রিক সুরু হলো। দূর দূরান্তের তীর্থ-পথিকেরা গণ্ডি কাটতে কাটতে 'জয় হো বাবা বৈদ্যনাথ' বলতে বলতে এগিয়ে চলেছে। তাদের দিনরাত্রি শিবময়। সব ভ্রান্তি, তৃষ্ণা, ব্যাধি, যন্ত্রণা নিমেষে মুছে গেছে বিদ্যাপীঠের পাশে 'দর্শনিয়া'র মাঠে বাবা বৈদ্যনাথের মন্দিরচূড়াটি দর্শন করে। ওদের পথচলা সার্থক, কারণ ওদের লক্ষ্য নিশ্চিত। ওরা চলতে জানে, ওরা থামতে জানে।

*

আমার ট্রেন কি কখনো থামবে? থেমে যাওয়াই হারিয়ে যাওয়া, চলার পথেই নিত্য নতুন সাম্রাজ্য। যেন কোন অলক্ষ্য গার্ডের হাতে সবুজ নিশান উড়েই চলেছে। আর ট্রেনও বলছে, চলো চলো, আবার চলো, দূর থেকে সুদূর, সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে ভোর – এ ট্রেন কেবলি চলবে, কেবলই ডাকবে। যারা বন্ধ ঘরের দরজায় এই মুহূর্তে নিদ্রামগ্ন তাদেরও বুকের মধ্যে আচমকা রেলের বাঁশী জানিয়ে দেবে—যেতে হবে, যেতে হবে, শুধু যাওয়ার জন্যই আমাদের সবাইকে যেতে হবে।

তবু চলাচলের পথে অনিশ্চিত এক পরম লগ্নে অজানা এক স্টেশনে যখন মুহূর্তের বিরতি পাবো, তখন যেন জানালা দিয়ে দেখতে পাই—স্টেশনের নাম 'মননপুর'। আর কিছুই চাইব না।

আগমনী

মহম্মদ গোলাম আম্বিয়া

এস গো জননী দনুজদলনী,
　　শক্তিরূপিণী, হৃদি-পটে
বরাভয়া রূপে ব্রহ্মময়ী মা,
　　ত্রিনয়নী, মহা সঙ্কটে!
তুমি যে মা আদি, তুমি মা অন্ত,
　　মহিমা তোমার চির অনন্ত,
কল্যাণময়ী, মুক্তিদায়িনী,
　　রয়েছ মা তুমি সব ঘটে!

সর্বভূতে মা তুমি দশভূজা,
　　সব মঙ্গলে মঙ্গলা,
সর্বজনের পূজিতা তুমি মা,
　　তুমি অখণ্ড-মণ্ডলা।
যখন যেদিকে তাকাই শিবানী,
　　তুমিই সবেতে অভয়া-ভবানী!
বিরাজিছ মা গো বাহিরে ভিতরে,
　　দুঃখনাশিনী তুমি বটে।

ভক্তের ভগবান

শ্রীনরেন্দ্র দেব

লোকে বলে তুমি আছো, তাই কাছে যেতে চাই,
উঁকি মারি চারিদিকে যদি কভু দেখা পাই ;
কিন্তু, কোথায় তুমি ? লুকিয়ে যে থাকো প্রভু ;
এতো খুঁজে খুঁজে ফিরি, দেখা তো পাইনে তবু !

কতো সাধু, সন্ন্যাসী, কতো যোগী, ঋষি পাশে,
ছুটে যাই বার বার, পাবো কিছু এই আশে ;
শুধাই তোমরা কেউ পেয়েছো কি দেখা তার ?
তারা বলে, হৃষীকেশ হৃদে আছে সবাকার !

দেখা না পেলেও তাঁর, মাঝে মাঝে সাড়া মেলে,
ধরা পড়ে পাছে, তাই, চলে লুকোচুরি খেলে ।
আছে যার বুকভরা ভক্তির সম্বল,
ছুঁতে পারে সেই শুধু, চলে না সেখানে ছল ।

সাধনা ও আরাধনা মনে হয় বুঝি মিছে ;
ভক্তির ডোর নিয়ে ছোটো যদি পিছে পিছে,
পারে না সে বেশিদিন বাঁধন এড়ায়ে যেতে ;
ভক্ত ভাগ্যবানে হয় নাকো বেগ পেতে ।

সবারে সে ফাঁকি দেয়, পারে না শুধুই তাকে,
ভক্তির শক্তিতে হৃদে সদা বাঁধা থাকে ।
তা'বলে ভেবো না কেউ—তপস্যা নিষ্ফল,
এ জনমে না পেলেও ক্রমে তার বাড়ে বল ।

ফিরে সে যখন আসে আবার এ ধরণীতে,
খুঁজে তাকে তুলে নেয় মাঝী তার তরণীতে ।
জীবনের যত কাজ—মন্দ অথবা ভালো,
আঁধারে ডোবায় কভু, কখনো দেখায় আলো ।

সে তরীতে ভক্তের আসন সবার আগে,
বুকে তুলে নিয়ে যান প্রেমঘন অনুরাগে ।
আত্মীয় করে তাঁরে ভক্তি প্রেমের টান,
শোনো নাকি লোকে বলে ভক্তের ভগবান ?

'রক্তকরবী'র রাজা

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

রূপের কামনা, ধনের কামনা, খ্যাতির কামনা—এরা মনের ষোলো আনা জুড়ে থাকলে, কামিনী-কাঞ্চনে বা যশে আসক্ত হ'লে মানুষ মৃত্যুর জালে জড়িয়ে যায় ; তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্। কামনাই আমাদের আত্মাকে পাশবদ্ধ করে। বুদ্ধ মারকে জয় করেছিলেন, অর্থাৎ কামনাকে, তৃষ্ণাকে, every sort of personal craving-কে জয় করেছিলেন। 'ফাল্গুনী'তে কবিশেখর বলছে : "হাঁ মহারাজ, আমরাই তো পৃথিবীতে আছি মানুষের আসক্তি মোচন করবার জন্য।"

মানুষকে মৃত্যু-জালের মধ্যে ঠেলে দেয় তার greedy desire,—উপনিষদ্ এমন কথা বলেছে কেন? কারণ কামনা আমাদের আত্মাকে সঙ্কুচিত করে, আমাদের চৈতন্যকে প্রসারিত হ'তে দেয় না সকলের মধ্যে। এই যে limiting of consciousness যাকে শাস্ত্রে অবিদ্যা বলা হয়েছে—এই আত্ম-সঙ্কোচের মধ্যেই আমাদের যথার্থ মৃত্যু। তাই সাধু জন-এর (St. John) পত্রাবলীতে আছে : He that loveth not his brother abideth in death. মার্কিন কবির ভাষায় And whoever walks a furlong without sympathy walks to his own funeral drest in his shroud. অন্তরে সহানুভূতি না নিয়ে কেউ সামান্য রাস্তা হাঁটলেও আপন চিতার পাশেই সে চলে ; পরিচ্ছদ তার শবাচ্ছাদন। মানুষের আত্মায় অনন্তের ক্ষুধা। আত্মকেন্দ্রিকতার কঠিন আবরণের মধ্যে মানুষ যদি চারিদিকের সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, যদি তার ভাবনায় অনুক্ষণ থাকে অহংবুদ্ধি তবে তো আনন্দকে সে নাগালের মধ্যে কখনোই পাবে না। এইজন্যে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' বইতে বলেছেন, "আমাদের আত্মা যখন অহং-এর সংকীর্ণ চতুঃসীমানার মধ্যে অবরুদ্ধ থাকে তখন সে আপনার সত্যকে হারিয়ে ফেলে। কারণ আত্মার ধর্মই হচ্ছে যোগ। সকলের সঙ্গে যোগের মধ্যে আত্মা নিজের সত্যকে আবিষ্কার করে এবং শুধু এই যোগের মধ্যেই আত্মার আনন্দ।" 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ আবার বলেছেন, "আপনাকে বৃহতে উপলব্ধি করাই সত্য, অহং-সীমায় অবরুদ্ধ জানাই অসত্য। ব্যক্তিগত দুঃখ এই অসত্যে।" রাজার মনে বৃহতের উপলব্ধি নেই। আনন্দলোকে পৌছানোর পথে তাঁর পর্বত-প্রমাণ বাধা হচ্ছে the first-personal pronoun ; স্বার্থের গণ্ডির মধ্যে রাজার চৈতন্য সঙ্কুচিত হয়ে আছে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russel) যাকে possessive impulse বলেছেন সেই লোভের প্রবৃত্তির বশে রাজা যক্ষপুরীর মানুষগুলিকে মানুষের পর্যায় থেকে বস্তুর পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন। গাঁয়ে যারা মানুষ ছিলো, রাজার উদগ্র লোভ তাদের সংখ্যায় পরিণত করেছে। তারা সব টুকরো মানুষ। H. G. Wells-এর ভাষায় The fragmented mass man of our time. রাসেল (Russel) বলেছেন, It is reverence towards others that is lacking in capitalism. মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব হচ্ছে ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। রাজার কাছে মানুষের জীবনের কোন সম্মান নেই। যক্ষপুরীর শ্রমিকদের জীবনগুলিকে ছাই ক'রে রাজার

লোভের শিখা জ্বলছে। নিজের জীবনকে পুষ্ট করাই যার জীবনের লক্ষ্য তার কাছে আর সমস্ত কিছুর মূল্য অকিঞ্চিৎকর হতে বাধ্য। 'সাধনা'য় কবি বলেছেন: The man who aims at his own aggrandisement underrates everything else. Compared with himself the rest of the world is unreal. স্বর্ণ-পাগল রাজার কাছে যক্ষপুরীর মানুষগুলি unreal. বিখ্যাত মার্কিন ঔপন্যাসিক স্টাইন্‌বেক্‌ তাঁর 'Grapes of Wrath' বইতে আমেরিকার ধনতন্ত্রের উপরে নিদারুণ কাশঘাত করেছেন। এই পুস্তকের এক জায়গায় আছে: For the quality of owning freezes you for ever into "I" and cuts you off for ever from the "we". বিষয়ী মানুষ ঐশ্বর্যের আওতায় জমে কেবলই 'আমি' হ'য়ে যায়। তার ভাবনায় কেবলই বিষয়-চিন্তা, কেবলই "আমি ও আমার"। একটা বিরাট অহং তার সমস্ত চেতনার ক্ষেত্রকে জুড়ে থাকে। সে 'আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া' ঘুরে মরে 'পলে পলে।' আত্মকেন্দ্রিকতার কারা-প্রাচীর তাকে সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখে। তার 'আমি'টা 'আমরা'য় বিকশিত হবার অনুকূল সুযোগ পায় না। তাই তো খৃষ্ট বলেছিলেন, 'সূচীর রন্ধ্র দিয়ে উট যেমন গলে না, ধনীর পক্ষে স্বর্গদ্বার তেমনি দুর্গম।' রবীন্দ্রনাথ এর ভাষ্য করে বলেছেন, যে মানুষ অর্থসঞ্চয়ের দিকে ষোলো আনা মন দিয়েছে সে তো তার সীমিত বিষয়ের প্রাচীরের সঙ্কীর্ণ চতুঃসীমানার মধ্যে অবরুদ্ধ হ'য়ে থাকলো। যা কিছু আমরা নিজেদের জন্যে জমিয়ে তুলি তা আমাদিগকে আর সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে: Our possessions are our limitations. আমাদের বিষয়-সম্পত্তি শেষ পর্যন্ত আমাদের চৈতন্যকে সীমার মধ্যে কেবলই ঘুরিয়ে মারে। রক্তকরবীর রাজার অহং-সীমাবদ্ধ চেতনায় তো সমগ্রের কল্যাণ-চিন্তা নেই। রাজা ধনী আর রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "ধনী নিজের সত্যকে এমন কিছুর দ্বারা অনুভব ও প্রকাশ করতে অভ্যস্ত যা অপরিমেয়ের বিপরীত।" আমাদের মর্মের গভীরে নিঃসংশয়ে অপরিমেয়ের পিপাসা, অসীমের ক্ষুধা। তাই সমগ্রের সঙ্গে যোগেই আমাদের আনন্দ। কাঞ্চনের প্রতি আসক্তি রাজাকে সমগ্র থেকে উৎপাটিত ক'রে নিজের সীমার মধ্যে তাঁকে বেঁধে রেখেছে। আর রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "আসক্তি যাকে মাকড়সার মতো জালে জড়ায় তাকে জীর্ণ করে দেয়, তাতে গ্লানি আনে, ক্লান্তি আনে।" তাই তো রক্তকরবীর রাজা মস্ত জোরটা নিয়েও ভিতরে ভিতরে এত ক্লান্ত; যেন একটা প্রকাণ্ড মরুভূমি কত উর্বর ভূমিকে লেহন করেও তৃষ্ণার দাহে ছটফট করছে। মানুষ তো আসলে আত্মাই। আবার রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই We must know with absolute certainty that essentially we are Spirit. এই আত্মাই হচ্ছে মানুষের পরম 'আমি'। আপনার সেই পরমকে না দেখে আপন মনের মানুষকে হারিয়ে যখন আমরা বাইরে সার্থকতা খুঁজে বেড়াই তখন নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই ডেকে আনি। 'মানুষের ধর্ম' বইতে কবি তাই বলেছেন: "মানুষের যত কিছু দুর্গতি সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে, তাকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে অর্থাৎ আপনাকেই পর ক'রে দিয়ে। মানুষ যখন মূলতঃ আত্মাই, মানুষের সত্য পরিচয় যখন তার মাংসের পরিমাপে নয়, এবং আত্মার পরম তৃষা যখন ভূমারই জন্য তখন অল্পের মধ্যে সুখকে খুঁজতে গেলে চলবে কেন?

স্বামীজী বলেছিলেন, Man the infinite dreamer, dreaming finite dreams! রাজা আপনার পরমকে ভুলে যা বস্তুগত, যা বাহ্যিক, সীমাই যার ধর্ম—সেই ঐশ্বর্যের স্বপ্নের মধ্যে ডুবে আছেন। রাজা যদি উপলব্ধি করতে পারতেন, যা কিছু বস্তুগত, সীমাই তার ধর্ম এবং সীমাকে বাড়িয়ে চলা যায়, পেরিয়ে যাওয়া যায় না!

অবিদ্যায় রাজার চিত্ত তমসাচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। অবিদ্যা কি? রবীন্দ্রনাথ ভাষ্য করেছেন, "মানুষ যখন অবিদ্যার জীবন যাপন করে তখন সে নিজের স্বার্থের মধ্যে সঙ্কুচিত হ'য়ে থাকে। চৈতন্যকে যা সীমিত ক'রে রাখে অহং-এর গণ্ডীর মধ্যে তারই নাম অবিদ্যা।" রাজা যদি তাঁর ভাবনা থেকে first-personal pronounকে, অহংকে সরাতে পারতেন!

রক্তকরবী নাটকের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সাধনা পুস্তকে যা বলেছিলেন, তাই নতুন ভঙ্গীতে আবার বলেছেন। সেই চিরনূতন চিরপুরাতন সত্যটি হোলো: চৈতন্যকে অহং-এর ক্ষেত্রে একান্তভাবে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখলে মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে আসে আত্মাভিমান, লোভ, নিষ্ঠুরতা। নরনারী যদি নিজেদের চেয়ে বৃহত্তর একটা কিছুর মধ্যে আপনাদের সত্তাকে হারিয়ে ফেলতে না পারে, পরের মধ্যে আপন চৈতন্যের যদি প্রসারণ না হয় তবে তো পৃথিবীতে রক্তপাত চলতেই থাকবে, দিগন্তে নূতন যুগসূর্য উঠবে না! নিজেকে ভুলতে হবে একটা বৃহত্তর জীবনের প্রবাহের মধ্যে; তবেই কারাগার থেকে মুক্তি। স্তূপীকৃত ঐশ্বর্যের মধ্যেও রাজার জীবন কয়েদীর অভিশপ্ত জীবন! নন্দিনী দিল তাকে কয়েদখানা থেকে মুক্তি।

রক্তকরবী পড়তে পড়তে কেবলই এই প্রবন্ধলেখকের মনে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকের মধ্য দিয়ে যা বলতে চেয়েছেন তার ভিত্তি উপনিষদ্। কঠোপনিষদে যম বলছেন নচিকেতাকে: নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ—যে রাস্তা মানুষকে ঐশ্বর্যে নিয়ে যায়, যে রাস্তায় হেঁটে বহু মানুষ সর্বনাশের মধ্যে ডোবে, তুমি তা গ্রহণ করোনি। রক্তকরবীর রাজাকে ডুবিয়েছে বিত্তের পথকে বেছে নেবার মূঢ়তা! তাই রাজার অন্তর অতৃপ্তির একটা প্রকাণ্ড বোঝায় ভারাক্রান্ত হ'য়ে আছে। Man the infinite dreamer, dreaming finite dreams! স্বামীজীর সেই অবিস্মরণীয় কথা! অন্তরে যার অনন্তের স্বপ্ন সে-মানুষ যক্ষপুরীতে স্বপ্ন দেখছে শুধু কাঞ্চনের, যার কোথাও না কোথাও একটা সীমা আছে! রাজা কামনার মৃত্যুজালের আড়ালে অপ্রকাশিত। যক্ষপুরীর জীবন্মৃত শোষিত মানুষগুলির মধ্যে রাজা যদি আপনার অবরুদ্ধ সত্তাকে প্রসারিত করে দিতে পারতেন! সেই "enlarged diastole of the Soul', সেই সকলের মধ্যে আপনার বিকিরণ, 'সেই সকলেতে আমি, আমাতে সকল';—এই বৃহতের উপলব্ধি, সেই ব্যক্তিগত ভাবনা থেকে first-personal pronoun-এর অপসারণ, সেই অহং-এর মহান মৃত্যু বিরাটের প্রাণসমুদ্রের অসীমে—এক কথায় প্রেমের অনুভূতি রাজাকে নিমেষে নির্বাণের প্রশান্তিতে (Soul-serenity) পৌঁছে দিতে পারতো! কিন্তু মারের অর্থাৎ কামনার প্রলোভন জয় করা কঠিন, অহং ম'রেও মরতে চায় না! তাই আপনার চৈতন্যকে সকলের মধ্যে প্রসারিত করার পথকে কবিরা শাস্ত্রে দুর্গম বলেছেন। জীবনের কঠিনতম সংগ্রামের ক্ষেত্র

তো বাইরে নয়, ভিতরে। সে লড়াই নিজের বিরুদ্ধে নিজেরই লড়াই। মারকে জয় না ক'রে আত্মার প্রশান্তিতে পৌছানোর উপায় নেই। তৃষ্ণার ক্ষয়ে তবেই দুঃখের সমাপ্তি! রাজা অবশেষে নন্দিনীর প্রেরণায় অমৃত-লোকের পথকে বরণ করেছেন। গান্ধীজী একদিন মাতৃজাতিকে লক্ষ্য ক'রে বলেছিলেন, She is our maker, our mother, the silent leader. যার দেহের মধ্যে পুরুষের দেহ, আত্মার মধ্যে পুরুষের আত্মা, স্বপ্নের মধ্যে পুরুষের স্বপ্ন তৈরী হোলো সেই নারীই কি পুরুষকে নিঃশব্দে অমৃত-লোকের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে করুণার বাণী কণ্ঠে নিয়ে? রাজাকে যে জালের বন্ধন থেকে মুক্ত করলো সে তো নারী! নূতনতর মানব-সভ্যতার সৌধরচনায় নারীর ভূমিকা কি হবে তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রক্ত-করবীতে—একথা যেন স্মরণে রাখি।

ধ্যানালোক

শ্রীশান্তশীল দাশ

তবু আমি সুন্দরের ধ্যান করে যাই :
যতই আঁধার আসে, সব দুঃখ ব্যথা
সয়ে যাই ; মনে মনে জপি নিশিদিন
তোমার অমৃতমন্ত্র, হে চিরসুন্দর,
আর ওই অপরূপ রূপটি তোমার
আমার হৃদয়মাঝে এঁকে অবসরে
ধ্যান করি, ভুলে যাই সব দুঃখশোক ;
সমস্ত যন্ত্রণা জ্বালা নিমেষে মিলায়।

আমার ধ্যানের রাজ্য সদানন্দময়,
সেখানে নেইকো কোন দুঃখ, হা-হুতাশ;
অভাবের, বঞ্চনার, বেদনার গ্লানি,
এতটুকু নেই, শুধু শান্তি চারিধার।
গভীর প্রসন্ন শান্তি, আর সীমাহীন
জীবনের ব্যাপ্তি সেই স্নিগ্ধ ধ্যানলোকে।

স্বামীজীর শিক্ষা-চিন্তা

অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী

"মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ-সাধনই শিক্ষা" ("Education is the manifestation of the perfection already in man")—স্বামীজীর এ শিক্ষা-সংজ্ঞা শিক্ষা-তত্ত্বের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি স্বর্ণ অধ্যায়ের সংযোজন করেছে। মূল সমস্যার গভীরে প্রবেশ ক'রে স্বচ্ছ সুন্দর সমাধানের আলোকে উদ্ভাসিত এমন ভাবোদ্দীপক, এমন শক্তিসঞ্চারী তত্ত্ব শিক্ষা সম্বন্ধে আর কেউ কখনও ব্যক্ত করেছেন ব'লে আমার জানা নেই। শিক্ষা যে কেবল মনোজগৎ ও বহির্জগতের মধ্যে পারাপারের সেতুই নয়—নিত্য নূতন সংবাদ আহরণে মন-পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করাই যে শুধু এর কাজ নয়-বহিরঙ্গ ছাড়াও যে শিক্ষার একটি অন্তরঙ্গ দিক আছে, এবং সেইটিই যে প্রধান—শিক্ষা যে কেবল কিছু জানা বা আয়ত্ত করাই নয়, কিছু হওয়া বা হয়ে ওঠাও—এ কথাটা স্বামীজীর মতন এমন দৃপ্ত ভঙ্গীতে আর কেউ বলেছেন ব'লে শুনিনি। এ একেবারে মৌলিক কথা, মূল ধ'রে নাড়া দেওয়া কথা। সকলেরই ভাববার মত কথা। কিন্তু, এ সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক।

শিক্ষার দুটি দিক আছে—একটি তত্ত্বের দিক, অপরটি প্রয়োগের। একটি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বা আদর্শ, আর একটি ওই লক্ষ্য প্রাপ্তির পথ বা পাথেয়। তত্ত্বের দিক থেকে শিক্ষা-স্বরূপের সঙ্গে ব্যক্তি-স্বরূপ, বিশ্ব-স্বরূপ এবং বিশ্বের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধের প্রশ্নটি জড়িত। কারণ, শিক্ষা মানুষকে কেন্দ্র ক'রেই, তাই মানুষের স্বরূপ আর শিক্ষার স্বরূপ যদি স্বতন্ত্র হয়, তাহলে আর যাই হোক—মানুষের জন্য আর ও-শিক্ষার কোন সার্থকতা থাকে না। আবার ব্যক্তিমানব কোন নিরালম্ব স্বতন্ত্র একটি অস্তিত্ব মাত্র নয় এ সংসারে; মনুষ্যজাতি ও বিশ্বজগতেরই অন্তর্ভুক্ত সে। সমাজনীতি ও রাজনীতির ভাষায়—সে একটি পরিবারের একজন, একটি সমাজের সদস্য, রাষ্ট্রের নাগরিক ও বিশ্ববাসীর অন্যতম। অর্থনীতির ভাষায়—বিশ্ব উৎপাদন ও ভোগের বৃত্তের একটি বিন্দু সে। সমস্যাটা শেষপর্যন্ত তাই ব্যক্তিকে অতিক্রম ক'রে বিশ্বময় ছড়িয়ে যায়। তা শিক্ষা-স্বরূপ উপলব্ধিতে বিশ্ব-স্বরূপ ও বিশ্বের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের উপলব্ধির প্রয়োজন দেখা দেয়। আবার স্বরূপ ও আদর্শের মধ্যেও একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। আদর্শ কখনও স্বরূপবিরুদ্ধ হ'তে পারে না। যা আদর্শ, তা ঠিক বাস্তব নয়—একথা সত্য। কিন্তু তাই ব'লে তা একেবারে অবাস্তব নয়। আদর্শ বাস্তবকে অতিক্রম ক'রে যায় সত্য, কিন্তু বাস্তবের গভীরেই তার শেকড় থাকে। আদর্শ হয়ত বাস্তবে রূপায়িত হয় কদাচিৎ, কিন্তু ও বাস্তব-রূপায়ণে প্রকৃতিগত বাধা নেই কোথাও। বাস্তবের পথিক আদর্শের লক্ষ্যের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেও প্রান্তে গিয়ে হয়ত পৌঁছায় না শেষপর্যন্ত, কিন্তু ও-পথ ওই লক্ষ্যের দিকেই প্রসারিত নিঃসন্দেহে। তাই আদর্শ-অনুধ্যানে স্বরূপ-উপলব্ধিরও আবশ্যকতা আছে। তাই বলছিলাম, শিক্ষার আদর্শ

নিরুপণ করতে গেলে মানুষ ও বিশ্বের স্বরূপ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। আর এইখানেই—দর্শনের পরাবিদ্যার—পদসঞ্চার। তাই শিক্ষার তত্ত্বের দিকটি একটি দার্শনিক সমস্যা, দর্শনের আলোকেই তার সমাধানের পথ খুঁজতে হয়। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যে ধারণা গ্রহণ করা হবে, তার প্রভাব গিয়ে পড়বে শিক্ষা-তত্ত্বের ওপর। সেই ভাবেই শিক্ষা-তত্ত্ব গ'ড়ে উঠবে। উঠেছেও তাই। নানা মুনির নানা মত দেখা দিয়েছে।...

মূলতঃ অদ্বৈত বেদান্তের আলোকেই জগৎ ও ব্যক্তিজীবনকে উপলব্ধি করেছেন স্বামীজী। তাই তাঁর জীবন ও জগৎ বোধে যে গভীরতা ও উদারতা আত্মপ্রকাশ করেছে তা অন্যত্র দুর্লভ। এই গভীরতা ও উদারতার রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে ব্যক্তিমানব তাঁর দৃষ্টিতে এক মহিমান্বিত আত্মিক মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। ব্যক্তির মধ্যে তিনি বিশ্বকে উপলব্ধি করেছেন—বিন্দুতে সিন্ধুর কলতান শুনেছেন। অস্থি-মাংস মেদ-মজ্জাকে অতিক্রম ক'রে, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতির উর্ধ্বে উঠে মানুষ মহৎ, স্বরাট, বিরাট হয়ে উঠেছে তাঁর অনুভূতিতে। মানুষ শুদ্ধ, বুদ্ধ ও পূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। এই শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ভাব মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। পূর্ণতাই মানুষের প্রকৃত পরিচয় কিন্তু মানুষ স্বরূপতঃ পূর্ণ হ'লেও তার এ পূর্ণতা স্বতঃপ্রকাশ নয়; মূলতঃ মুক্ত হলেও বন্ধনহীন নয় সে। চৈতন্যসত্তা হলেও তার চৈতন্যের স্ফুরণ ঘটে না সহজে। অবিদ্যা ও জড়ত্বের জগদ্দল পাথরে চাপা পড়ে থাকে তার প্রাণ-নির্ঝরিণীর বাইরে বেরোবার পথ। ওই পাথরটাকে সরিয়ে দিয়ে তাকে তাই বাইরে বেরুবার সুযোগ ক'রে দিতে হয়। তবেই সে আপন আনন্দে ধেয়ে চলে স্বভাব-গতিতে। চলে আপন লক্ষ্যের দিকে। আর—এই বাধাকে অতিক্রম করা, প্রতিবন্ধকতাকে পরাভূত করা, নিজ পূর্ণতার অনুভূতি লাভ করা এবং ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠা—এর মধ্যেই মানব-আত্মার জীবন্ত রূপ, সক্রিয়তার স্বাক্ষর। এই-ই হলো নিজেকে আবিষ্কার করা—আত্মোপলব্ধি পাওয়া, আত্মস্থ হয়ে ওঠা। এই-ই প্রকৃত মানুষ হওয়া। আর শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো মানুষের ওই অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ সাধন করা, অর্থাৎ মানুষকে তার নিজের পূর্ণতা সম্বন্ধে উপলব্ধি লাভ করতে সহায়তা করা। অতএব, প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে মানুষ হতে সাহায্য করা এবং সেইভাবে মানুষকে মানুষ ক'রে তোলা। স্বামীজী স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন—"মানুষ গঠন করাই সকল শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য"।...

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে স্বামীজীর উপরোক্ত শিক্ষা-তত্ত্বের সঙ্গে তাঁর ধর্মতত্ত্বের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ধর্ম সম্বন্ধে স্বামিজী বলেছেন—"মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ-সাধনই ধর্ম।" এই ধর্ম-সংজ্ঞার দ্বারা তিনি ধর্মকে যে লৌকিক আচার-ব্যবহার ও মতবিরোধের নাগপাশ থেকে মুক্ত ক'রে একটি জীবন্ত, সার্বজনীন ও গভীর ভাবদ্যোতক রূপ দিয়েছেন তাইই নয়, মানবাত্মার একটি বিরাট ও স্বরাট স্বরূপের চিত্রও অঙ্কিত করেছেন। আরও লক্ষ্য করবার বিষয় যে, ধর্মের বহিরঙ্গের চাইতে অন্তরঙ্গ দিককেই তিনি মুখ্য মর্যাদা দিয়েছেন। শিক্ষা-তত্ত্বেও স্বামীজীর ঠিক অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। সেখানেও বাইরের বৈচিত্র্য ও পারিপাট্যের চাইতে আন্তর দিককেই প্রধান ক'রে তুলেছেন তিনি। সেখানেও মানুষের ঠিক একই

মহিমান্বিত মূর্তি এঁকেছেন এবং মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ-সাধনকেই শিক্ষা বলেছেন। অতএব বলা যায় যে ধর্ম ও শিক্ষা একই জাতীয় দুটি প্রক্রিয়া—একটির লক্ষ্য মানুষের দেবত্বের বিকাশ, অপরটির হলো তার পূর্ণতার বিকাশ। আর ওই 'দেবত্ব' আর 'পূর্ণতা' কিন্তু দুটি অবিচ্ছেদ্য গুণ। আরও বিশদ ক'রে বলতে গেলে, একই গুণের দুটি দিক ওরা—এপিঠ আর ওপিঠ। দুটোরই লক্ষ্য আত্মোপলব্ধি। উভয়ই মূলতঃ "man-making"। তাই শিক্ষা ও ধর্ম স্বামীজীর দৃষ্টিতে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু নয়, ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল দুটি প্রক্রিয়া। মানব-জীবন-নাট্যের দুটি ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য নয় তারা, একই দৃশ্যের অনুধ্যানের দুটি দৃষ্টিভঙ্গীমাত্র। তাই ধর্ম-হীন শিক্ষা স্বামীজীর দৃষ্টিতে শুধু অসার্থক ও অকল্যাণকরই নয়, অসম্ভবও বটে। ধর্মই শিক্ষার প্রাণ তাঁর কাছে। অবশ্য, প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধেই স্বামীজীর এ তত্ত্ব—তথাকথিত 'বিদ্যালাভ' সম্বন্ধে নয়।

আবার ধর্মজীবন ও নৈতিক জীবনও পরস্পরের থেকে অবিচ্ছিন্ন—স্বামীজীর চোখে। তাঁর দৃষ্টিটাই সমন্বয়ী, সামগ্রিক। আর ওই নীতির দিক থেকে পাশ্চাত্যের হেগেল প্রভৃতি ভাববাদী দার্শনিকদের মতে—'পূর্ণতাবাদই' (Perfectionism) পরম তত্ত্ব। পূর্ণতা-প্রাপ্তিই নৈতিক আদর্শ মানুষের। আর ওরই নাম আত্মোপলব্ধি। "Be a Person"ই এ প্রসঙ্গে চরম কথা হেগেলের। মানুষ হয়ে ওঠাই মানুষের পরম লক্ষ্য তাঁর মতে। আবার এই মানুষ হয়ে ওঠা—এই পূর্ণতাপ্রাপ্তি, এই আত্মোপলব্ধি—একদিনেই লাভ করা যায় না, ধীরে ধীরে অর্জন ক'রে আয়ত্ত ক'রে নিতে হয়। অর্থাৎ—ওই বিকাশসাধনই সার কথা এখানে। এদিক দিয়ে হেগেলের নীতি-তত্ত্ব এবং স্বামীজীর ধর্ম ও শিক্ষা-তত্ত্বের মধ্যে একটি সমগোত্রীয়তা, এমনকি একাত্মীয়তা অনুভব করা যায়। তাই স্বামীজীর শিক্ষা-তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে হেগেলের পূর্ণতাবাদের কথা সহজেই মনে আসে। আরও লক্ষ্য করবার বিষয় যে স্বামীজীর দৃষ্টিতে শিক্ষা, ধর্ম ও নীতি পরস্পরের সঙ্গে সহজভাবে মিলে মিশে একটি স্বচ্ছন্দ সুন্দর জীবন-ঐকতান গড়ে তুলেছে।

ধর্মের ক্ষেত্রে যেমন নিজের দেবত্বের বিকাশ-সাধনই নয়, অপরের দেবত্বের বিকাশে সাহায্য করা—শুধু নিজেই মানুষ হওয়া নয়, অপরকে মানুষ হতে সহায়তা করাই আদর্শ—শিক্ষার ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি। নিজের পূর্ণতা-বিকাশেই ব্যক্তি-শিক্ষার চরিতার্থতা নয়, অপরকেও ওই কর্তব্যকর্মে সাহায্য করতে হবে। নিজে শিক্ষিত হলেই হবে না, অপরকেও শিক্ষিত করতে হবে। তিনিই প্রকৃত শিক্ষিত মহাজন যিনি নিজ পাণ্ডিত্যের পরিমণ্ডলেই আপনাকে আবদ্ধ রাখেন না, পরন্তু যেখানেই মূর্খতার ও অজ্ঞানতার পুঞ্জীভূত অন্ধকার সেখানেই নিজ করধৃত জ্ঞান-প্রদীপ নিয়ে উপস্থিত হন এবং যথাশক্তি অন্ধকারের বুকে আলোক-শিখা জেলে তোলেন। এক থেকে আর একজনে, ব্যষ্টি থেকে সমষ্টিতে শিক্ষার এই প্রসারকে স্বামীজী শিক্ষা-তত্ত্বে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। জন-শিক্ষাই শিক্ষাদর্শ স্বামীজীর। কি ধর্মে, কি শিক্ষায়, সর্বত্রই সমষ্টির জাগরণ, বৃহতের কল্যাণই কাম্য তাঁর। আর—আত্মবাদী ভারতীয় আচার্যের পক্ষে তাইই স্বাভাবিক।

স্বামীজীর শিক্ষাদর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্যের শিক্ষা-তত্ত্ববিদ Sir T. Percy Nunn-এর বক্তব্যের তুলনা করা বোধ করি এখানে

অপ্রাসঙ্গিক হবে না। Nunn-এর মতে 'The aim of education is to foster individuality'—অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশসাধনই শিক্ষার লক্ষ্য। Nunn-এর এই তত্ত্বের মধ্যেও শিক্ষার অন্তরঙ্গ দিকেই যথার্থ দৃষ্টি পড়েছে। শিক্ষার মাধ্যমে কিছু গড়ে তোলা—হয়ে ওঠাই—মূল লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়েছে। স্বামীজীর সেই 'man-making'-এর প্রতিধ্বনিই যেন কিছু পরিমাণে শোনা গেছে এ তত্ত্বে। কিন্তু, সে ওই কিছু পরিমাণেই, পরিপূর্ণভাবে নয়। স্বামীজীর আদর্শের 'man' আর Nunn-এর 'individual'—ঠিক একবস্তু নয়। স্বামীজীর 'man' বুদ্ধ, মুক্ত, নিরঞ্জন সত্তা—সে সার্বজনীন মানব। আর Nunn-এর 'individual' স্বাতন্ত্র্যবোধের বেড়াজালে আবদ্ধ সীমিত বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-মানব। অনেক সঙ্কীর্ণ, অনেক অপূর্ণ সে। তাই স্বামীজীর 'man-making' আর Nunn-এর 'individual making' ঠিক একজাতের তত্ত্ব নয়,—যদিও কিছু পরিমাণ সাদৃশ্য ও নৈকট্য আছে উভয়ের মধ্যে। পূর্বেই বলেছি—এ বিষয়ে হেগেলই অধিকতর আত্মীয় স্বামীজীর। হেগেলের 'Be a Person' এবং স্বামীজীর 'Be a man'-এর মধ্যে মূলতঃ বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

শিক্ষা-তত্ত্বের পরেই আসে তার প্রয়োগের প্রশ্নটি। [ক্রমশঃ]

মাতৃস্তুতি

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

প্রণমি তোমারে জগজ্জননী
জগদ্ধাত্রী মাগো,
ঘটে আর পটে সিদ্ধিরূপিণী
শক্তিদায়িনী, জাগো!
তোমার কৃপায় অণুপরমাণু
দিব্য হয়েছে অয়ি,
ভাবে ও অভাবে জগদানন্দ
তুমি যে জগন্ময়ী!

তীর্থ-যজ্ঞ-তপ-দান সবই
তোমাতে যে হল হারা,
তুমি যে শক্তি শিবেরও বাহুতে—
পুণ্য পীযূষধারা।
সাধ্বী জগদ্ধাত্রী দুর্গা
দুর্গতি-তমঃ নাশো,
বর ও অভয়-স্ফুরিত অধরে
জ্যোৎস্না-সায়রে হাসো।

মানব-প্রেমী অ্যালবার্ট সোয়েইৎজার

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের অগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস। স্বাধীন ভারতের নাতিদীর্ঘ ইতিহাসে একটা দুর্যোগময় কাল। পাকিস্তান কাশ্মীর গ্রাস করার উদ্দেশ্যে ভারতের উপর আমেরিকার দেওয়া অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকেরা হাজার বছর লড়াই করে কাশ্মীর কেড়ে নেবে বলে জোর গলায় আস্ফালন করছে। পাকিস্তানের এই আক্রমণে ইন্ধন যোগাচ্ছে চীন এবং ইন্দোনেশিয়া। সারা দেশে যেমন ছড়িয়ে পড়েছে একটা গভীর উৎকণ্ঠা, তেমনি জেগেছে একটা অপার ঐক্যবোধ এবং দুর্বার প্রতিরোধ-সঙ্কল্প। সেই গভীর উদ্বেগময় দিনগুলির উত্তেজনা যখন চরমে, যুদ্ধের কোলাহল যখন উচ্চকিত সেই সময় একটা ছোট্ট খবর সংবাদপত্রের শেষ পাতার এক পাশে স্থান পেয়েছিল। যুদ্ধের ডামাডোলে সেই ছোট্ট খবরটার দিকে অনেকেরই নজর পড়ে নি সেদিন।

খবরটি অতি সংক্ষিপ্ত।

খবরটি হল :—

মধ্য আফ্রিকার লাম্বারিণে নোবেল শান্তি-পুরস্কার বিজয়ী ডাঃ অ্যালবার্ট সোয়েইৎজার নব্বুই বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন।

এমন কতজনের মৃত্যুসংবাদই তো প্রতিদিন খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। খুব বড় রাষ্ট্রনায়কের মৃত্যুসংবাদ ছাড়া খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে এমন সংবাদ ক্বচিৎ কখনো ছাপা হয়। কাজেই অন্ত দশটা বড় খবরের ভিড়ে ডাঃ সোয়েইৎজারের মৃত্যুর খবরটাও সেদিন অনেকের নজর এড়িয়ে গেল। আর তা' ছাড়া এঁর জীবনে উত্তেজনামূলক ঘটনা বা নাটকীয়ত্বের প্রাচুর্য কতটুকু!

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর গুন্স্বাখ্ অঞ্চলের এক নগণ্য গ্রামে এক সাধারণ পরিবারে অ্যালবার্ট সোয়েইৎজারের জন্ম হয়। পিতা ছিলেন পল্লীগীর্জার পাদরী। অতি শৈশবেই অ্যালবার্টের চরিত্রে কয়েকটি বিশেষগুণের পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। পাঁচ বৎসর বয়সের শিশু পিয়ানোর গৎ বাজিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করত। পরবর্তীকালে এ-বালক যে স্থর ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে খুব বড় কৃতিত্ব অর্জন করতে পারবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

স্কুলের পড়াশুনাতেও অ্যালবার্ট বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভার পরিচয় দিলেন। স্কুলের পাঠ যথারীতি সাঙ্গ করে স্ট্রাস্বুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হলেন, এবং মাত্র ২৪ বৎসর বয়সেই বহুলকাম্য ডক্টরেট লাভ করলেন। তাঁর অধ্যয়ন ও গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল 'থিওলজি' অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্র। উদ্দেশ্য : পৈতৃক পেশাকেই জীবিকার্জনের পন্থারূপে গ্রহণ। পর বৎসরই ধর্মযাজকরূপে লুথারীয় চার্চের অভিষেক-পত্র পেলেন। প্রভু যীশুর পবিত্র জীবন ও বাণী হল তাঁর সব চাইতে প্রিয় অনুশীলনের বস্তু। প্রথম বই প্রকাশ করলেন "The Quest of the Historical Jesus" নাম দিয়ে। এ বইয়ের মূল বক্তব্য হল : যীশু-অনুসৃত জীবন-পন্থা ভিন্ন সার্থকতর পথ আর কিছু নেই। সেণ্ট ফ্রান্সিস্ অব্ অ্যাসিসির ভগবদুৎসর্গীকৃত জীবনের সঙ্গে

অ্যালবার্ট সোয়েইৎজারের জীবনের এক সহজ মিল দেখতে পাওয়া যায়। এদিকে ধর্মশাস্ত্র পাঠের সঙ্গে সঙ্গীতচর্চাও চলছে অচল নিষ্ঠার সঙ্গে। সে সময়ের নামকরা সঙ্গীতবিশারদ ইউজেন মাঞ্চের কাছে অরগ্যান বাজনা শিখেছিলেন বাল্যকালেই। তারপর আঠার বৎসর বয়সে প্যারীনগরীর বিখ্যাত বাদক ও সুরকার চার্ল্স-মেরী উইডরের কাছে তালিম নিতে গেলেন অ্যালবার্ট। প্রথম সাক্ষাতের পরই প্যারী তথা ইউরোপের সবচাইতে নামী সঙ্গীতবিদ্ উইডর অ্যালবার্টকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কত শীঘ্র আবার তুমি আমার কাছে তালিম নিতে আসতে পারবে?" একজন যোগ্য শিষ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন উইডর। যোগ্য শিষ্যের সান্নিধ্যে শিক্ষাগুরুমাত্রেরই আনন্দ হয়। যোগ্য আধারে দান দাতামাত্রেরই কাম্য। "পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্"—পিতা এবং গুরুর বাসনার জিনিস। অল্পদিনের শিক্ষার গুণেই অ্যালবার্ট হয়ে উঠলেন একজন প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীতবিদ্ ও সুরশিল্পী। সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর খ্যাতি। আমন্ত্রণ আসতে লাগল বিভিন্ন নগর থেকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে হতে লাগল প্রচুর অর্থাগম। সঙ্গীতশিল্পী রূপেই যে অ্যালবার্ট জগৎজোড়া খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করতে পারতেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। ইতিমধ্যে প্রসিদ্ধ সুরকার বাখ্ (Bach)-এর সঙ্গীতসাধনা বিষয়ে তাঁর দু'খণ্ড গ্রন্থ তাঁকে এনে দিয়েছে বহুবাঞ্ছিত সাহিত্য-প্রতিষ্ঠা। অ্যালবার্ট ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। দর্শনে ও ধর্মশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। ধর্মযাজক রূপেও অ্যালবার্ট বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেছেন। মাত্র ২৮ বৎসর বয়সেই তিনি স্ট্রাসবুর্গের সেন্ট টমাস ধর্মশাস্ত্রীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। জন্মগত প্রতিভার তিলক তাঁর জীবন-ললাটে আঁকা। মননশীলতা এবং শিল্পবোধে তিনি অদ্বিতীয়। পার্থিব জীবনে অর্থ, যশ, মান, প্রভাব ও প্রতিপত্তি যেন করামলকবৎ। প্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক পরিক্রমায় অ্যালবার্ট তখন স্বপ্রতিষ্ঠ। জীবন-পরিকল্পনা প্রায় যখন সুনির্ধারিত, সেই সময় ঘটল এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা, এবং সেই ঘটনার সূত্রেই অ্যালবার্টের জীবনধারা প্রবাহিত হল আর এক সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে।

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি—
আমার বাঁশীর সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি।

বস্তুজগতে তার এবং বেতারে যেমন বার্তাবিনিময় চলে, ভাবজগতেও তেমনি হৃদয় হতে হৃদয়ান্তরে চলে সূক্ষ্ম ভাববিনিময়। সূক্ষ্ম অনুভূতিশীলতায় জগতের সুখদুঃখ নিজের ব'লে মনে করার মত মানুষ বিরল হলেও অবাস্তব অথবা অসম্ভব নয়। মানুষের দুঃখ-বেদনার তীব্র অনুভূতি রাজপুত্রকে রাজপাট ও রাজ্যসুখে বিমুখ করে বহুজনহিতায় জগদ্ধিতায় কঠোর ত্যাগ-তপস্যায় উদ্বুদ্ধ করেছে। আড়াই হাজার বছর আগের এ-ঘটনা—সিদ্ধার্থের সাধনা ও সিদ্ধি—মানুষকে নব আদর্শে, নব প্রেরণায় অভিসিঞ্চিত করেছিল। সেই মহান আদর্শ, সেই নিবিড় অধ্যাত্ম-চেতনাই অঙ্কুরিত হল অ্যালবার্টের জীবনে এক ভিন্ন পরিবেশে। অ্যালবার্ট তখন প্যারী নগরীতে। একদিন দৈবাৎ তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হল প্যারী মিশনারী সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বিবরণীর একটি বিশেষ অধ্যায়ের প্রতি। "কঙ্গো মিশনের প্রয়োজন" শীর্ষক এই বিশেষ রচনাটি সেদিন

তরুণ অ্যালবার্টের অন্তরকে জাগিয়ে তুলল এক নব চেতনায়, নব প্রেরণায়, যে প্রেরণায় মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডি অবলীলাক্রমে অতিক্রম করে বিশ্বচেতনার উদার অঙ্গনে অবতীর্ণ হয়; আত্মকেন্দ্রিতার আবরণ দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে বিশ্বাত্মবোধের উন্মেষ ঘটে, এবং যে মহান ভাব-প্রেরণায় ধন-মান-সুখ-সম্পদ-আরাম-আয়েস তুচ্ছ বোধ হয়, তুচ্ছ বোধ হয় সব স্বার্থ-চিন্তা। মানুষকে ভালবাসা, মানুষের দুঃখের সমভাগী হওয়া আর মানুষের সেবায় আত্মোৎসর্গই জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়।

মিশনারী সোসাইটির বিবরণীর অভিনবত্ব বিশেষ কিছু ছিল না। মধ্য আফ্রিকার নিরক্ষীয় আরণ্য অঞ্চলের অজ্ঞ, দীনদরিদ্র ও নিঃসহায় মানুষের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার কাজ পরিচালনার জন্য কর্মী চাই, চাই ডাক্তার, চাই নার্স। এম্নিধারা মামুলী বিবরণী মাঝে মাঝেই প্রকাশিত হয়। মিশনারী অথবা বেতন-ভোগী কর্মী এ ডাকে সাড়া দেয়। কিন্তু অ্যালবার্টের কাছে এ মামুলী বিবরণীই নিয়ে এল এক নূতন কর্তব্যের আহ্বান। তাঁর অন্তরের অন্তরে এক নূতন অনুভূতি জেগে উঠল। এক প্রশ্ন দিল মনকে প্রবল নাড়া। জীবনের উদ্দেশ্য কি—এই হল তাঁর প্রশ্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পদ এবং তার সঙ্গে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পীর প্রতিষ্ঠা, এতেই কি জীবনের চরম সার্থকতা! জীবনে কি প্রেয়, কি শ্রেয়? অ্যালবার্ট তাঁর দিনলিপিতে লিখলেন কয়েকটি কথা:

"We here in Europe are rich, because we know how to fight disease. We are Dives, but those poor natives in Africa are Lazarus, full of sores. We are sinning against them."

সেই অজ্ঞাত দুর্গম আরণ্য অঞ্চলের দৈন্যক্লিষ্ট ও নানা রোগাক্রান্ত দুর্ভাগা মানুষগুলির ব্যথাবেদনা ও গ্লানি যেন অন্তর দিয়ে অনুভব করতে লাগলেন অ্যালবার্ট।

এই সংবেদনশীলতা ও পরদুঃখকাতরতা অ্যালবার্টের বাল্যজীবনেই বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বাল্যকালে গুন্‌স্‌বাখের যে পাঠশালায় পড়তেন সেখানে তাঁর অন্তরঙ্গ সহপাঠী ছিল জর্জ নীটসেলম্ নামে এক সমবয়সী বালক। একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুই বন্ধুতে—কার গায়ে জোর বেশী তা' পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে মল্লযুদ্ধ শুরু করে দেয়। দৈহিক গঠনে ও আকারে জর্জ ছিল অ্যালবার্টের চাইতে বেশী মজবুত আর বড়। তার মনে বিশ্বাস ছিল যে, সে সহজেই অ্যালবার্টকে কাবু করতে পারবে, কিন্তু কার্যতঃ ফল হল ঠিক বিপরীত। জর্জকে অ্যালবার্টের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হল। মনের ক্ষোভে জর্জ অ্যালবার্টকে বলল: "ভাই, আমিও যদি প্রতিদিন ব্রেক্‌ফাষ্টে তোমার মত মাংসের সুরুয়া খেতে পেতাম তা' হলে তোমার মত গায়ের জোর আমারও হতে পারত।" জর্জদের সাংসারিক অবস্থা ছিল হীন, নিয়মিত মাংসের সুরুয়া তাদের জুটবে কি করে? সহপাঠীর সাংসারিক অসচ্ছলতাই যে তার পরাভবের কারণ অ্যালবার্টের মনে এই কথাটাই বারবার খোঁচা দিতে লাগল। পরদিন হতে অ্যালবার্ট সুরুয়া খাওয়াই ছেড়ে দিল। মা জিজ্ঞাসা করায় দিল একটা মনগড়া অজুহাত। এম্নি আর একটা ঘটনা বালক অ্যালবার্টের চরিত্রের উপর বিশেষ আলোকপাত করে। প্রচণ্ড শীতেও অ্যালবার্ট ভারী ওভারকোট গায়ে দিত না, কারণ স্কুলের গরীব অনেক ছেলেরই ওভারকোট ছিল না।

এই ঘটনাগুলি অ্যালবার্টের কোমল অনুভূতি-প্রণবতার নির্ভুল সাক্ষ্য।

দূর দুর্গম আরণ্য আফ্রিকার দুঃস্থ মানুষের ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারলেন না হৃদয়বান তরুণ অ্যালবার্ট। সুনিশ্চিত সুখ-সমৃদ্ধির পথ ছেড়ে অনিশ্চিতের পথে পা বাড়ালেন। সেণ্ট টমাস ধর্মমহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদে ইস্তফা দিয়ে স্ট্রাসবুর্গের মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলেন ছয় বছরের জন্য ছাত্র হিসেবে। চিকিৎসক হতে হবে তাঁকে, আর তবেই না নানারোগক্লিষ্ট নিরুপায় আফ্রিকাবাসী মানুষগুলির সেবাকার্যের জন্য নিজেকে যোগ্য করে তুলতে পারবেন। অ্যালবার্ট তখন প্রায় বিগতযৌবন—বয়স আটত্রিশ বৎসর। তারপর পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন লাবণ্যময়ী শ্রীমতী হেলেন ব্রেসল নাম্নী মহিলার সহিত। তারপর মনস্থ করলেন সস্ত্রীক মধ্য আফ্রিকার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাবেন। ফরাসী-অধিকৃত মধ্য আফ্রিকার নিরক্ষীয় অঞ্চল। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘন অরণ্যের আবরণে এই অঞ্চলটি লোকচক্ষুর অন্তরালবর্তী; মহাকবি যার চিত্রায়ন করেছেন অনুপম ভাষায়:

> "হায় ছায়াবৃতা,
> কালো ঘোমটার নীচে
> অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ
> উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।
> এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
> নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
> এল মানুষ-ধরার দল
> গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
> সভ্যের বর্বর লোভ
> নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।"

যাত্রার পূর্বে প্রস্তুতির জন্য সময় নিলেন প্রায় এক বৎসর। এই সময়টা অতিবাহিত করলেন ট্রপিক্যাল্ রোগ (Tropical disease) চিকিৎসার বিশেষ অনুশীলনে। আর ইউরোপের শহরে শহরে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করতে লাগলেন সঙ্গীতের আসর বসিয়ে। তারপর একদিন নিরক্ষীয় আফ্রিকার গহন অরণ্যমধ্যস্থিত ওগোই নদীর তীরে লাম্বারিণে এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে সহধর্মিণী শ্রীমতী হেলেন। লাম্বারিণ হল সোয়েইৎজার-দম্পতির আমরণ কর্মস্থল ও সাধনার ক্ষেত্র। এখানে অর্ধ-শতাব্দীরও বেশী কাল কাটালেন ডাঃ অ্যালবার্ট সোয়েইৎজার এবং তাঁর মহীয়সী পত্নী। মানবজীবনের নিগূঢ় উদ্দেশ্য কি? এই দুরূহ প্রশ্নের সমাধান খুঁজেছিলেন অ্যালবার্ট সোয়েইৎজার, এবং সমাধান পেয়েছিলেন, একটি কথায়—সেবা। জীবসেবা। মনে যে আকূতি জাগলে মানুষ ঘরবিরাগী হয়, রাজ্য ও রাজপাট তুচ্ছ মনে হয়, আত্মসুখ, সম্ভোগ হেয়জ্ঞান হয় সেই পবিত্র সেবাব্রতের আহ্বানেই সোয়েইৎজার-দম্পতির স্বেচ্ছা বনবাস।

ওগোই নদীর তীরে তিনটি ছোট পাহাড়। তারই সানুদেশে প্যারী মিশনের ক্ষুদ্র উপনিবেশ লাম্বারিণ। মিশনারীদের আসল ও অকৃত্রিম লক্ষ্য আদিম অরণ্যবাসীদের ধর্মান্তরিত করা। এই ধর্মান্তরণ-প্রচেষ্টার পিছনে মিশনারীদের আছে নানা কৌশল। শিক্ষাদান, চিকিৎসা-ব্যবস্থা, আর্তত্রাণ ইত্যাদি মিশনারী কার্যকলাপে মানুষের দুঃখ, দুর্দশা ও অসহায়তার সুযোগে অপরকে ধর্মান্তরিত করে দল ভারী করবার মতলবও থাকে। বলপ্রয়োগ, ভীতিপ্রদর্শন, উৎপীড়ন এবং নারীনিগ্রহও আমাদেরই দেশে সাম্প্রদায়িক সংখ্যা-বৃদ্ধি সাধনের তথা ধর্মান্তর-করণের প্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়েছে, এবং আজও

হচ্ছে। এ ধর্মান্তরের সঙ্গে প্রকৃত ধর্মের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। ধর্ম যদি সত্যানুসন্ধান হয়, ধর্ম যদি সত্য, শিব ও সুন্দরের আরাধনা হয়, ধর্ম যদি ঈশ্বরানুরক্তি হয় তবে যে ধার্মিক অন্য ধর্মের অনুগামীদের ছলে বলে কৌশলে ছিনিয়ে এনে নিজ-গণ্ডির অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উদ্যোগী তাকে প্রকৃত ধার্মিক বলা চলে না। এ হচ্ছে নির্লজ্জ ও নিকৃষ্ট রাজনৈতিক অপকর্ম, ধর্মান্ধতা ও বর্বরতার নামান্তর। সত্যধর্ম কখনো অপরকে ধর্মান্তরিত করে প্রতিষ্ঠা খোঁজে না। প্রকৃত ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত,—সংখ্যাগরিষ্ঠতার আশ্রয়ে তার নিরাপত্তার প্রয়োজন কি?

যা'হোক সোয়েইৎজার-দম্পতি মিশনারীদের ভাঙ্গা আস্তানাতেই বাসা বাঁধলেন। কতকগুলি জীর্ণপ্রায় ও পরিত্যক্ত কুটির মেরামত করে সোয়েইৎজারদের থাকবার ঘর ঠিক হল। একটা অব্যবহৃত মুরগী-ঘর সংস্কার করে ডাক্তার সোয়েইৎজার তাঁর প্রথম হাসপাতাল স্থাপন করলেন। এখানেই চলল দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ও বছরের পর বছর আর্তসেবা —সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধ'রে। দূর দুরান্তরের অরণ্য-অঞ্চল থেকে প্রতিদিন আসত শত শত গলিত কুষ্ঠ, শ্লীপদ, শোথ, গলগণ্ড, আমাশয় ও অন্যান্য দুরারোগ্য গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের দল। মিশনারীদের মামুলী ধর্মপ্রচার আর সোয়েইৎজারের মানব-সেবা এ দুয়ের মধ্যে আর কোন সম্বন্ধই রইল না প্রায়। অথচ সোয়েইৎজার পরম খৃষ্টভক্ত। প্রভু যীশু স্বহস্তে কুষ্ঠীর গলিত ক্ষতের পরিচর্যা করেছিলেন। যীশু-জীবনই সোয়েইৎজারের প্রধান প্রেরণা।

সোয়েইৎজার-দম্পতির নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতা বিধাতার আশীর্বাদরূপে দেখা দিল আধিব্যাধিগ্রস্ত আফ্রিকাবাসীদের অভিশপ্ত জীবনে। চিকিৎসক সোয়েইৎজার এবং শুশ্রূষাকারিণী সোয়েইৎজার-পত্নী। ভোর থেকেই শুরু হয় হাসপাতালের কাজ। যারা একান্ত আতুর ও অশক্ত তারা অন্তর্বিভাগীয় রোগী; রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত হাসপাতালেই তারা থাকে। তাদের চিকিৎসা, শুশ্রূষা ও থাকাখাওয়ার যাবতীয় ভার বহন করেন ডাক্তার নিজে। তাঁকে অবশ্য সাহায্য করে প্যারী মিশন, এবং আরও অনেকে। যারা অপেক্ষাকৃত শক্ত সমর্থ তাদের পরিচর্যা হয় আউট-ডোর বিভাগে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। বহিরাগত রোগীরা ফিরে যায় তাদের পল্লীতে। হাসপাতালের ঘরগুলিতে স্তিমিত আলোকের ক্ষীণ রশ্মিরেখা নিবিড় অন্ধকারকে যেন নিবিড়তর করে তোলে। হাসপাতাল-প্রাঙ্গণের অনতিদূরেই অরণ্য-প্রান্ত। রাত্রির অন্ধকারে চারিদিক বিলুপ্ত হয়ে যায়। স্তব্ধ বনভূমি যেন কোন মৌন মহাশঙ্কায় নিথর, নিশ্চল। দিনের কাজ শেষ হল। সোয়েইৎজার-দম্পতির এখন দিনান্তিক অবকাশ। স্বল্পপরিসর গৃহ এবং অতি সাধারণ গৃহসজ্জা। নৈশভোজন শেষ হল। অ্যালবার্ট বসলেন তাঁর চিরপ্রিয় পিয়ানোটির পাশে। শিল্পীর নিপুণ অঙ্গুলি সঞ্চালিত হতে লাগল পিয়ানোর পত্রী-পঙ্‌ক্তির উপর দিয়ে। সুললিত সুরধারা তরঙ্গায়িত হয়ে গেল সেই নিবিড় অন্ধকারের বুকে। অরণ্যের মৃদু মর্মর আর পিয়ানোর মধুর সুরলহরী এক অপূর্ব ঐকতানে মিলিত হল।

ডাক্তার সোয়েইৎজারের চিকিৎসা-নৈপুণ্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল অল্প সময়ের মধ্যেই। সমসাময়িকদের অভিমতে সোয়েইৎজার প্রথমে রোগীর অসুস্থ ও অসুখী মনটিকে সারিয়ে

তুলতেন, তারপর করতেন তার রোগের চিকিৎসা। অপরিসীম বেদনাবোধ আর ভালবাসার স্পর্শে রোগীচিত্ত এক নূতন জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ ও উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠত। মুমূর্ষুর এক নবজন্ম ঘটত যেন। প্রথম বৎসর মাত্র ন' মাসের মধ্যে তাঁরা দুহাজার পীড়িত নর-নারীকে রোগমুক্ত করতে পেরেছিলেন। এ অদ্ভুত কৃতিত্বের কথা সারা বিশ্বের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ করল। বড় বড় চাকুরির প্রস্তাব আসতে লাগল সোয়েইৎজারের কাছে।

কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে ছন্দ-পতন ঘটল একদিন। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের সূচনাতেই ফরাসী কর্তৃপক্ষ জার্মান ব'লে সোয়েইৎজার-দম্পতিকে গৃহান্তরীণ করে রাখলেন। হাসপাতাল পরিদর্শন ও রোগীর চিকিৎসা করাও নিষেধ করে দেওয়া হল। গৃহান্তরীণ অবস্থায় ডাক্তার সোয়েইৎজার তাঁর বহুদিনের অপূর্ণ সঙ্কল্প—বিশ্বসভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি গ্রন্থের রচনায় আত্মনিয়োগ করলেন। এদিকে যুদ্ধের তাণ্ডব যতই বাড়তে লাগল ততই গৃহবন্দী সোয়েইৎজারদের উপর আরোপিত বিধিনিষেধের কড়াকড়িও তীব্র কঠোরতর হয়ে উঠল। তারপর একদিন আদেশ এল অন্তরীণ বন্দীদের প্যারীতে স্থানান্তরিতকরনের। প্যারীনগরীতে নজরবন্দী হয়ে থাকতে হল যুদ্ধ-শান্তি না হওয়া অবধি। এ সময়টাতেই শেষ করলেন দু'খণ্ডে সম্পূর্ণ 'বিশ্বসভ্যতার দর্শন' গ্রন্থের রচনা। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ অবধি সোয়েইৎজার-দম্পতি যুদ্ধোত্তর ইউরোপেই থেকে গেলেন কয়েকটা বছর। এ-সময়টা প্রধানতঃ সাহিত্য-সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন ডাক্তার সোয়েইৎজার। তৎপ্রণীত গ্রন্থরাজির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(ক) Bach : the Musician-Poet
(খ) Indian Thought and its Development
(গ) On the Edge of the Pimeval forest
(ঘ) My Life and Thought
(ঙ) From my African Note-book
(চ) Christianity and the Religions of the World.

ভোগবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার আকর্ষণ এই মানবদরদী ও অধ্যাত্মজীবনে গভীর বিশ্বাসী সোয়েইৎজারকে প্রভাবিত করতে পারে নি এতটুকু। দুর্গম আফ্রিকার দুর্বার আকর্ষণে গৃহ-জীবনের তাবৎ সুখ-সম্পদ-সম্মানের মোহ নস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘ নয় বৎসরের পর আবার তাঁরা ফিরে গেলেন লাম্বারিণে। তাঁদের সাধের হাসপাতাল ও সেবাগৃহগুলি অযত্নে জীর্ণ-প্রায়। আবার নূতন উদ্যমে হাসপাতাল গড়ে তোলার কাজে লেগে গেলেন তাঁরা। বড় বড় দালান-কোঠা ও আধুনিক ধরনের হাসপাতাল নির্মাণ করার ফরমায়েস, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতিও আসতে লাগল নানান দিক থেকে। সোয়েইৎজার কিন্তু কোন দিনও বড় বড় দালান-কোঠার পক্ষপাতী ছিলেন না। ছোট ছোট কুটিরকল্প গৃহই তাঁর পছন্দ, কেননা রোগীরা তাতেই নিজেদের গৃহ-পরিবেশের স্পর্শ অনুভব করতে পারবে। আবার শুরু হল পুরাদমে চিকিৎসা ও সেবার কাজ। জীবনের শেষ দিন অবধি বিরামহীন চলল এই কার্যধারা। স্বদেশ থেকে আসতে লাগল আত্মীয়-অন্তরঙ্গদের আকুল আহ্বান : "ফিরে এস, তোমাকে যে দেশে রাখতে চাই আমরা (We need you here)।" সোয়েইৎজার উত্তরে লিখলেন, "না, এখনও সময় হয়নি। এরা আমাকে এখানেই চায় (They need me here)।"

অলক্ষ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে অর্ধশতাব্দী কাল। দেহে এসেছে বার্ধক্যের জীর্ণতা, মনেও এসে থাকবে ক্লান্তি। পাতিব্রত্য ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি সোয়েইৎজার-জায়া শ্রীমতী হেলেনের ধৈর্যের বাঁধনও শিথিল হল নাকি! ঈষৎ কুণ্ঠায় ও সানুযোগে স্বামীকে স্বদেশে ফিরে যাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আর কতকাল এখানে থাকবে?" উত্তর পেয়েছিলেন: . "যতদিন আমার নিঃশ্বাস পড়বে (As long as I can draw breath)।" ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের নোবেল শান্তি-পুরস্কার দেওয়া হল মানবসেবক সোয়েইৎজারকে।

জীবসেবায় জীবন উৎসর্গ করে নিগূঢ় জীবনরহস্যের সন্ধান খুঁজেছিলেন অ্যালবার্ট সোয়েইৎজার। মানুষই সবার উপরে—জীব-সেবাই দেবসেবা, এই হল সোয়েইৎজার-জীবনের মর্মবাণী।

আলো জ্বালো ভগবান

সেখ সদর উদ্দীন

আরো আলো চাই, আরো আলো চাই, আলো জ্বালো ভগবান,
অকূল আঁধারে কাঁদে মানুষের আলোক-পিয়াসী প্রাণ!
আঁধারে-অন্ধ মনের সামনে হারায়ে গিয়াছে পথ,
হে জ্যোতির্ময়, চালাও ধরায় মহাসূর্যের রথ!

পথের দুধারে দলিত হইয়া মানবতা কাঁদে হায়,
ব্যাকুল হইয়া নূতন উষার আলোক পাইতে চায়!
সভ্যতা-শিশু পশুর ভয়েতে দারুণ আর্তনাদে
অসভ্যতার আঁধারের বনে ডুকারি ডুকারি কাঁদে!

হৃদয়ে হৃদয়ে সত্য-প্রেমের আলো জ্বালো ভগবান,
হোক বীভৎস বেদনা-মথিত রাত্রির অবসান!
সে আলোক পেলে অমানুষ সব আবার মানুষ হবে
স্নেহে করুণায় আর্তজনেরে বক্ষে টানিয়া লবে।

মানুষ হইয়া মানুষেরে ভাই দিতে তার সম্মান
এসো সমবেত প্রার্থনা করি—'আলো জ্বালো ভগবান!'

"কেবল শরণাগত হও"

ডক্টর রমা চৌধুরী

"এত জপ করলামই বল, আর এত কাজ করলামই বল, কিছুই কিছু নয়। মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কার কি সাধ্য! হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবেই তিনি দয়া করে পথ ছেড়ে দেবেন।"

পরমকরুণাময়ী জগজ্জননী শ্রীশ্রীমা সারদামণি সংসার-পাশবদ্ধ, ত্রিতাপদগ্ধ, অনাদিমায়ামুগ্ধ জীবগণের উদ্ধারের জন্য কৃপাভরে যে সাধন-মার্গের উল্লেখ করেছেন নিজের সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়ে, তা পৃথিবীর সর্বকালের, সর্বস্থানের, সর্বাবস্থারই সাধকবর্গের একমাত্র অনুসরণীয়, নিঃসন্দেহ।

এই সাধনের নাম "প্রপত্তি" বা "শরণাগতি"। পৃথিবীর সকল সাধনতত্ত্বেই এর গৌরবজনক উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশেষ করে, ভারতবর্ষের সাধনপ্রণালীতে এর স্থান কেন্দ্রীভূত। দৃষ্টান্তস্বরূপ সাধনতত্ত্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা"র উল্লেখ করা চলে। স্মরণ করুন গীতার সেই সর্বজনবিদিত, সর্বজনপ্রিয়, সর্বজনহিতকর শ্লোক—

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"
(গীতা ১৮।৬৬)

"সর্বধর্ম ত্যাগ করে তুমি আমারি শরণ লও।
সর্ব পাপ থেকে করব মুক্ত, শোকাকুল কেন হও।"

এইটীই গীতার তত্ত্বসম্বন্ধীয় শেষ শ্লোক। তার পরের যে কয়েকটী মাত্র শ্লোক আছে (৬৭-৭৮) তাতে গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যার ফল, শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুনের কথোপকথন প্রভৃতি মাত্র আছে। সেজন্য নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, এই অপূর্ব সুন্দর শ্লোকটীতেই রয়েছে ভারতবর্ষের যুগযুগান্তরের সাধকগণের মর্মবাণী—গীতার মর্মবাণী এবং শেষবাণী।

তার আরেকটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল ঠিক পূর্বের দুটী শ্লোক, যেখানে স্পষ্টতমভাবে বলা আছে—

"ইতি মে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া॥"
(.৮।৬৩)

"সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।"
(১৮।৬৪)

সুতরাং প্রপত্তিই যে গীতার সাধনসার, গীতার সর্বাপেক্ষা গুহ্য, পরম বাণী, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

গীতার তুল্য আরেকটী সর্বজনবিদিত, সর্বজনপ্রিয়, সর্বজনহিতকর ধর্মগ্রন্থ "শ্রীশ্রীচণ্ডীতে"ও কেবলমাত্র এই প্রপত্তি-সাধনেরই সানন্দ উল্লেখ আছে বারংবার।

"প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥"
(শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১।৩৫)

"প্রসন্ন হও প্রণতজনে, দেবী বিশ্বদুঃখহারিণী।
ত্রিভুবনজনবন্দিতা দেবী, হও সবাকার
বরদায়িনী॥"

শিহরণ জাগে আমাদের দেহে মনে এই সব রোমাঞ্চকর বাণী শ্রবণে ও পাঠে। মনে হয়, কি পরমসৌভাগ্য আমাদের যে, আমরা এই ভাবে নিজেদের অধন্য, অপুণ্য, অপবিত্র জীবনকেও জগজ্জনকের বা জগজ্জননীর শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করবার সুযোগ লাভ করছি—কত শত জন্মের

সঞ্চিত মহাপুণ্যের ফলেই না তিনি কৃপাভরে আকর্ষণ করে এনেছেন তাঁরই ত্রিভুবনতারণ-পদতলে; নয় ত সেই দেবদুর্লভ পদ-পঙ্কজকেই বা আমরা কি করে চিনে নিতে পারতাম সংসারের শত-সহস্র প্রলোভনের মধ্যেও?

কিন্তু অত সহজ নয় ত আমাদের জীবন, অত সরল নয় ত আমাদের চিন্তাধারা—কত কঠিনতা তাতে, কত কুটিলতা, কত জটিলতা; শ্রীভগবানের অরুণালোক ত তাতে এরূপ সাক্ষাৎভাবে প্রতিফলিত হতে পারে না; পারে না তাঁর বাণী নির্বাধে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে—চিন্তার কত "হেরফের", যুক্তির কত "মার-প্যাঁচ" তাতে। ভক্তি যেখানে করে মাথা নত, যুক্তি সেখানে উঠে দাঁড়ায় সদর্পে; এবং যখন আমরা যুক্তি-বিচারশীল মানব, তখন যুক্তিকে না স্বীকার করেই বা আমাদের উপায় কি?

তাহলে, আসুন, আমরা এই যুক্তির আপত্তিই শুনি কান পেতে। যুক্তি বলছে কি এক্ষেত্রে? বলছে ন্যায়সঙ্গত কথাই—ভারতীয় কর্মবাদানুসারে, কর্ম করলেই তার ফল অবশ্যম্ভাবী; তার জন্য কারো কৃপা প্রার্থনা করতে হয় না, কারো শরণাগত হতে হয় না, কারো মুখ চেয়ে বসে থাকতে হয় না। কারণ সেই ফল ত কেহই ধ্বংস করতে পারেন না, কেহই পরিবর্তিতও করতে পারেন না—তা আমোঘ, অটল, অচল, কোনো রূপেই তার বিন্দুমাত্রও ব্যত্যয় ঘটতে পারে না।

এই যদি হয় জাগতিক কর্মের স্বরূপ, তাহলে আধ্যাত্মিক সাধন-প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেই বা তা হবে না কেন? আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই বা কেন সকল সাধন সুষ্ঠুভাবে পরিপালন করেও, পরিশেষে শ্রীভগবানের পদতলেই আমাদের ভিক্ষাপাত্র হস্তে আসতে হবে; কেন বারংবার সকাতর প্রার্থনা জানাতে হবে—কৃপা কর, কৃপা কর, বর দাও, বর দাও, মুক্তি আন, মুক্তি আন—বলে? আমাদের সাধনবল যদি থাকে, তাহলে সেই সাধনবলের ফলেই ত মুক্তি হবে আমাদের করতলগত—আর অন্য কিছুর প্রয়োজন কি? অন্যপক্ষে, যদি স্বয়ং শ্রীভগবানই হন মুক্তি-দাতা, তাহলে সাধন-পরিপালনেরই বা প্রয়োজন কি? এই ভাবেই ত হল উদ্ভব এ স্থলে একটী গুরুতর উভয়-সঙ্কটের—যদি সাধনবলে মুক্তিলাভ হয়, তাহলে শরণাগতি ও ঈশ্বরকৃপার প্রয়োজন কি? এবং যদি শরণাগতি ও ঈশ্বরকৃপাবলে মুক্তিলাভ হয়, তাহলে সাধনাবলীর প্রয়োজন কি?

প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, যেহেতু জ্ঞানি-গুণি-সাধক-ভক্তগণ নিশ্চয়ই নিষ্প্রয়োজন কথা অকারণে বলবেন না।

প্রথমতঃ, স্বতন্ত্র সাধনাভ্যাস ও প্রপত্তি পরস্পরবিরুদ্ধ নয়, উপরন্তু প্রথমটী ব্যতীত দ্বিতীয়টী হতেই পারে না। কারণ, জ্ঞান-ভক্তি-নিষ্কামকর্ম দ্বারা নিজেকে শুদ্ধ করে নিয়ে, তবেই না তা শ্রীভগবচ্চরণে উৎসর্গ করা যায়। অশুদ্ধ অর্ঘ্য, দেবচরণে দেওয়া যায় কিরূপে? যে পুষ্পটী তাঁর জন্য সাজাব, যে ধূপটী তাঁর জন্য জ্বালাব, যে শঙ্খটী তাঁর জন্য বাজাব—তাদের ত প্রথমে শোধন করে নিতে হবে। একই ভাবে, আমাদের প্রাণপুষ্প, মনোধূপ, জীবন-শঙ্খকেও প্রথমে সাধনাবলীর দ্বারা পবিত্র করে নিয়ে, তবেই শ্রীভগবচ্চরণে নিবেদন করা যায়, অন্যথায় নয়। এরূপে, সাধনাবলী আরম্ভ, প্রপত্তি শেষ।

কিন্তু সাধনাবলীই বা শেষ হবে না কেন? এদের পরে, পুনরায় প্রপত্তিরই বা প্রয়োজন কি?

প্রয়োজন আছে প্রধানতঃ দুটী কারণে।—প্রথমতঃ, সাধনাবলী সুষ্ঠুভাবে অভ্যাস করলেই

যে আমরা মুক্তি দাবী করতে পারব পরমেশ্বরের নিকট থেকে—তাই বা কি করে হয়? মালিক-শ্রমিকের মধ্যে যে দাবী-অধিকারের সম্বন্ধ পরমেশ্বর-জীবের সে সম্পর্ক হতে পারে কিরূপে? তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যে পিতা-পুত্র, মাতা-সন্তান প্রভৃতির নিকটতম, মধুরতম ব্যক্তিগত সম্পর্ক—তাতে দাবী-দাওয়া নেই, আছে সশ্রদ্ধ প্রার্থনা, আছে সস্নেহ দান। সেজন্য পূর্ণ অধিকার থাকলেও পুত্র যেরূপ পিতার নিকট কোনো কিছু দাবী করেন না, করেন কেবল প্রার্থনা, করেন কেবল স্নেহের আবদার, এক্ষেত্রেও ত ঠিক তাই! এক্ষেত্রেও, সাধনাবলী দ্বারাই মুক্তি লভ্য হলেও, আমরা তা তাঁর কাছে দাবী না করে, ভিক্ষা করে চেয়ে নেই সানন্দে, স্বেচ্ছায়। তাতেই ত কেবল অব্যাহত থাকবে তাঁর ও আমাদের মধ্যে সেই স্নেহ-সুমধুর, শ্রদ্ধা-সমুজ্জ্বল প্রাণের সম্পর্কটী অটুটভাবে।

দ্বিতীয়তঃ, "অহং-মম"-ভাবের ক্ষালন না করতে পারলে মুক্তি কোথায়? সেজন্য—"আমিই করেছি, আমারই দাবী আছে পাবার" এরূপ ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ অহমিকা বর্জন করা এস্থলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন। প্রপত্তি ত এই অহমিকাবর্জনেরই একটি প্রধানতম পন্থা। "আমি আমার নির্দিষ্ট কাজ করে যাব নিষ্কাম ভাবে, কোনো কিছু দাবী করব না তার জন্য, কোনো রূপ অহঙ্কার রাখব না, কেবলমাত্র মাথা নীচু করে পরম করুণাময়ের নিকট প্রার্থনা জানাব, কেবলমাত্র মাথা পেতে নেব তাঁর সস্নেহ দান"—এই ত হল সাধনা, এই ত হল সিদ্ধি। এর চেয়ে মধুরতর আর কি হতে পারে?

মায়ের কথাটি শুনি

শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত

মায়ের কথাটি শুনি কোন্ সেই আদি ঊষাকালে,
'অহং রাষ্ট্রী সংগমনী' রূপ ধ'রে চোখে ভেসে আসে;
চৈতন্যের মূলকেন্দ্র ভ'রে যায় অমেয় আশ্বাসে,
স্ফূর্ত এক প্রতিশ্রুতি আকাশের দিগন্তে কে জ্বালে?
তারপর আর এক উজ্জ্বলতা পুরাণের ভালে,
'ষোড়শী' 'ভুবনেশ্বরী' আনন্দ-তন্ময় রূপে হাসে;
'কমলে কামিনী' রূপে সমুদ্রের তরঙ্গে বিকাশে,
মঙ্গল কাব্যের যুগ জননীকে কোন্ অর্ঘ্য ঢালে!
তারপর অন্নপূর্ণা যায় যেথা ঈশ্বরী পাটনী—
সন্তানের জন্যে মাগে দুধ-ভাত পাতা-ছাওয়া নীড়ে;
কন্যা হ'য়ে গার্হস্থ্যের সোহাগে সম্ভ্রমে আসে ফিরে,
প্রসারিত অন্ধকারে ফুটে ওঠে আলোর সরণী।
কোন্ শুভ আশীর্বাদ ঝ'রে পড়ে রাত্রির শিশিরে,
রামপ্রসাদের গানে আজও বাজে স্নিগ্ধ আগমনী।

কেদার-বদ্রী দর্শন

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী অমলানন্দ

শিশু-রূপিণী মা-দুর্গাগুলিকে মনে মনে প্রণাম জানিয়ে মৈখণ্ডা থেকে এগিয়ে চলেছি। বেলা প্রায় ৯টার কাছাকাছি আমরা ফাটা-চটিতে এসে উপস্থিত হলাম। আমরা এখানে দুটি বড় বড় ঘর পেলাম—একটিতে বিশ্রাম এবং অন্যটিতে রান্নাবান্না। ঘরের কোন ভাড়া নেই। কিন্তু খাদ্যসামগ্রী চটির মালিকের দোকান থেকে কিনতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে দোকানদার রান্নার তৈজসপত্রও বিনামূল্যে যোগান দেবেন। উত্তরাখণ্ডে এটি হল সাধারণ ব্যবস্থা। অবশ্য যাত্রীদের অত্যধিক চাপ যখন পড়ে তখন বাড়ীর জন্য ভাড়া দিতে হয়। যাই হোক চাল, ডাল, ঘি আর আলু কিনে খিচুড়ির আয়োজন হল। বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে রান্নাকর্ম সমাধা হল। এমন উপাদেয় খিচুড়ি যে আমরা অনেকদিন খাইনি একথা সকলে একবাক্যে স্বীকার করল।

খাওয়া একটু বেশী হয়েছিল; তাই ঘুম জমেছিল বেশ—কিন্তু তিনটার মধ্যে রওনা হতে হবে। চড়াই-উৎরাই-এর ঢেউয়ের স্রোতে ভেসে চলেছি। চড়াইতে কষ্ট আর উৎরাইতে সে কষ্ট নেই—ঠিক আরাম যাকে বলে তা পাচ্ছিলাম না। একটা গাণিতিক সত্য উৎরাইয়ের আরামটুকু কেড়ে নিয়েছিল। আমরা এখন মাত্র ৫০০০ ফুট উপরে—আমাদের উঠতে হবে ১২,০০০ ফুটের কাছাকাছি। কাজেই যখনই উৎরাই আসছে তখনই ভাবছি, এতটা আবার বেশী চড়াই আমাদের ভাঙ্গতে হবে। এক-একটি ঝরণা আসে, তাকে অতিক্রম করার জন্য নীচে আমাদের নামতে হয় এবং তারপর যখন উঠতে হয় তখন খাড়া চড়াই। অধিকন্তু এই পথ সঙ্কীর্ণ। তারপর যখন উল্টো দিক থেকে সওয়ার-সমেত ঘোড়া আসতে থাকে তখন অনভিজ্ঞ পথিককে একটু ভয় পাইয়ে দেয়। ঘোড়ার সহিস অবশ্য চিৎকার করে ওঠে 'ওপর, ওপর'। কিন্তু 'ওপর ওপর' মানে যে কি তাই জানতে অনেকটা সময় কেটে যায়। 'ওপর' অর্থাৎ পাহাড়ের কোল ঘেঁসে যাত্রীকে দাঁড়াতে হবে—উল্টো দিকে গেলেই বিপদ; গর্তের মধ্যে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। ক্রমশঃ সূর্যদেব গাছপালার আড়ালে নামছেন। আমরা ধীরে ধীরে রামপুর চটির দিকে এগুচ্ছি। এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার নামে অনেক দেরীতে—সূর্যাস্ত ৭টার পর; তাতে যাত্রীদের হাঁটার সুবিধে হয়। আমরা কিন্তু সূর্যাস্তের অনেক আগেই রামপুর পৌছে গেছি। আমাদের Advance Party অর্থাৎ চিদ্‌ঘনানন্দ ৫টার পূর্বে এসে গেছে। সৌভাগ্যবশতঃ আমরা কালীকম্বলী ছত্রের একটি ঘর পেয়ে গেলাম। রামপুর এই পথের একটি নাম করা চটি—বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অনেকগুলি দোকানপাট এখানে রয়েছে। একটি দোকানে আমাদের আহারের ব্যবস্থা হল। উনুনের ধারে বসে গরম গরম রুটি, ডাল ও একটা সব্জি আর কিছু ভাত দিয়ে আমাদের নৈশাহার সম্পন্ন হল। তারপর কম্বল মুড়ি দিয়ে গভীর নিদ্রা।

পায়ে চলার দ্বিতীয় দিন। বলা বাহুল্য এদিকে ইলেকট্রিসিটি আসেনি; তাই মোমবাতি জেলে বিছানা বাঁধা হল এবং খুব ভোর ভোর রওনা হয়ে পড়লাম। প্রায় একমাইল এসেছি—

সীতাপুর চটি। দোকানের সামনে আবার সেই ভাল সতরঞ্চি পরিপাটি করে পাতা। কাজেই চা খেতে হবে বৈকি! সীতাপুর পেরিয়ে রাস্তা দুভাগে বিভক্ত হল। একটি পাহাড়ের চড়াইয়ের পথ—ত্রিযুগী-নারায়ণের দিকে এবং অন্যটি সোজা কেদারের পথ—গৌরীকুণ্ডের দিকে। ত্রিযুগী-নারায়ণ দর্শন ফিরতি পথের জন্য রেখে আমরা সোজা গৌরীকুণ্ডের দিকে এগুতে লাগলাম। মন্দাকিনী আমাদের রাস্তার নীচ দিয়ে বয়ে চলেছেন। নদীর এধারে ওধারে চাষের ক্ষেত স্তরে স্তরে সাজান। একটির নীচে আর একটি। মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম। কোথাও বা দুটি একটি কুটির। মন্দাকিনীর ঝর ঝর শব্দ নিস্তব্ধ হিমালয়কে সরব করে রেখেছে। এরই মাঝখানে ডিনামাইটের এক-একটি শব্দ কদাচিৎ শোনা যায়। কারণ নূতন রাস্তা তৈরী হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে যাত্রীদের চড়াই-উৎরাইয়ের হাত থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য। প্রায় দু-মাইল দূরে আমরা পেলাম সোমপ্রয়াগ। ত্রিযুগী-নারায়ণ পাহাড় থেকে যে ঝরণা (কালীগঙ্গা) বয়ে আসছে তার সঙ্গে মন্দাকিনীর সংযোগ এইখানে। ঝরণার উপর ভাল পুল। সে পুল পার হবার পর চড়াইয়ের রাস্তা। পথে পড়ে 'ধড়কাটা গণেশ'। যাত্রীরা পূজা দেন যাত্রাসিদ্ধির জন্য। এর কিছু দূরে চড়াইয়ের পথে গৌরীকুণ্ড। আমরা বেলা প্রায় ৯॥টায় গৌরীকুণ্ডে এসে উপস্থিত হলাম।

গৌরীকুণ্ডে কালীকম্বলী ছত্রেই আমরা জায়গা পেয়ে গেলাম। এখানকার উচ্চতা ৬৫০০ ফুট। বেলা সড়ে নটার সময়ও শীতের আমেজ রয়েছে। ছত্রের পাশ দিয়েই বয়ে চলেছেন মন্দাকিনী। নদীর জলধারা এক একটি পাথরে লেগে নানাভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে—খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতভঙ্গে! আর কি বেগ! ঐরাবত ভেসে যেতে পারে—কোন কষ্ট-কল্পনা নয়। আমরা স্নানের জন্য পাথরের উপর দিয়ে নদীর ভেতরে চলে গেলাম। কিন্তু কি ঠাণ্ডা! অবশ্য মন্দাকিনীর এখানে স্নানার্থীর সংখ্যা কম। পাশেই রয়েছে গরম জলের কুণ্ড। তপ্ত কুণ্ড। তবে কেদারে উঠবার পথে তপ্ত কুণ্ডে স্নান না করাই ভালো—উপরে অধিকতর ঠাণ্ডা, সর্দি লাগার আশঙ্কা আছে। কেদার থেকে নামার সময় সকলে তপ্ত কুণ্ডে স্নান ক'রে শ্রান্তি দূর করে। তপ্ত কুণ্ড ছাড়া আরও দুইটি কুণ্ড আছে—তার একটির জল হলুদ রং-এর এবং অন্যটি সাধারণ জলের।

যুগ-যুগান্তের কত স্মৃতি-বিজড়িত এই গৌরীকুণ্ড। জগজ্জননী ও জগৎপিতার লীলা-নিকেতন হিমালয়ের এই অংশটি কত পৌরাণিক আখ্যায়িকায় সমৃদ্ধ হয়ে আছে। মদনভস্মের পর মহামায়া গৌরী দেবাদিদেব মহাদেব শিবের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য এইখানে সুকঠিন তপস্যায় মগ্ন হয়েছিলেন। এবং মহাদেব সেই দুশ্চর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন। এই মহাক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী স্বয়ং মহামায়া গৌরী এবং তাঁরই নামে এই মহাস্থানটি প্রসিদ্ধ। মহামায়ার একটি সুন্দর মন্দির আছে। চারিদিকের প্রাকৃতিক শোভা সুন্দর। সমগ্র হিমালয়ই প্রাকৃতিক শোভার আকর-স্বরূপ—আবার তার মধ্যে কেদারের পথের এই অংশটির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ পরম-পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজ—যিনি সমগ্র হিমালয় একাধিকবার পদব্রজে ঘুরেছেন, তাঁর লেখা থেকে কয়েকটি কথা এখানে সন্নিবেশিত করছি:

"পুরাণাদি শাস্ত্রে এবং মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভবে গৌরীশিখরের যে বর্ণনা দৃষ্ট হয় তাহার সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। এই গৌরীকুণ্ডই যে সেই গৌরীশিখর, তাহার প্রমাণস্বরূপ স্বয়ং বাবা কেদারনাথই অদূরে বিদ্যমান রহিয়াছেন, এবং বিশ্বজননী ভগবতীর নিজ পদ্মহস্তে রোপিত ও বর্ধিত এবং মায়ের হৃদি-পীযূষ-ধারায় পরিপুষ্ট অপূর্ব অমর লতা-কুঞ্জ ও বৃক্ষরাজি এখন এই মর্ত্য-ধামকে স্বর্গাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছে।"

"সমগ্র হিমালয় ও উত্তরাখণ্ডের মহিমা এবং তাহার রমণীয়তা ও পবিত্রতা অতুলনীয়া হইলেও প্রাকৃতিক শোভা, সম্পদ ও গাম্ভীর্যে শ্রীকেদারনাথ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ।" [তিব্বতের পথে হিমালয়ে]

মধ্যাহ্নের আহার ও বিশ্রামের পর আবার আমরা বেরিয়ে পড়লাম—গন্তব্যস্থল চার মাইল দূরের রামওয়াড়া—হাঁটা পথের শেষ চটি। এখান থেকে বেশ খাড়া চড়াই আরম্ভ হল। যত এগোচ্ছি তত খাড়া চড়াই—চায়ের দোকান আর বেশী নেই—জঙ্গল চটিতে একটিমাত্র ছোট কুটির, একটিমাত্র চায়ের দোকান, চড়াইয়ের পর চড়াই আসছে—ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। কিছুদূর অন্তর এক-একটা পাথর, কোথাও বসছি, কোথাও বা হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি। কি অপরূপ শোভা চারদিকে! কয়েকদিন আগে বৃষ্টি হয়েছিল—তার পরিচয় সাদা পদ্মদল গোলাপে আর এক রকম লাল ফুলে—যাকে দূর থেকে জবা বলে মনে হচ্ছে। চাম্পেয়-গৌরার্ধশরীরকায়ার পূজা এই রক্তজবায় আর কর্পূরগৌরার্ধশরীরকায়ের পূজা শ্বেত-পুষ্পে। সামনে বরফাচ্ছাদিত শুভ্র গিরি-শিখরগুলিতে সূর্যকিরণের বিচ্ছুরণ, আকাশে আলোর বন্যা; সে আলোকচ্ছটায় পথিকের চোখ ঝলসিয়ে যায়—কিন্তু চোখ ফেরাবার উপায় নেই। পাহাড়ের কোলে দাঁড়িয়ে অপলক নেত্রে চেয়ে আছি। কিন্তু সঙ্গীরা সকলেই এগিয়ে গেছে—আমি পিছিয়ে পড়েছি। তাতে মনে কিছু দুঃখ নেই; কারণ যারা এ পথে পিছিয়ে থাকে তারাও কম লাভবান হয় না।

রামওয়াড়ায় যখন পৌছি তখন পাচটার কাছাকাছি। সূর্যাস্তের আরও দু'ঘণ্টা বাকী। কিন্তু কালো করে মেঘ এল—আর নিয়ে এল বৃষ্টি ও বাতাসের সঙ্গে হাড়-কাঁপানো শীত। বলে রাখি, এখানকার উচ্চতা আট হাজার ফুট। বৃষ্টি হল সামান্যই, কিন্তু তাতেই শীত খুব বেড়ে গেল। অবশ্য ততক্ষণে আমরা কলীকম্বলীর ছত্রের নিরাপদ আশ্রয়ে ঢুকে পড়েছি। ছত্রের কল্যাণে কয়েকখানি কম্বলও পেয়ে গেলাম। জায়গাটি খুব বড় নয়--কয়েকটি দোকান আর কালীকম্বলীর একটি ছত্র। বৃষ্টি থামার পর একটু ঘুরে দেখা গেল। প্রচণ্ড শীতের জন্য এখানে কেউ চাষবাস বা স্থায়ী বসবাস করে না। বছরে ছয়মাস এখানে সব বন্ধ—নীচে গুপ্তকাশীর কাছাকাছি গ্রামগুলিতে এখানকার সব লোক চলে যায় দোকানপাট গুটিয়ে। এ যেন এক মেলার ব্যাপার—তবে সে মেলার মেয়াদ একটু বেশী—একদিন বা এক সপ্তাহ নয়, ছ-মাসের মেলা; মে থেকে অক্টোবর।

২৩শে মে সোমবার প্রত্যুষেই আমরা রওনা হলাম। মনে আশা ও আনন্দ—আজ বাবা কেদারনাথের দর্শন পাব। কিন্তু পথ ভারী বেয়াড়া, একের পর এক খাড়া চড়াই আসছে। মাত্র দু'মাইলের মধ্যে দু'হাজার ফুট উঠতে হবে। ফার্লং এবং নিশানাগুলি যাঁরা দিয়েছিলেন তাঁরা কোন্ ফুটকাঠির মাপ নিয়েছিলেন তা বলা বড় শক্ত। এক-একটি ফার্লং যেন আর ফুরোতে চায় না। যে সব গরম জামা গায়ে ছিল সেগুলি

এখন বোঝা হয়ে গেছে। ব্যাগের জিনিসপত্র ছাতা, লাঠি, সব কিছু যেন শত্রুতা আরম্ভ করেছে। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা হলেও ভেতরে ঘাম ছুটছে। ক্লান্তি ও শ্রান্তিতে বসে পড়েছেন কেউ কেউ। ফিরতি পথের যাত্রীরা তাঁদের সাহস দিয়ে বলছেন—"বাবা কেদারের নাম করুন। এসে গেছেন; আর একটু।" কিন্তু যতই পরিশ্রম হোক পথের দৃশ্য পথিককে আনন্দে ভরপুর করে দিচ্ছে। ধীরে ধীরে গাছপালাও আর নেই, শুধু ধ্যানগম্ভীর অভ্রভেদী শৃঙ্গরাজি আর তারই পাশে মন্দাকিনী প্রবল গর্জনে নীচে নেমে চলেছেন। কোথাও বা একটি ঝরণা যেন আকাশ থেকে নেমে আসছে পর্বতচূড়ার গা দিয়ে স্বর্গের অমৃতধারা বয়ে নিয়ে।

হঠাৎ যাত্রীরা বাবা কেদারনাথের জয়ধ্বনিতে নিস্তব্ধ পার্বত্য উপত্যকা কাঁপিয়ে তুলল। দেখলাম, কিছুদূরে বাবা কেদারনাথের মন্দির। মনে মনে প্রণতি জানালাম দেবাদিদেবের শ্রীচরণে। আর এক মাইল পথ; চড়াই-উৎরাই নেই বললেই হয়। অনেকটা সমতল একসঙ্গে। তারপর মন্দাকিনীর সেতু পার হয়ে স্নানের ঘাট। একটু বিশ্রাম করে মন্দাকিনীতে স্নান করে নিলাম। মন্দাকিনী এখানে গৌরীকুণ্ড থেকে অনেক বেশী খরস্রোতা। স্নান করে বাজারের মধ্য দিয়ে মন্দিরের প্রাঙ্গণের দিকে এগোচ্ছি এমন সময় কেদারের পাণ্ডা মহেশ্বরপ্রসাদ এগিয়ে এসে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাঁর বাড়ীতে নিয়ে তুললেন। আমাদের দলের অন্যান্য সকলে অনেক আগেই এখানে এসে ডেরা পাকড়িয়েছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা মন্দির-প্রাঙ্গণে এসে গেলাম। পূজা দেওয়ার জন্য আমাদের নাম রেজিষ্ট্রিভুক্ত হল। আমাদের আগে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা আগে পূজা দেবেন। প্রায় শ'তিনেক ভক্ত নরনারী অপেক্ষা করছেন।

মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। নিরাভরণ নাতিবৃহৎ একটি মন্দির, কিন্তু কি অপূর্ব সুন্দর! কাশী, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, পুরী, ভুবনেশ্বর, মাদুরা, কাঞ্চিভরম্, চিদম্বরম্, শ্রীরঙ্গম্ বা রামেশ্বরের মন্দিরগুলির বিশালতা ও কারুকার্য কিছুই এখানে নেই; কিন্তু সেগুলি দেখার পরও কেদারের সৌন্দর্য তীর্থযাত্রীকে মুগ্ধ করবে। মন্দিরের পরিবেশ ও পটভূমি এখানে অনন্য। মন্দিরের উত্তরে—দূরে আরও দূরে কয়েকটি গিরিচূড়া—জগৎপিতার কর্পূর-কুন্দধবল জটামালা। পিছনে দিগন্তবিস্তৃত হিমালয়—উপরে অনন্ত আকাশ। সব মিলিয়ে কেদারনাথ; যিনি বিশ্বেশ্বর—যিনি বিশ্বনাথ। প্রবাদ আছে বিশ্বনাথের পূজার জন্যেই পাণ্ডবেরা এসেছিলেন হিমালয়ের এই দুর্গম প্রদেশে; এবং বিশ্ব ও বিশ্বনাথকে এক অঙ্গে মিলিত দেখে ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন। এখানে এলে সহজেই বলতে ইচ্ছে হয়—

বিশ্বেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায়
কর্ণামৃতায় শশিশেখরভূষণায়
কর্পূরকুন্দধবলায় জটাধরায়
দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়।

বিশ্বেশ্বরের কাছে যুগে যুগে মানুষ দারিদ্র্য-দুঃখের আর্তি জানিয়েছে। কিন্তু সে দারিদ্র্য শুধু বিষয়-জগতের নয়। এর থেকে অনেক বড় দৈন্য—মনোজগতের। হে শিব, মনোজগতের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর কর। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষাদি মানস সম্পদ দিয়ে এ জীবনকে ধন্য কর। (ক্রমশঃ)

শক্তির বিভিন্ন রূপ

ডক্টর শ্রীবিশ্বরঞ্জন নাগ

(৫) বৈদ্যুতিক শক্তি

যান্ত্রিক শক্তি, শব্দ, তাপ ও আলো হল শক্তির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ। শক্তি এই চার রূপে থাকলে আমরা শক্তিকে সহজেই অনুভব করতে পারি। শক্তি অন্যান্য আরো অনেক রূপে প্রকৃতিতে ছড়িয়ে আছে। বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধিৎসায় এবং তাঁদের বিচক্ষণ দৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়ের বাইরের শক্তির কয়েকটি রূপ ধরা পড়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বৈদ্যুতিক শক্তি। বস্তুর গতিরূপে যান্ত্রিক শক্তি প্রকাশিত, আন্দোলনরূপে শব্দশক্তি। আবার বস্তুতে তাপশক্তি আশ্রয় নিলে বস্তুর কণাগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে গতিশীল হয়। এসব ক্ষেত্রে শক্তি বস্তুকে আশ্রয় করলে বস্তুর বাহ্যিক অবস্থার পরিবর্তন হয়, সবগুলি অণু একসঙ্গে চলতে আরম্ভ করে বা অণুগুলি বিচ্ছিন্নভাবে গতিশীল হয়; কিন্তু বস্তুর গঠনের কোন পরিবর্তন এতে হয় না। বস্তুতে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রকাশিত হয় বস্তুর গঠনের পরিবর্তন থেকে। এই পরিবর্তন ঘটে পরমাণুতে এবং পরমাণু আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে বলে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রকাশ আমাদের সহজ অনুভূতির বাইরে। অবশ্য এই পরিবর্তন থেকে বাহ্যিক অবস্থারও পরিবর্তন হতে পারে, যে পরিবর্তন আপাতদৃষ্টিতে বুদ্ধি দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। এমনি বাহ্যিক পরিবর্তন নিয়ে অনুসন্ধান করেই বৈদ্যুতিক শক্তির খোঁজ পাওয়া গিয়েছে।

বৈদ্যুতিক শক্তির বাহ্যিক প্রকাশের দুটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। শীতের সময় চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ানোর সময়ে লক্ষ্য করা যায়, চিরুনি চুলের কাছে নিয়ে এলে চুলগুলি শক্ত ও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। দ্বিতীয় ঘটনাটি হল আকাশের বিদ্যুৎ—বর্ষার সময়ে যখন কালো মেঘ আকাশে জমা হয় তখন দেখা যায়, মাঝে মাঝে ভীষণ গর্জন করে আকাশ হঠাৎ আলোকিত হয়ে যায়। এমনিতে এই ঘটনা ঠিক কিভাবে হচ্ছে বোঝা যায় না, বিচিত্র প্রকৃতির একরূপ বৈচিত্র্য বলেই মনে হয়।

আজ জানা গেছে, যে ধরনের পরিবর্তনে শীতকালে মাথার চুল খাড়া হয়ে যায়, সেই একই ধরনের পরিবর্তন আবার আকাশকে আলোকিত করে। পদার্থের এই পরিবর্তিত অবস্থার নাম হল তড়িতান্বিত অবস্থা। খৃষ্ট-জন্মের বহু বৎসর আগেই গ্রীস দেশের থেলস নামে একজন বিজ্ঞানী পদার্থ যে তড়িতান্বিত অবস্থায় থাকতে পারে এবং এই অবস্থায় পদার্থের বাহ্যিক গুণাগুণের পরিবর্তন হয় সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এর পরে বহু শতাব্দীর পরীক্ষায় বিদ্যুৎকে বিশেষভাবে জানা গেছে এবং আমাদের বর্তমানের অতি-পরিচিত বৈদ্যুতিক শক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।

বৈদ্যুতিক শক্তিকে বুঝতে হলে বস্তুর ক্ষুদ্রতম কণা পরমাণুর গঠন জানা দরকার। পরমাণুর দুটি অংশ আছে—একটি হল কেন্দ্রের অংশ, এর নাম দেওয়া হয়েছে 'কেন্দ্রীন'। কেন্দ্রীনের চারপাশে ছড়িয়ে আছে আর একটি অংশ, যেখানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে আরও কতগুলি কণা যাদের নাম দেওয়া হয়েছে 'ইলেকট্রন'। আমাদের সাধারণ

অভিজ্ঞতায় বিদ্যুৎকে আমরা অনুভব করি না। কিন্তু অণুর সঙ্গে বিদ্যুৎ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

অভিকর্ষ যেমন এই বিশ্বকে ধরে রেখেছে, বিভিন্ন নক্ষত্র ও তাদের গ্রহ-উপগ্রহকে সম্যাবস্থায় রেখেছে, তেমনি বৈদ্যুতিক শক্তিই পরমাণুকে সাম্যাবস্থায় রেখেছে। পরমাণুর কেন্দ্রীন ও ইলেকট্রন স্বভাবতই বিপরীতধর্মী তড়িতের দ্বারা তড়িতান্বিত। বিপরীতধর্মী তড়িৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করে বলে ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রীনের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, ঠিক যেমনটা অভি-কর্ষের জন্য আমাদের পৃথিবী সূর্যের সঙ্গে থাকে। কাজেই সব সময়েই বস্তুর পরমাণুর মধ্যে অজস্র পরিমাণে তড়িৎশক্তি ছড়িয়ে আছে। কিন্তু বিপরীতধর্মী ইলেকট্রন ও কেন্দ্রীন যতক্ষণ পরস্পরের কাছে থাকে, ততক্ষণ এই তড়িৎশক্তির কোন বহিঃপ্রকাশ নেই। যদি কখনো এদের পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়, তবে তখনই এদের তড়িৎশক্তি প্রকাশিত হয়। দুটি জিনিস নিয়ে যদি পরস্পরের সঙ্গে ঘষা যায় তবে এমনটা হতে পারে। চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়া-নোর সময়েও এমনি ঘর্ষণের ফলেই চিরুনির অণু-গুলির কিছু ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে এবং এসে চুলের অণুগুলিতে আশ্রয় নেয়। ফলে চুলগুলি একই ধর্মের তড়িৎযুক্ত হয় এবং চিরুনিটি বিপরীত ধর্মের তড়িৎযুক্ত হয়। তড়িতের স্বভাব অনুসারে যেমন বিপরীত ধর্মের হলে পরস্পরকে আকর্ষণ করবে তেমনি একই ধর্মের হলে পরস্পরকে দূরে ঠেলবে। এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ফলেই চিরুনি চুলের কাছে নিয়ে এলে চুলগুলি দাঁড়িয়ে যায়। ঘর্ষণ ছাড়া অন্যভাবেও পরমাণুর ইলেক-ট্রন কেন্দ্রীন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে—যেমন পরমাণু আলোকশক্তি গ্রহণ করলে। জল সূর্যের তাপে বাষ্প হয়ে মেঘ তৈরী করে। জলীয় বাষ্পের জলকণাগুলি আবার সূর্যের আলো গ্রহণ করলে জলকণার ইলেকট্রনগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং মেঘ তড়িতান্বিত হয়। তড়িতান্বিত দু-খণ্ড মেঘ যখন পরস্পরের কাছাকাছি আসে তখন এদের তড়িৎ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে চায়। সাধারণভাবে বায়ুর মধ্য দিয়ে তড়িৎ যেতে পারে না—কিন্তু যখন মেঘের খণ্ডদুটির তড়িৎ খুব জোরালো হয় তখন বায়ুর কণাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে তড়িৎ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। এই ঘটনা যখন ঘটে তখন জোরালো শব্দ হয় এবং আলো উৎপন্ন হয় এবং আমরা বলি বিদ্যুৎ চমকালো।

(ক্রমশঃ)

পূজা

শ্রীস্মরজিৎ মুখোপাধ্যায়

তোমারে পুজিতে সফল আমারে করো না!
পূজাশেষে কেন মনে হয়, পূজা হল না!
নানারূপে করি কত আয়োজন, মনে ভাবি আছে সবই প্রয়োজন,
তবু যেন কিছু বাকী রয়—যাহা নিবেদন করা হল না!
কত উপচার করি সঞ্চয় কুসুম-দূর্বাদলে
কত ধূপ-দীপ বিধিমত সব রেখেছি আসন তলে।
বুঝিতে পারি না উপাসনা শেষে অন্তরে কে যে বলে যায় এসে,
'নিজেরে না দিয়ে যাহা কিছু দাও, কিছুই দেওয়া যে হল না!'

মহাজাতি সদনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তৈলচিত্রের আবরণ-উন্মোচন

গত ১৯শে আগস্ট মহাজাতি সদনের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ। আবরণ উন্মোচনের পর আয়োজিত সভায় তিনি সভাপতির আসনও অলঙ্কৃত করেন।

সভায় মহাজাতি সদনের ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সমাগত সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ এবং ডক্টর রমা চৌধুরী বক্তৃতা করেন। সভাপতির ভাষণান্তে ধন্যবাদ জানান অর্থমন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়। সভার শেষে "ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ" মঞ্চস্থ হয়।

সভাপতির ভাষণে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী বলেন, বর্তমান সময়ে মানবসভ্যতা জড়বাদ ও ভোগসর্বস্বতাকে আদর্শ করিয়া অবক্ষয়ের পথে ধ্বংসের মুখে আগাইয়া চলিয়াছে। জড়-বিজ্ঞানের উন্নতি এবং তৎকর্তৃক ভোগের নবনব উপহার প্রদানই তাহাকে এ পথে চলিতে প্রলুব্ধ করিয়াছে। এদেশের এবং পাশ্চাত্যের বহু মনীষী এই পথ হইতে তাহাকে সরাইয়া আনিবার জন্য গভীর চিন্তা ও চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এই অবক্ষয়ের মূল কারণ দূরীভূত না হইলে সে প্রচেষ্টায় কিছু ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না।

মানুষ জড়ের সমষ্টি নয়—আসলে সে সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সর্বানুস্যূত অবিনাশী আনন্দময় সত্তা। এই স্বরূপবোধের দিকে মানুষের অগ্রসর হইবার প্রচেষ্টা সভ্যতাকে উন্নত করে; ইহার অভাবই মানবসভ্যতার অবক্ষয়ের মূল কারণ। এদিকে মানুষকে অগ্রসর করাইবার জন্য সচেষ্ট না হইলে মানবসভ্যতার বর্তমান অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব নহে।

মানুষের দেব-স্বরূপের সত্যতা শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া বহু কথা বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীই সারা জগতে প্রচার করিয়াছেন স্বামী বিবেকানন্দ। উহাই নবযুগে উন্নততর জীবনলাভের পথে সারা বিশ্বের পথপ্রদর্শক। নিজ স্বরূপের সর্বব্যাপিত্বের আভাস পাইলে মানুষ সহজেই স্বার্থের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া দ্বেষ-হিংসা ভুলিয়া বিশ্বকল্যাণের উদার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'রূপ বাণীর জীবন-রূপায়ণের প্রচেষ্টা মানবজাতিকে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সর্ববিষয়ে উন্নত হইতে সহায়তা করিবে। নবযুগের আবির্ভাব হইবে "দাবী"-র পথে নহে, "সেবা"-র পথে।

স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ বলেন, অহেতুক কৃপা বিতরণের জন্য আবির্ভূত শ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্বধর্মের এবং জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের সমন্বয় সাধন করিয়া এবং মানুষকে সাক্ষাৎ ভগবান রূপে দেখিয়া সকলের মুক্তির পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। আমরা অনেক সময় ভাবি, তাঁহার আবির্ভাবে ধর্মজগৎ উন্নত হইলেও, রাষ্ট্র ও সমাজের তাহাতে কি হইল? একথা ঠিক নহে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব আর্তমানবের সেবা নিজেই করিয়া গিয়াছেন দেওঘরের দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের এবং রাণাঘাট অঞ্চলের দুঃস্থ প্রজাবর্গের সেবা করিয়া। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহারই আদর্শ অবলম্বনে জনসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া সেই আদর্শই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি এমন একটি কথাও বলেন নাই যাহা শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতে বা জীবনে নাই। তবে শ্রীরামকৃষ্ণের জনসেবা পরোপকার-ইচ্ছা-সম্ভূত জনহিতকর কর্মমাত্র নয়, মানবরূপী সাক্ষাৎ নারায়ণের পূজা, ধর্মসাধনার একটি অঙ্গ।

ডক্টর রমা চৌধুরী বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ভারতের শাশ্বত আদর্শ —সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ। রোঁমা রোঁলার ভাষায় তিনি ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর দুই হাজার বছরের সাধনার মূর্ত বিগ্রহ। মহাজাতি সদনের লক্ষ্যও ভারতের সেই শাশ্বত আদর্শের প্রতি নিবদ্ধ। এই বিশ্বব্যাপী হিংসা-দ্বেষের দিনে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শকে, বিশ্বমৈত্রীর আদর্শকে আমরা যেন সর্বদা দৃষ্টিপথে রাখিয়া চলিতে পারি।

স্বামী অতুলানন্দজী মহারাজের দেহত্যাগ

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীমৎ স্বামী অতুলানন্দজী (গুরুদাস মহারাজ) গত ১০ই আগস্ট রাত্রি ২টা ৭ মিনিটের সময় ৯৭ বৎসর বয়সে মুসৌরীর নিকটবর্তী বার্লোগঞ্জ শ্রীসারদা কুটীরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি নাকে একটি দূষিত ক্ষতে (Cancer) ভুগিতেছিলেন ; শেষ সময়ে তাঁহার মূত্রাশয়ের পীড়া দেখা দেয় এবং উহাতেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। দীর্ঘকাল অসহ্য রোগযন্ত্রণা ভোগের সময় তাঁহাকে কখনও বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই, সর্বদা হাস্যমুখে সকলের সহিত ব্যবহার করিতেন। জীবনের শেষ তিন চার দিন নিরন্তর তিনি 'জয় মা', 'ওঁ মা' বলিয়াছেন ; শাশ্বত প্রশান্তিতে নিমগ্ন হওয়ার প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পূর্বে তাঁহার মুখে শেষ কথা উচ্চারিত হইয়াছিল 'হরিঃ ওঁ'।

তাঁহার পবিত্র দেহ মোটরে করিয়া কনখল সেবাশ্রমে, এবং সেখান হইতে বেলা ৫টার সময় শোভাযাত্রা-সহকারে পুণ্যতীর্থ হরিদ্বারে নীলধারায় লইয়া যাওয়া হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও বিভিন্ন আখড়ার প্রায় ১৫০ জন সাধু পদব্রজে শবানুগমন করেন। গঙ্গাতীরে তাঁহার পূতদেহ আনিবার পর শেষকৃত্য-সমাপনান্তে সলিলসমাধি দেওয়া হয়। গত ২১শে আগস্ট বেলুড় মঠে এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

স্বামী অতুলানন্দজীর পূর্বনাম ছিল মিঃ সি. জে. হেজব্রুম। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ হল্যাণ্ডের আমষ্টারডম্ হইতে আমেরিকায় আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি নিউইয়র্ক কেন্দ্রে যোগদান করেন। সেখানেই ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে ব্রহ্মচর্য দীক্ষা লাভ করেন। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য দেশে পদার্পণের পর নিউইয়র্কেই তিনি সর্বপ্রথম তাঁহার পুণ্য দর্শন লাভ করেন। পরে তিনি স্যান ফ্রান্সিস্কোতে তদীয় গুরুভ্রাতা শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন, এবং তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও সাধুত্বে মুগ্ধ হইয়া দীর্ঘকাল তাঁহার প্রতিষ্ঠিত স্যান ফ্রান্সিস্কোর নিকটবর্তী শান্তি আশ্রমে ব্রহ্মচারী-রূপে বাস করেন। ভারতে আসিবার পর ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি 'উদ্বোধনে' শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজীর নিকট হইতে বেলুড় মঠে সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। কিছুকাল মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে কর্মীরূপে থাকিবার পর জীবনের শেষভাগে ৩০ বৎসরের অধিককাল তিনি হিমালয়ের বিভিন্নস্থানে নির্জন তপস্যায় ও সাধন-ভজনে অতিবাহিত করেন। মায়াবতীতে অবস্থানকালে তিনি 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় বহু সুচিন্তিত মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আমেরিকায় তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের যে সকল প্রাচীন সাধুর সঙ্গলাভ করেন তাহার বিবরণ দিনলিপিতে সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এই বিবরণের কিছু কিছু একত্র করিয়া অদ্বৈত আশ্রম হইতে "With the Swamis in America" (আমেরিকায় স্বামীজীদের সহিত) একখানি সুন্দর পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বামী অতুলানন্দের জীবন ছিল বেদান্তনিষ্ঠ ও ত্যাগসমুজ্জ্বল। তাঁহার দিনচর্যা ছিল সাধকগণের অনুকরণীয়। তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে চির শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ ! শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

সমালোচনা

বৈদিকসাহিত্যসংকলন (প্রথম খণ্ড) : শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় এম. এ., ডি. ফিল., সাংখ্যতীর্থ। প্রধান অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান। পৃঃ ২০২ ; মূল্য : ২'৫০ টাকা। প্রকাশক : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-প্রসার-গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থরূপে সুধী ও সুগায়ক শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বৈদিক-সাহিত্যসংকলন গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড ভারত-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান বাঙালী পাঠকদের মনে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করবে, এ কথা বলাই বাহুল্য। ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ববেদের মন্ত্রমালার সুনির্বাচিত এই স্বল্পায়তন সংকলনে ভারতবর্ষের মনোময় ইতিহাসের আদিপর্ব যেন সংক্ষেপে বিধৃত। সাবলীল, স্বচ্ছন্দ অনুবাদে সংকলয়িতার কৃতিত্ব লক্ষণীয়। সেই সঙ্গে বৈদিক সাহিত্যের অধ্যাত্ম-পরিবেশটির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখায় সাধারণ পাঠকের অন্তরেও ভারতীয় সাধনার চিরাগত ঐতিহ্যের অমর্ত্যমহিমাসঞ্চারে এই সংকলনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এদিক থেকে গ্রন্থারম্ভে শ্রীঅনির্বাণের ভূমিকাটি এ গ্রন্থের সম্পদস্বরূপ।

বৈদিক সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ে পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা—দুয়েরই স্থান রয়েছে। জাতীয়জীবনের ইতিহাস-বিচারে বৈদিক-সাহিত্যের উভয়বিধ পরিচয়ই প্রয়োজনীয়। পরবর্তী খণ্ডে বৈদিকসাহিত্যের অন্যান্য দিকগুলিও ফুটে উঠবে—এই আশা পোষণ করে আমরা প্রথম খণ্ডের সুচারু প্রকাশনার জন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।

প্রসঙ্গতঃ দু'একটি মন্ত্রবাণী ও তার অনুবাদ পাঠকসমাজের কাছে নিবেদন করি—

যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা
যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

যাঁহার এই সকল হিমবান্ (পর্বতসমূহ) মাহাত্ম্যের দ্বারা (প্রকটিত), যাঁহার (মাহাত্ম্য) নদীসহ সমুদ্র, (সকলে) বলিয়া থাকে, যাঁহার এই সকল দিক্‌সমূহ যাঁহার বাহু (স্থানীয়)— (তিনি ছাড়া আর) কোন্ দেবতার উদ্দেশ্যে হবি দ্বারা বিধান করিব? (ঋগ্বেদ) (বৈদিকসাহিত্যসংকলন : পৃঃ ৯৯)

সত্যং চ মে শ্রদ্ধা চ মে জগচ্চ মে ধনং চ মে
বিশ্বং চ মে
মহশ্চ মে ক্রীড়া চ মে মোদশ্চ মে জাতং চ
মে জনিষ্যমাণং
চ মে সূক্তং চ মে সুকৃতং চ মে যজ্ঞেন
॥

সত্যও আমার, শ্রদ্ধাও আমার, জগৎও আমার, ধনও আমার, বিশ্বও আমার, দীপ্তিও আমার, ক্রীড়াও আমার, আনন্দও আমার, জাতও আমার, জনিষ্যমাণও (অর্থাৎ ভবিষ্যতে যাহা জাত হইবে তাহাও), শোভন কথনও (বা ঋক্‌সমূহও) আমার, সুকৃতও (অর্থাৎ পুণ্যও) আমার যজ্ঞের দ্বারা সম্পাদিত হোক। (যজুর্বেদ) (বৈ. সা. স. পৃঃ ১৩৯)

বাংলাসাহিত্যে বৈদিকসাহিত্যচর্চার আয়োজন খুব বেশী নয়। সেজন্য যে মনীষা ও শ্রমশক্তির প্রয়োজন, তার অভাব যে বাংলাদেশে নেই, এ বিষয়ে এ গ্রন্থটিও আংশিক প্রমাণস্বরূপ। সর্বসাধারণের মধ্যে মহত্তম চিন্তার প্রসারের দায়িত্ববহন যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কর্তব্য হয়, তাহলে এই জাতীয় গ্রন্থের আরো বিশদ ও সেই সঙ্গে সুলভ সংস্করণের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। এজন্য জাতীয় সরকারের উদ্যোগ যতটা প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশী প্রয়োজন পাঠকসমাজের আগ্রহ। সুপরিকল্পিত এই সংকলনটি বাংলাসাহিত্যে মূল্যবান সংযোজন। বাংলার পাঠকসমাজের সম্বর্ধনা এই জাতীয় গ্রন্থপ্রচারে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহকে উৎসাহিত করুক—এই প্রার্থনা।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

শ্যামলাতাল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কার্য-বিবরণী (এপ্রিল ১৯৬৫—মার্চ ১৯৬৬) প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে হিমালয়ের সৌন্দর্য-মণ্ডিত পরিবেশে ৪,৯৪৪ ফুট উচ্চে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫ মাইলের মধ্যে কোন হাসপাতাল বা চিকিৎসালয় না থাকায় সেবাশ্রমটি অসহায় ও দরিদ্র পার্বত্য-জনগণের একমাত্র চিকিৎসার স্থান।

দাতব্য চিকিৎসালয়: আলোচ্য বর্ষে সেবাশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়ে বহির্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১০,৭১৩, তন্মধ্যে ৭,৭৯৮ জন নূতন রোগী (পুরুষ—৩,৩৯৬, স্ত্রীলোক—২,১৪৬ এবং শিশু—২,২৫৬)। অন্তর্বিভাগে ১২টি শয্যা আছে; এই বিভাগে আলোচ্য বর্ষে ১৯৪ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে। এ পর্যন্ত উভয় বিভাগে ২,৫২,০০২ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর অধিককাল সেবাশ্রমটি জাতিধর্মনির্বিশেষে নিরাশ্রয় পার্বতীয়-দের অকুণ্ঠ সেবা করিয়া আসিতেছে।

পশুচিকিৎসালয়: ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে গৃহপালিত মূক প্রাণীদের চিকিৎসার জন্য পশুচিকিৎসালয়টি খোলা হয়। প্রতিষ্ঠাকাল হইতে এ পর্যন্ত ৬৪,৭৫০টি পশুর চিকিৎসা করা হইয়াছে। এখানে অস্ত্রচিকিৎসারও ব্যবস্থা আছে। আলোচ্য বর্ষে মোট ২,২৬০টি পশু চিকিৎসিত হয়।

সেবাশ্রমটিকে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসালয়ে পরিণত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় সহৃদয় জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে।

লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্র

লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে স্বামী ঘনানন্দ কর্তৃক আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত এবং ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ডিউকস্ অ্যাভিনিউ-এ নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। পরে হল্যাণ্ড পার্কে একটি বাড়ি কিনিয়া সেখানে একটি শাখা কেন্দ্রও খোলা হইয়াছে। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে ৫ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথির দিন হল্যাণ্ড পার্ক আশ্রমটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। স্বামী ঘনানন্দ প্রতিষ্ঠা-কার্য সম্পন্ন করেন এবং এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন যুক্তরাজ্যে ভারতের হাই কমিশনার শ্রীজীবরাজ মেটা।

স্বামী পরহিতানন্দ মার্চ মাসে ভারত হইতে ফিরিয়া আসেন (সেখানে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে গিয়াছিলেন)। সেখান হইতে ফিরিয়া ৬৮ ডিউকস্ অ্যাভিনিউ-এ তিনি তাঁহার ভারতভ্রমণ সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং রবিবাসরীয় ভাষণ দেন; পরে হল্যাণ্ড পার্কে বক্তৃতা করেন। এতদ্ব্যতীত বৃহত্তর লণ্ডনে অর্থাৎ উইম্‌ব্লেডন, কিংস্টন ও ক্রয়ডনে তিনি নয়টি ভাষণ দিয়াছিলেন।

স্বামী ঘনানন্দ মে মাসে ইন্‌স্‌ব্রাক পরিদর্শন করেন এবং সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন; সভায় দর্শনের সহকারী অধ্যাপক সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। স্বামী ঘনানন্দ আহূত হইয়া তিনটি ক্যাথলিক মনাস্টারিতে বক্তৃতা দেন এবং জুরিখ পরিদর্শন করেন।

গত আগস্ট মাসে স্বামী ঘনানন্দ লিসেস্টার যোগ-শিক্ষার্থীদিগের নিকট মনঃসংযম ও ধ্যান সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন এবং স্বামী পরহিতানন্দ এই বিষয়ে আরো কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহারা সর্বসমেত ৫৪টি বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর হিন্দু ধর্মের আলোচনা-অনুষ্ঠান পরিচালনাকালে স্বামী ঘনানন্দ টেলিভিসনে বক্তৃতা দেন। এই অনুষ্ঠান হইয়াছিল সেণ্ট মেরী-লে-বো, ঈস্ট সেণ্ট্রাল লণ্ডনে ডিউক-অব-এডিনবার্গ কর্তৃক কমন-ওয়েলথ আর্টস ফেসটিভ্যালের উদ্বোধন স্মরণ উপলক্ষে।

আশ্রম হইতে প্রকাশিত 'Vedanta for East & West' পত্রিকাখানি সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। ৯০০ পাউণ্ড মূল্যের পুস্তক কেন্দ্র হইতে বিক্রয় করা হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী শিবানন্দের জন্মতিথি এবং শ্রীশ্রীদুর্গা-পূজা ও খৃষ্টজন্মদিন পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উৎসব-গুলিতে ও অনুষ্ঠিত ক্লাসসমূহে যোগদানকারী শ্রোতৃবৃন্দের মোট সংখ্যা কয়েক সহস্র হইবে।

রামকৃষ্ণ মিশনের বন্যার্ত-সেবাকার্য

আসামের প্রলয়ঙ্কর বন্যাধিধ্বস্ত অঞ্চলে কাছাড় জেলায় গত ২৯.৬.৬৬ তারিখে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক আরব্ধ সেবাকার্য আগামী নভেম্বর মাস পর্যন্ত চালাইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের জন্য মোটামুটি হিসাবে ৮০,০০০ টাকা ব্যয়িত হইবে বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। প্রধান কেন্দ্র বেলুড়ে এবং অন্যান্য শাখাকেন্দ্রের মাধ্যমে আগস্ট মাসের শেষ পর্যন্ত বন্যার্ত-সেবাকার্যের জন্য দান-হিসাবে মাত্র ৪৩,১৭৮৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। এখন পর্যন্ত প্রধান কেন্দ্র হইতে ৫০,০০০৲ টাকা অগ্রিম দিতে হইয়াছে।

২৯শে জুন হইতে ১৭ই আগস্ট পর্যন্ত শিলচর কেন্দ্র হইতে ৪২ কুইণ্টাল চাল, ৯১ কুইণ্টাল আটা, ১৮ কুইণ্টাল ডাল, ২৬ খানি শাড়ি, ২৫ খানি ধুতি, ১০টি লুঙ্গি, প্রায় ১০০ গজ লং-ক্লথ, ১১০৲ টাকা মূল্যের ঔষধ এবং নগদ ১,৮৯২৲ টাকা বিতরিত হইয়াছে। ১২,৩৯০ জন লোক সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছে।

করিমগঞ্জ কেন্দ্র হইতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে টেষ্ট রিলিফ পরিচালিত হইতেছে, তাহা এখন ২০০টি পরিবারে (প্রায় ১,০০০ জনের মধ্যে) সম্প্রসারিত করা হইয়াছে। টেষ্ট রিলিফে নগদ টাকা ও নির্ধারিত অল্প মূল্যে খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হইতেছে।

কাছাড় জেলার বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য ভারতের যে কোন রেলস্টেশন হইতে রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারির নামে করিমগঞ্জ, শিলচর বা বেলুড়ে প্রেরিত দ্রব্যাদি যাত্রী ও মালবাহী ট্রেনে বিনামূল্যে বহন করিতে রেলওয়ে বোর্ড সম্মত হইয়াছেন। আগামী ৩০.১১.৬৬ তারিখ পর্যন্ত এই সুবিধা পাওয়া যাইবে।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ছাত্রদের কৃতিত্ব

জামসেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি পরিচালিত শ্রীরামকৃষ্ণ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে জনৈক ছাত্র এই বৎসর বিহার স্কুল এগজামিনেশন বোর্ডের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠের (পলিটেকনিক) জনৈক ছাত্র এবার ষ্টেট-

কাউন্সিলের ডিপ্লোমা পরীক্ষায় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

বেলুড় বিদ্যামন্দিরে ভ্রাতৃবরণ উৎসব

বিদ্যামন্দিরের বাৎসরিক ভ্রাতৃবরণোৎসব গত ২১শে আগস্ট, ১৯৬৬, রবিবার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সকালে মঙ্গলারতি, ভক্তিমূলক সঙ্গীত, বিশেষ পূজা প্রভৃতির পর নবাগত ছাত্রগণ আচার্যের সহিত একযোগে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও যজ্ঞাগ্নিতে আহুতিপ্রদান করিয়া বিদ্যার্থীব্রত-হোম সম্পাদন করে। বিকালে ছাত্রদের মধ্যে ফুটবল প্রতিযোগিতা, এবং পরদিন সকালে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাঁকুড়া আশ্রমে জন্মাষ্টমী-উৎসব

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বাঁকুড়ায় ২১শে ভাদ্র হইতে চারদিনব্যাপী জন্মাষ্টমী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। রাত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ পূজা, ভোগরাগ, হোম ও শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠের পর প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ২২শে ভাদ্র শ্রীগোপাল নাগের সেতার বাদ্য, ২৩শে গীতিকা শিল্পী-গোষ্ঠীর গীতি-আলেখ্য পরিবেশন এবং ২৪শে ভাদ্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও বাণী আলোচনার ব্যবস্থা ছিল। প্রায় পাঁচশত লোক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

স্বামী প্রত্যগানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে জানাইতেছি যে, গত ২৬শে আগস্ট বেলা ৪টার সময় নিউ দিল্লীতে অল ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল সায়েন্স ইনস্টিটিউটে স্বামী প্রত্যগানন্দ (বিজয় মহারাজ) ৭৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বৎসরাধিক কাল মূত্রাশয়ের পীড়ায় ভুগিতে-ছিলেন। গত ফেব্রুআরি মাসে বৃন্দাবন সেবাশ্রমে তাঁহার প্রসটেট গ্ল্যাণ্ডে অস্ত্রোপচার করা হয়; মাসখানেক ভাল থাকার পর নানা উপসর্গ দেখা দেয় এবং গত জুলাই মাসে পুনরায় তাঁহাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হইলে প্রসটেট-এ ক্যান্সার ধরা পড়ে এবং পুনরায় অস্ত্রোপচার করা হইলেও আরোগ্য লাভের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না।

স্বামী প্রত্যগানন্দ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, ১৯২২ খৃষ্টাব্দে বৃন্দাবনে তিনি রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। দীর্ঘকাল তিনি কাটিহার, ঢাকা, কলিকাতা গদাধর আশ্রম, বেলুড় মঠ প্রভৃতি স্থানে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মীরূপে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সন্ন্যাস-জীবনের অধিকাংশ সময় বৃন্দাবন সেবাশ্রমেই অতিবাহিত হয়।

তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিবিধ সংবাদ

সন্তরণে জিব্রাল্টার, দারদানেলেস ও বসফরাস প্রণালী অতিক্রম

ইংলিশ চ্যানেল ও পক প্রণালী বিজয়ী বিখ্যাত সাঁতারু শ্রীমিহির সেন সন্তরণে জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করিয়াছেন। গত ২৪শে আগস্ট সকাল ৭টা ১৪ মিনিটের সময় জলে নামিয়া ৮ ঘণ্টা ১ মিনিটে দীর্ঘ ২৫ মাইল সাঁতার কাটিয়া তিনি আফ্রিকার উপকূলে মরক্কোর সিউটায় পৌছান। 'পুনটা ওলিভেরস ইয়াজ'-এর শীতল জলে মিহির সেন 'জয় হিন্দ' বলিয়া ঝাঁপাইয়া পড়েন। তারের জালের খাঁচা তৈরী ছিল—খাঁচাটি ১০ ফুট চওড়া ও ৯ ফুট উচ্চ। মিহির সেন প্রথমে খাঁচা ব্যবহার করিবেন না বলিয়া জানাইয়াছিলেন; কিন্তু বেলা প্রায় ১১টার সময় তারের খাঁচা পরিতে বাধ্য হন, কারণ কয়েকটি হাঙ্গর তাঁহাকে তাড়া করিয়াছিল। এই সময় আফ্রিকার তটভূমি বেশী দূরে ছিল না। তীব্র স্রোত ও বাতাসে সাঁতারের অগ্রগতি কিছু পরিমাণে ব্যাহত হয়। তখন তিনি তারের খাঁচার মধ্যে সাঁতার কাটিতেছিলেন। বেলা ৩টা ১৫ মিনিটের সময় আফ্রিকার উপকূলে তিনি লোহার জাল হইতে বাহির হইয়া আসেন। তাঁহার হাতে ছিল ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা।

ইহার পর তিন সপ্তাহের মধ্যেই—গত ১২ই সেপ্টেম্বর রাত্রে তিনি মর্মর সাগর হইতে এজিয়ান সাগর পর্যন্ত সাঁতার কাটিয়া দারদানেলেস প্রণালী সন্তরণে পৃথিবীর প্রথম সাঁতারুর সম্মান লাভ করিয়াছেন। ইহার পূর্বে আর কেহই সন্তরণে দারদানেলেস প্রণালী অতিক্রম করেন নাই। সমুদ্রবক্ষে সাঁতার কাটিয়া ৩২ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করিতে শ্রীসেনের ১৩ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট সময় লাগে।

মিহির সেন পশ্চিম কূলের গ্যালিপলি হইতে সাঁতার আরম্ভ করেন এবং ১৩ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট পর একই কূলে জল হইতে উপরে উঠিয়া আসেন। সাঁতারের পর তিনি বলেন, 'ভয়ঙ্কর কষ্টসাধ্য সাঁতার। সমুদ্রের শীতল জল ও প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে আমাকে কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে।' রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণন শ্রীমিহির সেনকে অভিনন্দন জানাইয়া একটি বাণীতে বলেন—

'আর একটি বীরত্বসূচক কৃতিত্বের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনার এই গৌরবময় দুঃসাহসিক কার্যের জন্য আমরা সকলেই গর্বিত।'

গত ২১শে সেপ্টেম্বর তিনি পুনরায় সন্তরণে অবতীর্ণ হন। এই দিন তিনি চার ঘণ্টারও কম সময়ে কৃষ্ণসাগরের রুমেলিফেনার হইতে মর্মর সাগরের লিনডারস টাওয়ার পর্যন্ত ১৬ মাইল সাঁতার কাটিয়া বসফরাস প্রণালী লম্বালম্বি ভাবে অতিক্রম করিয়াছেন।

ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী সন্তরণবীর শ্রীমিহির সেন সন্তরণে পক প্রণালী অতিক্রম করিবার অনতিকাল পরেই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে জিব্রাল্টার, দারদানেলেস ও বসফরাস প্রণালী অতিক্রম করিয়া এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার সাত সমুদ্র অভিযানের স্বপ্ন সফল হইল। ভারতবাসী মাত্রই তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত।

বড়বিলে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

বড়বিল (কিয়ণঝড়) : গত ১লা মার্চ হইতে ৪ঠা মার্চ পর্যন্ত উড়িষ্যায় বড়বিলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই কয়দিন স্থানীয় বিশিষ্ট বক্তাগণ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। উড়িষ্যা মাইনিং কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রীশ্যামলকুমার ঘোষ, বার্ড কোম্পানির ম্যানেজার শ্রীএন. এস. ক্লেয়ার, সাবডিভিসনাল অফিসার শ্রীপ্রমোদকুমার পট্টনায়ক, ডাঃ সৎপতি, রুঙ্গঠে কোম্পানির স্থপারিণ্টেনডেণ্ট শ্রীযুক্ত শ্রীবাস্তব এবং আরও অনেকে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। বেলুড় মঠের স্বামী জীবানন্দজী মহারাজ ৩রা মার্চ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে যুগোপযোগী আলোচনা করেন। পরের দিন তিনি গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের ভজন সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি পাঠ করেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী এবং তাঁহার প্রতিকৃতি সম্বলিত একটি পুস্তিকা এই সময় বিতরণ করা হয়। উৎসবের পর হইতে নিয়মিতভাবে মাসে একবার করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের এবং স্বামীজীর প্রসঙ্গে আলোচনা সুরু করা হইয়াছে।

প্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেহত্যাগ

গত ২০শে আগস্ট শনিবার কলিকাতায় ২৪ পরগনা জেলার চায়ঘাট-নিবাসী পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণ দেশসেবী বিশিষ্ট জননেতা প্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৭৭ বৎসর বয়সে জীবনাবসান হয়।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। ২৪ পরগনা জেলার টাকীতে আশ্রম স্থাপনে উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। এই কেন্দ্রটি পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

প্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বহরমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর প্রথমে তিনি আলীপুর কোর্টে ও পরে বসিরহাট মহকুমা আদালতে আইন ব্যবসায় সুরু করেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে তিনি আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। উহার বিভিন্ন পর্যায়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া তিনি একাধিকবার কারাবরণ করিয়াছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে তিনি সর্বপ্রথম ২৪ পরগনা জেলায় কংগ্রেস কমিটি গঠন করেন এবং উহার সম্পাদক ও সভাপতিরূপে নেতৃত্ব করেন। প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল ধরিয়া তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁহার ত্যাগ ও সেবার জন্য তিনি সর্বত্র সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও পরোপকার-প্রবৃত্তি সকলকে মুগ্ধ করিত।

তিনি এক পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রথমা ও তৃতীয়া কন্যা শ্রীসারদা মঠে যোগদান করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন।

ওঁ শান্তিঃ! ওঁ শান্তিঃ!! ওঁ শান্তিঃ!!!

দিব্য বাণী

হরগৌর্যষ্টকম্—(শঙ্করাচার্য)

কস্তুরিকাচন্দনলেপনায়ৈ, শ্মশানভস্মাঙ্গবিলেপনায়।
সৎকুণ্ডলায়ৈ ফণিকুণ্ডলায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥১
মন্দারমালাপরিশোভিতায়ৈ, কপালমালাপরিশোভিতায়।
দিব্যাম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥২
চলৎক্বণৎকঙ্কণনূপুরায়ৈ, বিভ্রৎফণাভাস্বরনূপুরায়।
হেমাঙ্গদায়ৈ চ ফণাঙ্গদায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥৩

অর্ধ অঙ্গ কস্তুরিকা- ও চন্দন-বিলেপিত,
অর্ধ অঙ্গ—অপরার্ধটি—শ্মশান-ভস্ম-সিত।
একদিকে দোলে মণিকুণ্ডল, অপর কর্ণে ফণীকুণ্ডল দোলে,
(একই দেহে দেখি হর-গৌরীরে —যেন—উর্মি-বিকাশ চেতনা-সায়রে),
প্রণমি সেথায় শিবা ও শিবের যুগ্ম-চরণতলে ॥১
মন্দার-মালা-শোভিতা শিবানী, কপাল-মাল্যে শোভিত মহেশ্বর,
দিব্য বসনে ভূষিতা জননী, মহেশ দিগম্বর।
(অর্ধ অঙ্গ হেরি গৌরীর, অর্ধ অঙ্গ শশী-মৌলির)—
নমি শিবা-শিব মিলিয়া যেথায় (অর্ধ-নারীশ্বর) ॥২
একটি চরণে সোনার নূপুর রুণুঝুণু রবে বাজে,
অপর চরণ বেড়িয়া বেড়িয়া ফণা তুলি' ফণী রাজে।
হেম-অঙ্গদে সুশোভিতা মাতা, ফণা-অঙ্গদ-বিভূষিত পিতা,
নমি শিবা-শিবে, (যুগ্ম চরণ হেরি যেন হৃদি-মাঝে) ॥৩

বিলোলনীলোৎপললোচনায়ৈ, বিকাশিপঙ্কেরুহলোচনায়।
ত্রিলোচনায়ৈ চ বিষমেক্ষণায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥৪
প্রপন্নভক্তে (প্রপন্নপৃষ্ঠে) সুখদাশ্রয়ায়ৈ, ত্রৈলোক্যসংহারকতাণ্ডবায়।

কৃতস্মরায়ৈ বিকৃতস্মরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥৫
চাম্পেয়গৌরার্ধশরীরকায়ৈ, কর্পূরগৌরার্ধশরীরকায়।
ধম্মিল্লবত্যৈ চ জটাধরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥৬
অম্ভোধরশ্যামলকুন্তলায়ৈ, বিভূতিভূষাঙ্গজটাধরায়।
জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥৭
সদা শিবানাং পরিভূষণায়ৈ, সদাশিবানাং পরিভূষণায়।
শিবান্বিতায়ৈ চ শিবান্বিতায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥৮

বিলোল-নীল-ফুল্লোৎপল-নয়না জননী শিবা,
শিব-আঁখি যেন বিকাশোন্মুখ পঙ্কজ মনোলোভা।
শিবানীর স্নেহমাখা ত্রিনয়ন, ত্রিনয়ন-যুত শিবের আনন,
নমি শিবা-শিব-শ্রীপদে, যেথায় যুক্ত-রক্তবিভা ॥৪

অর্ধ অঙ্গে শরণাগত ভক্তেরে সুখদাত্রী
আশ্রয় দেন স্নেহভরে সদা জননী জগদ্ধাত্রী ;
ত্রিলোক-ধ্বংসী তাণ্ডবে রত অপর অর্ধ সদা।
একদিকে লভে মদন জনম, অপর দিকেতে তৃতীয় নয়ন
মদনান্তক জ্বলে ধক ধক একই সঙ্গে যেথা,
শিবা ও শিবের যুগ্ম-চরণে নতশির হই সেথা ॥৫

স্বর্ণ-চাঁপার কনক-আভায় অর্ধ অঙ্গ দীপ্ত,
অপরার্ধটি কর্পূর-সিত গৌর-কান্তি-লিপ্ত।
একদিকে দোলে অপরূপ বেণী, অপরদিকেতে জটাজাল, ফণী,
শিবা ও শিবের চরণে প্রণমি শ্রীপদ-রজানুলিপ্ত ॥৬

জলদশ্যামল-কুন্তলদল-ধারিণী জননী শিবা,
বিভূতিভূষিত হরশিরে শোভে পিঙ্গল জটা কিবা!
একই দেহে দুই—জগতের মাতা, আদি ও একক জগতের পিতা—
প্রণমি সেথায় শিবা ও শিবের শ্রীচরণে মনোলোভা ॥৭

অর্ধ অঙ্গ সব-মঙ্গল-ভূষণস্বরূপ যাঁর
অপরার্ধটি অমঙ্গলেরও ভূষণ-স্বরূপ তাঁর ;
শিবের সঙ্গে মিলিতা শিবারে, শিবার সহিত মিলিত শিবেরে—
একই দেহে লীন মাতা ও পিতারে—প্রণমি বারংবার ॥৮

কথা-প্রসঙ্গে

ছাত্র-বিক্ষোভ

দেবী সরস্বতীর আনুষ্ঠানিক পূজায় ছাত্রগণ সর্বত্র উৎসাহে ভরিয়া উঠে। পূজা কিন্তু ফুল বেলপাতা দিয়াই সবটা হয় না, আসল পূজা হইল মায়ের প্রসাদলাভের—জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টা; শুধু অপরা বিদ্যা নয়, জীবনকে সফলতম করিবার জন্য পরাবিদ্যাও লাভের চেষ্টা। এ পূজা, আসল পূজা, প্রতিদিনের। ছাত্রগণ আজ যেভাবে চলিতেছে, জীবনের গতি সেদিকেই অব্যাহত রাখিলে মা সরস্বতী তাহাদের পূজোপহার গ্রহণ করিবেন কি?

সারা দেশ আজ ছাত্র-বিক্ষোভে সংক্ষুব্ধ। সুদীর্ঘ কয়েক মাস ধরিয়া কোন না কোন অজুহাতে এই বিক্ষোভ চলিতেছে; দেখিয়াশুনিয়া মনে হয়, পড়াশুনা বোধ হয় ছাত্রজীবনের একটি অনত্যাবশ্যক কর্তব্য মাত্র, তাহাদের প্রধান কর্তব্য যেন আন্দোলনে যোগ দেওয়া। (বর্তমান যুগের একটি অতি ছোট ঘটনা মনে পড়িতেছে, যাহার একটি বর্ণও অতিরঞ্জিত নহে। আমাদের পরিচিত এক ভদ্রলোকের ৪।৫ বছর বয়স্ক পুত্র একদা তাঁহাকে ধরিয়া বসিল, 'আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দাও।' পিতা শুনিয়া স্বভাবতই আনন্দিত হইয়া বলিলেন, 'থাক না আরো কয়েকমাস, এখন তো খুব ছোট তুমি।' ছেলেটি উত্তর দিল, 'না আর দেরী কোরো না। আমার স্ট্রাইক করতে ইচ্ছে হচ্ছে—স্কুলে ভর্তি না হলে তো স্ট্রাইক করতে পারবো না।') শিক্ষাব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করিয়া আন্দোলন সৃষ্টি করাই যেন ছাত্রদের প্রধান কাজ এখন, অথবা তাহাদের দিয়া এরূপ করানোই নেতাদের কর্তব্য; আর, এ-দুটির যেটিই বিক্ষোভপ্রদর্শনের প্রধান কারণ হউক, অতিপ্রয়োনীয় জ্ঞানে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দানের অবসর বা প্রয়োজনও যেন সরকারের নাই। নতুবা গত গ্রীষ্মাবকাশের পূর্ব হইতেই শিক্ষা-ব্যবস্থায় যে গণ্ডগোল সুরু হইয়াছিল, গ্রীষ্মাবকাশের মধ্যে ও পরে তজ্জনিত ক্ষতি পূরণ করা তো দূরের কথা, হৈ চৈ করিয়া সে গণ্ডগোলকে জিয়াইয়াই রাখা হইল। আর, ছাত্রদের ভবিষ্যৎকে—অন্ততঃ একটি বর্ষকে তো বটেই—দগ্ধ করার সে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দান করাও ছাত্রগণের পক্ষে অতি মূল্যবান এই কয়েকমাসের মধ্যেই অনিবার্য হইয়া পড়িল শিক্ষকগণের এবং শিক্ষায়তনের কর্মীদের। দেশের ভবিষ্যৎ যাহারা, তাহাদের ভবিষ্যতের বহ্ন্যুৎসবে এককালে সকলের সোৎসাহে যোগ-দান ইহার পূর্বে আর কখনো এভাবে হইয়াছিল কি না জানি না।

ছাত্রআন্দোলানের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, তাহার সীমা এবং মাত্রাও আছে। সীমাজ্ঞান, মাত্রাজ্ঞান আজ আমরা যেন সকলেই হারাইয়া ফেলিয়াছি, সেই সঙ্গে সংবেদনশীলতাও। আমাদের সকলেরই কল্যাণের জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার গুরুত্ব যে কতখানি, সে বিষয়ে আমাদের কাহারো কোনরূপ সজাগতা আছে বলিয়াই মনে হয় না; আর-পাঁচটা আন্দোলনের সমপর্যায়েরই যেন এটি।

ছাত্র-বিক্ষোভ বন্ধ করার জন্য সরকারের পক্ষ হইতে এতদিনে তীব্র সজাগতা আসিয়াছে। কিন্তু তাহা কতখানি ছাত্রদের কল্যাণ-চিন্তা-সম্ভূত, আর কতখানি শাসনব্যবস্থার বিপর্যয়-

নিরোধচিন্তা-সম্ভূত—তাহা সর্বক্ষেত্রে সঠিক করিয়া বলা কঠিন। দুইটিরই প্রয়োজন আছে নিঃসন্দেহ, কিন্তু প্রথমটির গুরুত্বই সর্বাধিক। আন্দোলনে রূপায়িত হইবার বহু পূর্বেই তাহার কারণটিকে যে নিবারণ করা একান্ত প্রয়োজন, একথা মনে উদিত হইতে আমাদের এত সময় লাগিল কেন? ডক্টর রাধাকৃষ্ণন ছাত্রগণের যথার্থ কল্যাণকামী ও দরদী বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এ বিষয়ে তিনি যে সব কথা বলিয়াছেন, বা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ সভা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেগুলি অবিলম্বে কার্যে পরিণত করা প্রয়োজন। কিন্তু উহা করিতে কতদিন লাগিবে (যদি একান্তই করা হয়), কে জানে।

ছাত্রদের আদর্শানুগ করিতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন এমন শিক্ষকের সাহচর্য, যেখান হইতে সে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে জীবন-নিয়ন্ত্রণক্ষম সদ্ভাব আহরণ করিতে পারে। পাশে আগুন জ্বলিলে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক তাহার কিছুটা তাপ সমীপাগতের শরীরে প্রবেশ করিবেই। শিক্ষকের জীবন যদি আদর্শের 'জ্বলন্ত পাবক সদৃশ' হয় (এরূপ হওয়ার প্রয়োজনের কথা স্বামীজী বহু পূর্বেই বলিয়া গিয়াছেন এবং ইহাই ভারতের জাতীয় শিক্ষাদর্শের গোড়ার কথা), তাহা হইলে ছাত্রগণের জীবন আপনা হইতেই আদর্শানুগ ও উন্নত হইবেই। অবশ্য চিত্ত যেখানে বরফের মত ঠাণ্ডা সেখানকার কথা আলাদা; কিন্তু সৌভাগ্যের কথা, সেরূপ চিত্তের অধিকারী মানুষ জগতে অতি অল্পই থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ জীবনের উপর জীবনের প্রভাব-সম্বন্ধে পাশ্চাত্যে একবার বলিয়াছিলেন, কয়েক সহস্র যুবক যদি কেবল সংযত আদর্শ জীবন যাপন করে তাহা হইলে তাহারই প্রভাবে সমাজ হইতে সব দোষ চলিয়া যাইবে, ইহার জন্য কাহাকেও কোন উপদেশ দিতে হইবে না, সভা করিয়া বক্তৃতাও করিতে হইবে না। তিনি পওহারী বাবাকে একদা বলিয়াছিলেন যে, এত বিপুল শক্তির অধিকারী হইয়াও তিনি উহা লোক-কল্যাণে নিয়োজিত করিতেছেন না কেন—মৌনী ও গুহাবাসী না থাকিয়া লোকের সহিত মিশিয়া তাহাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করেন না কেন? উত্তরে পওহারী বাবা বলিয়াছিলেন, লোকের মানসিক উন্নতি-বিধান করিতে হইলে তাহাদের সহিত যে মিশিতেই বা আলাপ করিতেই হইবে, এমন কি কথা আছে! স্বামীজী বলিয়াছেন, কথাটি যে কত সত্য তাহা বুঝা যাইত, যে গুহায় পওহারী বাবা বাস করিতেন তাহার চারিপাশের লোকের তৎকালীন মনের অবস্থা হইতেই। জীবনের প্রভাবই যে জীবনের উপর সর্বাধিক ক্রিয়াশীল, ইহা অতি সত্য কথা। আমরা আজ তাহা বুঝিতেছিও। কিন্তু এখনি বলামাত্র তো শিক্ষকদের জীবন ইচ্ছানুরূপ গঠন করা যাইবে না—প্রথম হইতে চেষ্টা করিলে হইত। কিন্তু একটি কাজ আমরা এখনি করিতে পারি—কেন যে তাহা করা হইতেছে না, জানি না। সদ্‌গ্রন্থপাঠ সৎসঙ্গেরই কাজ অনেকখানি করে—যাঁহাদের জীবনে যে আদর্শ রূপায়িত হইয়াছে তাঁহাদের কথায় বা লেখায় একটা বিশেষ ধরনের জোর থাকে সেই আদর্শকে অপরের মনে গাঁথিয়া দিবার। আমাদের দেশের যে সব গ্রন্থ হইতে—আর সব কিছু ছাড়িয়া দিলেও গীতা এবং স্বামীজীর বাণী হইতে—জীবন গঠনের শক্তি আহরণ করিয়া কত দিকপাল জীবন গঠন করিলেন (আমরা আজ যতখানি উন্নত হইয়াছি, তাহা তাঁহাদেরই জীবনান্ত সাধনার ফলে), সেগুলি কেন, বা কিসের ভয়ে যে এখনো

অবশ্যপাঠ্য করা হইতেছে না, তাহা জানি না। বেদান্তের নির্যাস-স্বরূপ গীতা, আর, আধুনিক যুগোপযোগী ভাব ও ভাষায় স্বামীজী যে সব কথা বলিয়া গিয়াছেন, যাহার মধ্য হইতে দেশবিদেশের বহু লোক জীবনগঠনের জন্য শক্তি আহরণ আজও করিতেছেন, সেগুলিই বা অবশ্যপাঠ্য না হইবার কারণ কি? যাহা আমরা চাহিতেছি—দেশের এবং ছাত্রদের ব্যক্তি-গত জীবনের কল্যাণের জন্য বর্তমান কালের যুবসমাজকে গোটা পৃথিবীব্যাপী অসংযত ভাব হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদের মানুষ করা—তাহা করিতে একমাত্র সক্ষম আদর্শ জীবনের সংস্পর্শ, আদর্শকে যুক্তিগ্রাহ্য ও আধুনিক মনের গ্রহণোপযোগী করিয়া তাহার পরিবেশন এবং আদর্শ জীবনের কিঞ্চিৎ আনন্দাস্বাদন। আদর্শ জীবনের পরেই এ বিষয়ে গীতা ও স্বামীজীর কথা ভাবপরিবেশনের পক্ষে সর্বাধিক ফলপ্রসূ হইবেই হইবে। স্বামীজীর কথা গীতা-উপনিষদেরই যুগোপযোগী ভাষ্য এবং তাহা সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ, সর্বজনীন। যুবমনের বর্তমান অবনতি উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশের যুবমনের অবনতির তুলনায় অনেক কম। তখন প্রাণের জাগ্রত ভাবের অভাব ছিল, রাজসিকতার অভাব ছিল। সাধারণভাবে ছেলেরা ভাল থাকিত, শান্ত সুবোধ থাকিত তামসিকতা-সঞ্জাত মনোভাবের প্রভাবে, তাহারা নিয়ম মানিয়া চলিত ভয়ে ও শক্তিহীনতায়। উহাকে মনের উন্নত অবস্থা বলা চলে না। এখন জগৎ জুড়িয়া মানবাত্মার মুক্তির সুর বাজিতেছে, মানুষের তামসিকতা ব্যাপকভাবে সরিয়া গিয়া রাজসিকতাকে আসন ছাড়িয়া দিতেছে (অবশ্য যেখানে তাহার অভাব ছিল)। জগৎ জুড়িয়া বিভিন্ন আন্দোলন ও বিক্ষোভ-প্রদর্শন এই মুক্তি-ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ। সে দিক দিয়া বিচার করিলে ভয়ে প্রতিবাদ না করা অপেক্ষা অবাঞ্ছিত প্রতিবাদ এবং অন্দোলনও করা ঢের ভাল। এখন প্রয়োজন, একমাত্র প্রয়োজন অবাঞ্ছিত অকল্যাণকর পথে জাগ্রত বা জাগরণোন্মুখ রাজসিকতার উচ্ছৃঙ্খল অপচয় রোধ করিয়া উহাকে প্রয়োজনমত কল্যাণকর্মে নিয়োজিত করা—যৌবনের বিপুল-উচ্ছ্বসিত প্রাণধারাকে বাঁধ দিয়া ধরিয়া সুনির্দিষ্ট, সুপরীক্ষিত কল্যাণের খাতে উহাকে প্রবাহিত করানো।

এখনই একাজটি আরম্ভ করা যায় যুক্তিসম্মত সচ্চিন্তা পরিবেশনের মাধ্যমে। স্বামীজীর কথাগুলিই আধুনিক যুগে নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ সচ্চিন্তা। চিন্তাই কর্মের নিয়ন্তা। যে-চিন্তা টলষ্টয়ের মত মনীষীকে, বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে, রাজসিকতার তীব্র সুরায় উন্মত্ত অসংখ্য পাশ্চাত্য-বাসীকে একদা প্রভাবিত করিয়াছে, ভারতীয় জাতিকে তাহার তামসিকতাচ্ছন্ন নিম্নতম অবস্থা হইতে টানিয়া তুলিয়াছে, অগ্নিযুগের যুবকদের প্রভাবিত করিয়াছে, সুভাষচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতিকেও প্রভাবিত করিয়াছে, তাহা কি ইহারই মধ্যে শক্তিহীন হইয়া পড়িল, না তাহা অপেক্ষা উচ্চতর চিন্তা ইহারই মধ্যে জগতে উদ্ভূত হইয়াছে? যাহা যথার্থ জীবনপ্রদ, যাহা প্রগতিশীল জাগ্রত যুব-মনে রেখাপাত করিতে সক্ষম, যাহা সর্ব সম্প্রদায়ের, তাহা হইতে যুবক-গণকে ঔদাসীন্যবশতঃ বা ইচ্ছা করিয়া বঞ্চিত রাখা শুধু অশোভন বা অযৌক্তিক নয়, অত্যন্ত অন্যায়। কেবল শিল্প-বিজ্ঞানাদিতে কিছু জ্ঞানলাভ করিয়া, মিন্‌মিন্‌-পিন্‌পিন্‌ করিয়া পৌরুষকে ঝিমাইয়া দেওয়া কবিতা আবৃত্তি করিয়া বা গান গাহিয়া, গল্প উপন্যাস পড়িয়া, এবং সিনেমা দেখিয়া যদি 'মানুষ' তৈয়ারী হইত, তাহা হইলে দেশে আজ

অমানুষ খুঁজিয়া পাওয়াই দায় হইত। তাহা হইলে কোন তথাকথিত সুসভ্য জাতিই আজ রাসায়নিক বা আণবিক অস্ত্র-শস্ত্র উৎপাদন করিবার বা ব্যবহার করিবার চিন্তাও করিতে পারিত না।

শিক্ষায়তন পবিত্র স্থান। জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী সর্বশুক্লা; পবিত্রতা ও জ্ঞানের প্রতীক এই শুক্লবর্ণ। এই অমল-ধবল আবহাওয়ায় পুলিশপ্রবেশের কল্পনা, আর মা সরস্বতীর কমলবনে একদল পুষ্পাহারী ছাড়িয়া দেওয়ার কল্পনা প্রায় সমভাবেই অচিন্তনীয়। শিক্ষায়তনে পুলিশ প্রবেশ করিবে না—এ সিদ্ধান্ত তাই সাগ্রহে বরণীয়। কিন্তু সেই সঙ্গে এই কথাটিও সমপরিমাণ আগ্রহের সহিতই চিন্তা করিতে হইবে—"তাই বলিয়া অপ্রতিরোধশীল হইয়া শিক্ষায়তনকে অপরাধমূলক কর্মের আড্ডা হইতেও দেওয়া যায় না।" দুইটি দিকই সমভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে আজ। শিক্ষায়তনে পুলিশের প্রবেশ নিশ্চয়ই অন্যায়—যেমন অন্যায় মন্দিরে বা মস্‌জিদে তাঁহাদের প্রবেশ। কিন্তু মন্দির বা মস্‌জিদ যদি কোন কারণে ভগবদ্‌ভক্তগণের সহিত দুর্বৃত্তগণেরও আশ্রয়স্থল হইয়া উঠে, সেখানে যদি পূজাবেদীর পাশে আরাধনার সামগ্রীর সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রও রহিয়াছে দেখা যায়, তখন শান্তিরক্ষকের কর্তব্য কি হইবে? ঠিক এই ঘটনাই ঘটিতেছে আজকালকার শিক্ষায়তনগুলিতে; উহা রাজনীতিরও স্থান হইয়া উঠিতেছে, এবং আমরা সকলেই দেখিয়াছি, কখনো কখনো দুর্বৃত্তপনারও। সেক্ষেত্রে কর্তব্য কি? এই সমস্যার একমাত্র সুষ্ঠু সমাধান—শিক্ষায়তনে অনবদ্য পবিত্র পরিবেশ পুনরায় ফিরাইয়া আনা, যেখানে অন্য কোন ভাব উঁকি মারিতেও কুণ্ঠা বোধ করিবে। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বারে বারে প্রাচীন ব্রহ্মচর্য আশ্রমের পুনঃপ্রবর্তনের কথা বলিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন শিক্ষায়তনের তরুতল-ছায়াচ্ছন্ন তৃণাসন প্রয়োজন নাই, অট্টালিকা-মধ্যে টেবিল-চেয়ার চলিবে, কিন্তু সেই শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশটুকু, গুরু-শিষ্যের মধ্যে সেই অনবদ্য অমৃতোপম সহানুভূতিময় স্নেহমাখা ভাবটুকু সেখানে থাকা চাই-ই; থাকা চাই সেই আদর্শ-প্রিয়তা, সংযম, বিলাসিতা-বর্জন এবং জ্ঞান-লাভেচ্ছু ও জ্ঞানদানেচ্ছু একাগ্র হৃদয়। আর ভাল হয় শিক্ষায়তনগুলিকে বাহিরের হট্টগোল হইতে একটু দূরে রাখিতে পারিলে। যদি আমরা তাহা করিতে পারি, তাহা হইলে সভা ডাকিয়া সিদ্ধান্ত লইতে হইবে না—শিক্ষায়তনে পুলিশ প্রবেশ করিবে কি করিবে না। এক্ষেত্রে সদ্-গ্রন্থ পাঠ ও সচ্চিন্তার সহিত আরো দুটি জিনিস এগুলির সহায়করূপেই প্রয়োজন—সৎসঙ্গ ও সৎকর্ম। শিক্ষায়তনে পুলিশ ঢুকিবে কি না, একথা আজ যতখানি উদ্বিগ্ন হইয়া আমাদের চিন্তা করিতে হইতেছে, ততখানি উদ্বিগ্ন হইয়াই দেখা প্রয়োজন শিক্ষায়তনের পবিত্র পরিবেশের পক্ষে হানিকর বিপরীত চিন্তাশীল, বিপরীত ভাব প্রচারকারী কোন ব্যক্তিই যেন শিক্ষায়তনে প্রবেশাধিকার না পায়। এই পথরোধ করার চেষ্টা এখনি করা সম্ভব। পৃথিবীর সর্বোচ্চ চিন্তাগুলি সেখানে চারিদিক হইতেই আসুক (না আসাই খারাপ), কিন্তু শিক্ষাধরাকে কার্যতঃ যেন তাহা ব্যাহত করিতে না পারে। আর, ছাত্রজীবনের উদ্দেশ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে সদালোচনার জন্য অন্ততঃ সপ্তাহে একটি করিয়া আবশ্যিক ক্লাসের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। আবশ্যিক না হইলে অধিকাংশ ছাত্রই সদ্‌গ্রন্থ-

পাঠের মত সদালোচনা হইতেও দূরে থাকিতে চাহিবে। অবশ্য এ প্রচেষ্টা সার্থক হইবে, যখন আবশ্যিক না হইলেও কিছুদিন পর রস পাইয়া তাহারা স্বেচ্ছায় ইহাতে যোগদান করিবে তখনই, এবং তাহা হইবেই।

ছাত্র-বিক্ষোভ যে রূপ লইয়া যেভাবে আজ ক্রমশঃ ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে, আমাদের সকলেরই প্রাণপণে ইহার প্রতিকারে তৎপর হওয়া প্রয়োজন। এখানে কর্তব্য সকলেরই আছে, নেতাদের আছে, দেশ শাসকদের, ছাত্রদের ও অভিভাবকদের আছে, প্রত্যেক দেশবাসীরই আছে। কারণ, আমরা প্রায় সকলেই, বিশেষ করিয়া নেতারা, ইহার জন্য কমবেশী দায়ী। ভালবাসা ও সহানুভূতি লইয়া এ কার্যে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে, তা দেখিয়া ভয় পাইবার কিছু নাই। যৌবনে শক্তির বিকাশ এত অধিক হয় যে, উহার বহিঃপ্রকাশের একটি পথ চাই-ই চাই; পথ না পাইলে বরং তাহা ক্ষতিকরই হইতে পারে। আমরা যুবমনের উত্তাল শক্তিপ্রবাহকে প্রবাহিত হইবার জন্য কল্যাণের পথ দেখাইতে পারিতেছি না, উহা বিপথে যথেচ্ছ প্রবাহিত হইতেছে—ইহাতে দোষ কাহার বেশী? এই প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেশের নিরক্ষরতা সহজেই দূরীভূত করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহা কয়েকবার আমাদের চিন্তাতে আসিলেও এখনো কর্মপরিণত হইল না। বহুবিধ সমাজকল্যাণের কাজে, আত্মোন্নতির কাজে প্রবাহিত হইবার পথ পাইলে যুবশক্তি যে দেশের পরম কল্যাণসাধনে সক্ষম তাহা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু জানিয়াও তাহার ব্যবস্থা কিছু করিতেছি না। আর, ইংরেজ-শাসনের সময় গীতা ও স্বামীজীর কথা একদিন পড়িতে হইত লুকাইয়া লুকাইয়া। তখন এগুলিকে পাঠ্য করিবার উপায় ছিল না। কিন্তু এখন তো আমাদের হাতেই সব—অথচ ভাগ্যের এমনই পরিহাস, নিশ্চিত পথের নির্দেশ সেখানে থাকা সত্ত্বেও আমরা এগুলিকে আজ সযত্নে পরিহার করিয়া চলিতেছি ভারতের যিনি ভাগ্যবিধাতা, যাঁহার দৃষ্টি 'ঘোরতিমিরঘন নিবিড় নিশীথে'ও আমাদের কল্যাণ সাধনে সজাগ ছিল—তাঁহার চরণে আজ দেশের যুবকগণের কল্যাণ কামনায়, জাতির কল্যাণ কামনায় সকলের হইয়া প্রার্থনা জানাই—"তমসো মা জ্যোতির্গময়"।

নরনারায়ণস্তোত্রম্

শ্রীওট্টুর্ উন্নি নম্মুতিরিপ্পাদ্ বিরচিতম্

[পূর্বানুবৃত্তি]

আশৈশবাদুন্মিষিতং নরেন্দ্রে
বিশ্বোত্তরং সদ্‌গুণপুষ্কলত্বম্।
প্রাগল্‌ভ্যমোজশ্চ বিলোক্য কেচিৎ
তং মেনিরে দেবকলাংশভূতম্ ॥ ১৩

গদাধরস্যাংঘ্রিতলাৎ পতন্ত্যা
বিশুদ্ধবিজ্ঞানসুরাপগায়াঃ।
মহাজবং ধারয়িতুং নরেন্দ্রা-
ন্মৃড়াবতারাদিতরঃ ক ঈষ্টে ॥ ১৪ ॥

মোহাব্ধিজাতং জগতোঽখিলস্য
সংসারদুঃখাত্মককালকূটম্।
ভোক্তুং প্রদগ্ধুং চ নরেন্দ্রনাথা-
দীশাংশভূতাদপরঃ ক ঈশঃ ॥ ১৫ ॥

প্রব্রজ্য গূঢ়ং বিপিনং যিযাসুং
শিষ্যোত্তমং প্রাগিব পাণ্ডুসূনুম্।
দিব্যোপদেশৈস্ স জগদ্বরিষ্ঠো
নিষ্কামকর্মোন্মুখমেব চক্রে ॥ ১৬ ॥

নরো হি নারায়ণ এব সাক্ষা-
দিতীমমাম্নায়সমর্থিতার্থম্।
প্রকাশয়ন্ কর্মভিরাবিবেশ
গদাধরো হন্ত নরেন্দ্রদেহম্ ॥ ১৭ ॥

যথা নরেন্দ্রে স্বমহো নিধায়
লয়ং প্রপেদে ক্ষুদিরামসূনুঃ।
তথৈব সর্বাং মমতামহন্তাং
সমর্প্য শিষ্যোঽপি গুরৌ বিলিল্যে ॥১৮

নরেন্দ্রনাথস্য গদাধরেণ
সমাগমোঽয়ং পরিলালসীতি
যথা মহাদেবমুকুন্দযোগো
যথা চ গঙ্গাযমুনাপ্রসঙ্গঃ ॥ ১৯ ॥

সন্দেশমাদায় গুরোঃ সমুদ্রং
তীর্ত্বা প্রয়াতঃ স নরেন্দ্রনাথঃ।
দিব্যাঙ্গুলীয়ং প্রতিগৃহ্য রামা-
ল্লঙ্কাং গতং স্মারয়তে কপীন্দ্রম্ ॥২০॥

পার্থো নরেন্দ্রাকৃতিমাদদানো
নূত্নে মহাভারতধর্মযুদ্ধে।
কৃষ্ণস্য চন্দ্রাসুতবিগ্রহস্য
সারথ্যসাহ্যেন জয়ং প্রপেদে ॥ ২১ ॥

শুদ্ধার্ষসংস্কারমহাম্বুরাশিং
কাৎস্ন্যেন নির্মথ্য গদাধরেণ।
নিষ্পাদিতাং জ্ঞানসুধাং নরেন্দ্রো
দেবাসুরান্ পায়য়তে স্ম সর্বান্ ॥ ২২

অস্মাৎ প্রবোধামৃতকুম্ভবাহা-
দ্ধন্বন্তরের্নব্যতমাবতারাৎ।
নৃণাং মহারোগনিদানবেত্তা
বৈদ্যো নু কোঽন্যোঽস্তি নরেন্দ্রনাথাৎ।

বিমোহজাতাং সুদৃঢ়ামবজ্ঞাং
নিরস্য পাশ্চাত্যজনাবলীনাম্।
অপারভক্তিং ভরতস্য বর্ষে
প্রবোধনেনাজনয়ন্নরেন্দ্রঃ ॥ ২৪ ॥

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

[স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে লিখিত]

(১)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা। 57, R. K. Bose St., 1st. June, 1897

My Dear Swami,

তোমার এক পত্র পাইয়া বিস্তারিত অবগত হইলাম। তোমাদের কাজের কথা শুনিয়া মনে বড় আনন্দ হইল। স্বামীজী তোমাদের পত্র পাইয়াছেন, আমাকে জবাব দিতে বলিয়াছেন। তাঁহার শরীর তত ভাল নাই বলিয়া চিঠিপত্র বেশী লেখেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা যে, কাগজে লেখা। বাস্তবিক, কাগজে লেখা হইলে আমরা fund-র জন্য subscription তুলিতে পারিব, কারণ কেহ জানে না সেখানে তোমরা কিরূপ কার্য করিতেছ।...অতএব তোমরা যত শীঘ্র পার correspondence Mirror এবং Patrika-য় পাঠাইবে। তোমাদের correspondence বাঙ্গলা এবং ইংরাজীতে বাহির হইলে চাঁদার চেষ্টা করা যাইবে।...Brahmavadin office হইতে চেষ্টা হইতেছে। Mirror-এতে তোমাদের চিঠি অনুযায়ী শীঘ্র একটা notice যাহাতে দেওয়া হয় তাহার চেষ্টা হইতেছে। টাকা পাঠাব কার care-এ তাহা লেখ নাই বলিয়া পাঠান হয় নাই। আমি নিত্যানন্দকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছি একটা care-এ না দিলে গোল হইবে। কিন্তু তাহা করিলে না, অদ্য ৯৫৲ টাকা পাঠান গেল, পাইবা-মাত্র acknowledge ক'রো, ৫৲ টাকা ওখানে একজন ব্রাহ্মণকে দেওয়া হইবে।

মঠে স্বামীজী যেরূপ নিয়ম করিয়াছেন সেইরূপ চলিতেছে। রামকৃষ্ণানন্দ Madras গিয়াছে। বুড়া Dinanath N. W. যাত্রা করিয়াছে। স্বামীজী দেওয়াল-ধারায়* গিয়া ভাল আছেন। আর ২ যেমত হয় পরে লিখিব। তোমরা আমাদের প্রণাম ও ভালবাসাদি জানিবে। ইতি—

দাস Brahmananda

* (আলমোড়ার নিকট)

(২)

(ইংরেজী হইতে অনূদিত)

Math,
Alambazar,
5th July, 1897

My Dear Akhandananda,

আজ মনিঅর্ডারযোগে তোমার নিকট বর্তমান জুলাই মাসের খরচ বাবদ ১৫০৲ টাকা পাঠাইতেছি। তুমি ইহার প্রাপ্তিসংবাদ দিও।··· তোমার অফুরন্ত শক্তি-সামর্থ্য লইয়া কাজ করিয়া যাও, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য তোমার মনকে দমিতে দিবে না।···

তোমাদের ওখানকার কাজ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে :—

১। গভর্ণমেণ্ট যখন এই দামে তোমাদের নিকট চাল সরবরাহ করিতে রাজী হইবে না—তখনই চালবিতরণ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন হইবে এবং তোমাদিগকেও বিচারপূর্বক সব করিতে হইবে।

২। যাহারা প্রকৃতই অভাবগ্রস্ত এবং জীবিকার্জনে অসমর্থ, চাল সাহায্যদানের জন্য তাহাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে।

৩। দানের যাহারা উপযুক্ত পাত্র তাহাদের নাম লিষ্টিভুক্ত করিবে এবং তোমরা প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে যে ভাবেই চাল বিতরণ করিবে তাহাতে অপরের দ্বারা কখনও পরিচালিত হইবে না।···

তুমি অন্য একস্থানে সাহায্যকেন্দ্র খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছিলে। তুমি ঐ বিষয়ে কতদূর কি করিয়াছ তাহা আমাকে জানাইবে। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই যশোহরেও সেবাকার্য আরম্ভ করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

তুমি শুনিয়া সুখী হইবে যে, আমরা পুরাতন ও নূতন কাপড় সংগ্রহ করিয়াছি। ২৫৲ পঁচিশ টাকার মোটা নূতন কাপড় তোমার নিকট পাঠাইতে চাই। তুমি সত্বর আমাকে জানাইবে কোথায় কোন্ রেলওয়ে ষ্টেশনে ঐ পার্শ্বেল পাঠাইলে তুমি অক্লেশেই উহা পাইতে পার। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে উহা বিতরণ করিয়া তুমি নিশ্চয়ই খুব আনন্দ পাইবে। যে ঠিকানায় উক্ত কাপড় পাঠাইতে হইবে তাহার বিস্তৃত বিবরণ পত্রপাঠ আমাকে জানাইবে।

আমার শরীর এখনও দুর্বল। আমি পূর্বের স্বাস্থ্য এখনও ফিরিয়া পাই নাই। ভালবাসা ও নমস্কার জানিবে।

Yours obediently
Brahmananda

স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী

[শিক্ষাতত্ত্বের পরেই আসে তার প্রয়োগের প্রশ্নটি।]

শিক্ষার এই প্রয়োগের দিকটিতে দৃষ্টি দিলে তিনটি অপরিহার্য উপাদানের সাক্ষাৎ মিলবে। প্রথমতঃ, শিক্ষক বা আচার্য যিনি শিক্ষাদান করেন। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থী বা শিষ্য, যিনি শিক্ষাগ্রহণ করেন। তৃতীয়তঃ, যে সম্বন্ধে শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভ করা হয়—সেই পাঠ্যবিষয় বা শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু। আধুনিক ইংরেজী শিক্ষা-শাস্ত্রের পরিভাষায়—এরা হলো Educator, Educand এবং Subject matter বা curriculum। এ ছাড়াও অবশ্য আছে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের environment বা পরিবেশ। এই সব ক'টি উপাদানেরই প্রায় সমান গুরুত্ব শিক্ষা-জগতে। কোনটিকে উপেক্ষা করেই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সার্থক ক'রে তোলা যায় না। তবে শিক্ষক ও ছাত্র—উভয়েই ব্যক্তি-মানব এবং এক বিশিষ্ট মানবিক সম্পর্কে আবদ্ধ দুটি চৈতন্যসত্তা, তাই সেদিক থেকে অপরাপর উপাদান অপেক্ষা এদের গুরুত্ব অধিক। আরও বিশদ ক'রে বলতে গেলে অবশ্য 'ছাত্র'কেই অধিকতর মূল্য দিতে হবে এ ব্যাপারে। কারণ, শিক্ষা-ব্যবস্থা তো মূলতঃ তাকে কেন্দ্র ক'রেই আবর্তিত; তার পূর্ণতার বিকাশসাধন, তাকে মানুষের মত মানুষ ক'রে তোলাই তো শিক্ষার সত্যকারের আদর্শ। সেই জন্যেই তো শিক্ষার এই শতেক রকম আয়োজন। সেই কারণেই তো শিক্ষার এমন প্রয়োজন।...সে যাই হোক, এসব উপাদানের সবগুলোর ওপরই স্বামীজীর গভীর সন্ধানী দৃষ্টি পড়েছে এবং সেই দৃষ্টির আলোকে এসব উপাদানগুলো এক বিশিষ্ট অর্থবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে শিক্ষা-জগতে। একে একে এখন এসম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্যগুলোকে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন।

প্রথমেই শিক্ষকের কথা ওঠে। কারণ, শিক্ষা-ব্যাপারে তিনিই প্রথম ব্যক্তি—প্রধান প্রবক্তা। তিনি শিক্ষাদান করেন, আর ছাত্র তা গ্রহণ করে। আগে দান, তারপরে গ্রহণ। তাই শিক্ষকের সমস্যাই সকলের আগে। স্বামীজীর চোখে গতানুগতিক পাঠন শিক্ষাদান নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য ছাত্রকে মানুষ ক'রে তোলা—তার মধ্যেকার সুপ্তব্রহ্মকে জাগানো। একাজ সকলের দ্বারা হয় না, হ'তে পারে না। যে কেউই তাই শিক্ষক হ'তে পারেন না। প্রকৃত শিক্ষক হবার জন্য মস্তিষ্ক ও হৃদয়বৃত্তির একটি বিশিষ্ট গতিপ্রকৃতি প্রয়োজন। বলেছেন—"যিনি মুহূর্তে ছাত্রের সঙ্গে অভিন্নাত্মা হইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত শিক্ষক। সেই ব্যক্তিই প্রকৃত শিক্ষক যিনি একেবারে ছাত্রের স্তরে নামিয়া আসিতে পারেন এবং নিজের আত্মাকে ছাত্রের আত্মায় একীভূত করিয়া তাহারই মন দিয়া সব কিছু দেখেন ও বুঝিতে পারেন। এইরূপ শিক্ষকই প্রকৃত শিক্ষাদানে সমর্থ, অন্যে নহে।" শিক্ষাদান প্রসঙ্গে ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষকের এই যে সহমর্মিতা, সহধর্মিতা, একাত্মীয়তার কথা বলেছেন স্বামীজী—বর্তমান শিক্ষা-অনুধ্যানে এর একটি গভীর তাৎপর্য আছে। শিক্ষা-সম্বন্ধীয় মনস্তত্ত্বে বর্তমানে ঠিক এইভাবের তত্ত্বকেই মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে।

পাশ্চাত্য জগতে Pestalozzi থেকে সুরু ক'রে অতি আধুনিক শিক্ষা-তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা পর্যন্ত মূলতঃ এই তত্ত্বই প্রচার ক'রে চলেছেন যে, শিক্ষাদানকে যদি সার্থক ক'রে তুলতে হয় তাহলে শিক্ষককে তার ছাত্রের মানসিক গঠন ও সামর্থ্য, অনুভূতি ও ভাবাবেগ, প্রবৃত্তি ও প্রবণতা সম্বন্ধে অল্পবিস্তর ধারণা লাভ করতে হবে—ছাত্রের মনের সঙ্গে নিজের মনের তার অনুভূতির সঙ্গে নিজের অনুভূতির আত্মীয়তা স্থাপন করতে হবে। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিজ্ঞান আরও বলে যে, শিক্ষাকে সার্থক করতে গেলে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে একটি প্রীতির সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠা আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে স্বামীজীও বলেছেন, "গভীর স্নেহ ও সহানুভূতির অভাবে আমরা কখনও উত্তম শিক্ষা দিতে পারি না"। এ ব্যাপারে স্নেহ ও সহানুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত ধারাকে অবশ্য তিনি শিক্ষকের গোমুখী থেকেই নির্গত করাতে চেয়েছেন। কারণ, শিক্ষকই জ্যেষ্ঠ—তিনিই প্রথম—তিনিই তো দাতা। এক্ষেত্রে আগে দিতে হয়, তবে প্রতিদানে পাওয়া যায়। দানেই গ্রহণের অধিকার অর্জিত হয়। ভারতীয় আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ অবশ্য এইখানেই ইতি করেন নি এ-বিষয়ের। তিনি শিক্ষকের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও চরিত্র-সৌন্দর্যের দিকেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে—প্রকৃত শিক্ষক হবেন বিদ্বান, চরিত্রবান, নির্লোভ ও স্নেহপ্রবণ। এক কথায় শিক্ষক হবেন এক আদর্শ পুরুষ। এই আদর্শ পুরুষের সান্নিধ্য ছাত্রদের মধ্যেও আদর্শের সঞ্চার করবে। দীপ থেকে দীপ জ্বলে উঠবে। ব্যক্ত মনুষ্যত্বের স্পর্শে গুপ্ত মনুষ্যত্বের সুপ্তিভঙ্গ হবে। সুপ্ত ব্রহ্ম জেগে উঠবেন পূর্ণ মহিমায়। আর এমনি ভাবেই তো শিক্ষাদর্শ সার্থক হবে।...এমন গভীরে না গেলেও, শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রভাবের দিকটি আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিজ্ঞানেও উপেক্ষিত হয় নি। শিক্ষা-পদ্ধতির আলোচনা প্রসঙ্গে Sir John Adams বলেছেন যে, শিক্ষাদানের অন্যতম পাথেয় হচ্ছে—'the direct application of the educator's personality to the personality of the educand.' শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের ওপর শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের আরোপ ও প্রভাবের প্রশ্নটি এখানে সুস্পষ্ট। অবশ্য স্বামীজীর মতো শিক্ষকের সেই ব্যক্তিত্বকে কতকগুলি অপরিহার্য সদ্‌গুণ ও শুভ আদর্শের মাধুর্যে মহিমান্বিত ক'রে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গিটি এখানে নিঃসন্দেহে অনুপস্থিত। এবং তা স্বাভাবিকও। কারণ, স্বামীজীর জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে ধারণাটাই স্বতন্ত্র, আর তাই স্বামীজীর পরিকল্পিত তত্ত্বদর্শী ও ত্যাগী শিক্ষাব্রতীর সঙ্গে এইসব পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিজ্ঞানীদের শিক্ষকের মিল খুঁজতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তবে একথা ঠিক, ছাত্রের ওপর শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের আরোপের প্রশ্নটির মধ্যে শিক্ষকের উন্নততর ও অধিকতর পরিস্ফুট ব্যক্তিত্বের সূত্রটি অন্ততঃ ইঙ্গিত-আকারে নিহিত আছে। নতুবা—শিক্ষার ফলশ্রুতিতে ও-ব্যক্তিত্ব আরোপের বিষয়টির অর্থ থাকে না কিছু। সে যাই হোক, প্রকৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বামীজী পক্ষান্তরে অধিকার-ভেদের প্রশ্নটিই তুলেছেন। সকলেই শিক্ষক হবার যোগ্য নন, তাঁর বিবেচনায়।

শিক্ষার্থীর সমস্যাটি অধিকতর জটিল। শিক্ষাদান আরম্ভ করতে হয় বস্তুতঃ শৈশব-কালেই। সেখানে—একটি অপরিণত অথচ পরিণতিপ্রাপ্তির পথের পথিক মনের মুখোমুখি আমাদের দাঁড়াতে হয়। ভেতরে ভেতরে চৈতন্য-সত্তা অথচ এক সুপ্ত চৈতন্যের আত্মপ্রকাশের

পূর্বাচলে আমাদের অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে হয়। তাই সমস্যাটা এমন জটিল হয়ে ওঠে। বলাবাহুল্য, মনুষ্য-শিশু পূর্ণ মানব নয়। সে মানবের সম্ভাবনা, প্রস্তুতিপর্ব। সে 'man in the making'। শরীরেই সে শুধু ক্ষুদ্রকায় ও অপরিণত নয়, মনেও সে অপুষ্ট, অপূর্ণ। তাই পরিপুষ্ট ও পরিণত মানুষের মন ও মানসিকতা নিয়ে ওদের সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপনের চেষ্টা করলে—উভয়ের মধ্যে ব্যবধানের মাত্রাটা বেড়েই যাবে কেবল, সেতুবন্ধনের পালাটা সমাপ্ত হবে না কোনদিন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীও তাই মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের দিক থেকে কাছাকাছি আসবে না কোন সময়; শিক্ষাদান এবং গ্রহণও সমাধা হবে না তাহলে। পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিজ্ঞানে তাই শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিশু-মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। শিক্ষকের পক্ষে শিশুমনের পরিচিতির আবশ্যকতার কথা সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করা হয়েছে। স্বামীজীও—প্রকৃত শিক্ষকের পক্ষে অপরিহার্য গুণাবলীর উল্লেখ প্রসঙ্গে এ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। ছাত্রের আত্মার সহিত শিক্ষকের আত্মাকে একীভূত করবার কথা বলেছেন। তিনি অবশ্য আরও অনেকদূর অগ্রসর হয়েছেন এ বিষয়ে। আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কেবল মানসিক বোঝাপড়াই নয়, একটি আন্তরিক প্রীতির সম্পর্কের কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু, স্বামীজী শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর মনোভাব ও উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও গভীরতর ও দৃঢ়তর ভিত্তির উপর স্থাপিত করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন—"পিতৃপুরুষ এবং তাঁহার বংশধরদিগের মধ্যে সম্বন্ধ যেরূপ, শিক্ষকের সহিত ছাত্রের সম্বন্ধও সেইরূপ। শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের অন্তরে যদি বিশ্বাস, বিনয়, নম্রতা ও শ্রদ্ধা না থাকে তাহা হইলে ছাত্রের কোন চিত্তোন্নতি হইতে পারে না। যে সকল দেশ শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ রাখিতে অবহেলা করিয়াছে, সেই সকল দেশে শিক্ষক কেবল বক্তা এবং ছাত্র শ্রোতামাত্র।"...

প্রকৃত শিক্ষকের মত প্রকৃত শিক্ষার্থীর পক্ষেও কয়েকটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করেছেন স্বামীজী। যে কেউই প্রকৃত শিক্ষালাভ করে না। প্রকৃত শিক্ষালাভের জন্য একটি বিশেষ মানসিকতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আবশ্যকতা আছে। জ্ঞানতৃষ্ণা, অধ্যবসায়, চারিত্রিক পবিত্রতা ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি কয়েকটি সদ্‌গুণ ছাত্রের পক্ষে অপরিহার্য। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"—এ ভারতবাণী। এ স্বামীজীর কথাও। বিদ্যাভ্যাসকালে ব্রহ্মচর্যাদির ওপরও অসাধারণ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এদেশে। ওদেশে এসব প্রশ্ন প্রাধান্য পায় নি এ ব্যাপারে। শিক্ষার আদর্শটাই যে ভিন্ন এ দেশে—স্বামীজীর দৃষ্টিতে

শিক্ষার্থীর প্রকৃতি প্রসঙ্গে আবার স্বামীজী যে তত্ত্বটি ব্যক্ত করেছেন শিক্ষাজগতে নানা কারণেই তা কৌতূহলোদ্দীপক। স্বামীজীর মতে—বাইরে থেকে কাউকে শিক্ষাদান করা যায় না, কেউ শিক্ষিত হয়ও না তেমন ভাবে। শিশু নিজে থেকেই শিক্ষালাভ করে। তার ভেতরের শিক্ষকটি যখন জাগ্রত হবে, জাগ্রত হয়ে দিকে দিকে দুই বাহু প্রসারিত ক'রে দেবে নিত্য নূতন উপাদান গ্রহণের জন্য, তার অন্তর্নিহিত পূর্ণতার স্বভাবটি যখন বাহ্য অভাবের আস্তরণ ভেদ ক'রে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য উদ্বেল হয়ে উঠবে, তখনই তার প্রকৃত শিক্ষালাভ হবে। বাইরের শিক্ষক শিশুর এই ভেতরকার শিক্ষককে জাগ্রত করেন মাত্র,

সুপ্ত চৈতন্যের ঘুম ভাঙ্গান শুধু; শিশু আপন স্বভাবেই শিক্ষিত হয়ে ওঠে, শিক্ষক বাইরে থেকে উপদেশ দেন মাত্র। এ ব্যাপারে একটি উদ্ভিদ-শিশুর প্রকৃতির সঙ্গে মনুষ্য-শিশুর স্বভাবের অপূর্ব সামঞ্জস্য লক্ষ্য করেছেন স্বামীজী। উভয়েরই পরিপুষ্টি ও পরিণতি লাভ সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক—স্বাভাবিক। স্বামীজী বলেছেন—"একটি চারাগাছকে যেমন জোর করিয়া বাড়ানো যায় না, শিশুকেও তেমনি চেষ্টা করিয়া শিক্ষা দেওয়া যায় না। চারাগাছটি স্বীয় স্বভাব অনুসারেই বর্ধিত হয়। শিশুও নিজেই শিক্ষালাভ করে। কিন্তু, তুমি শিশুকে তাহার শিক্ষালাভের পথে সাহায্য করিতে পার। তুমি কেবল বাধাগুলি অপসারণ করিতে পার। তখন স্বভাবতই জ্ঞানের বিকাশ হয়। মাটিটা একটু আলগা করিয়া দাও, তাহা হইলে অঙ্কুরের উদ্গম সহজ হইবে। উহার চারিদিকে বেড়া দাও; দেখ, যেন কেহ ইহার কোন অনিষ্ট করিতে না পারে। উহাতে মাটি জল বায়ু প্রভৃতি যাহা আবশ্যক দাও। তোমার কাজ সেখানেই শেষ। যাহা কিছু অঙ্কুর চায় সেই সমস্ত ইহা স্বীয় স্বভাবের দ্বারাই সংগ্রহ করিবে। সংগৃহীত উপাদান পরিপাক করিয়া ইহা স্বীয় স্বভাববশেই বর্ধিত হইবে। শিশুর শিক্ষাও এই প্রকারে হয়। শিশু স্বয়ং শিক্ষিত হয়।... মানুষের অন্তঃস্বরূপটি জ্ঞানময়। ইহার উদ্বোধন আবশ্যক। উহাই শিক্ষকের কার্য।"

স্বামীজীর উপরোক্ত মন্তব্য প্রসঙ্গে Rousseauর "Education according to Nature" মতবাদের কথা মনে পড়ে যায়। Rousseau তাঁর 'Emile'-এ শিক্ষা-তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—শিক্ষার অর্থ বাইরে থেকে কিছু সংগ্রহ করা নয়, ছাত্রকে বাইরে থেকে কিছু ক'রে তোলাও নয়। প্রাকৃতিক পরিবেশে এবং প্রকৃতির মাধ্যমে ভেতর থেকে স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করাই শিক্ষা। ('Education is development from within, in and through nature')। বাইরের মনুষ্য-শিক্ষক প্রকৃত শিক্ষাদান করতে পারে না। শিক্ষাকে বরং বিকৃত ও কৃত্রিম ক'রে ফেলে সে। প্রকৃত শিক্ষা আসে প্রকৃতি থেকে। প্রকৃতির শিক্ষাই সৎশিক্ষা। কিন্তু এই প্রকৃতি বা nature বস্তুটি সম্বন্ধে রুসোর ধারণাটি এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রকৃতি বলতে রুসো—আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য—উভয় প্রকার প্রকৃতিকেই বোঝাতে চেয়েছেন। বাইরের নিসর্গ প্রকৃতি এক প্রকৃতি। এমনকি এই বিশ্ব-প্রকৃতির স্রষ্টা (Author of Nature)—এক বিশ্ব-নিয়ামককেও এই প্রকৃতির দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন তিনি। আর এক প্রকৃতি শিশুর অন্তর্জগৎ। তার মনের স্বাভাবিক সামর্থ্য, কামনা-বাসনা, হৃদয়াবেগ, প্রবণতা—সমস্ত কিছুই এই আন্তর প্রকৃতির অন্তর্গত। এই দুই প্রকৃতির প্রভাবেই সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ গ'ড়ে ওঠে। এই দুই প্রকৃতিই মানুষকে যথার্থ ও সহজ শিক্ষা দেয়। যেখানেই এবং যখনই কোন মনুষ্য-শিক্ষকের পদসঞ্চার ঘটে—সেখানেই শিক্ষার স্বাভাবিক স্ফূর্তি নষ্ট হ'য়ে কৃত্রিমতা দেখা দেয়, বিকৃতি আত্মপ্রকাশ করে, শিক্ষা-কাব্যে ছন্দপতন হয়। মানুষ ও মানুষের হাতেগড়া সমাজ মানুষের পায়ে পায়ে শেকল পরিয়ে দেয়। তার স্বাভাবিক বিকাশের পথ এমনিভাবেই রুদ্ধ হয়ে যায়।...রুসোর এইসব কথার সঙ্গে স্বামীজীর কথার কিছু মিল অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যায়, তাই একজনের আলোচনা প্রসঙ্গে আর একজনের কথা স্বভাবতই মনে পড়ে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্যও আছে সে সম্বন্ধে অবহিত না হলে এঁদের কারো তত্ত্বেরই

প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব হয় না। বাইরে থেকে সংবাদ আহরণ যে শিক্ষা নয়, কোন শিক্ষক কর্তৃক ভাব-সঞ্চারও যে শিক্ষা পদবাচ্য নয়, প্রকৃত শিক্ষা যে ভেতর থেকেই আসে, স্বভাব-অনুযায়ীই জন্ম নেয়, শিক্ষা যে একটা আভ্যন্তরীণ বিকাশ—রুসো ও স্বামীজী উভয়েই কম বেশী এ মতবাদ পোষণ করেন। কিন্তু, রুসো সমাজ-বিদ্রোহী ও প্রাকৃতিক স্বাধীনতার একনিষ্ঠ সোচ্চার সমর্থক। মানুষের সভ্যতা, রীতিনীতি, সনাতন আদর্শ ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠ প্রতিবাদে তিনি মুখর। রুসোর কণ্ঠে ভাঙ্গনের জয়গান। অপরপক্ষে, স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র, হৃদয়াবেগও ভিন্ন খাতে প্রবাহিত শিশুর আত্ম-গঠন এবং সহজ ও স্বাভাবিক স্ফুর্তিতে তিনি বিশ্বাসী, কিন্তু সে সমাজের জগদ্দল পাথরের তলায় নিষ্পেষিত অসহায় শিশুর ক্লেদাক্ত করুণ মূর্তির কথা ভেবে নয়। সামাজিক শৃঙ্খলাও তেমন শৃঙ্খল নয় তাঁর কাছে; সমাজ তাঁর দৃষ্টিতে মহামায়ার লীলানিকেতন—মানব-সন্তানের শিশুশয্যা। আর শিশু তো স্বভাবতই শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত। বাইরের কোন শিক্ষক কাউকে প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারে না—একথা যে স্বামীজী বলেছেন তা ওই শিক্ষক সম্বন্ধে অবিশ্বাস বা আশঙ্কার জন্য নয়। তার কারণ, মানুষের অন্তঃস্বরূপটিই চৈতন্যময়, জ্ঞানময়। চৈতন্য-স্বরূপকে আবার চৈতন্য দেবে কে? জ্ঞানময় লোকে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে তুলবে সে কোন্ মহাজন? কিন্তু, তাই ব'লে ও শিক্ষকের একেবারে প্রয়োজন নেই—একথা বলেন নি স্বামীজী। শিশুর অন্তঃস্বরূপটিকে জাগ্রত করতে, তার জ্ঞানময় সত্তার উদ্বোধন করতে ওই শিক্ষকের প্রয়োজন। স্বামীজী আরও চান—অতি শৈশবের অবচেতন মানব-সন্তানের কর্ণে মাতৃকণ্ঠেই মন্ত্রোচ্চারিত হোক—'শুদ্ধোঽসি, বুদ্ধোঽসি, নিরঞ্জনোঽসি"। রুসো চান—স্বাধীন শিশুর স্বাভাবিক মানসিকতা ও প্রবণতা অনুসারে সে আপনাথেকেই গ'ড়ে উঠুক—তার প্রকৃতি অনুযায়ী সে নিজেই শিক্ষিত হোক। স্বামীজী মনে করেন—শিশুর অন্তর্নিহিত পূর্ণতার স্বাভাবিক বিকাশের মধ্য দিয়ে সে স্বয়ং শিক্ষিত হয়ে ওঠে। রুসোর জোর—শিশু-মনের প্রাকৃতিক গঠন, সামর্থ্য ও প্রবণতার ওপর। স্বামীজীর সার কথা কিন্তু মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতা। রুসোর দৃষ্টিভঙ্গী মূলতঃ সামাজিক ও রাজনৈতিক এবং নাস্তিভাবাপন্ন বা নেতিমূলক। অপরপক্ষে—স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গী আধ্যাত্মিক, অথচ অ-লৌকিক নয়, এবং ইতিবাচক। তবে উভয়ের দৃষ্টিতেই শিক্ষার্থীর সমান গুরুত্ব। শিক্ষা-বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুই শিক্ষার্থী, উভয়ের মতেই। তবে—এ ব্যাপারে স্বামীজীর অবগাহন আরও অনেক গভীরে।

শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট আলোচনা এমনিতেই তো একরকম অসম্ভব ব্যাপার, তার ওপর এ বিষয়ে ইতস্ততঃ সূত্রাকারেই তাঁর বক্তব্য রেখেছেন স্বামীজী। ওই বক্তব্যগুলির ভেতর থেকে তাঁর মূল সুরটিকে আবিষ্কার করা খুব দুঃসাধ্য নয়। প্রথমতঃ, নানা তত্ত্ব, তথ্য ও ভাবের দুর্বহ ভারে মনকে ভারাক্রান্ত করবার আদৌ পক্ষপাতী নন তিনি। "মনের একাগ্রতা-সাধনই সার কথা",—তাঁর মতে। স্বামীজী বলেছেন,—"যদি আমাকে পুনরায় শিক্ষাগ্রহণ করিতে হয়, আমি আদৌ তথ্যসমূহ পাঠ করিব না। আমি তখন মনের একাগ্রতা ও নির্লিপ্ততা বৃদ্ধি করিয়া উক্ত নিখুঁত যন্ত্র সাহায্যে ইচ্ছামত তথ্যরাজি সংগ্রহ করিব।"...দ্বিতীয়তঃ, তাঁর মতে—সেই সব বিষয় শিক্ষাগ্রহণ করা প্রয়োজন যা ইতিমূলক

শিক্ষা দেয়। কতকগুলো 'না'-এর সমষ্টি শিখে জীবনটাকে 'নাস্তি' ক'রে তোলা নয়, কতকগুলি 'হাঁ'-এর সমাবেশে 'সৎ'-এর স্বাদ লাভ করাই শিক্ষা। বড় ভাব, মহৎ চিন্তা—যা মানুষকে বড় হ'তে, উদার হ'তে, সৎ হ'তে, স্ব-রূপী হ'তে সাহায্য করে, যার দ্বারা মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠে, তাইই মানুষের শিক্ষণীয়। বাকী সব বর্জনীয়। তৃতীয়তঃ, পাঠ্যবিষয়ের নির্বাচন ব্যাপারে স্বামীজী কিছুটা উপযোগিতাবাদের (Pragmatism) সমর্থক। যা অবান্তর, নিষ্প্রয়োজন—যা জীবনের সঙ্গে, স্ব-প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য—যা জীবন-সংগ্রামে পাথেয় যোগায় না, যা নিজের কোন উপকারে লাগে না এবং অপরেরও কোন উপকার করতে সমর্থ নয়—এমন সব নিষ্ফল আবর্জনায় মস্তিষ্ক ভরাট করবার ঘোর বিরোধী তিনি। তিনি চান—শিক্ষার মাধ্যমে কিছু হ'তে, কিছু হওয়াতে; কিছু করতে, কিছু করাতে; নিজেকে নিজে জানতে—শিক্ষাকে কাজে লাগাতে। পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিজ্ঞানী ও দার্শনিক John Dewey-র সঙ্গে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গীর এ-বিষয়ে অনেকখানি মিল আছে।

শিক্ষাদান ও গ্রহণের প্রয়োজনীয় পরিবেশের ওপর খুব বেশী গুরুত্ব দেননি স্বামীজী। কারণ, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীটা মূলতঃ অন্তর্মুখী—আত্মাভিমুখী। তবে, ভারত-আত্মার মূর্ত প্রতীক বিবেকানন্দ প্রাচীন আশ্রমিক শিক্ষার জয়ঘোষণা করতে ভোলেন নি কোনদিন। সংসারের কোলাহল ও কর্মব্যস্ততা থেকে কিছু দূরে—একটি শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে, প্রকৃতির উচ্ছল উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, আকাশের উদার চন্দ্রাতপের নীচে, গুরুগৃহে, গুরুর মুখোমুখি বসে শিক্ষালাভকেই—এ বিষয়ে আদর্শ চিত্ররূপে অঙ্কিত করেছেন তিনি। কিন্তু, আগেই বলেছি, এ ব্যাপারে দুর্বার কোন মানসিক ঝোঁক ছিল না তাঁর। আদৌ আপসহীন ছিলেন না তিনি এ বিষয়ে, যেমন ছিলেন রুসো, যেমন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রুসোর মতে—প্রকৃতির উদার উন্মুক্ত স্বাধীন পরিবেশ ব্যতীত শিশুর স্বাভাবিক শিক্ষা সম্ভবই নয়। ও আধুনিক সভ্যতা, সমাজ, নগর-রাজধানী—ওসব বিষবৎ পরিত্যাজ্য। নগরগুলো সব মনুষ্যজাতির কবর-স্থান ("Cities are the graves of the human species")। রবীন্দ্রনাথও আধুনিক নগর-সভ্যতার সমর্থক ছিলেন না। আকাশ-চুম্বী হর্মরাজি পরিবেষ্টিত প্রকৃতির প্রসাদ-বঞ্চিত এই শহর, ধোঁয়াচ্ছন্ন ওপরের ওই ধূসর আকাশ, এই কোলহল, এই বীভৎস চাঞ্চল্য, কৃত্রিম প্রাণহীন পরিবেশ, এর মাঝখানে তাঁর কবি-মন আর্তনাদ ক'রে উঠত—সেই পরিত্যক্ত প্রাচীন সুমহান 'অরণ্য'-এর জন্য। তাঁর শিশু-মন ইঁট, কাঠ, আর দেওয়ালের গোলকধাঁধায় হাঁফিয়ে উঠেছে প্রতিমুহূর্তে। তাই তিনি নিরানন্দ এই নগর-কারাগার থেকে মুক্তি চেয়েছেন প্রকৃতি-জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় নিয়ে। আর শিক্ষার মঙ্গল কলসটিও প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন ওই প্রকৃতির সহজ সুন্দর আনন্দময় প্রাণপ্রাচুর্যের মধ্যে।

(ক্রমশঃ)

মায়াচক্র

প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা

শ্রীভগবানের মায়াশক্তির ব্যাখ্যা করা এবং তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত থাকা সাধারণ মানবের সাধ্যাতীত, শাস্ত্র এরূপ বলেন। মায়া মায়াই—মরীচিকাস্বরূপ! যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ এই মায়া দ্বারাই চালিত হইয়া জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত চলিতেছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজ-
মব্যয়ম্‌॥

অর্থাৎ হে অর্জুন—আমি যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত—সকলের নিকট প্রকাশিত নহি। মূঢ় অর্থাৎ মায়ামুগ্ধ ব্যক্তিরা আমাকে অজ, অব্যয়স্বরূপে জানিতে সক্ষম নহে।

এই মায়াকে 'অনাদি অনির্বাচ্য অজ্ঞান' 'অঘটনঘটনপটীয়সী' প্রভৃতি বলা হইয়াছে। কাহারও নিদারুণ শোক উপস্থিত হইলে আমরা কিছুক্ষণের মত নীরব থাকিয়া বিজ্ঞের মত বলি—এই সংসারে সবই মায়া। নিঃসম্পর্কীয় কাহারও এরূপ হইলে পুনরায় অসমাপ্ত কাজ করিতে থাকি বা কাহারও সহিত বাক্যালাপে মগ্ন থাকিলে পুনরায় তাহাই করিতে থাকি; সম্পর্কীয় কাহারও হইলে নীরবতাটুকু আর একটু দীর্ঘস্থায়ী হয়—প্রভেদ এইটুকু। নিদারুণ শোকও আমাদের সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে বেশীক্ষণ স্তম্ভিত করিয়া রাখিতে পারে না। ইহাই মায়া, ইহাই আশ্চর্য। রাজা যুধিষ্ঠিরের উক্তি—'অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্‌।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্‌॥'

প্রতিদিন প্রতিক্ষণ আমরা মৃত্যুর করাল বদন দেখিয়াও নিশ্চিন্ত হইয়া সংসারে জড়িত হইতেছি—মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার পাইবার ব্যাকুলতা লক্ষের মধ্যে একজনের হয়ত আসিতেছে। মায়ার ঘোরে ঘুরিতেছি, বলিতেছি সব মায়া, অথচ তাহাকে অতিক্রম করিতে পারিতেছি না—ইহাই তো মায়া, ইহাই আশ্চর্য!

শ্রীশ্রীঠাকুর মাষ্টার মহাশয়কে বলিতেছেন—"তাঁকে কি বুঝা যায় গা!...তাঁর মহা মায়ার ভিতর আমাদের রেখেছে। কখন তিনি হুঁস করেন, কখন অজ্ঞান করেন। একবার অজ্ঞানটা চলে যায়, আবার ঘিরে ফেলে। পুকুরে পানা ঢাকা, ঢিল মারলে খানিকটা জল দেখা যায়, আবার খানিকক্ষণ পরে পানা নাচতে নাচতে এসে সে জলটুকুও ঢেকে ফেলে।"

শাস্ত্র আবার বলেন, মায়াময় এই জগৎ আমাদের মনেরই সৃষ্টি। মহামায়া তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে আমাদের মনে এই জগতের সব কিছুই ফুটাইয়া তোলেন

এই বিষয়ে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রাদিতে বহু গল্প প্রচলিত আছে। ভ্রান্ত মানব এই মায়া দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াই যে সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা প্রভৃতি নানা চিত্তবৃত্তির অধীন হইতেছে, মহামায়ার প্রভাবেই যে মনে দেশ-কাল-নিমিত্ত ফুটিয়া উঠিতেছে, সে সম্বন্ধে বরাহপুরাণে একটি অতি চমৎকার কাহিনী লিখিত আছে:

পুরাকালে ব্রতধারিণী ধরিত্রী দেবী ভগবান নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে মাধব, তুমি যে তোমার মায়ার কথা বলিলে তাহার রহস্য

জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত আছি, তাহা আমাকে বল।” ভগবান নারায়ণ বলিলেন—“মায়ার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া অনর্থক কেন কষ্ট পাইবে? মানবের কথা দূরে থাক, ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্যন্ত আমার মায়াশক্তির বিবরণ জানিতে পারেন না। সে তত্ত্ব তুমি কিরূপে বুঝিবে? এ সকল যাহা কিছু দেখিতেছ—আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত সকলই মায়া! আমি নিজ মায়াবশে সৃষ্টি করি, পালন করি, আবার সংহার করি। নিজ মায়াবশে অনন্তশয্যায় নিদ্রাভিভূত হই। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু ঘটিতেছে, সকলই মায়ার খেলা। মদীয় লোমহর্ষক মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া জীবগণ সংসারে প্রবিষ্ট হইতেছে, তাড়িত তাপিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। একটি প্রাচীন কাহিনী শোন—

পুরাকালে সোমশর্মা নামক এক ব্রাহ্মণ নানা জন্ম-জন্মান্তর লাভ করিয়া শেষে সোমশর্মা-রূপে বহু তপস্যাদি দ্বারা নারায়ণের দর্শনলাভ করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণরূপে থাকিবার কালেই পুনরায় স্ত্রীজন্মলাভ করেন। তাঁহার কোনও অপরাধ নাই, তিনি কোন অন্যায়ও করেন নাই। নিয়ত আমার আরাধনা করিয়া আমারই প্রীত্যর্থে সকল কর্ম করিয়া দিবানিশ আমারই মনোহর মূর্তি ধ্যান করিতেন। বহুকাল পরে তাঁহার তপস্যা, একান্ত ভক্তি ও স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া আমি তাঁহাকে দর্শন দিলাম এবং বলিলাম, ‘হে দ্বিজবর! আমি তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি; ধনরত্ন, গোধন, নিষ্কণ্টক রাজ্য, দিব্যাঙ্গনাযুক্ত স্বর্গসুখ প্রভৃতি যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাই প্রদান করিব।’ তখন ব্রাহ্মণ অবনতমস্তকে কহিলেন—‘প্রভো, যদি ক্রোধ প্রকাশ না করেন, তবে এ দাস প্রার্থনা করে; আপনি পূর্বে যাহা সব দিতে চাহিলেন, সে সবে—কাঞ্চনে গোধনে দিব্যাঙ্গনায় রাজ্যে স্বর্গে অপ্সরাগণে কিম্বা মনোহারিণী সমৃদ্ধিতেও আমার প্রয়োজন নাই। আমি কেবল আপনার মায়াবিনী লীলার মর্ম বুঝিতে চাই।’ আমি তাঁহার কথার উত্তরে কহিলাম—‘ব্রাহ্মণ, আমার মায়াবিজ্ঞানে তোমার প্রয়োজন কি? আমার মায়ায় মুগ্ধ দেবগণও মায়াতত্ত্ব অবগত হইতে অক্ষম।’ ঐ সময় বিপ্রেন্দ্র আমার মায়াবলে মধুর কথায় বলিলেন—‘দেব! যদি আমার কর্মানুষ্ঠানে বা তপস্যায় তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে প্রসন্ন হইয়া আমার অভীষ্ট বর প্রদান করুন।’ অতঃপর সেই তপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণকে বলিলাম—‘তুমি কুব্জাম্রক তীর্থে গিয়া গঙ্গাসলিলে অবগাহন কর। তাহা হইলেই আমার মায়াতত্ত্ব বুঝিতে পারিবে।’

তখন সেই ত্রিদণ্ডী ব্রাহ্মণ আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া আমার মায়াতত্ত্ব বুঝিবার জন্য কুব্জাম্রকে গমন করিলেন এবং তথায় স্বীয় বস্ত্রাদি রাখিয়া প্রথমে যথানিয়মে তীর্থারাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পরে যথাবিধি গঙ্গায় নামিয়া অবগাহনান্তে স্বীয় কলেবরে গঙ্গামৃত্তিকা লেপন করিবার পর তাঁহার ব্রাহ্মণ-দেহ চলিয়া গেল। তিনি এক নিষাদ-পত্নীর গর্ভে জন্ম লইলেন। তথায় গর্ভযন্ত্রণায় অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন ‘হায় কি কষ্ট! আমি এমন কি দুষ্কর্ম করিলাম যে, আমাকে নরকতুল্য নিষাদীগর্ভে বাস করিতে হইল! আমার তপস্যায় কর্ম-ফলে এবং জীবনেও ধিক্। অপবিত্র নিষাদ-গর্ভে যন্ত্রণাভোগ করাই কি আমার পরিণাম হইল! কোথায় বা ভগবান, কোথায় বা আমি, কোথায় বা পাবন গঙ্গাজল! যাহাই হউক এই গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনর্বার নারায়ণের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইব।’ এইরূপ চিন্তা করিতে

করিতে সেই সোমশর্মা যেমন গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন অমনি তাঁহার পূর্বস্মৃতি লোপ পাইয়া গেল। তিনি ধনধান্যপূর্ণ নিষাদগৃহে কন্যারূপে জন্ম লইলেন। কিন্তু বৈষ্ণবীমায়ায় পূর্বকথা স্মরণ রহিল না। কিয়দ্দিন পরে যথাকালে তাঁহার বিবাহ হইল। নিষাদকন্যার কয়েকটি পুত্রকন্যাও হইল। কিন্তু তাহার খাদ্যাখাদ্যে বিচার নাই, পেয়াপেয়ে জ্ঞান নাই, কার্যাকার্যে বোধ নাই, বাচ্যাবাচ্যে বিবেক নাই। এইরূপে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইল। একদিন মায়াবশে অতি মলিন এক বস্ত্র প্রক্ষালন করিবার মানসে কক্ষে কলস লইয়া ঘর্মাক্ত কলেবরে গঙ্গাতটে সে উপনীত হইল। তথায় বস্ত্র ধৌত করিয়া তীরে রাখিয়া স্নানার্থ গঙ্গাজলে অবগাহন করিবামাত্র সেই নিষাদকন্যা পুনরায় ত্রিদণ্ডী তপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণরূপে পরিণত হইল। ব্রাহ্মণের জ্ঞান পরিস্ফুট হইলে তিনি দেখিলেন, তথায় তাঁহার সেই পূর্বের ত্রিদণ্ড ও পরিধেয় বস্ত্রাদি সকলই রহিয়াছে। তখন সেই তপোধন সলজ্জভাবে ভাগীরথীতীরে উঠিয়া স্বীয় পরিধেয় বস্ত্রাদি পরিধান করিলেন এবং তীরে বসিয়া স্বীয় পূর্বজন্মবিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন—'আমার জীবনে ধিক। আমি একেবারে বিপরীত পরিবেশে পড়িয়া এইরূপ হীনদশা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। কি এমন ঘৃণিত কর্ম করিয়াছিলাম, যাহার ফলস্বরূপ এইরূপ হীন জন্মলাভ করিয়াছিলাম!' এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে পুত্রগণ-পরিবৃত নিষাদ সেই মায়াতীর্থে আসিয়া স্বীয় ভার্যাকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। খুঁজিতে খুঁজিতে সেই স্থানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'মহাশয় আমার পত্নী কলসহস্তে জলাহরণ করিতে এই গঙ্গাতীরে আসিয়াছে—আপনি কি তাহাকে দেখিয়াছেন?' অন্যান্য যাহারা তথায় ছিল, তাহারা বলিল—'এই পরিব্রাজক ও এই জলকুম্ভ ভিন্ন আর কিছুই দেখি নাই।' নিষাদ নিজ পত্নীর উদ্দেশ না পাইয়া এবং কলস ও বস্ত্র দেখিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। নিষাদ পত্নীর উদ্দেশ্যে বহু কথা বলিয়া বিলাপ করিতে থাকিলে তপোধন সলজ্জভাবে স্বগতোক্তি করিলেন, 'ব্যাধ! তোমার সে ভার্যা আর নাই। তুমি স্বস্থানে যাও। তোমার সহিত সুখ ও সংযোগ শেষ করিয়া সে চলিয়া গিয়াছে, আর সে আসিবে না।' পরে তাহাকে বলিলেন—'নিষাদ! আর কেন বৃথা কষ্ট পাইতেছ, স্বগৃহে ফিরিয়া যাও। গিয়া বিবিধ আহারদানে বালকগুলিকে পালন কর। কখনই ইহাদিগকে ত্যাগ করিও না।' ব্যাধ পরিব্রাজকের কথায় দুঃখশোকে একান্ত অধীর হইয়া মধুরবচনে বলিল—'হে মুনিবর, আপনার মধুর বাক্যে সান্ত্বনা পাইলাম।' ব্রতাবলম্বী মুনি শোকাকুল নিষাদের কথা শুনিয়া বলিলেন—'ভদ্র, আর কাঁদিও না। আমিই তোমার ভার্যা ছিলাম। সম্প্রতি এই গঙ্গাতীরে মুনিরূপে পরিণত হইয়াছি।' পরিব্রাজকের কথা শুনিয়া নিষাদের দুঃখ দূর হইল। সে সানুনয়বাক্যে বলিল—'দ্বিজোত্তম! স্ত্রীলোক পুরুষরূপে পরিণত হইল, ইহা অতি আশ্চর্য কথা।' নিষাদের কথায় দুঃখিত হইয়া তপোধন বলিলেন—'তুমি এই বালকগুলিকে লইয়া চলিয়া যাও। সকলের প্রতি সমান স্নেহ, সমান আদর করিও। ব্যাধ মধুরভাবে জিজ্ঞাসা করিল—'প্রভো! পূর্বজন্মের কোন্ কর্মের ফলে আপনার এইরূপ জন্ম! কোন্ অপরাধে পুরুষ হইয়া স্ত্রীত্ব-লাভ এবং পুনরায় স্ত্রী হইতে পুরুষ হইলেন?' সোমশর্মা বলিলেন—'আনুপূর্বিক সকল কহিতেছি শুন—আমি

স্বীয় জ্ঞানানুসারে কখনও কুত্রাপি কোনও কুকর্ম করি নাই। আমি নিয়ত লোকনাথ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছি। তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া যখন দর্শন দিলেন এবং বারবার বর নিতে বলিলেন, আমি তখন অন্য কোনও বর না চাহিয়া কেবল বলিলাম, হে প্রণতবৎসল, আমাকে তোমার নিজ মায়া দেখাও। তিনি বারবার বলিলেন, আমার মায়া দেখিয়া লাভ কি হইবে? তথাপি আমি দেখিতে চাওয়ায় তিনি বলিলেন—যদি নিতান্তই মায়া দেখিতে চাও তবে কুব্জাম্রক তীর্থে যাও। সেখানে গিয়া গঙ্গাস্নান করিলে আমার মায়া বুঝিতে পারিবে। তখন আমি মায়া দেখার নেশায় মজিয়া এই গঙ্গাতীরে আসিলাম। এখানে আসিয়া দণ্ড কমণ্ডলু বস্ত্রাদি সমস্ত রাখিয়া স্নানার্থ ভাগীরথীর এই নির্মল জলে মস্তক নিমজ্জিত করিবামাত্র কি ঘটিল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পরক্ষণেই এক শবরীর গর্ভে জন্ম লইলাম। তাহার পর তোমার পত্নী হইলাম। এই গঙ্গাজলে স্নান করিবামাত্র পুনরায় পূর্ববৎ ঋষিরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই দেখ আমার বস্ত্র, কমণ্ডলু ও দণ্ড পূর্ববৎ পড়িয়া রহিয়াছে। তোমার গৃহে বাস করিবার কালে আমার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু এতকাল পর্যন্ত আমার দণ্ড বস্ত্রাদি জীর্ণ বা গঙ্গাসলিলে অপহৃত হয় নাই, এখনও এখানে সমভাবে রহিয়াছে।' উভয়ের এইরূপ কথোপকথনের মধ্যেই হঠাৎ নিষাদ একেবারে অদৃশ্য হইল। তাহার সন্তানসন্ততিও আর দৃষ্টিগোচর হইল না।

তখন সেই সোমশর্মা ঊর্ধ্বশ্বাস, ঊর্ধ্ববাহু হইয়া পবনাশনে ঘোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে দিবা অবসান হইল তিনি তপস্যা ছাড়িয়া বিধিমত পূজাকার্য আরম্ভ করিলেন। পরে যে সকল ব্রাহ্মণ স্নানার্থ তথায় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সেই সোমশর্মাকে পরিবেষ্টন করিয়া কহিলেন—'দ্বিজবর, তুমি পূর্বাহ্ণে দণ্ড কমণ্ডলু প্রভৃতি রাখিয়া কোথায় গিয়াছিলে? তুমি কি পথ ভুল করিয়াছিলে? তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন?' মুনিবর ব্রাহ্মণগণের কথা শুনিয়া মৌন অবলম্বন করিয়া রহিলেন। এদিকে দ্বিজগণও প্রত্যুত্তর না পাইয়া স্ব-স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। তপোধন মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'কি আশ্চর্য! আজ অমাবস্যা, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইল। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কেন বলিতেছেন—তুমি সকালে এ সমস্ত রাখিয়া কোথায় গিয়াছিলে সারাদিন?'

মুনি ইহা চিন্তা করিতেছেন এমন সময় ভগবান বিষ্ণু তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন—'তপোধন, তোমাকে এত উদ্‌ভ্রান্ত ও ব্যগ্র দেখিতেছি কেন?' সোমশর্মা ভূতলে মস্তক অবনত করিয়া বারবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দুঃখিত মনে কাতর বচনে বলিলেন, 'হে জগদ্‌গুরো! এইমাত্র দ্বিজগণ আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তুমি পূর্বাহ্ণে দণ্ড কমণ্ডলু প্রভৃতি এইস্থানে রাখিয়া অপরাহ্ণ পর্যন্ত কোথায় গিয়াছিলে? তোমার কি পথভ্রম হইয়াছিল? কিন্তু আমি ব্যাধের ঘরে জন্ম লইয়া সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কাল নিষাদপত্নী থাকিয়া কয়েকটি পুত্রকন্যার জননী হইয়াছি। এতগুলি অপত্য জন্মিবার পর আমি একদিন স্নানার্থ গঙ্গাতটে আসিলাম এবং তথায় বস্ত্রাদি রাখিয়া জলে অবতরণান্তে যেমন মস্তক মগ্ন করিয়াছি অমনি পুনর্বার পূর্ববৎ মুনিরূপ ধারণ করিলাম। হে প্রভো! আমি কি আপনার সেবায় ত্রুটি করিয়াছি? তপস্যাকালে আমার কোন অপরাধ হইয়াছে কি? এসকল চিন্তা করিয়া আমি

একান্ত আকুল হইয়াছি সুতরাং আমার এই নরকভোগের যথাযথ কারণ বলুন। আমার তো কিছু স্মরণ হইতেছে না। তবে পূর্বে আমি মায়াতত্ত্ব জানিতে চাহিয়াছিলাম, এই মাত্র।'

দুঃখসন্তপ্ত সোমশর্মার কথা শেষ হইলে তাঁহার সেই করুণ কাহিনী শুনিয়া নারায়ণ কহিলেন—'ব্রাহ্মণ, তুমি দুঃখ করিও না। তোমার দোষে বা আমাকে পূজার ত্রুটিতে তোমার এরূপ দুঃখপ্রাপ্তি ঘটে নাই। তুমি আমার নিকট অন্য বর না চাহিয়া কেবল আমার মায়াতত্ত্ব জানিতে উৎসুক হইয়াছিলে। আমি তোমায় তাহাই দেখাইলাম। দেখ, একদিনও অতীত হয় নাই, অপরাহ্ণও আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। অথবা নিবাদগৃহে তোমার পঞ্চাশ বৎসর অতিবাহিত করাও হয় নাই। হে দ্বিজবর, তোমায় আরও একটি কথা কহিতেছি শুন—তুমি অশুভ কর্মের জন্য নিষাদজন্ম লাভ করিয়াছ বলিয়া যে অনুতাপ করিতেছ, তাহাও ঠিক নহে। সবই আমার মায়া। তুমি কেবল বিস্ময়বশেই অনুতাপ করিতেছ। নতুবা ইহ-জন্মে কোনও কুকর্মের অনুষ্ঠান বা আমার অর্চনায় কোনও ত্রুটি বা তপস্যায় কোনও বিঘ্ন-বিধান কর নাই।' সোমশর্মা মায়াতীর্থে থাকিয়া কঠোর তপশ্চরণ করিতে করিতে দেহ-পাত করিয়া আমার সমীপে আগমন করিলেন। ইহাই মায়াচক্র। ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সাধারণ মানবের সাধ্যাতীত।"

শ্রীশ্রীঠাকুর গান গাহিতেন—

এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি তা জানতে পারে?

এই মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় কি? তিনি উদ্ধার পাইবার উপায় বলিতেছেন—"মায়াকে যদি চিনতে পার, আপনি লজ্জায় পালাবে। একজন বাঘের ছাল পরে ভয় দেখাচ্ছে। যাকে ভয় দেখাচ্ছে সে বলে, তোকে আমি চিনেছি—তুই আমাদের 'হরে'। তখন সে হেসে চলে গেল আর এক জনকে ভয় দেখাতে গেল।" মায়াকে চিনিতে হইলে, মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে মায়ের কাছে প্রার্থনা করিতে হয়—"মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় ভুলিও না, মা।"

পল্লী-বন্দনা

স্বামী তেজসানন্দ

প্রকৃতির রঙ্গভূমি পল্লী মোর, জননী আমার,
দেখায়েছ যুগে যুগে অপরূপ সুষমা তোমার!
বহে কত নদনদী, ফোটে শত সুরভি কমল,
মধুলোভে দিকে দিকে ভ্রমে যত ভ্রমর চঞ্চল।

হরিৎ শোভায় দোলে জননীর শ্যামল অঞ্চল,
পুলকে নাচিয়া ওঠে দেখে যত সোনার ফসল
কৃষিকুল আকুলিত, নৃত্যরত হরষ পরাণে
দলেদলে চলে মাঠে, কত আশা হৃদয়ের কোণে!

কিন্তু হায়! প্রকৃতির প্রলয়-তাণ্ডব যবে শুরু,
নদ নদী হ্রদ নালা উৎস আদি সব হয় মরু।
কৃষকের স্বপ্ন-স্বর্গে হানা দেয় হতাশা-দানব,
স্তব্ধ আশা, স্তব্ধ ভাষা, ধ্বংস হয় সকল মানব।

ঐ হের পল্লবিত ছায়াঘন বনরাজি শোভা,
শ্রান্ত পথিকের নীড়, বনানীর রূপ মনোলোভা।
দাবানল জ্বলে যবে, ভস্ম তার করাল পরশে
পশুপক্ষী মানবাদি, ভীত মনে পলায় তরাসে।

সুরম্য প্রাসাদ-সারি, পল্লীমার পল্লব-কুটীর
ভূকম্পনে চূর্ণ হয়, সাথে নাচে মাতাল সমীর,
প্লাবনের রুদ্র বেগে। লণ্ডভণ্ড বিপুল সংসার,
চারিদিকে আর্তকণ্ঠে ওঠে আজি আর্তি অনিবার।

কোথা অন্ন কোথা গৃহ, কোথা পাব আশ্রয় এবার—
বুভুক্ষায় দিশাহারা নরনারী করে হাহাকার।
প্রকৃতির পরিহাস কেহ নাহি পারে বুঝিবারে,
অপূর্ব বিধান তাঁর, দুঃখ মাঝে মগ্ন রাখিবারে।

এ-লীলায় ভ্রান্ত, হের—হাসে কাঁদে কত শত প্রাণ,
ওঠে ভাসে ডুবে মরে কোটি কোটি মানবসন্তান।
কে বুঝিবে ভাঙ্গা-গড়া, এই বিশ্বসংসারের মাঝে
কি শিখায় প্রকৃতি বা বারে বারে সাজি নব সাজে?

দয়াল, ভয়াল অতি প্রকৃতির বিচিত্র আকার
যে বোঝে সে মজে প্রেমে, করে সদা আরতি তাঁহার।
এস দীন, এস হীন, যে যেথায় রহিয়াছ প'ড়ে
আলস্য জড়তা ফেলি ছুটে এস জননীর ক্রোড়ে।

চাষ করি চাষী ভাই, জননীরে দাও উপহার
অমূল্য জীবন-বলি, পূজা হোক সার্থক তোমার।
আসিবে বঙ্গের লক্ষ্মী, পুনঃ ঘরে ছুটিবে উল্লাস,
আনন্দে মাতিবে সবে, টুটে যাবে সকল হতাশ।

প্রকৃতির রানী পল্লী, লহ মাগো প্রণতি আমার,
ধন্য হোক এ-জীবন, হেরি পুনঃ সুখের সংসার।

শক্তির বিভিন্ন রূপ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর শ্রীবিশ্বরঞ্জন নাগ

(৫) বৈদ্যুতিক শক্তি

ঘর্ষণজনিত তড়িৎ নিয়েই প্রথমে তড়িতের অনুশীলন আরম্ভ হয়। দেখা যায় কতগুলি পদার্থ ঘর্ষণে তড়িতান্বিত হবার পরে তড়িৎকে সীমান্বিত স্থানে ধরে রাখতে পারে; যেমন কাঁচ, অভ্র, এবনাইট ইত্যাদি। এদের নাম দেওয়া হয়েছে তড়িৎ-অপরিবাহী পদার্থ (Insulator), আবার অন্য ধরনের পদার্থ আছে যাদের তড়িতান্বিত করলে তড়িৎ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, এদের নাম দেওয়া হয়েছে তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থ (Conductor); যেমন তামা, রূপা, লোহা ইত্যাদি। তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থে তড়িৎ এক জায়গা থেকে অন্যত্র সহজেই চলে যেতে পারে। তাই যখন দুটি তড়িৎ-যুক্ত পদার্থকে কোন ধাতুর তার দিয়ে যোগ করে দেওয়া যায় তখন পদার্থদুটির তড়িৎ তারের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়। এই মিলনের সময়ে ইলেকট্রনগুলি তারের মধ্যে একই দিকে গতিশীল হয়। যখন কোন পদার্থে ইলেকট্রনগুলি সম্মিলিতভাবে একই দিকে চলতে আরম্ভ করে তখন বলা হয় পদার্থটিতে তড়িৎ-প্রবাহ (Current) চলছে। তড়িৎপ্রবাহের জোর নির্ভর করে পদার্থদুটির তড়িতের পরিমাণ এবং আকার ও আয়তনের উপরে। তাপযুক্ত দুটি পদার্থের মধ্যে তাপবিনিময় মোট তাপের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না—নির্ভর করে পরস্পরের তাপমাত্রার তারতম্যের উপরে। তেমনি তড়িৎপ্রবাহের ক্ষেত্রেও তড়িৎযুক্ত পদার্থের তড়িৎ প্রবাহিত করার ক্ষমতা নির্ভর করে তড়িৎবিভবের (Potential) উপরে। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে একই বস্তুতে তড়িতের পরিমাণ বাড়ালে তার বিভব বাড়ে ঠিক যেমনটা কোন বস্তুতে তাপশক্তি বাড়িয়ে গেলে তার তাপমাত্রা বাড়ে। কিন্তু একই পরিমাণের তড়িৎ বিভিন্ন বস্তুতে সঞ্চারিত করলে যে বিভব হয় তা তাদের আকার, আয়তন এবং অন্য বস্তুর নৈকট্যের উপরে নির্ভর করে। দুটি তড়িৎযুক্ত বস্তুকে তার দিয়ে যোগ করলে যে বস্তুটির বিভব বেশী সেই বস্তুটি থেকে অন্য বস্তুটিতে তড়িৎপ্রবাহ চলে।

ঘর্ষণজাত তড়িৎ ব্যবহার করে ক্ষণস্থায়ী তড়িৎপ্রবাহই তৈরী হতে পারে। কেননা এক্ষেত্রে তড়িৎপ্রবাহের ফলে বস্তুটির বিভব সাম্যাবস্থায় আসে। কালক্রমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা দেখতে পান যে দুটি ভিন্ন ধাতুর দণ্ডকে বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পদার্থে ডুবিয়ে রাখলে দণ্ডদুটিতে তড়িৎবিভব সৃষ্টি হয় যার দ্বারা দীর্ঘস্থায়ীভাবে তড়িৎপ্রবাহ চালানো যেতে পারে। রাসায়নিক ক্রিয়ায় রাসায়নিক শক্তিই এই স্থির বিভব সৃষ্টি করে। এমনি তড়িৎবিভবের উৎসকে বলা হয়েছে বৈদ্যুতিক সেল; টর্চের ব্যাটারী এরই সমগোত্রীয়। তড়িৎপ্রবাহে ইলেকট্রনগুলি সম্মিলিতভাবে একই দিকে গতিশীল থাকে। কাজেই যে কোনও গতিশীল বস্তুর মত ইলেকট্রনগুলিতে গতিজনিত শক্তি থাকে এবং এ থেকেই আসে বৈদ্যুতিক শক্তি।

বৈদ্যুতিক শক্তিকে সহজেই অন্যশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। বিশেষ ধরনের ধাতুর তারে তড়িৎপ্রবাহ পাঠালে খুবই সহজে

বৈদ্যুতিক শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের হিটার, ষ্টোভ, বৈদ্যুতিক কেতলী এই সবে এমনি তারে তড়িৎ-প্রবাহ চালিয়ে তাপ উৎপন্ন করা হয়। আবার খুব জোরালো তড়িৎপ্রবাহ পাঠালে ধাতুর তারটির তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে তারটি আলোও বিকিরণ করতে থাকে এবং বৈদ্যুতিক শক্তি আলোতে রূপান্তরিত হয়। বৈদ্যুতিক আলোয় এমনি ভাবেই আলো পাওয়া যায়। বায়বীয় পদার্থেও তড়িৎপ্রবাহ চালালে পদার্থের পরমাণুগুলি বৈদ্যুতিক শক্তি গ্রহণ ক'রে আলো উৎপন্ন করে। ফ্লোরেসেন্ট বাতি, নিয়ন বা অন্যান্য রঙীন বাতিতে এমনিভাবে বৈদ্যুতিক শক্তি আলোতে রূপান্তরিত হয়।

তড়িৎপ্রবাহ থেকে যেমন তাপ ও আলো পাওয়া যেতে পারে তেমনি আবার আলো বা তাপকেও বিদ্যুৎপ্রবাহে রূপান্তরিত করা যায়। দুটি বিভিন্ন ধাতুর তারকে জুড়ে, জোড়াটিকে গরম করা হলে তার দুটির মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলে। উচ্চ তাপমাত্রা মাপার জন্য এই থার্মোকাপ্‌লের ব্যবহার হয়ে থাকে। আবার বিশেষ ধরনের ধাতুর উপরে আলো ফেললেও তড়িৎপ্রবাহ চলে। ক্যামেরার আলো পরিমাপক যন্ত্রে এমনি আলো-বিভব-কোষ (Photo-electric-Cell) ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আলো, তাপ ও বিদ্যুৎশক্তির পরস্পরের মধ্যে সহজ রূপপরিবর্তন থেকে বলা যেতে পারে তড়িৎপ্রবাহের ইলেকট্রনের গতিজনিত শক্তি বা বৈদ্যুতিক শক্তি অন্যান্য শক্তির সমগোত্রীয়। বিশেষ অবস্থায় তড়িৎপ্রবাহের অদৃশ্য শক্তিই তাপ বা আলো হয়ে আমাদের অনুভূতিতে আসে।

ব্যাটারীর সেল ব্যবহার করে যে তড়িৎ-প্রবাহ পাওয়া যায় সাধারণতঃ তার জোর খুব বেশী করা যায় না। আবার শুধুমাত্র তড়িৎপ্রবাহ থেকে আলো বা তাপ পাওয়া গেলেও যান্ত্রিক শক্তি পাওয়া যায় না। তাই সেলের বৈদ্যুতিক শক্তি বহুদিন পর্যন্ত পরীক্ষাগারে বিজ্ঞানীদের কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা রূপেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই কৌতূহল থেকে বিজ্ঞানীরা কয়েকটি বিশেষ তথ্য জানতে পারেন যার ফলে মানুষের প্রয়োজনীয় কাজে বৈদ্যুতিক শক্তি আজ অপরিহার্য রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে।

যদি কোন তারে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলে তাহলে তারটির বাহ্যিক অবস্থানের কোন পরিবর্তন সাধারণভাবে দেখা যায় না। কিন্তু চুম্বকের

১নং চিত্র
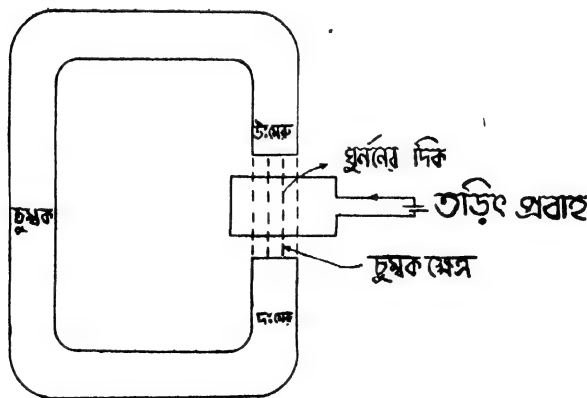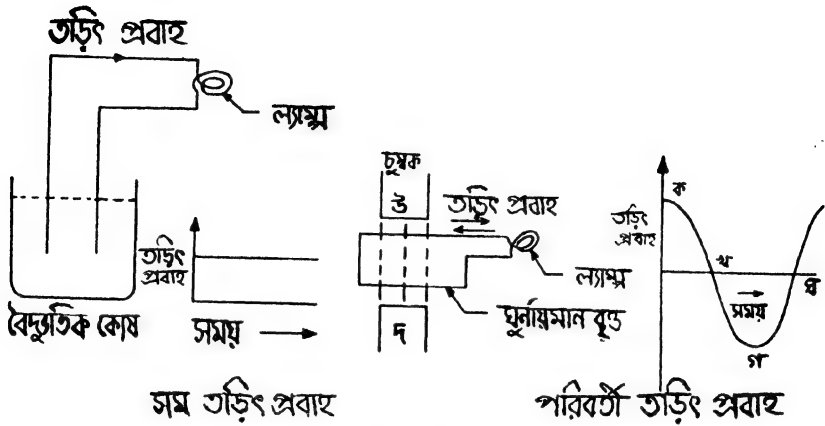
২নং চিত্র

সান্নিধ্যে রেখে তড়িৎপ্রবাহ চালালে তারটিতে গতি সঞ্চারিত হয় বা তারটিতে গতিজনিত যান্ত্রিক শক্তি প্রকাশিত হয়। চুম্বকের বিশেষ ধরনের অবস্থানে এমনটা করা যেতে পারে যে, চুম্বকক্ষেত্রে কোন তারের বৃত্তে তড়িৎপ্রবাহ চালালে তারটি ঘুরতে থাকবে (১নং চিত্র); ঠিক যেমনটা বায়ুর গতিজনিত শক্তি ব্যবহার করে বায়ুচালিত যন্ত্রের চাকা ঘোরানো হয়। এই আবিষ্কারের ফলে বৈদ্যুতিক শক্তিকে সোজাসুজি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হল।

চুম্বক ও বিদ্যুৎ প্রবাহের পরস্পরের প্রভাব নিয়ে পরীক্ষা করে আরো দেখা গেল যে চুম্বকের সান্নিধ্যে কোন তারের বৃত্তকে ঘোরালে ঐ বৃত্তে তড়িৎপ্রবাহ চলতে আরম্ভ করে। কাজেই চুম্বকক্ষেত্রকে ব্যবহার করে যান্ত্রিক শক্তিকে সহজেই বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। এর ফলে খুব জোরালো বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র তৈরী করা সম্ভব হল। কেননা নানাভাবে প্রচুর পরিমাণে যান্ত্রিক শক্তি পাওয়া যেতে পারে। বর্তমানে বিদ্যুৎউৎপাদন ক্ষেত্রে এই ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করেই কয়লার তাপশক্তি বা জলধারার অবস্থানজনিত শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎশক্তি এ ভাবে সহজেই যান্ত্রিক শক্তি, আলো- বা তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয় বলে এবং যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব বলেই বিদ্যুৎ বর্তমান সভ্যতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। অদৃশ্য ইলেকট্রনগুলির গতির মাধ্যমে ধাতুর তারকে আশ্রয় করে বিদ্যুৎশক্তি বহুদূরে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই বিদ্যুৎশক্তি প্রকৃতিতে স্বতঃপ্রকাশিত না হলেও বর্তমান কালে সর্বক্ষেত্রেই শক্তিকে প্রধানতঃ বিদ্যুৎ-শক্তিরূপেই সভ্য মানুষ দেখতে পায়। পৃথিবীর অভ্যন্তরে, গহন অরণ্যে বা পর্বতমালায় যেখানেই প্রকৃতি শক্তি সঞ্চয় করে রাখে সেখান থেকেই বিদ্যুতের মাধ্যমে এই শক্তিকে মানুষ তার নিজের ঘরে নিয়ে আসছে। আবার চুম্বকক্ষেত্রের ব্যবহার করে যে কোন যান্ত্রিক গতিজনিত শক্তিকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করা যায় বলে শব্দকেও বিদ্যুতে রূপান্তরিত করে বহুদূরে নিয়ে যাওয়া হয়, যার ফলে সম্ভব হয়েছে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ যন্ত্র—মানুষের

খবরাখবর আদানপ্রদান করার সর্বাধিক প্রচলিত যন্ত্রপাতি।

শব্দকে যখন বিদ্যুতে রূপান্তরিত করা হয় বা চুম্বকক্ষেত্রে কোন তারের বৃত্তকে ঘুরিয়ে যখন বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা হয় তখন ইলেকট্রনের কণাগুলি সমষ্টিগতভাবে গতিশীল হলেও সেলের তড়িৎপ্রবাহে ইলেকট্রনের যে গতি হয় তা থেকে এই গতি একটুখানি ভিন্ন ধরনের (২নং চিত্র)। সেলের তড়িৎপ্রবাহে ইলেকট্রনগুলি সবসময়েই একই দিকে যায় এবং এই প্রবাহকে বলা হয় সমতড়িৎপ্রবাহ (D. C.)। চুম্বকক্ষেত্রে তারের বৃত্তকে ঘুরিয়ে যে তড়িৎপ্রবাহ হয় তাতে ইলেকট্রনগুলি কোন এক সময়ে একদিকে যেতে থাকে (ক), সময়ের সঙ্গে এদের গতিবেগ কমতে থাকে, ক'মে ক'মে শূন্য হয় (খ)। তারপরে এরা উল্টোদিকে যেতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে উল্টো-দিকে গতিবেগ বেড়ে একটি উচ্চ সীমায় আসে (গ)। আবার গতিবেগ কমতে আরম্ভ করে এবং ক'মে ক'মে শূন্য হয়ে (ঘ), দিক পরিবর্তন ক'রে আগের দিকে চলতে আরম্ভ করে। বলা যেতে পারে এক্ষেত্রে ইলেকট্রন-গুলো যেন তারের মধ্যে আন্দোলিত হতে থাকে এবং আন্দোলায়মান ইলেকট্রনগুলিও শব্দশক্তির মতই গতিজনিত শক্তিকে ধরে রাখে। এই ধরনের তড়িৎপ্রবাহকে বলা হয় পরিবর্তী তড়িৎপ্রবাহ (A.C.)। পরিবর্তী তড়িৎপ্রবাহের বিদ্যুৎশক্তিকেও সমতড়িৎ-প্রবাহের শক্তির ন্যায় আলো, তাপ বা যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় এবং আমাদের কাজে ব্যবহারের দিক থেকে এদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। তবে পরিবর্তী তড়িৎ-প্রবাহের বিদ্যুৎশক্তি তাপশক্তির ন্যায় দুভাবে থাকতে পারে। তাপশক্তি বস্তুকে আশ্রয় করে থাকতে পারে আবার বস্তু-নিরালম্বভাবে শূন্যেও প্রকাশিত হতে পারে। তেমনি পরিবর্তী তড়িৎপ্রবাহের শক্তির একটা অংশ ইলেকট্রন-গুলিকে আশ্রয় করে ধাতুর তারে প্রকাশিত হয় আবার একটা অংশ ইলেকট্রন থেকে বিচ্যুত হয়ে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে। প্রবাহের পরিবর্তনের হার বা কম্পনাঙ্ক যতই বাড়ে ততই এই দ্বিতীয় অংশটির পরিমাণ বাড়ে। বিদ্যুৎশক্তি মহাশূন্যে যে রূপে ছড়িয়ে পড়ে তাকেই বলা হয় বেতারতরঙ্গ (৩নং চিত্র)। আলো, বিকীর্ণতাপ ও বেতারতরঙ্গ সমগোত্রীয় এবং মূলতঃ এক। পার্থক্য শুধুমাত্র কম্পনাঙ্কের।

৩নং চিত্র
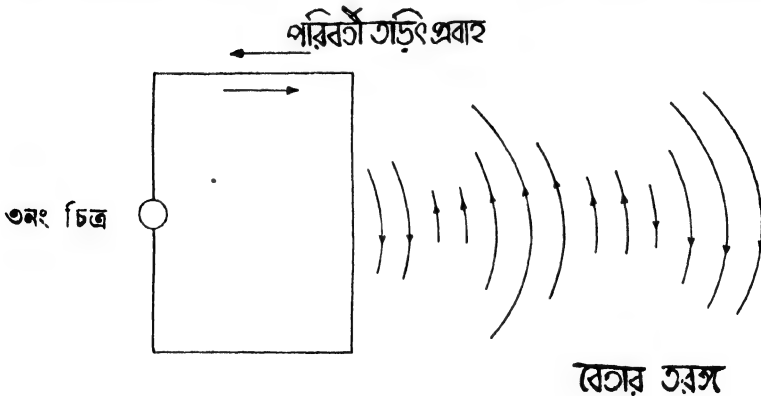
বেতারতরঙ্গের কম্পনাঙ্ক সর্বাপেক্ষা কম। কোন ধাতুর তারে উচ্চ কম্পনাঙ্কের পরিবর্তী বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠালেই বিদ্যুৎশক্তি শূন্যে আলোর গতিবেগ নিয়ে বেতারতরঙ্গরূপে ছড়িয়ে পড়ে। এই বেতারতরঙ্গকে আমরা সাধারণভাবে কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে পারি না। কিন্তু বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই বেতারতরঙ্গকে আশ্রয় করে শব্দ- বা আলো-কে বহুদূরে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, আবার বহুদূরে যন্ত্রের সাহায্যে সেগুলি ধরেও নেওয়া যায়; যার ফলে সম্ভব হয়েছে রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি। তারের মাধ্যমে যেমন কম কম্পনাঙ্কের বিদ্যুৎ-শক্তিকে দূরদূরান্তে পাঠান যায় তেমনি উচ্চ কম্পনাঙ্কের বিদ্যুৎশক্তিকে বেতারতরঙ্গে রূপান্তরিত করে বিনা-তারে মহাশূন্যে ছড়ানো যায়।

সব মিলিয়ে ভাবতে গেলে পরমাণুর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ইলেকট্রনের তড়িৎ হল বিদ্যুৎ-শক্তির আশ্রয়। আমরা একে দেখতে বা অনুভব করতে পারি না। কিন্তু বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ও মাধ্যমে সবরকমের শক্তিই ইলেকট্রনকে আশ্রয় করে বিদ্যুৎশক্তিরূপে প্রকাশিত হতে পারে এবং তারের মাধ্যমে বা বেতার-তরঙ্গরূপে ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিশ্বপ্রকৃতির দিকে তাকালে আমরা আলো, তাপ বা শব্দের মত বিদ্যুৎশক্তির কোন ব্যাপক প্রকাশ দেখি না এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বকে জানতে হলে বিদ্যুৎকে জানবার কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বকে বিশেষভাবে বুঝতে হলে এই অতীন্দ্রিয় বিদ্যুৎ-শক্তিকে বোঝা দরকার কেননা বিদ্যুৎশক্তি হল সব শক্তির সহজ পরিবর্তনীয় রূপ এবং মানুষের সৃষ্ট কৃত্রিম প্রকৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

'মা আমার আয়'

শ্রীমতী ইন্দুবালা মিত্র

কুলায়ে শাবক যথা তৃষিত নয়নে
চেয়ে থাকে জননীর আগমন-আশে,
চেয়ে আছি সেইরূপ আকুল পরাণে
হেরিতে তোমারে প্রতি সন্তানের পাশে।

দারিদ্র্যের কশাঘাতে দীর্ণ প্রতিদিন
অভয়ে, অম্বিকে, তোর স্নেহের সন্তান!
অন্নদে, অন্নের তরে হাহাকার ক'রে
গত হল কত সুত, রাখ কি সন্ধান?

জান না কি গৃহে গৃহে অসুরের বেশে
দুর্নীতি ফিরিছে তীক্ষ্ণ অসি লয়ে করে,
দুঃখহরা হররানী? জান না অভয়ে,
নীরবে গৃহের কোণে কত আঁখি ঝরে?

আয় মা, মুছাতে আয় নয়নের বারি,
আয় মা, ঘুচাতে আয় মরমের ব্যথা,
বরষের গত দুঃখ জমেছে হৃদয়ে
ঢালিয়া চরণে তোর জুড়াব সে ব্যথা!

কেন রব দীন-হীন, বল মা বরদে,
জননী মোদের যবে 'রাজ-রাজেশ্বরী'?
কেন রব বল ভীরু জগতের কাছে
থাকিতে জননী তুমি, শক্তির ঈশ্বরী?

এস মা, এস মা পুনঃ বরষের পরে
সঞ্জীবনী-সুধা লয়ে এ মৃত ভারতে
দাও ঢালি' মহাকালী, সন্তানের শিরে!
স্পর্শে তার জাগুক সে 'মা ভৈঃ'-রবেতে।

এস শক্তিরূপা, এস আনন্দ-প্রতিমা,
সব ভয় দুর্বলতা কর নিবারণ,
ভক্তিহীন—তবু তো মা তোমারই সন্তান—
কৃতাঞ্জলিপুটে আজি করে আবাহন!

শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর আয়ারলণ্ডের টাইরন প্রদেশের ডানগ্যানন সহরে স্যামুয়েল রিচমণ্ড নোবলের গৃহ আলোকিত করিয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ২৮শে অক্টোবর যে দুহিতা ভূমিষ্ঠ হন তিনিই মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল সংক্ষেপে মার্গারেট। পরবর্তীকালে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে ভগিনী নিবেদিতা নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পিতা স্যামুয়েল ছিলেন প্রটেষ্টাণ্ট ধর্মযাজক, সুতরাং তাঁহার পক্ষে স্বাধীন চিন্তার বহুল সুযোগ বর্তমান ছিল। তাঁহার জীবন আদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। পিতৃকুলের বৈশিষ্ট্যসমূহ, আদর্শনিষ্ঠা ও গভীর মানবতা-দৃষ্টির সহিত মাতৃকুলের দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতা-স্পৃহার একাধারে উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন তিনি; তাঁহার স্বদেশানুরাগ ধর্মানুরাগ দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল। মার্গারেট ছিলেন স্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ। কথিত আছে, কৈশোরেই তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত সুকুমার মুখচ্ছবি দর্শনে এবং ঐকান্তিক ধর্মানুরাগ প্রত্যক্ষ করিয়া ভারত-প্রত্যাগত এক ধর্ম-যাজক পিতৃবন্ধু 'একদিন তোমার ভারত হইতে ডাক আসিবে' এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই সেই দিন বালিকা ঐ উক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন নাই। পিতা স্যামুয়েল ও বালিকা কন্যা মার্গারেটের সম্পর্ক সাধারণ পিতা পুত্রীর স্নেহের বন্ধন অতিক্রম করিয়াও যেন অতিরিক্ত আরও কিছু বিশেষত্বে পৌঁছাইয়াছিল। মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে স্যামুয়েল সংসারধাম ত্যাগ করিবার সময় পত্নীকে বালিকা কন্যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছিলেন তাহাতে ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় এবং স্বতই প্রতীতি জন্মে যে কন্যার মাধ্যমে স্বীয় আদর্শের ভবিষ্যৎ সফলতার সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়া স্যামুয়েল শান্তিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। পিতৃবিয়োগে বালিকা যে শুধু গভীর শোক-জনিত প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হইলেন তাহাই নহে, একটা শূন্যতা, একটা অপূরণীয় অভাববোধ সর্বদা তাঁহাকে পীড়া দিতে থাকিল। ইতিপূর্বে পিতামহীর মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকায় মার্গারেট মৃত্যুর সহিত অপরিচিত ছিলেন না।

ভবিষ্যৎ জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন হইবার পূর্বে আরও একটি আঘাত তাঁহাকে সহ্য করিতে হইল। মার্গারেটের ন্যায় তেজস্বিনী, আদর্শবাদী ও ব্যক্তিত্ব-সমন্বিত নারীর জীবনে বহু সুহৃদ পাওয়া সম্ভব নয়। তবুও এক সময় একজন ওয়েলেস্‌বাসী যুবকের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্য ঘটে। চিরাচরিত প্রথানুযায়ী মার্গারেট হয়ত সেই সময় সংসার পাতিবার স্বপ্নও দেখিয়াছিলেন কিন্তু স্বপ্ন বাস্তবে রূপান্তরিত হইবার অবকাশ মিলিল না। মৃত্যুর নির্মম করস্পর্শে ঐ স্বপ্নও অচিরেই বিলুপ্ত হইল। ইহাতে মার্গারেটকে জীবন-মৃত্যুর রহস্য এবং সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলে। অন্যদিকে যে ধর্ম-পরিবেশে তিনি কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন তাহাও তাঁহাকে শান্তিদানে সক্ষম হইল না। তিনি দেখিলেন চার্চের সমাজকল্যাণ-প্রচেষ্টার পশ্চাতে যেন সর্বত্র সঙ্কীর্ণতা ও পক্ষপাতিত্ব বর্তমান। ইহা তাঁহার উদার হৃদয়কে ব্যথিত

করে। তাঁহার মতে মানব-সেবাব্রত নির্বিচারে সকল দুঃস্থ মানবের জন্যই করার স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন; এবিষয়ে দলাদলি ও সপক্ষ-বিপক্ষ জ্ঞান অযৌক্তিক ও অনুদার মনোভাবের পরিচায়ক।

মার্গারেট শিক্ষাকার্য গ্রহণ করিয়া সেই কাজে আপনাকে নিঃশেষে ঢালিয়া দিলেন। যে কাজ গ্রহণ করিতেন তাহা মনে প্রাণে সর্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পাদন করিতে চেষ্টা করাই ছিল তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি বিষয় সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে, সে যত কষ্টসাধ্যই হউক, তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না। একাগ্রতাও ছিল তাঁহার অপরিসীম। সুতরাং স্বল্পকাল মধ্যেই তিনি বহু গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তির প্রশংসাভাজন হইয়া উঠিলেন এবং সমসাময়িক বিশিষ্ট সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কলাবিদ্ প্রভৃতি বহু চিন্তাশীল ও সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদিগের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠিল।

কিন্তু স্বাভাবিক ধর্মানুরাগবশতঃ তাঁহাকে বহু জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইল যাহার সমাধান তিনি কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। তাঁহার অন্তরের জিজ্ঞাসা এবং আদর্শের প্রেরণা কাণ্ডারীবিহীন তরীর ন্যায় তাঁহাকে সংসারসমুদ্রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছিল। অথচ তাঁহার জীবন সাধারণ ভাবে কাটিবে না, অন্তরের অন্তস্তলে এইরূপ এক অস্পষ্ট ইঙ্গিত যেন তিনি অনুভব করিতেন। যেন তাঁহার জন্য মহান কার্যক্ষেত্র অপেক্ষা করিতেছে—কিন্তু সেই কাজ কি এবং কোথায়?

এই পরিস্থিতিতে মার্গারেট সর্বপ্রথম স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন লাভ করেন। প্রথম দর্শনেই অভিনব ভারতীয় যোগীর মধ্যে এক অভূতপূর্ব উদারতা ও অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিকতার পরিচয় লাভ করিয়া নিজের সকল দ্বন্দ্ব ও সংশয় এই মহাপুরুষসকাশেই নিরসন সম্ভব বুঝিয়া মার্গারেট আপনাকে তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করিতে উন্মুখ হইলেন। মার্গারেট নোবল রূপান্তরিত হইলেন নিবেদিতায়। যদিও দীর্ঘ দুইটি বৎসর লাগে এই পরিবর্তন কার্যতঃ সাধিত হইতে, তবুও কিন্তু সূচনা প্রথম দর্শনেই—সিসেম ক্লাবে।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জানুআরি মার্গারেট নোবল ভারতে পদার্পণ করিয়া ভারতবাসী চল্লিশ কোটি নরনারীর ভগিনী নিবেদিতাতে পরিণত হইলেন। এই সময় হইতে আরম্ভ হয় এই অনন্যসাধারণ জীবনসাধনা ও বালিকা বয়সে তাঁহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণীর সার্থকতা।

স্বামীজী বলিতেন, একপক্ষে যেমন পক্ষী উড়িতে পারে না, সমাজেরও তেমন সর্বাঙ্গীণ কুশল অসম্ভব যত দিন নারী পুরুষ উভয়েই সমভাবে উন্নত না হয়। তিনি আরও বলিতেন, উন্নতির জন্য প্রধান প্রয়োজন নারী-শিক্ষা; শিক্ষা পাইলে নারী-সমাজ নিজেদের মঙ্গল ও উন্নতির পথ আপনারাই স্থির করিতে পারিবে, তাহা লইয়া পুরুষকে ভাবিতে হইবে না। স্বামীজী তাঁহার অভ্রান্ত দৃষ্টিতে ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, অন্ধকারে নিমজ্জিত ভারতীয় নারীর শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়া কোনও নারী জীবন বলি দিলে তবেই সফলতা আসিবে। তিনি বলিয়াছিলেন, এই গুরুভার বহন করিবার শক্তি আছে এইরূপ নারী তখন ভারতে বিরল। তাঁহার ভাষায়, ভারতীয় নারী-সমাজের উন্নতিকল্পে প্রয়োজন একজন প্রকৃত সিংহিনী; বিদেশ হইতেই তাহা আমদানী করিতে হইবে। সেই বিদেশাগত সিংহিনীই ভগিনী নিবেদিতা।

নিবেদিতা শুধু ভারতে পদার্পণই করিলেন

না, উপযুক্ত গুরুর শিক্ষাধীনে এবং স্বীয় চরিত্র-গুণে চির-অভ্যস্ত জীবন-যাত্রার আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া আচার-ব্যবহারে এবং মনে-প্রাণে ভারতীয়া হইবার সুকঠোর সাধনায় নিমগ্নাও হইলেন। মিস্ ম্যাকলাউডের প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, 'ভারতবর্ষকে ভাল-বাসিতে শিক্ষা কর।' গুরুর এই বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালনে যত্নবতী হইলেন নিবেদিতা। তিনি এই সুকঠিন ব্রতে কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন আমরা পাই সমসাময়িক ভারতীয় দেশসেবক, কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও কলাবিদ্ প্রভৃতি দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদিগের নিবেদিতার নিকট প্রেরণালাভের স্বীকৃতিতে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'মানুষের সত্যরূপ, চিৎরূপ যে কি, তাহা যে তাঁহাকে জানিয়াছে সে দেখিয়াছে। মানুষের আন্তরিক সত্তা সর্বপ্রকার স্থূল আবরণকে একেবারে মিথ্যা করিয়া দিয়া কিরূপ অপ্রতিহত তেজে প্রকাশ পাইতে পারে তাহা দেখিতে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে মানুষের সেই অপরাহত মাহাত্ম্যকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।' তিনি আরও বলিয়াছিলেন, 'নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য ক্ষমতা আর কোন মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মধ্যে যেন কোন বাধাই ছিল না। তাঁহার শরীর, তাঁহার আশৈশব ইউরোপীয় অভ্যাস, তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ-মমতা, তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং যাহাদের জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তাহাদের ঔদাসীন্য, দুর্বলতা ও ত্যাগ-স্বীকারের অভাব—কিছুই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই।'

ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর নিবেদিতার ত্যাগ ও সেবাব্রতের বহু নিদর্শন তাঁহার লেখনী-মুখে রাখিয়া গিয়াছেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছিলেন, 'এই ভগিনীর ভিতরে হিন্দুধর্মের জন্য যে উচ্ছ্বসিত প্রেম ছিল, তাহা তাঁহার সহিত মতের মিল না হইলেও আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম।' শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভগিনী নিবেদিতাকে 'মহাশ্বেতা' আখ্যায় ভূষিত করিয়া সংক্ষেপে এই পবিত্রতার প্রতিমূর্তি কল্যাণময়ী নারীর কি মনোরম নয়নাভিরাম চিত্রই না অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। বাংলার অগ্নিযুগের মধ্যাহ্নসূর্য পরলোকগত বিপিনচন্দ্র পাল বলিয়াছিলেন, 'ভারতের সনাতন সভ্যতা ও সাধারণ ধারাতে তিনি নিঃশেষে আপনাকে মিশাইয়া দিয়াছেন। এই ইংরেজ মহিলা সমস্ত জীবন দিয়া যেভাবে ভারতকে ভালবাসিয়াছেন, আমাদের দেশের—বিশেষ করিয়া আধুনিক শিক্ষাভিমানীর মধ্যে—খুব কম লোকই সেভাবে দেশকে ভালবাসিয়াছে।'

স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই ভগিনী নিবেদিতা আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ১৮ই জুলাই রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। এই ব্যাপার লইয়া বহু সমালোচনা হইয়াছে। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং কর্মসচিব স্বামী সারদানন্দ সর্বদাই নিবেদিতাকে যে অতি আপনার জন মনে করিতেন, তাহার প্রচুর প্রমাণ রহিয়াছে। অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারীদিগের মধ্যে অনেকে, বিশেষ করিয়া স্বামী সদানন্দ এবং ব্রহ্মচারী অমূল্য (পরে স্বামী শঙ্করানন্দ) নিবেদিতার সহিত সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করিতেন।

এই সিদ্ধান্তও বহু স্থলে গ্রহণ করা হইয়াছে দেখা যায় যে, বিপ্লব আন্দোলনে বাংলার প্রথম ও

প্রধান আচার্য শ্রীঅরবিন্দ নিবেদিতার পূর্ণ সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ অনুমান অসঙ্গত নয় যে নিবেদিতা বিশ্বাস করিতেন, পরাধীন ভারতের সর্বপ্রথম প্রয়োজন আত্মনিয়ন্ত্রণ। সুতরাং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে রাজনীতি হইতে মুক্ত রাখা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত সংঘ হইতে তিনি বিচ্ছিন্ন হইয়া যান, কারণ স্বামীজী সংঘকে রাজনীতিতে যোগদান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। অপর পক্ষে রাজনীতি-ক্ষেত্রে নিবেদিতার যথেষ্ট অবদান থাকা সত্ত্বেও এইরূপ নিশ্চিত প্রমাণ উত্থাপন করা কঠিন যে বিপ্লবীদিগের সর্বপ্রকার কার্যপদ্ধতিতে নিবেদিতার পূর্ণ অনুমোদন ছিল। তাঁহার লেখা ইত্যাদি হইতে অবশ্য সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, স্বাধীনতালাভের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা—তাহা যে পথেই হউক—অনুচিত নয়। নিবেদিতার ন্যায় ভাবপ্রবণ, অটল ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও অনমনীয় মনোবলসম্পন্না তেজস্বিনী নারী যাহা ভাল বুঝিবেন সেই দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িবেন—ইহাই স্বাভাবিক সন্দেহ নাই। বিপ্লবীদিগের লেখা হইতে ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে, তিনি তাঁহাদের এক নিশ্চিত ভরসাস্থল ও নির্ভরশীল আশ্রয় ছিলেন।

কিন্তু অপরদিকে তিনি আমরণ গুরুভক্তি, ধর্মানুরাগ বা সেবাব্রত হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিতা হন নাই। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে সেপ্টেম্বর 'A Benediction' কবিতায় স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে যে আশীর্বাদ করেন তাহাই ছিল নিবেদিতার প্রকৃত স্বরূপ :

'বীরের সঙ্কল্প আর মায়ের হৃদয়,
দক্ষিণের সমীরণ—মৃদুমধুময়,
আর্যবেদী 'পরে দীপ্ত মুক্ত হোমানলে
যে পুণ্য সৌন্দর্য আর যে শৌর্য বিরাজে
সকলই তোমার হোক, আরো, আরো কিছু
স্বপ্নেও ভাবেনি যাহা অতীতের কেহ।
ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তানের তরে
তুমি হও বন্ধু, দাসী, গুরু—একাধারে।'

এই মহীয়সী নারী আপন জীবনব্রত উদ্‌যাপনে তিলে তিলে হৃদয়ের শোণিত মোক্ষণ করিয়া আপনাকে নিঃশেষে ভারতের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। স্বামীজীর সহপাঠী লাহোর 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ' পুস্তকে লিখিয়াছেন, 'প্রথম যখন ভারতে পদার্পণ করেন, নিবেদিতা অপূর্ব সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারিণী ছিলেন কিন্তু ভারতীয় জলবায়ুতে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে অচিরেই স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়।' ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সেই শ্রীরামকৃষ্ণচরণে নিবেদিত এই কুসুমটি অকালে ঝড়িয়া পড়ে।

আগামী ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে নিবেদিতার জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হইবে। বাঙ্গালী তথা ভারতবাসী মাত্রেরই একাধারে মাতা, শিক্ষয়িত্রী ও ধাত্রীসমা বিদেশিনীর মহিমামণ্ডিত স্মৃতিতর্পণ উপযুক্ত শ্রদ্ধা সহকারে সম্পাদন করিলে তাঁহার অপরিশোধনীয় ঋণের কিঞ্চিৎ লাঘব হইতে পারে। ভারতীয় তথা বাঙ্গালী নারীসমাজকে পূর্বাবধি বিশেষরূপে প্রস্তুত হইতে হইবে যাহাতে এই মহান জীবন আলোচনা ও অনুধ্যানের মাধ্যমে তাঁহার আদর্শ ও ভাবধারা নারীজীবনে রূপায়িত করিয়া ভারতে পুনরায় লীলাবতী, মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতির আবির্ভাব সহজ হইতে পারে—যাহা ছিল নিবেদিতার স্বপ্ন ও স্বামী বিবেকানন্দের ভবিষ্যদ্‌বাণী। আজ যে ভারতীয় নারী পৃথিবীর সকল অগ্রণী সুসভ্য দেশের নারী অপেক্ষা অধিক বা সমতুল্য অধিকার লাভ করিতেছেন তাহার মূলে এই বিদেশিনীর দান অবিস্মরণীয়।

কেদার-বদ্রী দর্শন

স্বামী অমলানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

পূজার জন্য আমাদের ডাক এল। পূজার উপচার সামান্য। সবই শুকনো জিনিস। শুকনো ডাল, বাদাম, নকুলদানা আর সাদা ফুল। বেলপাতা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। মন্দিরের প্রবেশমুখে সিদ্ধিদাতা গণেশ—তাঁর পূজা সকলের আগে। তারপর নাটমন্দির অতিক্রম করে গর্ভমন্দির। সেখানে দেবাদিদেব কেদারনাথ। দেবাদিদেব কেদারনাথ এখানে ত্রিকোণাকার এক প্রস্তরমূর্তি। তাঁকে দর্শন, স্পর্শন ও পূজাদি করে নাটমন্দিরে পার্বতীর পূজা করলাম। নাটমন্দিরে পঞ্চপাণ্ডব ও মাতা কুন্তীদেবীর মূর্তি আছে। মন্দিরের বাইরেও কয়েকটি ছোট মন্দির—দুর্গাদেবী প্রভৃতির।

মন্দির কে বা কারা এবং কখন করেছেন একথা যখন উঠল পাণ্ডাজী তখন খুব জোরের সঙ্গে বললেন, পাণ্ডবেরাই এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর মতে মূল মন্দিরের উদ্ভব সাড়ে তিন হাজার বছর আগে। অবশ্য পরবর্তীকালে বারে বারে তার সংস্কার হয়েছে। শঙ্করাচার্যের সময় একবার সংস্কারকার্য হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য আচার্য শঙ্করের দেহাবসান এখানে ঘটেছিল। তাঁর মূর্তিসহ একটি স্মৃতি-মন্দির কেদারনাথ-মন্দিরের অদূরে বিরাজ করছে। শেষ সংস্কার-কার্য গড়বালের রাজা অজয় পালের সময়—ইংরেজদের আসার আগে।

মন্দির পরিচালনার ভার রাজ্যসরকার-নিযুক্ত এক কমিটির উপর হলেও গড়বালের রাজার এখনও অনেকখানি কর্তৃত্ব আছে; কোন্ দিন মন্দির খুলবে তা তিনিই স্থির করে দেন। সাধারণতঃ অক্ষয় তৃতীয়ায় (মে মাসের প্রথম সপ্তাহ) মন্দির খোলে ও ছ-মাস খোলা থাকে। মন্দিরের পূজারী দাক্ষিণাত্যের জঙ্গম সম্প্রদায়ের শৈব ব্রাহ্মণ। রাওল নামে তিনি অভিহিত। মন্দিরের পূজাদির সকল ব্যবস্থাপনার সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁর হাতে। নভেম্বর থেকে এপ্রিল এই ছ-মাস কেদারনাথের মন্দির বন্ধ থাকে এবং তখন তাঁর উদ্দেশ্যে পূজাদি নিবেদিত হয় উখীমঠ থেকে।

কেদারনাথের উচ্চতা ১১,৭৫০ ফুট; শীত খুব বেশী। তাই যাত্রীরা পূজাদি সেরে বিকেলে রামওয়াড়া নেমে আসে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য মন্দির দুটো পর্যন্ত খোলা থাকে। আমরা বিকেলে না ফিরে ঐদিন থেকে গেলাম। সন্ধ্যার আকর্ষণ ৺কেদারনাথের আরাত্রিক। চন্দন ও ফুল দিয়ে অতি সুন্দরভাবে ঐ সময়ে বাবাকে সাজানো হয়। পরদিন সকালে বাবা কেদারনাথকে দর্শন ও প্রণামাদি করে ফিরবার জন্য প্রস্তুত হলাম। একদিনে এ-স্থানে মন ভরে না। বারবার অতৃপ্ত নয়নে কেদারনাথের মন্দির ও হিমালয়কে দর্শন করে ও বাবার জয়-ধ্বনি দিয়ে আমরা ফিরবার পথে পা বাড়ালাম।

ফিরবার পথে গুপ্তকাশী পর্যন্ত ছক কাটা। শুধু যেখানে চড়াই ছিল সেখানে এখন উৎরাই —আর যেখানে উৎরাই ছিল সেখানে চড়াই। রামওয়াড়া, গৌরীকুণ্ড, রামপুর, ফাটাচটিগুলি আগে ছিল অজানা অচেনা—এখন জানাশোনা বন্ধু। সদ্যপরিচয়ের উত্তাপ অনুভব করছি এবং একটির পর একটি পার হয়ে চলেছি। আগে আমরা ত্রিযুগীনারায়ণ যাইনি; তাই ফিরতি-পথে ত্রিযুগীনারায়ণ দর্শন করি। ত্রিযুগীনারায়ণের উচ্চতা ছয় হাজার ফুট।

ত্রিযুগীনারায়ণ যাওয়ার জন্য কালীগঙ্গার (গৌরীকুণ্ড ও রামপুরের মধ্যে) পুল পার হয়েই চড়াই-এর পথ ধরতে হয়। আমরা গৌরীকুণ্ড থেকে খুব ভোরে বেরিয়েছিলাম। যখন চড়াই আরম্ভ হল তখন রোদ উঠে গেছে। প্রায় দু'মাইল খাড়া চড়াই। বনের ছায়াপথে যতই এগোচ্ছি ততই দেখছি চারদিকে ফল, ফুল ও শস্যসম্ভার। শুধু গুপ্তকাশী থেকে কেদারের মধ্যে নয়, আমাদের সমগ্র যাত্রাপথে এরকম উর্বর উপত্যকা আমরা দেখিনি বললেও চলে। চড়াই যেখানে শেষ হল সেখানে শাকম্ভরী দেবীর (মনসা) মন্দির। প্রবাদ বলে, পাণ্ডবেরা কেদারের পথে শাকম্ভরী দর্শন করেছিলেন ছিন্নবস্ত্রে। এখান থেকে এক মাইল দূরে ত্রিযুগীনারায়ণের মন্দির। এখানে হরপার্বতীর বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল এবং লক্ষ্মী ও নারায়ণ সে বিবাহের সাক্ষী হয়ে মন্দিরে বিরাজ করছেন। সামনে বিরাট হোমকুণ্ড—হোমাগ্নি অনির্বাণ জ্বলছে তিন যুগ ধরে। মন্দিরের প্রাঙ্গণস্থ কুণ্ডে স্নানাদি করে ভোলানাথ পাণ্ডার সাহায্যে আমরা দর্শন ও পূজাদি করলাম। বিশ্রাম হল মন্দিরের নিকটবর্তী কালীকম্বলী ছত্রে। গুজরাটি এক ভদ্রলোক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমাদের ভিক্ষা দিলেন—পুরী ডাল ও সবজি।

তারপর রাত্রির অবস্থান রামপুর-চটিতে। পরের দিন (২৬শে মে, ১৯৬৬) ফাটা, মৈখণ্ডা ও ভীমাঙ্গ প্রভৃতি হয়ে আমরা সন্ধ্যার একটু আগে গুপ্তকাশীতে পৌঁছি। যাত্রীদের এত ভীড় যে আমরা কালীকম্বলী ছত্রে জায়গা পেলাম না। বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছে একটি চায়ের দোকান হল আমাদের রাত্রের আশ্রয়; —ত্রিপলের ছাউনি এবং ছেঁড়া চটের দেওয়াল —কিন্তু ভয়ের কোন কারণ নেই। এ পথে চোরডাকাত নেই—অন্ততঃ আমাদের সমস্ত যাত্রাপথে কোথাও শুনিনি যে কোন চটিতে বা পথে যাত্রীদের কাছ থেকে কিছু চুরি ডাকাতি হয়েছে। আর একটা উল্লেখযোগ্য কথা হল, গুপ্তকাশী থেকে কেদারের সারা হাঁটা পথে আমরা একটিও পুলিস কোথাও দেখিনি।

প্রাচীন ভারত আজও বেঁচে আছে হিমালয়ের চড়াই ও উৎরাই-এর মাঝখানে।

বাবা কেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণের জয়ধ্বনি দিয়ে গুপ্তকাশী থেকে সাতাশে মে'র ভোরে আমাদের বাস ছাড়ল—এবার আমরা বদ্রীনাথের যাত্রী।

গুপ্তকাশী থেকে রুদ্রপ্রয়াগ চব্বিশ মাইল আমাদের চেনা পথ। মন্দাকিনীর ধারে ধারে বাস এগুতে লাগল কুণ্ডাচটি ও অগস্ত্যমুনি প্রভৃতি আমাদের পূর্বপরিচিত স্থানগুলি পার হয়ে আমরা সকাল আটটার মধ্যে রুদ্রপ্রয়াগে এসে গেলাম। রুদ্রপ্রয়াগে পুলিশ-চেকিং হয়ে গেলে বাসগুলি পূর্বমুখে অলকানন্দার দক্ষিণতীর ধরে ছুটতে লাগল। থামল গৌচরে। গৌচরে অনেকখানি জায়গা সমতল—সবুজ ঘাসের নয়ন-বিমোহন আস্তরণ। বাস ছেড়ে সমতলের অধিবাসীরা মনের আনন্দে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কাছেই বাজার, অনেকদিন পরে আমরা ২।৩ রকমের ফল একসঙ্গে দেখলাম—কমলা, কলা আর আম। দামের দিকে লক্ষ্য না রেখে আমরা হাতের কাছে যা পেলাম তা কিনে নিলাম। কাছে দু'একটি স্কুলও আছে—স্কুলের ছেলেরা Progress Report ও পরীক্ষার মার্কশীট নিয়ে মহা আনন্দে তাদের অভিভাবকদের দেখাচ্ছে।

বাস হর্ণ দিয়েছে—সবাই দৌড়ে এসে উঠল বাসে। গৌচর থেকে বাস ছুটেছে মিলিটারি তাঁবু আর ছোট গ্রামের ধার দিয়ে।

গমভরা চাষের ক্ষেতও পড়ল অনেকগুলি। কিছু গ্রামবাসীকেও দেখা গেল পথের ধারে ধারে। নীচে অলকানন্দা অনেকটা প্রশস্ত—আর তাতে ভেসে যাচ্ছে সাইজ-করা কাঠগুলি হিমালয়ের প্রচুর সম্পদ। তার মধ্যে শুধু কাঠের ব্যবসা আর মৌমাছির চাষ নিয়ে বেঁচে আছে উত্তরাখণ্ডের গরীব জনসাধারণ। কিন্তু হিমালয়ের আরও দু'টি বিরাট সম্পদের কথা সকল আগন্তুকেরই মনে উঠবে। (১) কত খরবেগ জলস্রোত দিকে দিকে বয়ে চলেছে—যাতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা এবং যা থেকে জলবিদ্যুৎ সংক্রান্ত নানা স্কীম নেওয়া যেতে পারে। (২) আর আছে ধাতব সম্পদ; হিমালয়ের বিভিন্ন অংশে নানা মূল্যবান ধাতব পদার্থ থাকা খুবই সম্ভব—যার সদ্ব্যবহার হলে হিমালয়ের অধিবাসীরা কুবেরের ধনের সন্ধান পেতে পারে।

বাস কর্ণপ্রয়াগে এসে থামল। হিমালয়ের এই দুর্গম প্রদেশে কর্ণ তপস্যা করে সূর্যদেবকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। পিণ্ডার নদী এখানে এসে অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। দূর থেকে দেখা যায় উমাদেবীর মন্দির।

কর্ণপ্রয়াগের পর প্রসিদ্ধ জায়গা নন্দপ্রয়াগ। কর্ণপ্রয়াগ থেকে তের মাইল। ত্রিশূল পাহাড় থেকে নন্দাকিনী (মন্দাকিনী নয়) এসে এখানে অলকানন্দায় পড়েছে। এক একটি নদী পার হওয়া মানে এক একটি পাহাড় শেষ হয়ে যাচ্ছে—আমাদের বাস পাহাড়ের গায়ে গায়ে আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে একবার বহু উপরে উঠে যাচ্ছে; পরে আবার এঁকেবেঁকে নেমে আসছে—এবং পুলের উপর দিয়ে নদী বা ঝরণা পার হয়ে অন্য পাহাড়ে চলে যাচ্ছে। নন্দপ্রয়াগ থেকে সাত মাইল দূরে চামৌলি এসে বাস থামলো। চামৌলি একটি বড় শহর—চামৌলি, জেলার হেড্-কোয়ার্টার। হাসপাতাল, টেলিগ্রাফ অফিস প্রভৃতি সব রয়েছে। পুলিস এসে বাসগুলি আবার পরীক্ষা করল।

চামৌলি থেকে পিপলকোটি দশ মাইল। শহরটি ছোট হলেও কয়েকটি ভাল ধর্মশালা ও ডাকবাংলো আছে। যোশীমঠ যাতায়াতের পথে বাসগুলির এটি একটি প্রধান বিশ্রাম-স্থল। আমাদের বাস এখানে থামল—মধ্যাহ্নের স্নানাহার করবেন যাত্রীরা। কিন্তু জলের ব্যবস্থা এখানে একান্ত অপ্রচুর। স্নান ত' দূরের কথা, পানীয় জল সংগ্রহ করাই কঠিন। যাই হোক, আমরা শুধু খানিকটা পানীয় জল সংগ্রহ করে নিলাম এবং গোচরে সংগৃহীত ফল দিয়ে মধ্যাহ্নের আহার সমাধা করলাম। বাস কিছুক্ষণ পরই ছেড়ে দিল; যত খাড়া চড়াই ভাঙ্গছে তত বেশী গর্জন করছে; আর ঝাঁকুনির চোটে যাত্রীদের অনেকেই বমি করছেন। দু'একটি মিলিটারি জীপ আসছে উল্টো দিক থেকে। কোথাও বা রাস্তা মেরামতির কাজ চলছে এবং সে কাজ করছে সবই মিলিটারি লোক। স্থানীয় লোকও কিছু আছে—তবে তাদের সংখ্যা খুব কম। কিছুক্ষণ পর গাড়ী এসে এক জায়গায় বিরাট গর্জন করে বন্ধ হয়ে গেল; ড্রাইভার বললেন গাড়ী আর যাবেনা; ইঞ্জিন বিকল হয়েছে। আমাদের সমস্ত যাত্রাপথে অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চারশ মাইল বাসের রাস্তায় ইঞ্জিন বিকল হওয়া এই প্রথম এবং এই শেষ। এজন্য বাসের কোম্পানীগুলিকে ধন্যবাদ জানানো উচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভারদেরও। গাড়ী যেখানে বন্ধ হল সেখান থেকে যোশী-মঠ শহর খুব কাছেই। অনেকখানি চড়াই উৎরাই করে আমরা শেষ পর্যন্ত কালীকম্বলীর ছত্রে গিয়ে হাজির হলাম। রাত্রের মত

এখানেই বিশ্রাম। পরের দিন বদ্রীনাথের বাস ধরতে হবে।

একটি বিরাট পাহাড়ের চূড়া থেকে পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত এই যোশীমঠ শহর। চীনা আক্রমণের পর প্রতিরক্ষা ব্যাপারে এই শহরের অনেকখানি প্রাধান্য বেড়ে গেছে। নূতন নূতন ঘরবাড়ী ও নূতন নূতন রাস্তায় এর নিত্যনূতন প্রসার হচ্ছে। কিন্তু নূতন আগন্তুকের কাছে শহরের সবটা দেখা খুব পরিশ্রম-সাধ্য। হৃষীকেশগামী বাস-গ্যারেজ থেকে স্টেটবাস-গ্যারেজ যেতে হলে ৫০০ ফুট চড়াই ভাঙ্গতে হবে। নৃসিংহদেবের মন্দিরে যেতে হলে সেখান থেকে ২০০।৩০০ ফুট উৎরাই, আর জ্যোতির্মঠ দর্শন করতে হলে সেখান থেকে আরও চড়াই ৫০০ ফুট। তারও ওধারে সেনানিবাস ইত্যাদি—তাতে অবশ্য সাধারণের প্রবেশাধিকার নেই। আমরা জ্যোতির্মঠে (২৮শে মে) গিয়ে বর্তমান শঙ্করাচার্যকে দর্শন করি। তিনি অনেকক্ষণ ধরে অত্যন্ত অমায়িকভাবে আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করলেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি বেলুড় মঠ দর্শন করেছিলেন—বারে বারে তার সপ্রশংস উল্লেখ করলেন। কিছু প্রসাদ ধারণ করে আমরা সেখান থেকে বিদায় নিলাম। মঠের পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রত্যেক দর্শককে মুগ্ধ করে।

একদা অধ্যাত্ম-ভারতের প্রাণকেন্দ্র ছিল এই জ্যোতির্মঠ। বৌদ্ধ বিপ্লবের পর হিন্দু-ধর্মকে সনাতন বৈদিক আদর্শে উজ্জীবিত করার জন্য যতিরাজ আচার্য শঙ্কর দিগ্বিজয়ী বীরের মত সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করে ভারতের চার প্রান্তে চারটি ধর্ম-দুর্গ বা মঠ স্থাপন করেছিলেন। পূর্বপ্রান্তে পুরীধামে গোবর্ধন মঠ, দক্ষিণ ভারতে রামেশ্বরধামে শৃঙ্গেরী, পশ্চিমে দ্বারকায় সারদামঠ এবং উত্তরে জ্যোতির্ধামে জ্যোতির্মঠ। জ্যোতির্মঠ আচার্য শঙ্করের বিজয়-বৈজয়ন্তীরই স্মৃতি বহন করে ধন্য হয়ে আছে।

ষোল বৎসরেরও কম বয়সে আচার্য এখানে আসেন, এবং কথিত আছে, জ্যোতির্ধামের শান্তিময় পবিত্র পরিবেশে অবস্থান করে প্রস্থান-ত্রয়ের ভাষ্য রচনা সম্পূর্ণ করেন। ব্রাহ্মণবেশী ব্যাসদেবের সঙ্গে পরবর্তীকালে উত্তরকাশীতে শারীরকসূত্রের ভাষ্য নিয়ে তাঁর সতেরদিন-ব্যাপী সুগভীর আলোচনা সুধীজনমাত্রেরই জানা আছে। সেই আলোচনায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্যাসদেব আচার্যের আয়ুষ্কাল আরও ষোল বৎসর বাড়িয়ে দেন। সারা ভারতে ধর্মপ্রচার করে আচার্যদেব আবার ফিরে আসেন উত্তরাখণ্ডে এবং তখনকার গাড়োয়ালের রাজা সুধন্বার সহায়তায় উত্তরাখণ্ডের সমস্ত মন্দিরের ও পূজাদির সংস্কারকার্য সাধন করেন। প্রবাদ আছে, বদ্রীনাথ-মন্দিরের নিকটবর্তী নারদ-কুণ্ড থেকে বদ্রীনারায়ণের শীলামূর্তি উদ্ধার করে শ্রীবিগ্রহের পূজাদিরও বিধিব্যবস্থা প্রবর্তন করেন আচার্য শঙ্কর।

২৮শে মে দুপুরে যোশীমঠ থেকে বদ্রীনাথের বাস ছাড়ল। দূরত্ব মাত্র ২৯ মাইল। কিন্তু চড়াই-উৎরাই-এর পথ—তাই সময় বেশী লাগে। এবছরই প্রথম এই বাস-সার্ভিস চালু হয়েছে। রাস্তা সব জায়গায় এখনও সম্পূর্ণ না হলেও বাস-চলাচলের যোগ্য করার জন্য পুরো উদ্যমে কাজ করছেন সেনাবিভাগ। দেশরক্ষার গুরুদায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অর্জন করেছেন তীর্থযাত্রীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা। কেননা তাঁদের চেষ্টাতে আজ যাত্রীরা অল্প পরিশ্রমে বদ্রীনারায়ণ দর্শনের সুবিধা পাচ্ছেন। বিষ্ণুপ্রয়াগের আগে এসে

আমাদের বাস থামল—একটি বড় পাথর প'ড়ে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ডিনামাইটের শব্দ ও তার কিছুক্ষণ পরেই সেনাবিভাগের লোকজনের সাহায্যে রাস্তা পরিষ্কার; আমরা বিষ্ণুপ্রয়াগে উপস্থিত হলাম।

নীচে গরুড়গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গম। সেতু দিয়ে পার হয়ে গেলাম বিষ্ণুপ্রয়াগ। পাঁচ মাইল দূরে গোবিন্দঘাট। এখান থেকেই যেতে হয় Valley of flowers আর লোকপাল, যেখানে গুরুগোবিন্দজী তপস্যা করে সিদ্ধ হয়েছিলেন। একটু পরেই পাণ্ডুকেশ্বর (উচ্চতা ৮০০০ ফুট); পাণ্ডু রাজার তপস্যার স্থান। প্রবাদ বলে, এখানকার দুটি প্রাচীন মন্দির — যোগবদ্রী ও বাসুদেব, পাণ্ডবদের দ্বারা নির্মিত।

পাণ্ডুকেশ্বর থেকে চার মাইল দূরে হনুমান চটি, মহাবীরের মন্দিরের কাছে এসেই বাসটি দাঁড়ায় এবং কয়েক মিনিটের বিরতির মধ্যেই যাত্রীরা মহাবীরের দর্শন ও পূজাদি সেরে নেন। আমরা ইতোমধ্যে ৮৫০০ ফুট উচ্চতা অতিক্রম করেছি। একমাইল সমতল পার হয়ে কিছু দূরে কাঞ্চনগঙ্গা পার হতে হয়; যে পাঁচটি উৎস-ধারার সম্মিলিত রূপ অলকানন্দা, কাঞ্চনগঙ্গা তাদের অন্যতম। বদ্রীনাথ-মন্দিরের উত্তরে যে বরফাবৃত উপত্যকা, যাকে অলকাপুরী বলা হয় তা থেকে এসেছে অলকা এবং নন্দা, আর কিছু নীচে মানাগ্রাম থেকে সরস্বতী এবং আরও কিছু নীচে ঋষিগঙ্গা—আর এই কাঞ্চনগঙ্গা; এই মোট পাঁচটি ধারা মিলে হয়েছে অলকানন্দা।

বাস এদিকে প্রবল গর্জন করে খাড়া চড়াই একটির পর একটি অতিক্রম করছে, যত উপরে উঠছে বাসের ঝাঁকুনি তত বেশী লাগছে। অধিকতর উচ্চতার জন্য শ্বাসপ্রশ্বাসেরও কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে। রাস্তা এক এক জায়গায় খুবই সংকীর্ণ, কোথাও বা ঝরণার জল নেমে এসে বাসের রাস্তাকে আরও বিপদসঙ্কুল করে দিচ্ছে এবং সেই ঝরণার জল অতিক্রম করে বাস আবার খাড়া চড়াই-এর বাঁকে মাথা উঁচু করে উঠছে, কোথাও রাস্তার ঠিক নীচে গভীর খাদ হাজার ফুট বা তারও বেশী। বাসের চালক যদি একটু অন্যমনস্ক হয় তবে বাস গড়িয়ে পড়বে নীচের খাদে। কতক্ষণ কেটেছে জানিনা, আমরা পাহাড়ের চূড়ায় এসে গেছি। অদূরে বদ্রীনাথপুরী যেন আকাশের গায়ে ভেসে উঠল। আকাশবিদারী শব্দে যাত্রীরা জয় দিলেন—জয় বদ্রীবিশালের জয়।

একদিকে নর ও অন্যদিকে নারায়ণ; অনন্তের ধ্যানে চিরধ্যানমগ্ন ঋষিদ্বয়ের কল্যাণচিন্তা যেন স্থির হয়ে আছে পর্বতের আকারে। মহা-তপঃক্ষেত্র এই বদরিকাশ্রমে যুগ-যুগান্ত ধরে কত মুনি-ঋষি ধ্যানমগ্ন হয়েছেন এবং পরমার্থ লাভ করে নিজেরা ধন্য হয়েছেন, অপরকে ধন্য করেছেন। বরাহ ও নৃসিংহ অবতারে ভগবান স্বয়ং এখানে এসে তপস্যা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে উদ্ধব এসেছেন এই তপঃক্ষেত্রে, ব্যাসদেব বদ্রীনাথের মন্দিরের অদূরে ব্যাসগুহায় (কেশবপ্রয়াগ) বসে বেদবিভাগ করেছিলেন আর মহাভারতের রচনাও এইখানে। পরবর্তী কালে আচার্য শঙ্কর এসে এই তপঃক্ষেত্রের মহিমা পুনঃপ্রচার করেছিলেন সেকথা আগেই বলেছি।

বদ্রীনাথপুরীর অল্পদূরে বাস এসে থামল; ততক্ষণে বৃষ্টি ও ঝড়ের বাতাস বইতে শুরু করেছে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে বাস থেকে নামতে হল। আমাদের পাণ্ডাজী কেদারের পাণ্ডার মত বা তার চাইতে স্পষ্টভাবে আমাদের সঙ্গে বাংলায় আলাপ করলেন। তাঁর বাড়ীতে

স্থানাভাব থাকায় আমরা কালীকম্বলী ছত্রে স্থান সংগ্রহ করে মন্দিরে দর্শনের জন্য উপস্থিত হলাম।

সন্ধ্যারতির আর দেরী নেই। মন্দিরে প্রবেশের জন্য আমরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছি, সম্মুখে ভক্তরাজ গরুড় উপবিষ্ট, কী সৌম্যমূর্তি! কঠিন পাথরেও এত কমনীয়তা! ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম জানালাম। সমবেত যাত্রীরা ভজন ধরেছেন—

নারায়ণ নারায়ণ বদ্রীনারায়ণ জয় জয়।
নারায়ণ নারায়ণ লক্ষ্মীনারায়ণ জয় জয়॥
নারায়ণ নারায়ণ পরব্রহ্ম নারায়ণ জয় জয়॥

ধীরে ধীরে নাটমন্দিরে প্রবেশ করে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। ছোট নাটমন্দির - সামনে একটি ঘৃতপ্রদীপ জলছে। সেই পর্যন্ত যাত্রীরা যেতে পারে। গর্ভমন্দিরে প্রবেশের অধিকার কারুর নেই—রাওল সাহেব (পূজক) ও তাঁর সহকারী কয়েকজন ব্রাহ্মণ ছাড়া। মধ্যে মধ্যে বিশেষ পূজা হচ্ছে ও সেই পূজার অঙ্গীভূত আরাত্রিকের দীপালোকে বিগ্রহ স্পষ্ট হয়ে উঠছেন। বদ্রীনারায়ণকে কেন্দ্র করে দক্ষিণে ও বামে আরও কয়েকটি বিগ্রহ। বদ্রীনারায়ণের বামে লক্ষ্মীজী, তাঁর বামে নারায়ণ ও নর; (বদ্রীনারায়ণের) দক্ষিণে উদ্ধব, কুবের ও গণেশ; নীচে গরুড় ও নারদ। বদ্রীনারায়ণ চতুর্ভুজ ধ্যানমূর্তি, মস্তকে এক অত্যুজ্জ্বল মণি। নির্বাণ-অভিষেকের সময় দেখা যায়, বদ্রীনারায়ণ এক শীলামূর্তি।

বদ্রীনারায়ণ দর্শন করে আমরা মন্দিরের বাইরে এলাম। মন্দিরের দক্ষিণে (এই প্রাঙ্গণেই) একটি পৃথক গম্বুজযুক্ত লক্ষ্মীমাতার মন্দির—তার ধারে মন্দিরের রন্ধনগৃহ। একটু পশ্চিমে এক হলঘরে আচার্য শঙ্করের এক ধাতু-মূর্তি—যেন তিনি উপস্থিত থেকে মন্দিরের সেবা-পূজা পরিচালনা করছেন। মন্দিরের প্রাঙ্গণেই আছে ধর্মশীলা—যাত্রীরা সেখানে দানাদি করেন।

মন্দিরের চত্বরের চারদিকে প্রশস্ত বারান্দা—সেখানে কোথাও কোথাও যাত্রীরা পূজাদির ব্যবস্থাপনা নিয়ে ব্যস্ত—কোথাও ভক্তজন ধ্যান-জপে মগ্ন—আবার কোথাও বা ভজনগান করছে স্থানীয় ভজনদল।

মন্দিরের নীচে অলকানন্দার ঠিক উপরে নারদকুণ্ড, সূর্যকুণ্ড, গরুড়কুণ্ড প্রভৃতি নামে কয়েকটি তপ্ত কুণ্ড আছে; কোনটি বেশী গরম—কোনটি কম। পরদিন (২৯শে মে) সকাল সকাল এই তপ্তকুণ্ডে স্নান সেরে মন্দিরে হাজির হলাম পূজা দেওয়ার জন্য। নৈবেদ্যের উপচার সবই শুকনো। শুকনো আখরোট, বাদাম, কিসমিস, নকুলদানা আর ওখানকার তুলসী-পত্রের (এ অঞ্চলের থেকে একটু বিভিন্ন) মালা নিয়ে আমরা আবার লাইন দিয়ে দাঁড়ালাম। আমরা যখন মন্দিরের মধ্যে গেলাম তখন পূর্বদিনের মত ঐ প্রদীপের কাছেই আমাদের থামতে হল। ঐ প্রদীপের কাছ থেকেই সকলের পূজা ও নৈবেদ্য নিবেদিত হয়। ভক্তিভরে আমরা প্রসাদ ও নির্মাল্য নিয়ে বাইরে এলাম।

প্রায় ৫০ ফুট উচ্চ মন্দিরটি অতি সুদৃশ্য। প্রবেশদ্বারটি নানা কারুকার্যে ভরা। মন্দিরের স্বর্ণচূড়াটি রানী অহল্যাবাই কর্তৃক নির্মিত। মন্দিরের পশ্চাতে নারায়ণ পর্বত এবং তারও পশ্চাতে নীলকণ্ঠ (২১৬৫০ ফুট) এক অপূর্ব শোভা বিস্তার করে আছে। নীচে অলকানন্দা কুলুকুলু রবে বয়ে চলেছে—হরিপাদপদ্ম বিধৌত করে। তিনি সত্যিই এখানে হরিপাদপদ্ম-তরঙ্গিণী।

বদ্রীনাথধামের এবং বদরিকাশ্রমের মাহাত্ম্য মহাভারত এবং স্কন্দপুরাণাদিতে উল্লিখিত

আছে—তাতেই প্রমাণিত হয় স্থানের প্রাচীনত্ব।

বদ্রীনাথের উচ্চতা ১০২৫০ ফুট। অক্টোবর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ছয়মাস মন্দির বন্ধ থাকে—অত্যধিক শীতের জন্য। তখন বদ্রীনারায়ণের পূজা পরিচালিত হয় যোশীমঠ থেকে।

মন্দিরের প্রধান পূজারী (রাওল সাহেব) ব্রহ্মচারী এবং কেরলের নাম্বুদ্রিপাদ ব্রাহ্মণ—যে পবিত্র বংশে আচার্য শঙ্কর জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

বদ্রীনাথের কাছাকাছি অনেক কিছু দেখবার আছে। সেগুলির মধ্যে সহজে দেখা যায় নারদ-শীলা, বরাহ-শীলা, গরুড়-শীলা, মার্কণ্ডেয়-শীলা ও নৃসিংহ-শীলা - এই পঞ্চশীলা নারদাদি দেবতার তপস্যার স্মৃতিচিহ্ন। এগুলির অবস্থান আমাদের পূর্বোল্লিখিত তপ্তকুণ্ডের পাশেই। এছাড়া উল্লেখযোগ্য হল ব্রহ্মকপাল। এখানে যাত্রীরা পিতৃপুরুষের তর্পণ-শ্রাদ্ধ করেন। অপারগ-পক্ষে মনে মনে শুধু মুক্তি-প্রার্থনা জানালে তীর্থমাহাত্ম্যগুণে সে প্রার্থনাও পূর্ণ হয়। অদূরে গান্ধীঘাট—জাতির জনকের প্রতি জাতির তর্পণ-স্মৃতি।

দু-মাইল দূরে মানভদ্রগ্রাম বা মানাগ্রামে যেতে পারলে দেখা যাবে ব্যাসগুহা—যেখানে বসে ব্যাসদেব মহাভারতের এক একটি শ্লোক বলতেন আর আদি লিপিকার গণপতি গণেশ সে শ্লোক লিপিবদ্ধ করতেন। গণেশের বাস-স্থানরূপে একটি গণেশগুহাও আছে। নর ও নারায়ণের মাতা 'মাতামূর্তি'র মন্দিরও এই মানাগ্রামে অবস্থিত

বদ্রীনাথে আমরা ত্রিরাত্রি বাস করি। একদিন পাণ্ডাজী আমাদের বদ্রীনাথে অন্নপ্রসাদ ভিক্ষা দিলেন। ভাত-ডাল, একটি সবজি আর মালপোয়া। আর একদিন আমরা কালীকম্বলী ছত্রে ভিক্ষা নিয়েছিলাম।

৩১শে মে আমাদের প্রত্যাবর্তনের কথা। অতি প্রত্যুষে স্নানাদি করে মন্দিরে যাই এবং নির্বাণ-অভিষেক দর্শন করি। অবশেষে এই পবিত্র তীর্থের ধূলি মাথায় নিয়ে বাস-স্ট্যাণ্ডে আমরা চলে এলাম। বাস ছাড়ল ৮টার পর। দূরে নীলকণ্ঠ, নর ও নারায়ণ পর্বত আর কাছে বদ্রীনারায়ণের মন্দির ও অলকানন্দা—ধীরে ধীরে এসব ছেড়ে আমরা নেমে চলেছি সমতলের দিকে। কিন্তু নিয়ে চলেছি পবিত্র স্মৃতি। সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য এসব কিছুই ভক্তেরা চায় না। তাঁর ইচ্ছা হলে এগুলি আপনা-আপনিই হবে, কিন্তু ভক্তের প্রার্থনা—তোমাকে যেন না ভুলি, তোমার স্মৃতি যেন হৃদয়মন্দিরে সর্বদা অবিচল থাকে।

নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা রামা মৃদুতনুলতানন্দনেনাপি রন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥

হে হরি, আমি সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বের নিবৃত্তির জন্য তোমার চরণযুগল বন্দনা করি না, ভয়ানক কুম্ভীপাক নামক নরক দূর করিবার জন্যও নহে; কিন্তু জন্মে জন্মে যেন হৃদয়মন্দিরে তোমার ভাবনা করিতে পারি।

শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সকলেই ভগবানের অবতার, সমন্বয়ের ঠাকুর, সিদ্ধসাধক বা মহাপুরুষ বলিয়াই জানেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের আরও অনেকগুলি দিক ছিল যেগুলি আমরা অনেকেই জানি না। ঈশ্বরপ্রেমে সদা-মাতোয়ারা এই মহামানব ঈশ্বর, ঈশ্বরপ্রসঙ্গ বা আধ্যাত্মিক জীবন ছাড়া অন্য কিছু জানিতে পারেন, ইহা আমাদের ভাবনার বাহিরের জিনিস

মনের উপর যাঁহার সম্পূর্ণ আধিপত্য আসিয়াছে, মনকে যিনি সম্পূর্ণ বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার নিকট অসাধ্য কিছুই থাকে না। একাগ্র মনের কাছে অসাধ্য কিছুই নাই।

শিল্প ও সংগীত পছন্দ করেন না এমন লোক অল্পই আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও গান ভালবাসিতেন, গান খুব ভাল গাহিতে পারিতেন। যেমন ছিল তাঁহার সুমধুর কণ্ঠ, তেমনি ছিল তাঁহার সংগীতের রসবোধ। তাঁহার ভজন সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিত। তিনি নিজেও অনেক সময় বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া সমাধিস্থ হইতেন গান গাহিতে গাহিতে। নরেন্দ্রাদির কণ্ঠে মনপ্রাণ-ঢালা সংগীত শুনিয়াও অনেক সময় তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইত। দেবদেবী-বিষয়ক সংগীত গাওয়া বা শ্রবণ করাকে তিনি সাধনার অঙ্গ বলিয়াই মনে করিতেন। ভজনাদি সহজেই মনকে অন্তর্মুখী ও ভগবচ্চিন্তায় একাগ্র করে। ভজনাদির সময় অপর বিষয়ে কাহারও মন যাইলে তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে তাঁহার গীত বহু সংগীতের উল্লেখ আছে; যথাযথ তাল-মান বজায় রাখিয়া সে গানগুলি তিনি গাহিতেন।

'ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে' গানটি গাহিতে গাহিতে তাঁহার মন জগন্মাতার অলৌকিক রূপসাগরের অতল তলে ডুবিয়া যাইত। 'যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে' গানটি যখন গাহিতেন তখন সকলেই অনুভব করিতেন যে তিনি যেন সত্যই তাঁহার হৃৎপদ্মে জগন্মাতার আবির্ভাব উপলব্ধি করিতেছেন। শিল্পীর শিল্পায়ন তখনই সার্থক হয় যখন তিনি কায়মনোবাক্যে শিল্পের রসাস্বাদন করিতে পারেন—সেই সময়ের জন্য বাহিরের কোনও বস্তুর বোধ তাঁহার থাকে না; এই মাপকাঠিতে বিচার করিলে শ্রীরামকৃষ্ণ যে একজন শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ শিল্পী ছিলেন এ বিষয়ে কাহারও কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

আমরা জানি, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম ভাব-সমাধি হইয়াছিল বালক-অবস্থায়, কাজল মেঘের কোলে সাদা বকের সারি দেখিয়া। পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ ঐ ঘটনাটি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন:

"প্রান্তরমধ্যে যদৃচ্ছা পরিভ্রমণ করিতে করিতে বালক (গদাধর) নবজলধর-ক্রোড়ে বলাকাশ্রেণীর শ্বেতপক্ষ বিস্তারপূর্বক সুন্দর স্বাধীন পরিভ্রমণ দেখিয়া এতদূর তন্ময় হইয়াছিল যে তাহার নিজ শরীরের ও জাগতিক অন্য সকল পদার্থের বোধ এককালে লোপ হইয়াছিল এবং সংজ্ঞাশূন্য হইয়া

সে প্রান্তর-পথে পড়িয়া গিয়াছিল। বয়স্যগণ তাহার ঐরূপ অবস্থা দর্শনে ভীত ও বিপন্ন হইয়া তাহার জনক-জননীকে সংবাদ প্রদান করে এবং তাহাকে ধরাধরি করিয়া প্রান্তর হইতে বাটীতে তুলিয়া লইয়া যাওয়া হয়। চেতনালাভের কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু সে আপনাকে পূর্বের ন্যায় সুস্থ বোধ করিয়াছিল। …বালক গদাধর কিন্তু তাঁহাদিগকে ঐ ঘটনা সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিল, তাহার মন এক অভিনব অদৃষ্টপূর্ব ভাবে লীন হইয়াছিল বলিয়াই তাহার ঐরূপ অবস্থা হইয়াছিল এবং বাহিরে অন্যরূপ দেখাইলেও তাহার ভিতরে সংজ্ঞা এবং একপ্রকার অপূর্ব আনন্দের বোধ ছিল।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকালে ভাল অভিনেতাও ছিলেন। অপরের ভাবভঙ্গীও তিনি হুবহু নকল করিতে পারিতেন। একজন শিল্পীর শিল্পবিষয়ে যাহা জানা দরকার, তিনি তাহা সবই জানিতেন। লীলাপ্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে, "গ্রামের কোথাও পুরাণকথা অথবা যাত্রাগান হইতেছে শুনিলেই সে তথায় গমন করিয়া শাস্ত্রোপাখ্যানসকল শিখিতে লাগিল এবং শ্রোতাদের নিকটে ঐ সকল কিরূপে প্রকাশ করিলে তাহাদের বিশেষ প্রীতিকর হয় তাহা তন্নতন্নভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিল বালকের অপূর্ব স্মৃতি ও মেধা তাহাকে ঐ সকল বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিল।" কামারপুকুরে পাইনদের বাড়ীতে শিবরাত্রিতে যাত্রাভিনয়ে তাঁহার শিবসাজিবার ও শিবচিন্তায় বিভোর হইয়া সমাধিস্থ হইবার কথাও পাঠকগণের অবিদিত নাই।

চিত্রাঙ্কনে ও মূর্তিগঠনেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ছেলেবেলায় কামারপুকুরে থাকাকালীন তাঁহার চিত্রাঙ্কন ও মূর্তিগঠনের অনেক পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি।

গৌরহাটি গ্রামে তাঁহার ভগিনী সর্বমঙ্গলা প্রসন্নচিত্তে তাঁহার স্বামীকে সেবা করিতেছেন দেখিয়া বালক গদাধর কয়েকদিন পরে ঐরূপ ভাবের একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। উহাতে ভগিনী ও তাঁহার স্বামীর চেহারার সাদৃশ্য দেখিয়া পরিবারের সকলে আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন।

দুর্গাপ্রতিমা-গঠনের সময় তিনি পোটোদের নানারূপ ইঙ্গিত দিতেন। মানুষের নানারূপ চক্ষুর কথায় কাহারও পদ্মপত্রের মত, কাহারও বৃষের মত, কাহারও যোগীর বা দেবতার মত চক্ষু, এইরূপ উল্লেখ করিয়া কোন্ চক্ষু কিরূপ ভাব প্রকাশ করে তাহা নির্দেশ করিতেন। ভক্তিমান ব্যক্তির শরীরের গঠন বা লক্ষণ কিরূপ, তাহার হাত-পায়ের গাঁটগুলি কেমন, অস্থি ও পেশীর সামঞ্জস্য কেমন রূপ ধারণ করিবে, এসবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা দিতেন।

'শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ' বিষয়ে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু কয়েকটি অমূল্য কথা তাঁহার একটি পত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন: "প্রিয় বরেণ, তোমার ৩১-৮-৫৪ তারিখের চিঠি পেলাম। শ্রদ্ধেয় ভূপেনবাবুর প্রশ্নের উত্তরগুলি তাঁহার বইতে কাজে লাগবে জেনে বড় সুখী হলাম।…

ঠাকুর (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব) নিজে একজন শিল্পী ছিলেন। ছবি ও মূর্তি তৈয়ারী করতেন। শুধু idealist নয়, রসিক শিল্পী ও কারিগরও ছিলেন। তিনি আঙ্গিকের (technique) বিষয়ও বেশ জানতেন। আর ছবি বা মূর্তি দেখে ভাব ও গড়ন (form) ভুল হলে তা ঠিক করে দিতে পারতেন। মথুরবাবু একবার তাঁর করা শিবমূর্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।…

দক্ষিণেশ্বরে যে ঘরে থাকতেন তার বারদিকের উত্তর দেয়ালে দরজার দুপাশে কাঠকয়লার রেখায় আঁকা দুটি ছবি ছিল। ৪'×৫' আন্দাজ বড়। আমি ও প্রিয়নাথ সিংহ (স্বামীজীর সহপাঠী) উহা দেখেছি। ঢুকতে বাঁদিকে একটি জাহাজ, ডানদিকে একটি আতাগাছ আর তাতে টিয়াপাখি সব বসে। ঐ ছবি দুটি কাঁচ দিয়ে দেয়ালে ফ্রেম করে দেবার জন্য রামলাল-দাকে কিছু টাকা সংগ্রহ করে দিয়েছিলাম। পরে গিয়ে দেখি উহার উপর চুনকাম করে ঢেকে ফেলা হয়েছে। তাঁহার ছেলেবেলায় কামারপুকুরে থাকার সময় ঐরূপ বহু ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। দুর্গাপ্রতিমা গড়ার সময় পোটোদের সব সময় guide (চালনা) করতেন। তিনি প্রতিমার উপরের চালচিত্র আঁকার ভারও কখন কখন নিতেন। প্রতিমার চক্ষুদানের সময় তাঁহার ডাক পড়ত, চোখের তারা ঠিক জায়গায় দেওয়া বড় কঠিন বলে। চোখের ঠিক দেবভাব না হলে সংশোধন করে দিতেন। তিনি একজন সহজ শিল্পী ও শিল্পের সমঝদার ছিলেন।··· তিনি ভাল অভিনেতাও ছিলেন। অপরের ভাবভঙ্গী হুবহু নকল করতে পারতেন। একজন শিল্পীর শিল্পবিষয়ে যা জানা ও থাকা দরকার তিনি সবই জানতেন। আমার মনে হয়, স্বামীজী তাঁহার নিকট প্রথমে শিল্পের গূঢ় রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, যদিও তাঁহার প্রতিভার অন্ত ছিল না। ঠাকুর প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তু অতি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ (observe) করতেন।···তিনি রূপপতি ছিলেন। ইচ্ছামাত্র তাঁহার হৃদয়ের সব ভাবই রূপে পরিণত হত। এই সব অনেক কথা পুণ্যদর্শনের কাছেও শুনেছি। (আমার পক্ষে এসব আলোচনা করা বড় ধৃষ্টতা মনে হয়)। তাই পূর্বপত্রে লিখেছি, স্বামীজী প্রথমে ঠাকুরের নিকট শিল্পবিষয়ে অনেক জেনেছেন। পরে সিষ্টার তাহা স্বামীজীর কাছে জেনেছেন। আর সিষ্টার পরে স্বামীজীর কাছ থেকে (aesthetics) সৌন্দর্যবোধ, রুচি-বিজ্ঞানও শিখেছেন।

গিরীশবাবু, শরৎ মহারাজ, রাখাল মহারাজ, সিষ্টার নিবেদিতা ও সবশেষে পুণ্যদর্শনের সঙ্গে আলোচনায় সকলের উপদেশের সার পেয়েছি।"*

ভগ্নমূর্তি খুব ভাল ভাবে জোড়া দিতে পারিতেন তিনি। একবার পূজারীর অসাবধানতাবশতঃ দক্ষিণেশ্বরে গোবিন্দজীর একখানি পা ভাঙ্গিয়া যাইলে, রানী রাসমণি মহা চিন্তিতা হইয়া পড়েন এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের বিধান অনুযায়ী ঐ মূর্তি গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়া নূতন মূর্তি প্রস্তুত করাইতে মনস্থ করেন। পরে মথুরবাবুর সঙ্গে পরামর্শের পর শ্রীরামকৃষ্ণের মতামত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, রানীর কোনও জামাই-এর পা ভাঙ্গিয়া যাইলে রানী কি একজন নূতন জামাই লইয়া আসিবেন, না চিকিৎসাদির দ্বারা উহা সারাইতে চেষ্টা করিবেন? এক্ষেত্রেও ভগ্ন বিগ্রহের পা জোড়া দিতে চেষ্টা করাই উচিত। তাঁহার কথাতে উভয়েই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহাকেই গোবিন্দজীর বিগ্রহের ভাঙ্গা পা জোড়া দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তিনিও উহা এমন নিখুঁত ভাবে জুড়িয়া দেন যাহাতে সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইয়া যান। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের মৃত্তিকা-নির্মিত শিব-মূর্তি সম্বন্ধে লীলাপ্রসঙ্গে এইরূপ বর্ণনা আছে,

* 'শিল্পজিজ্ঞাসায় শিল্পদীপঙ্কর নন্দলাল'—শ্রীবরেন্দ্রনাথ নিয়োগী প্রণীত।

"এই সময়ে একদিন মূর্তিগঠন করিয়া ঠাকুরের শিবপূজা করিতে ইচ্ছা হয়। আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, বাল্যকালে কামারপুকুরে তিনি কখনও কখনও ঐরূপ করিতেন। ইচ্ছা হইবামাত্র তিনি গঙ্গাগর্ভ হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিয়া বৃষ, ডমরু ও ত্রিশূল সহিত একটি শিবমূর্তি স্বহস্তে গঠন করিয়া উহার পূজা করিতে লাগিলেন। মথুরবাবু ঐ সময় ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিনি তন্ময় হইয়া কি পূজা করিতেছেন জানিতে উৎসুক হইয়া নিকটে আসিয়া মূর্তিটি দেখিতে পাইলেন। বৃহৎ না হইলেও মূর্তিটি সুন্দর হইয়াছিল। মথুর উহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, বাজারে ঐরূপ দেব-ভাবাঙ্কিত মূর্তি যে পাওয়া যায় না ইহা তিনি দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন। কৌতূহলপরবশ হইয়া তিনি হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ মূর্তি কোথায় পাইলে, কে উহা গড়িয়াছে?' হৃদয়ের উত্তরে ঠাকুর দেবদেবীর মূর্তি গড়িতে এবং ভগ্ন-মূর্তি সুন্দরভাবে জুড়িতে জানেন—একথা জানিতে পারিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন এবং পূজান্তে মূর্তিটি তাঁহাকে দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। …মূর্তিটি হস্তে পাইয়া মথুর এখন উহা তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং মুগ্ধ হইয়া রানীকে উহা দেখাইতে পাঠাইলেন। রানীও উহা দেখিয়া নির্মাতার বিশেষ প্রশংসা করিলেন এবং ঠাকুর উহা গড়িয়াছেন জানিয়া মথুরের ন্যায় বিস্ময় প্রকাশ করিলেন।"

'শিল্পজিজ্ঞাসায় শিল্পদীপঙ্কর নন্দলাল' গ্রন্থটিতে এসব কথারও উল্লেখ আছে—শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের দেওয়ালে শ্রীশ্রীবীণাপাণির ছবি, নিতাই-গৌর কীর্তনানন্দে মগ্ন এই ছবি, ধ্রুব ও প্রহ্লাদের ছবি, মা-কালীর মূর্তি, রাজ-রাজেশ্বরীর মূর্তি, যীশুর ছবি—পিটার ডুবিয়া যাইতেছেন ও যীশু তাঁহাকে উদ্ধার করিতেছেন—এইসব ছবি টাঙানো থাকিত। ঘরের দেওয়ালে দেবদেবীর ছবি রাখা তিনি পছন্দ করিতেন—বলিতেন সকালে উঠিয়া দেবদেবী ও সাধুসন্ন্যাসীর মূর্তি দর্শন করিলে চরিত্রের উপর উহাদের প্রভাব পড়ে এবং মনে অনুপ্রেরণা আসে। কোন্ কোন্ ছবিতে মনে সত্ত্বগুণের ও কোন্ কোন্ ছবিতে মনে রজোগুণের উদ্ভব হয় তাহাও বলিতেন। বাগবাজারে বোসেদের বাড়িতে দেওয়ালে বড় বড় চিত্র খুব আগ্রহের সহিত দেখিয়াছিলেন।

যোগীর চক্ষু কিরূপ হয় তাহার বর্ণনা দিতে গিয়া ডিমে তা দিচ্ছে এরূপ পাখীর চোখের সঙ্গে তিনি তুলনা করিতেন। উহার চক্ষু খোলা থাকিলেও দৃষ্টি যেমন ফ্যালফেলে ও অন্তর্মুখীন হয় যোগীর চক্ষুও তদ্রূপ হইয়া থাকে, ইহা বলিতেন এবং জনৈক ভক্তকে ডিমে তা দিতেছে এবং ফ্যালফেলে ও অন্তর্মুখীন দৃষ্টি—এইরূপ একটি পাখীর ছবি করাইতে বলিয়াছিলেন এবং উহা তৈয়ারী হওয়ার পর তাঁহাকে দেখাইলে খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত সব ঘটনা ও বিবরণ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিল্পবিষয়ে যে গভীর জ্ঞান ও ভালবাসা ছিল ইহা কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে সহজ হইবে।

মহাত্মা কবীর ও ধর্মসমন্বয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী অমৃতত্বানন্দ

কবীর ও শ্রীরামকৃষ্ণ

মহাত্মা কবীরের জীবনচরিতধারার সহিত অনেকাংশে শ্রীরামকৃষ্ণের চরিতধারার মিল পাওয়া যায়। এই দুই পরমপ্রেমিক যে সম্প্রদায়-হীন ধর্মসাধনার পথনির্দেশ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা অনাগত মানবসভ্যতার রূপরেখা। মধ্যযুগে কবীরের সাধনা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয় নাই—সম্প্রদায়হীন ধর্মসাধনার বাস্তবায়িত রূপ দেখা যায় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব-কথিত ও তাঁহার জীবনে যাপিত সত্য-সাধনাও আগামী কয়েক শতকের মধ্যে কিরূপ ধারণ করিবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা দুষ্কর। স্বামী বিবেকানন্দ ভবিষ্যতে মানবসভ্যতার একমাত্র ধর্ম হিসাবে বেদান্তধর্মকে নির্দেশ করিয়াছেন। কারণ একমাত্র বেদান্তই মানুষকে স্বীয় 'আত্মার উপসনারূপ সত্যধর্মে' বিশ্বাসী হইতে বলেন। অপরাপর ধর্মীয় ধারণাগুলিকে ধর্মবিজ্ঞানের কিণ্ডারগার্টেন-রূপে দেখিয়া মত ও সম্প্রদায়ের বাহিরে মানুষের আত্মার উপাসনারূপ ধর্ম বিজ্ঞান-চেতনায় সমৃদ্ধ মানবের একান্ত উপযোগী বলিয়া প্রতীত হইলেও ধর্মজগতের বৈচিত্র্যসম্পাদক সম্প্রদায়গুলি এককালে যে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে এইরূপ কল্পনা তিনিও করেন নাই। গোঁড়ামির অবসান ঘটাইয়া হয়ত সকল দেশের একদল বুদ্ধিদীপ্ত কুশলী বিজ্ঞানবিশ্বাসী মানুষ এই ধর্মধারার প্রতি অনুরক্ত হইবে। স্বামীজী বলিয়াছেন: 'সময় আসিতেছে—যখন মহান মানবগণ জাগিয়া উঠিবেন; এবং ধর্মের এই শিশুশিক্ষার পদ্ধতি ফেলিয়া দিয়া তাঁহারা আত্মা দ্বারা আত্মার উপাসনারূপ সত্যধর্মকে জীবন্ত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিবেন।'[১] তাই মনে হয়, সত্যদ্রষ্টা স্বামীজীর এই বাণী একদিন বাস্তব হইয়া উঠিবে, তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত মহাত্মা কবীরকে স্মরণ করিতে হইবে—কারণ আত্মার এই মহান উদার আহ্বান কবীরজীও এক বিরুদ্ধ পরিবেশে বহুবৎসর পূর্বে করিয়াছিলেন

কবীর নিরক্ষর জোলা। পরিবারে বিদ্যা-চর্চার কোন রেওয়াজ ছিল না। শুভঙ্করী ধাঁধা লাগিলেও পাঠশালায় পাঠ করিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব—পরিবারের মধ্যে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার শুভ সংস্কৃতি ছিল। প্রচলিত অর্থে শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিরক্ষর ছিলেন না। বহু পণ্ডিত ব্যক্তির দার্শনিক আলোচনা তিনি শুনিয়াছেন[†] —নিজেও তাঁহাদের বিতর্কে মীমাংসা দিয়াছেন। কিন্তু কবীরের সে সকল সুযোগ না থাকিলেও কাশীর মতন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তাঁহার মতন জিজ্ঞাসু মনের পক্ষে শুনিয়া প্রাচ্য প্রচলিত ধর্মসাধনা ও তত্ত্ব জানা কিছু কঠিন নয়। তাই তাঁহার দোঁহাবলীতে যেমন তাত্ত্বিক গভীরতার প্রকাশ দেখা যায় তেমনি পাওয়া যায় ধর্ম-সাধনার বৈচিত্র্য-সমাবেশ।

১ বাণী ও রচনা ৩য় ভাগ—৩৯১ পৃঃ

†"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কিন্তু ছেলেবেলায় লাহাদের ওখানে (কামারপুকুরে) সাধুরা যা পড়তো বুঝতে পারতুম, তবে একটু-আধটু ফাঁক যায়। কোন পণ্ডিত এসে যদি সংস্কৃতে কথা কয় তো বুঝতে পারি। কিন্তু নিজে সংস্কৃত কথা কইতে পারি না।" কথামৃত ৪র্থ, ৮৩পৃঃ

অক্ষরজ্ঞান না থাকিলেও কী অপূর্ব ছন্দোবদ্ধ জ্ঞানগর্ভ সংগীত তিনি মুখে মুখে রচনা করিতেন! প্রচলিত জীবনযাত্রার মধ্য হইতে উদাহরণ বাছিয়া জীবনের ক্ষেত্রকে ঈশ্বরচেতনা-আবেশিত করিতে উভয়েই কুশলী ছিলেন। উভয়ের বাণীর মধ্যে কাব্যসৌন্দর্য স্বাভাবিক। ছন্দোবদ্ধ পদ্য রচনা করিতেন কবীর—তাহাতে থাকিত প্রিয়সম্মেলনের আকূতি, তত্ত্বমীমাংসা, কখনও বা প্রচলিত রীতিনীতির প্রতি সুতীব্র শ্লেষ, কখনও বা বিরহ-ব্যাকুলতার প্রকাশ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব পদ্য রচনা করেন নাই কিন্তু তাঁহার সাধারণ কথ্য ভাষাও পদ্যসৌন্দর্যে ভরপুর। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ বাণীগুলি সবই পদ্যময়। যেমন: যত মত তত পথ; শিবজ্ঞানে জীবসেবা। শ্রীশ্রীমাকে বলিতেছেন—যাকে যেমন তাকে তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন। আবার ধৈর্যহারা সাধককে বলিতেছেন—যে সয় সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়, প্রভৃতি। গভীর অনুভূতির স্তরের এত স্বল্পবাক্যে সরল ভাষায় এত অধিক প্রকাশ অন্যত্র দুর্লভ। তত্ত্ব ও নানা মতের অন্তর্নিহিত মিল সবই তাঁহার সরল গ্রামের ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত। কবীরের রূপক ও বর্ণনায় সাহিত্যবিন্যাস অনবদ্য—

"মাঁলন আবত দেখ করি, কলিয়া করী পুকার।
ফুলে ফুলে চুনি লিয়ে কাল্‌হি হমারী বার ॥ ১
ফাগুন আবত দেখি করি, বন স্থনা মন মাঁহি।
উচী ডালী-পাত্‌ হৈঁ, দিন দিন পীলে থাঁহি ॥২
পাত পড়তা যো কহৈ স্থন তরিবর বনরাই।
অব্‌কৈ বিছুরে মিলৈঁ, কহি দূর পড়েঙ্গে জাই ॥৩"

'মালিনীকে আসতে দেখে ফুলের কলিরা চেঁচিয়ে উঠল—ফোটা ফুলগুলো তুলে নিয়ে গেছে, কালই আসছে আমাদের পালা। ফাগুন মাস আসতে দেখে বনের মনে পৌছাল শূন্যের ডাক। পাতায় ভরা উঁচু ডাল। পাতাগুলো দিন দিন হলদে হয়ে উঠল। ঝরা পাতা বললে —ওগো, বনরাজি, ওগো তরুবর, শোন, এখন আমাদের যে বিচ্ছেদ হবে, তারপর আর মিলন হবে না। কে জানে কোথায় কোন দূরে গিয়ে পড়ব।'

কবীরের আত্মসাধনায় প্রেমভাব—মধুরভাব। তাহা একদিকে যেমন বীরভাবদ্যোতক, সাধককে সাধন-সমরে আহ্বান করে, অন্যদিকে তাহাই আবার পরম প্রমাণ অবিনাশী দুল্‌হার—পরমপ্রিয়ের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় কোমল অশ্রু-সজল। ইহাতে তাঁহার সাধনা এক অভিনবত্ব সূচিত করিয়াছে ও তাহাতে তাঁহার যোগ-প্রাধান্যই লক্ষিত হয়। অহংকারকে নাশ করাই সর্বধর্ম সাধনার চরম কথা। এই অহংনাশকে কবীর রণক্ষেত্রের অবতারণায় বীরভাবোদ্যোতক পদে ব্যক্ত করিয়াছেন:

গগন দামামা বাজিয়া, পড়ত নিসানে ঘাব্‌।
সেত পুকারৈ স্থরমা, অব লড়নেকা দাব্‌ ॥১
যা মরণেসে জগ ডরৈ, সো মেরে আনন্দ।
কব মরিহৌঁ কব দেখিহৌঁ পূরণ পরমানন্দ ॥২

"আকাশে বেজে উঠল দামামা—নাকাড়াতে ঘা পড়ল। বীরকে আহ্বান করছে রণক্ষেত্রে, এখন লড়বার সময় মিলেছে। যে মরণকে জগৎ ভয় করে, সেই মরণে আমার আনন্দ। কবে 'আমি' মরব, কবে দেখব আমার পূর্ণ পরমানন্দ স্বরূপকে।"

এই তত্ত্বই ললিতমধুর হইয়া উঠে যখন তিনি গাহেন—

নৈনা আন্তর আব তূঁ জ্যোহী নৈন ঝঁপেউ।
নাঁ হৌ দেখৌঁ ঔবকূঁ ন তুম দেখন দেউ" ॥১
মেরা মুঝমে কুছ নহীঁ জো কুছ হৈ সো তেরা।
তেরা তুমকো সৌপতাঁ ক্যা লগ্‌গৈ হৈ মেরা ॥২॥

'নয়নের মধ্যে তুমি এস। যেমনি আসবে আমি নয়ন বন্ধ করে দেব। আমি আর

কাউকে দেখব না, না আর তোমায় কাউকে দেখতে দেব। আমার মধ্যে আমার কিছু নেই। যা আছে সে-সব তোমার। তোমার জিনিস তোমায় দেব সঁপে, এতে আমার কি এসে যাবে।'

আমিত্ব নিঃশেষে মিলাইয়া দেওয়াই কবীরের সাধনার অন্তর্নিহিত ভাবস্তম্ভ। এই স্তম্ভের উপরেই প্রতিষ্ঠিত তাঁহার মধুরভাব। মিলন হয় বলিয়াই মানবজীবন শ্রেষ্ঠ। অদ্বৈতবেদান্তী আচার্য শঙ্করও জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়াছেন কেবল জীবন্মুক্তি-সুখ প্রাপ্তির সার্থকতায়। নতুবা জগতের এই জান্তব জীবন-যাত্রায় এমন কোন নিরঙ্কুশ মধুরতা নাই যা মানুষকে পরিপূর্ণআনন্দ-ধারায় অভিষিক্ত করিতে পারে। কোন কোন সুসাহিত্যিকের লেখার সহিত কবীরের ভাবধারার আপাত মিল দেখা গেলেও কবীর তথাকথিত সাহিত্যিকদের ন্যায় 'মানবই ব্রহ্ম' ভাবিয়া অপরংপার পুরুষোত্তম যেহেতু নির্বিশেষ নিরাকার সেহেতু মানবের সামাজিক সাহিত্যিক তথা সাংস্কৃতিক কোন কাজে লাগেন না অতএব পরিত্যাজ্য—এইরূপ বোধ করিতেন না। যেই অর্থে তাঁহারা মানব-ব্রহ্মবাদ প্রচার করেন—সেই ভাবেও সত্যকে প্রকাশ করেন নাই। সীমা ও অসীম এই দুই-ই অনন্তনিরপেক্ষ উপলব্ধি নয়। পরন্তু ইহাদের অতীত এক সত্তায় ইহারা বিবৃত। যাহার সীমা-জ্ঞান, তাহারই অসীম-প্রত্যয়। বিপরীত পর্যায়েও ইহা সত্য। সীমা ও অসীমের এই বুদ্ধিজ প্রত্যয়ের পরপারে যে উপলব্ধি তাহাই পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎ স্পর্শ—অবাঙ্-মনসোগোচরম্-এর উপলব্ধি। কবীর সখেদে বলিতেছেন—'জগৎ অন্ধ, আমি কাকে বোঝাব!'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব-কথিত নুনের পুতুলের সমুদ্র মাপার অবস্থা। কিন্তু সাহিত্যিক বন্ধুগণ এ অবস্থাকে লইতে পারেন না—কারণ তাহা হইলে বহুধারা মৃৎপাত্রটির কানায় কানায় ভরিয়া জীবনরস পান করা হয় না। কবীর গাহিতেছেন—

হদ চলে সো মানবা, বেহদ চলে সো সাধ।
হদ বেহদ দোউ তজে, তাকর মত অগাধ॥

'সীমার মধ্যে চলে মানুষ—অসীমে চলে যে সে সাধু। সীমা ও অসীম এই দুইটি যিনি ত্যাগ করিয়াছেন—গভীর তাঁহার মত!'

এই গভীর মতের স্রোত বাহিয়াই চলিয়াছে কবীরের জীবনতরী পরমের পানে। সংসারে তিনি ছিলেন উদাসীন ভাববিভোর হইয়া। সংসারজীবনে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যার কাহিনী সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। মত যাহাই হোক না কেন—তিনি এক বিচিত্র জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। গেরুয়া পরিয়া তিনি সন্ন্যাসী সাজেন নাই, গৃহে ছিলেন বলিয়াই তিনি বিষয়রসে জারিত হন নাই। অন্তর তাঁহার সন্ন্যাসীর পর-মুখীনতায় সংস্কৃতিবিস্মৃত, বাহিরে তিনি সংসারের মানুষ। বিপরীত এই দুই ধারার সম্মেলন জীবনের ক্ষেত্রে এত মহানভাবে খুব কমই ঘটিয়া থাকে।

ঈশ্বর-প্রেমে মাতোয়ারা কবীরের নিকট সংসার বড় মধুর ছিল না। যদিও কোরানের বাণী অনুসরণ করিয়া ঈশ্বরের সৃষ্টির মাধ্যমেই তিনি স্রষ্টার অনবদ্য উপস্থিতির ইঙ্গিত উপলব্ধি করিতেন। তথাপি ইন্দ্রিয়ের দ্বার-পথে যাবতীয় ভোগসুখ গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরের আনন্দোপলব্ধির যন্ত্রস্বরূপ হওয়া রূপ বিচিত্র দর্শন তাঁহার ছিল না। সব আনন্দ, সত্তা, জ্ঞান সচ্চিদানন্দেরই—উপনিষদ্ একথা ব্যক্ত করিয়াছেন—'বিষয়ানন্দে ব্রহ্মানন্দ' ইত্যাদি। কিন্তু উপনিষদ্ আবার একনিঃশ্বাসে

বলিয়াছেন—"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্।" আর ভূমার স্বরূপ কি?—'যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা।' সুতরাং হীন-বুদ্ধি লোকের ইন্দ্রিয়জ আনন্দভোগকে ঈশ্বরের আনন্দোপলব্ধির যন্ত্র কল্পনা করা রূপ সর্বথা হেয় দৃষ্টি মহাত্মা কবীরের ছিল না।

গরীব জোলাপরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের দায়িত্ব কবীরের স্কন্ধে। ঘরে অন্ন নাই। প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রীর অভাব। রোজগারের একমাত্র ছেলে কবীর রামনামে বিভোর—তাঁত বোনে না। মায়ের অশ্রুসজল রোষমূর্তি সন্তানকে পীড়িত করে। পুত্রের প্রতি অভিযোগে জননী আজ মুখরা। নিরুপায় কবীর অবস্থাটা উপলব্ধি করিয়া গাহিতেছেন—

কো বীনৈ প্রেম লাগো রী মাঈ কো বীনৈ।
রাম রসাইণ মাতে রী মাঈ কো বীনৈ!
ইত্যাদি—

'ওগো মা, আমি তো প্রেমে পড়েছি। এখন কাপড় বুনবে কে? মাগো, আমি রাম-রসায়ন পান ক'রে মত্ত হয়ে গেছি। এখন কাপড় বুনবে কে! তোর বিশ্বাস আমি কুঁচি দিয়ে সুতোর জট ছাড়াবার কাজ শেষ করেছি কিন্তু আমি যে জট ছাড়াবার কুঁচিটাই বেচে খেয়েছি। মাগো কে কাপড় বুনবে! এই প্রেমে এমন একটি রস জমে উঠেছে যে আমি সুতোর জট ছাড়ানোর উপরই এই রস সমস্তটাই ছড়িয়ে দিয়েছি। মাগো কাপড় বুনবে কে? টানা নাচছে, পোড়েন নাচছে, পুরোনো কুঁচিটা নাচছে। মাগো কাপড় বুনবে কে? মাগো, (আমি দেখছি) বুনবার জায়গায় বসে কবীর নাচছে, ইঁদুরে টানা কেটে দিয়েছে, কে কাপড় বুনবে?'

যিনি কামক্রোধকে প্রদীপের পলিতা বানাইয়াছেন, 'পাকপাত্র' (মন) জ্বালাইতেছেন, 'ঘরে আগুন' (মায়ামোহের সংসারে) দিতেছেন—যেই সংসারের পঞ্চেন্দ্রিয়জ জ্ঞানানুভূতিতে সাহিত্যসেবিগণ মাতোয়ারা—সেই পঞ্চেন্দ্রিয়ে আসক্তি যাঁহার কাছে ডাইনীর ছেলে এবং সে ডাইনী (মায়া, সংসার) তাঁহাকে নিত্য দংশন করিতেছে—সেই সংসারের প্রতি তাঁহার কবে যে সত্যতা বোধ ছিল, তাহা পাঠক বিচার করিবেন। সুতরাং কবীরের সাধনা যুগযুগ-বাহিত 'কাম-কাঞ্চন'-ত্যাগরূপ সাধনার ধারাতেই প্রবাহিত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। (ক্রমশঃ)

যোগারূঢ়

শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

হৃদিচন্দ্র-প্রেমজ্যোতি-
সুধা-স্নিগ্ধ অনিবার
প্রাণ-পদ্ম আলো করি'
খোলো সত্য-জ্ঞান-দ্বার

সেবাগঙ্গা-শুচি-যোগী,
শিব-শান্তি-ধ্যান-লোভী!
হেরি' আত্মা-রূপরাশি,
গাহো বার্তা সদা তাঁর

রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ কর্তৃক শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের শতবার্ষিকী জন্মোৎসব পালন

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্ন্যাসী-শিষ্য পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে গত ৮ই সেপ্টেম্বর রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে তাঁহার ১০১তম জন্মোৎসব প্রতিপালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ৯ই ও ১০ই সেপ্টেম্বর মহাজাতি সদনে দুইটি সভা আয়োজিত হইয়াছিল। প্রথম দিন সভায় পৌরোহিত্য করেন জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দজী। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ১০১টি দীপ জ্বালিয়া সভার উদ্বোধন করেন। মাননীয় বিচারপতি প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইবার পর স্বামী পুণ্যানন্দজী মহারাজ, অর্থমন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় এবং কলিকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ভাষণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজীর চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। বেদান্তমঠের সাধারণ সম্পাদক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজীর কর্মবিবৃতি পাঠের পর সভাপতির ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে সভার কার্য শেষ হয়।

১০ই তারিখ সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ। উদ্বোধন-সঙ্গীত ও শান্তিপাঠ হইবার পর স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া ও দীপ জ্বালিয়া সভার কার্য আরম্ভ করেন। পরে প্ল্যানিং কমিশনের মেম্বার ডক্টর ভি. কে. আর. ভি. রাও, ডক্টর রমা চৌধুরী, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার ও স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী বক্তৃতা করেন। স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ সভাপতির ভাষণ দিবার পর শ্রীমৃগাঙ্কমোহন শূর সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সভাপতির ভাষণে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ বলেন :

আজ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের জন্মশতবার্ষিকী সভায় তাঁহার শতমুখী প্রতিভা ও অবদানের কথাই মনে জাগিতেছে। কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করা সত্বেও তাঁহার মন ভোগের দিকে না যাইয়া প্রথম হইতেই যোগাভিমুখী ছিল। যোগসাধনার জন্য গুরু খুঁজিবার সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যসঙ্গ লাভ করিয়া তিনি তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর তিনি তাঁহার অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের সহিত বরাহনগর মঠে আসিয়া মিলিত হন। এইকালে তাঁহার তপস্যার কঠোরতা ও বেদান্তোক্ত সত্যলাভে একান্ত অনুরাগ দর্শনে তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ তাঁহাকে 'কালী তপস্বী' ও 'কালী বেদান্তী' নামে অভিহিত করিতেন। সংস্কৃত ভাষায় ও শাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান ছিল অগাধ। শ্রীশ্রীমায়ের যে অনবদ্য স্তবটি ('প্রকৃতিং পরমামভয়াং বরদাম্…') তিনি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, 'এই ছেলেটির

জিহ্বায় সরস্বতী বসবেন।' স্বামী অভেদানন্দজীর জীবনে শ্রীশ্রীমায়ের সে উক্তির সফলতা দেখা যায় আমেরিকায় প্রচারকালে তাঁহার অদ্ভুত বাগ্মিতার বিকাশ দর্শনে। দীর্ঘ ১০।১২ বৎসর আমেরিকায় কাটাইবার পর ভারতে ফিরিলে ব্যাঙ্গালোরে একটি সভায় তাঁহাকে প্রদত্ত সংস্কৃত অভিনন্দনের উত্তরে সুললিত সংস্কৃতে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছিল, এত দীর্ঘকাল সংস্কৃত-চর্চাহীন পাশ্চাত্যে বাস করা সত্ত্বেও সংস্কৃত ভাষার উপর তাঁহার অধিকার বিন্দুমাত্রও কমে নাই। কৈলাস মঠের ধনরাজ গিরি তাঁহার সহিত সংস্কৃতে তর্ক করিবার পর বলিয়াছিলেন—'ইঁহার প্রজ্ঞা অলৌকিক।'

স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যে প্রচারকালে তাঁহার আহ্বানে স্বামী অভেদানন্দজী লণ্ডনে ও সেখান হইতে আমেরিকায় গমন করেন এবং সেখানে ভারতীয় ভাবধারা প্রচার করিতে থাকেন। প্রচার-ব্যপদেশে তাঁহাকে ১৭।১৮ বার অতলান্তিক মহাসাগর অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। পাশ্চাত্যে সুদীর্ঘকাল থাকিয়া তিনি সেখানে বেদান্তের আলোক ছড়াইয়াছেন। এই কার্যে যে পরিশ্রম তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল, তাহার জন্য সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

ভারতে ফিরিয়া তিনি রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানেও বহুব্যক্তি তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার ও তাঁহার সঙ্গলাভ করিবার সুযোগ পাইয়া ধন্য হইয়াছেন।

আমরা আজ তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী সভায় মিলিত হইয়াছি। আজ যেন আমরা তাঁহার উপদেশমত জীবনগঠনে উদ্বুদ্ধ হইতে পারি—তাহা হইলেই এই অনুষ্ঠান সার্থক হইবে।

ডক্টর ভি. কে. আর. ভি. রাও বলেন :

স্বামী অভেদানন্দজী শুধু ভারতেরই নয়, সমগ্র জগতের মহত্তম ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেসব ১৮।২০ বছর বয়স্ক পবিত্র-হৃদয়, আদর্শবাদী, স্বাধীনচেতা যুবকদের অনুপ্রেরণাদানে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক জীবন স্বহস্তে উচ্চ পর্দায় বাঁধিয়া তাহার ভাবপ্রচারকল্পে সংঘবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, স্বামী অভেদানন্দজী ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। গুরুর সন্ধানে শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে আসিয়া তিনি তাঁহারই হইয়া যান এবং এই ত্যাগী যুবকদের দলভুক্ত হন। এই সন্ন্যাসীবৃন্দের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব সারা জগতে প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবিতকালে তিনিই ছিলেন এই ত্যাগী যুবকদলের নেতা; তাঁহার অবর্তমানে স্বামী বিবেকানন্দ ইঁহাদের নেতা হইলেন। বিবেকানন্দই ছিলেন ইঁহাদের মধ্যে সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর স্বামী বিবেকানন্দ বরাহনগরে মঠ করিয়া সেখানে সকলকে একত্র করেন। স্বামী অভেদানন্দও এখানে আসিয়া যোগ দেন এবং দীর্ঘকাল সকলের সহিত সেখানে সাধনভজন ও তপস্যায় কাটাইবার পর তীর্থদর্শন ও সাধুসঙ্গ করিবার জন্য সারাভারত পরিভ্রমণ করেন। এই দীর্ঘ ভ্রমণ সময়ে ভারতের জনগণের সঙ্গে, ভারতের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। সেই সঙ্গে ভারতের ইতিহাসের সহিত, এবং সমগ্র মানবজাতিরই চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইতেও তিনি সচেষ্ট হন। পরে স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে তিনি লণ্ডন গমন করেন। তৎপূর্বে স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো-বিজয় হইয়া গিয়াছে—গোটা আমেরিকায় বেদান্তের বিজয়-পতাকা তখন

উড্ডীন, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনানুভূত ও শ্রীমুখ-নিঃসৃত ভারতের যুগযুগসঞ্চিত বেদান্তের চিন্তাধারা তখন পাশ্চাত্যের দিকে দিকে প্রচারিত। এই প্রচারকার্যে সহায়তার জন্য স্বামীজী স্বামী অভেদানন্দকে লণ্ডন হইতে আমেরিকায় পাঠাইলেন।

আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দের বাণী বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। তাঁহার বাণী যে সকলের হৃদয় স্পর্শ করিত, তাহার কারণ তিনি সর্বজনীন ভাবে যুক্তির মাধ্যমে বেদান্তের ভাবগুলি প্রচার করিতেন। সে ভাবগুলি বিশ্ববাসী সকলেরই গ্রহণযোগ্য—তাহা কোন ধর্মবিশেষের ভাব নয়। বেদান্তের ভাব বৈজ্ঞানিক-চিন্তাধারানুগ, যুক্তিসম্মত। সেদিক দিয়া প্রত্যেক ধর্মই বেদান্ত-প্রচারিত সর্বজনীন ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। যুক্তিপ্রবণ, বৈজ্ঞানিক ধারায় চিন্তাশীল বিংশ শতাব্দীর মানুষের ধর্মই তাই বেদান্তের ধর্ম। ইহা কোন সম্প্রদায়গত ধর্ম নয়, ইহার ভিত্তিভূমি কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তির সহিত সংশ্লিষ্টও নয়। দেশ, জাতি, বর্ণ, ভাষা বা সম্প্রদায়গত ভেদ এই বেদান্তধর্মে নাই; এই ধর্ম এ-সব কিছুর ঊর্ধ্বে; ইহা এ যুগের সর্বমানবের ধর্ম। বিংশ শতাব্দীরও মানুষকে ধর্মের কথা বলিতে গেলে যুক্তি, সমাজতন্ত্র প্রভৃতির মাধ্যমে তাহা বলিতে হইবে—তবেই তাহা তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিবে। কোন কুসংস্কার বা বিশ্বাসের স্থান এখানে নাই; অমুক শাস্ত্রে ইহা বলিয়াছে বা অমুক মহাপুরুষ একথা বলিয়াছেন—বর্তমান যুগের বিশ্বাসের পক্ষে এসব আজ যথেষ্ট নয়।

স্বামী অভেদানন্দজী তাই ধর্মের কথা এইভাবে, যুগোপযোগী করিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বেদান্তনিহিত সত্য দেশকালাতীত, চিরন্তন।

আজ আমাদের দেশের যুবকদের সম্মুখে এই দেশকালাতীত সত্যকে তাহাদের বুঝিবার মত করিয়া তুলিয়া ধরিতে হইবে। ইহা যে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যের অবিরোধী তাহা তাহাদের বুঝিতে দিতে হইবে। বুঝিতে দিতে হইবে, বিশ্বপ্রকৃতির সর্ববিধ বৈচিত্র্যের অন্তরালে যে সর্বজনীন নিত্য সত্য বিদ্যমান রহিয়াছে—বিজ্ঞানও সেই সত্যেরই অন্বেষণে রত, এবং বিজ্ঞান এখনো যাহার অন্বেষণ করিতেছে, বেদান্ত সেই সত্যকে বহুপূর্বেই লাভ করিয়াছে। বিজ্ঞান ও বেদান্তকে একই সূত্রে গাঁথিয়া পরিবেশন করিতে হইবে আমাদের।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট তাঁহার সন্তানগণ যে সত্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহারা জগতে প্রচার করিয়াছেন। ইহার একটি হইল—একই সত্তা সকলের ভিতর রহিয়াছে, ভগবান সকলেরই অন্তরে রহিয়াছেন। ইহা জানিয়া ধনীদরিদ্র-নির্বিশেষে সকল মানুষকেই ভালবাসিতে হইবে। সর্ববিধ পার্থক্যের আবরণ ভেদ করিয়া সর্বজনীন সত্তারূপে মানুষকে দেখিতে হইবে—মানুষকে আসল মানুষরূপে, ভগবানরূপে দেখিতে হইবে। এবং এভাবে দেখিয়া তাহাকে ভালবাসিতে হইবে, তাহার সেবা করিতে হইবে। ইহাই কর্ম-পরিণত বেদান্ত, স্বামী অভেদানন্দজীর জীবনে ইহারই প্রতিফলন দেখি।

আজ তাঁহার জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান সভায় এই সত্যটিকে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, ভারতের কল্যাণের জন্য ভারতের যুবসংঘকে, ভারতের অমৃতের সন্তানগণকে এই সত্যদৃষ্টিতে দেখিয়া তাহাদেরও মনকে এই সত্যাভিমুখী করিতে হইবে। বর্তমান ভারতকে বাঁচিতে হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে অনুভূত এবং তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট বেদান্তের সত্যকে আমাদের জীবনে রূপায়িত করিতেই হইবে।

সমালোচনা

God and the Welfare State—By Nakuleswar Banerjee, Indian National Academy, 31 Mahajati Nagar, Block II, Calcutta 51, Pp. 30, price Re 1/-.

একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকার মধ্যে অধ্যাপক নকুলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বহু গুরুতর প্রসঙ্গ সরসভাবে উত্থাপন করিয়াছেন এবং আকর্ষণীয় মৌলিকতার সহিত সে প্রসঙ্গসমূহের আলোচনা করিয়াছেন। ঈশ্বরকে গ্রহণ ও স্বীকার করার মধ্যেই যে আধুনিক সভ্য জগতের মূল সমস্যাগুলির সমাধান নিহিত, নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠককে সে বিষয়ে অবহিত করিতে চাহিয়াছেন।

তাঁহার পুস্তিকাটি যথাক্রমে (১) ঈশ্বর ও স্বর্ণমান, (২) মানব ও ঈশ্বর, এবং (৩) সমাজতান্ত্রিকের বাঞ্ছনীয় ধর্ম অথবা বিপ্লব—এই তিনটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বরকে স্বীকার করার পক্ষে যে যুক্তিগুলি দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার চিন্তাশীলতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর নিজস্বতার পরিচয় উজ্জ্বল।

তাঁহার মতে স্বর্ণমান যেমন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-ক্ষেত্রে কতগুলি সুষ্ঠু নীতির প্রচলন করিয়া মুদ্রাজগতে অরাজকতা রোধ করিয়াছে, তেমনি ঈশ্বরকে স্বীকার করিলে মানুষের আচরণের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতার অবসান ঘটিবে। মানুষের যৌথ জীবন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল বলিয়া অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য এই যে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ ঈশ্বরচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইলে সমাজের কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সহাবস্থান সম্ভব নহে (২৯ পৃঃ)। রক্তপ্লাবিত বিপ্লবের পরিবর্তে ধর্মের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তিনি আগ্রহী।

তাঁহার সহিত সকলের সর্বক্ষেত্রে মতৈক্য না হইলেও তাঁহার সুভাষিত সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগের সহিত বিচার-বিবেচনার অপেক্ষা রাখে।

—প্রেমবল্লভ সেন

Spitam Zarathushtra : By Dr. Jal K. Wadia, 275, Bepin Behari Ganguli Street, Calcutta 12. Pp. 30.

ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন প্রাগৈতিহাসিক যুগের অন্ধকারের অজ্ঞাত গর্ভ হইতে নিঃসৃত ক্ষীণ অলোকরেখা বিশ্লেষণ করিয়া মানবজাতি যে সকল তথ্য সংগ্রহে সক্ষম হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্বপ্রথম নৈতিক-উপদেষ্টা ও মহাপুরুষরূপে স্বীকৃত স্পিতম জরথুষ্ট্রের জীবন ও বাণী এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সংগ্রহ যদিও যৎসামান্য তথাপি প্রাচুর্যের অভাব উৎকর্ষে পূরণ করিয়াছে।

সর্ব-ধর্ম-প্রসূতি এশিয়া মহাদেশের এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে জনসাধারণের জ্ঞান খুবই সীমিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিজব্যয়ে এই পুস্তিকা প্রণয়ন ও বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া লেখক ধর্মপ্রাণ মানুষ মাত্রেরই প্রশংসা অর্জন করিবেন, সন্দেহ নাই। পুস্তিকার শেষাংশে অবেস্তার পবিত্র গাথা হইতে জরথুষ্ট্রের বাণী- ও উপদেশ-চয়ন সন্নিবেশিত হওয়ায় উহার সৌষ্ঠব ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মহাপুরুষের জীবন ও বাণী স্মরণ-মননে সর্বদাই মঙ্গল।

লেখক ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশনে অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগের সাহায্য আরো বেশী লইলে ভাল হইত। **—কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়**

মাষ্টার মশায়ঃ শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ, মুকুন্দ-পল্লী, বীরভূম। প্রাপ্তিস্থান—মডেল পাবলিশিং হাউস, ২এ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। পৃঃ ২৩৮ ; মূল্য—৪·৫০ টাকা।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় খণ্ডের ৪১৩ পৃষ্ঠায় আছে, "খুব অপ্রত্যাশিত ভাবে কোন এক বিশিষ্ট বড় লোকের বাড়ী হইতে এক যুবকের বিবাহের প্রস্তাব আসে।" যুবকটি কর্তব্য স্থির করিতে "শ্রীশ্রীমার মত জানিবার জন্য জয়রামবাটীতে তাঁহার নিকট বিবাহের কথা উত্থাপন করে (মে, ১৯১৫)। মা সব শুনিয়া বলিলেন, 'বাবা, তুমি তো বেশ আছ। কেন সংসার-অনলে দগ্ধ হতে যাবে? তুমি ভাল কাজ করছ। অনেক ছেলে তোমার সাহায্যে পড়া-শুনা করছে। তারা সব ভাল হবে, তোমারও কল্যাণ হবে।'" এই যুবকটিই শ্রীমুকুন্দ-বিহারী সাহা, স্থানীয় অঞ্চলে 'মাষ্টার মশায়' নামেই পরিচিত, আর এই স্কুলটিই বর্তমান রামকৃষ্ণ শিক্ষাপীঠের (মুকুন্দপল্লী, বীরভূম), শিশু-অবস্থা। পুস্তকটি তাঁহার স্মৃতি-তর্পণ।

শ্রীশ্রীমায়ের আদেশ শিরোধার্য করিয়া কিভাবে এই যুবকটি নিজের আজীবন ব্রহ্মচর্যপূত অমলিন জীবনপুষ্পটির অর্ঘ্য ও শিক্ষাপীঠের পরিচালনা এবং তার চেয়েও বড় কথা আজীবন সেখানকার অসংখ্য ছাত্রের হৃদয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজী-মায়ের কল্যাণকর ভাবগুলিকে অনুপ্রবিষ্ট করানো রূপ কর্মের নৈবেদ্য শ্রীশ্রীমায়ের পূজাপীঠে তুলিয়া দিতে পারিয়া-ছিলেন, 'মাষ্টার মশায়' পুস্তকটি সেই বিবৃতিই বহন করিতেছে। পুস্তকটি পাঠ করিলে সকলেই আনন্দ লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

পুস্তকটির নামকরণে একটু ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে মনে হইল। 'মাষ্টার মশায়' কথাটি কানে আসা মাত্র 'শ্রী—ম'-র কথাই মনে জাগে। নামটির নীচে বন্ধনীমধ্যে ছোট করিয়া 'মুকুন্দবিহারী সাহা' কথাটি লেখা থাকিলেই ভাল হইত।

ভগবৎপ্রসঙ্গ (প্রথম পর্যায়)— শ্রীহরিশচন্দ্র সিংহ। প্রকাশক—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির প্রকাশক-মণ্ডলীর পক্ষে শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, ৪নং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো, কলিকাতা ২৫। পৃষ্ঠা ১৯৬ ; মূল্য ৪·৫০ টাকা।

'ভগবৎপ্রসঙ্গ' গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিয়া আমরা আনন্দিত। উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কথোপকথনচ্ছলে সরলভাবে পরিবেশিত হওয়ায় পুস্তকের যে যথেষ্ট সমাদর হইয়াছে, বর্তমান সংস্করণই তাহার প্রমাণ। বিষয়বস্তু পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণ থাকিলেও সুধী লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পুস্তকের প্রারম্ভে নূতন সংযোজিত হইয়াছে ; লেখকের জীবন-চর্যার প্রতি পাঠক-গণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

তারাপীঠের সাধক—ভবেশ দত্ত। প্রকাশক—শ্রীসুরেশচন্দ্র দাশ, ৩৭।১১, বেনিয়া-টোলা লেন, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ১৩৫ ; মূল্য ৩৲।

সিদ্ধ মহাপুরুষের জীবনের কাহিনী জন-সাধারণের সম্মুখে যথাযথভাবে উপস্থাপিত করা অত্যন্ত কঠিন। তারাপীঠের সাধক পরম সিদ্ধ পুরুষ শ্রীশ্রীবামাক্ষেপার জীবনের শ্রুত ও সংগৃহীত অলৌকিক ঘটনাবলী আলোচ্য পুস্তকে পরিবেশিত।

উপন্যাসের রচনাশৈলী গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া পুস্তকের সর্বত্র সাবলীলতা বর্তমান। সন তারিখ সহ সিদ্ধ মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযোজিত হইলে পুস্তকখানির মর্যাদা অধিকতর বৃদ্ধি পাইত সন্দেহ নাই, আমরা এই বিষয়ে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। প্রচ্ছদপটটি সুন্দর।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের সুমুদ্রিত কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ভারতের বাহিরে সুদূরবর্তী স্থানে মিশনের এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে। এই কেন্দ্রের প্রধান কার্য আধ্যাত্মিক ও সাধারণ শিক্ষা বিস্তার। প্রতি সপ্তাহে ক্লাস ও বক্তৃতা এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয়। কেন্দ্রাধ্যক্ষ আশ্রমের বাহিরে বিভিন্ন স্থানে আহূত হইয়াও ধর্মবিষয়ে ভাষণ দেন।

বিদ্যালয়: 'বিবেকানন্দ তামিল বিদ্যালয়' এবং 'সারদা দেবী তামিল বিদ্যালয়'—সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত এই বিদ্যালয়-দুইটিতে আলোচ্য বর্ষে ২৭১ জন ছাত্রছাত্রী (ছাত্রী—২০৩) অধ্যয়ন করিয়াছে। তামিল-ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হইলেও ছাত্রছাত্রীগণকে জাতীয় ভাষা (মালয়) এবং ইংরেজীও শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় (Secondary School Entrance Examination) উত্তীর্ণের হার ৬৫·৬%।

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য নৈশবিদ্যালয়ে তামিল ও ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৫৫ জন বয়স্ক ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

ছাত্রাবাস: মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত ছাত্রাবাসে আলোচ্য বর্ষে ৫৫টি ছাত্র ছিল। বিদ্যার্থীরা নিয়মিত প্রার্থনা-ভজনাদি ও খেলাধূলার মাধ্যমে মানুষ হইয়া উঠিতেছে। ৮ হইতে ১৭ বৎসরের আশ্রম-বালকবৃন্দ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র। আলোচ্য বর্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ছাত্রাবাস পরিদর্শন করিয়া বিশেষ প্রীত হন।

গ্রন্থাগার: ইংরেজী, তামিল, মালয়ালম, হিন্দী ও বাংলা ভাষায় ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে ৫,০৮৮ খানি সুনির্বাচিত পুস্তক গ্রন্থাগারে রাখা হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে ১২৯টি নূতন গ্রন্থ সংযোজিত হয়। পাঠাগারে ৬টি দৈনিক ও ৫৮টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। শিশুদের জন্য একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার করা হইয়াছে; এখানে শিক্ষাবিষয়ক প্রয়োজনীয় পুস্তকাবলী রাখা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা, ও স্বামীজীর জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে; পুণ্যতিথিগুলিও যথাযথভাবে উদ্‌যাপন করা হয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের বন্যার্ত-সেবাকার্য

আসামের বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে গত ২৯. ৬. ৬৬ হইতে ১৮. ৯. ৬৬ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক শিলচর কেন্দ্র হইতে ৪৫ কুইণ্টাল চাল, ২৪·০ কুইণ্টাল আটা বিতরিত হইয়াছে। (অন্যান্য দ্রব্য যাহা বিতরিত হইয়াছে, উদ্বোধনের গত আশ্বিন সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে)। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ২৩,২১২।

মিশনের করিমগঞ্জ শাখা হইতে ৪টি সাহায্য-কেন্দ্র খুলিয়া ২৫টি গ্রামে ২৪৮টি পরিবারের মধ্যে টেষ্ট রিলিফ পরিচালিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত ৩২৫টি পরিবারে (প্রায় ১,১০০ জনকে) ফ্রি-রেশন দৈনিক ২ কে. জি. করিয়া দেওয়া হইতেছে।

এ পর্যন্ত বন্যার্ত-সেবায় জন্য প্রধান কেন্দ্র

বেলুড় হইতে শিলচর ও করিমগঞ্জ কেন্দ্রে ৬৬,৪৩৫৲ টাকা অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে।

রিলিফের জন্য অত্যাবশ্যক সর্ববিধ দ্রব্যকে অগ্রাধিকার দিয়া রেলওয়ে বোর্ড বিনা ভাড়ায় এবং যথাসম্ভব সত্বর (প্যাসেঞ্জার ট্রেনেও) শিলচর ও করিমগঞ্জে পৌছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আমেরিকায় বেদান্ত

নিয়ইয়র্ক: রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বেদান্ত কেন্দ্র—অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ। এই কেন্দ্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছিল:

মে, ১৯৬৬: ঈশ্বর, আত্মা এবং বিশ্ব; শ্রীবুদ্ধের শান্তির বাণী (বুদ্ধের জন্মদিন উপলক্ষে); কর্তব্য ও স্বাধীনতা; ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ; নির্ভীক ও উদ্বেগশূন্য হইয়া জীবনসংগ্রামের সম্মুখীন হওয়া।

জুন, '৬৬: কর্মের মাধ্যমে নৈষ্কর্ম্য; আমরা সকলেই কি ঈশ্বরের সন্তান? আধ্যাত্মিকতা-শূন্য জীবন নিরর্থক; ধ্যানের বিভিন্ন স্তর।

এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত এবং কঠোপনিষৎ অবলম্বনে ক্লাস করা হইয়াছিল।

চিকাগো কেন্দ্রের নূতন গৃহের উদ্বোধন এবং বিশ্বধর্মসম্মেলনের স্মারক অনুষ্ঠান

চিকাগো বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি উহার এল্‌ম্ স্ট্রীটস্থ পুরাতন আবাস হইতে ৫৪২৩ সাউথ পার্ক বুলেভার্ডে অবস্থিত একটি বৃহত্তর ত্রিতল বাড়িতে উঠিয়া আসিয়াছে। এই বাড়িটি ক্রয় এবং পুনর্বিন্যাসের জন্য প্রায় একলক্ষ ডলার ব্যয়ভার বেদান্তানুরাগী জনৈক বিশিষ্ট আমেরিকান বন্ধু বহন করিয়াছেন। গত ৭ই সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমীর দিন নূতন গৃহের উদ্বোধন-উৎসব সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে আমেরিকার বিভিন্ন বেদান্তকেন্দ্র হইতে ৭ জন সন্ন্যাসী চিকাগোতে সমবেত হইয়াছিলেন। প্রত্যূষে অডিটোরিয়ামের বেদির সম্মুখে সোসাইটির পরিচালক স্বামী ভাষ্যানন্দ মঙ্গল আরতি করেন। এই বেদিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে। হার্মান গারফিল্ড নামক জনৈক ভাস্কর উহা নির্মাণ করিয়াছেন। মূর্তির পরিমাপ ৩১/২´×২১/২´। এই দিনের পূজার জন্য সোসাইটির নিত্যপূজিত শ্রীরামকৃষ্ণের ছোট প্রস্তরমূর্তি এবং জননী সারদাদেবী, স্বামীজী এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের ফটো পৃথক পৃথক কাষ্ঠ-সিংহাসনে বেদির নীচে স্থাপিত হইয়াছিল। মঙ্গল আরতির পর স্বামী ভাষ্যানন্দ এবং আশ্রমের আমেরিকান ব্রহ্মচারি-চতুষ্টয় বেদ ও উপনিষদ্ হইতে আবৃত্তি করেন। পরে সমবেত সন্ন্যাসী এবং ৩০ জন ভক্ত ধ্যান ও প্রার্থনায় কিয়ৎকাল নিযুক্ত থাকেন। বিশেষ পূজা ও হোম সকাল ৯টা হইতে বেলা ১২টা পর্যন্ত স্যানফ্রান্সিস্কো কেন্দ্রের স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এবং হলিউড কেন্দ্রের স্বামী বন্দনানন্দ নির্বাহ করেন। প্রায় ৬০ জন আমেরিকান ভক্ত ইহাতে উপস্থিত ছিলেন। পূজার পর ভক্তেরা পুষ্পাঞ্জলি দেন। সমগ্র পূজাস্থান নয়নাভিরাম পুষ্পসম্ভারে সুসজ্জিত হইয়াছিল এবং ধূপ, দীপ, মন্ত্র ও স্তোত্রাদি পাঠ, তথা গৈরিক পরিহিত আটজন ভারতীয় সন্ন্যাসীর উপস্থিতিতে যে ভারতীয় আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছিল উহা ভক্ত-মণ্ডলীকে বিশেষ অনুপ্রেরণা ও আনন্দ দেয়। সন্ধ্যা ৭ টায় সর্বসাধারণের জন্য একটি সভা আয়োজিত হইয়াছিল। সেন্টলুইস কেন্দ্রের স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ, নিউইয়র্ক কেন্দ্রের স্বামী পবিত্রানন্দ, সিয়্যাট্‌ল্ কেন্দ্রের স্বামী বিবিদিষা-নন্দ, বস্টন ও প্রভিডেন্স কেন্দ্রের স্বামী সর্বগতানন্দ, স্যানফ্রান্সিস্কো কেন্দ্রের স্বামী

শ্রদ্ধানন্দ, হলিউড কেন্দ্রের স্বামী বন্দনানন্দ ও স্বামী শান্তানন্দ এবং চিকাগো কেন্দ্রের স্বামী ভাষ্যানন্দ বেদান্তের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন। বক্তৃতার পর ভারতীয় যন্ত্রসঙ্গীত চিকাগো-প্রবাসী তিনজন ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞ কর্তৃক পরিবেষিত হয়। সভাশেষে সমবেত ২০০ জন নরনারীকে ভুরিভোজনে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর চিকাগোতে বিশ্বধর্মসম্মেলনে তাঁহার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রথম ভাষণ দিয়াছিলেন। ঐ ঘটনার স্মরণে বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি ১১ই সেপ্টেম্বর, রবিবার সন্ধ্যা ৭ টায় সোসাইটির অডিটোরিয়ামে একটি সর্বধর্ম-আলোচনা সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। এই সভায় ইহুদী ধর্ম সম্বন্ধে বলেন, র‍্যাবাই (ইহুদী ধর্মযাজক) ম্যালকম কোহেন; ইউনিটেরিয়ানিজম্ ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থাপিত করেন রেভারেণ্ড চার্লস্ এডিস; খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ে ভাষণ দেন রেভারেণ্ড হ্যারল্ড্ ফ্রেঞ্চ; ইসলাম ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বলেন যথাক্রমে অধ্যাপক আবদুল শরীফ ও রেভারেণ্ড সাথার। হিন্দুধর্মের বক্তা ছিলেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। স্বামী ভাষ্যানন্দ অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন। অধিকাংশ বক্তাই স্বামী বিবেকানন্দের সার্বভৌমিক উদার দৃষ্টির উল্লেখ করিয়াছিলেন। এই আলোচনা-সভায় বিভিন্ন ধর্মের পারস্পরিক সমাদর এবং উদার সহানুভূতির ভাব শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। স্বামীজীর চিকাগো বক্তৃতাকালীন বীরবেশের একটি সুবৃহৎ চিত্র অডিটোরিয়ামের দেওয়ালে টাঙানো ছিল। স্বামীজীর জীবন্ত প্রেরণা যেন প্রত্যেকেই অনুভব করিয়াছিলেন।

স্বামী প্রণবাত্মানন্দের প্রচারকার্য

গত জুন মাস হইতে ২০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী কুশমণ্ডি, কালিয়াগঞ্জ, বনিয়াদপুর, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—মালদহ, মাদিয়া, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ—শোভানগর, অনাথ আশ্রম—সাহাপুর, যজ্ঞেশ্বরপুর, নিশিন্দ্রা, সুদনা, বহরমপুর কলেজ, রামকৃষ্ণ মিশন টিচার্স ট্রেনিং কলেজ—সারগাছি, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—সারগাছি, রামকৃষ্ণ আশ্রম-কৃষ্ণনগর, বাহাদুরপুর, প্রবুদ্ধ ভারত সংঘ—চুচুড়া, হুগলী জেলা রামকৃষ্ণ সেবাসংঘ, রামকৃষ্ণ আশ্রম—আঁটপুর, বিবেকানন্দ বিদ্যার্থী ভবন—কলিকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন সমাজকল্যাণ শিক্ষা কেন্দ্র—বেলুড়, রামকৃষ্ণ শিক্ষাপীঠ মুকুন্দপল্লী—বীরভূম, রাঁচী সহরের বিভিন্ন স্থান যথা—হিনুক্লাব, চিরুণ্ডি, জহরনগর কলোনী, ঘাঘড়া, গান্ধীনগর কলোনী, কাটাটুলী কলোনী, কন্যাপাঠশালা, হিনুবিহারী ক্লাব, নিবারণপুর ব্রহ্মচারী হাইস্কুল, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—মোরাবাদি, দুর্গাবাড়ী, ডুরণ্ডা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, মিলিটারী ক্যাম্প, রামকৃষ্ণ সেবাসংঘ—জগন্নাথপুর, রাঁচী রামকৃষ্ণ মিশন টি বি স্যানাটোরিয়াম ইত্যাদি স্থানে 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ', 'সর্বধর্মসমন্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ', 'শিক্ষাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ', 'জাতীয় জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও যুগাচার্য বিবেকানন্দ', 'ভারতীয় সংস্কৃতি' ইত্যাদি সম্বন্ধে মোট ৪৫টি বক্তৃতা দিয়াছেন; তন্মধ্যে ১১টি হিন্দী ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

সুরবিতানে স্বামী অভেদানন্দ জন্মশতবার্ষিকী পালন

গত ৮ই অক্টোবর সকাল ৯ টায় ৮৩ মনসাতলা লেনে "সুরবিতান" এক নিষ্ঠাপূর্ণ অনুষ্ঠানে স্বামী অভেদানন্দের জন্মশতবার্ষিকী দিবস পালন করে। উৎসবের প্রারম্ভে শ্রীরবীন্দ্র বসু বেদগান এবং সুরবিতান-শিশুশিল্পীবৃন্দ উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

শ্রীরবীন্দ্র বসু তাঁহার হৃদয়গ্রাহী ভাষণে বলেন, স্বামী অভেদানন্দের স্বর্গীয় মানবতাবোধের তুলনা নাই। পৃথিবীর আধ্যাত্মিক ইতিহাসে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীসারদা মা এবং স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব এক পরম মঙ্গলের সূচনা করিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন স্বয়ং নারায়ণ, শ্রীশ্রীমা ছিলেন স্বয়ং ভগবতী এবং বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন নর-ঋষি। শ্রীরামকৃষ্ণের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' বাণীকে সাক্ষাৎ রূপদান করিয়া গিয়াছেন সন্ন্যাসীর বেশে অক্লান্ত বীর যোদ্ধা রূপে স্বামী বিবেকানন্দ। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র সারমর্ম এত গভীরভাবে জগতের আর কোন মানুষ বুঝিয়াছেন কিনা জানিনা। স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন এই মহাবীর সন্ন্যাসীর একনিষ্ঠ সেবক ও তাঁহার আদর্শ প্রতিনিধি। তিনি তাঁহার কর্ম ও শিক্ষার মাধ্যমে শিখাইয়াছেন 'স্বর্গীয় মানবতাবোধ', যাহা হইল কর্ম ও শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে ভালবাসা এবং শিবজ্ঞানে তাহার সেবা করা। তাঁহার পরম জ্ঞানগর্ভ পুস্তকগুলি পৃথিবীর সমস্ত গুণীসমাজে আদৃত। তিনি সকল দেশের সকল মানুষকে ভালবাসিয়াছেন এবং তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করিয়াছেন, তাঁহাকে মনে করিলেই স্বামীজীকে মনে পড়ে এবং একসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে মনে পড়ে।

কার্যবিবরণী

বিবেকানন্দ-সোসাইটি (২১, বৃন্দাবন বসু লেন, কলিকাতা ৬): যুগপ্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা রূপায়িত করিবার জন্য জনসাধারণ কর্তৃক যে সকল সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বিবেকানন্দ সোসাইটির নাম প্রাচীনতার দিক হইতে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য। সুদীর্ঘ ৬৩ বৎসর পূর্বে ভগিনী নিবেদিতার পরিকল্পনা অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানের পত্তন হইয়াছিল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই সমিতির ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

আলোচ্য বর্ষে সাপ্তাহিক ও সাময়িক ধর্মসভায় শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি (কথকতা), স্বামীজীর জ্ঞানযোগ এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের জীবন ও বাণী আলোচিত হইয়াছিল।

সোসাইটি-প্রাঙ্গণে এ বৎসর অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উৎসবে বিশেষ পূজা ও পাঠের মাধ্যমে সোসাইটির সভ্যগণ তাঁহাদের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। আলোচ্য বর্ষে স্বামী বিবেকানন্দের ১০৩তম জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা হইয়াছিল।

পাঠাগারে প্রায় ৬,০০০ পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষাভিলাষী ছাত্রদের কথা স্মরণ করিয়া বর্তমানে পাঠাগারের পুস্তক নির্বাচন করা হয়। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও অর্থনীতির বিভিন্ন পুস্তক এবং অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ছাত্রদের জন্য ক্রয় করা হইতেছে।

সোসাইটির দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে পল্লীর দুঃস্থ পরিবারের প্রয়োজন-বোধে পথ্যের ব্যবস্থা করা হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসালয়ে ১৪,০২৪ জন রোগী চিকিৎসিত হয়। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সহযোগিতায় সোসাইটিতে একটি দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে, প্রতিদিন ১০০ জনকে দুগ্ধ দেওয়া হইতেছে। প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের মাসিক ও এককালীন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়।

কলিকাতায় ১৫১নং বিবেকানন্দ রোডে নিজস্ব জমিতে সোসাইটির বহু-ঈপ্সিত 'বিবেকা-নন্দ-স্মৃতিমন্দির'-এর নির্মাণকার্য দ্বিতল পর্যন্ত প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

পরলোকে পণ্ডিত রমেশচন্দ্র পঞ্চতীর্থ

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, মেদিনীপুর জেলার বিখ্যাত পণ্ডিত রমেশচন্দ্র পঞ্চতীর্থ, বিদ্যার্ণব, বিদ্যালঙ্কার মহাশয় গত ১৭.৮.৬৬ বুধবার অপরাহ্ণ ৫টা ৩১ মিনিটের সময় তাঁহার কাঁথি চণ্ডীতলাস্থিত বাসভবনে ৭৮ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। অগণিত বিদ্যার্থী তাঁহার নিকট সামবেদ, শুক্লযজুর্বেদ, নব্য ও প্রাচীন স্মৃতি, সাংখ্য, বেদান্ত, মীমাংসা, সাধারণ দর্শন, বৈষ্ণবদর্শন, জ্যোতিষ, কাব্য, পুরাণ ও ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যশস্বী অধ্যাপক হইয়াছেন। অর্ধ শতাব্দীর ঊর্ধ্ব কাল যাবৎ পবিত্র অধ্যাপনাব্রতে ভারতের সনাতন হিন্দুধর্ম ও প্রাচ্যকৃষ্টির প্রচার ও প্রসারে তিনি নিজেকে একনিষ্ঠভাবে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। কাঁথি বেদবিদ্যালয় (১৯২৫), কাঁথি সংস্কৃত সমিতি (১৯১০), কাঁথি ব্রাহ্মণসভা (১৯২৭), কাঁথি সংস্কৃত সমিতি জুবিলী সদন (১৯৩৫), কাঁথি পণ্ডিত দিবাকর বেদান্তপঞ্চানন গভর্নমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ (১৯৫০) প্রমুখ বহু শিক্ষা- ও সংস্কৃতি-মূলক প্রতিষ্ঠানাদি প্রতিষ্ঠা ও সমুন্নয়ন ব্যাপারে তাঁহার আজীবন প্রাণপাত অক্লান্ত পরিশ্রম কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণীয়। তিনি একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামীও ছিলেন। তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

নিবেদন

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে প্রেসের ছুটির জন্য 'উদ্বোধন'-পত্রিকার আগামী অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইবে।

দিব্য বাণী

শ্রীসদাশিব উবাচ

ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে ॥

—মহানির্বাণতন্ত্রম্, চতুর্থ উল্লাস—১০

মহদাদ্যণুপর্যন্তং যদেতৎ সচরাচরম্।
ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ ॥১১
ত্বমাদ্যা সর্ববিদ্যানাম্ অস্মাকমপি জন্মভূঃ।
ত্বং জানাসি জগৎ সর্বং ন ত্বাং জানাতি কশ্চন ॥১২

পরমাত্মা, ব্রহ্ম যিনি সাক্ষাৎ শকতি তুমি তাঁর
পরমা প্রকৃতি ;
তোমা হতে জন্মলাভ করিয়াছে সব কিছু,
তুমি শিবে, জগৎ-জননী—
তোমাতেই সবাকার স্থিতি।

মহৎ হইতে অণু, চরাচরে আছে যাহা কিছু
তুমি সৃজিয়াছ সব ; তোমার অধীন বিশ্ব,
তুমি বিশ্বধাতা ;
সর্ববিদ্যামূলে তুমি, আমারো জননী তুমি,
ব্রহ্মারো, বিষ্ণুরো তুমি মাতা।
জগতের সবকিছু ভাসে সদা তব জ্ঞানে,
তোমারে জানিতে নারে কেহ—
(মন-বুদ্ধি-পারে তুমি, শুদ্ধ-বোধ-গতা)।

ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা ॥১৩
ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্‌দেবী ত্বং দেবি কমলালয়া।
সর্বশক্তিস্বরূপা ত্বং সর্বদেবময়ী তনুঃ ॥১৪
ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলা চ ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি ॥১৫

তুমি কালী, তুমি তারা, তুমি দুর্গা মহাদেবী,
ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, তুমি মহামায়া
বগলা, ভৈরবী তুমি, ধূমাবতী, ছিন্নমস্তা,
অন্নপূর্ণা, সরস্বতী, লক্ষ্মী তুমি কমল-আলয়া।

সর্বশক্তিরূপা তুমি, তুমি সর্বদেবময়ী-তনু,
স্থূল তুমি, সূক্ষ্ম তুমি, এ ব্যক্ত জগৎ তুমি—
ব্রহ্মা হতে ক্ষুদ্র পরমাণু ;
অব্যক্ত যা, তা-ও তুমি ; তুমি ছাড়া কিছু আর নাহি চরাচরে,
নিরাকারা হইয়াও সাকারা হয়েছ তুমি, অচিন্ত্য-রূপিণি !
কে তোমা জানিতে পারে, জানিবার সাধ্য বল কার,
বিশ্ব-বিমোহিনি !

●

উদ্বোধনের সহিত সংশ্লিষ্ট সকলকেই আমরা ৺বিজয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা নিবেদন করিতেছি।

—সঃ

●

কথাপ্রসঙ্গে

'মৃত্যুরূপা মা'

মহাশক্তির দশমহাবিদ্যারূপের একটি হইল কালী-রূপ। শিবের বুকে মা আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, যেন নিবাত নিষ্কম্প সচ্চিদানন্দ-সাগরে তরঙ্গ উঠিয়াছে, যেন অদ্বয় সত্তায় প্রথম ইচ্ছার বিকাশ 'একোঽহং বহু স্যাম্' রূপ লইয়া দাঁড়াইয়াছে, যেন "একরূপ অ-রূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামি-কালহীন, দেশহীন, সর্বহীন" অস্তিত্বের উপর ভাসিয়া উঠিয়াছে নাম-রূপ-দেশ-কাল-সমন্বিত জন্ম-স্থিতি-মরণ-শীল ব্রহ্মাণ্ড। মায়ের একদিকে দুই হাতে খড়্গ ও ছিন্ন মুণ্ড, অপরদিকে দুই হাতে বর ও অভয়। দেহ রুধির-চর্চিত, গলায় মুণ্ডমালা। বিশ্বজননীর এই রূপে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ তিনটি ভাবেরই সমন্বয় ঘটিলেও বিনাশের ভাবই অধিকতর প্রকট। মা যেন মৃত্যুরূপা হইয়াই আবির্ভূতা হইয়াছেন—অসত্য-উদ্ভূত সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিনাশ করিয়া ভক্তকে, মৃত্যুর পূজারীকে মরণের পরপারে অমৃত অদ্বয় সত্তায় আবার ফিরাইয়া যাইবার জন্য। বিনাশের মত সৃষ্টি এবং পালনও তিনিই করেন বলিয়া ভয়ঙ্করী হইয়াও তিনি "স্মেরানন-সরোরুহা"। মা দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া অভয় দিতেছেন—'মৃত্যুকে ভয় করিও না, মৃত্যু তোমাকে স্পর্শও করিতে পারিবে না, সে বিনাশ করিতে পারে শুধু অসত্যকে।' মায়ের যথার্থ ভক্ত, অমৃতলাভেচ্ছু সাধক তাই "সদ্যশ্ছিন্ন শির" হইতে প্রবাহিত মায়ের দেহলিপ্ত রুধিরধারা দেখিয়া ভয় পায় না, উহাকে মায়ের পূজার অর্ঘ্যরূপেই দেখে—"নীল জলে জবাপ্রায়।"

জগজ্জননীকে যাহারা মৃত্যুরূপা বলিয়া ভাবিতে ভয় পায়, যাহারা "মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী", সত্যকে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি তাহারা করিতে পারে না। যদি সত্যের মুখোমুখি হইয়া তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে চাই আমরা, সত্যকে ভালবাসিতে চাই, তাহা হইলে মৃত্যুরও মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইতে হইবে, মৃত্যুকে ভালবাসিতে হইবে। দেহ-মন-বিজড়িত আমি-বোধ এবং তাহা হইতে পৃথক বহুবিধ জাগতিক বস্তুর সহিত তাহার সংস্পর্শজ অনুভূতিকেই আমরা জীবন বলি; জীবন বলিতে যাহা কিছু আমাদের মনে ভাসিয়া উঠে, তাহা সবই অসত্য, অনিত্য। যাহাকে আমরা মৃত্যু বা বিনাশ বলিয়া ভাবি, তাহা এই সব অনিত্য অসত্য বস্তুর বোধকেই শুধু বিনষ্ট করে, জাগতিক বস্তুর বোধরূপ সত্যের যে অনিত্য বিকাশগুলি নিত্যবিরাজমান সত্যকে ঢাকিয়া রাখে, সেই-গুলিই শুধু নষ্ট করিয়া দেয়। সত্যের পূজারীর কাছে মৃত্যু এগুলিকেই একটার পর একটা বিনাশ করিয়া সত্যকে ক্রমে স্পষ্টতর করিয়া চলে; শেষে চরম মৃত্যু—সীমিত আমি-বোধের মৃত্যু, মায়ের চরণে বলি,—পূর্ণ অনাবৃত করিয়া দেয় সে সত্যকে। মৃত্যুরূপা মা যেমন "কলাকাষ্ঠাদি" কালের রূপ লইয়া আমাদের স্থূলদেহের, জাগতিক বস্তুসমূহের বাহ্যতঃ বিনাশ সাধন করেন, জগতের কোন কিছুকেই চিরকাল রাখিয়া দেন না, তেমনি আবার সেগুলিকে বাহ্যতঃ বিনষ্ট না করিয়াও সত্যান্বেষী সাধকের স্থূলদেহের, সূক্ষ্মদেহেরও উপর আমিত্ববোধ,

দেহাত্মবোধ বিনষ্ট করিয়া থাকেন। দেহ থাক বা না থাক, তাহার প্রতি এই আমিত্ব-বোধের বিনাশই যথার্থ মৃত্যু ; এই মৃত্যুকেই স্বামী বিবেকানন্দ ভালবাসিতে বলিয়াছেন, এই মৃত্যুই সত্যের দ্বার অবারিত করে। এই মৃত্যুবিধায়িনী, পরমানন্দময় অমৃতময় সত্যজ্ঞান-প্রদায়িনী, মৃত্যুভয়-বিনাশিনী মা-ই মৃত্যুরূপা মা। সত্যলাভ না হইলে স্থূলদেহের বিনাশেও মন-বুদ্ধি-সীমিত আমিত্বের, 'কাঁচা আমির' মৃত্যু হয় না, মৃত্যুভয়ও যায় না—অসত্যকে সত্য ভাবিয়া, দুঃখকষ্টসমন্বিত জীবনকেই সত্য ভাবিয়া সে আবার উহাতে জড়িত হইবার জন্য নূতন দেহ আশ্রয় করে, আবার দেহের মৃত্যুকে নিজের মৃত্যু ভাবিয়া বারে বারে এভাবে 'জীবনের' মাধ্যমে ত্রাসময় মৃত্যুরই সম্মুখীন হয়, মৃত্যুর করাল বাহ্যরূপকে অসত্য জানিয়া মৃত্যুরূপাকে সানন্দে সাগ্রহে বরণ করিতে পারে না কখনো।

অনিত্য নামরূপের যে আবরণগুলিতে আবৃত থাকার জন্য নিত্যবস্তুকেই জাগতিক বস্তু বলিয়া বোধ জন্মে, নিজেকে সীমিত জন্ম-মৃত্যু-কবলিত বলিয়া বোধ জন্মে, মৃত্যু ঘটিতে পারে কেবলমাত্র সেইগুলিরই ; সত্য চির-অবিনাশী, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সর্বকাল-অবাধিত সত্তা। মরণশীল বাহ্যজগৎ এবং আমাদের দেহ-মন-বুদ্ধি প্রভৃতিকে সত্য বলিয়া ভাবিয়া সেগুলির প্রতি যত বেশী আমরা মনঃ-সংযোগ করি, যত বেশী সেগুলিকে আমি বা আমার ভাবিয়া নিবিড়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরি, মৃত্যু তত বেশী করিয়া আমাদের বিভীষিকা দেখাইতে সক্ষম হয়, মৃত্যুভয় তত বেশী আসন গাড়িয়া বসে আমাদের মনে। এগুলিকে একান্তভাবে আমি বা আমার বলিয়া আঁকড়াইয়া থাকিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা যতক্ষণ আমাদের থাকে, ততক্ষণই মৃত্যু আমাদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করিতে পারে।

সত্যদ্রষ্টারা জগতের সহিত জড়িত 'আমি'র খেলাকে, 'জীবন'কে অসত্য বলিয়াই জানেন, ইহার প্রতি আসক্তি বিনষ্ট না হইলে যে সত্যলাভ হয় না, তাহাও তাঁহাদের প্রত্যক্ষী-ভূত। সত্যলাভেচ্ছুকে তাই তাঁহারা বলেন জীবনের প্রতি এই তৃষ্ণার পরিসমাপ্তি ঘটাইতে—"This thirst for life for ever quench"। জীবনতৃষ্ণা দিয়া যাহা আমরা আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই, চির আনন্দ ও চির-অস্তিত্ব, তাহা আমরা আসলে পাই এই তৃষ্ণার বিনাশেই।

জগজ্জননী মহাশক্তি কৃপা করিয়া তাঁহার যে সত্যলাভেচ্ছু সন্তানকে সত্য প্রত্যক্ষ করান, আমরা নিজেরাই যে আসলে সেই চির-অবিনাশী সত্য ইহা উপলব্ধি করান, তাঁহাকে এই উপলব্ধির পথে লইয়া যান মৃত্যুর মধ্য দিয়াই অভয়রূপা হইয়া ; একমাত্র সেই সন্তানই যথার্থ নির্ভীক হইয়া প্রাণ খুলিয়া বলিতে পারে, "মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!" নিজ স্থূলদেহের উপর আমাদের আসক্তি সর্বাধিক, দেহের উপর আমি-বোধ অতি নিবিড়। স্থূলদেহে আমি-বোধই আমাদের সত্যলাভের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। মা বুঝি তাই সে দেহ দ্বিখণ্ডিত করার রূপ ধরিয়া আসেন। শাস্ত্রে আছে, স্বর্গাদিলোকের সূক্ষ্ম দেহ বা ভূলোকের মনুষ্যেতর দেহ কেবল ভোগের জন্য, মুক্তিলাভ সম্ভব কেবল মনুষ্যদেহেই ; এই জন্যই ভক্তসাধক দেখেন মুক্তিদাত্রী মায়ের "গলায় নর-শির-হার"।

মুক্তিদানেচ্ছু এই মহাশক্তিই কুণ্ডলিনী-শক্তি-রূপে জাগ্রতা হইয়া ঊর্ধ্বগামিনী হন। এই

শক্তির জাগরণে সত্য-উপলব্ধির দ্বার উন্মুক্ত হয়। এই শক্তি যখন মেরুদণ্ডমধ্যস্থ সুষুম্নামার্গে উঠিতে থাকেন, তখন সেখানকার বিভিন্নস্থানে অবস্থিত পদ্মগুলি একটির পর একটি প্রস্ফুটিত হয়—মা যেন তাঁহার চরণস্পর্শে পদ্মগুলিকে ফুটাইয়া চলেন—"পদচিহ্নে পদ্ম ফোটে।" আর এক একটি পদ্ম অতিক্রম করার সময় এই মহাশক্তি এক একটি জগৎকে বিনাশ করিয়া চলেন—"তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে"—অসত্যের আবরণ একটির পর একটি দৃষ্টিপথ হইতে সরিয়া যায়, সেই সঙ্গে বিনষ্ট হয় সেই আবরণে আচ্ছাদিত জগৎটিও; স্থূলজগৎ সরিয়া গিয়া দৃষ্টিপথে আসে তাহার স্থলে সূক্ষ্মজগৎ, সেটি সরিলে আসে সূক্ষ্মতর জগৎ। রোগ-মহামারী-বিপর্যয়াদি হইল মায়ের স্থূল-জগৎ বিনাশের খড়্গ, আর সূক্ষ্মজগৎও বিনাশের খড়্গ হইল জ্ঞান। মা সেই খড়্গ দিয়া সত্যান্বেষী সন্তানের অসত্যকে আঁকড়াইয়া ধরিবার আশ্রয় স্থূলসূক্ষ্ম সমস্ত জগৎ একসঙ্গে বিনষ্ট করিয়া তাহাকে এভাবে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর জীবনে তুলিতে তুলিতে শেষে এমন এক অস্তিত্বে লইয়া আসেন, যেখানে শুধু চিন্ময়রূপে "মা আছেন আর আমি আছি", আর কিছুই নাই। আবার তাহাও জ্ঞানখড়্গে বিনষ্ট করিয়া মা ও সন্তান উভয়ের চিন্ময় অস্তিত্ব উভয়েরই যে স্বরূপ, যে অদ্বয় সত্তা হইতে উদ্ভূত, সেই স্বরূপেও লইয়া যান সন্তানকে—অসংখ্য জগতের বস্তুরূপ অসংখ্য তরঙ্গগুলির মধ্যে অবশিষ্ট দুটি তরঙ্গকেও মিশাইয়া দেন স্থির প্রশান্ত চেতনাসাগরে। মায়ের দশ-মহাবিদ্যারূপেরই অন্যতম ছিন্নমস্তারূপ বোধ হয় এই সত্যেরই প্রতীক—মৃত্যুরূপা যেখানে নিজেকে নিজেই দ্বিখণ্ডিত করিতেছেন।

মৃত্যুরূপা মায়ের পূজা, মৃত্যুকে ভালবাসা, মনে নিরুৎসাহ আনা নয়, তমোগুণে আচ্ছন্ন মনকে রাজসিকতায় এবং রাজসিক ভাবকে সাত্ত্বিক ভাবে পূর্ণ করা; ভয়কে চিরনির্বাসিত করিয়া অভয়ার আশীর্বাদ অদম্য নির্ভীকতায় হৃদয় ভরাইয়া তোলা।

"কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগিয়ে দু-একবার সহস্রারে উঠা নামা করাতে পারলেই ত্রিকালজ্ঞ হতে পারা যায়।···তিনি ত্রিকালজয়ী হয়ে অনন্ত কালের সঙ্গে মিশে যান। কালকে জয় করে তিনি হয়েছেন মহাকাল—আর তার বুকে শ্যামা মা নৃত্য করেন। মহাকাল কি করছেন? না, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে গিলে ফেলে অহরহ ব্রহ্মে লীন হয়ে রয়েছেন।"

—স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

নরনারায়ণস্তোত্রম্

শ্রীওট্টূর্ উন্নি নম্বুত্তিরিপ্পাদ্ বিরচিতম্

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীরামকৃষ্ণেন সমুদ্ধৃতং যৎ
তচ্ছিষ্যবর্যেণ সমর্পিতং যৎ।
তজ্জ্ঞানবীর্যামৃতলেশপানা-
দাসন্ স্বতন্ত্রাঃ খলু ভারতীয়াঃ ২৫ ॥

নরেন্দ্রনাথশ্চ গদাধরশ্চ
ন ভূতলেঽস্মিন্নভবিষ্যতাং চেৎ।
সমস্ত কল্যাণনিদানভূতঃ
সনাতনো ধর্মচয়ো ব্যনঙ্ক্ষ্যৎ ॥ ২৬ ॥

শ্রেয়ঃপ্রধানং নিজরাজ্যধর্মং
প্রেয়ঃপ্রধানং পরদেশধর্মম্।
এতদ্দ্বয়ং যোজয়িতুং মহদ্ভ্যা-
মাভ্যাং দৃঢ়সুসেতুরহো নিবদ্ধঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীমন্নরেন্দ্ররহিতঃ ক্ষুদিরামপুত্রঃ
শ্রীরামকৃষ্ণরহিতশ্চ নরেন্দ্রনাথঃ।
নাস্তে ন ভাতি ন চ গচ্ছতি পূর্ণভূয়ং
নো রোচতে ন তু মুদং তনুতে জনানাম্ ॥
২৮ ॥

একস্য তত্ত্বস্য বিভিন্নরূপৌ
পূর্বাপরার্ধৌ কিল তাবুভৌ চ।
যোগাদ্দ্বয়োরেব নবাবতার-
সুসম্পূর্ণতাং শোভনতাং চ যাতি ॥২৯॥

ঈশস্য ভক্তেন পৃথক্কৃতস্য
ভক্তস্য চেশেন বিবর্জিতস্য।
অন্যোন্যসম্বদ্ধহৃদিন্দ্রিয়াস্বো-
র্ভাব প্রতীতিপ্রিয়তাঃ কথং স্যুঃ ॥৩০

বীরাগ্রণীর্যত্র নরেন্দ্রনাথো
যোগেশ্বরো যত্র গদাধরশ্চ।
তত্রৈব লক্ষ্মীর্বিজয়ো বিভূতি-
র্ধর্মশ্চ নীতিশ্চ সদা ভবেয়ুঃ ॥ ৩১ ॥

দেবালয়স্থপ্রতিমাসু যদ্ব-
ল্লোকস্থমর্ত্যেষ্বপি তদ্বদীশম্।
দৃষ্ট্বা কুরুধ্বং প্রণতিং রতিং চে-
ত্যস্মান্মুহুঃ শাস্তিনবাবতারঃ ॥ ৩২ ॥

চেষ্টামশেষাং হরিধর্মরূপাং
লোকং সমস্তং ভগবন্ময়ং চ।
উৎকৃষ্টয়া ভাবনয়া বিদধ্ব-
মিত্যেব নোবক্ত্যবতারবর্যঃ ॥ ৩৩

পাতিত্যদারিদ্র্যজরানপত্য-
রোগাদিনানাবিধযাতনাভিঃ।
চেখিদ্যমানাম্মনুজান্নুপাধ্বং
সর্বেশবুদ্ধ্যেত্যনুশাস্তি সোঽস্মান্ ॥৩৪॥

দুঃখায় বন্ধায় চ মর্ত্যবুদ্ধ্যা
মর্ত্যেষু কল্পেত কৃতা নিষেবা।
সৈবেশ বুদ্ধ্যা তু কৃতা সুখায়
মোক্ষায় চ স্যাদিতি স ব্রবীতি ॥ ৩৫ ॥

ধর্মানুপেতাবভাবানুকূলৌ
লোকেঽর্থকামাবনুসেবনীয়ৌ।
শ্রেয়োর্থিভির্নৈব হি তদ্বিরুদ্ধা-
বিত্যেষ বিশ্বৈকগুরুর্ব্রবীতি ॥ ৩৬ ॥

কামার্থসম্পাদনকৌতুকেন
ধর্মাপবর্গৌ যদি বিস্মরেয়ুঃ।
নঙ্ক্ষ্যন্তি তর্হি ধ্রুবমস্মদীয়া
ইত্যুৎকরো রৌতি নবাবতারঃ ॥ ৩৭ ।

অনাত্মতন্ত্রাণি ততঃ প্রতীচ্যা
অধ্যাত্মবিদ্যাস্ত্বিহ ভারতীয়াঃ।
বিতীর্য কুর্বন্তু মিথোঽন্ধপঙ্গু—
ন্যায়েন সাহায্যমিতি প্ররৌতি ॥ ৩৮

নরেন্দ্রনাথে নরতত্ত্বভূতে
গদাধরেণ প্রকটীকৃতো যঃ।
তমুৎকটং স্নেহমবেহি তেন
প্রকাশিতং সর্বনরব্রজেষু ॥ ৩৯ ॥

অধোন্মুখানামশুভাশয়ানা-
মবান্ধবানাং ক্রন্দনার্দিতানাম্।
ভুবশ্চ নাকাচ্চ বহিষ্কৃতানাং
নৃণ্যাং সমুদ্ধারক এব একঃ ॥ ৪০ ॥

অহো কৃতার্থা ভরতাবনীয়-
মসূত যা সর্বজনাভিরামৌ।
শুভাবদৃষ্টশ্রুতপূর্ববীর্যৌ
কলৌ যুগেঽপীদৃশদিব্যপুত্রৌ ॥ ৪১ ॥

ভূমণ্ডলং ধন্যমিহং সমস্ত-
মার্ষী পুনর্ধন্যতরা ধরিত্রী।
আধ্যাত্মিকো ধন্যতমশ্চ ধর্মো
নারায়ণস্যাধুনিকাগমেন ॥ ৪২ ॥

অভ্যুত্থিতৈরাসুরধর্মপূগৈ-
র্যোদ্ধুং সমর্থোঽপ্রতিমপ্রভাবঃ।
প্রত্যগ্র এষ ক্ষুদিরামসূনোঃ
প্রহ্লাদসর্গসৃস্নুচিরায় জীয়াৎ ॥ ৪৩ ॥

জেজীয়তামেষ নরেন্দ্রনাথো
গাধেয়বাতাত্মজফল্গুনানাম্।
স্ফূর্জন্মহাপৌরুষশৌর্যবীর্য-
পূর্ণাবতারো নরলোকপূজ্যঃ ॥ ৪৪ ॥

ক্ষাত্রেণ বীর্যেণ নিতান্তশান্ত-
ব্রাহ্মণ্যযোগোঽয়মভূতপূর্বঃ।
শ্রীমন্নরেন্দ্রেণ গদাধরস্য
সখ্যাত্মকঃ কামদুঘোঽস্তু নৃণাম্ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীমদ্গদাধরনরেন্দ্রকলেবরাভ্যা-
মাবিষ্কৃতস্ত্বয়মদৃষ্টচরানুভাবঃ।
নারায়ণস্য চ নরস্য চ যোগরূপো
জেজেতু সর্বজগদেকহিতাবতারঃ ॥ ৪৬॥

অত্যুগ্রতাপত্রয়দাবতপ্তা
হে জীব-পান্থাঃ ক্ষুদিরামসূনোঃ।
পাদাব্জয়োশ্শান্তসুশীতলাসু
ছায়াসু বিশ্রম্য চিরং রমধ্বম্ ॥ ৪৭ ॥

অন্যস্য ভব্যে নিজমঙ্গলে বা
হে মানবাঃ কৌতুকমস্তিচেদ্বঃ।
তর্হ্যেতয়োরঙ্ঘ্রিতলাঙ্কিতেন
ধর্মাধ্বনা গচ্ছত লোকগুর্বোঃ ॥ ৪৮ ॥

স্তম্ভভূতাজ্জগৎসৌধস্যার্ষধর্মাৎ প্রতাড়িতাৎ।
পাষণ্ডমুষ্টিভিঃ সদ্যসঞ্জাতং নৃহরিং
ভজে ॥ ৪৯ ॥

পুণ্যনরেন্দ্রগদাধরসঙ্গমশেষার্ষধর্মগোপ্তারম্।
এতং নরনারায়ণনূতনপূর্ণাবতারমব-
লম্বে ॥ ৫০ ॥

নিঃশ্রেয়সং হস্তগতং বিমুক্তো
বিক্রীয় চিক্রীষতি যৎপরাগম্।
আরাধয়ে তৌ নরসংযুতস্য
নারায়ণস্যাভিনবস্য পাদৌ ॥ ৫১ ॥

পূর্ণে পরব্রহ্মণি রামকৃষ্ণে
সেস্নেঢি গাঢ়ং সুকৃতী নরো যঃ।
কিং শিষ্যতে তস্য সমার্জনীয়ং
তস্মাচ্চ কো ধন্যতরোঽস্তি লোকে ॥৫২॥

স্বেচ্ছাবতীর্ণস্য নরেণ সাকং
নারায়ণস্যাশ্রিতকল্পকস্য।
চন্দ্রাত্মজাখ্যস্য ভবাব্ধিপোতৌ
সর্বাত্মনা শিশ্রয়িষামি পাদৌ ॥ ৫৩ ॥

সেবে গয়াবিষ্ণুপদাবতীর্ণাং
শ্রীমন্নরেন্দ্রস্য কপর্দজুষ্টাম্।
শুশ্রুষুজহ্নুশ্রবণপ্রলীনাং
চন্দ্রাত্মজক্রীড়ননব্যগঙ্গাম্ ॥ ৫৪ ॥

ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে অধ্যাত্ম-চেতনা

ডক্টর শ্রীপীযূষকান্তি মহাপাত্র

ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলের কাহিনী অন্যান্য ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর মতই। মূল কাহিনী অন্যান্য শাখাকাহিনীর দ্বারা পুষ্ট হয়ে অনিবার্য বেগে পরিণতির দিকে চলেছে। ঘনরামের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি কাব্যে কাহিনী-বয়ন, ঘটনাপর্যায়ের গতি, নির্বাচিত শব্দপ্রয়োগের দ্বারা এবং সর্বোপরি পৌরাণিক উপমা প্রয়োগ ও বিদগ্ধ বাক্‌ভঙ্গি ব্যবহার করে আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। অষ্টাদশ শতকের উৎকেন্দ্রিক নাগর সভ্যতার বিলাসকেলি তাঁর কাব্যকে স্পর্শ করেনি, হাল্কা কাহিনীকেও তিনি পৌরাণিক মহিমায় মহিমান্বিত করেছেন। চিত্তবৃত্তি বিলাস-সুখের আবর্তে পড়ে থাকেনি, দেহকে অতিক্রম করে আধ্যাত্মিক চেতনার স্তরে উন্নীত হয়েছে।

কাব্যের কাহিনী-বর্ণনায় বিভিন্ন পালা আরম্ভ করবার সময় তিনি প্রার্থনা-পদ রচনা করেছেন। এই পদগুলিতে কবির ভক্ত-হৃদয়ের ব্যাকুল আর্তি এবং একান্ত আত্মনিবেদনের আকুল আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়েছে। কাব্যে চিত্রিত বিভিন্ন চরিত্রের মুখে যে দেবদেবীর বন্দনাগুলি বর্ণিত হয়েছে সেগুলি কবির অধ্যাত্মবোধের পরিচয় বহন করে। কামদল বধ পালাতে দেখা যায়, আশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করার পর জীব মানব-জন্ম পরিগ্রহ করে। বিকল বাসনার নাগপাশে যেন সেই দুর্লভ মানব-জন্ম ব্যর্থ না হয়ে যায়। গোলা হাট পালার প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্যের প্রতি কবির ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

ঘনরামের অধ্যাত্ম-চেতনা স্বচ্ছ, কোনরূপ গোঁড়ামির ছায়াপাত তাতে ছিল না। বিশেষ কোন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল না। তাঁর ধর্মবোধ এবং অধ্যাত্ম-চেতনার সঙ্গে প্রবল নৈতিক বোধ যুক্ত ছিল বলে অনাবিল পরিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক বোধ তাঁর সমগ্র কাব্যে পরিব্যাপ্ত। ধর্ম-আচরণে যেখানে ভণ্ডামি দেখেছেন সেখানে তীব্র কশাঘাত করেছেন। ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব এবং দর্শনের উপলব্ধি না করে ধর্মীয় সাধনাকে ব্যক্তিগত সুখভোগে, লালসার পরিতৃপ্তিতে পরিণত করার মানসিকতাকে তিনি ধিক্‌কার দিয়েছেন। ব্যক্তিগত বাসনাকে ধর্মীয় আবরণে ঢাকা দেওয়ার ফলে যে সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়ে থাকে তা কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। বৈষ্ণবধর্ম দর্শনের নিগূঢ় উপলব্ধি ও হৃদয়ের একান্ত আত্মনিবেদনের দ্বারাই সম্ভব, "বৈষ্ণবতা ধর্ম দেবারাধ্য কর্ম ব্রহ্মপদে মতি লীন।" কিন্তু এই উপলব্ধি না করে ধর্মীয় আবরণে নিজ আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি ও পার্থিব সুখভোগকে কবি ধিক্‌কার দিয়েছেন। মধ্যযুগের বাংলাদেশে বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্ম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে গিয়েছিল। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সমাজের উচ্চকোটিতে অনুসৃত হলেও সাধারণভাবে সমাজে এই দুই ধর্মীয় সাধনা অনুসৃত হয়েছিল। সাহিত্যের ইতিহাসে তার প্রামাণ্য পরিচয় আছে। শক্তিসাধনাও বাংলাদেশে নানা আভিচারিক প্রক্রিয়ায় ধর্মের আবরণে ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির চরিতার্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি না করে ধর্মসাধনার প্রয়াসকে কবি ধিক্‌কার

দিয়েছেন। ধর্ম যেখানে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বা পারলৌকিক উন্নতির সোপান নয়, ইহলৌকিক সুখের উপায়মাত্র কবি সেখানে নিন্দাবাদে মুখর হয়েছেন। ধর্মবোধের সঙ্গে নৈতিক বোধ মিশ্রিত হয়ে কবির অধ্যাত্ম-চেতনা দার্শনিক উপলব্ধির উচ্চতম স্তরে উন্নীত হয়েছে।

কাব্য সুরু করার পূর্বে প্রচলিত রীতিতে ঘনরাম দেবদেবীর বন্দনা করেছেন। প্রথমে গণেশের বন্দনা করে কবি ধর্মঠাকুরের বন্দনা, শক্তিদেবীর বন্দনা, সরস্বতীবন্দনা, লক্ষ্মীবন্দনা ও শেষে যোগাদ্যার বন্দনা করেছেন। এই বন্দনা-পদগুলিতে কবির ভক্ত-হৃদয়ের ব্যাকুল আর্তি প্রকাশিত হয়েছে। কাব্যের প্রারম্ভে দেবদেবীর বন্দনা প্রচলিত রীতি। ঘনরামের কাব্যে দেখা যায় বিভিন্ন পালাগুলি রচনা করবার পূর্বে প্রার্থনা-পদ আছে। এগুলি ঘনরামের নিজস্ব অধ্যাত্ম-বোধের পরিচয় বহন করে। এই পদগুলিতে ঐহিক সুখভোগের অসারতা, ক্ষণিক সুখভোগের লালসায় দুর্লভ মানবজন্মের ব্যর্থ পরিণতি, অসার সংসারে হরিনামের সার্থকতা, ধর্মজীবনের এক অবক্ষয়ের সময় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। পরিশুদ্ধ ধর্মবোধ ও সমুন্নত অধ্যাত্ম-চেতনা ঘনরামের কাব্যে প্রবাহিত হয়েছে।

অধ্যাত্ম-চেতনা এই পদগুলিতেই কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ নয়। নির্বাচিত শব্দপ্রয়োগ, পৌরাণিক উপমা, ধর্মমঙ্গলের ঘটনার সঙ্গে পৌরাণিক ঘটনার সারূপ্য, রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতের অজস্র উল্লেখ এবং মহাকাব্যের আবহে কাহিনী সংস্থাপন করে কবি সমগ্র কাব্যে এক আধ্যাত্মিক ভাব-পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করেছেন। কবির গভীর পাণ্ডিত্য, সংস্কৃত অধ্যাত্ম-চেতনা এবং প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় সমগ্র কাব্যে পরিব্যাপ্ত। অনিয়ন্ত্রিত ভাবাবেগ এবং উদ্বেল ভক্তিবিহ্বলতার পরিবর্তে তাঁর কাব্যে আছে মিতভাষিতা ও পরিমিতিবোধ। অষ্টাদশ শতকের অন্যান্য কাব্যে যে বিলাসকলার ভোগমেদুর বর্ণনা বাহ্য অলঙ্কারের দ্বারা শোভিত হয়েছে ঘনরামের কাব্যে তা অনুপস্থিত। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে প্রত্যাশিত স্থূলতা ও অশ্লীলতা অতিক্রম করে তিনি মার্জিত রুচি ও বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন পৌরাণিক ঘটনা, কাহিনী ও উল্লেখের ব্যবহার করে কবি কাব্যকে এক উচ্চ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কবির প্রগাঢ় অধ্যাত্ম-চেতনা কাব্যকে কখনো স্থূলরসের আবর্তে নামায়নি, ধর্ম ও নীতিবোধের আদর্শে উদ্ভাসিত করেছে।

রামায়ণ-মহাভারতের আদর্শে ঘনরাম তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। একদিকে পৌরাণিক মহাকাব্যের রীতি, অন্যদিকে ধর্মমঙ্গলের ঘননিবদ্ধ কাহিনী—এই দুই ধারাকে তিনি একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। ঘনরামের রচিত চরিত্রগুলি রামায়ণ-মহাভারতের চরিত্রের আদর্শে সৃষ্ট। কিন্তু কোনও চরিত্রকে কোনও বিশেষ চরিত্রের অনুরূপ করেননি তিনি; যখন যেভাবে কাহিনী অগ্রসর হয়েছে, সেইভাবে পৌরাণিক চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। লাউসেন ও ও কর্পূর কখনও শ্রীরামলক্ষ্মণ, কখনও কৃষ্ণ-বলরাম, কখনও বা লবকুশ। লাউসেনের বাল্যকালের কাহিনী শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার কাহিনীকে অনুসরণ করেছে। লাউসেনের গৌড় গমনে ময়নার অবস্থা শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনে বৃন্দাবনের অনুরূপ। মহামদ ও লাউসেন যথাক্রমে কংস ও কৃষ্ণ। মায়ামুণ্ড কাহিনীতে রামায়ণের প্রভাব সুস্পষ্ট। ইছাই ঘোষ ও লাউসেনের যুদ্ধে রাবণ ও রামের

যুদ্ধের ছায়াপাত হয়েছে। পার্বতীর ভক্ত ইছাইয়ের পরাজয়ে দেবী ক্রুদ্ধ হয়ে যখন 'মৈনাক মহেশ গুহ গণেশের' দিব্য দিয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি লাউসেনকে বধ করবেন তখন দেবগণ সমস্যায় পড়লেন, কারণ 'ইছাই বধিতে হেথা ঈশ্বরের আজ্ঞা'। এই অবস্থায় দেবগণ ভাবতে লাগলেন যে দুইকুল কিভাবে রক্ষা করা যায়। মহাভারতের কাহিনী বর্ণনা করে কবি ঘটনার সারূপ্য রক্ষা করেছেন। অর্জুন এবং সুধন্বা উভয়ের প্রতিজ্ঞা যেভাবে শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করেছিলেন সেইভাবে ইছাই ও লাউসেনের সমস্যা দেবগণ সমাধান করার কথা ভাবতে লাগলেন। ঘনরামের কাব্যে যতবার রাজসভার চিত্র দেখা যায়, ততবারই দেখা যায় যে রাজসভায় পুরাণপাঠ হচ্ছে। কাব্যে যখন যে ঘটনাপ্রবাহ চলেছে, সেই প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করে নাটকীয়তা সৃষ্টি করা হয়েছে। রাজসভায় তখন এমন কাহিনী পুরাণে পাঠ করা হচ্ছে, যার অনুরূপ কাহিনী ধর্মমঙ্গলে ঘটবে।

গৌড় রাজসভায় যখন লাউসেনের জন্ম-সংবাদ এল তখন সেখানে বাল্মীকি-রামায়ণ পাঠ হচ্ছিল। তখন আদিকাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মের কাহিনী পাঠ করা হচ্ছিল। শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম-কাহিনী শুনবার পর যখন পণ্ডিত পুথি বেঁধে-ছিলেন তখন লাউসেনের জন্মের সংবাদ রাজা পেয়েছিলেন। আখড়া পালায় কাঁচলি নির্মাণ ও ফলা নির্মাণ পালায় ফলার চিত্র বর্ণনায় পৌরাণিক চিত্র ও কাহিনীর প্রাচুর্য লক্ষণীয়। লাউদত্ত কর্মকার ও লাউসেন যথাক্রমে গুহক চণ্ডাল ও শ্রীরামচন্দ্র। হস্তীবধ পালায় দেখা যায় রাজসভায় মণিহরণের কাহিনী শুনে রাজার গত রাত্রির স্বপ্নের কথা মনে হল। স্যমন্তক মণি শ্রীকৃষ্ণ হরণ না করলেও তাঁকে অপবাদ দেওয়া হয়েছিল, তেমনি লাউসেনও হাতী চুরি করেননি, অথচ তাঁকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছিল। কাঙুর-যাত্রা পালায় মহামদ দেবীর পরামর্শে চক্রান্ত করেছিলেন যে কামরূপরাজের বিরুদ্ধে লাউসেনকে পাঠিয়ে লাউসেনকে হত্যার ব্যবস্থা করবেন। দূত যখন সংবাদ নিয়ে লাউসেনের রাজসভায় এল তখন সেখানে পণ্ডিত পুথি পাঠ করছিলেন। তার কাহিনী এই যে নারদ কংসকে যুক্তি দিয়েছিলেন কৃষ্ণকে তাঁর রাজসভায় এনে হত্যা করতে। তার ফলে শ্রীকৃষ্ণকে আনবার জন্য অক্রূরকে পাঠান হল। কানড়ার স্বয়ম্বর পালায় গৌড়রাজের মনে ইন্দ্রিয়বাসনা উদ্রিক্ত করার জন্যে স্বর্গের অপ্সরাকে পাঠান হল। অপ্সরা যখন রাজ-সভায় প্রবেশ করল, তখন সেখানে সমুদ্র-মন্থনের কাহিনী পাঠ করা হচ্ছিল। অসুরদের বঞ্চিত করে দেবতাদের অমৃত বণ্টন করার জন্যে শ্রীহরির মোহন নারীবেশ ধারণের সেই কাহিনী। মায়ামুণ্ড পালায় কর্ণসেন ও রঞ্জাবতী যখন রামায়ণের মায়ামুণ্ড কাহিনী শুনছিলেন তখন ইন্দ্রজাল লাউসেনের মায়ামুণ্ড নিয়ে রাজসভায় প্রবেশ করেছিল। অঘোরবাদল পালায় বাটুয়া কুকুরের কাহিনীতে পৌরাণিক ছায়াপাত হয়েছে। সমুদ্রকাটারি ও ব্রহ্মকর-জাপ্যমালার কহিনীতে পৌরাণিক কাহিনীর ছায়াপাত হয়েছে।

কবি পৌরাণিক মহাকাব্যের আদর্শে কাহিনী বয়ন ও চরিত্র সৃষ্টি করেছেন এবং পৌরাণিক ঘটনার উল্লেখ করে তাঁর কাব্যে পৌরাণিক মহাকাব্যের আবহ সৃষ্টি করেছেন। তার ফলে নাটকীয়তা আরোপিত হয়েছে এবং তা ছাড়াও ধর্মমঙ্গলের চরিত্রগুলি যে সাধারণ মানুষের বিচারের মাপকাঠিতে বিচার করা চলবে না, পৌরাণিক চরিত্রের আলোকে

বিচার করতে হবে, তা কবি দেখিয়েছেন। কবির অধ্যাত্ম-চেতনা কাব্যকে এইভাবে প্রভাবিত করেছে।

ঘনরাম শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন। বহু ভনিতায় তিনি 'নাথ রঘুবীর' বলে উল্লেখ করেছেন। কাব্যোৎপত্তির কাহিনীতে জানা যায় তিনি প্রথমে শ্রীরাম পাঁচালী রচনা করতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু রামের বন্দনা করতে গিয়ে ধর্মের বন্দনা রচিত হয়েছিল বলে তিনি গুরুদেবের আদেশে ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। শ্রীরামচন্দ্রের সশ্রদ্ধ উল্লেখ তাঁর কাব্যে ছড়িয়ে আছে। 'আশীর্বাদ কর যে রাঘবে রয় মতি' অথবা 'প্রভু যার কৌশল্যানন্দন কৃপাবান' প্রভৃতি ভনিতা থেকে কবির রামভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শুধুমাত্র রামনাম উচ্চারণ করলেই যে সকল পাতক থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, তা তিনি বর্ণনা করেছেন। 'পাতক পালায় দূরে রা শব্দ করিতে' এবং 'ম-কারে কপাট পড়ে পুনঃ প্রবেশিতে।' ধর্মঠাকুরই যে শ্রীরামচন্দ্ররূপে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ঘনরাম সে উল্লেখ করেছেন। ধর্মঠাকুর কাব্যের মধ্যে যখনই হনুমানকে কোন কাজ করতে বলেছেন, তখনই রাম অবতারে যে ঘটনা ঘটেছিল তার উল্লেখ করেছেন। কাহিনী-বয়ন ও ঘটনা-সংস্থাপনে কবি রামায়ণের কাহিনী এবং উপমা ব্যবহার করেছেন অজস্রভাবে। ঘনরামের রামভক্তির পরিচয় সমগ্র কাব্যে পরিব্যাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপের দিকটি ঘনরামকে আকৃষ্ট করেছিল সমধিকভাবে। কবি শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণ করেছেন নানা দিক দিয়ে, চরিত্র-চিত্রণে, ঘটনা-বর্ণনায়, দৃষ্টান্ত-স্থাপনে এবং কোন কোন স্থলে কাহিনী-বয়নে। লাউসেনের বাল্যকাল শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার অনুরূপ। মহামদ ও লাউসেনের কাহিনীতে কংস এবং শ্রীকৃষ্ণের কাহিনীর ছায়াপাত হয়েছে। হস্তীবধ পালায় কংসের রাজসভায় শ্রীকৃষ্ণের কুবলয় হস্তীবধ কাহিনীর প্রভাব আছে। অঘোরবাদল পালায় ইন্দ্রের রোষে গোকুলে ঝড়বৃষ্টি এবং গোবর্ধন ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণের গোকুলকে রক্ষার কাহিনীর অনুরূপ কাহিনী আছে। মায়ামুণ্ড পালায় কালিয়-দমনের চিত্রটি দুর্নিরীক্ষ্য নয়। মায়ামুণ্ড পালায় লাউসেনের মায়ামুণ্ড দর্শনে রানীদের ব্যাকুল বেদনা শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনে গোপীদের বিরহ-ব্যাকুলতা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে চৈতন্যোত্তর যুগে যে মধুর রস এবং নায়িকা-ভাবনা বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তার করেছিল, রাধাকৃষ্ণের যে ভাবানুষঙ্গ বাঙ্গালীর চিত্তে মদির আবেশ রচনা করেছিল, তার কোন পরিচয় ঘনরামের কাব্যে নেই। চৈতন্যোত্তর যুগে যে ললিতকোমল গীতিরসের প্রাবল্য এবং রাধাকৃষ্ণের লীলারস বর্ণনায় মধুর রসের যে ভাবোদ্বেল প্লাবন দেখা গিয়েছিল ঘনরামের কাব্যে তা অনুপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ তিনি চিত্রিত করেছেন। প্রেমের বর্ণনায় রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ করেননি, হয়ত ভাবানুষঙ্গ পাঠককে বিভ্রান্ত করতে পারে। তিনি উল্লেখ করেছেন শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী ও সত্যভামার কথা, ঊষা অনিরুদ্ধের কথা, সীতা ও শ্রীরামচন্দ্রের কথা। শ্রীকৃষ্ণের মধুর রসের দিকটি কবি শ্রীমদ্ভা-গবত থেকে গ্রহণ করেছেন, যেখানে গোপীদের উল্লেখ আছে, রাধার উল্লেখ নেই। অষ্টাদশ শতকে রচিত হয়েও ঘনরামের কাব্যে নায়িকার রূপ ও অন্তর-ভাবনা চিত্রণে রাধার উল্লেখ নেই। ঘনরামের কাব্যে বর্ণিত মাধুর্য রসে আদিরসের পিচ্ছিলতা নেই। কবি প্রাত্যহিকতার গ্লানি, মানবীয় প্রেমের সঙ্কীর্ণতা এবং আদিরসের

ক্লেদাক্ত জগৎ থেকে তাঁর কাব্যকে এক অধ্যাত্ম-চেতনার স্তরে উন্নীত করেছেন।

ঘনরামের মানসিকতায় বৈষ্ণবপ্রাণতা ছিল। কাব্যের বিভিন্ন স্থানে তিনি শ্রীচৈতন্যের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ঐতিহাসিক মূল্য কবি অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করেছেন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে যে নব ধর্মান্দোলন হয়েছিল, যার প্রভাব বাংলাদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে এক নূতন দিগন্তের সূচনা করেছিল, সে কথা কবি বর্ণনা করেছেন। শ্রীচৈতন্যের প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, 'সর্বজীবে সমভাব ভেদবুদ্ধি নাই', ও 'কলিকাল-সর্পের করিতে দর্পচুর জন্মিল চৈতন্যচন্দ্র দয়ার ঠাকুর', এবং 'গোবিন্দ গরিমাগুণ গাইয়া বিভোল যাচিয়া জগতে যত জীবে দিল কোল।' কবির সরল ভক্তিভাব একটি মাত্র ছত্রে প্রকাশিত হয়েছে, 'দীনদয়াল আমার ঐ চৈতন্য গোসাঁই।' চৈতন্যদেব ব্যতীত কবি শচী ঠাকুরানী, পুরন্দর মিশ্র, কেশবভারতী, অদ্বৈত গোসাঁই. দ্বাদশ গোপাল ও চৌষট্টি মোহান্তের উল্লেখ করেছেন।

শক্তিদেবীর একটি বিশিষ্ট রূপ ঘনরামের কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। পৌরাণিক শুম্ভ-নিশুম্ভনিধনকারিণী, মহিষাসুরমর্দিনী' উগ্র ও চণ্ডরসসম্পন্না শক্তিদেবীর একটি রূপ ঘনরামের কাব্যে পাওয়া যায়, এবং সেই সঙ্গেই শান্ত বরাভয়-প্রদায়িনী মাতৃরূপটিও নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। দেবীর মাতৃহৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহশীলতা এবং সন্তান-বাৎসল্যের পরিচয় ঘনরামের কাব্যে পাওয়া যায়। এখানে দেবী তাঁর মাতৃহৃদয়ের সবটুকু উত্তাপ দিয়ে সন্তানকে যে কোন প্রকারের বিপদ হতে রক্ষা করতে ব্যাকুল। ঢেকুর পালায়, কামদল বধ পালায়, কামরূপ যুদ্ধ পালায়, কানড়ার বিবাহ পালায়, ইছাই বধ পালায় এবং জাগরণ পালায় দেবীর 'নৃমুণ্ডমালিনী খড়্গাখর্পরধারিণী' ভয়ঙ্করী চণ্ডিকারূপটি বিকশিত হয়েছে। দেবীর এই পৌরাণিক রূপটি কবি বিশ্বস্তভাবে চিত্রিত করেছেন। অন্য-দিকে দেবীর শান্ত শমরসপ্রধান রূপটির পরিচয়ও ঘনরামের কাব্যে দেখা যায়। একদিকে পৌরাণিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার, দেবীর পৌরাণিক ভয়ঙ্করী রূপ, যিনি সৃষ্টির মূল কারণ এবং শক্তিরূপে বিরাজমানা, অন্যদিকে দেবীর লৌকিক রূপ, স্নেহশীলা মাতা, আমাদের পারিবারিক জীবনের কেন্দ্র-বিন্দু, এই দুই রূপই কবি চিত্রিত করেছেন। দেবীর লৌকিক রূপের চিত্রণে তাঁকে বিশ্বের কেন্দ্রশক্তিরূপিণী দেবী মনে হয়না, বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের প্রতিফলন দেবীর পারিবারিক জীবনে দেখা যায়। শক্তিপদাবলী-গুলিতে দেবীর ভক্তের সহিত এই একাত্মতা দেখি। সেখানে মানব এবং দেবী একই অনুভূতি ও পারিবারিক জীবনের সূত্রে গ্রথিত। ঘনরামের কাব্যে দেবী ও মানব সম্পর্কের একাত্মতা দেখা যায়। যে ভাব-বিপ্লব পরবর্তীকালে গীতিকবিতায় ঝরে বাঙ্গালী মানসে এক নূতন চেতনার সৃষ্টি করেছিল, ঘনরামের কাব্যে তার সূত্রপাত দেখা যায়। শক্তিপদাবলীতে ভক্তহৃদয়ের আলোকে এবং ভক্তহৃদয়ের নানা অনুভূতিতে দেবীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে দেখা যায়। ভক্তই দেবীর প্রতি মানবীয় গুণের ও সম্পর্কের আরোপ করেছে। ঘনরামের কাব্যে এই রূপটি দেখা যায় লাউসেন, কানড়া, জাল্লাল শিখর, মহামদ প্রভৃতির প্রার্থনায়। ঘনরামের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি আর এক দিক দিয়ে দেবীকে দেখেছেন। শক্তি-পদাবলীতে

মানব দেবীর সম্পর্কে তার মানসিকতা আরোপ করেছে। কিন্তু ঘনরামের কাব্যে দেখা যায় মানব সম্পর্কে দেবীর মানবীয় মানসিকতা। দেবীর এই মানবীয় রূপ ঘনরামের অপূর্ব সৃষ্টি। ভক্তের বিপদে দেবীর যে ব্যাকুলতা, ভক্তের বিনাশে দেবীর যে হাহাকার, তাতে দেবীর ভাবনার আলোকে ভক্তের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের পরিচয় বিকশিত হয়েছে।

দেবীর এই মাতৃরূপের মধ্যে পূজা প্রচারের কোন উদ্দেশ্য নেই, মাতৃহৃদয়ের স্নেহব্যাকুলতাই প্রকাশিত হয়েছে। ইছাই ঘোষের আরাধনায় তিনি তুষ্ট এবং তাকে বর দিয়েছেন যে তিনি তাকে সকল বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। কাব্যের নায়ক লাউসেন যখন দেবীর প্রতিকূলতায় কিছুতেই ইছাইকে বধ করতে পারলেন না তখন হনুমান দেবীর কাছে গেলেন লাউসেনের পক্ষ নিতে। দেবী সেই প্রস্তাবে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং বললেন যে, 'প্রিয় পুত্র ইছাই কার্ত্তিক হইতে বাড়া।' স্নেহশীলা দেবীর নিকট ভক্ত প্রাণপ্রতিম, নিজ পুত্রেরও অধিক। নানা চক্রান্ত ও ছলনা করে ইছাই ঘোষকে বধ করা হয়েছিল। দেবী জানতে পেরে গভীর শোকে অধীর হলেন। পুত্রবিয়োগবিধুরা জননীর সেই শোকোচ্ছ্বাসের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা নেই। শোকাতুর মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা শতধারায় ঝরে পড়েছে। ঘনরামের বর্ণনায় সেই শোক-বিদীর্ণ মাতৃহৃদয়ের যে নিরলঙ্কার প্রকাশ আছে, তা পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে। পুত্রশোকাতুরা মাতার সেই অতলান্ত বেদনায় দৈবী শক্তির অহঙ্কার নেই, প্রলয়ঙ্করী শক্তির ভয়ঙ্কর তাণ্ডব নেই। দেবগণের সমবেত চক্রান্তে তিনি পরাজিত হয়েছেন। প্রিয় পুত্র ইছাই আর নেই। দেবী তাঁর ঐশী শক্তি দূরে ফেলে দিয়েছেন, দেবত্বের সব মহিমা পরিত্যাগ করেছেন। পুত্রবিয়োগবিধুরা পরম স্নেহশীলা জননীর শোকবিদীর্ণ হৃদয়ের অশ্রু-সজল হাহাকার তাঁর দেবীত্বের মহিমার মধ্যে মানবীহৃদয়কে মূর্ত করেছে। মাতা স্বহস্তে পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন। তার পর ইছাই ঘোষের রাজবাড়ীতে ফিরে এসেছেন। সেই মন্দির আছে, সেই রাজ্য-পাট আছে, সেই সিংহাসন আছে, সব কিছু আছে, কেবল ইছাই নেই। সে আজ স্মৃতিতে পরিণত। স্মৃতিচিহ্নগুলি দেবীর মনে গভীর বেদনা সঞ্চার করল। তাঁর উদ্বেল বেদনা শতধারে উচ্ছ্বসিত হল। অন্যদিকে কানড়াকে তিনি বর দিয়েছিলেন। লাউসেনের মৃত্যু মানেই কানড়া বিধবা হবে। তাই তিনি আবার ভক্ত কানড়ার কাছে এলেন। কানড়া ও দেবীর সম্পর্কের কাহিনীতে এবং লাউসেন ও দেবীর সম্পর্কের কাহিনীতে মানব ও দেবীর একাত্মতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন পালায় শিবপার্বতীর পারিবারিক সংসারের চিত্রণে বাঙ্গালীর পারিবারিক চিত্র পাওয়া যায়।

ঘনরামের পরিকল্পিত দেবী-চরিত্রে বিভিন্ন পুরাণের বিভিন্ন দেবীরূপের ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিত হয়েছে রামায়ণের রাবণ-পূজিত ও রামচন্দ্রের দ্বারা অকালে আরাধিত দেবীর ঐতিহ্য, শ্রীমদ্ভাগবতের কাত্যায়নী এবং লৌকিক দেবীর মানবী রূপটি। এই সব ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার গ্রহণ করে ঘনরাম দেবীর মধ্যে বিশেষ একটি মাতৃরূপের পরিকল্পনা করেছেন। মানব ও দেবী সেখানে একাত্ম হয়েছে। পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যবিহীন স্নেহশীল মাতৃহৃদয়ের কোমল রূপটি ঘনরামের কাব্যে বিশেষভাবে বিকশিত হয়েছে। ঘনরামের ভাবনায় দেবী

এক অনির্বচনীয় মাতৃহৃদয় নিয়ে ধূলার পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন। সন্তানের প্রতি স্নেহ-ব্যাকুলতায় মাতৃহৃদয়ের সেই পরিপূর্ণ বিকশিত রূপটি ঘনরামের কাব্যে দেখা যায়।

ঘনরামের ভক্ত-হৃদয়ের ব্যাকুলতা সমগ্র কাব্যে পরিব্যাপ্ত। কোন একটি বিশেষ দেবতার প্রতি আনুগত্য নয়, সকল দেবতাকে সমানভাবে দেখেছেন, সকল দেবতার কাছেই কৃপা ভিক্ষা করেছেন। এই সমন্বয়বোধ তাঁর অধ্যাত্ম-চেতনার পরিচয় বহন করে। ভক্ত-হৃদয়ের ব্যাকুল আর্তি ও আত্মনিবেদনের একান্ত ব্যাকুলতা তাঁর কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে। ঘনরামের অধ্যাত্ম-চেতনা কেবল ব্যক্তিগত ধর্মসাধনা ও নিজস্ব আত্মিক উপলব্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সর্বজীবে প্রেম দান করে ও সকলকে হরিনাম বিতরণ করে শ্রীচৈতন্য যে সার্বজনীন মিলনের সূত্রপাত করেছিলেন এবং সমগ্র সমাজকে এক ভাবসূত্রে গ্রথিত করেছিলেন, কবি সেকথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেছেন। বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনায় ও আরাধনায় কবির ভক্ত-হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশিত হয়েছে। এক পরিশুদ্ধ উপলব্ধি ও পবিত্র অধ্যাত্ম-চেতনা সমগ্র কাব্যে পরিব্যাপ্ত। সহজ আন্তরিকতা, সরল অনুভূতি ও উপলব্ধির নিরলঙ্কার প্রকাশে ঘনরামের অধ্যাত্ম-চেতনা উদ্ভাসিত হয়েছে।

ব্রহ্মকমল

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

এই বনে কী ব্রহ্মকমল জন্মালো—
সুগন্ধে যার সুস্মিত দিন-রাত ?
দিকে দিকে ছড়িয়ে দিল পীত আলো
সত্যভামার স্বপ্ন-পারিজাত ?

এই পারিজাত নিয়েই কী সেই দ্বন্দ্বটা—
শতক্রতু ইন্দ্রসাথে শ্রীকৃষ্ণের ?
আহা, একি রঙের ফেনা, গন্ধটা
মর্তের নয় —ও-স্বর্গের ?

নিঃশ্বাসে যে হিমেল পরশ সুমিষ্ট,
হেমগঙ্গা বরফঢাকা ওই,
হিমালয়ের বিশ্বরূপই অভীষ্ট
মাটির 'পরে ছড়িয়ে দিল খই !

যে খই শ্বেত চূর্ণ তুষার অনঙ্গের—
ব্রহ্মকমল বার্তাবহ অনন্তের ?

স্বামীজীর শিক্ষা-চিন্তা

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী

স্বামীজীর প্রায় সকল চিন্তার মত শিক্ষা-সংক্রান্ত চিন্তারও দুটি দিক আছে। একটি দেশ-কাল-পাত্রের পরিসীমাহীন সার্বজনীন ও চিরন্তন দিক। আর একটি ভারত-কেন্দ্রিক দিক। এই ভারত-কেন্দ্রিক দিকটি আবার ভারত-ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায়ের পটভূমিকায় অধিকতর প্রকট।

একদিন এক ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে ভারতে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন লর্ড মেকলে প্রভৃতি কয়েকজন ইংরাজ চিন্তাবিদ। এদেশেও ওই ইংরাজী শিক্ষাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি ভারতীয় মনীষীরা। বলাবাহুল্য, এই দুই পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গী ও উদ্দেশ্য কিন্তু এ ব্যাপারে ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্নজাতীয়। মেকলে প্রভৃতি চেয়েছিলেন ভারতীয় কাল চামড়ার অন্তরালে মস্তিষ্ক ও হৃদয়বৃত্তিতে এক একটি সাদা চামড়ার মানুষ তৈরী করতে—রাজনৈতিক বিজয়কে সাংস্কৃতিক বিজয়ের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে। অপরপক্ষে রাজা রামমোহন ও বিদ্যাসাগর প্রভৃতি প্রধানতঃ চেয়েছিলেন এ দেশের মধ্যযুগীয় মানসিকতার ক্ষয়িষ্ণু বদ্ধস্রোত জীবন-নদীতে পাশ্চাত্যের খরস্রোতা ভাব-তরঙ্গিণীর সঙ্গম-সাধনে একটি প্রাণোচ্ছল পলিমাটি-ভরা জোয়ার বহাতে—প্রাচীন প্রাচীর মানসিক দিগন্তে নবীন প্রতীচির নতুন আলোকাচ্ছ্বাসের আবাহনে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলনের মঙ্গলঘট স্থাপিত করতে। এঁরা চেয়েছিলেন ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনে জাতীয় জীবন-মৃত্তিকায় একটি অমৃতবৃক্ষ রোপণ করতে। সে যাই হোক, এঁদের দূরদৃষ্টি আজ সর্বজনস্বীকৃত। এঁদের উদ্দেশ্যও যে সিদ্ধ হয়েছিল তার প্রমাণ উনবিংশ শতকের বাংলার রেনেশাঁস—বাংলা তথা ভারতের নব জাগরণ। কিন্তু কি আশ্চর্য, মেকলে প্রভৃতিরও যে দূরদৃষ্টির অভাব ছিল না একেবারে, তাঁদের উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়নি, অমৃতবৃক্ষ যে শুধু অমৃতফলই দান করেনি বিষফলও প্রসব করছে, তার প্রমাণও পাওয়া যাবে ওই উনিশ শতকের রেনেশাঁসের বাংলায়। তার প্রমাণ পাওয়া যাবে আজও, স্বাধীনতা প্রাপ্তির এত বৎসর পরও। শুধু বাংলাতে নয়, সারা হিন্দুস্থানে। তা সে যেমনই হোক, ইংরাজী শিক্ষার ওই কুফল বা বিষফলের দিকে যাঁদের সজাগ দৃষ্টি পড়েছিল এবং প্রধানতঃ সেই কারণেই যাঁরা ওই নিরঙ্কুশ ইংরাজী শিক্ষার বিরুদ্ধে সমগ্র জাতিকে সচেতন ও সতর্ক করে দিয়েছিলেন--তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন দুজন শ্রেষ্ঠ ভারতসন্তান—একজন বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, অপরজন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বিদ্রোহ করেছিলেন প্রধানতঃ ওই ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োগ বা পদ্ধতির ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। স্কুল-কলেজের পঠন-পাঠন ব্যবস্থার প্রাণহীন যান্ত্রিকতা, নিষ্ঠুর বাধ্যবাধকতা, করুণ কৃত্রিমতা ও নিরানন্দ পরিবেশের বিরুদ্ধেই প্রধানতঃ তাঁর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল—সেই তার কৈশোরের দিনগুলোতেই। পরবর্তী কালে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের মাধ্যমে তাঁর শিক্ষা-স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবার প্রয়াস পেয়েছিলেন মহাকবি। বিবেকানন্দের

বিরোধ কিন্তু অনেকটা ভিন্ন ধরনের। প্রয়োগের চাইতে পরিণাম, পরিবেশের চাইতে পাঠ্য বিষয়ের ওপরই এ ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন স্বামীজী। যাই হোক, এ প্রসঙ্গে একটি কথা কিন্তু মনে রাখা দরকার। রবীন্দ্রনাথ ও স্বামীজী—কেউই কিন্তু অনুদার প্রাচীনপন্থী মানুষ ছিলেন না; বরং প্রগতিশীলতার প্রতিমূর্তি বলা যায় তাঁদের। আর ইংরাজী সাহিত্য ও দর্শনের সঙ্গে উভয়েরই ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাই ইংরাজী শিক্ষার বিরুদ্ধে এঁদের বিদ্রোহকে স্বতন্ত্র কোন আলোকে নিরীক্ষণ করবার অবকাশ নেই।

পূর্বেই বলেছি, ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োগের চাইতে পরিণাম, পরিবেশের চাইতে পাঠ্যবিষয়ের কথাই বেশী ভেবেছেন স্বামীজী। তাই তিনি এ প্রসঙ্গে একেবারে মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন। ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে কী শিক্ষা লাভ করি আমরা? ও শিক্ষায় কী উপকার হয় আমাদের? এ শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশের উপযোগী কিনা? এ শিক্ষায় কি উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়? কার স্বার্থ সিদ্ধিলাভ করে?—এই সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জাতির সামনে তিনি তুলে ধরেছেন।

প্রথমতঃ, ইংরাজী শিক্ষার ধারক ও বাহক স্কুল-কলেজগুলোতে কতকগুলি তথ্য ও তত্ত্বই মাত্র পরিবেশন করা হয়। কতকগুলি সংবাদ ও ভাব অনেকটা যেন জোর করেই বাইরে থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। বাইরে থেকে প্রবিষ্ট ঐ তথ্য ও তত্ত্বগুলো শিক্ষার্থীরা আত্মস্থ করতে পারে কদাচিৎ, তাই শিক্ষা-ব্যবস্থাও সার্থকতা লাভ করতে পারে না। কারণ, সংবাদসংগ্রহ তো আর প্রকৃত শিক্ষা নয়। তা যদি হত, তাহলে তো স্বামীজী বলেছেন, "গ্রন্থাগারগুলি জগতের শ্রেষ্ঠ মুনি এবং অভিধানসমূহ প্রধান ঋষি বলিয়া গণ্য হইত।"

দ্বিতীয়তঃ, প্রধানতঃ যে সংবাদ ও ভাবগুলো আমাদের দেশের শিক্ষার্থীর মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয় সেগুলোর সঙ্গে আমাদের নাড়ীর যোগ নেই কারও। অপরিচিত মানুষ ও অজ্ঞাত দেশের সঙ্গে অপরিচিতির অন্ধকার কাটিয়ে তোলবার প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে করতেই শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হয়ে যায়। ফললাভ করবার আগেই শিক্ষার্থী জীবনের বৃক্ষটি পাতা ঝরিয়ে একেবারে শুকিয়ে অকালে মরে যায়। তার ওপর আছে—বিদেশী ভাষার সুকঠিন আবরণ, যার তলাতে আত্মগোপন করে থাকে ওই তথ্য ও তত্ত্বগুলো। ওই বিদেশী ভাষার রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করতে করতেই প্রাণান্ত হতে হয় শেষ পর্যন্ত, ভেতরে প্রবেশ করে ভাবের ঘরে আশ্রয় পাওয়া আর হয়ে উঠে না কোনদিন। ফলে—পরিশ্রমের ক্লেশ ও ক্লান্তিই সার হয়, প্রাপ্তিযোগ আর দেখা দেয় না।

তৃতীয়তঃ, স্বামীজী মনে করেন যে একটা জাতির সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের প্রথমতঃ সেই জাতির গৌরবদৃপ্ত ইতিহাস, ও ঐতিহ্য, সনাতন শিক্ষা ও সংস্কৃতি, দেশের মহামনীষী ও পূতপবিত্র পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে শিক্ষাদান করা কর্তব্য। যে শিক্ষার্থী নিজের দেশ ও জাতি সম্বন্ধে অজ্ঞ, অথচ পরদেশ ও পরজাতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, সে প্রকৃত শিক্ষার্থী নয়। সত্যিকারের শিক্ষালাভ সে করে না। এর ওপর নিজের দেশ ও স্বজাতি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ যা কিছু শিক্ষা লাভ করে তাতে যদি শুধু বিকৃত ইতিহাস থাকে, ভ্রান্ত বক্তব্য থাকে, এ দেশ ও জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করবার শতেকরকম অপচেষ্টা থাকে, তাহলে তো

সোনায় সোহাগা। এতে করে একজন শিক্ষার্থী শুধু যে নিজের দেশ ও জাতি সম্বন্ধে খুব কম ও ভুল জানল, তাই নয়। অন্য জাতি ও দেশ সম্বন্ধে অত্যধিক এবং অতিরঞ্জিত সংবাদ সংগ্রহ করে নিজ মস্তিষ্ককে অহেতুক ভারাক্রান্ত করল, শুধু তাও নয়। এমন অবস্থাতে শিক্ষার্থীর যে মানসিকতা গড়ে উঠে, এবং উঠা স্বাভাবিক, তাতে স্বদেশ সম্বন্ধে সংশয়, ও অশ্রদ্ধা, আত্মবিশ্বাসহীনতা, হীনমন্যতা, অনুকরণপ্রিয়তা এবং পরনির্ভরতা ও দাসসুলভ মনোভাব আত্মপ্রকাশ করে। উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত সাধারণ বাঙ্গালী ও ভারতবাসীর মনোজগৎ বিশ্লেষণ করলেই একথার সত্যতা সহজেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আজও যে সম্পূর্ণভাবে সে মানসিকতা থেকে মুক্তি পেয়েছি আমরা, তা নয়। শিক্ষাজগতের এই বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন স্বামীজী। আমাদের ছেলে-মেয়েদের কাছে আমাদের দেশের কথা, আমাদের জাতির ইতিহাস, পূর্বপুরুষের কাহিনী, আমাদের সাধনার কথা, সিদ্ধির কথা অধিক পরিমাণে পরিবেশন করতে চেয়েছিলেন তিনি। স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভাব জাগাতে চেয়েছিলেন তাদের মনে। আত্মাভিমুখী ও আত্মস্থ হতে বলেছিলেন তাদের। কিন্তু, তাই ব'লে এ বিষয়ে একদেশ-দর্শী অনুদার ছিলেন না স্বামীজী। "সম্প্রসারণই জীবন, সঙ্কোচনই মৃত্যু"—এ স্বামীজীর জীবনের মূলমন্ত্র। শিক্ষার জগতেও ওই সম্প্রসারণের নীতিই তাঁর আদর্শ। সকল দেশ ও সব জাতির কাছ থেকেই যা কিছু শিক্ষণীয় তা গ্রহণ করতে হবে। আবার নিজের দেশের যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাও অপরকে বিতরণ করতে হবে। শিক্ষার জগতে আদান-প্রদানই সার সত্য। স্বামীজী বলেছেন, পাশ্চাত্য দেশগুলির কাছ থেকে আমাদের বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা গ্রহণ করতে হবে। আবার আমাদের দর্শন ও জীবন-বাণীও ওদের দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে। সেই পথেই শুধু শিক্ষা সার্থক হবে তাই-ই নয়, বিশ্ব-ভাবও সামঞ্জস্য ও সমন্বয় লাভ করবে। মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠবে।

সর্বোপরি—স্বামীজী প্রশ্ন তুলেছেন ইংরাজী শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে। তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সুতীব্র যুগ-চেতনা ইংরাজী শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বাভাবতই তাঁকে সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল। এ দেশে এ শিক্ষাবিস্তারের পেছনে ইংরাজ রাষ্ট্রনায়কদের কি চিন্তা ও মানসিকতা প্রধানতঃ সক্রিয় ছিল, তা তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি। ভারতীয় জনগণের সঙ্গে ব্যাপক ও সাক্ষাৎ পরিচয় ও তীব্র সমাজ-চেতনা তাঁর দৃষ্টিকে সেদিনেও এক দুর্লভ স্বচ্ছতা দান করেছিল। এই ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের জনগণ স্বাভাবতই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ছিল। একদল ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত, আর একদল ও বিষয়ে অজ্ঞ, তাই অশিক্ষিত। যারা শিক্ষিত, তারা ভদ্র, অভিজাত, ধনী, মানী —সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। বাকী সব নিম্নশ্রেণীর, অনুন্নত ইতর জনগণ। প্রথম শ্রেণীর—অর্থাৎ ওই ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেদের ওপরই ইংরাজ-রাজের কৃপাদৃষ্টি। কারণ, তাঁরাই প্রধানতঃ দেহে ও মনে ওঁদের বশংবদ। ওঁদের শাসনযন্ত্রের অতি প্রয়োজনীয় 'নেটিভ' নাটবল্টু, ছিলেন এঁরাই। আর এই প্রয়োজনীয় কাঠখড় যোগাড় করবার উদ্দেশ্যেই তো প্রধানতঃ ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন ও বিস্তারের ব্যবস্থা করেছিলেন, ওই শেতাঙ্গ বণিক শাসক। অবশ্য

বাঁদর গড়তে গিয়ে শিব যে হয়ে দাঁড়াইনি কেউ কেউ, তা নয়। কিন্তু, ও শিব গড়ার লক্ষ্য যে ছিল না এ শিক্ষাব্যবস্থার, তাতে কোন সন্দেহ নেই।...অপরদিকে—যারা ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠবার সুযোগ পায়নি, ভারতের সেই কোটি কোটি জনসাধারণ, তারা ছিল সেদিন উপেক্ষিত, অবহেলিত, অবজ্ঞার পাত্র। শুধু সেই বিদেশী সরকারই উপেক্ষা করেননি তাদের। উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করেছিলেন আমাদের দেশের শিক্ষিত মানুষেরাও। বোধকরি বিদেশীরাজের চাইতে স্বদেশী এই শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা অধিক অবজ্ঞা ও ঘৃণা করেছিলেন তাদের। ওই ইংরাজী শিক্ষা তাই মানুষে মানুষে মৈত্রীবন্ধন তো স্থাপিত করেইনি এ দেশে, বরং একই দেশের মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার সুউচ্চ প্রাচীরে আবদ্ধ দুটি ভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি করেছিল। আর সৃষ্টি করেছিল—উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত এ দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের ঐকান্তিক অভাব। ফলে—জনজীবনে সর্বদিক থেকে এক শোচনীয় মূর্ছিত অবস্থা দেখা দিয়েছিল সেদিন।...

স্বামীজী শুধু ইতিহাসের বাতায়ন-পথে ভারতবর্ষকে দেখেননি। ভাব-কল্পনার বর্ণালী-চশমার ভেতর দিয়েও এদেশ ও জাতিকে লক্ষ্য করেননি। তিনি খোলা চোখে সারা ভারত দেখেছেন। মানুষের পাশে বসে মানুষকে দেখেছেন, স্বকর্ণে তাদের সুখদুঃখের কাহিনী শুনেছেন। তাই—ইংরাজী শিক্ষার ফলশ্রুতি হিসেবে ওপরের ওই সব করুণ চিত্রগুলো অমন স্বচ্ছ হয়ে তাঁর মনোদর্পণে ধরা পড়েছে। তাঁর বহু রচনার মধ্যে এ সম্বন্ধে তাঁর অনুভূতি, তাঁর সতর্কবাণী আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর অনহুকরণীয় রচনা থেকেই কয়েক ছত্র উপস্থাপিত করাই শ্রেয় এ প্রসঙ্গে। স্বামীজী বলেছেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীতে প্রায় সবই দোষ।...মানুষগুলো একেবারে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস বর্জিত হচ্ছে। গীতাকে প্রক্ষিপ্ত বলবে, বেদকে চাষার গান বলবে। ভারতের বাইরে যা কিছু আছে, তার নাড়ি-নক্ষত্রের খবর আছে, নিজের কিন্তু সাত পুরুষ চুলোয় যাক, তিন পুরুষের নামও জানেনা। তাই তো বলছি বাবা, তোদের শ্রদ্ধাও নেই, আত্মপ্রত্যয়ও নেই। কি হবে তোদের? না হবে সংসার, না হবে ধর্ম।" ইংরাজী শিক্ষার পরিণাম ও লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেছেন, "একটি বিদেশী ভাষায় অপরের চিন্তারাশি মুখস্থ করিয়া তদ্দারা তোমার মস্তিষ্ক পূর্ণ করিয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি উপাধি গ্রহণ করিয়া তুমি ভাবিতেছ, তুমি শিক্ষিত। তোমার শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? হয় একটা কেরানীগিরি, না হয় একটা ওকালতি, আর খুব বেশী হইলে একটা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট (যাহা আর এক প্রকার কেরানীগিরি)। ইহা কি সত্য নহে? ইহাতে তোমার নিজের বা তোমার দেশের কি কল্যাণ হইবে?...তোমার শিক্ষা কি এই দেশের অভাব দূরীকরণে সমর্থ? যে শিক্ষা জনসাধারণকে জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইতে সাহায্য করেনা, যাহা আমাদের সৎসাহস বৃদ্ধি করেনা, যাহা পরোপকারের ইচ্ছা জাগ্রত করেনা... তাহা কি শিক্ষানামের যোগ্য?"... উপেক্ষিত অশিক্ষিত জনগণের প্রতি আমাদের কর্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

"জনসাধারণকে উপেক্ষা করা আমাদের একটি জাতীয় কলঙ্ক এবং ইহাই আমাদের অধোগতির কারণ। ভারতের জনসাধারণ যতদিন না আবার সুশিক্ষা ও সহানুভূতি

লাভ করিতেছে ততদিন কোন রাজনীতিই কিছু করিতে পারিবে না।...আমাদের যদি উন্নতি করিতে হয়, তাহা হইলে জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের দ্বারাই করিতে হইবে।... যতদিন পর্যন্ত দেশের কোটি কোটি মানব অনাহারে ও অজ্ঞতার অন্ধকারে জীবন যাপন করিবে ততদিন দেশের প্রত্যেক শিক্ষিত লোককে আমি বিশ্বাসঘাতক বলিব।”...

কিন্তু, তাই বলে ও ইংরাজী শিক্ষাকে সমূলে উৎপাঠিত করে বিকল্প কোন এক নতুন বা সনাতন শিক্ষা-ব্যবস্থাকে চালু করতে চাননি স্বামীজী। তাঁর ইতিহাস-চেতনা ও অসাধারণ বাস্তববুদ্ধি তাঁকে এ বিষয়ে সংযমী করে তুলেছিল। তবে—ভারতীয় আস্তিক্যভাবের সঙ্গে ওই শিক্ষাকে সম্মিলিত করেই তিনি তার প্রসার চেয়েছিলেন। দেশের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং ধর্মবিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেই এ শিক্ষার নতুন অধ্যায় তিনি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তিনি আরও চেয়েছিলেন, শিক্ষাকে দেশের সর্বত্র এবং সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে। উচ্চ-নীচে ভেদ নেই, ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে ব্যবধান নেই, ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ নেই, স্ত্রী-পুরুষে পার্থক্য নেই, সকলের মধ্যেই শিক্ষার আলো জ্বেলে দিতে হবে। ব্যক্তি-শিক্ষা নয়—লোক-শিক্ষা। কতিপয়ের নয়—সকলের, সমষ্টির জাগরণ। আর এ শিক্ষাবিস্তারের দায়িত্ব নিতে হবে প্রধানতঃ শিক্ষিত ব্যক্তিদের। নিজে শিক্ষিত হলেই হবে না, অপরকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। শিক্ষাই সারবস্তু জীবনে। ওতেই শক্তি, ওতেই মুক্তি। বিদ্যা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয়—এ ভারত-বাণী। কিন্তু ও অমৃত একে ভোগ না করে সকলে সম্মিলিত হয়ে খেতে হবে। তাই চাই—সমষ্টির শিক্ষা—জন-শিক্ষা। স্বামীজীর সেবাধর্মে তাই শুধু “চণ্ডালদেবো ভব,” বা “দরিদ্রদেবো ভব”ই নেই, মূর্খদেবো ভব” মন্ত্রও আছে সেখানে।

পরীক্ষা

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ

বেদন দিয়ে পরখ করো পরখ করো তুমি
দিবসযামী পরখ করো প্রিয় !
ব্যথারে যেন করি হে বরণীয়,
যতই ব্যথা জাগুক বুকে যতই হিয়া নমুক দুখে
তোমায় যেন রাখি হে মহনীয় !
বেদন দিয়ে জানাও তুমি তোমার ভালবাসা
প্রতিদিনই জানাও তুমি প্রিয় !
ব্যথা যে তাই হবেই সহনীয়,
তোমার প্রেমে হবেই কমনীয় !

শ্রীরামকৃষ্ণ—গুরুসঙ্গে*

স্বামী নির্বেদানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈতসাধনার গুরু, সনাতন সম্প্রদায়ভুক্ত তোতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণের (নির্বিকল্প সমাধিলাভে) অপূর্ব সাফল্য দেখে অতিমাত্রায় বিস্মিত হলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বে অতিমাত্রায় মুগ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় দক্ষিণেশ্বরে তাঁর সঙ্গে একটানা এগারো মাস বাস করলেন। পুরীজী যতই তাঁর সঙ্গ করতে লাগলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর মনে ততই গভীর রেখাপাত করতে লাগল। শ্রীরামকৃষ্ণের ভেতর অদ্ভুত একটা মৌলিকত্ব লক্ষ্য করলেন তিনি। আপেক্ষিক জগৎ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের ধারণাগুলি তিনি ধীরে ধীরে মেনে নিলেন। শেষ পর্যন্ত সবই মেনেছিলেন।

খাঁটি অদ্বৈতবেদান্তবাদী সন্ন্যাসীর মত পুরীজী দৃশ্যস্থানীয় সমগ্র বিশ্বকে, এমন কি সাকার ঈশ্বরকেও শিশুসুলভ বাসনায় গড়া সোনার স্বপ্ন ব'লে জেনে অস্বীকার করে চলতেন। সেজন্য সন্ন্যাসগ্রহণের পরও শ্রীরামকৃষ্ণকে জগন্মাতার ভাবে তন্ময় হয়ে যেতে দেখে প্রায়ই তিনি তিরস্কার করতেন, কারণ এ ভাবরাজ্যও অজ্ঞানেরই অন্তর্গত। শিক্ষানবীশদের তো কথাই নেই, তোতাপুরীর মত মুক্তাত্মা অদ্বৈতবাদীরাও এই দৃশ্যমান জগৎ থেকে দূরে থাকতে চান। অনাদি অজ্ঞান ও ভ্রমের যাদু-মন্ত্রময়ী মায়াই হচ্ছে সর্ববিধ বন্ধনের কারণ। যে-সত্যজ্ঞান লাভ করে মানুষ মুক্ত হয়ে যায়, মা সে-সত্যজ্ঞানকে আবৃত করে রাখেন, দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে লুকিয়ে রাখেন। জগৎ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের যা দৃষ্টিভঙ্গী, তা ভ্রমজ; সে-দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চললে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষার খোরাক যুগিয়ে চলে, এমন একটা জড়বস্তুর রাজত্ব ছাড়া সে-দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রকৃতির ভেতর অন্য আর কিছুই দেখা যায় না। কাজেই যতদিন এ ভ্রম থাকে, ততদিন আসক্তির চিরক্রীতদাস হয়ে মানুষকে ইন্দ্রিয়-জগতেই শৃঙ্খলিত হয়ে থাকতে হয়; হিন্দুশাস্ত্রমতে যন্ত্রণাময় জন্ম-মৃত্যুর আবর্তন থেকে ততদিন তার মুক্তি নেই। এই জন্যই জ্ঞানপথের যাত্রীদের যাত্রার প্রারম্ভ থেকেই শেখানো হয়, 'প্রকৃতির এই ভ্রমজ রূপের সঙ্গে কোনরূপ আপস কোরো না, সংগ্রাম করে একে একেবারে বিনষ্ট করে ফেল।' এই ভ্রমই হচ্ছে জ্ঞানমার্গীদের চিরশত্রু; এরই নাম মায়া। চিরমুক্তি ও পূর্ণতা রূপ দিব্যানন্দময় লক্ষ্যে পৌঁছানোর পূর্বে এই মায়াকে তাঁদের উৎখাত করতেই হয়। সেজন্য মনে হয়, লক্ষ্যলাভ করে ফিরে আসার পরও এই পথের মুক্ত-পুরুষদের হৃদয়ে মায়ার প্রতি পূর্বের মনোভাবই থেকে যায়; এই বিজিত শত্রুকে তাঁরা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু অন্যরূপ। তিনিও অবশ্য নিজের গুরুর মতোই ভালভাবে জানতেন যে, সৃষ্টি ভ্রমজ দৃশ্যমাত্র; জগতের স্বরূপ —চিরন্তন সত্য—রয়েছে এই দৃশ্যের পিছনে। তবু উপেক্ষা না করে সৃষ্টিকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। সৃষ্টির ভেতর একটা রহস্যঘন মহিমামণ্ডিত ঈশ্বরীয় প্রকাশ প্রত্যক্ষ করতেন ব'লে চারিদিকের সব কিছুর মধ্যে নিত্য পরাচৈতন্যের উপলব্ধি হত তাঁর। অতি উচ্চ জ্ঞানাতীত ভূমিতে তিনি যে চৈতন্য-

---

* লেখকের মূল গ্রন্থ Sri Ramakrishna and Spiritual Renaissance হইতে অনূদিত—সঃ।

সত্তাকে প্রত্যক্ষ করতেন, সেখান থেকে বহু নিয়ে এসে বিশ্বের নামরূপের রহস্যময় আবরণের ভেতরও সেই সত্তাকেই দেখতে পেতেন। তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে নামরূপের খোলটা অতি স্বচ্ছ দেখাতো; তার ভেতর ঈশ্বরীয় প্রকাশের মহিমা ও অপরূপ মাধুর্য তিনি দিবালোকের মত স্পষ্ট দেখতে পেতেন। আর দেখতেন, এ খোলগুলি যিনি বুনেছেন সেই মহাশক্তিমতী মায়াই হচ্ছেন তাঁর মা-কালী, জগজ্জননী। তিনিই আদিভূতা শক্তি, প্রকৃতি। অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তির মত নির্গুণ ব্রহ্ম ও তিনি অভেদ। জগতের শাঁস ও খোল দুই-ই তিনি; তিনিই আধার, তিনিই আধেয়। মাকড়সা যেমন নিজের শরীর থেকে জাল বের করে আবার তা নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেয়, তিনিও তেমনি নিজের ভেতর থেকে এ সৃষ্টিকে প্রক্ষিপ্ত করেছেন, আবার একে নিজের ভেতর সংহরণও করে নেবেন। তিনিই বিশ্বজননী, তিনিই বেদান্ত বা উপনিষদের ব্রহ্ম, আত্মা। নিত্যা বিশ্বনিয়ন্ত্রী তিনি; তিনিই নিয়ম সৃষ্টি করেন, সে নিয়ম আবার পাল্‌টান-ও তিনি। তাঁর অমোঘ ইচ্ছাতেই কর্ম ফলপ্রসূ হয়। তিনিই আমাদের মায়াজালে বদ্ধ করেছেন, তিনিই আবার বন্ধন খুলে দিয়ে আমাদের মুক্ত করে দেন। এই জগৎ-প্রপঞ্চের সর্বময়ী অধীশ্বরী তিনি, তাঁরই ইচ্ছার অঙ্গুলি-নির্দেশে বিশ্বের চেতন-অচেতন সব কিছু চালিত হচ্ছে। এমন কি নির্বিকল্প সমাধি সহায়ে যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁদের পর্যন্ত মায়ার এলাকায় আবার ফিরে আসতে হয় তাঁর ইচ্ছামাত্রে। চেতনায় জগৎবোধের লেশমাত্রও যতক্ষণ অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর আধিপত্যের বাইরে কেউ যেতে পারে না।

বিশ্বের সব কিছুর মধ্যে ঈশ্বরকে ওতপ্রোত ভাবে প্রত্যক্ষ করার ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, মায়ার দুটি বিভিন্ন রূপ আছে; এর একটিকে তিনি অবিদ্যামায়া বলতেন, অপরটিকে বলতেন বিদ্যামায়া। বিশ্বের স্থূলরূপ ফুটিয়ে তোলে প্রথমটি; তার প্রভাবে মানুষ ইন্দ্রিয়-জগতে আসক্ত হয়ে জন্মমৃত্যুর আবর্তনে ঘুরতে থাকে। অজ্ঞানের এই দিকটির সঙ্গে লড়াই করার কথাই অদ্বৈতবাদী সাধকদের বলা হয়; সে লড়াই-এর প্রয়োজনও আছে নিঃসন্দেহ। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব উপলব্ধি করেছিলেন যে, অবিদ্যামায়া জয় করে পরব্রহ্মের সঙ্গে নিজের একত্বানুভূতি লাভান্তে বাহ্যজগতে ফিরে আসার পর মায়াকে দেখতে পাওয়া যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা মূর্তিতে। শুধু দৃষ্টিকোণ সামান্য একটু ঘুরিয়ে নিলেই মুক্তপুরুষগণ নিশ্চয়ই বুঝবেন যে, মায়াকে ঘৃণা বা উপেক্ষা করার প্রয়োজন আর নেই। জাগতিক বস্তুর বাইরের আকার অবশ্য তাঁরা আগের মতই দেখতে পান, কিন্তু তাঁদের কাছে তার অর্থ ও মূল্য যে আগের মতো আর থাকে না, একথা নিশ্চিত। ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার ক্ষেত্র ব'লে আর মনে হয় না জগৎকে, তাঁদের দৃষ্টি রোধ করার মতো কিছুই আর থাকেনা সেখানে। নিবিকল্প সমাধিতে তাঁরা যে সত্তাকে প্রত্যক্ষ করেছেন, এখানেও দেখতে পাবেন সেই একই সত্তাকে। ছাদে উঠে নেমে আসার পর দেখবার ইচ্ছা থাকলে নিশ্চয়ই তাঁরা দেখতে পাবেন যে, ওঠার সময় সিঁড়ির যে ধাপগুলিকে পিছনে ছেড়ে আসতে হয়েছিল সেগুলিও যা দিয়ে তৈরী, ছাদও তৈরী সেই একই উপাদানে। জ্ঞানাতীত সত্তাই প্রাতিভাসিক জগতের রূপ ধারণ করেছে। যে মায়াশক্তির প্রভাবে জগতের এই রূপটি দেখতে পাওয়া যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ার সেই

দিকটিকেই বিদ্যামায়া বলেছেন। জগন্মাতার লীলার আর একটি দিক এটি—তাঁর অপূর্ব লীলায় মুক্তিবিতরণের দিক; লীলায় অন্যান্য সব বদ্ধ মানবের বাঁধন খুলে মুক্ত করে দেবার সজ্ঞান যন্ত্রস্বরূপ করে তিনি মুক্তপুরুষদের রেখে দেন এই জগতে।

জগন্মাতার আদেশে আপেক্ষিক চেতনার দ্বারদেশে (ভাবমুখে) দাঁড়িয়ে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ এভাবে সত্তা ও তার প্রাতিভাসিকতা দুই-ই দেখতে পাচ্ছিলেন একসঙ্গে। তাঁর চেতনা যেন একই ব্রহ্মের শুদ্ধ ও আপেক্ষিক অস্তিত্বের, জ্ঞানাতীত ও প্রাতিভাসিক ভূমির প্রত্যন্ত-প্রদেশ ঘিরে সঞ্চরণ করে বেড়াচ্ছিল, এবং মৃদুভাবে আন্দোলিত হচ্ছিল এদুটি ভূমির মিলন-রেখার উভয় দিক ছুঁয়ে ছুঁয়ে। কখনো জগন্মাতা কালী ও তাঁর লীলার প্রতি ভক্তি-ভাবাবেশে আপ্লুত হচ্ছিলেন তিনি, কখনো বা একেবারে মগ্ন হয়ে যাচ্ছিলেন পূর্ণ একত্বের প্রশান্ত সাগরে। এর ফলে ব্রহ্মের নিত্য ও লীলা এই উভয় ভাবের ওপরেই সমানভাবে জোর দিতে দেখা যেতো তাঁকে।

উপনিষদে এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে, সন্দেহ নাই। স্পষ্টই বোঝা যায়, কালক্রমে এ-দুটি ভাব পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হয়ে আধ্যাত্মিকতা-লিপ্সুদের জ্ঞানী ও ভক্ত এই দুই পৃথক শ্রেণীর জন্য দুটি পৃথক আদর্শ গড়ে তুলেছিল; সেজন্য ভগবদ্গীতায় এদের সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়েছিল। কয়েক বছর পরে এ-দুটি ভাব বাহ্য দৃষ্টিতে আবার পৃথক হয়ে যায়। জ্ঞান-যোগীগণ ব্রহ্মের জ্ঞানাতীত স্বরূপের দিকটিকেই একমাত্র সত্য মনে করতেন ব'লে মনের প্রায় সবটাই নিবিষ্ট রাখতেন সেদিকে। অপর দিকটিকে অলীক, স্বপ্নমাত্র জেনে সেদিকে অপাঙ্গে একটু চাইতেন মাত্র; ভক্তের বিশ্বাসরূপ ছেলেখেলার সহায়ক হবে ভেবে এবং সে ছেলেখেলার খানিকটা প্রয়োজনও আছে জেনে কৃপা করে যেন তার আপেক্ষিক মূল্য স্বীকার করতেন। এদিকে ভক্তেরা আবার ঈশ্বরের সর্বভূতস্থ হয়ে প্রকাশিত হওয়ার দিকটিকে আঁকড়ে ধরে থাকতেন; লীলাময়ের বলে বলীয়ান হয়ে ব্রহ্মের জ্ঞানাতীত স্বরূপের দিকে ফিরেও চাইতেন না। ভাবতেন, তাঁর জ্ঞানাতীত নির্গুণ স্বরূপের দিকে তাকালে ঈশ্বরের যে সর্বভূতান্তরাত্মা সাকার ভাব অবলম্বন করে চিরদিন তাঁরা আনন্দ করতে চান, সে ভগবৎপ্রেম বোধ হয় একেবারে শুকিয়ে যাবে। তাঁরা চিনি খেতে ভালবাসেন, চিনি হতে চান না। ঈশ্বরের পরমানন্দময় সঙ্গই তাঁদের কাম্য, ঈশ্বরের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে রাজী নন তাঁরা। দ্বৈতবাদী ভক্তদের তো কথাই নেই, ভক্তদের মধ্যে যাঁরা একত্বে বিশ্বাসী, ভগবানের সঙ্গে নিজের স্বরূপগত একত্ব যাঁরা স্বীকার করেন, তাঁরাও সেখানে একটা সীমা পর্যন্ত দ্বৈতবাদের রং ধরিয়ে রেখে নিজেদের অদ্বৈত-দৃষ্টিভঙ্গীকে বিশেষ গুণান্বিত ব'লে রঞ্জিত করে রাখাটা পছন্দ করতেন। এভাবে জ্ঞানী বা পূর্ণ-অদ্বৈত-বাদীগণ এবং দ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী উভয়বিধ ভক্তগণ ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করে চলেছিলেন, এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাঁদের পথের ব্যবধান ক্রমে বেড়েই চলেছিল।

এই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন হাততালি দিয়ে ভগবানের নাম করতেন, জ্ঞানযোগী তোতাপুরী তাঁর ভাবে আঘাত দিয়ে বিদ্রূপ করে বলতেন, 'আরে, কেঁও রোটি ঠোক্তে হো?' এই জন্যই আবার ভক্তিপথযাত্রী ভৈরবী ব্রাহ্মণী শুক্নো জ্ঞানী সন্ন্যাসীর নির্দেশাধীনে শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈতসাধনাকে

দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। কিন্তু এই উভয়বিধ মতের আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ এ-দুটি মতেরই শক্তি ও সীমা যে কতদূর, দৈবানুকম্পায় স্পষ্টভাবে তা জানতে পেরেছিলেন। ঈশ্বরের সগুণ ও নির্গুণ উভয় ভাবের পশ্চাতে যে সত্য নিহিত রয়েছে তা তিনি আবিষ্কার করেছিলেন এবং এই যুগান্তকারী আবিষ্কার সহায়ে দু-দিকেই ভারসাম্য বজায় রেখে উভয়ের মাঝখানে সংযোগ-সেতুর মত দাঁড়িয়ে মধ্যবর্তী ব্যবধানটুকু ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। ভালবাসা, ভক্তি ও চরম নম্রতা অবলম্বনে শ্রীরামকৃষ্ণ তোতাপুরীর বিদ্রূপ গায়ে না মেখে সময় বুঝে তাঁকে তাঁর আংশিক ও একদেশী দৃষ্টির দোষগুলি দেখিয়ে দিতেন। ধীরে ধীরে এই কঠোর সন্ন্যাসীর অনমনীয় মনকে শ্রীরামকৃষ্ণ একটু নোয়াতে পারলেন এবং তাঁকে অনুভব করাতে সক্ষম হলেন যে, নিরাকার সচ্চিদানন্দসাগরই ভক্তিহিমে জ'মে বিভিন্ন নামে ও বিভিন্নমূর্তিতে সাকার ঈশ্বর রূপে প্রতীত হন, এবং সেই সাকার ঈশ্বরই আবার যেন প্রদীপ্ত জ্ঞানাগ্নির তাপে গলে নির্গুণ নিরাকার হয়ে যান। নিজ শিষ্যের অনুভূতির অন্তরালে যে বিস্ময়বিমোহনী সত্য নিহিত ছিল, তা একটু ধারণা করার দিকে ও তদনুসারে নিজ-মত পরিবর্তন করার দিকে ধীর পদবিক্ষেপে এগিয়ে চললেন তোতাপুরী। দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগের পূর্বে জগন্মাতার অস্তিত্ব তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এবং ভক্তিনম্র চিত্তে প্রণত হয়েছিলেন তাঁর শ্রীপাদপদ্মে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর তান্ত্রিক গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সম্পর্কও কম জটিল ছিল না। তিনি ভৈরবীর শিষ্য ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর সাহচর্যে এসে ভৈরবীকে অনেককিছু শিখতে হয়েছিল। পরিচয়ের পর হতে ভৈরবীকে তিনি মায়ের মত দেখতেন; পরিবারে আত্মীয়দেরই একজনের মত ছয় বৎসর কাল ভৈরবী তাঁর সঙ্গে বাস করেছিলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে অসুস্থতার জন্য স্থানপরিবর্তনের প্রয়োজনে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে পল্লীগ্রামে তাঁর জন্মস্থানে (কামারপুকুরে) যান, সে সময় ভৈরবীকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় সাতমাসকাল সেখানে ছিলেন; শৈশবের আনন্দময় পরিবেশ খুবই ভাল লেগেছিল তাঁর। বহুলোক এ সময় আসতো তাঁর কাছে; তাঁর ভাবোদ্দীপ্ত কথা শুনে তাঁদের মনের আঁধার কেটে যেতো। শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী, চতুর্দশ বৎসরের বালিকা সারদামণিও তাঁর কাছে থাকার জন্য সে সময় এসেছিলেন সেখানে। নিজ শুদ্ধ দিব্য প্রেমের অংশ গ্রহণ করতে শ্রীরামকৃষ্ণ অনুমতি দিলেন তাঁকে; সারদামণির হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে গেল এতে। সারদামণির মনে হীন বাসনার কোন স্থান ছিল না। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালবাসতেন, ভক্তি করতেন, মনপ্রাণ ঢেলে তাঁর সেবা করতেন এবং প্রতিদানে স্বামীর কামগন্ধহীন ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই চাইতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষার এবং তাঁকে আদর্শ গৃহিণীরূপে গড়ে তোলার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন।

তবু স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সংস্রব এবং তাঁর প্রতি প্রতিবেশীদের শ্রদ্ধাভক্তি-প্রদর্শন ভৈরবীর কাছে অসহ্য হয়ে উঠলো। ভৈরবী আধ্যাত্মিক পথে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তখনও চরম লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারেননি। তাঁর মন নিঃশেষে সর্বমালিন্য-বর্জিত হয়নি তখনো। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন জ্ঞানপথ ধরে চলার নির্দেশলাভের জন্য তোতাপুরীর শিষ্যত্ব বরণ করেন, তখন ভৈরবীর মনে ভীষণ আলোড়ন উঠেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর মাতৃস্নেহ

প্রায় বশীকরণের যাদুতে রূপায়িত হয়েছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়ের একমাত্র নিয়ন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন তিনি। তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণের মত যোগ্য শিষ্যের অধিকার-গর্বে তিনি স্ফীত হয়ে উঠেছিলেন। অহংকার তাঁকে কিছুকালের জন্য সত্যই তমসাবৃত করে রেখেছিল, এবং সকলের প্রতি তাঁর আচরণ চলেছিল তাঁর আধ্যাত্মিকতায় উৎসর্গীকৃত জীবনের প্রতিকূল পথ ধরেই।

কিন্তু সু-পুত্রের মত শ্রীরামকৃষ্ণ এসব সহ্য করে যেতেন, ভৈরবীর প্রতি সশ্রদ্ধ আচরণে ঈষন্মাত্র বৈষম্য প্রকাশ করতেন না কখনো। নিজের বালিকাবধূ সারদাকেও তিনি বলে দিয়েছিলেন ভৈরবীকে নিজ শ্বশ্রূর মত সম্মান করে চলতে। শ্রীরামকৃষ্ণের ধৈর্যমণ্ডিত, সস্নেহ ও জ্ঞানালোকবর্ষী সাহচর্যে ভৈরবী শীঘ্রই নিজের দোষ ধরতে পারলেন এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় গভীরভাবে ডুবে যাবার জন্য হঠাৎ একদিন সেখান থেকে অন্যত্র চলে গেলেন। বিদায়ের পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তিনি ক্ষমা চেয়ে নেন এবং তাঁকে গৌরাঙ্গের অবতার বলে সম্বর্ধনা করে তাঁকে মাল্যচন্দনে ভূষিত করেন। ছয় বৎসর কাল শ্রীরামকৃষ্ণের সাহচর্য লাভ করে ভৈরবী এভাবে তাঁর মহান ধর্মপথযাত্রায় লক্ষ্যলাভের জন্য অধিকতর আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠেন, এবং আধ্যাত্মিকতায় উন্নত হয়ে যান অনেকখানি। উত্তরকালে তীর্থভ্রমণের পথে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কাশীতে আর একবার তাঁর সাক্ষাৎকার হয়েছিল।

চাই আরও আলো

শ্রীঅসিত সেনগুপ্ত

বিশ্বে আজ প্রভাতের আলোর প্লাবন মাঝে ছায়া।
স্নিগ্ধকান্তি পূর্ণচন্দ্র মাঝে মাঝে মেঘে ঢেকে যায়।
সুন্দরের শিবলোকে জীবনের জড়বাদী মায়া
পুণ্য দিব্যজীবনের ছন্দ মাঝে ছেদ আনে, হায়!

ক্লান্ত মন্দাক্রান্তা যেন জীবনের সুরকে না টানে
মনের গভীরে যেন অলসতা নাহি বাঁধে বাসা,
শক্তিময় ছন্দ যেন মূর্ত হয় সবাকার প্রাণে,
সত্য হয় মানুষের সফল সুন্দর চির আশা।

দূর হোক, মুছে যাক হৃদয়ের গ্লানি আছে যত,
পৃথিবীর যত ক্লেদ, যত পঙ্ক, যত নির্জীবতা ;
প্রাণময় দিব্য সুর প্রাণে যেন বাজে অবিরত,
বীর্যময় দেবভাবে জীবনের ছন্দ হোক গাথা।
এসো ওহে সত্যশিব, সুন্দরের দীপখানি জ্বালো
বিশ্বজীবনের পথে চাই আলো, চাই আরও আলো

মহাত্মা কবীর ও ধর্মসমন্বয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী অমৃতত্বানন্দ

কবীর ও শ্রীরামকৃষ্ণ

কবীরের ভাব বুঝিতে গেলে 'সন্তো, সহজ সমাধি ভলী' ও 'উলটি সমানা আপন মেঁ'—এই দুইটি একসাথে বুঝিতে হইবে। উল্টাইয়া যাওয়া অর্থে বহির্মুখ বৃত্তিগুলিকে অন্তর্মুখ করা —অবশেষে সাধক দেহ-চেতনা মন-প্রাণ সংসার ভুলিয়া কেবল ঈশ্বরধ্যানে তদ্গত হইবে—তবেই 'হুআ ব্রহ্ম সমান' এই ভাব আসিবে। এই অবস্থার পর 'সহজ সমাধি ভলা।' এই সহজ সমাধি যে কি তাহা অনেকের পরিষ্কার ধারণা নাই। তাই উন্মনী ভাব, বিমনসা ভাবকে বাদ দিয়া সহজ সমাধির ভাবকে বুঝিতে যাইয়া বিষম গোলে পতিত হন। মন-বুদ্ধির পরপারে আত্মার দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া সাধক যখন 'আমি আমার' জগতে নামিয়া আসেন তখন জগৎকে চৈতন্যময় দেখেন ও অন্তরে বাহিরে এককে নানাভাবে দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া যান। তখন তাঁহার প্রাত্যহিক কর্মও ঈশ্বর-আরাধনায় পর্যবসিত হয়—তিনি দেখেন ঈশ্বর বৈ আর কিছুই নাই, তাই তাঁহার আচরিত সমস্ত কর্মেও তাঁহার অহংকার থাকে না, তিনি দেখেন ঈশ্বরই ঐরূপ করিতেছেন। এই অবস্থাকে সহজ-সমাধি বলা হয়। এইখানে পৌঁছাইতে আগে ঈশ্বরময় হইবার প্রয়োজন অস্বীকার করিলে বিসমিল্লায় গলদ হইবে। কবীর গাহিতেছেন—

সন্তো, সহজ সমাধি ভলী—
সাঈঁ তে মিলন ভয়ো জা দিনতেঁ,

আঁখি ন মূদুঁ কান ন রূঁধুঁ কায়া কষ্ট ন ধারূঁ।
খুলে নৈন মৈঁ হঁস হঁস দেখুঁ সুন্দর রূপ নিহারূঁ॥
ইত্যাদি

ওহে সন্ত, সহজ সমাধিই ভাল। যেদিন মিলন হয় স্বামীর সঙ্গে সেদিন চোখ বন্ধ করি না, কান ঢাকি না, দেহকে দি না কষ্ট। চোখ মেলে আমি হাসতে হাসতে দেখি, তাঁর সুন্দর রূপ। যা বলি সেই নাম, যা শুনি সেই স্মরণ, যা কিছু করি সেই পূজা। বাড়ী আর পড়ো-বাড়ী সমান দেখি। দ্বৈত ভাব দি মিটিয়ে। যেখানে যেখানে যাই তাই হয় পরিক্রমা, যা কিছু করি সেই হয় সেবা। যখন শয়ন করি, সেইটেই হয় দণ্ডবৎ। অন্য দেবতার আর পূজা করি না। অনাহত শব্দে নিরন্তর মত্ত হয়ে আছে আমার মন, খারাপ কথা বলা সে ছেড়ে দিয়েছে। উঠতে বসতে কখনো (তাঁকে) ভুলে না। ইত্যাদি॥

সংস্কৃতে ও দেশীয় ভাষায় এইরূপ ভাবোদ্যোতক বহুপদ পরম রসানুভবসিদ্ধ মাধুর্যে অনবদ্য হইয়া আছে। 'আত্মা ত্বং গিরিজা মতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ।' ইত্যাদি। সুতরাং ইহা ভোগলোলুপ চিত্তের কারসাজি নয় যে, জগৎ ও ঈশ্বর উভয়ই সমান সত্য বলিয়া ধরিয়া—ঈশ্বরের একমাত্র সার্থকতা এই জগৎসংসার রচনায় নিহিত—এই বিভ্রান্তিকর ধারণার সমর্থন করিবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ত্রৈলোক্য সান্ন্যালকে এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ করিলে মন্দ হয় না। "ও সব তোমাদের কি কথা!—যারা 'সংসারে ধর্ম', 'সংসারে ধর্ম' করছে তারা একবার যদি ভগবানের আনন্দ পায় তাদের আর কিছু ভাল লাগে না। কাজের সব আঁট কমে যায়, ক্রমে যত আনন্দ বাড়ে কাজ আর করতে পারে না, কেবল সেই

আনন্দ খুঁজে খুঁজে বেড়ায়! ভগবানের আনন্দের কাছে বিষয়ানন্দ আর রমণানন্দ! একবার ভগবানের আনন্দের স্বাদ পেলে সেই আনন্দের জন্য ছুটোছুটি করে বেড়ায়, তখন সংসার থাকে আর যায়।......

"বলে দুদিক রাখবো! দু'আনা মদ খেলে মানুষ দুদিক রাখতে চায়, আর খুব মদ খেলে কি আর দুদিক রাখা যায়!"

মহাত্মা কবীরের ভাবধারাও যে ঐরূপ দুইদিক রাখিবার প্রচেষ্টাপূর্ণ নয়—তাহা তাঁহার দোঁহাতেই নির্দেশিত রহিয়াছে—

অবিনাসী দুলহা কব মিলি হৌ ভক্তনকে
রছপাল।
জল উপজী জল হী সোঁ নেহা—রটত
পিয়াস পিয়াস। ইত্যাদি

"ভক্তের রক্ষাকারী অবিনাশী প্রিয়তম কবে তোমার দেখা পাব! আমার অবস্থাটা যেন সেই মাছের মত যে জলে জন্মে, জলই ভালবাসে, তবু জল জল বলে চেঁচায়! প্রিয়তম, তোমার সঙ্গে মিলনের আশায় বিরহিণী আমি তোমার পথের দিকেই চেয়ে আছি, তোমার প্রেমের জন্য আমি ঘর ছেড়েছি, তোমার চরণে করেছি আত্মসমর্পণ। জলছাড়া মাছের যেমন হয় তেমনি ঘরের মধ্যে আমার প্রাণ আকুলি বিকুলি করছে। দিনের বেলা আমি যেতে পারিনে, রাতে আমার ঘুম হয় না, ঘরদোর আমার ভাল লাগে না। শয্যা আমার শত্রু হয়েছে। আমি জেগে রাত কাটিয়ে দি। বন্ধু, আমি ত তোমারই দাসী, তুমি আমার ভর্তা। দীনদয়াল, এস তুমি দয়া করে। তুমি শক্তিমান, তুমি স্রষ্টা। প্রিয়তম, হয় তুমি এসে আপন করে নাও, নয় আমি এই প্রাণ ত্যাগ করি। কবীরদাস বলছে—বিরহ অত্যন্ত প্রবল হয়েছে, আমাকে দর্শন দাও।"

এই প্রবল ব্যাকুলতা যাঁহার প্রাণে তাঁহার সংসারপ্রীতি যে কতখানি ছিল তাহা সহজেই বোধগম্য। তিনি বলিতেছেন—'সহজৈ সহজৈ সব গয়ে সুত-চিত-কামিনী-কাম।'

যাঁহার প্রাণে ভগবদ্‌বিরহের আগুন জ্বলিয়াছে তাঁহার নিকট সংসার ভয়ের। ঘর-সংসারকে ডাইনী ভাবিতেছেন কবীর। পঞ্চ ইন্দ্রিয় ডাইনীর পাঁচ ছেলে।

লবৌ বাবা আগি জলাবো ঘরা রে।
তা কারনি মন ধন্ধে পরা রে।
ইক ডাইনি মেরে মনমেঁ বসে রে।
নিত উঠি মেরে জিয়কো ডঁসে রে।
তা ডাইনিকে লরিকা পাঁচ রে।
নিস্‌-দিন মোহি নচাবৈ নাচ রে।
কহৈ কবীর হুঁ তাকৌ দাস
ডাইনি কে সঙ্গ রহৈ উদাস।

—এইভাবে দেখা যায় যে, কবীর 'রামে কামে' মিলাইতে চাহেন নাই। 'সংসারকে পাতকুয়ো ও আত্মীয়-স্বজনকে কাল সাপ' বলিয়া বোধ হইবার কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলিয়াছেন। 'সংসার' 'সংসার' যাঁহারা করেন তাঁহাদের সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি: এরা কি জানে। একটা পাতকুয়ার ব্যাঙ কখনও পৃথিবী দেখে নাই। পাতকুয়াটি জানে; তাই বিশ্বাস করবে না যে একটা পৃথিবী আছে। ভগবানের আনন্দের সন্ধান পায় নাই, তাই 'সংসার' 'সংসার' করছে।

ঈশ্বরানন্দে বিভোর কবীরজী বলিতেছেন—'যেদিন থেকে গুরু আমাকে সিদ্ধিঘোঁটা খাইয়েছেন, সেদিন থেকে আমার চিত্ত স্থির হয়ে গেছে। আমার সকল দু'টানার ভাব দূর হয়ে গেছে। আধ-কটোরা নাম-ঔষধ খেয়ে আমার কুমতি তৃপ্ত হয়ে চলে গেছে।...'

ঈশ্বরপ্রেমে বিরহকাতর কবীরের বিরহ-

বর্ণনা বৈষ্ণব পদাবলীর সমতুল্য বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। ভাবের স্পন্দন ও প্রকাশে আশ্চর্য মিল পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের মতন কবীরের পদ্যও ছন্দের স্পন্দনকে অতিক্রম করিয়া সংগীতের মাধুর্য লাভ করিয়াছে। কবীর আপনার আন্তরিক প্রবল ঈশ্বরমিলনেচ্ছাকেই অনুভব-রসধারার জারকে নিষিক্ত করিয়া নির্গত পদ্যধারায় প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহা তাঁহার সাধনা ও সংগীত। কবীর বাংলা দেশের হইলে বোধ হয় তাঁহার প্রেমসাধনার বীর ভাবটুকু অশ্রুজলে মুছিয়া যাইয়া বাংলার পেলব কোমল ভাবধারায় উহাকে আরো রসঘন করিত। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি মহাজনের সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত পরিচয় ছিল এবং তাঁহারা পড়ুয়া পণ্ডিত। কিন্তু কবীর! নিরক্ষর অনন্য একক কবীরে সহিত্যসৃষ্টির কোন সজ্ঞান প্রচেষ্টাই ছিল না। অথচ ভাবে উপমায় ইঙ্গিতে মাধুর্যে কবীরের দোঁহাবলী অনবদ্য। পদাবলীতে পদকর্তাদের কল্পনা, যাহা অনেক ক্ষেত্রেই জীবনানুভূত নয়, কবীরে তাহা জীবনানুভূত বাস্তব।

"হে রাম, বহুকাল ধ'রে তোমার পথ চেয়ে রয়েছি—তোমার সঙ্গে মিলনের জন্য প্রাণ ছটফট করছে—মনে একটুও সুখ নেই। হে রাম, তোমার দর্শনের জন্য বিরহী উঠে দাঁড়াচ্ছে আর পড়ে পড়ে যাচ্ছে। মরবার পর তুমি যে দর্শন দেবে তা কোন্ কাজে লাগবে! কবীর বলছে, হে রাম, মরবার পর তোমায় পেতে চাইনে। সব লোহা যদি পাথরই হয়ে যায় তাহলে পরশমণি কোন্ কাজে আসবে? কবীর বলছে রামকে ছেড়ে দিলে সুখ নেই, সুখ নেই রাতে, স্বপ্নে সুখ নেই, রোদে সুখ নেই, ছায়াতেও সুখ নেই।"

এই দেহেই চাই মিলন—মৃত্যুর পর মিলনে কি কাজ? এই দেহপিঞ্জরেই চাই অনন্ত আনন্দধারার উপলব্ধি—পদাবলীর কবি গাহিতেছেন:

ঈ নব যৌবন বিরহে গতায়ব
কি করব সে পিয়া নেহে
অঙ্কুর তপনতাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।

বিরহের দরুন কবীর নিদারুণ কষ্ট পাইতেছেন—'আমি আগুনে পুড়ছি—আমার দেহ জ্বলে যাচ্ছে। রাতে ঘুম নেই। চন্দন ঘষে ঘষে শরীরে লাগাই। রামের বিরহে আমি দারুণ দুঃখ পাচ্ছি।'

বিরহের কষ্টের এই বর্ণনা পদাবলীতে শ্রীরাধার বিরহবর্ণনায় এবং শ্রীকৃষ্ণবিরহ-কাতর শ্রীচৈতন্যদেবের ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনীতেও বর্ণিত রহিয়াছে। শরীরে চন্দন-লেপন ও কণ্ঠে পুষ্পমাল্য-ধারণ যে সেই বিরহজ দৈহিক যন্ত্রণা প্রশমনের উপায় তাহারও উল্লেখ আছে।

শ্রীমতীর বিরহবর্ণনা দিতে গিয়া বিদ্যাপতি লিখিতেছেন—

নয়ানক নিদ্ গেও বয়ানক হাঁস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ হম পাশ॥

মধুরভাবের এই সাধনা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে অনন্ত গভীরতায় কৃত হইয়াছে। স্বয়ং নারীরূপ ধারণ করিয়া গভীর অনুরাগে মধুরভাব সাধনকালে তাঁহার শরীরে কৃষ্ণ-প্রেমবিধুরা শ্রীমতীর সকল অবস্থার প্রত্যেকটি প্রকাশিত হইয়াছিল।

মহাত্মা কবীরের সাধনা যুগপ্রয়োজনে কয়েকটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছিল। তিনি মধুরভাব অবলম্বন করিলেও তাহা বৈষ্ণবোচিত নয়; তিনি নিরাকার নৈর্ব্যক্তিক রামপ্রেমে বিভোর। একদিকে উহা যোগ-প্রভাবযুক্ত হওয়ার ফলে বাহ্যাচার ও পূজা-অর্চনা বর্জিত অহংনাশের সাধনা। অন্যদিকে

এই অহংকেই বধূবেশে সজ্জিত করিয়া অবিনাশী বরের সহিত তিনি মিলিত করিতে চাহিয়াছেন। ইহাতে সূফী সম্প্রদায়ের ঈশ্বরসাধনার সহিত হিন্দুধর্মের বহুমতপথগামী সাধনাধারার একটি ধারার মিলন সম্ভবপর হইয়াছিল। কবীর যাহা চাহিয়াছিলেন মধ্যযুগীয় বাতাবরণে তাহার সম্যক্ বিকাশ সম্ভব ছিল না। সম্প্রদায়হীন ধর্মসাধনার আহ্বানে সাড়া দেওয়া প্রজ্ঞাসম্পন্ন মানুষের পক্ষেই সম্ভব ছিল। বর্তমানের বিজ্ঞান-চেতনা ও অর্থ নৈতিক পরিবর্তন মানুষকে যে পরিবেশের মধ্যে লইয়া যাইতেছে তাহাতে মনে হয়, সাম্প্রদায়িক গণ্ডির কথা ভাবিবার বা ভাবিলেও তাহার সঙ্কীর্ণ বিধি-নিষেধ মানিবার অবকাশ ও স্পৃহা মানুষের থাকিবে না। ফলে ধর্মবিশ্বাসে বর্তমানের আলোকপ্রাপ্ত মানুষ সাম্প্রদায়িক ধর্ম-গণ্ডির মধ্যে থাকিলেও তাহার মধ্যে একটি সকল ধর্মমত গ্রহণের বিজ্ঞানীজনোচিত উদার মনোবৃত্তি কম-বেশি লক্ষিত হইতেছে। কবীর সেই একত্বেরই পূজারী ছিলেন—

'আমার নিরঞ্জন আর আল্লা এক। আমার কাছে হিন্দু তুরুক. দুই নয়। আমি ব্রত রাখি না, মহরম জানি না, নিদানকালে যে থাকে তাকে স্মরণ করি। পূজা করি না, নমাজ পড়ি না, হৃদয়ে এক নিরাকারকে প্রণাম করি। হজেও যাই না, তীর্থব্রতও করি না। এককে চিনলে আর দুই কিসের? কবীর বলছে—সব ভ্রম দূর হয়েছে; এক নিরঞ্জনে মন নিবিষ্ট রয়েছে।'

আর শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিরঞ্জন ও আল্লাকে একই দেখিয়াছেন—নামমাত্র ভেদ। তাঁহার কাছে হিন্দু তুরুক দুই নয়। তিনি ব্রতাদিও রাখিয়াছেন, আবার, নিদানকালে যিনি থাকেন তাঁহাকে স্মরণও করিয়াছেন। তিনি পূজা করিয়াছেন, নমাজ পড়িয়াছেন, আবার হৃদয়ে এক নিরাকারকেও স্মরণ করিয়াছেন। তিনি তীর্থব্রত রাখিয়াছেন। তিনি এক চিনিয়াছেন, দুইকেও রাখিয়াছেন। সব ভ্রম দূর করিয়া এক নিরঞ্জনে মনপ্রাণ সঁপিয়াছেন।

একজন নেতিমুখে মিলন চাহিলেন, অপরে ইতিমুখে। কবীর যাহা ব্যাবৃত্ত পথে সাধন করিতে গিয়া বিশ্বজনীন হইতে পারিলেন না, (কারণ সাধারণ মানব তাঁহার আচার-অর্চনা-বর্জিত পথনির্দেশ বরণ করিতে পারে নাই) শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহা গ্রহণপথে সাধন করিয়া বিশ্বজননীন হইলেন। কারণ বেদমূর্তি শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের মাধ্যমেই বর্তমান যুগধারার বহু-মুখীনতার সার্থক মিলন সাধিত হইয়াছে।

প্রবন্ধোক্ত দোঁহা ও অর্থ—অধ্যাপক উপেন্দ্রকুমার দাস লিখিত 'ভক্ত কবীর' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল।

বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকায় স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীসুখরঞ্জন চক্রবর্তী

স্বামী বিবেকানন্দ বহু ভাষা ও সাহিত্যের সমুদ্রসঙ্গমে মধুকর ছিলেন এবং নানা বিষয় তাঁর সেই মাধুকরীকে রাজৈশ্বর্যের মহিমা দান করেছিল। তবু সকল বিষয়ের মধ্যে নিজের দেশ, জাতি, তার ধর্মভাব ভাষা ও সাহিত্যকে চিরদিন সবচেয়ে উচ্চমূল্য দান করেছেন তিনি। তাঁর চরিত্রের যে অনমনীয় দৃঢ়তা, পবিত্রতা এবং সংযম দীর্ঘকাল ধরে মানবজাতির শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উৎপাদন করে আসছে, তাঁর ব্যবহৃত ভাষা এবং লিখন-প্রয়াসও অনুরূপ শ্রদ্ধায় বাংলা সাহিত্যের পাঠককে এক স্তম্ভিত উপত্যকার শীর্ষে স্থাপন করেছে। বাংলাদেশের ধর্মজীবনে এবং কর্মজীবনে বিবেকানন্দের অবদানের কথা অত্যন্ত গভীরভাবে অনুভব করেও বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকাতে তাঁর অস্তিত্বের দিকটিকে বিশেষভাবে চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা আছে। বিবেকানন্দ নানা প্রয়োজনে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনকালে যে সকল গ্রন্থ রচনা করেছেন বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে তা অমূল্য। বাংলা সাহিত্যের শ্রদ্ধাবান পাঠকমাত্রই তাঁর কথা সসম্মানে উল্লেখ করবেন।

অবশ্য বিবেকানন্দ বাস্তব অর্থে সাহিত্যিকদের মতন লেখনী ধারণ করেননি কোন কালেই। লিখে লেখক হিসেবে নাম করবেন এমন ইচ্ছে বিন্দুমাত্রও তাঁর ছিল না। তাই কথাসাহিত্যের কল্লোলঘেরা উদ্যানে কিংবা কবিতা বা কাব্যের কল্পধামে তিনি কোন পঞ্চতপা সাধনা করেননি। সমাজকে উন্নত, দৃঢ় এবং সুসংহত করবার গুরু কর্তব্যবশেই তিনি মাঝে মাঝে লিখেছেন সাংস্কারিকের দৃষ্টি নিয়ে। মোটামুটি ভাবে বলা যায় তাঁর যাবতীয় রচনাই প্রয়োজনে সিদ্ধ। তাই তাঁর লেখায় হালকাচালের ফুল্‌কি ছন্দের প্রত্যাশা করা বৃথা। তাতে সাহিত্যের রূপরসগন্ধস্পর্শের আশা করাও অনুচিত। তথাপি এত শত অসঙ্গতি সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের যথার্থ পাঠক বাংলা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেকানন্দকে বহির্ভূত করে শান্তি পায় না, পেতে পারে না। কেননা তাতে তার সাহিত্যপাঠের অসম্পূর্ণতাই প্রমাণিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়। বিবেকানন্দে সেই সীমিত আরব্ধ কর্মের পূর্ণ রূপ দেখি, সমগ্র জাতির হৃদয় ও চৈতন্যকে আলোড়িত করেছেন তিনি। রামমোহন সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনে তাঁর জীবনকালে বহু লেখা লিখেছেন। তাতে বাংলা সাহিত্য বিশেষ প্রাণময়তা লাভ করেনি। কিন্তু বাংলা ভাষা সুগঠিত হয়েছে। বিবেকানন্দও বাংলা সাহিত্য থেকে বাংলাভাষা গঠনের দিকেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন দেখা যায়। রামমোহন, বিদ্যাসাগর ইত্যাদির মতন বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে বিবেকানন্দ কলম হাতে তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে যে সাহিত্যের গুপ্তফল্গুধারা প্রবাহিত ছিল তাই তাঁকে বরণীয় করে নিয়েছে সাহিত্যের আলো-ঝলমল-করা চাঁদোয়ার নীচে।

দ্বিতীয় পর্বের বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দের অবদানকে ভুললে চলবে না। এ যুগে বাংলা সাহিত্যের প্রবন্ধ গড়ে উঠেছে। নানা দিকে নানা ভাবে দেখা দিয়েছে তার প্রকাশ। ভূদেব, রাজনারায়ণ, অক্ষয় দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর

প্রভৃতির যশস্বী লেখনীস্পর্শে নানা বিষয়ের নানা কথা এসে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনপ্রাঙ্গণ ভরে তুলেছে। রসরচনা ও নিবন্ধসাহিত্য শুরু করেছে তার শনৈঃ শনৈঃ অভিযান। নানালোকে নানা দিক হতে বাংলা সাহিত্যের স্রোতে নানা গান ঢালতে আরম্ভ করেছেন। বিবেকানন্দ এসেও সেই স্রোতে যোগ দিলেন। কিন্তু সাহিত্যরচনার প্রত্যক্ষ প্রেরণা তাঁর ছিল না। ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ প্রভৃতির নানা বিষয়ই তাঁর লেখাতে বাক্‌বদ্ধ হয়েছে। আর কিছু কবিতাও রচনা করেছেন তিনি।

বাংলা সাহিত্যের আসরে বিবেকানন্দ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি যখন লিখতে শুরু করলেন তখন কী আশ্চর্যভাবে তিনি তাঁর প্রাক্তনদের ছায়া না মাড়িয়ে গেলেন! তাঁর লেখ্য ভাষা তাঁর পূর্বসূরীদের তোরণদ্বারের ধার দিয়েও যায়নি। তিনি তাঁর অধিকাংশ রচনাই লিপিবদ্ধ করেছেন লেখ্য ভাষার তথাকথিত বিধিকে উপেক্ষা করে কথ্য ভাষার সহজ মুক্ত ছন্দে। তাঁর সব লেখাই কথ্য ভাষাকে বাহন করে দিগন্ত বিহার করেনি অবশ্য। স্বামীজীর পরিব্রাজক গ্রন্থখানাই কথ্য ভাষার সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দলিল। চিঠিপত্রেও অবশ্য তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কথ্য ভাষা ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া ভাববার কথা, বর্তমান ভারত ইত্যাদি লেখার আশ্রয় সাধুভাষা। তথাপি তাঁর ব্যবহৃত সাধুভাষা সমাস, সন্ধি, ক্রিয়াপদ প্রভৃতি ব্যাকরণের নানা জটিলতার ভারে পীড়িত নয়। তাঁর সংযত অথচ মুক্ত-মানসিকতা কোন প্রকার গতানুগতিকতার সাথে হাত মিলিয়ে সাম্যপ্রতিষ্ঠায় রাজী ছিল না।...

ভবিষ্যদ্রষ্টা ঋষির মতন বিবেকানন্দ বাংলা সাহিত্যে কথ্য ভাষার স্থান ও মর্যাদা নির্দেশ করেছেন। হুতোমের যে সাবলীল মুক্তভাষা উত্তরসূরীদের হাতে লাঞ্ছনা সহ্য করতে করতে কোণঠাসা হয়ে গেল, যার দমকদামিনী দেখেই আমরা শান্ত হতে বাধ্য হয়েছিলাম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীকে আশ্রয় করে তার সত্যরূপ মশাল হয়ে জ্বললো।

উচ্চচিন্তাকে মুখের ভাষায় কী আশ্চর্যভাবে প্রকাশ করতে সচেষ্ট হলেন বিবেকানন্দ! ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি "বাঙ্গলাভাষা" নামক প্রবন্ধে লিখেছেন :—

"আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্তবিদ্যা থাকার দরুন, বিদ্বান্ এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত—যাঁরা 'লোক-হিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা—যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিতমাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের ক'রে কি হবে? ...ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ্ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছা কর—আবার যে-কে-সেই, একচোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা—সংস্কৃতর গদাইলস্করি চাল—ঐ এক চাল নকল ক'রে অস্বাভাবিক হ'য়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়,—

নিজের রচনাতেও অধিকাংশক্ষেত্রে বিবেকানন্দ এই চলতি ভাষাকে প্রয়োগ করেছেন। বলা যেতে পারে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তাঁর দেহত্যাগের কাল পর্যন্ত বাংলা কথ্যভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক তিনিই। বাংলা ভাষা সৃষ্টির ইতিহাসে স্বামীজী চিরদিন মর্যাদার আসনে

অধিষ্ঠিত থাকবেন। তাঁর লেখা নানা নিবন্ধে বাংলা সাহিত্য তার প্রবন্ধের ভাণ্ডারটিকে বেশ পরিপাটি করে নিতে পেরেছে। এই সব লেখাতে আছে উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত শব্দ-প্রয়োগ। স্থানে স্থানে প্রয়োজনানুসারে 'ফার্সি' শব্দের ব্যবহার। এতে বিশেষ করে লাভবান হয়েছে বাংলা শব্দভাণ্ডার। রচনারও সরসতা বেড়ে গেছে। একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যাক :

"এইবার জাহাজ সমুদ্রে প'ড়ল। ঐ যে 'দূরাদয়শ্চক্র' ফক্ক 'তমালতালী বনরাজি' ইত্যাদি ওসব কিছু কাজের কথা নয়। মহাকবিকে নমস্কার করি, কিন্তু তিনি বাপের জন্মে হিমালয়ও দেখেননি, সমুদ্রও দেখেননি, এই আমার ধারণা।

এইখানে ধলায় কালোয় মেশামেশি, প্রয়াগের কিছু ভাব যেন সর্বত্র দুর্লভ হ'লেও 'গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।' তবে এ জায়গা বলে ঠিক গঙ্গার মুখ নয়। যা হোক আমি নমস্কার করি, 'সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখং' ব'লে।" (পরিব্রাজক ॥ বঙ্গোপসাগরে)

এতে লক্ষণীয় হ'ল কথ্যভাষার ব্যবহারের নিপুণতা। কথ্যভাষার ব্যবহারের মধ্যে বিবেকানন্দ যা লক্ষ্য করেছিলেন তা হ'ল ভাষার অসামান্য ক্ষিপ্রতা। ভাষাকে তিনি কথনই স্থিতিশীল ব'লে মনে করতে চান নি। তাইতো তিনি সাধুভাষার "গদাইলস্করি চাল" ছাড়তে বলেছিলেন। সাধুভাষার মাধ্যমে তিনি যে সব ভাবকে প্রকাশ করেছেন তাতেও একটা গতির ছন্দ অনুভব করা যায়। তাতে উপরন্তু আছে একটা সক্ষম চলার গাম্ভীর্য। বাংলা ভাষার প্রবন্ধ গহন ও গম্ভীর হয়ে বিশ্বসাহিত্যের প্রবন্ধের সমকক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে স্বামী বিবেকানন্দেরই রচনার মধ্য দিয়ে। যেমন—

"হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা। পাশ্চাত্য-অনুকরণ-মোহ এমনই প্রবল হইতেছে যে, ভালমন্দের জ্ঞান আর বুদ্ধি বিচার শাস্ত্র (বা) বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। শ্বেতাঙ্গ যে ভাবের, যে আচারের প্রশংসা করে, তাহাই ভাল; তাহারা যাহার নিন্দা করে, তাহাই মন্দ। হা ভাগ্য, ইহা অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় কি?" (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংঘর্ষ ॥ বর্তমান ভারত)

এই রচনার মধ্য থেকে পাঠকমাত্রই লেখকের শিল্পিসত্তাকে অনুভব করবেন। উপকরণের দিক দিয়ে যদিও এ রচনার বিষয় সাহিত্যের কোন সুলভ মনোরঞ্জনী নয়, তবুও এর প্রমাণরীতি আপাত-কঠিন নীরস বস্তুতত্ত্বের মধ্যে যে সোনার ফসল ফলিয়েছে তা থেকেই হবে তার সাহিত্যিক মূল্যায়ন। তাছাড়া সাহিত্যের জগৎ যখন সুপ্রসারিত, অখণ্ড—রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি, দর্শনবিজ্ঞান, স্মৃতি ন্যায় এমন কি গণিত পর্যন্ত সাহিত্যের মণিময় ঔদার্যের কাছে একটি নমস্কারে বিনত হয়ে গেছে তখন বিবেকানন্দের যাবতীয় রচনাকেই বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকাতে গণ্য করতে কারো দ্বিধা থাকা উচিত নয় বলেই মনে হয়। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের লোকরহস্য, বিজ্ঞানরহস্য, কমলাকান্ত এবং রামেন্দ্রসুন্দরের জিজ্ঞাসার প্রবন্ধাবলীকে যখন আমরা বাংলা সাহিত্যের গণ্ডির মধ্যে ফেলেছি তখন বিবেকানন্দের সমুদয় রচনাকে তার বাইরে ফেলার বাস্তবিক কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই।

বিবেকানন্দের সকল লেখাতেই একটা মনুষ্যত্বের জয়ধ্বনি শোনা যায়। কী গদ্য, কী পদ্য কোথাও তিনি মানুষকে পরিত্যাগ করে কিছু বলতে চান নি। তাঁর ঈশ্বরবিষয়ক

কবিতার মধ্যে "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর" নামক পঙ্‌ক্তিটি তাই ধ্রুবপদ হয়ে আছে। মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ তাঁর মরমের কথা বলেছেন :

"শোন বলি মরমের কথা,
জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর,
এক তরী করে পারাপার—
মন্ত্র-তন্ত্র প্রাণ-নিয়মন,
মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ, বুদ্ধির বিভ্রম ;
'প্রেম' 'প্রেম'—এইমাত্র ধন।"
(সখার প্রতি)।

এই মানবপ্রেমই বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে তাঁর স্বদেশমন্ত্রে :

"ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর ; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই ;……।" (বর্তমান ভারত)

হীন পতিতের সাথে এই একাত্মতার বোধ প্রাক্-বিবেকানন্দ যুগের লেখকদের লেখাতে ক্বচিৎ দেখা গেছে। যা-ও দেখা গেছে তাও অতিমাত্রায় ভাবালুতায়
বিবেকানন্দের অনুভূতি এই ভাবালুতার লুতা-জালে আচ্ছন্ন না থেকে অসামান্যরূপে অব্যর্থ-লক্ষ্য ও প্রাণস্পর্শী হয়েছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তার বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর নয়। তবু একথা সত্য যে বিবেকানন্দই হলেন উনিশ শতকের প্রথম বাংলাভাষার লেখক যাঁর মধ্যে গণজীবনের কথা সম্পূর্ণভাবে অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

সাহিত্যিক তিনি ছিলেন না। শিল্পী তিনি নন। তাই এই পঙ্‌ক্তিহীন ব্রাত্যদের কথা বাংলা সাহিত্যের কোন কালজয়ী কাহিনীর মাধ্যমে তিনি অঙ্কন করে রেখে যান নি। তাঁর কাছ থেকে সে আশাও আমরা অন্যায় রকম ভাবে করি নি। তবুও পরবর্তীকালে বাংলার যে বিশাল গণসাহিত্য রচিত হয়েছে গদ্য-বিকাশের সাথে সাথে তাতে বিবেকানন্দের অগ্রণী ভূমিকাটুকু ভুললে চলবে না। বিবেকানন্দই নির্মিতির যুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম গণজীবনের সুরকার।

বাংলা সাহিত্যে বিষয়বস্তুর দিকে না হোক আঙ্গিকের দিকে বিবেকানন্দ যা দান করেছেন তা অতুলনীয়। বাংলা ভাষাকে শাস্ত্রপুরাণের আলোচনার যথার্থ বাহন ও যুক্তিপূর্ণ ভাব প্রকাশের মাধ্যম যাঁরা করে তুলেছেন তাঁরা হলেন বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত ও রামমোহন ইত্যাদি। এঁদের মাঝখানে বিবেকানন্দও আছেন। তাঁর রচনাতেও বাংলা সাহিত্যের প্রবন্ধ বিশেষ লাভবান হয়েছে।

স্বামী সুবোধানন্দ

শ্রীঅবনীমোহন গুপ্ত

এক

আঠার শ' সাতষট্টি খৃষ্টাব্দের পয়লা নভেম্বর কলিকাতা অঞ্চলে এক বিপর্যয়কর ঝঞ্ঝাবাত প্রবাহিত হয়।[১] তাহারই সপ্তাহকাল পরে, আটই নভেম্বর, উত্থান একাদশীর দিন, মহানগরীর ঠন্‌ঠনিয়া পল্লীতে এক দেবকল্প শিশু জন্মগ্রহণ করেন।

শিশুর পিতা শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোষ। মাতা শ্রীমতী নয়নতারা ঘোষ। পিতামহ শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ। প্রপিতামহ শ্রীরামশঙ্কর ঘোষ। ইনিই ঠন্‌ঠনের শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালী-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য শঙ্কর ঘোষ। এখনও ৪০নং শঙ্কর ঘোষ লেনে তদীয় বংশধরগণ বিদ্যমান আছেন। শিশুর মাতামহের নাম শ্রীদুর্গাচরণ গুহ।

তাঁহার পিতৃদত্ত নাম শ্রীসুবোধচন্দ্র ঘোষ। মাতা ডাকিতেন—দেবতা। শুনা যায়, বাড়িতে আর একটি ডাক নাম ছিল—ঝোড়ি। সম্ভবতঃ সেই সাতষট্টি সালের প্রচণ্ড ঝড়ের পরেই জন্ম হইয়াছিল বলিয়া এই নাম বাটীতে প্রচলিত হইয়াছিল। এই শিশুই যথাকালে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ-ভুক্ত, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ সন্ন্যাসী-শিষ্যগণের অন্যতম—স্বামী সুবোধানন্দ বা খোকা-মহারাজ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

সুবোধচন্দ্র পাড়ার একটি বালকের সহিত কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বর (আড়াই ক্রোশ) পায়ে হাঁটিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে গমন করেন। তিনি তখন নিতান্ত বালক, স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে (প্রবেশিকার পূর্বের শ্রেণীতে) পাঠ করিতেন। সম-সাময়িক শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন তাঁহার "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি" নামক গ্রন্থে লিখেন :

"ক্ষীরোধ সুবোধ দুটি অতি শিশু ছেলে।
শুনিয়া প্রভুর নাম আসে হেন কালে॥
ক্ষীরোদ সংসারী পরে বল নাই বেশী।
সুবোধের খোকা নাম কুমার সন্ন্যাসী॥"

সুবোধচন্দ্র ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে সর্বপ্রথম দর্শন করেন আঠার শ' চুরাশি খৃষ্টাব্দের পঁচিশে জুন। এইটি তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিন এবং সেই হেতু সর্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য। ইহার সহিত তুলনায় অপর সকল ঘটনাই অকিঞ্চিৎকর। ইতিপূর্বের ঘটনাশ্রেণী এবং অতঃপর সমগ্র জীবনব্যাপী তাঁহার যে প্রয়াস—ঈশ্বরলাভার্থে পথে-ঘাটে, শ্মশানে, নদীতীরে, অরণ্যে, পর্বতগহ্বরে, জপ-ধ্যান-সমাধিতে, তীর্থাটনে, পরহিতব্রতে, তিলে তিলে প্রাণপাতী কঠোর তপস্যায় যতকিছু জ্ঞান ও পুণ্যের সঞ্চয়—সে সমস্তই কোথায় ভাসিয়া যায়, হৃদয় মধুময় হয়, চিত্ত-মন-বুদ্ধি অহংসহ তলাইয়া যায়, একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত এই তাঁহার মিলনকথার চিন্তনে। এই এক কেন্দ্র-বিন্দু হইতে যতকিছু ভাব ও ভাবনার প্রসার তাহাই তাঁহার প্রকৃত জীবনী।

১ "On the 1st of November, 1867, the centre of the storm traversed the country nearby due east from Calcutta to Basirhat on the Ichamati River. In this line villages were blown down wholesale and their destruction was accompanied by loss of human life." —District Gazatteer of 24 Parganas.

*

পরমহংসদেবের সহিত মিলন সম্বন্ধে তাঁহার নিজের উক্তি:—"তুমি লিখেছ রথের দিন তোমার দীক্ষার দিন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ঐ দিনে আমিও গিয়াছিলাম। ঠাকুর আমার হাত ধরিয়া নিজের বিছানার উপর বসাইলেন। আমি বলিয়াছিলাম, রাস্তায় কত লোককে ছুঁইয়াছি, এই কাপড়ে আর আপনার বিছানায় বসিব না। ঠাকুর আমাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে রইলেন, বলিলেন—তুই এখানকার, কাপড়ে কি আসে যায়। পরে ঠাকুর ভাবে অচৈতন্য হইলেন ও আপনাআপনি হাসিতে লাগিলেন; আরও কত কথা হইল। ঠাকুর যে বলিয়াছিলেন—তুই এখানকার, তার মানে আমি তাঁর।... আমি একজনার সহিত দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়াছিলাম কিন্তু এখন ঠিক জানিয়াছি, অন্য লোক উপলক্ষ মাত্র। যার জিনিস, যার লোক সেই টানিয়া লয়।"[২]

এই উক্তিতে "রথের দিন"-কথাটি প্রণিধানযোগ্য। একত্রিশে আগষ্ট (১৮৮৫ খৃ:) দক্ষিণেশ্বরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ 'কথামৃত'-প্রণেতা শ্রীম-(শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়)কে বলিয়াছিলেন—"দুটি ছেলে এসেছিল। শঙ্কর ঘোষের নাতির ছেলে (সুবোধ) আর একটি তাদের পাড়ার ছেলে (ক্ষীরোদ)। বেশ ছেলে দুটি।"[৩] কবে 'এসেছিল' বা কতদিন হইতে যাতায়াত করিতেছে সে সম্বন্ধে ঐ স্থানে কোন উল্লেখ নাই। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের রথের দিনই আসিয়া থাকিবে। সে বৎসর রথযাত্রা হইয়াছিল চোদ্দই জুলাই। সে দিন কিন্তু ঠাকুর বলরাম বসুর বাড়িতে ছিলেন, দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন না।[৪] তাহার পূর্বের বৎসর অর্থাৎ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের তেসরা জুলাই শ্রীম লিখেন: "গত ২৫শে জুন বুধবারে শ্রীশ্রীরথযাত্রার দিন ঠাকুর শ্রীযুক্ত ঈশান মুখোপাধ্যায়ের ঠনঠনিয়ার বাটীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।"[৫] সে দিন পূর্বাহ্ণে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরেই ছিলেন, এবং সিদ্ধান্ত এই যে উক্ত রথের দিনই পূর্বাহ্ণে সুবোধ শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্ত, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' প্রথম ভাগের (ষষ্ঠ সংস্করণের উপক্রমণিকা ১৵০ পৃঃ) নিম্নলিখিত উক্তির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, যথা—"১৮৮৩-৮৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ...সুবোধ ... আসিলেন।" পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ-লিখিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ—দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ"-নামক গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে যাহা লিখিত হইয়াছে ["তাঁহারা সকলেই ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ অতীত হইবার পূর্বে তাঁহার (ঠাকুরের) নিকট আগমন করিয়াছিলেন"] তাহাও এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে।

দুই

দুই বন্ধু (ক্ষীরোদ ও সুবোধ) গোপনে পরামর্শ করিয়া দক্ষিণেশ্বর যাইবার দিন স্থির করিলেন এবং নির্ধারিত দিনে প্রত্যুষে কাহাকেও কিছু না বলিয়া পদব্রজে দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিলেন।

পথ ভুল হওয়ায় অনেক ঘুরিতে হইল। অবশেষে দুই বন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রকোষ্ঠের দ্বারে আসিয়া পড়িয়াছেন—ক্ষীরোদ অগ্রে, সুবোধ পশ্চাতে।

২ সোনার গাঁ রামকৃষ্ণ মঠ, ঢাকা হইতে ১৩৪২ সনে প্রকাশিত "শ্রীশ্রীস্বামী সুবোধানন্দের জীবনী ও পত্র"—৭৯ পৃঃ, ৫৩ সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য।

৩ "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত"—৪র্থ ভাগ, ৩য় সংস্করণ; ২৯১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৪ তদেব—২৫২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৫ তদেব—১১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

তাঁহারা একটু দূর হইতে করজোড়ে প্রণাম করিবামাত্র পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কোথা থেকে আসচো গা।"

ক্ষীরোদ উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে, কোলকাতা থেকে।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "ও বাবুটি অত দূরে দাঁড়িয়ে কেন? ওগো খোকাবাবু, এগিয়ে কাছে এসো না!"

"পায়ে বড্ড ধুলো, ধুয়ে আসি"—এই বলিয়া দুই বন্ধু গঙ্গার ঘাটে যাইয়া হাত-পা ধুইয়া, কিঞ্চিৎ গঙ্গাবারি পান করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। এবার সুবোধ অগ্রে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সুবোধের প্রতি এক বিশেষ প্রকারের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তুই শঙ্কর ঘোষের বাড়ির?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি কি করে জানলেন?"

"যখন ঝামাপুকুরে ছিলুম, তখন তোদের সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে, তোদের বাড়িতে কতবার গেছি। তুই তখন কোথায়—জন্মাস নি। তুই এখানে আসবি জানতুম। যাদের হবে মা তাদের এখানে পাঠিয়ে দেন। তুই অত দূরে দাঁড়িয়ে কেন—কাছে আয়।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাদর আহ্বানে সুবোধ নিকটে আসিলেন। পরমহংসদেব তাঁহার একখানি হাত নিজ দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া, বাম হস্তে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া একটু ধ্যানস্থ হইলেন। পরে কনুই হইতে আঙুলের ডগা পর্যন্ত তাঁহার হাতখানির যেন ওজন পরীক্ষা করিতে করিতে বলিলেন, "ভাখ, তোর হবে। মা বললেন তোর হবে। এই বিছানায় বোস্।"

"না মশাই, বাসি কাপড়, ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই চলে এসেছি, কত লোককে ছুঁয়েছি, এ কাপড়ে আর আপনার কাছে ও বিছানায় বসবো না।"

"কাপড়ে কি এসে যায়, তুই এখানকার—বোস্।"

"আমি যদি এখানকারই তবে আরো আগুতে এলুম না কেন?"

"ওরে, সময় না হলে হয় না – বোস্।"

সুবোধ উপবেশন করিলে পর ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা, তোরা কি করে এলি?"

সুবোধ তাঁহার ভালবাসা পাইয়াছেন, এখন আর সঙ্কোচ-ভাব নাই। কলিকাতার ছেলেরা যেরূপ করে, সকল কথার চটপট জবাব দিতে লাগিলেন। বলিলেন—"হেঁটে এলুম। আবার পথ ভুলে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিলুম। একজন লোক পথ দেখিয়ে দিলে, তারপর মন্দিরের চূড়ো দেখে ঠিক এলুম

"বলিস কি রে? এতটা পথ হেঁটে এলি। তা, এখানকার খবর পেলি কি করে?"

"আপনার উক্তি পড়ে বড় ভাল লাগলো। আপনার কি চমৎকার কথা!"

শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, "আমি কিছুই নয়—মা-ই সব। যাদের হবে মা তাদের এখানে পাঠিয়ে দেন। তা ভাখ, এখানে শনি-মঙ্গলবারে আসা ভাল। শনি কি মঙ্গলবার দেখে একদিন আসিস।"

"আর একদিন এলে হয়তো বাড়িতে জানাজানি হবে। আপনার যা বলবার আছে আজই বলে ফেলুন না। তা ছাড়া শনিবার বাবা সকাল-সকাল আপিস থেকে ফেরেন।"

"না রে, মুখ দিয়ে যা বেরিয়ে গেছে, তা করতেই হবে। এই ভাখ না, যেখানে অমুক দিন যাব বলি, তা ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, বাদল হোক, যেতেই হবে। ইচ্ছা না থাকলেও মা সেখানে নিয়ে যাবেনই যাবেন, কিছুতেই নিস্তার নেই। মুখ দিয়ে যা বেরিয়ে গেছে—শনি কি মঙ্গলবার দেখে আসিস।"

সুবোধ কাজেই সম্মত হইলেন। ভাবিলেন, আজ আর বেশীক্ষণ থাকবো না, আজ আর বেশী কিছু কথাও হবে না।

এইরূপ মনে করিয়া দুই বন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট বিদায় লইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন।

বালকদিগকে কিঞ্চিৎ প্রসাদ দিতে বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব সস্নেহে কহিলেন, "অনেকটা পথ। হেঁটে যেতে কষ্ট হবে। পয়সা দিতে বলে দিচ্ছি—গাড়ী কি নৌকোয় যা।"

সুবোধ বলিলেন, "না মশায়, সাঁতার জানিনে, নৌকোয় যাব না।"

"তবে গাড়ী করে যা।"

"না, হেঁটেই যাব।"

"না রে, কষ্ট হবে। ছেলেমানুষ, অতটা হাঁটতে পারবি কেন?"

"সে কি, এই বয়সে হাঁটবো না তো হাঁটবো কবে?"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব আর জেদ করিলেন না। বলিলেন, "আচ্ছা, তবে আয়। শনি কি মঙ্গলবার দেখে আর একদিন আসিস।"

তখন তাঁহার পদধূলি লইয়া দুই বন্ধু দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সুবোধ যখন বাড়ি ফিরিলেন তখন দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হইয়াছে। আকাশে মেঘ, টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। শুষ্ক মুখে, ধুলোকাদা-মাখা পায়ে সুবোধ পিতামহীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধা পদশব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রে?"

"আমি, ঠাকুমা।"

"কে, ঝোড়ি?"

"হ্যাঁ ঠাকুমা, একটু জল খাচ্ছি।"

এই বলিয়া তাকের উপর কুঁজো হইতে জল গড়াইয়া সুবোধ ঢক্ ঢক্ করিয়া জল পান করিলেন। পিতামহী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "দাঁড়া দাঁড়া, আগে একটু মিষ্টি মুখে দে। ওগো ঝোড়ি এসেছে, কোথায় তোমরা?"

* * *

সেদিন সকালবেলা হইতে সুবোধের জন্য বাড়িতে নানা দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ। ইতিপূর্বে ছেলেরা কেহই না বলিয়া বাটী হইতে অধিক দূরে যায় নাই। প্রাতে মাতা সুবোধকে না দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া হোগলকুঁড়িয়াতে সুবোধের মাতুলালয়ে সন্ধান লইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন। খবর শুনিয়া সুবোধের মাতামহী এ বাড়িতে (ঠনঠনিয়ায়) আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুবোধের পিতাও সেদিন বেশ চিন্তিত মনেই বাটীর বাহির হইয়াছিলেন।

বাড়ির মহিলাগণ এখন, সুবোধ আসিয়াছে শুনিয়া সেই ঘরে উপস্থিত হইলেন। এক এক জন ব্যগ্রভাবে এক এক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। মাতা কেবল চোখের জল মুছিতে লাগিলেন। সুবোধ সকল প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "আমি দক্ষিণেশ্বরে গিছিলুম।"

নেপালে আটদিন

শ্রীমতী অপরাজিতা গোহ

এবার শিবরাত্রির দিন-পনের আগে হঠাৎ নেপালে যাবার ডাক এল। প্রাত্যহিক জীবনে সংসারের ঘূর্ণাবর্তে এ আমন্ত্রণকে স্বীকার করা যে সম্ভব হবে, তা ছিল আমার কল্পনার বাইরে। স্বয়ং ৺পশুপতিনাথই বোধহয় সে সুযোগ করে দিলেন। আই. এ. সি.-র প্লেনে ১৬ই ফেব্রুআরির টিকিট করা হল। পারমিটও পেয়ে গেলুম। তবু সেই যাত্রার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত যেন সব কিছুকেই স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল।

১৬ই ফেব্রুআরি সকাল সাড়ে ছয়টার মধ্যে দমদমে পৌছাই। আমাদের দলটি বেশ বড় ছিল। সাতটা পঞ্চান্নর প্লেন ছাড়লো প্রায় সওয়া আটটায়। আমি জানলার ধারে একটি সিঙ্গল সিটে জায়গা করে নিয়েছিলুম। প্রথম প্লেনে ওঠার উত্তেজনায় অনেক কিছু ঘটার আশা নিয়ে অপেক্ষা করলুম। প্লেন ছাড়লো। আমরা নিশ্চিন্তে ধানবাদ, গয়া, পাটনা পার হয়ে কাঠমাণ্ডুর উদ্দেশ্যে ছুটে চললুম।

নেপালের কাছাকাছি এসে কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি দূরে সারি সারি বরফের চূড়াগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে যেন পাহাড়গুলো আমাদের ঘিরে ধরেছে। এসব চূড়াগুলোর মধ্যেই লুকিয়ে আছে হিমালয়ের ধবলগিরি, মাউন্ট এভারেষ্ট ইত্যাদি গিরিশৃঙ্গ। নেপালের ভেতর ঢুকে নীচে নজরে পড়লো পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে, তলায় তলায় ছোট ছোট বাড়ী। উপর থেকে মনে হচ্ছিল পাহাড়কে যেন কে কোন ধারালো অস্ত্র দিয়ে এমনি ভাবে কেটেছে। সেই খাঁজে খাঁজে কোথাও-বা শস্যের সবুজ প্রলেপ, কোথাও-বা গেরুয়া মাটি। মাঝে মাঝে দুই পাহাড়ের মাঝে সবুজ বনানী। এ বনানী যেমন উন্মুক্ত তেমনি ছলনাময়ী। নিজেকে যেন এরই মধ্যে হারিয়ে ফেলতে সাধ হচ্ছিল। দূরে তুষারের চূড়াগুলো মাঝে মাঝে যেন এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। মুগ্ধ বিস্ময়ে এ দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইলুম। এ যেন কোথায় কি রঙ দিলে সার্থক হবে প্রকৃতিদেবী সমস্ত বিচার করে তবে তুলি বুলিয়েছেন। এ দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল যদি এ সবের সঙ্গে একাত্মতার উপলব্ধি জাগতো, না জানি সে অনুভূতি নিয়ে আসতো কি বিপুল আনন্দ, কি স্নিগ্ধ মাধুর্য! এই বিরাটত্বের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে যেন নূতন করে দেখতে পেলুম। তাই কাঠমাণ্ডু স্পর্শ করবার আগে মহিমময় হিমালয়কে বার বার প্রণাম জানালুম।

সওয়া এগারোটা নাগাদ আমরা এয়ার-পোর্টে পৌছালুম। নেপালের এয়ারপোর্ট খুব বড় নয়। কাস্টামস থেকে মুক্তি পেতে প্রায় এক ঘণ্টার উপর লেগে গেল। বাইরে আমাদের জন্য একটি গাড়ী আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। মালপত্র সমেত আমরা বারজন বসলুম। এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে আমাদের হোটেলের উদ্দেশ্যে গাড়ী ছুটে চললো। দুপাশে বসতি নেই প্রায়ই; পাহাড়ী রাস্তা আর সবুজের সমারোহ। এখানে এ রাস্তাকে বলে চৌহর। খানিক দূর গিয়েই দূর হতে ৺পশুপতিনাথের সোনার চূড়া স্পষ্ট হল। তার চারি পাশে ঘন বসতি। তবে মন্দিরের রাস্তা অন্য।

মন্দিরের চূড়া পিছনে ফেলে আমরা এগিয়ে এলুম সহরের দিকে। এবার দূর হতে চোখে পড়লো নেপালের 'ধারারা' আর 'ঘণ্টাঘর'। ধারারা আমাদের কলকাতার মনুমেণ্টের মত। সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠবার বন্দোবস্ত আছে। আর ঘণ্টাঘরে সময় জানানো হয়। এইবার দিল্লীবাজার, বাগবাজার আর টুণ্ডিখেল দিয়ে আমরা এসে ঢুকলুম একেবারে সহরের মধ্যে। ঠিক ঢোকবার মুখে সিমেণ্টের এক প্রকাণ্ড গেট। তারই ভিতর দিয়ে আমরা এসে গেলুম নূতন কাঠমাণ্ডুর একেবারে প্রাণকেন্দ্রে। দু'ধারে অজস্র দোকানপাট। জামাকাপড়, ষ্টেশনারী, রেডিও, ঘড়ি, পশম ইত্যাদির দোকান যেন দুপাশে সারি দিয়ে সাজানো হয়েছে। তাদের চাকচিক্য কলকাতার চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। আমাদের হোটেল সহরের উপরে অবস্থিত। রাস্তার নাম 'যুদ্ধ সড়ক', ইংরাজীতে বলে 'নিউ রোড'। রাস্তা বেশ ভাল ও চওড়া। আমাদের হোটেল একেবারে চৌমাথায়। এই যুদ্ধ সড়ক নাম নিয়েই ঐ রাস্তা সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। কাঠমাণ্ডু এখনও গড়ে উঠছে, তার কাজ এখনও শেষ হয়নি।

হোটেল একেবারে রাস্তার উপর। ঘর পছন্দ হল সকলেরই। কিন্তু জলে যখন হাত দিলাম, চমকে উঠতে হল—কনকনে ঠাণ্ডা। জলে এত বেশী লোহা যে, সাবান দিয়ে হাত ধুতে চার-পাঁচ মগ জল লাগে। ততক্ষণে হাত ঠাণ্ডায় সাদা হয়ে যায়। তবু জল দেখে আশ্বস্ত হলুম। শুনেছিলুম নেপালে খুব জলের কষ্ট।

সন্ধ্যায় আমরা ৺পশুপতিনাথ দর্শনে বের হলুম। কিন্তু খানিক দূর এসে আমাদের থামতে হল। শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে রাস্তার দু'পাশে দোকানপাট বসতে শুরু হয়েছে, যাত্রীসংখ্যাও বেড়েছে; তাই ভেতরে আর গাড়ী যেতে দিল না। আমরা হাঁটতে লাগলুম অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে। সেদিন কি কারণে জানি না রাস্তা খুব অন্ধকার ছিল। মাঝে মাঝে রাস্তার আলো চোখে পড়ছিল বটে। দূরে দূরে যাত্রীদের আগুনের শিখাও চোখে পড়ছিল। অনেক যাত্রী, সাধুসন্তের ভীড় দেখলুম। সেই ঠাণ্ডায় প্রায় গরম জামাকাপড় ছাড়াই তাঁরা বসে আছেন। আমরা তো এদিকে ওভারকোটের তলায়ও শীতে কাঁপছিলুম।

মন্দিরে পৌঁছে ফুলের ডালি নিয়ে ভেতরে ঢুকতে গিয়ে প্রথমে চোখে পড়লো দরজার গায়ে লেখা 'শুধুমাত্র হিন্দুদের প্রবেশের অধিকার।' গেট দিয়ে ঢুকেই সামনে বিরাট চত্বর। চত্বর পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ৺পশুপতিনাথের মন্দিরে যেতে হয়। তাঁর মন্দিরের সামনে এক বিরাট সোনার ষাঁড়। তার সামনে একটি ছোট ষাঁড়। সেখানে কয়েকজন প্রদীপ বিক্রী করছিল। ছোট ছোট ঘি-ভর্তি গেলাস; তাতে পলতে দেওয়া। আমরা প্রদীপ কিনলুম। কিন্তু সেদিন আটটা বেজে যাওয়ায় ৺পশুপতিনাথের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তার পরের দিন সকালে আমাদের দর্শন হল।

৺পশুপতিনাথের মন্দিরের গড়ন ঠিক আমাদের হিন্দু মন্দিরের মতন নয়। একটু যেন প্যাগোডার ছায়া আছে। তবু এ বৈশিষ্ট্যে অদ্বিতীয়। কারুকার্যখচিত বিরাট মন্দির। উপরের চারিদিকে সোনার পাত, তাতে ঘন কাজ। একেবারে চূড়ায় ৺পশুপতিনাথের ত্রিশূল। ৺পশুপতিনাথের আসল মন্দিরের দরজা চারিটি। কারণ ৺পশুপতিনাথের চার মুখ। প্রতিটি দরজা যেমন ভারী, তেমন সুন্দর তাদের অঙ্গের সৌন্দর্য। বোধহয় সোনার

পাতলা পাত বসানো, কিংবা সোনার জলকরা। উপরে দেওয়ালেও কাজকরা, তাতে ছোট ছোট মূর্তি বসানো। ৺পশুপতিনাথ রেলিং দিয়ে ঘেরা। উপরের অংশ উন্মুক্ত। মন্দিরের চার দোর আগলান চারজন পুরোহিত বা ওখানকার ভাষায় ভট্ট। তাঁদের হাত দিয়েই ঠাকুরের পায়ে পূজা পৌছায়। তাঁদের চেহারা যেমন সুন্দর, ভাবও তেমন শান্ত ও সৌম্য। তাঁদের পরনে লাল টকটকে পোষাক; একেবারে হাতের কবজি পর্যন্ত ঢাকা, তলায় পা পর্যন্ত। মাথায় রুদ্রাক্ষ, গলায় রুদ্রাক্ষ।

৺পশুপতিনাথের মূর্তি অভিনব সন্দেহ নেই। শিবলিঙ্গের চারিদিকে চারিটি মুখ। সোনার চোখ পরানো, নাক, ঠোঁট সবই চিহ্নিত। সকালবেলায় ৺পশুপতিনাথের স্নান হয়। তখন লোকে তাঁর মাথায় বহু সমারোহে দুধ, জল ঢালতে পারে। অবশ্য দরজা থেকে ছুঁড়ে। ফুলও ছুঁড়ে দিতে হয়, কিংবা ভট্টদের হাত দিয়ে তাঁকে অর্পণ করতে হয়। মন্দিরের ভেতরই তাঁর বিরাট ঘণ্টা। সেটা বাজিয়ে তাঁকে সজাগ করে দিতে হয় 'আমি এসেছি' বলে।

সন্ধ্যার সময় ৺পশুপতিনাথ রাজবেশে থাকেন। সে সাজও অপূর্ব। লাল জামা সারা গায়ে। শুধু মুখগুলি উন্মুক্ত। চার মাথায় সোনার ছাতা, সব থেকে উপরে একটি বড় ছাতা। মাথার উপরিভাগ শুধু ফুল দিয়ে ঢাকা। এখানে এক রকম হলদে ফুলের প্রচলন খুব বেশী। এখানে বেলপাতা বিশেষ পাওয়া যায় না। অন্য এক রকম পাতাকে এরা বেলপাতা বলে চালায়। আরতির সময় ৺পশুপতিনাথের চার মুখের সামনেই আরতি হয়। আগুনের আভা লেগে তাঁকে যেন জীবন্ত বলে মনে হয়। ৺পশুপতিনাথের চারিটি মুখেই এই সময় যেন এক দিব্য মহিমা বিরাজ করে। এই সময় কাঁসর-ঘণ্টা আর এক সুমিষ্ট বাদ্যধ্বনি পরিবেশকে আরও মহিমময় করে তোলে। এই মুহূর্তে ৺পশুপতিনাথের মহিমাকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না মনে হয় যেন অনন্তকাল এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর এই অপূর্ব সাজ দেখি। কেমন যেন একটা আবেশে প্রাণ আপনা হতেই স্থির হয়ে আসে। আরতিশেষে দীপশিখা স্পর্শ করার সময় 'ব্যোম ব্যোম' শব্দে আকাশ ভরিয়ে তুলল। আরতি শেষ হবার পরই মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আমরা মন্দির থেকে নেমে এসে ৺শীতলা ষষ্ঠী ও ভৈরবের কাছে গেলুম। মন্দির-প্রাঙ্গণেই তাঁদের আবাস।

৺পশুপতিনাথের মন্দিরের সামনের ঠিক পিছন দিকের দরজার সামনে রাজা মহেন্দ্র হাতজোড় করে ৺পশুপতিনাথকে প্রণাম জানাচ্ছেন; মূর্তিটি সোনা দিয়ে তৈরী; একটু উঁচু করে স্থাপন করা যাতে হাজার পুণ্যার্থীর মাঝেও তিনি ৺পশুপতিনাথ দর্শন করতে পারেন। মূর্তির পাশে একটু ঘেরা জায়গার মধ্যে ছোট ছোট করে নেপালের পূর্বেকার রাজারানীর মূর্তি। তাঁদেরও গায়ের বর্ণ সোনার মত, কি দিয়ে তৈরী জানিনা। তাঁদেরও হাত অঞ্জলিবদ্ধ। এই সকল মূর্তির সামনে খানিকটা অংশ তামা দিয়ে বাঁধিয়ে আলাদা চত্বর করে রাখা হয়েছে। কোন উপলক্ষ্যে ঠাকুরের ভোগের সময় এইখানে ভোগ রাখা হয়। দেখলুম কয়েকজন নারী ও পুরুষ সেখানে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। এর ফলে নাকি পুণ্যলাভ হয়। মন্দিরের গায়েও এক বিরাট ঘণ্টা ঝোলানো আছে। মন্দির প্রদক্ষিণকালে সেই ঘণ্টা বাজাতে হয়।

মন্দির-প্রাঙ্গণে ঢোকবার দরজাও চারিটি। একটি উঠে এসেছে বাঘমতী নদীর ঘাট থেকে।

বিষ্ণুমতী ও বাঘমতী নদীর সংযোগস্থল আরও একটু দূরে। যদিও নামে নদী, তার 'জলের' গভীরতা হচ্ছে ঘটীটুকু ডোবাবার মত। জলের ভিতরে পাথর, নুড়ি, বালি সবই দেখা যায়। জল সুন্দর, স্বচ্ছ ও ঠাণ্ডা। এখানে অনেক পুণ্যার্থীই স্নান করেন। মন্দিরের ছবি তোলা একেবারে নিষিদ্ধ; টুরিস্টরা এখানে ছবি তুলতে চেয়েছিলেন।

৺পশুপতিনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণ ও অতিথিশালা অনেক তীর্থযাত্রীকে আশ্রয় দিয়েছে দেখলুম। শিবরাত্রিতে প্রহরে প্রহরে পশুপতিনাথের পূজা করবার আকাঙ্ক্ষায় অনেকেই সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। অনেক সাধু-সন্ত আগুন জ্বালিয়ে শীতের হাত হতে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করছেন। শিবরাত্রির দিন পশুপতিনাথের শুধুই স্নান হয়। সেদিন আর তাঁর রাজবেশ হয় না। এইদিন আমরা আশা করেছিলুম খুব ভীড় হবে এবং অনেক যাত্রীর মুখেও শুনেছিলুম। অসম্ভব ভীড় হয়েছিল। কিন্তু আমরা রাত্রি নয়টার পর যাওয়ার দরুনই বোধহয় একটুও ভীড় অনুভব করিনি। আমাদের দর্শন ভালই হয়েছিল।

দর্শন শেষ করে পিছনের দরজা দিয়ে আমরা বেরিয়ে এলুম। সেখান দিয়ে যাবার পথে চোখে পড়ল গোলকধাঁধা। খানিকটা স্থান ঘিরে এই গোলকধাঁধার সৃষ্টি করা হয়েছে। তার মাঝে মাঝে শিবলিঙ্গ বসানো রয়েছে। প্রণাম জানিয়ে আমরা ফিরে এলুম।

৺পশুপতিনাথের মন্দিরের সংলগ্ন আর একটি মূর্তি আছেন; তিনি হচ্ছেন 'কলি'। বাঘমতী নদীর ঘাট থেকে ৺পশুপতিনাথের মন্দিরে যাওয়ার রাস্তায় এই 'কলি' দেবতার ছোট্ট ঘর। এই দেবতা আপনা হতে মাটির তলা থেকে আবির্ভূত হচ্ছেন। এখন তিনি উরু পর্যন্ত উঠেছেন। কালো পাথরের সুন্দর মূর্তি। এখানকার সকলেই দেখছেন, এই দেবতা কেমন করে আস্তে আস্তে প্রকাশ হচ্ছেন। এখানকার বাঙালী অধিবাসীরাও এ কথা স্বীকার করলেন। তাঁরাও নিজের চোখে দেখেছেন।

৫১ পীঠের অন্যতম পীঠস্থান এই নেপালে। নেপালে দেবীর জানুদ্বয় পতিত হয়েছিল বলেই প্রসিদ্ধি। কিন্তু এখানকার অধিবাসীরা বলে গুহ্যদেশ এবং সেজন্য দেবীর নামও গুহ্যেশ্বরী। এই দেবীর মন্দির দর্শন না করে ৺পশুপতিনাথ দর্শন করলে তাঁর দর্শনের ফললাভ হয় না। তাই আগে এ মন্দির দর্শন করতে হয়। মন্দির-প্রাঙ্গণও বিরাট। রাস্তা থেকে অনেকটা উপরে এই মন্দিরটি ৺পশুপতিনাথেরই কাছে। দেবীর মন্দিরের চারিদিকে পিতলের সিংহ বসানো আছে; কিন্তু পরিষ্কারের অভাবে ম্লান। মন্দিরের বাইরের অংশ বিরাট। কিন্তু ভিতর সংকীর্ণ। সিঁড়ি দিয়ে নেমে দেবীর কাছে যেতে হয়। এখানে কোন মূর্তি নেই। খানিকটা স্থান চৌকা করে বাঁধানো, সেখানে দেবীর অঙ্গ ঢাকা আছে। বাঁধানো অংশটি সোনার বলে মনে হল। তাতে সামান্য কারুকার্য। তার সামনে একটি ছোট গর্ত; তার উপরে সোনার কৌটার মত একটি জিনিস বসানো। যাত্রীরা গেলে সেই কৌটাটি তুলে দেখানো হয়। সেই গর্তটি গাঢ় গোলাপী রঙের সুগন্ধি জলে ভর্তি। এই জল সকলে স্পর্শ করে, গায়ে মাথায় দেয়। এই জল কখনও বাড়ে না, কখনও কমে না। কোথা হতে এই জল আসে, কেউ তা জানে না। পুরুষানুক্রমে এখানকার পুরোহিতরা এই জল দেখে আসছেন। তবে এখানে কোন মূর্তি নেই বললে মিথ্যা বলা হবে; পীঠস্থানের ৺কালী মূর্তি হিসাবে একটি ছোট মেটে রঙের মূর্তি

দেওয়ালে লাগানো আছে। কিন্তু তা এতই ছোট যে, মূর্তি কেমন তা বলা শক্ত। এখানেও মন্দিরের সামনে নেপালের বর্তমান রাজা ও রানীর অঞ্জলিবদ্ধ ব্রোঞ্জের মূর্তি আছে।

নেপালের আর একটি তীর্থস্থান 'দক্ষিণ কালী'। নেপালের দক্ষিণে এঁর অবস্থান-হেতু এই নামের উৎপত্তি। পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরী হয়েছে। এ রাস্তার সঙ্গে ডেরাডুন হতে মুসৌরী যাবার রাস্তার খুব সাদৃশ্য আছে। তবে এ রাস্তা ভীষণ খারাপ, খুব বিপজ্জনক। যে কোন মুহূর্তে গাড়ী উল্টে যাবার সম্ভাবনা আছে। এখানে অ্যাক্সিডেন্টের সংখ্যাও খুব। গাড়ী চললে গাড়ীর মধ্যে স্থির হয়ে বসে থাকা যায় না। মাঝে মাঝে আবার এ রাস্তা এত খারাপ হয়ে যায় যে তখন গাড়ী চলা বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তার নাম 'কাঠমাণ্ডু দক্ষিণ কালী রোড'। গাড়ী মন্দির অবধি যায় না, উপরে থাকে। মন্দিরে যেতে গেলে অনেকটা নীচে নামতে হয়। দক্ষিণ কালী নেপালের খুব বিখ্যাত ও জাগ্রত দেবী। এখানকার অধিবাসী-দের বিশ্বাস দেবীর কাছে যা প্রার্থনা জানানো যায়, তাই পূর্ণ হয়। এখানে দেবীর মন্দির নেই। খানিকটা অংশ ঘেরা; তার মধ্যেই দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো মেটে রঙের দেবীর মূর্তি। এ মূর্তিরও বর্ণনা দেওয়া শক্ত। ছোট একটি মূর্তি, আমাদের মা-কালীর মূর্তির মত নয়। তবে চার হাত; কিন্তু প্রহরণ বোঝা যায় না, কিংবা প্রহরণ নেই। তাই মূর্তির সাজসজ্জা একেবারেই নেই। শুধু সিঁদুরই বৈশিষ্ট্য দেবার চেষ্টা করে। কাঠমাণ্ডুর টুণ্ডিখেলের পাশে ৺ভদ্রকালীর মূর্তিও ঠিক এই রকম। এখানেও পূজার ডালি পাওয়া যায়। ফুল, মিষ্টি, চাল, সিঁদুর আর লাল পাড় কাপড়ের বদলে লাল পাড় সাদা কাপড়ের টুকরো। লোহা, আলতা-পাতা ইত্যাদি আমরা দিলুম। ওখানকার পুরোহিত প্রত্যেকের পৃথকভাবে পুজো করলেন। আমরা মায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম জানালুম। কিন্তু খুব সন্তর্পণে। মায়ের কাছে এত বলি হয় যে চারিদিক বলির রক্তে মাখা-মাখি। দেওয়ালের গা বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, পুরোহিত এবং ওখানে যত জন উপস্থিত ছিলেন প্রত্যেকের জামা রক্তের ছিটেতে নূতন বর্ণ ধারণ করেছে। পূজার জায়গায়ও রক্ত। আমরা অবশ্য রক্ত বাঁচাবার চেষ্টা করলুম; কিন্তু ওখানের অধিবাসীদের বিশ্বাস এই রক্তের স্পর্শ সৌভাগ্যের পরিচায়ক। ওখানকার মুরগি-বলি আর এক বৈশিষ্ট্য। দেবীর পূজার ডালিতে হাঁসের ডিম পূজা দেওয়াও এখানকার রীতি। কিন্তু আমরা তা দিইনি। পূজা হয়ে যাবার পর পুরোহিত সেই লাল কাপড়ের অংশ টুকরো করে করে আমাদের গলায় বেঁধে দিলেন। পূজার দক্ষিণা দেওয়ার ব্যাপারে এঁরা কোন রকম জেদাজেদি করলেন না। দক্ষিণ কালীর মন্দিরের পাশ দিয়ে একটি ঝরণা বয়ে গেছে। সেই ঝরণার জলও খুব ঠাণ্ডা।

নেপালের আর একটি দর্শনীয় স্থান 'বুঢ়া নীলকণ্ঠ' বা 'নারায়ণস্থান'। এটি নেপালের উত্তরে অবস্থিত। 'নারায়ণস্থানে' নারায়ণই সবচেয়ে আকর্ষণীয়। মাঝারি একটি জলাশয়, তার চারি দিকে ঘেরা। একটিমাত্র দরজা দিয়ে জলে নামতে হয়। সেই জলাশয়ের মধ্যে নারায়ণ জলে শুয়ে আছেন। বিরাট কালো পাথরের মূর্তি। অনেকটা কারণসলিলে অনন্তশয্যায় বিষ্ণুর মূর্তির সঙ্গে মিল আছে। বিষ্ণুর চারি প্রহরণ, মাথায় অনন্ত নাগ। মুখে এক অপূর্ব স্বর্গীয় হাসি। একটিমাত্র পাথর কেটে এই বিরাট মূর্তি নির্মাণ করেছেন কোন এক অজ্ঞাত শিল্পী।

এক কৃষকের লাঙ্গলের ফলায় এই মূর্তি উঠেছিলেন। কে এর নির্মাতা, কবে এটি নির্মিত হয়েছিল তা আজও অজ্ঞাত। কিন্তু কি জীবন্ত আর কি চকচকে এই শিল্প-সৌন্দর্য! শ্রীবিষ্ণুর মুখে যেন গ্রীক ভাস্কর্যের ছাপ। জানিনা, কোন্ মহান শিল্পী ভগবানের কত করুণা লাভ করার পর এই সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন!

'নারায়ণস্থান' থেকে ফেরবার পথে আমরা এলুম 'বালাজু ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সহরে'। এইখানে নেপালের বড় বড় ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে উঠেছে। তারই মাঝে 'বাইশ ধারা'কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে একটি সুদৃশ্য পার্ক। এই 'বাইশ ধারা'র কোথা হতে উৎপত্তি কেউ জানে না। বাইশটি মুখ দিয়ে অবিশ্রান্তভাবে জলধারা বয়ে যাচ্ছে। আর জলও স্বচ্ছ এবং শীতল। তারই আর এক পাশে দ্বিতীয় নারায়ণের সৃষ্টি করা হয়েছে। রাজা স্বয়ং নারায়ণ; যেখানে সকলে নারায়ণের পূজা করে, তিনি নিজে নারায়ণ হয়ে সেখানে পূজা করতে পারেন না। তাই এই দ্বিতীয় নারায়ণের সৃষ্টি করা হয়েছে। এখানে রাজা আসেন পূজা করতে। এরও শিল্প-সৌন্দর্য অস্বীকার করা যায় না।

এর পর আমরা এলুম 'স্বয়ম্ভু'র মন্দিরে। এই মন্দিরে আসতে গেলে পুরানো কাঠমাণ্ডুর ভিতর দিয়ে আসতে হয়। পুরানো কাঠমাণ্ডু ঘিঞ্জী, একটু অপরিষ্কার। নীচে গাড়ী রেখে আমরা পাহাড়ের উপরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলুম। মন্দিরের কাছে এসে নজরে পড়লো দেওয়ালের গায়ে জাপানের যুবরাজ ও যুবরানীর সম্বর্ধনা-বাণী। 'স্বয়ম্ভু'র মন্দির বুদ্ধদেবের মন্দির। বিরাট মন্দির; দর্শনীয় বস্তু সন্দেহ নেই। এ মন্দিরের চূড়াও সোনার তৈরী। মন্দিরের সামনে বৌদ্ধ স্তূপ রয়েছে। মন্দিরের দরজায় পর্দা মেলা ছিল, বোধহয় রৌদ্রের জন্য। জুতো পরে ঢুকবো কিনা ভাবছিলুম, কারণ দেখলুম সকলেই জুতা পরে রয়েছে। টুরিস্টদের সঙ্গে একজন গাইড ছিলেন, তিনি আমার ইতস্ততঃ ভাব দেখে জুতা পরে ঢুকতে বললেন। পর্দা সরিয়ে ভিতরে গেলুম। বাজনার আওয়াজ বাইরে থেকে শুনতে পাচ্ছিলুম। ভিতরে ঢুকে অবাক হলুম। বুদ্ধদেবের বিরাট মূর্তি; সুন্দর, শান্ত, সৌম্য। তাঁর চারপাশে প্রদীপ জ্বলছে; ছোট্ট ছোট্ট ঘি-ভর্তি গেলাস। সেই ভাল ঘিয়ের গন্ধে আর ধূপের গন্ধে এক মনোরম পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছে। একদিকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা মুণ্ডিত মস্তকে সারিবদ্ধভাবে পূজায় বসেছেন। কয়েকজন মন্ত্র পাঠ করছেন, কয়েকজন ড্রাম-জাতীয় এক রকম বাজনা বাজাচ্ছিলেন। তাঁরা নাকি এই সঙ্গে চা পানও করেন। প্রতিদিন এই সময় এই রকম আড়ম্বরসহকারে বুদ্ধদেবের পূজা হয়। তাঁদের এই অদ্ভুত পূজাপদ্ধতি টুরিস্টদের খুব উৎসাহিত করেছিল। তারা অনেকক্ষণ ধরে ফটো তুলছিলেন। আমরাও এই পূজাপদ্ধতিতে একটু বিস্মিত হয়েছিলুম। তবে যত বিদেশে যাওয়া যায় ততই বিভিন্ন পূজারীতি চোখে পড়ে। প্রত্যেকেই সেই পূজার মধ্যে দিয়েই তাঁর দেবতার কাছে পৌঁছে যান। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা মনে পড়ল, "যত মত তত পথ।"

আমাদের যে কোন তীর্থস্থানের মত অলিতে গলিতে এখানেও অনেক মন্দির আছে। এখানে বুদ্ধদেবের আর একটি মন্দির আছে, নাম 'মহিন্দর মন্দির'। এটি একেবারে কাঠমাণ্ডুর ভিতর। 'ভগবানের মন্দির' নাম দিয়ে এখানে একটি হনুমানের মন্দিরও আছে। তবে এখানে বৌদ্ধদের সঙ্গে হিন্দুদের বিরোধ নেই। স্বয়ম্ভুর মন্দিরে 'লছমী মায়ের' মূর্তি আছে। এটি দেখিয়ে একটি ছোট মেয়ে পয়সা চাইছিল। নেপালের সব কটি তীর্থ দর্শন করে আমার মনে

হল যে, মন্দিরের পবিত্রতা সম্বন্ধে এরা খুব বেশী সজাগ নয়। তবে এদের পবিত্রতার ধারণাও অন্য রকম। প্রথমতঃ এরা ঠাকুরকে সব কিছুই ভোগ দেয়, খাদ্যের বাছবিচার নেই। দ্বিতীয়তঃ একমাত্র পশুপতিনাথের মন্দির ছাড়া সব জায়গাই মাসে বোধ হয় একবারও পরিষ্কার হয় কিনা সন্দেহ। শীতের দেশ বলে এরা নিজেরাও খুব বেশী পরিষ্কার নয় এবং অপরিষ্কারের পরিবেশে থাকতেও এদের কষ্ট হয় না। তবে ঠাকুরদেবতায় এদের অগাধ বিশ্বাস। এরা বিশ্বাস করে পশুপতিনাথের কাছে চাইলে সকল প্রার্থনা পূর্ণ হয়; পশুপতিনাথ, দক্ষিণ কালী, নারায়ণ তাদের কাছে পরম জাগ্রত দেবতা। পশুপতিনাথে বিশ্বাস এদের জীবনের মেরুদণ্ড। এখানকার বাঙালী অধিবাসীরাও এখানে থাকতে থাকতে এই বিশ্বাস কিছুটা আয়ত্ত করেছেন, আমার ধারণা। তাঁদের কথাবার্তায় আমি সেই রকম আভাস পেয়েছি। তাঁদের বিশ্বাস নেপালে কোন জিনিস হারায় না, চুরি যায় না, মানত করলে ঠাকুর ঠিক ফিরিয়ে দেন।

এখানে রাজাকেও লোকে শ্রদ্ধা করে। প্রায় প্রতিটি দোকানে রাজারানীর ছবি দেখলুম। রাজার দর্শনলাভে সবাই উৎসুক। কোন বিশেষ উপলক্ষ্যে রাজা দর্শন দেন। রাজা শিবরাত্রির দিন সকালে ৺পশুপতিনাথ দর্শন করেছিলেন। শিবরাত্রির দিন এখানে সব জায়গায় ছুটি থাকে। কিছুদিন আগেই রাজার এক মেয়ের বিবাহ হয়েছে। তার রেশ তখনও চলছিল। বিজয়া দশমীর দিন রাজা তাঁর দর্শনার্থীদের নিজহাতে তিলক এঁকে দেন। এই তিলকলাভের জন্য খুব ভীড় হয়। নেপালের লোকেরা যদিও খুব দরিদ্র তবু তাদের মধ্যে একটা আনন্দ আছে, তাদের মধ্যে কর্ম-চাঞ্চল্য আছে। তারা কাজ করতে বিরক্ত হয় না। এরা সৎ, এদের ব্যবহারও ভদ্র।

নেপালের বাজার ভারতীয় জিনিসে আজ ছেয়ে আছে। কাপড়, ষ্টেশনারী, চকলেট, হরলিকস, কফি ইত্যাদি যা কিছুতেই হাত দেওয়া যায় সবই শুনি ভারতীয়। তারপর আছে চীনের আর জাপানের জিনিস। নেপালে একমাত্র পশম ছাড়া কিছুই বিশেষ তৈরী হয় না। আমাদের একশত টাকা নেপালের একশো ষাট টাকা। জিনিসপত্রের দাম একটু বেশী। তবে খাবার-জিনিসপত্রের সুবিধা ওখানে বেশ ভালই আছে। চাল এবং ঘি এখানে বেশ ভাল পাওয়া যায়। ফলটা খুব ভাল নয়। কাঁচা লঙ্কা দুষ্প্রাপ্য। আমিষের মধ্যে ডিমের দাম বেশী। এখানে ক্ষীরের মিষ্টি ভালই পাওয়া যায়। বাঙলার বাইরে যে এত ভাল রসগোল্লা পাওয়া যায়, এখানে না দেখলে বিশ্বাস করতুম না।

এখানকার সমাজজীবনেও আধুনিকতার হাওয়া লেগেছে। এখানে স্কুল, কলেজ, ইউনিভারসিটি গড়ে উঠেছে। লেখাপড়ার প্রচলন বেশ বেড়েছে। সিনেমা-হলও বেশ কয়েকটা আছে। হিন্দী গান ও সিনেমা এখানে খুব জনপ্রিয়। রাজা নিজে একজন বিখ্যাত গীতিকার। নেপালী গান দূর থেকে শুনলে বাংলা গান বলে ভুল হয়। এখানকার মিউজিয়ামে নেপালী সংস্কৃতির কিছু নিদর্শন আছে। তবে পূর্বেকার রাণাদের পোশাক ও অস্ত্রশস্ত্রের নিদর্শনই বেশী।

এবার ফেরার পালা। চারটের সময় আমাদের প্লেন এসে গেল। আমাদের যাত্রা শুরু করতে চারটে দশ মিনিট হয়ে গেল। পশুপতিনাথকে স্মরণ করে আকাশে উঠলাম। নীচের ছোট ছোট বাড়ী, খেলনার মত বাস, লরী, এক আঙ্গুলের মত মানুষ সব কিছু ফেলে রেখে আমাদের প্লেন উঠে গেল একেবারে মেঘের রাজ্যে। আমরা মেঘের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছি। চারিদিকে আর অন্য কিছু নেই। মাঝে মাঝে যখন মেঘ একটু হাল্কা হচ্ছে তখন দূরে দেখা দিচ্ছে একটা নীল আভা, আর চিরতুষারমণ্ডিত হিমাচলের শুভ্র শির—যেন ধ্যানমগ্ন মহাদেব আমাদের আশীর্বাদ করছেন নীরবে।

কর্ম ও সংস্কার

শ্রীযোগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়

যাহা করা যায় তাহাই কর্ম; কর্ম বলতে তার সঙ্গে ফলও বুঝায়। কায়, মন ও বাক্যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়। কর্ম প্রধানতঃ দু'রকম—অর্থকর্ম ও গুণকর্ম। যে কর্মে অপূর্বতা সাধিত হয় (দেব- ও পিতৃ-কার্যাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, তাহাই অপূর্ব) তাহা অর্থ-কর্ম; যেমন দুর্গোৎসব। আর যাতে বস্তুর সংস্কার সাধিত হয়, তাকে গুণকর্ম বলে; যেমন কোন কোন কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় এবং তার ফলে মুমুক্ষুত্ব, বিবেক এবং শেষে মুক্তিও হয়। শাস্ত্র বলেন—

"কর্মণা চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ তয়া তীব্রা মুমুক্ষুতা।
ততো বিবেকাৎ মুক্তিঃ স্যাৎ কর্ম ত্যাজ্যং
কথং ভবেৎ ॥"

ঈশ্বরলাভের জন্য যেসব কর্ম বা সাধনা প্রয়োজন, সকল লোকেই তা করা সম্ভব হয় না; যেখানে সেসব কর্ম বা সাধনা করা সম্ভব তারই নাম কর্মভূমি—সেটাই মনুষ্যলোক। ঈশ্বরলাভের জন্য (মোক্ষের জন্য) সাধনা একমাত্র মনুষ্যজন্মেই সম্ভব; অন্য কোন লোকে সম্ভব নয়। সেইজন্য মোক্ষলাভেচ্ছু হ'লে দেবতাদেরও এই কর্মভূমিতে আসতে হয়। দেবতা- ও পশ্বাদি-দেহ ভোগের জন্য মাত্র—সে দেহে কর্ম হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন:

সংসার কর্মভূমি। কর্ম করতে করতে জ্ঞান হয়, আর মনের ময়লা কেটে যায়। কিন্তু ভোগের ইচ্ছা থাকলে হয় না; বিষয়তৃষ্ণা, কামনা থাকলে, মন বাসনারহিত হ'য়ে শুদ্ধ না হ'লে সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না। তাই সংসারের নানা কর্মের ভিতরেও মুহূর্তের জন্য তাঁকে ভুললেই বিপদ। সেইজন্য সংসারে থেকেও মনে রাখতে হবে, সংসার-ভাব যেন মনে না থাকে। জলে নৌকা থাকুক, কিন্তু নৌকার ভিতরে যেন জল না থাকে। সকল কর্ম করেও মনটি যেন ঈশ্বরে পড়ে থাকে। তার একমাত্র উপায় সব সময় মনে ভাবা—'টাকা, বাড়ী-ঘর, পরিবার এসব কিছুই আমার নিজের নয়, সবই ঈশ্বরের; আমি তাঁরই কর্মচারীরূপে কাজ করছি।' অভ্যাস চাই, আর হুঁশিয়ার হওয়া চাই, তবে এ ভাব রাখা যায়।

এখানে কর্ম করতে আসা; যেমন দেশে বাড়ী, কলকাতায় গিয়ে কর্ম করে। কিছু কর্ম দরকার—সাধন। কর্মগুলি তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে নিতে হয়। খুব রোক চাই—তবে সাধন হয়; দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

ভগবান গীতায় (৮।৩) কর্মের সংজ্ঞা বলেছেন—'ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম-সংজ্ঞিতঃ' অর্থাৎ ভূতসকলের (জরায়ুজাদি প্রাণিগণের) ভাব (উৎপত্তি) ও উদ্ভব (বৃদ্ধি) সম্পাদনকারী যে বিসর্গ (দেবোদ্দেশে দ্রব্য-ত্যাগরূপ যে যজ্ঞ)—তারই নাম কর্ম। তাই যজ্ঞার্থে কর্মই শ্রেষ্ঠ কর্ম।

কর্মের ফল আছেই; যেভাবে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, ফলও সেরূপই হয়। মানুষ সংসারে জন্মগ্রহণ ক'রে অহংবুদ্ধিতে যে সকল শুভাশুভ কর্ম করে, তা থেকে তিন রকম কর্ম-

সংস্কার জন্মায়—সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ বা ভবিষ্যৎ এবং প্রারব্ধ। এই সকল কর্মসংস্কার চিত্তের গভীর দেশে সঞ্চিত থেকে ধীরে ধীরে জন্ম-জন্মান্তরে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৃষ্টি ক'রে ফলদান করে। এ জন্মে যে সকল কর্মের ফলভোগ বাকী থাকে সেই সব অভুক্ত কর্মসংস্কারকে 'সঞ্চিত' কর্মসংস্কার বলে। প্রতি জন্মে মানুষ নূতন নূতন বাসনার বশে যে সকল কর্ম করে তার সংস্কারকে 'ক্রিয়মাণ বা ভবিষ্যৎ' কর্মসংস্কার বলে। আর 'সঞ্চিত' এবং 'ভবিষ্যৎ' এই উভয়প্রকার সংস্কারের মধ্যে যে সংস্কারগুলি প্রবলতর হ'য়ে চিত্তের উপর দিকে ভেসে থাকে প্রথমেই তদনুরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থাযুক্ত দেহ নবজন্মে লাভ করায় তাদের নাম 'প্রারব্ধ' কর্মসংস্কার। মৃত্যুর পূর্বে বলবত্তম সংস্কারগুলিই চিত্তকে বিশেষভাবে আশ্রয় ক'রে মানবের প্রারব্ধরূপে তদনুরূপ পরজন্ম প্রদান করে। এই সংস্কারটি যে দেহে জন্মের যোগ্য (দেব, মনুষ্য বা পশ্বাদি) তদনুরূপ দেহেই জন্ম হবে প্রারব্ধের গুণে।

নিজ পুরুষকার-বলে মানুষ মন্দ সংস্কার-গুলির বেগ নষ্ট ক'রে শুভ সংস্কারের উৎকর্ষ সাধন করতে পারে এবং এভাবে উন্নততর সংস্কার লাভ করলে তাকে আর নিম্নতর যোনিতে জন্মাতে হয় না। ক্রমোৎকর্ষ দ্বারা তার সংস্কারগুলির বেগ নষ্ট ক'রে বিনাশ করতে পারলে সে অতি সহজেই মুক্তিপথে এগিয়ে যেতে পারে। বিহিত ও শুভ কর্ম বিবেকশক্তি-বলে সুষ্ঠুভাবে ক'রে যেতে পারলে জীবন্মুক্তিও লাভ করতে পারে।

জীবন্মুক্তিলাভ মানে কি? জীবন্মুক্ত কে? ব্রহ্মকে যিনি এ জীবনেই সাক্ষাৎকার করেছেন, কিন্তু ব্রহ্মলাভ, ব্রহ্মসুখ ও ভূমানন্দ অনুভব করা সত্ত্বেও যাঁর প্রারব্ধ ক্ষয় হয়নি তিনিই জীবন্মুক্ত। যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে সাক্ষাৎকার ক'রে, সকল বন্ধনমুক্ত হ'য়ে ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়েছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত।

জীবন্মুক্ত পুরুষ রক্তমাংসযুক্ত এই দেহ দ্বারা, সহজে পরিণামী ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা এবং শোক-মোহাধীন অন্তঃকরণ দ্বারা কর্ম করেন বটে, কিন্তু তিনি জানেন যে কর্মজনিত সুখ-দুঃখ সত্য নয়; যেমন বাজিকর জানে ইন্দ্রজাল সত্য নয়। তাই বলা হয়, জীবন্মুক্ত পুরুষের চোখ-কান, মনপ্রাণ যেন থেকেও নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'পরশমণি ছোঁয়ালে লোহার তলোয়ার সোনার তলোয়ার হ'য়ে যায়; তলোয়ারের আকার থাকে, অথচ তার দ্বারা অনিষ্ট হয় না—হিংসার কাজ হয় না।' জীবন্মুক্ত পুরুষের অশুভ সংস্কার সব নষ্ট হ'য়ে যায় ব'লে তাঁর যথেচ্ছা-চরণে প্রবৃত্তি হয় না—'কখনো বেতালে পা পড়ে না।' কোন কার্যের অনুষ্ঠান ক'রে বা না ক'রে তাঁর অহঙ্কারও হয় না, বুদ্ধিও লিপ্ত হয় না।

জীবন্মুক্তের লক্ষণ সম্বন্ধে "শ্রীশ্রীকালী কুণ্ডলিনী" বলেন—জীবন্মুক্ত বন্ধনহীন; যোগ-রাজ্যে তিনি সমাধিস্থ; ভাবরাজ্যে নির্বিশেষ ব্রহ্মবুদ্ধি; কর্মরাজ্যে তাঁর মন আত্মসুখ-নির্বাসনা; ভক্তিরাজ্যে ইষ্টপদে তন্ময়; শুদ্ধাচারী, নির্মলহৃদয়, ভগবানে স্থিরবিশ্বাসী; জগতের নশ্বরতায় উপলব্ধিমান; মায়িক বন্ধনহীন, ইন্দ্রিয়-ভোগেচ্ছাহীন, বৈরাগ্যবান এবং ভক্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: মায়ার আবরণ গেলেই জীবন্মুক্ত। যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্তা' এই বোধ হ'য়ে গেল তা হ'লেই জীবন্মুক্ত হ'য়ে গেল। তার আর ভয় নাই। 'তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি'। ঈশ্বরের

শক্তিতে সব শক্তিমান—জ্বলন্ত কাঠ টেনে নিলে সব চুপ! এ কথা শুধু জানলে হবে না—বোধ হওয়া চাই। ঈশ্বর আছেন, তাঁর ইচ্ছায় এ সমস্ত হচ্ছে, বিষয়ীরা শোনে—শুধু শুনেই রাখে, বিশ্বাস করে না।

'কালীর ভক্ত জীবন্মুক্ত নিত্যানন্দময়'। তার দেহাত্মবুদ্ধি চ'লে যায়; দেহের সুখদুঃখে তার সুখদুঃখ বোধ হয় না—সে দেহের সুখ চায় না। জীবন্মুক্ত হ'য়ে বেড়ায়।

কর্মের ফল অবশ্যম্ভাবী; সকাম কর্মের ফল ভোগ করতে হবেই। তাই কর্মই জীবের বন্ধনের হেতু; কর্মই জীবকে পুনঃ পুনঃ ভোগ করাবার জন্য প্রারব্ধরূপে জন্মমৃত্যুর কারণ হ'য়ে থাকে। বস্ত্রের মত জীবের ভোগ-দেহটিও সূত্র দিয়ে তৈরী। এ সূত্র হচ্ছে কর্মসূত্র। জীবদেহরূপ বস্ত্রের 'টানা'র সুতো হচ্ছে তার পূর্ব পূর্ব জন্মার্জিত সংস্কাররূপ প্রারব্ধ—যার ভোগ এখনো বাকী আছে। নির্লিপ্ত ব্যক্তিকেও সংস্কারবশে কর্মফল বা প্রারব্ধ ভোগ করতে হয়। আবার এই প্রারব্ধভোগের সঙ্গে সঙ্গে জীবকে সতত নূতন কর্মও করতে হয়; সেই নূতন কর্মরূপ সূত্রগুলিও কখনো বা আসক্তিরূপে (মোক্ষের প্রতিকূল), আর কখনো আসক্তির প্রতিকূলে থেকে জীবের ভোগদেহরূপ বস্ত্রের 'পড়েন'-এর সুতোরূপে সেই বস্ত্রকে 'পাতলা' বা 'খাপী' ক'রে তুলছে। শাস্ত্র বলেন—পূর্ণ জ্ঞান হ'লে জীবের সঞ্চিত ও আগামী কর্মের ক্ষয় হয়, কিন্তু প্রারব্ধ-ভোগ জ্ঞানলাভ হ'লেও করতে হয়। যে অহঙ্কারে নিজে কর্তা সেজে বসে, তার প্রারব্ধ ক্ষয় না হ'য়ে বরং বৃদ্ধিই হয়; কারণ তার সঞ্চিত এবং আগামী কর্মও ক্ষয় না হ'য়ে প্রারব্ধরূপে তার কর্মবন্ধনকে আরও দৃঢ় করে।

মায়ের কৃপায় প্রারব্ধনাশ নানা ভাবে হয়; কতক ভোগের ভিতর দিয়ে, কতক সংযমের ভিতর দিয়ে, আবার কতক অন্যভাবে বিলীন হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: যার যা কর্মের ভোগ আছে, তার তা করতে হয়। উত্থান পতন, সম্পদ দারিদ্র্য, এ সব কর্মের ভোগ। সংস্কার, প্রারব্ধ—এ সব মানতে হয়।

সুখদুঃখ দেহধারণের ধর্ম। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে, কালুবীর জেলে গিছিল; তার বুকে পাষাণ দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু কালুবীর ভগবতীর বরপুত্র। দেহধারণ করলেই সুখ-দুঃখ-ভোগ আছে।

শ্রীমন্ত বড় ভক্ত; আর তার মা খুল্লনাকে ভগবতী কত ভালবাসেন। সেই শ্রীমন্তের কত বিপদ! মশানে কাটতে নিয়ে গিছিল।

একজন কাঠুরে পরম ভক্ত, ভগবতীর দর্শন পেলে; তিনি কত ভালবাসলেন, কত কৃপা করলেন। কিন্তু তার কাঠুরের কাজ আর ঘুচলো না। সেই কাঠ কেটেই খেতে হবে। কারাগারে চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবান দেবকীর দর্শন হ'ল, কিন্তু কারাগার ঘুচলো না।

এ সব প্রারব্ধ কর্মের ভোগ; যে ক'দিন ভোগ আছে দেহধারণ করতে হয়। একজন কানার গঙ্গাস্নান ক'রে সব পাপ ঘুচে গেল; কিন্তু কানা চোখ ঘুচলো না। পূর্বজন্মের কর্ম ছিল, তাই ভোগ।

প্রারব্ধের জন্য মনে করলেই ত্যাগ করা যায় না। একজন রাজাকে একজন যোগী বললে, তুমি আমার কাছে থেকে ভগবানের চিন্তা কর। রাজা বললে, আমি থাকতে পারি; কিন্তু আমার এখনো ভোগ আছে। এ বনে যদি থাকি, হয়তো বনেই একটা রাজ্য হ'য়ে যাবে।

তবে তাঁর চিন্তা করলে, তাঁর নাম করলে, তাঁর শরণাগত হ'লে কর্মপাশ অনেকটা কেটে যায়।

পূর্বজন্মের সংস্কার মানতে হয়। শুনেছি একজন শবসাধন করছিল, গভীর বনে ভগবতীর আরাধনা করছিল। কিন্তু সে অনেক বিভীষিকা দেখতে লাগলো; শেষে তাকে বাঘে নিয়ে গেল। আর একজন বাঘের ভয়ে নিকটেই একটা গাছে উঠে বসেছিল। শব আর অন্যান্য পূজার উপকরণ তৈয়ার দেখে, সে নেমে এসে আচমন ক'রে শবের উপর ব'সে গেল। একটু জপ করতে করতে মা সাক্ষাৎকার হলেন ও বললেন—'আমি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি, বর নাও।' মা'র পাদপদ্মে প্রণত হয়ে সে বললে—'মা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। সে ব্যক্তি এত খেটে, এত আয়োজন ক'রে, এতদিন ধ'রে তোমার সাধনা করছিল, তাকে তোমার দয়া হ'ল না! আর আমি—কিছু জানি না, শুনি না, ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন,—আমার উপর এত কৃপা!'

ভগবতী হাসতে হাসতে বললেন—'বাছা! তোমার জন্মান্তরের কথা স্মরণ নাই; তুমি জন্ম জন্ম আমার তপস্যা করেছিলে, সেই সাধনবলে তোমার এরূপ জোটপাট হয়েছে, তাই আমার দর্শন পেলে। এখন বল কি বর চাও?'

কি জান? অনেকটা পূর্বজন্মের সংস্কারে হয়। লোকে মনে করে, হঠাৎ হচ্ছে। একজন সকালে একপাত্র মদ খেয়েছিল, তাতেই বেজায় মাতাল হ'য়ে ঢলাঢলি আরম্ভ করলে; লোকে অবাক্। এক পাত্রে এত মাতাল কি ক'রে হ'ল? একজন বল্লে—'ওরে, সমস্ত রাত্রি মদ খেয়েছে।'

দেখ না, লালাবাবু—এত ঐশ্বর্য; পূর্বজন্মের সংস্কার না থাকলে ফস্ ক'রে কি বৈরাগ্য হয়? আর রানী ভবানী—মেয়েমানুষ হ'য়ে এত জ্ঞান-ভক্তি?

শেষজন্মে সত্ত্বগুণ থাকে, ভগবানে মন হয়; তাঁর জন্য মন ব্যাকুল হয়—নানা বিষয়কর্ম থেকে মন স'রে আসে।

আগের জন্মের কর্মসংস্কারে পরজন্মের কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। পূর্বজন্মের সংস্কার মানতে হয়।

কোথায় ঈশ্বর?

শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার হালদার

বিবেক-আনন্দ ঋষি বিখ্যাত ধরায়
শুনি' ইষ্টপাদমূলে, ভ্রমি' তপস্যায়
গভীর অরণ্য মরু গিরি নদীতটে
লভিলেন মহাসত্য—"প্রতি ঘটে ঘটে
বিরাজে ঈশ্বর—জীবে সেব শিবজ্ঞানে।"
হিংসায় উন্মত্ত জড়-সভ্যতার কানে
পশেনি সে মহামন্ত্র; অদ্যাপি বিস্তর
উঠিছে প্রাচীন তর্ক—"কোথায় ঈশ্বর?"

সমালোচনা

রামায়ণ কাহিনীঃ স্বামী অমলানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেন্টস হোম, বেলঘরিয়া, কলিকাতা-৫৬ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১২৮+৮; মূল্য ছাত্রসংস্করণ—১.৬০ টাকা, বোর্ড বাঁধাই—২৲ টাকা।

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লেখা 'রামায়ণ কাহিনী'তে আদিকাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরকাণ্ড পর্যন্ত রামায়ণ-বর্ণিত সুদীর্ঘ কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ভাষা অতি সহজ, সরল, মাধুর্যমণ্ডিত। স্থানে স্থানে প্রাকৃতিক বর্ণনা এই মাধুর্যকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। কাহিনী প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সাবলীল গতিতে বহিয়া গিয়াছে, কোথাও ব্যাহত হয় নাই। কাহিনীর মধ্যে ছাত্রদের গ্রহণোপযোগী উচ্চ ভাবগুলিকে কোথাও কোথাও যথাসাধ্য অধিকতর প্রকট করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টাও প্রশংসনীয়।

পুস্তকটি মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত মূল গ্রন্থানুগ। ছাত্রগণ পুস্তকটি দ্বারা খুবই উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই। যাঁহারা অতি সংক্ষেপে মূল রামায়ণের পরিচয় পাইতে চান, পুস্তকটি তাঁহাদেরও সহায়ক হইবে।

জীবন শ্রবণ ও শ্রবণযন্ত্রঃ শ্রীমতী অনুভূতি বসু বি. এ., বি. টি., ইউ. সি. টি. ডি. (ম্যাঞ্চেষ্টার)। ১৩৯, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—১৮+৬; মূল্য—১৲ টাকা।

"ভাষা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনের চাহিদাই কেবল মেটায় না, চৈতন্যের দ্বার উন্মুক্ত করে। সমাজ-জীবন-যাপন ও আত্মবিকাশ—কোনটাই ভাষার সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়।" সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বধিরতার প্রতিকার তাই একান্ত কাম্য। বধিরতা, তাহার কারণ ও প্রতিকার বিষয়ে কিছু জ্ঞান সাধারণের থাকা একান্ত আবশ্যক। শ্রীমতী বসু তাঁহার মনীষা এবং দেশ-বিদেশ হইতে আহৃত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে এ বিষয়ে অনেক কিছু সহজ সরল ভাবে পুস্তকাটিতে পরিবেশন করিয়াছেন। শ্রীমতী বসু কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের বালিকা বিভাগের হেড-ইন-চার্জ। পুস্তিকাটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

বিদ্যামন্দির পত্রিকা (চতুর্দশ সংখ্যা—১৯৬৬)—রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭০+৪১।

পূর্ব মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বিদ্যামন্দির পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটির আত্মপ্রকাশ অভিনন্দনযোগ্য। কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ: বিশ্ব-রহস্য-উদ্ঘাটনে দূরবীন ও বর্ণালীবীক্ষণ, আচার্য বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেম, শক্তিসাধনায়াং স্বামী বিবেকানন্দঃ, Swami Vivekananda's Vision of a New India, Problems before the Youth of Bengal.

অভীঃ (চতুর্থ প্রকাশ—১৩৭২)—রামকৃষ্ণ মিশন মহাবিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর, ২৪-পরগনা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭৯+৪১।

আলোচ্য পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রচ্ছদ-পটে মুদ্রিত যম ও নচিকেতার ছবি, শাস্ত্রবাক্যের উদ্ধৃতি এবং প্রবন্ধনির্বাচন দৃষ্টি আকর্ষণ করে। India's Tolerance—A fruit of her spiritual Outlook, Space Exploration, Swami Vivekananda on some problems of our national Life, Atomic Energy—some of its uses, স্বামী বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তা, গাধার লজিক (রম্য রচনা), প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান, রেডিও ফটো, রবীন্দ্র-নাথের ইতিহাস-চেতনা—প্রবন্ধগুলিতে চিন্তা-শীলতার স্বাক্ষর বিদ্যমান।

ত্রয়ী (অষ্টম প্রকাশ—১৯৬৬)—রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬৪+৫৩।

শিল্পবিদ্যা-অধ্যয়নরত ছাত্রগণের সাহিত্য-সাধনার পরিচয় আমরা 'ত্রয়ী' পত্রিকার মাধ্যমে পাইয়া আসিতেছি। আলোচ্য সংখ্যাখানিও উৎকৃষ্ট সাহিত্য-চর্চার নিদর্শন। 'স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতীয় জাতীয়তাবোধ' প্রবন্ধটি অতি সুন্দর। অন্যান্য রচনার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য : শিশুমন ও রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা, মহাকাশ, পরমাণু বিভাজন ও তেজস্ক্রিয়তার বিপদ, Student Indicipline, Integration of Science, Technology and Industry.

নিবেদিতা বিদ্যালয় পত্রিকা (১৯৬৬)—রামকৃষ্ণ সারদা মিশন ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়, ৫ নিবেদিতা লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭৩।

পত্রিকার শোভন মুদ্রণ ও সুসম্পাদনা আকর্ষণীয়। পত্রিকাটিতে প্রথম শ্রেণী হইতে একাদশ শ্রেণীর বালিকাদের রচনা এবং শিক্ষিকাগণের সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

আমার প্রিয় কুকুর ঝুমুর, পুতুলের বিয়ে, চিড়িয়াখানা দেখে এলাম, সেরা দিন, ভাই ফোঁটা, ছুটি—এই রচনাগুলি প্রথম হইতে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীদের। শিশুদের সযত্নকৃত লেখাগুলি ছাপার অক্ষরে দেখিয়া তাহারা আনন্দ ও উৎসাহ পাইবে, পাঠকবর্গও আনন্দিত হইবে। কয়েকটি উৎকৃষ্ট রচনা: স্বামী সারদানন্দ (শতাব্দীর শ্রদ্ধাঞ্জলি), কালিদাসস্য কাব্যে ঋতুবর্ণনম্, Homage to our beloved Sister Nivedita (poem).

শাশ্বতী (৭ম সংখ্যা—১৩৭৩)—টাকী রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ বিদ্যালয়, টাকী, ২৪-পরগনা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭০।

বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ-রচিত কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধাবলীর মাধ্যমে তরুণমনের চিন্তাশীলতার সহিত পাঠকগণের পরিচয় ঘটিবে। লেখা-গুলিতে সাহিত্যসৃষ্টির প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতা আছে। সম্পাদনার ক্ষেত্রে অধিকতর উৎকর্ষ বাঞ্ছনীয়। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যার্থীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণকাহিনীটি একটি তথ্যপূর্ণ রচনা।

উৎসর্গ (পত্রিকা—১৩৭৩)—প্রকাশক : সাহিত্য-সংসদ, নেতাজী মহাবিদ্যালয়, আরামবাগ, হুগলী। পৃষ্ঠা ৮৮+১৫।

সুনির্বাচিত বাণী-সঙ্কলন, কবিতা, ভ্রমণ-কাহিনী, গল্প এবং সুলিখিত বাংলা ও ইংরেজী প্রবন্ধে সমলঙ্কৃত এই পত্রিকাখানি সুষ্ঠু সম্পাদনার দাবি রাখে। 'সন্ন্যাসী তুমি বীর'-শীর্ষক কবিতাটি যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সার্থক শ্রদ্ধাঞ্জলি। প্রচ্ছদপটটি আকর্ষণীয়। আমরা পত্রিকাখানির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরিষদ পত্রিকা (রবীন্দ্রসংখ্যা—১৩৭৩) ১নং ডালিমতলা লেন, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা-৩৪।

রবীন্দ্রসংখ্যার উপযোগী কয়েকটি প্রবন্ধ এই স্মারক-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার সহিত পাঠকগণের পরিচয় ঘটাইবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। পত্রিকাটি যোগ্য সমাদর লাভ করিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বেলুড় মঠে যথাযোগ্য ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে মৃন্ময়ী প্রতিমায় জগজ্জননী শ্রীশ্রীদুর্গা-দেবীর উপাসনা বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকামতে (২০শে অক্টোবর সপ্তমী হইতে ২৩শে অক্টোবর দশমী পর্যন্ত) চারদিন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজার কয়দিন আবহাওয়া সুন্দর থাকায় মঠে পূজা ও প্রতিমা দর্শনের জন্য প্রচুর ভিড় হইয়াছিল। ২১শে অক্টোবর প্রাতঃকালে কুমারীপূজা ও রাত্রে সন্ধিপূজা যথারীতি ভাবপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। সহস্র সহস্র ভক্ত শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর উদ্দেশে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। বর্তমান পরিস্থিতিজনিত খাদ্যাভাবের জন্য এবার অন্ন-প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই।

শাখাকেন্দ্রে শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব

এই বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিম্নলিখিত কেন্দ্রসমূহে মৃন্ময়ী প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর অর্চনা অনুষ্ঠিত হইয়াছে:

আসানসোল, করিমগঞ্জ, কামারপুকুর, জয়রামবাটী, জলপাইগুড়ি, জামসেদপুর, ঢাকা, পাটনা, বারাণসী (অদ্বৈত আশ্রম), বোম্বাই, মালদহ, মেদিনীপুর, রহড়া, শিলং, শ্রীহট্ট, শেলা (খাসিহিল)।

রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা

১৯৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী

গত ৩০শে অক্টোবর, ১৯৬৬, বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কার্যবিবরণী পাঠ ও সভার অন্যান্য অনুষ্ঠানান্তে স্বামী তপস্যানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ভাবধারা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পর শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ সভাপতির ভাষণ দেন। এই ভাবটির উপর তিনি বিশেষ জোর দেন যে, সকলের ভিতরেই ভগবান রহিয়াছেন—এই সত্যকে ভিত্তি করিয়া শিবজ্ঞানে জীবসেবার মাধ্যমেই বিশ্বজনীন কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত হইবে।

সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতির সারানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল:

সদস্য-সংখ্যা

আলোচ্য বর্ষে মিশনের ৫জন সাধু-সদস্য এবং ৩জন গৃহস্থ-সদস্য দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৯৬৬, মার্চ-এর শেষে মোট সদস্য-সংখ্যা ছিল ৬৬৪ (সাধু ৩৫০, ভক্ত ৩১৪)।

কর্মপ্রসার

আলোচ্য সময়ে মিশনকে অন্য দিক দিয়াও কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। ভারত ও পাকিস্তানের সংঘর্ষের ফলে প্রধান কেন্দ্রের সহিত পাকিস্তানস্থিত কেন্দ্রগুলির সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। পাকিস্তানের কেন্দ্রগুলির কর্মিগণ (ভারতীয় নাগরিক) দীর্ঘকাল নানা দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হন। চারজন কর্মী (পাকিস্তানের নাগরিক) এখনও সেখানে আছেন। অনিবার্য কারণবশতঃ এই কেন্দ্র-গুলির সহিত আমাদের যোগসূত্র অতি ক্ষীণ,

নামে মাত্র আছে। পাকিস্তানের সব কেন্দ্রের কার্যবিবরণী আমাদের নিকট পৌঁছায়ও নাই। মনে হইতেছে, এই কেন্দ্রগুলির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

বিগত ৫ই জুলাই, ১৯৬৫, ব্রহ্মদেশস্থ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম রাষ্ট্রীয়করণের ফলে উক্ত কেন্দ্রের সাধু-কর্মিগণকে ভারতে চলিয়া আসিতে হইয়াছে। সেখানকার রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটির কর্মিগণও চলিয়া আসিয়াছেন; ব্রহ্ম সরকার তাঁহাদের ভিসা দিতে বা নূতন কর্মীকে তাঁহাদের স্থলে যাইতে দিতে অসম্মত। স্থানীয় কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীকে লইয়া মিশন কর্তৃক গঠিত একটি ম্যানেজিং কমিটি সোসাইটির কর্ম পরিচালনা করিতেছেন। মিশনের সহিত কেন্দ্রটির কোন ব্যক্তিগত সংযোগ কার্যতঃ আর নাই।

মিশনের ভারতস্থিত কেন্দ্রগুলি অবশ্য সন্তোষজনকভাবেই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে সম্প্রসারণ অপেক্ষা সংহতির প্রতি বেশী গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। বাঁকুড়ার রামহরিপুর উপকেন্দ্রটিকে বাঁকুড়া কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটি পূর্ণ কেন্দ্রে উন্নীত করা হইয়াছে।

সেবাকার্য

রামেশ্বরের সাইক্লোন রিলিফের বিবরণী গতবারের রিপোর্টে আংশিক প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল ৫৭টি কুটির ও ৩টি কূপ বিশিষ্ট একটি কলোনী সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়। উচিপল্লী ও রামেশ্বর—এই দুইটি সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ঝটিকাবিধ্বস্ত দুঃস্থগণের সেবাকার্যে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়িত হইয়াছে।

ভারত ও পাকিস্তানের সংঘর্ষের ফলে বহু পরিবার ছিন্নমূল হয়। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে জম্মু ও কাশ্মীর সীমান্তে সেইসব উদ্বাস্তদের মধ্যে সেবাকার্য আরম্ভ করা হয়। কম্বল, পোশাক-পরিচ্ছদ, বালতি, লণ্ঠন প্রভৃতি বিতরিত হইয়াছিল। ১৯৬৬, ফেব্রুআরিতে এই রিলিফ কার্য শেষ করা হয়। এই সেবাকার্যে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৪২,১১০·১৯ টাকা।

কেন্দ্রসমূহ ও কার্যবিভাগ

মূল কেন্দ্র (বেলুড়) ছাড়া ১৯৬৬, মার্চ মাসে মিশনের ৭০টি কেন্দ্র ছিল। তন্মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ছিল ৭টি এবং ব্রহ্ম, ফ্রান্স, ফিজি, সিঙ্গাপুর, সিংহল ও মরিশাসে একটি করিয়া; বাকী ৫৭টি ভারতে। ভারতের কেন্দ্রসংখ্যা রাজ্য-হিসাবে: পশ্চিমবঙ্গে ২৩, মাদ্রাজে ৮, উত্তরপ্রদেশে ৬, বিহারে ৬, আসামে ৪, অন্ধ্রে ২, ওড়িশায় ২; দিল্লী, রাজস্থান, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, মহীশূর ও কেরলে একটি করিয়া। নেফার এলং-এ একটি নূতন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (আলোচ্য সময়ের পরে ইহার কার্য আরম্ভ হয়)।

মিশনের শাখা-কেন্দ্রগুলির কার্যধারার প্রধানতঃ চারটি বিভাগ: (১) চিকিৎসা, (২) শিক্ষা, (৩) সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রসার, (৪) গ্রামাঞ্চলে ও দরিদ্রগণের মধ্যে সাহায্য-দানাদি কর্ম।

(১) চিকিৎসা: ভারত, পাকিস্তান এবং ব্রহ্মদেশে মিশনের অনেকগুলি কেন্দ্রে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে রোগীদের সেবাশুশ্রূষা করার জন্য কয়েকটি হাসপাতাল ও ডিস্পেনসারী আছে।

বারাণসী, বৃন্দাবন ও কনখল সেবাশ্রম, রাঁচির যক্ষ্মা হাসপাতাল ও কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠান—এইসব ইনডোর হাসপাতাল ছাড়াও বোম্বাই, কানপুর, সালেম ও নিউ

দিল্লীর সেবাকেন্দ্রগুলিতে আপৎকালীন ব্যবস্থা ও পর্যবেক্ষণের জন্য কয়েকটি করিয়া শয্যার ব্যবস্থা আছে। নিউদিল্লীস্থিত চিকিৎসালয়টি টি. বি. রোগীদের জন্য। কলিকাতা সেবা-প্রতিষ্ঠানে গবর্ণমেণ্ট-অনুমোদিত নার্সিং-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। সেবাপ্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য 'বিবেকানন্দ ইনষ্টিট্যুট' অবস্থিত; ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কলেজ অব মেডিসিন'-এর অঙ্গীভূত।

আলোচ্য বর্ষে মিশনের তত্ত্বাবধানে হাসপাতালগুলিতে মোট শয্যা-সংখ্যা ছিল ৯০১; এগুলিতে ১৬,০২২ জন রোগী চিকিৎসার জন্য ছিল। ৪৭টি বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয়ে পুরাতন রোগীসহ ২৪,০৯,৪০৪ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

(২) **শিক্ষা**ঃ আলোচ্য বর্ষে মিশন-পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কর্মধারা:

প্রতিষ্ঠান	স্থান বা সংখ্যা
মহাবিদ্যালয়	মাদ্রাজ
"	রহড়া (২৪পরগনা)
" (আবাসিক)	বেলুড়
" "	নরেন্দ্রপুর
আর্টস কলেজ (প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয়)	পেরিয়ানায়কেনপালয়ম
বি. টি. কলেজ	"
"	বেলুড়
বেসিক ট্রেনিং কলেজ (পোস্টগ্রাজুয়েট)	রহড়া
" (সিনিয়র)	সরিষা
" (জুনিয়র)	রহড়া
" (")	সরিষা
" (")	সারগাছি
বেসিক ট্রেনিং স্কুল	পেরিয়ানায়কেনপালয়ম
"	মাদ্রাজ
শারীর শিক্ষা কলেজ	পেরিয়ানায়কেনপালয়ম
গ্রামীণ " "	"
কৃষি-শিক্ষা বিদ্যালয়	"
সমাজশিক্ষাসংগঠক-শিক্ষণকেন্দ্র	"
"	বেলুড়
ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল (পলিটেকনিক)	বেলুড়
"	বেলঘরিয়া
"	মাদ্রাজ
"	পেরিয়ানায়কেনপালয়ম
পরিবেবিকা-শিক্ষণকেন্দ্র	কলিকাতা (সেবাপ্রতিষ্ঠান)
জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল অথবা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল "	৯
ছাত্রাবাস (কয়েকটি অনাথাশ্রম-সহ)	৭০
চতুষ্পাঠী	৩
বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৪
উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৭
উচ্চ বা মাধ্যমিক "	১২
সিনিয়র বেসিক ও মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়	৩৫
জুনিয়র বেসিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৪
নিম্নশ্রেণীর ও অন্যান্য বিদ্যালয়	৭৭

এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ভারত, পাকিস্তান, [illegible]র, ফিজি ও মরিশাসে পরিব্যাপ্ত। এতদ্ব্যতীত নরেন্দ্রপুর আশ্রমে অন্ধ ছাত্রদের জন্য একটি 'ব্লাইণ্ড বয়েজ অ্যাকাডেমি' আছে। কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র (Institute of Culture) কর্তৃক পরিচালিত দিবা-ছাত্রাবাসে (Day Hostel) ৮০০ জন ছাত্র অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করিতেছে; এখানে সাহিত্যাদি ও সংস্কৃতি-শিক্ষার এবং বিভিন্ন ভারতীয় ও বৈদেশিক ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গুলির মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৫৯,০৯৩, তন্মধ্যে ছাত্র ৪৪,৫৭৫ এবং ছাত্রী ১৪,৫১৮।

(৩) **সংস্কৃতি ও ধর্ম**ঃ মিশনের অধিকাংশ কেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে প্রতিফলিত ভারতের সমন্বয়-মূলক প্রাচীন সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক ভাববিস্তারের উপর বিশেষভাবে জোর দেন এবং বিভিন্ন কাজকর্মের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বজনীন শিক্ষাকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করেন। এতদুদ্দেশ্যে বহু গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগার পরিচালিত হয়। জনসভা, আলোচনা-সভা, পুস্তক-প্রকাশন ও উৎসবাদির

মাধ্যমেও আধ্যাত্মিক ভাববিস্তার করা হইয়া থাকে।

(৪) **গ্রামাঞ্চলে কার্য ও দরিদ্রদিগকে সাহায্য :** রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলি সবই শহরাঞ্চলে স্থাপিত এবং সেগুলি কেবলমাত্র উচ্চ-শ্রেণী ও মধ্যবিত্তদেরই জন্য—সাধারণের মধ্যে এরূপ একটি ধারণা জন্মিতেছে। ইহা অপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই হইতে পারে না। মিশনের অন্ততঃ নয়টি বড় কেন্দ্র গ্রামাঞ্চলেই অবস্থিত এবং এই কেন্দ্রগুলির পরিচালনাধীনে বহু উপকেন্দ্রও আছে। এগুলি দরিদ্র জন-সাধারণের সেবায় রত থাকিয়া ১২৯টি বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেছে; তন্মধ্যে ৬টি বহুমুখী বিদ্যালয়, ৩টি মাধ্যমিক, ৩৯টি সিনিয়র বেসিক, জুনিয়র বেসিক ও মধ্য ইংরেজী, ৪৭টি প্রাথমিক, এবং বয়স্কদের জন্য ৩৩টি নৈশ বিদ্যালয়। ১০টি দাতব্য চিকিৎসালয়ে ১,৬৪,২৪৩ রোগী চিকিৎসা লাভ করিয়াছে; ৪টি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ২৭টি গ্রাম্য কেন্দ্রে কাজ করিয়াছে। ৮৯টি দুগ্ধ-বিতরণ কেন্দ্র, ৫টি অডিও-ভিস্যুয়াল ইউনিট, ৮টি কমিউনিটি সেণ্টার, ৪টি বৃত্তি-শিক্ষা কেন্দ্র, কৃষি-মেলা ইত্যাদি আছে। শিলং কেন্দ্রের একটি ভ্রাম্যমাণ অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে খাসি পাহাড় এলাকায় নিয়মিতভাবে ১০টি গ্রাম ঘুরিয়া আলোচ্য সময়ে ১১,৯০৮ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে। কামারপুকুর মিশন কেন্দ্র কর্তৃক একটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী পরিচালিত হইতেছে। লক্ষণীয় যে, মিশনের শহরাঞ্চলের চিকিৎসা-কেন্দ্র ও বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নরনারী চিকিৎসার সুযোগ পাইতেছে এবং সহস্র সহস্র দরিদ্র ছাত্র অর্থসাহায্য অথবা বিনা-ব্যয়ে থাকিবার ও শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ লাভ করিতেছে। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, মিশন কর্তৃক প্রায় প্রতি বৎসরই আর্তত্রাণ-সেবাকার্য (Relief) করা হয় এবং এই সেবাকার্যের মাধ্যমে সহস্র সহস্র দুঃস্থ ও বিপন্ন লোক সাহায্য লাভ করে। ১৯৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত এইরূপ দুইটি সেবাকার্যের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রারম্ভেই দেওয়া হইয়াছে। আসামের বন্যার্ত-সেবাকার্যে এই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ৬০ হাজারের বেশী টাকা ব্যয়িত হইয়াছে এবং সেখানে ত্রাণকার্য এখনও চলিতেছে।

প্রধান কেন্দ্রের কাজ প্রধানতঃ শাখা-কেন্দ্রগুলির পরিচালনা হইলেও এখান হইতে দরিদ্র ছাত্রগণকে ও দুঃস্থ পরিবারবর্গকে সাহায্যদানও করা হয়। প্রধান কেন্দ্র হইতে নিয়মিতভাবে ১৩৪টি দুঃস্থ পরিবারকে ও ২৮৮ জন ছাত্রকে (সিন্ধু উদ্বাস্তদের লইয়া) আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে; তাছাড়া দুইটি বিদ্যালয়, ১৮৪টি পরিবার ও ৪০ জন ছাত্র সাময়িকভাবে সাহায্য পাইয়াছে। সাহায্যের মোট পরিমাণ ৩১,১০৬·৯৫ টাকা। কয়েকটি শাখা-কেন্দ্র হইতেও বহু দরিদ্র ছাত্র ও অভাব-গ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য দান করা হইয়াছে।

ব্রেজিলে বেদান্ত প্রচার

দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেণ্টিনা বেদান্ত-প্রচার কেন্দ্রের পরিচালক স্বামী বিজয়ানন্দজী এবার গ্রীষ্মকালে প্রায় দুই মাস ব্রেজিলের রিও ডি জেনাইরো এবং সাঁও পাউলো শহর-দ্বয়ে অবস্থান করিয়া স্থানীয় বেদান্তানুরাগী ভক্তগণের নিকট বেদান্ত, যোগ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শিক্ষা সম্বন্ধে ৩৫টি আলোচনা-ক্লাস পরিচালনা করিয়াছেন। এই ক্লাসগুলি বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে এবং ভক্তগণকে প্রভূত আনন্দ ও উদ্দীপনা দিয়াছে। কয়েক বৎসর যাবৎ রিও ডি জেনাইরো শহরে একটি

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। ভক্তেরাই উহার পরিচালনা করেন। ব্রেজিলের জাতীয় ভাষা পর্তুগীজে বেদান্ত, যোগ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের কতিপয় গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বামী সারদেশ্বরানন্দজী মহারাজের দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী সারদেশ্বরানন্দজী মহারাজ উক্ত আশ্রমে গত ২রা নভেম্বর বিকাল প্রায় ৪টার সময় দেহত্যাগ করিয়াছেন। দেহত্যাগকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৭ বৎসর। দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং শেষের কয়মাস তাঁহাকে শয্যাশায়ী হইয়াও থাকিতে হইয়াছিল, তবু অসুস্থ শরীরেই অদম্য উৎসাহ লইয়া তিনি শেষমুহূর্ত পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার দেহত্যাগের সংবাদ আসিয়া পৌঁছবামাত্র বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ ও নরেন্দ্রপুর আশ্রম হইতে কয়েকজন সাধু কামারপুকুর চলিয়া যান এবং শেষকৃত্যে যোগদান করেন। কামারপুকুরের প্রসিদ্ধ 'ভূতির খালে' বহু সাধু, ব্রহ্মচারী, ছাত্র ও ভক্তের উপস্থিতিতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সু-সম্পন্ন হয়।

স্বামী সারদেশ্বরানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ২৬ বৎসর বয়সে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। সর্বপ্রযত্নে বহুভাবে তিনি সঙ্ঘের সেবা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠে থাকাকালে তিনি অনলসভাবে উহার বিবিধ কার্যে যুক্ত ছিলেন। কিছুকাল বেলুড় ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল স্কুল এবং পাথুরিয়াঘাটা আশ্রমেরও সেক্রেটারি ছিলেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ওয়াকিং কমিটির সভ্যও ছিলেন কয়েক বৎসর। শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মস্থানটিকে উদ্ধার ও সেখানে মঠের কেন্দ্র-স্থাপন করিয়া তাহার বিস্তারকল্পে তাঁহাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। সুরম্য শ্রীরামকৃষ্ণমন্দির-সংলগ্ন নাটমন্দির, অতিথিভবন, বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয়, জুনিয়র ও সিনিয়র বেসিক স্কুল, বহুমুখী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং স্থানীয় লাইব্রেরী-সমন্বিত কামারপুকুর আশ্রমের বর্তমান রূপটি তাহারই অনলস উৎসাহের ফল। তাঁহার দেহত্যাগে সঙ্ঘ একজন অতন্দ্র কর্মীকে, মধুরস্বভাব সন্ন্যাসীকে হারাইল।

তাঁহার আত্মা শ্রীভগবচ্চরণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষাপীঠঃ গত ৩০শে সেপ্টেম্বর মুকুন্দপল্লীর (রামপুরহাট) শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষাপীঠের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে সভাপতিত্ব করেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য মহাশয়। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ মহারাজ। আবাসিক বিদ্যালয়টির সভাপতি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শ্রীব্রজকান্ত গুহ মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। উৎসবে শিক্ষাপীঠের ছাত্রেরা আবৃত্তি, পাঠ ও সংগীত পরিবেশনের দ্বারা নিমন্ত্রিত অতিথিদের চিত্তবিনোদন করে। সভায় বিভিন্ন বক্তা তাঁহাদের ভাষণে এই বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠাতা সর্বজনবরেণ্য শিক্ষাব্রতী স্বর্গীয় মুকুন্দবিহারী সাহার মহান অবদানের কথা স্মরণ করেন।

সুরবিতান : মহাষষ্ঠীর পুণ্যপ্রভাতে সকাল ৭টায় "সুরবিতান" এক নিষ্ঠাপূর্ণ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে 'ভগিনী নিবেদিতা জন্মশতবার্ষিকী' দিবস পালন করে। এই অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয় ৮৩, মনসাতলা লেনে (কলিকাতা-২৩)। এই উপলক্ষে অধ্যক্ষ শ্রীরবীন্দ্র বসু 'আদর্শ মহীয়সী নারী নিবেদিতা' সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন এবং প্রতিষ্ঠানের শিশুবৃন্দ 'মাতৃ-বন্দনা' শীর্ষক সংগীতানুষ্ঠান পরিবেশন করে। আবৃত্তি, স্তোত্র-পাঠ ও সংস্কৃত-সঙ্গীত অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল।

একটি মহান আত্মত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে হুগলী জেলার ইটাচুনা বিজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ গোপালচন্দ্র মজুমদার মহাশয় গত ইং ১৬ই নভেম্বর, ১৯৬৬, বুধবার সকাল ৮টা ৩০ মিঃ সময় খন্যান স্টেশনে রেল লাইনের উপর ক্রীড়ারত অন্যমনস্ক দুইটি বালককে ট্রেন দুর্ঘটনার হাত হইতে উদ্ধার করিতে যাইয়া নিজে আপ বারুণী এক্সপ্রেসের চাকায় পিষ্ট হইয়া ঘটনাস্থলেই প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে প্রাণ বিসর্জন দেন। একটি ছেলেকে মৃত্যুর হাত হইতে তিনি উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া অপরের প্রাণরক্ষার প্রচেষ্টা ও তাহাতে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া তিনি মনুষ্য-জীবনের একটি মহত্তম আদর্শ রাখিয়া গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বহু কেন্দ্রের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন এবং নানাস্থানে আহূত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে প্রাণস্পর্শী ভাষায় আলোচনা করিতেন। তিনি একজন আদর্শ হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল।

হুগলীর ইটাচুনা মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই তিনি সেখানে অধ্যক্ষের কার্যে ব্রতী থাকিয়া সুষ্ঠুভাবে সে কার্য পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। সুদীর্ঘ ১৬ বৎসর কাল ইটাচুনার বহু শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানাদি প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন-ব্যাপারে তিনি আজীবন প্রাণপাত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। ইটাচুনায় 'প্রবুদ্ধ ভারত সংঘের' তিনি প্রতিষ্ঠাতা। বিশিষ্ট স্বাধীন-চেতা সমাজসেবী ও শিক্ষাব্রতী রূপে আজীবন তিনি আদর্শশিক্ষাবিস্তারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় বহু ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। তিনি দরদী দরিদ্রছাত্রবন্ধু ছিলেন, স্বোপার্জিত অর্থের অধিকাংশই ব্যয় করিতেন দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যকল্পে। বিদ্যার্থীদের মানসিক, শারীরিক ও নৈতিক উন্নতিসাধনের প্রতি তিনি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতেন।

গোপালচন্দ্র মজুমদার খুলনা জেলার মহেশ্বরপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দৌলতপুর কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরেজীতে বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া দৌলতপুর কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন; দেশ-বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার ইটাচুনা গ্রামে কলেজটি গড়িয়া তোলেন। তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রধান অধ্যাপকও ছিলেন। তাঁহার হৃদয়টি ছিল কুসুমের ন্যায় কোমল। তাঁহার ন্যায় তেজোদীপ্ত, ত্যাগী, নিরহংকার, অকৃতদার শিক্ষাব্রতী বিরল দেখা যায়।

তাঁহার ত্যাগ ও সেবার আদর্শ দেশের শিক্ষক ও বিদ্যার্থিগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলুক। তাঁহার আত্মা শ্রীভগবানের পাদপদ্মে শাশ্বত শান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি!